Tattwabodhini Patrika | Reg. No. C. 432

একবিংশ কল্প
চতুর্থ ভাগ
বৈশাখ, ব্রাহ্মসম্বৎ ৯৭।

৯৯৩ সংখ্যা | ১৮৪৮ শক

তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা

"ব্রহ্ম বা একমিদমগ্র আসীন্নান্যৎ কিঞ্চনাসীত্তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রন্নিরবয়বমেকমেবাদ্বিতীয়ম্ সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয়ং সর্ব্ববিৎ সর্ব্বশক্তিমদ্ধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্যসাধনঞ্চ তদুপাসনমেব"।

সম্পাদক

শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৫৫ নং অপার চিৎপুর রোড্ [illegible] শ্রীরণগোপাল চক্রবর্ত্তী দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত।
সাল ১৩৩৩। খৃঃ ১৯২৬। সম্বৎ ১৯৮৩। কলিগতাব্দ ৫০২৭। বৈশাখ।

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার বার্ষিক মূল্য [illegible] টাকা ডাকমাশুল ৶০ আনা। এই সংখ্যার মূল্য [illegible] আনা। } আদি ব্রাহ্মসমাজের কর্ম্মাধ্যক্ষের নিকটে পাঠাইতে হইবে।

৺দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর

একবিংশ কল্প

চতুর্থ ভাগ

বৈশাখ, ব্রাহ্মসম্বৎ ৯৭।

৯৯৩ সংখ্যা ১৮৪৮ শক

তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা

"ব্রহ্ম বা একমিদমগ্র আসীন্নান্যৎ কিঞ্চনাসীত্তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রন্নিরবয়বমেকমেবাদ্বিতীয়ম্ সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয়ং সর্ব্ববিৎ সর্ব্বশক্তিমদ্ধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্যসাধনঞ্চ তদুপাসনমেব"।

সম্পাদক—শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

কলিগতাব্দ ৫০২৭। সম্বৎ ১৯৮৩। খৃঃ ১৯২৬। শক ১৮৪৮। সাল ১৩৩৩।

বন্ধু আমার!

(শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর)

১। বন্ধু আমার!

বন্ধু আমার! প্রিয় আমার! আমার প্রাণের ভিতর তোমাকে বন্ধু বলিয়া ডাকিতে কি তীব্র আকাংক্ষা জাগিতেছে, তাহা তুমি জানিতেছ। এ পর্য্যন্ত তোমাকে প্রাণ খুলিয়া বন্ধু বলিয়া ডাকিতে পারি নাই বলিয়া প্রাণের ভিতর কি প্রকার মর্ম্মভেদী আঘাত পাইতেছি, তাহাও তুমি জানিতেছ। এতদিন তোমাকে বন্ধু বলিয়া ধরি নাই, তাই সমস্ত জীবনটাই যেন মরুভূমি হইয়া উঠিয়াছে—চারিদিকেই শুষ্ক বালুকা ধূ—ধূ করিতেছে। একটী বৃক্ষ দেখিতেছি না, যাহার তলে মুহূর্ত্তের জন্যও বিশ্রাম লাভ করিতে পারি। আমার কর্ম্মফলের বীজসকল ইতস্তত নিক্ষিপ্ত হইয়া শতবিধ আগাছার জন্মদান করিয়াছে। এদিকে ওদিকে চারিদিকে চাহিয়া দেখিতেছি—যতদূর দৃষ্টি যায়, দেখিতেছি—কোথাও একটী সঙ্গী দেখিতেছি না। না—বন্ধু—না—আমি আর কোনও সঙ্গীর প্রত্যাশা করি না; কোনও ছায়াপ্রদ বৃক্ষতলে আশ্রয় গ্রহণ করিয়া সুখ সোয়াস্তি লাভেরও আশা করি না। আমি তোমাকে বন্ধু বলিয়া গ্রহণ করিয়াছি—জানিয়াছি। তুমি যদি আমাকে পরিত্যাগ করিয়া যাও, তোমার চরণতলে যদি আমাকে আশ্রয় প্রদান না কর, তবে তোমার স্পর্শে স্পন্দিত এই সুবিশাল সুবিমল আকাশতলে এই মরুভূমির বালুকারচিত সুকোমল চিতাশয্যায় শুইয়া আমার প্রাণ বহির্গত হৌক, তাহাতেও আমি সুখী। কিন্তু—না—জানি বন্ধু! জানি বন্ধু! তুমি আমাকে এত ভালবাস যে, তুমি এক মুহূর্ত্তের জন্যও আমাকে পরিত্যাগ করিতে পার না। তুমি আমার নিত্যসঙ্গী থাকিয়া আমাকে তোমার গৃহপানে লইয়া চলিয়াছ। বন্ধু আমার! এই সুনিস্তব্ধ সুপ্রশস্ত সুপ্রশান্ত মরুভূমির মাঝে দাঁড়াইয়া একবার আমাকে চীৎকার করিয়া তারস্বরে তোমাকে বন্ধু আমার—বন্ধু আমার বলিয়া ডাকিতে দাও—আমার প্রাণটা একটু হাল্কা হৌক। আর সেই ডাকার প্রতিধ্বনি শুভ্র গগনের পরতে পরতে উঠিয়া চন্দ্রসূর্য্যকে স্পন্দিত করুক; গ্রহ হইতে গ্রহান্তরে ঘুরিয়া ফিরিয়া সমগ্র দ্যুলোক ও অন্তরীক্ষে সেই আহ্বানের তরঙ্গ জাগাইয়া তুলুক। আমার এই দুইটী ক্ষুদ্র হাত তোমার চরণের অভিমুখে বাড়াইয়া দিতেছি; তুমি আমাকে তোমার কোলে তুলিয়া এই সংসার হইতে অন্তর্হিত করিয়া ফেল— আমি একমাত্র তোমারই মুখের দিকে তাকাইয়া সমস্ত জ্বালাযন্ত্রণা জুড়াই।

২। লুকোচুরি।

বন্ধু আমার! সহসা আমার নিকট হইতে তুমি লুকাইলে কেন? তুমি কিন্তু চিরকাল লুকাইয়া থাকিতে পারিবে না। আমি তোমাকে নিশ্চয়ই

ধরিব—তুমি আমার নিকটে ধরা না দিয়া থাকিতে পারিবে না। তুমি লুকাইয়াছ, কিন্তু তুমি তোমার চরণপাতের চিহ্ন তো মুছিয়া ফেলিতে পার নাই। যেখানেই যাই, যে দিকেই চাই, তোমারই পদচিহ্ন দেখি। আমি তোমার সেই পদচিহ্ন ধরিয়াই তোমাকে নিশ্চয়ই ধরিব। আমার সঙ্গে এ প্রকার লুকোচুরি খেলা খেলিয়া তোমারই বা লাভ কি? তুমি কি দেখিতে চাও, তোমার জন্য আমার প্রাণ কতটা আকুল-ব্যাকুল হয়? দেখ তবে আসিয়া—তোমার অদর্শনে আমার প্রাণের ভিতর কি প্রকার ব্যথা জাগিয়াছে, সমস্ত হৃদয় কি প্রকার দুরুদুরু কাঁপিতেছে। এই গাছপালা, এই পূর্ণিমার চাঁদের সঙ্গে সাদাসাদা ভাসা-মেঘের খেলা—চোখের সম্মুখে এ সমস্ত যেন স্বপ্নের মত চলিয়াছে। এমন মধুর সময়ে বন্ধুকে পার্শ্বে না দেখিয়া কান্না যে হৃদয় ফাটিয়া বাহির হইতে চাহিতেছে। এসো বন্ধু—এসো, তুমি নিজে আমার কাছে আসিয়া বসো। আমি হার মানিতেছি—আমি তোমার চরণচিহ্ন ধরিয়া কতই অগ্রসর হইয়াছি, তবু তোমাকে দেখিতে পাইলাম না। তুমি নিজে ধরা না দিলে আমি তোমাকে ধরিতে পারিব না, তাহা বুঝিয়াছি। এই স্থানটীও যেমন সুন্দর, এই কালটীও তেমনই সুন্দর। বন্ধু! আমার হৃদয়-আসনখানিও বিচিত্রগন্ধ বিচিত্রবর্ণ শতবিধ ফুলপত্রে খুব সুন্দর সাজে সুসজ্জিত করিয়া রাখিয়াছি। বাতাস ফুলের সুগন্ধভার বহন করিয়া শ্রান্তক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছে। বন্ধু আমার—আর তুমি লুকাইয়া থাকিও না। আমি হার মানিয়াছি। আমাকে আর ব্যাকুল করিও না। একবার আমাকে দেখা দাও, আর এই সুসজ্জিত আসনে আসিয়া বোসো—আমার প্রাণ শীতল হৌক। তুমি যদি আমার সঙ্গে কতকদূর অগ্রসর হইয়া এই ভাবে সহসা অদৃশ্যই হইবে, তবে আমার সঙ্গে বন্ধুত্ব পাতাইয়া আমার হৃদয়কে অধিকার করিবার কি দরকার ছিল? তুমি যখন আমার কাছে ছিলে, তখন তো আমি নির্ভয় ছিলাম। এখন তোমাকে কাছে দেখিতে পাইতেছি না বলিয়া, এসমস্তই যেন মায়া বলিয়া মনে হইতেছে—মনে হইতেছে, যেন কোন্ মায়াপুরীতে আসিয়া পড়িয়াছি—এখানকার কোন কিছুই যেন সত্য নয়, কোন কিছুরই উপর যেন নির্ভর করিতে পারিতেছি না। আমার প্রাণের ভিতর যে আনন্দের হাসি উঠিতেছে, বা কান্নার ঢেউ উঠিতেছে—তোমার বিরহে এসমস্তই যেন মিথ্যা মরীচিকা বলিয়া মনে হইতেছে। বন্ধু! বন্ধু!—আমি তোমাকে বন্ধু বলিয়া গ্রহণ করিয়াছি বলিয়া আমার হৃদয়টাকে লইয়া খেলা করিও না। আমার চিত্তকমলকে পদদলিত করিও না, আমার চিত্তপ্রসূনের পাতাগুলিকে খণ্ড খণ্ড করিয়া ছিঁড়িয়া ফেলিও না।

৩। বিরহে।

বন্ধু আমার! এখন পর্য্যন্ত তো তুমি দেখা দিলে না। আমি তোমার জন্য ঘুরিয়া ঘুরিয়া এ কোন্ অন্ধকার স্থানে আসিয়া পড়িয়াছি! তুমি আমার পার্শ্বে বসিয়া থাকিবে; আর আমি তোমার বন্ধুত্ব একা-একা পূর্ণরূপে উপভোগ করিব মনে করিয়াছিলাম। কিন্তু তাহা কতদূর সফল হইবে জানি না। আমি এখানে তোমার জন্য আকুল পরাণে ঘুরিয়া মরিতেছি, আর তুমি না জানি কোথায়—কোন্ অন্তরালে বসিয়া আমার এই ব্যাকুলতা দেখিয়া সুখ অনুভব করিতেছ! আমার নিকট ইহা তো বন্ধুত্বের উপযুক্ত কাজ বলিয়া মনে হয় না। অন্তরালেই যদি থাকিবে, তবে আমার দিকে বিস্ফারিত নয়নে চাহিয়া আমার প্রাণটাকে উদাস করিলে কেন? আমার কে-ই বা কোথায়! আমি লজ্জাসরম সমস্ত ত্যাগ করিয়া দুঃখদৈন্যকে বরণ করিয়া, তুমি ডাকিবামাত্র সমস্ত ছাড়িয়া একমাত্র তোমারই সঙ্গ লইয়াছি। এখন তুমিও আমার চক্ষের অন্তরালে থাকিলে আমি বাঁচি কি প্রকারে? নিতান্তই যদি তুমি না আইস, তবে দেখ—এই ধূলিধূসর মাটিতে তুমি যে পদচিহ্ন রাখিয়াছ, তোমার বন্ধু আজ সেই পদচিহ্নই বুকের ভিতর জড়াইয়া ধরিয়া এই মাটিতেই পড়িয়া থাকিবে। তাহাতেই যদি তুমি সুখ পাও তো পাইও। আমি এইখানে বসিলাম—আমি আর তোমার পশ্চাতে ছুটিয়া বেড়াইতে পারি না। আমি তোমার কাছে হার মানিলাম।

৪। দর্শনে।

বন্ধু আমার—বন্ধু আমার! তুমি এতই কাছে

ছিলে যে, আমি ব্যাকুলচিত্তে ডাকিতে না ডাকিতেই তুমি এখানে আসিয়া উপস্থিত। আমি তোমাকে দিশাহারা হইয়া পাগলের মত খুঁজিয়া বেড়াইতেছিলাম, আমার সেই কষ্টই দেখিতে কি তোমার এত ভাল লাগিতেছিল? আমি হার না মানিলে বুঝি তুমি ধরা দিতে না? তুমি আসিয়াছ, তাই আমার আনন্দ মনের ভিতর ধরিয়া রাখিতে পারিতেছি না—আনন্দটা যেন মূর্ত্তিমান হইয়া তোমার সম্মুখে প্রকাশ হইতে চাহিতেছে। এই আনন্দের কাছে—পৃথিবীর সুখ!—কত তুচ্ছ, তাহা না বলাই ভাল।

বন্ধু গো! তুমি যদি আসিয়াছ তো এইখানে একটুখানি বোসো, আর আমাকেও তোমার কাছে একটুখানি বসিতে দাও। আমি তোমাকে খুঁজিতে খুঁজিতে অনেক কাঁটার বন ভেদ করিয়াছি বটে, কিন্তু তবু কি জানি কেন, আমার মন আমাকে সমস্তক্ষণই বলিতেছিল যে, তুমি আমার কাছে কাছেই আছ। তুমি কাছে ছিলে বলিয়াই বাতাসের সঙ্গে সঙ্গে কেমন-যেন-এক সুগন্ধ পাইতেছিলাম। চাঁদের জ্যোৎস্না, ফুলের হাসি সকলের ভিতর দিয়াই মনে হইতেছিল, তুমিই যেন উঁকি-ঝুঁকি মারিতেছিলে। পাখীদের নীরব কূজনের ভিতরেও যেন তোমারই অনাহত বাণীর আহ্বান শুনিতে পাইতেছিলাম। যাক—এখন দ্যুলোক ও ভূলোকের সর্ব্বত্রই তোমাকে পাইয়াছি। আমার প্রাণ যাহা চায়, তুমিই তাহাই। তোমার মত এজগতে আমার আর কেহই নাই। তুমি আমার দিকে অনিমেষ নয়নে চাহিয়া থাক, আমিও তোমার দিকে অনিমেষ নয়নেই চাহিয়া থাকি। ইচ্ছা হয়, এই ভাবেই সমস্ত রাতটাই কাটাইয়া দিই।

প্রিয় আমার! সত্যই তুমি আমাকে ভালবাস কি না এক একবার আমার জানিতে ইচ্ছা হয়। তোমার হৃদয়ে যদি আমি এতটুকু স্থান পাই—তবে তো আর কিছুই চাই না। তোমাকে দেখিয়াও হৃদয় আনন্দের আনন্দে ভরিয়া যায়; আবার তোমার বিরহেও দুঃখের আনন্দ, ব্যথার আনন্দ হৃদয়ে উদ্বেলিত হইয়া উঠে—এ কি আশ্চর্য্য ব্যাপার! সত্যসত্য আমার ইচ্ছা কি হয়, তোমাকে কেমন করিয়া জানাইব? ইচ্ছা হয়—সমস্ত হৃদয়ের ভিতর তোমাকে টানিয়া রাখি—অনন্তকাল—অনন্তকাল ধরিয়া। এখন তোমাকে পাইয়াছি—আর তোমাকে ছাড়িব না। এখন আমার হাসি পাইতেছে—তুমি এইখানেই ছিলে, আমার এত কাছে ছিলে, তবু তোমাকে দেখিতে পাই নাই—তোমাকে খুঁজিয়া ঘুরিয়া মরিতেছিলাম। এসো বন্ধু,—এসো, আজ এই মধুর চাঁদিনী রাতে তোমার চরণ পূজা করিয়া তোমার সঙ্গে বন্ধুর সম্পর্ক গাঢ় ও দৃঢ় করিয়া লই।

গুরু ও শিষ্য।

(শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর)

ভগবৎপ্রীতি ও ব্রহ্মজিজ্ঞাসা।

ভগবানকে সমস্ত হৃদয় দিয়া প্রীতি করা এবং তাঁহার প্রিয় কার্য্য সাধন করাই তাঁহার একমাত্র উপাসনা, এবং এই প্রকার উপাসনাতেই আমাদের ঐহিক ও পারত্রিক মঙ্গল হয়। ইহাই হইল ব্রাহ্মধর্ম্মের মূল মন্ত্র। সত্যধর্ম্মের ইহা ব্যতীত দ্বিতীয় মূলমন্ত্র হইতে পারে না। এই মূলমন্ত্র প্রতি মানবের সহজাত সত্য। অন্তরে বা বাহিরে আমরা যাহা কিছু শিক্ষালাভ করি, তাহা এই সহজাত সত্যকে পরিস্ফুট করিয়া তুলিবার চেষ্টা মাত্র। প্রতিজনের অন্তরে এই মূলমন্ত্রকে পরিস্ফুট করিয়া তোলাই মানবের শ্রেষ্ঠতম কার্য্য।

ভগবানকে সমস্ত হৃদয় দিয়া প্রীতি করিতে গেলেই তাঁহাকে জানিবার চেষ্টা করিতে হইবে, তাঁহার স্বরূপ উপলব্ধি করিবার চেষ্টা করিতে হইবে। এই কারণেই উপনিষদের ঋষি বলিয়াছেন যে, যাহা দ্বারা সেই অবিনশ্বর পুরুষকে জানা যায়, সেই বিদ্যাই শ্রেষ্ঠ বিদ্যা। আমাদের সকল বিষয়ে পরিমিত ভাবই আমাদের অন্তরে সেই অক্ষর অনন্ত পুরুষকে প্রকাশ করিতেছে। তিনি ইচ্ছাতে অনন্ত, জ্ঞানেতে অনন্ত, প্রীতিতে অনন্ত। তিনি একমাত্র অপ্রতিম পরমাত্মা; তাঁহার দ্বিতীয় কেহ নাই। তিনি যেমন বহির্জ্জগতের বিধাতা, তেমনি তিনি অন্তর্জ্জগতেরও নিয়ন্তা অন্তর্যামী পরম পুরুষ।

ব্রহ্মবিদ্যা শান্তির মূল।

নির্জ্জনে স্থিরচিত্তে আলোচনা করিলেই বুঝা যাইবে যে, কি অন্তর্জ্জগতে, কি বহির্জ্জগতে, জগতে যাহা কিছু ঘটনা ঘটিতেছে; জ্ঞানবিজ্ঞানের যে কোন বিভাগে যাহা কিছু নবনব সত্য আবিষ্কৃত হইতেছে; ধর্ম্মসম্বন্ধীয় সত্য তত্ত্বের সমর্থনে যে সকল নূতন নূতন প্রমাণ আবি-

স্কৃত ও সংগৃহীত হইতেছে—এ সমস্তই প্রকৃতপক্ষে এক একটী বিচ্ছিন্ন ঘটনামাত্র নয়; এ সমস্তই পরস্পরের সহিত এক অবিচ্ছিন্ন যোগসূত্রে সম্বদ্ধ। তাই প্রকৃতির ঘটনাসমূহকে বিচ্ছিন্নভাবে দেখিলে, সেগুলি কেন ঘটিল, তাহার কোনই কারণ খুঁজিয়া পাই না; সেগুলিকে ঐন্দ্রজালিক ঘটনা বলিয়া মনে হইবে—এই সকল ঘটনার ভিতর হইতে হৃদয়ে কোনপ্রকার শান্তিলাভের আশা দেখি না। কিন্তু প্রকৃতির সমস্ত ঘটনাকে পরস্পর সম্বদ্ধভাবে উপলব্ধি করিলেই সে সমস্তের ভিতরে আর ইন্দ্রজালের খেলা দেখিতে পাই না। তখন তাহার ভিতরে সকল কারণের কারণ মঙ্গলময় পরমেশ্বরের এক অবিচ্ছিন্ন প্রেমধারা প্রবাহিত দেখিয়া প্রাণের ভিতর মহাশান্তি লাভ করি। প্রাণের ভিতর শান্তির অভাব হইলে সমস্তই শূন্য মনে হয়। তাই যে ব্রহ্মবিদ্যা সকল জ্ঞান, সকল বিদ্যার ভিতরে মঙ্গলহস্ত প্রদর্শন করিয়া প্রাণেতে অপার শান্তি দিতে পারে, সেই ব্রহ্মবিদ্যাকে ঋষিদের সময় হইতে আজ পর্য্যন্ত আমরা সকলেই যে শ্রেষ্ঠ বিদ্যা বলিয়া শিরোধার্য্য করিব, তাহা কিছু আশ্চর্য্য নয়। তাই ব্রাহ্মধর্ম্ম তেজস্বী মুণ্ডক ঋষির অনন্ত বাক্যে বলিয়াছেন যে, "ঋগ্বেদ, যজুর্ব্বেদ, সামবেদ, অথর্ব্ববেদ, শিক্ষা, কল্প, ব্যাকরণ, নিরুক্ত, ছন্দ, জ্যোতিষ, এ সমুদয় অশ্রেষ্ঠ বিদ্যা; যাহা দ্বারা অক্ষর পুরুষকে জানা যায়, তাহাই শ্রেষ্ঠ বিদ্যা"।

নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ।

ব্রহ্মজ্ঞান মানবের অন্তর্নিহিত সহজাত সত্য হইলেও তাহাকে পরিস্ফুট করিয়া তুলিবার জন্য প্রত্যেক ব্যক্তির যত্ন ও পরিশ্রম আবশ্যক। নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ—বলহীন ব্যক্তি পরমাত্মাকে লাভ করিতে পারে না। অন্তরে ব্রহ্মজ্ঞান নিহিত থাকিলেও তাহাকে পরিস্ফুট করিয়া তাহার সুশীতল ছায়ায় আশ্রয় লাভ করিতে চাহিলে বিশেষ ভাবে পরিশ্রম করিতে হইবে। নিমেষে নিমেষে হৃদয়ের ক্ষুদ্রতা, স্বার্থপরতা প্রভৃতি ক্ষুদ্র মলিন ভাবের সহিত সংগ্রাম করিয়া সেগুলিকে পরাজিত করিয়া হৃদয়কে পবিত্র রাখিতে হইবে, নির্ম্মল দর্পণের ন্যায় স্বচ্ছ রাখিতে হইবে। ব্রহ্মপিপাসুমাত্রেই জানেন যে, ক্ষুদ্রতার সহিত, পাপের সহিত এই সংগ্রাম আমাদের শরীরসংস্থান বিষয়ক বল, আর মানসিক বল, সকল সংগ্রাম হইতে কিরূপ গুরুতর, কিরূপ প্রাণের সমস্ত বলপ্রয়োগের অপেক্ষা রাখে।

শ্রেয় ও প্রেয়।

পূর্ব্বকালে মহামনা ঋষিগণ এই আধ্যাত্মিক সংগ্রামের গুরুত্ব উপলব্ধি করিয়া ব্রহ্মপিপাসুদিগকে উপযুক্ত গুরুর নিকটে গিয়া ব্রহ্মবিদ্যা লাভ করিবার জন্য বারবার উপদেশ দিয়াছেন। আমরা যদি আত্মাকে পবিত্র রাখিয়া আত্মাতে ঈশ্বরের বাণী শুনিবার জন্য সচেষ্ট থাকি; যদি আত্মাতে তাঁহার অধিষ্ঠান দেখিবার জন্য উৎসুক থাকি, তবে আমরা সেই সত্যের সত্য পরমগুরুর নীরব উপদেশ অতি সহজেই শুনিতে পাই। কিন্তু আমরা অনেক সময়ে বিষয়সুখে এরূপ মত্ত থাকি যে, ভগবানের বাণীর প্রতি কিছুমাত্র লক্ষ্য রাখি না। অনেক সময়ে ঈশ্বরের উপদেশ অন্তরে জলন্তভাবে শুনিতে পাইলে মোহবশত স্বার্থসিদ্ধির উদ্দেশ্যে তাহার বিকৃতার্থ করিয়া তদনুসারেই কার্য্য করিয়া পরে অনুশোচনা করিতে বাধ্য হই। অনেক সময়ে পার্শ্ববর্ত্তী অনুচর-সহচরদিগের পরামর্শে জানিয়া শুনিয়া ভগবানের আদেশের বিরুদ্ধে চলি, অথচ নানা তর্কজালে মনকে প্রবোধ দিতে যাই যে, ঈশ্বরেরই আদেশ অনুসরণ করিতেছি। একটী মিথ্যা কথার উপরে যখন প্রচুর বিষয়-বিভব মানমর্য্যাদা নির্ভর করে, তখন দেখা যায় যে, কত পরামর্শদাতা আসিয়া সেই মিথ্যা বলিবার জন্য আমাদিগকে কতপ্রকারে উত্তেজিত ও উৎসাহিত করে। এই সময়ে অন্তরে শ্রেয় ও প্রেয়ের মধ্যে কুরুপাণ্ডবের যুদ্ধ বাধিয়া যায়। তখন আমার গুরু শ্রেয়ের পথ প্রদর্শন করিয়া যথাযুক্ত যুক্তি সহকারে আমাকে শ্রেয়ের পথে পরিচালিত করিলে হৃদয় কিরূপ মহাবলে বলীয়ান হয়! এইরূপ সংশয়-দোলায় দোদুল্যমান অবস্থায় বিশেষ সাহায্য পাওয়া যায় বলিয়া ভগবানের সহিত প্রত্যক্ষ যোগসাধনের পথে অগ্রসর উপযুক্ত গুরুর সন্ধান লওয়াও যেমন আমাদের গুরুতর কর্ত্তব্য, সেইরূপ উপযুক্ত গুরুর সন্ধান পাওয়াও আমাদের পরম সৌভাগ্য।

ব্রহ্মজ্ঞান সহজ সত্য।

ব্রহ্মজ্ঞান যখন আমাদের আত্মাতে নিহিত ও সহজাত, তখন বলা বাহুল্য যে আত্মার সহজ জ্ঞানের দ্বারাই আমাদের তাহা উপলব্ধ হয়। চক্ষু-কর্ণকে যেমন দর্শন ও শ্রবণ করিতে শিক্ষা দেওয়া যায় না, সেইরূপ আত্মার সহজজ্ঞান, যাহার অপর নাম আত্মপ্রত্যয়, তাহাকেও আত্মার অন্তরে নিহিত স্বতঃসিদ্ধ সত্যসকল গ্রহণ করিবার বিষয়ে শিক্ষা দেওয়া যাইতে পারে না। এই সহজজ্ঞান আমাদিগকে বলিয়া দেয়, অর্থাৎ কূটতর্ক প্রভৃতির একটা অন্তরাল সম্মুখে উপস্থিত না করিলে আমরা সহজেই জানিতে পারি যে, আমাদের অন্তরে স্বাধীনতার একটা ভাব আছে। সহস্র তর্কবিতর্কের দ্বারা তাহা উড়াইয়া দিতে চাহিলেও আমাদের হৃদয় তাহা মানিতে চায় না এবং পারেও না। এই স্বাধীনতার ভাবের সঙ্গে সঙ্গে সহজজ্ঞানেরই ভিতর দিয়া

আর একটী এই ভাব্ প্রাপ্ত হই যে, অন্তরে কর্ত্তব্য বলিয়া যাহা বুঝিব তাহাই আমাদের করা উচিত।

ঈশ্বরই অভ্রান্ত গুরু।

এই স্বাধীনতার ভাব, এই কর্ত্তব্যজ্ঞান আমাদের হৃদয়ে কাহাকেও খুদিয়া বসাইয়া দিতে দেখি না। তবে ইহা আসিল কোথা হইতে? যাঁহা হইতে এই সকল অন্তর্নিহিত ভাব আমরা সহজাতরূপে পাইয়াছি, যিনি আমাদের অন্তরে এই সকল ভাব অহর্নিশি অনাহত ধ্বনিতে স্ফুরিত করিতেছেন, তিনিই একমাত্র অকিঞ্চন-গুরু, তিনিই একমাত্র আমাদের অভ্রান্ত গুরু। আমাদের লক্ষ্য হইতেছে সেই অক্ষর পুরুষকে, সেই অভ্রান্ত অকিঞ্চনগুরুকে উপলব্ধি করা, তাঁহার নীরব উপদেশ অনাহত বাণী অন্তরে প্রত্যক্ষ অনুভব করা।

গুরুর লক্ষণ।

ভগবানের সহিত প্রত্যক্ষ যোগসাধনের পথে অগ্রসর যে সাধক তাঁহাকে জানিবার পথ সুগম করিয়া দেন, তাঁহার বাণী শুনিবার সুচারু প্রণালী উদ্‌ঘাটিত করিয়া দেন; যিনি আমাদের স্বতঃপ্রাপ্ত সত্যকে জীবনের প্রত্যেক কার্য্যে ব্যবহার করিতে এবং সমস্ত চিত্তবৃত্তিকে সত্যের অধীন রাখিবার শিক্ষা দিতে পারেন, তিনিই প্রকৃত গুরু হইবার উপযুক্ত। সহস্র গ্রন্থপাঠে যাহা না হইবে, তাহা এইরূপ গুরুর বাক্যে ও দৃষ্টান্তে হইবে। এরূপ গুরু হওয়া সাধারণ লোকের পক্ষে সহজ নয়। শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য্য এইরূপ গুরুর লক্ষণ বলিয়াছেন যে, তিনি শিষ্যের ভ্রম দূর করিতে সমর্থ হইবেন; তিনি শান্ত দান্ত ও দয়াদি গুণবিশিষ্ট হইবেন; বেদাদি বিদ্যা তাঁহার আয়ত্ত হইবে; তিনি সকল প্রকার ভোগে অনাসক্ত হইবেন; যাগযজ্ঞাদি বৃথা আড়ম্বরপূর্ণ কর্ম্ম হইতে বিরত হইবেন; সদাচারী হইবেন; দম্ভ শঠতা প্রভৃতি দোষসকল পরিহার করিবেন; ব্রহ্মবিৎ ও ব্রহ্মে অবস্থিত হইবেন; এবং কেবল পরহিতৈষণা-প্রেরিত হইয়া বিদ্যাদান করিবেন। বর্ত্তমান যুগে কয়জন ব্যক্তিতে এই সকল গুণ একত্র দেখিতে পাওয়া যায়?

শিষ্যের লক্ষণ।

কেবল উপযুক্ত গুরুর সন্ধান পাইলেই যে ভগবানের সঙ্গে প্রত্যক্ষ যোগসাধনের পথ শিষ্যের সম্মুখে খুলিয়া যায় তাহা নহে। শিষ্য স্বেচ্ছায় অজ্ঞাননিদ্রায় নিদ্রিত থাকিলে সহস্র গুরু কোনই সাহায্য করিতে পারেন না। শিষ্যের আন্তরিক যত্ন থাকিলে এবং তাহারই সঙ্গে উপযুক্ত গুরুর সহায়তা লাভ করিলে সিদ্ধিলাভে বিলম্ব ঘটে না। এই কারণে উপযুক্ত গুরুরও যেমন প্রয়োজন আছে, উপযুক্ত শিষ্যেরও সেইরূপ প্রয়োজন আছে। শঙ্করাচার্য্য ব্রহ্মপিপাসু শিষ্যের লক্ষণ বলিয়াছেন—শিষ্য যাগযজ্ঞাদি বৃথা ক্রিয়াকর্ম্ম হইতে বিরত থাকিবে; পুত্র, বিত্ত ও প্রশংসার ইচ্ছা পরিত্যাগ করিবে; শমদমাদি এবং শাস্ত্রোক্ত অন্যান্য গুণযুক্ত হইবে; শুচি হইবে; যথাবিধি আচার্য্য সন্নিধানে আগমন করিবে এবং জাতি, কর্ম্ম, শীল, বিদ্যা ও কুল-বিষয়ে সুপরীক্ষিত হইবে। ব্রহ্মপিপাসু শিষ্য সর্ব্ববিধ ভোগসুখে অনাসক্ত হইয়া, সর্ব্বথা শুদ্ধ ও পবিত্র থাকিয়া শ্রদ্ধা ও ভক্তিসহকারে আচার্য্যসন্নিধানে আগমন করিবে, ইহাই হইল শাস্ত্রোক্ত বিধি। ইহা সত্য যে, গুরুর প্রতি শিষ্যের শ্রদ্ধাভক্তি না থাকিলে তাঁহার উপদেশ হৃদ্‌গত করিবার পক্ষে বিশেষ বাধা ঘটে। এই কারণে শাস্ত্রকারেরা শিষ্যের গুরুভক্তির প্রতি বিশেষ ঝোঁক দিয়াছেন। পূর্ব্বকালে শিষ্যগণ শুশ্রূষাদি দ্বারা গুরুভক্তি প্রকাশ করিত। তাই দেখি যে, মনু বলিয়াছেন—যে শিষ্যের অধ্যাপনাতে ধর্ম্ম বা অর্থ না থাকে, অথবা যাহার নিকট অনুরূপ শুশ্রূষা না পাওয়া যায়, ঊষর ক্ষেত্রে উত্তম বীজের ন্যায় তাদৃশ শিষ্যে বিদ্যাবীজ বপন করিবে না।

ধর্ম্মবিপ্লব ও স্বাধীনতাবিসর্জ্জন।

কি মনু, কি শঙ্করাচার্য্য, বিবিধ উপায়ে গুরুর প্রতি শিষ্যের ভক্তি-প্রদর্শনের ব্যবস্থা করিলেও কেহই শিষ্যকে গুরুর উপদেশ বিনা বিচারে গ্রহণ করিবার ব্যবস্থা দেন নাই, গুরুর চরণে শিষ্যের মনুষ্যত্ব বিসর্জ্জন দিবার অনুশাসন প্রদান করেন নাই। কিন্তু অনুমান হয় যে, বৈষ্ণব, তান্ত্রিক, বৌদ্ধ প্রভৃতি নানাবিধ ধর্ম্মের ঘাত-প্রতিঘাতে ভারতে যে ধর্ম্মবিপ্লব উপস্থিত হইয়াছিল, এবং তাহারই সঙ্গে এদেশে যে সকল সামাজিক ও রাজনৈতিক বিপ্লবও আসিয়াছিল, তাহারই ফলে ভারতবাসীরা আর ধর্ম্মবিষয়ে বিশেষ চিন্তা করিবার অবসর পাইত না; তখন তাহারা অন্তর্নিহিত স্বাধীনতার সদ্ব্যবহারে বিরত হইল। সেই সময়ে কতকগুলি অসাধারণ মহাপুরুষের অতিমানুষ ক্ষমতা দেখিয়া জনসাধারণ তাঁহাদের চরণে নিজেদের বিচারশক্তি, স্বাধীনতা সমস্তই বিসর্জ্জন দিল। জনসাধারণের মন এতই বিক্ষিপ্ত ও বিক্ষুব্ধ হইয়া উঠিয়াছিল যে, অন্তর্নিহিত স্বাধীনতার সদ্ব্যবহার করিতে গেলে মনের যে একটুকুও সংহত বল প্রয়োগ করা আবশ্যক, তাহাও প্রয়োগ করিতে পরাঙ্মুখ হইল—সেই সকল মহাপুরুষদিগের কথার উপর নিজেদের পাপতাপ হইতে মুক্তিলাভের আশা রাখিয়া নিশ্চিন্ত বোধ করিতে চাহিল।

গুরুবাদ ও তাহার ফল।

এই প্রকারে গুরুভক্তি বর্দ্ধিত হইতে হইতে উপ-

যুক্ত সীমা ছাড়াইয়া ক্রমশ গুরুবাদে পরিণত হইল; ক্রমশ গুরুকে শিষ্য ভগবানের আসনে স্থাপন করিতে লাগিল। তখন এই ভাবের প্রবাদসকল প্রচারিত হইল যে, হরি রুষ্ট হইলে গুরু ত্রাণ করেন, কিন্তু গুরু রুষ্ট হইলে ত্রাণ করিবার কেহই নাই। এই প্রকার গুরুবাদের ফলে অনেক স্থলে গুরুবংশ জ্ঞান ও ধর্ম্মালোচনার সহিত সম্বন্ধ সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন করিলেও বংশপরম্পরায় শিষ্য-বংশের গুরুর আসন অধিকার করে এবং আরাধ্য দেবতা ঈশ্বর অপেক্ষা অধিকতর পুজার্চ্চনা প্রাপ্ত হয় দেখা যায়। বলা বাহুল্য যে, মানুষের চরণে মানুষ হৃদয়ের সমস্ত স্বাধীনতা বিসর্জ্জন দিলে, তাহার অবশ্য-ম্ভাবী ফল অমঙ্গল—তাহার ফলে পরিণামে কখনই মঙ্গল হইতে পারে না। এইপ্রকার গুরুবাদ শিরোধার্য্য করিয়া স্বাধীনতা বিসর্জ্জনের ফলে আমাদের দেশের, সমাজের সর্ব্বাঙ্গ ব্যভিচার অনাচার কদাচার কিরূপ সমাচ্ছন্ন করিয়া ফেলিয়াছে, চক্ষুষ্মান ব্যক্তিমাত্রেরই তাহা প্রত্যক্ষ হইবে। ভগবানের নিহিত স্বাধীনতা বিসর্জ্জন দিবার ফলে যে কি প্রকার অমঙ্গল প্রসূত হইতে পারে, বাউল, সহজী, গুরুদাসী প্রভৃতি সম্প্রদায় তাহার প্রত্যক্ষ পরিচয় দিতেছে; এবং ইহারই ফলে এদেশবাসী কপট সন্ন্যাসী প্রভৃতিরও চরণে সভয়ে অবনতমস্তক হইয়া নিজের শতবিধ অমঙ্গল আনয়ন করে। কেবল এদেশে নয়, যে দেশে এই প্রকার গুরুকে ঈশ্বর অপেক্ষা উচ্চ আসন দিয়া আত্মার স্বাধীনতা বিসর্জ্জন দিতে দেখা গিয়াছে, সেই দেশেই উহার ফলে অমঙ্গলের সৃষ্টি দেখা যায়। এই প্রকার গুরুবাদের ফলেই সেদিন রুষিয়ার সম্রাট-বংশকে জীবন বিসর্জ্জন দিতে হইয়াছে। ঐ একই প্রকার শিক্ষার ফলে ইউরোপীয় মহাসমর সম্ভব হইয়াছিল। আমাদের উপলব্ধিতেই আসে না, শিষ্য চক্ষের সম্মুখে দেখিতেছে যে, তাহার গুরু যতই কেন উন্নত হউন না, তিনি তাহারই মত একজন মানব, তথাপি শিষ্য তাঁহাকে আরাধ্য দেবতা অপেক্ষা উচ্চ আসন প্রদান করিতে কিরূপে উদ্যত হয়!

ভগবানই একমাত্র অভ্রান্ত গুরু।

আমরা আশ্চর্য্য হই যে, গুরুবাদের ফলে, স্বাধীনতা বিসর্জন দিবার ফলে প্রতিপদে অমঙ্গলের উৎপত্তি দেখিলেও আজ কয়েক বৎসর যাবৎ এদেশে গুরুবাদের একটা বাতাস প্রবাহিত হইতে আরম্ভ করিয়াছে—প্রত্যেক সম্প্রদায় নিজ নিজ গুরুকে ঈশ্বরের আসনে বসাইয়া তাঁহাকেই সাক্ষাৎ ভগবান ও অভ্রান্ত গুরু বলিয়া ঘোষণা করিতে চান। কিন্তু তাঁহারা দেখেন না যে, কেহ অভ্রান্ত হইতে গেলেই তাঁহাকে পূর্ণপুরুষ হইতেই হইবে—একমাত্র পূর্ণ পুরুষেরই ভ্রমের অভাব হওয়া সম্ভব। অথচ পূর্ণ দুই জন হওয়াও অসম্ভব। সুতরাং এক পূর্ণপুরুষ ভগবান ব্যতীত আর সকলেই নিশ্চয়ই অপূর্ণ। সুতরাং মানুষ যখন অপূর্ণ, তখন তাহার ভ্রম থাক বা নাই থাক, ভ্রমের সম্ভাবনা যে আছে, তাহা তো অস্বীকার করা যায় না।

মনুষ্য পূর্ণপুরুষ হইতে পারে না।

আর, মনুষ্যকে কি প্রকারেই বা পূর্ণ বলা হয়, তাহাও আমরা বুঝিতে পারি না। মানুষ মাত্রই যে স্থানে ও কালে সীমাবদ্ধ—এখানেই তো তাহার অপূর্ণতা। এক বিষয়েও যাহার অপূর্ণতা, তাহাকে তো পূর্ণ বলিয়া কিছুতেই স্বীকার করা যায় না। এবং ইহা স্বতঃসিদ্ধ যে, পূর্ণপুরুষ কখনই আপনাকে অপূর্ণের মধ্যে সীমাবদ্ধ করিতে পারেন না। ঈশ্বর সর্ব্বশক্তিমান হইলেও তাঁহার পক্ষে কোন একটী মনুষ্যে তাঁহার পূর্ণসত্তায় অবতীর্ণ হওয়া অসম্ভব। অসম্ভব এই জন্য যে, পূর্ণ পুরুষ ঈশ্বর নিজের সত্তা ও স্বরূপ বিনষ্ট করিতে পারেন না। পূর্ণ ও অপূর্ণের মধ্যবর্ত্তী আর কিছুই নাই। যেমন এই জগতের একটীও পরমাণু সত্যসত্য বিনষ্ট হইলে সমস্ত বিশ্বচক্র ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়, সেইরূপ ইহা স্বতঃসিদ্ধ সত্য যে, পূর্ণ পুরুষ অপূর্ণ হইতে চাহিলে তাঁহাকে নিজের স্বরূপ নিশ্চয়ই বিনষ্ট করিতে হইবে। পূর্ণ পুরুষ তাঁহার শতবিধ শক্তি মহাপুরুষদিগের ভিতর প্রেরণ করিয়া নিজের মঙ্গল উদ্দেশ্য সিদ্ধ করিতে পারেন; কিন্তু তিনি নিজ পূর্ণ সত্তায় অবতীর্ণ হইতে ইচ্ছা করিয়া স্থানে ও কালে সীমাবদ্ধ অপূর্ণ মানুষের মধ্যে কি প্রকারে অবতীর্ণ হইবেন, তাহা আমাদের ক্ষুদ্রবুদ্ধির অগম্য। যদিই বা তাহা সম্ভব হয়, সোনার পাথরবাটী যেমন আমরা কল্পনাতেও আনিতে পারি না, উহাও সেইরূপ আমাদের কল্পনারও অতীত। আর ইহাও তো বড় আশ্চর্য্য, যে সকল ব্যক্তি এই প্রকার মানবমূর্ত্তিতে অবতীর্ণ তথাকথিত পূর্ণ পুরুষ ভগবানের সাক্ষাৎ পাইতেছেন, তাঁহার মুখনিঃসৃত বাণী প্রত্যক্ষ শুনিতেছেন, তাঁহাদেরও মধ্যে বিবাদ বিসম্বাদ মতভেদ আসে।

উপসংহার।

উপসংহারে আমরা খুব জোরের সহিত বলিতে চাই যে, উপযুক্ত গুরু ভগবানের সঙ্গে প্রত্যক্ষ যোগ-সাধনের পথে যথেষ্ট সহায়তা করিতে পারেন। কিন্তু এমন গুরু নির্ব্বাচন করিতে হইবে, যিনি আত্মপ্রত্যয় বা সহজজ্ঞানের বিরুদ্ধে কোন উপদেশ দিবেন না। উপযুক্ত গুরু লাভ করিলে তাঁহার প্রতি যথাযুক্ত ভক্তি-শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিবে, ধর্ম্মপথে অগ্রসর হইবার জন্য তাঁহার উপদেশ ও পরামর্শ প্রভৃতির সহায়তা নিশ্চয়ই

গ্রহণ করিবে; কিন্তু তাঁহাকে ঈশ্বরের আসনে বসাইয়া, তাঁহার চরণে আত্মার স্বাধীনতা বিসর্জন দিয়া নিজের এবং দেশের ও সমাজের অমঙ্গল আনয়ন করিও না। আত্মার স্বাধীনতার মূল আত্মপ্রত্যয়কে সযত্নে পোষণ করিলে আত্মপ্রত্যয়ই সন্ধান দিবে, কে প্রকৃত গুরুর আসন অধিকার করিবার উপযুক্ত আর কে-ই বা অনুপযুক্ত।

প্রসাদী ফুল।

(রামপ্রসাদী সুর)

১। অভয়।

(মন) দেখরে চেয়ে কে জেগে আছে—
গগন ভুবন চিত্তকমল সকল ঠেঁয়ে সে যে আছে।
(ধুয়া

ঘুমিয়ে যবে র'বি সুখে,
ঘরের ভিতর র'বি ঢুকে—
ভুল না করে জানিস্ রে ঠিক্—মা তোর সদাই গায়ের কাছে।

সুখের বন্যা আস্‌বে যবে,
দুখের ঘায়ে মরবি যবে—
চোখ খুলে তুই দেখ্‌লে মায়ের দেখ্‌বি রে হাত সবের মাঝে।

মিছে ভয় তুই করিস নেকো,
তাঁ' হতে দূর্ ফিরিস নেকো—
শোন্ ওরে তুই প্রাণের মাঝে বিজয়ডঙ্কা তাঁরি বাজে॥

২। বিষয়-বিষ।

(মন) বিষয়-বিষের কূপে ডুবলি কেন হায়।
কিবা হ'ল, কিবা হবে, তোর্ এত কি আসে বা যায়!
(ধুয়া)

ক্ষণে ক্ষণে মর্‌ছে লোকে,
বন্ধু যত মরে শোকে—
দেখেও রে তুই ভুলিস্ তবু—সঙ্গে এসব কিছু না যায়!
সংসার অসার সবাই বলে,
তা শুনে তো কেউ না ফেরে;
জেনেও রে তুই মরিস্ কেন ঘুরে ঘুরে ভবের খেলায়?
শমন-জয়ী হতে যদি চাস্,
কাটবি যদি ভবেরি পাশ,
পলক দেরী না করে আর পড়গে মায়ের চরণ-ছায়॥

৩। জন্ম ও মৃত্যু।

(মন) জনম নিলেই যখন মরণ আছে—
ভুবিস্ কেন বল্‌রে ভবে, এত আশা বন্দ মাঝে? (ধুয়া)

সুঠাম তোর এই যে দেহ,
এই যে বাড়ী এই যে গেহ—
চক্ষু দুটী বুজ্‌লে পরে লাগবে এসব কিবা কাজে?
মন্ত্র নে রে এখনো ভেবে—
নামে রুচি দয়া জীবে;
দম্ভ তম ছেড়ে দিয়ে দাঁড়া মায়ের চরণ-পাছে।
রোগ শোকে তো আকুল সবে,
(তবু) নাইকো মরণ সবাই ভাবে;
তুইও কি তাই মরবি ভুলে—দেখ্‌বিনে মা আছেন কাছে?

৪। ভুল।

ভুল করে আর ঘুরিস্ নেকো (ধুয়া)।
এসেছিলি কষ্টে দুখে,
যেতে হবে কষ্টে দুখে;
পাগল হয়ে তুই সুখের আশে শুধু ঘুরে মরিস্ নেকো।
সাবধান রে দিচ্ছি করে—
পরহিতে মন ঢেলে দেরে—
জননীর এই চরম আদেশ—প্রাণে তা কি শুনিস্ নেকো?
কথার ছলে ধনের বলে
এড়াতে চাস মরণকালে?
হবে নাকো তা—হবেনাকো—প্রাণের ভিতর ভেবে দেখো॥

৫। জননী।

মনটারে কর্ খাঁটি সোনা।
ছয় রিপুরে বেড়াজালে বেঁধে আগুন লাগিয়ে দে না।
(ধুয়া)

জলে স্থলে শূন্যে যিনি,
আপন ধ্যানে থাকেন যিনি;—
মায়েরে সেই দেখি' চিতে সকল কথা ছেড়ে দে না।
আপন বলে ভাবিস্ কারে?—
থাকিস নে আর স্বপন-ঘোরে;
বন্ধু তিনি, তিনি মাতা—প্রাণভরে তাঁয় দেখে নে না!
মরণ কালে পালায় সবে
যেথায় আছে যে তোর ভবে।
ভবসিন্ধু পার হতে যদি চাস্, মায়ের পায়ে শরণ নে না॥

বারুণী।

(শ্রীচিন্তামণি চট্টোপাধ্যায়)

হিন্দুশাস্ত্রে বারুণীতে গঙ্গাস্নানের বিধি আছে। দেশদেশান্তর হইতে লোক আসিয়া বারুণীতে গঙ্গাস্নান করিয়া যায়। কোথা হইতে বারুণীর উৎপত্তি তাহা বলা বড় কঠিন। বারুণীতে গঙ্গাস্নান করিলে যথেষ্ট পুণ্য সঞ্চয় হয়, ইহা শাস্ত্রের উক্তি। তিথিতত্ত্বের

ভিতরে দেখি স্মার্ত্তশিরোমণি রঘুনন্দন স্কন্দপুরাণ হইতে শ্লোক উদ্ধার করিয়া বলিতেছেন—

বারুণেন সমাযুক্তা মধৌ কৃষ্ণা ত্রয়োদশী।
গঙ্গায়াং যদি লভ্যেত সূর্য্যগ্রহ-শতৈঃ সমা॥

চৈত্র মাসে বারুণ অর্থাৎ শতভিষা নক্ষত্রযুক্ত কৃষ্ণা ত্রয়োদশী। ঐ তিথিতে গঙ্গাস্নান করিলে শত সূর্য্যগ্রহণে স্নানের সমান ফল হয়।

শনিবার-সমাযুক্তা সা মহাবারুণী স্মৃতা।
গঙ্গায়াং যদি লভ্যেত কোটিসূর্য্য-গ্রহৈঃ সমা॥
শুভযোগ-সমাযুক্তা শনৌ শতভিষা যদি।
মহামহেতি বিখ্যাতা ত্রিকোটিকুলমুদ্ধরেৎ॥

শনিবারে পড়িলে উহা মহাবারুণী বলিয়া পরিগণিত হয় এবং কোটি সূর্য্য গ্রহণে স্নানের তুল্য ফল হয়। উহা আবার পুণ্যযোগ সমাযুক্ত হইলে মহামহাবারুণী নামে ব্যাখ্যাত হয় এবং উহাতে স্নান করিলে শতকোটী কুল উদ্ধার প্রাপ্ত হয়।

বারুণীর গঙ্গাস্নানের সংকল্প এই—"ওং তৎসৎ অদ্য চৈত্রে মাসি কৃষ্ণে পক্ষে ত্রয়োদশ্যাং তিথৌ অমুক-গোত্রঃ অমুক-দেবশর্ম্মা বহুশত-সূর্য্য-গ্রহণকালীন-গঙ্গাস্নান-জন্য-ফলসম-ফলপ্রাপ্তিকামঃ গঙ্গায়াং স্নানমহং করিষ্যে"।

গঙ্গাস্নান মাত্রেই যে সত্য সত্য পাপ যায় না এবং সঙ্গে সঙ্গে ত্রিকোটি-কুলও উদ্ধারপ্রাপ্ত হয় না, তাহা জ্ঞানোন্নত ব্যক্তিকে বুঝাইতে হইবে না। কিন্তু যাহারা অজ্ঞান, সমুন্নত জ্ঞানপ্রধান ধর্ম্ম আচরণে যাহারা নিতান্ত অনধিকারী, তাহাদের জন্য ধর্ম্মসাধনের পথ প্রমুক্ত রাখিলে জনসমাজের নিম্নস্তরের লোকেরা একেবারেই ধর্ম্মহীন ও নাস্তিক হইয়া যাইবে হিন্দু শাস্ত্রকারগণের এরূপ ধারণা ছিল। তাহারই জন্য শাস্ত্রকারগণ ফলবহুল ধর্ম্মানুষ্ঠানের ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন; এবং এই ফললাভের লোভকে এতই বিবর্দ্ধিত করিয়া দিয়াছেন যে লোকে যেন ব্যাকুলভাবে এই সমস্ত কাম্যকর্ম্মের অনুষ্ঠান করে।

এখানে জিজ্ঞাস্য হইতে পারে যে, গঙ্গাস্নানকে কেন ধর্ম্মকার্য্য ধরা হয়? স্রোতের জলে স্নান শরীরের পক্ষে যে উপকারী তাহা বলা বাহুল্য। অধিকন্তু গোধনের ন্যায় এদেশে গঙ্গারও উপকারিতা অস্বীকার করা যায় না। তদ্ব্যতীত, দেশদেশান্তর হইতে অসংখ্য যাত্রী যখন গঙ্গাস্নানে আগমন করে, তাহাদের সঙ্গে শ্রদ্ধাভক্তিতে হৃদয়ের মিলনের ভিতরে অন্তরে যে এক অভিনব জাগরণ অনুভূত হয়, তাহা অস্বীকার করা যায় না। তাই ঈদৃশ অনুষ্ঠানে কেবল শরীর নহে—চিত্তও যে কতকটা উন্নত হয়, অন্তরে যে পবিত্রতার সঞ্চার হয়, তাহা প্রত্যক্ষদর্শী মাত্রেই অবগত আছেন।

যাহারা গঙ্গাস্নান করিয়া উঠিল, তাহারা এই বোধ লইয়া গৃহে ফিরিল যে, তাহাদের সমস্ত পাপ স্খলিত হইয়া গিয়াছে—তাহাদের পিতৃপুরুষগণ উদ্ধারলাভ করিয়াছেন। অনধিকারীপক্ষে এইরূপ অনুভবের একটি মূল্য আছে। এইরূপ ফলকামনা-বহুল অনুষ্ঠান হিন্দুসমাজে আছে বলিয়া এদেশের নিম্নস্তরের নিরক্ষর হিন্দুগণ অন্যান্য দেশের অপেক্ষা ধর্ম্মভীরু ও শান্তস্বভাব ইহাই অনেকের ধারণা।

খৃষ্টসমাজের ভাব হইতেছে যে, সর্ব্বদা মনে রাখিতে হইবে—'আমরা পাপী'। ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্রের ভিতরেও যথেষ্ট পরিমাণে এই পাপবোধের ভাব ছিল; ব্রাহ্মসমাজের ভিতরেও কতকটা ঐ ভাব বিরাজমান। হিন্দুসমাজের ভিতরেও ঐ ভাবের কথা আছে। নারায়ণের প্রণামের মন্ত্রে আছে—

পাপোঽহং পাপকর্ম্মাহং পাপাত্মা পাপসম্ভবঃ।
ত্রাহি মাং পুণ্ডরীকাক্ষ সর্ব্বপাপ-হরো ভব॥

অর্থাৎ আমি পাপী, আমি পাপকর্ম্মা, আমি পাপাত্মা, পাপ হইতে আমার উৎপত্তি। হে পাপনাশক পুণ্ডরীকাক্ষ, তুমি আমাকে সর্ব্বপাপ হইতে রক্ষা কর। হিন্দুধর্ম্মের এই ভাব যে খৃষ্টধর্ম্মে প্রবেশ করে নাই, তাহা কে বলিতে পারে?

এইরূপ মন্ত্র হিন্দুশাস্ত্রের ভিতরে থাকিলেও খৃষ্ট-সমাজের ভিতরে পাপবোধের মাত্রা যেরূপ সমধিক, হিন্দু-সমাজের ভিতরে সেরূপ নহে। হিন্দু-সমাজের ভিতরে এমন যথেষ্ট অনুষ্ঠান রহিয়াছে, যাহাতে লোকে আপনাকে নিষ্পাপ বলিয়া মনে করিবার অবসর পায়। গঙ্গাস্নান ও অন্যান্য পূজা-পদ্ধতি তাহার অন্যতর। খৃষ্টসমাজে গভীর পাপবোধের ভাব আছে, কিন্তু নিষ্পাপ-বোধের ভাব নিতান্ত বিরল। এদেশের শিক্ষার পরিসমাপ্তি আপনার নিষ্পাপ অনুভূতিতে। বেদান্তের ভিতরেও সেই শিক্ষাই পাই। পবিত্রস্বরূপ ঈশ্বরের সহিত যখন ধ্যানযোগে মিলিয়াছি, তখন আমার পাপ কোথায়? আমার পাপ-তাপ সবই দূরে পলায়ন করিয়াছে; নিরবদ্য নিরঞ্জনের সহবাসে আমিও নিষ্পাপ হইয়া গিয়াছি। তাই পঞ্চদশীর তৃপ্তিদীপ প্রকরণের শেষ অংশে আছে—

অহো পুণ্যমহো পুণ্যং ফলিতং ফলিতং দৃঢ়ং।
অস্য পুণ্যস্য সম্পত্তেরহো বয়মহো বয়ং॥
অহো শাস্ত্রমহো শাস্ত্রমহো গুরুরহো গুরুঃ।
অহো জ্ঞানমহো জ্ঞানমহো সুখমহো সুখং॥

কি আশ্চর্য্য দৃঢ় পুণ্য-ফল আমার প্রীতিবৃক্ষে ফলিত হইয়াছে। আমার এ পুণ্য পরমাশ্চর্য্য, এই আশ্চর্য্য পুণ্যসম্পত্তি হেতু আমিও পরমাশ্চর্য্য। কি আশ্চর্য্য

শাস্ত্র, কি আশ্চর্য্য গুরু, কি আশ্চর্য্য জ্ঞান, কি আশ্চর্য্য সুখ, অহো আমি এক্ষণে লাভ করিয়াছি (বেদান্তবাগীশ মহাশয়ের অনুবাদ)।

অনেকে বলেন, বারুণী-স্নান প্রভৃতি অনুষ্ঠানের সার্থকতা আছে। তাঁহাদের মতে এই সকল অনুষ্ঠানের অনুবর্ত্তী হইয়া সমাজের প্রত্যেক ব্যক্তি অপরের সহিত তাহার তাদাত্ম্যবোধ অনুভব করে; জনসমাজের প্রত্যেক ব্যক্তি উপলব্ধি করিতে পারে যে, আমাদের মধ্যে একই প্রথা একই আচার ও একই রীতি বিদ্যমান। আমরা সকলে একধর্ম্মী, এককর্ম্মী ও একই জাতি। এইরূপ বুঝিবার সুবিধা না ঘটিলে জনসমাজ সঙ্ঘবদ্ধ হইতে পারে না। পরস্পরের মধ্যে ঐক্য অনুভব করিয়া প্রত্যেকে তৃপ্তিলাভ করে বলিয়াই জনসমাজ গঠনের সুবিধা হয়। অনুষ্ঠানের ভিতর দিয়াই এই ঐক্য ফুটিয়া বাহির হয়। এইরূপ কতকগুলি অনুষ্ঠানের ভিতর দিয়া হিন্দু জাতির প্রত্যেকে পরস্পরের সঙ্গে ঐক্য অনুভব করে, অনুরূপ আচরণ দেখিয়া পরস্পর তৃপ্তিবোধ করে, মিলনের স্থান খুঁজিয়া পায়। এই সমস্ত আচরণ একই ধর্ম্মের অনুগত জনমণ্ডলীর ভিতরে ঘনিষ্ঠ মিলন আনিয়া দেয় এবং ঐ মিলন আঠার ন্যায় পরস্পরকে একত্র বাঁধিয়া রাখে। এদেশে আমাদের মস্তকের উপর দিয়া কত রাজনৈতিক বিপ্লব চলিয়া গিয়াছে; কিন্তু আচার ও রীতি-নীতির সমধিক আধিক্য থাকাতেই আমরা চূর্ণ হইয়া যাই নাই ইহাই অনেকের বিশ্বাস। ঐ সমস্তের 'বিধি-নিষেধ' শাস্ত্রের ভিতর স্থান পাইয়া হিন্দুসমাজকে বাঁচাইয়া আসিয়াছে। ইহার ফলে প্রকৃত ধর্ম্মের অন্তঃসার কতকটা বিনষ্ট হইয়া গিয়াছে বটে; কিন্তু মনে হয়, ঘোর দুর্দ্দিনের সময় এই সমস্ত 'বিধি-নিষেধ'ই এ জাতিকে অনেকটা রক্ষা করিয়া আসিয়াছে।

এক সময়ে এই 'বিধিনিষেধই' বহুল অংশে প্রকৃত ধর্ম্মের স্থান অধিকার করিয়া বসিয়াছিল। আজকাল স্বাধীন চিন্তার ধারা আমাদিগকে জাগ্রত ও কতক পরিমাণে আহারবিহারাদি বিষয়ে অসংযত করিয়া তুলিয়াছে; সমাজের মধ্যে যে ঐক্যের ও মিলনের মধুর ভাব ছিল তাহাকে ধীরে ধীরে শিথিল করিয়া দিতেছে। আমরা ভাবে, চিন্তায়, বেশে পরস্পরকে সকল সময়ে একই সমাজের একই জাতির অন্তর্ভুক্ত বলিয়া চিনিয়া উঠিতে পারিতেছি না—পরস্পরকে প্রেমালিঙ্গন দান করিতে পারিতেছি না। বংশানুগত জাতিভেদ যেমন একদিকে উঠিয়া যাইবার উপক্রম হইতেছে, অপরদিকে অর্থ ও মানসম্ভ্রমজনিত অন্যবিধ জাতিভেদ মস্তক উত্তোলন করিবার ছিদ্র অনুসন্ধান করিতেছে।

আমাদের দেশে পূর্ব্বে যে সমস্ত রীতি-নীতি ছিল তাহা যে সর্ব্বাংশেই ভাল ছিল, তাহা আমরা স্বীকার করি না। অন্ধ রীতির ফলে নরবলি, সহমরণ, গঙ্গায় পুত্র-কন্যা-বিসর্জ্জন প্রভৃতি অনাচার হিন্দুসমাজকে অধিকার করিয়া বসিয়াছিল—ধর্ম্মের নামে অধর্ম্ম আচরিত হইতে আরম্ভ হইয়াছিল। তান্ত্রিকগণের মধ্যে কৌলাচার উচ্ছৃঙ্খলতার সৃষ্টি করিতেছিল। জ্ঞানের আলোকের—ব্যাপক শিক্ষার অভাবই তাহার প্রকৃত কারণ। এখন জ্ঞানের আলোচনা চারিদিকে বিস্তৃত ভাবে আরম্ভ হইয়াছে। যে সকল প্রাচীন রীতি—যাহাতে ধর্ম্মের অবমাননা না হয়, সেগুলি যথাসম্ভব রক্ষা করিতে পারিলে পরস্পরের মধ্যে আপেক্ষিক মধুর সম্বন্ধ রক্ষা পাইবে, এবং পারস্পরিক যোগ একেবারে চূর্ণ-বিচূর্ণ হইয়া যাইবে না ইহাই অনেকে মনে করেন।

সমাজের নিম্নস্তরের সঙ্গে উচ্চস্তরের যোগ রাখিতে হইবে। সূক্ষ্ম ধর্ম্ম অবলম্বন করিবার যাহাদের সামর্থ্য নাই, তাহারা যাহাতে নাস্তিক হইয়া না যায়, সে দিকে সমাজসেবক ও দেশসেবকের বিশেষ দৃষ্টি রাখিতে হইবে। ধর্ম্মের স্থূলভাবের মধ্যে যাহারা থাকিতে চায়, উচ্চস্তরের ধর্ম্ম যাহাদের আয়ত্তের বহির্ভূত, তাহাদিগকে উপহাস করিলে চলিবে না; ঘৃণার চক্ষে—অবজ্ঞার চক্ষে দেখিলে চলিবে না, কুসংস্কার বলিয়া উপহাসের সঙ্গে উড়াইয়া দিলে চলিবে না। প্রকৃত ধর্ম্মের পথে তাহাদিগকে অগ্রসর করিতে চাহিলে সর্ব্বাগ্রে ব্যাপক শিক্ষার বিধান চাই, তবেই ক্ষেত্র প্রস্তুত হইবে, সংস্কারচেষ্টা আশানুরূপ ফলদান করিবে।

নববর্ষের উদ্বোধন।

(শ্রীনির্ম্মলচন্দ্র বড়াল বি-এল্)

আজ নববর্ষের প্রারম্ভে নবীন করে আপনাকে জাগিয়ে তুলতে হবে—নব উৎসাহে নব আনন্দে ভগবানের পথে অগ্রসর হতে হবে—নব আয়োজনে তাঁকে হৃদয়দেউলে বরণ করে নিতে হবে—নব শক্তি নিয়ে 'মনের কোণের সব দীনতা মলিনতা' মুছতে হবে—আত্মাকে পরমাত্মার প্রিয় আবাসস্থল করে তুল্‌তে হবে। যিনি চিরনবীন, যিনি চিরসুন্দর, তাঁর রচিত সুন্দর পৃথিবীতে কোথাও যেন অসৌন্দর্য্য মলিনতা না থাকে, কোথাও যেন দ্বন্দ্ব বিচ্ছেদ বিরোধ নিরানন্দ না থাকে। অন্তর বাহির শুভ্র অমল হোক—ভায়ে ভায়ে মিলিত হোক বিশ্ববাসী—এই আমাদের তাঁর কাছে একান্ত প্রার্থনা। এমন সুন্দর পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করে নিরানন্দ ম্লান হয়ে দিনযাপন করা আমাদের অন্যায়—আমাদের পাপের ফলভোগ সন্দেহ নাই। আমরা প্রত্যেকে অমৃতের

সন্তান—অমৃতত্বে আমাদের জন্মগত অধিকার—এ কথা আজ নূতন করে আমাদের জান্‌তে হবে এবং জীবনকে সেইমত গঠিত করে তুল্‌তে হবে। 'রাজপুত্র' আমরা যেন দাসত্ব করে জীবন অতিবাহিত না করি—যেন জীবনকে বিফল না করি। কর্ম্ম আমাদের কাছে আনন্দের কর্ম্ম হোক—আমাদের বন্ধন না হোক—জীবন আমাদের দুঃসহ ভারসম না হোক—আনন্দের নিকেতন হোক। আমাদের প্রত্যেক চিন্তা, প্রত্যেক কার্য্য, বাক্য ও আচরণ সুন্দর হোক—জগতের কল্যাণার্থে নিয়োজিত হোক—ভগবানের প্রিয় কার্য্য হোক। ক্ষুদ্রের মধ্যে তুচ্ছতার মধ্যে প্রেয়ের আহ্বানে বহুদিন আমরা ফিরেছি, কিন্তু সুখ পাইনি, শান্তি পাইনি, আজ সে কথা স্মরণ করবার দিন। আজ সমস্ত হৃদয়-মনকে দিয়ে বলাতে হবে—ভগবানেই আমার সুখ—ভগবানেই আমার শান্তি—ভগবানেই আমার প্রাণের আনন্দ—তাঁরই পথে তাঁরই পানে আমায় চলতে হবে—তাঁকেই জীবনে জানতে হবে—হৃদয়ে উপলব্ধি করতে হবে; তাঁকেই জীবনের কর্ণধার করতে হবে—তিনিই আমাদের জীবনের জীবন, প্রাণের প্রাণ, আত্মার আত্মা—তাঁর পথে অগ্রসর হওয়াতেই আমাদের পূর্ণ মঙ্গল, তাঁহার সহিত একান্ত মিলনের মধ্যেই আমাদের জীবনের পূর্ণতম সার্থকতা।

নববর্ষের প্রারম্ভে ভগবানকেই জীবনের কেন্দ্র করে রাখতে হবে, আমাদের সমস্ত আশা আকাঙ্ক্ষা ভগবৎমুখী করতে হবে। "আমাদের ধারণা, আমাদের অনুভূতি, আমাদের দর্শন, আমাদের আদর্শ হোক ভগবান;—আমাদের সাধনা, আমাদের কার্য্য, আমাদের জীবন হোক ভগবান; আমাদের হৃদয়, আমাদের আনন্দ, আমাদের অন্বেষণ সকলই ভগবানে ভরিয়া যাক—ভগবানই আমাদের জীবনস্বরূপ হউন। আমাদের জীবনের ষোল আনা ইচ্ছা ভগবানে নিয়ন্ত্রিত হোক—হৃদয়বুদ্ধির ষোল আনা আকর্ষণ ভগবানে নিয়মিত হোক।" পৃথিবীতে অনেকদিন হ'ল এসেছি—বেলা অনেক হয়েছে—সূর্য্যাস্ত হবার হয়তো আর বেশী বিলম্ব নেই—আর যেন আমরা ভ্রমান্ধ হয়ে না ফিরি—এইবেলা যেন 'ঘরের ঠিকানা' করে যেতে পারি।

তুচ্ছ অভিমান অহঙ্কার, ক্ষুদ্র স্বার্থ বিসর্জ্জন দিয়ে এস আজ আমরা ভগবানে উদ্বুদ্ধ হই। ভগবানে আত্মসমর্পণ করে নিজের ব'লে যেন আর কিছু রাখি নে—আমাদের আশা, আমাদের শক্তি, আমাদের বুদ্ধি, আমাদের প্রীতি ভক্তি সমস্তই ভগবানের দান। জগতে যা কিছু আছে সমস্তই ভগবানের—দেহ প্রাণ মন হইতে ধরণীর ধূলি তৃণ কীট পর্য্যন্ত ভগবানে পূর্ণ—কেহই ক্ষুদ্র নয়—কেহই তুচ্ছ নয়—এইটুকু যেন আজ মনে গেঁথে নিতে পারি—সকলকে হৃদয়ে বরণ করে নিতে পারি। আজ এস পূর্ব্ব, এস পশ্চিম, এস উত্তর, এস দক্ষিণ—আজ সকলকে আমরা নমস্কার করি—এস ব্রাহ্মণ, এস চণ্ডাল, এস বৃহৎ, এস ক্ষুদ্র, আজ সকলকে অভিবাদন করি। আজ এস তৃণ, এস কীট, এস পশু, এস পক্ষী আজ সকলকে অন্তরে বরণ করি। আজ ভগবান আমাদিগের মনের রুদ্ধ দুয়ার খুলে দিন—তিনি আমাদের জাগ্রত করুন অসত্য হতে সত্যে, অন্ধকার হতে জ্যোতিতে, মৃত্যু হতে অমৃতে। আজ এস আমরা সারা জীবনের পাথেয় ভিক্ষা করি ভগবানের নিকট—তিনি আমাদের পবিত্র ইচ্ছা পূর্ণ করুন।

শ্রীরামানুজ স্বামী।

(শ্রীকালীপ্রসন্ন বিশ্বাস)

আমাদের দেশে যেমন শ্রীচৈতন্যদেব নবদ্বীপে জন্মগ্রহণ করিয়া বৈষ্ণবধর্ম্ম সাধন ও প্রচার করিয়াছিলেন, তাহার বহু পূর্ব্বে মান্দ্রাজ অঞ্চলে সেইরূপ এক মহাপুরুষ জন্মগ্রহণ করিয়া আব্রাহ্মণ-চণ্ডাল-পর্য্যন্ত বৈষ্ণবমন্ত্রে দীক্ষিত করিয়াছিলেন। এই মহাপুরুষের নাম রামানুজাচারী বা রামানুজাচার্য্য। জীবিত অবস্থায় ইঁহার ৭৪ জন বিশিষ্ট শিষ্য ছিলেন। এতদ্ভিন্ন ৭০০ সন্ন্যাসী, ১২০০০ একাঙ্গী, ৩০০ কোথী (স্ত্রীলোক) এবং বহুসংখ্যক ব্রাহ্মণেতর জাতীয় ব্যক্তি তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন। আমরা এই মহাপুরুষের সংক্ষিপ্ত জীবনী বর্ত্তমান প্রবন্ধে আলোচনা করিব।

রামানুজের জীবনী লিখিতে হইলে প্রথমে শ্রীশতকোপ সম্বন্ধে কিছু বলা আবশ্যক। শ্রীশতকোপ ভেলী জেলায় শ্রীনগরী নামক কোন শূদ্রবংশে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম কারী এবং মাতার নাম নাথনায়কা ছিল। ইহারা সংসারসুখে বঞ্চিত না হইলেও অপুত্রক হেতু বড়ই দুঃখিত ছিলেন। এই জন্য তিরুকুরঙ্গরী নামক স্থানে কুরঙ্গেশ দেবের নিকট পুত্রার্থে বর প্রার্থনা করেন। ইহার কিছুদিন পরে শতকোপের জন্ম হয়। এ কারণ অনেকে বিশ্বাস করেন যে শ্রীকুরঙ্গেশ স্বয়ং কারী এবং নাথনায়কার পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। এই বিশ্বাস সমর্থন করিবার জন্য ভক্তগণ ভবিষ্যৎ, ভার্গব, পদ্ম, বৃহৎপদ্ম, মার্কণ্ডেয় এবং ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ হইতে শ্লোকসকল উদ্ধৃত করিয়া থাকেন।

যাহা হউক, শতকোপ জন্মগ্রহণ করিয়া প্রায় ষোল বৎসর কাল মৌনাবলম্বন করিয়া কালযাপন করেন। ঐ সময় তিনি সর্ব্বদাই একটি তেঁতুল গাছের তলে

বসিয়া থাকিতেন।* বৈষ্ণবগণ এই তেঁতুল গাছটিকে অনন্ত দেবের অবতার বলিয়া বিশ্বাস করেন। কথিত আছে যে, যেমন মহামতি ধ্রুব পঞ্চম বর্ষ বয়সে যোগ-সাধনা করিয়া ঈশ্বরকে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, বালক শতকোপও তদ্রূপ সেই তেঁতুল গাছের তলায় অনাহারে ষোল বৎসর কাল সমাধিস্থ থাকিয়া পরব্রহ্ম লাভে সমর্থ হইয়াছিলেন।

শতকোপ জন্মগ্রহণ করিবার অনেক দিন পূর্ব্বে দাক্ষিণাত্যের প্রসিদ্ধ গায়ক ভক্ত মথুরা কবি জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। ইনি সর্ব্বপ্রথমে শতকোপের নিকট আসিয়া তাঁহার সহিত যোগদান করেন বা তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন।

শতকোপ দেখিলেন যে ক্রমে সংস্কৃত ভাষা মৃতভাষায় পরিণত হইতেছে। সাধারণ লোকে, এমন কি, অনেক ব্রাহ্মণও তখন সংস্কৃতচর্চ্চা একেবারে পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। সুতরাং শাস্ত্রগ্রন্থাদি দেশীয় ভাষায় অর্থাৎ দাক্ষিণাত্যের প্রচলিত তামিল ভাষায় অনুবাদ না করিলে জীবগণের মঙ্গলসাধনের উপায় নাই। সে কারণ তিনি আব্রাহ্মণ-চণ্ডাল পর্য্যন্ত নরনারীগণের বোধগম্য করিবার জন্য শাস্ত্রগ্রন্থাদি সুললিত তামিল ভাষায় অনুবাদ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন এবং অল্প দিন মধ্যেই 'তিরুবিরত্তম্,' 'তিরুবশীর্যাম্', 'পেরিয়া তিরুবণ্ডদী' এবং 'তিরুবৈমলী' নামক ঋক, যজু, অথর্ব্ব ও সামবেদের সংক্ষিপ্ত সার গ্রন্থসকল প্রণয়ন করেন। তন্মধ্যে শেষোক্ত গ্রন্থই সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ। ইহাতে ১১০২টী শ্লোক আছে।

এইরূপে তিনি প্রায় ৩৫ বৎসর কাল তামিল ভাষায় নানাবিধ শাস্ত্রগ্রন্থাদি অনুবাদ এবং ব্যাখ্যা দ্বারা জনসাধারণের মধ্যে এক অভূতপূর্ব্ব ধর্ম্মভাব জাগরিত করিয়া দিয়া জীবলীলা সংবরণ করেন।

তাঁহার মৃত্যুর পর মথুরা কবি প্রায় ৫০ বৎসরকাল জীবিত ছিলেন। এই সময় তিনি নানা দেশ পর্য্যটন-পূর্ব্বক শতকোপ-বিরচিত ধর্ম্মসূত্রগুলি মধুর সঙ্গীত দ্বারা প্রচার করেন।

এই সময় হইতে দাক্ষিণাত্যের উপর দিয়া এক প্রবল ধর্ম্মের বন্যা বহিয়া যাইতেছিল। যে সকল মহাপুরুষ এই বন্যায় যোগদান করিয়াছিলেন তন্মধ্যে যমুনাচার্য্যের নামই বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। যমুনাচার্য্য একজন অসাধারণ পণ্ডিত ছিলেন।

শৈলপুর্ণ নামে যমুনাচার্য্যের এক শিষ্য ছিলেন। তাঁহার দুই ভগ্নী ছিল। তাহাদের নাম কান্তিমতী ও ধ্যান্তিমতী। আম্মুরী কেশব সমায়জীর সহিত কান্তিমতীর এবং কমলাক্ষ ভট্টের সহিত ধ্যান্তিমতীর বিবাহ হয়। কেশব সমায়জীর ঔরসে এবং কান্তিমতীর গর্ভে ৯৪০ শকে রামানুজ জন্মগ্রহণ করেন। ভক্তগণ তাঁহাকে লক্ষ্মণের অবতার বলিয়া বিশ্বাস করেন।

রামানুজ অতি অল্প দিন মধ্যেই প্রাথমিক শিক্ষা শেষ করেন। ১৬ বৎসর বয়সে তাঁহার বিবাহ হয়। ইহার কিছুদিন পরে রামানুজ সংবাদ পাইলেন যে কাঞ্চীনগরে যাদবপ্রকাশ নামক জনৈক সন্ন্যাসী বেদান্ত শিক্ষা দিতেছেন। তিনি এই সংবাদ প্রাপ্তি মাত্রেই কাঞ্চীনগরে গমন করিয়া যাদবপ্রকাশের শিষ্যত্ব স্বীকার করেন।

একদিবস যাদবপ্রকাশ তৈত্তিরীয় উপনিষদ সম্বন্ধে উপদেশ প্রদান কালে "সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম" কথার ব্যাখ্যা করিবার সময় বলিয়া উঠিলেন, এই ঋষিবাক্য কখনই সত্য হইতে পারে না। ব্রহ্মকে সত্যং, জ্ঞানং এবং অনন্তং বলাও যা, আর একটি গাভীকে শৃঙ্গবতী, ভগ্নশৃঙ্গী ও শৃঙ্গবিহীন বলাও তাই। এই কথা শুনিয়া রামানুজ বলিলেন, গুরুদেব আমার নিকট সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্মের অপর একটি সুন্দর ভাষ্য হইতে পারে। যথা সত্যং অর্থাৎ নিত্যং বা অপরিবর্ত্তনীয়, জ্ঞানং অচিৎ-শূন্য এবং অনন্তং অসীম, এই তিনটি বিভিন্ন গুণ হইলেও ব্রহ্মে অর্পণ করিতে পারা যায়। যাদবপ্রকাশ এই কথা শুনিয়া ক্রুদ্ধ হইলেন বটে, কিন্তু কোন প্রত্যুত্তর না করিয়া নীরবে রহিলেন। অন্য একদিন ছান্দোগ্য উপনিষদের "কপ্যাসম্ পুণ্ডরীকম্" বাক্য লইয়া যাদবপ্রকাশের সহিত রামানুজের মতান্তর উপস্থিত হয়। ইহাতে যাদব অতিশয় অসন্তুষ্ট হয়েন এবং বাটী হইতে রামানুজকে বহিষ্কৃত করিয়া দেন।

এই ঘটনার পর যাদব ভাবিলেন যে, তাঁহাকে রামানুজের হস্তে পুনঃ পুনঃ অবমানিত হইতে হইবে; সুতরাং তাহাকে নষ্ট করাই কর্ত্তব্য। এই উদ্দেশ্যে একদিন তিনি তাঁহার কতিপয় প্রিয় এবং বিশ্বাসী ছাত্রকে ডাকিয়া বলিলেন, "বৎসগণ! এই রামানুজ একজন ভয়ানক ব্যক্তি। তোমরা কি দেখিতেছ না যে সে আমার ছাত্র হইয়া আমার সহিত তর্ক করিতে প্রবৃত্ত হয়? তাহাকে আমাদের মধ্য হইতে বিদূরিত করিতে (অর্থাৎ মারিয়া ফেলিতে) না পারিলে ইহার দ্বারা অদ্বৈতবাদের সম্পূর্ণ উচ্ছেদ হইবার সম্ভাবনা। অতএব তোমরা যে কোন প্রকারেই হউক গোপনে এবং অতি সাবধানে এই ব্যক্তির বধসাধন কর।" ছাত্রগণ নানাবিধ উপায় নির্দ্দেশ করিলেন কিন্তু সকলগুলিই পাপকার্য্য বলিয়া যাদব কর্ত্তৃক পরিহৃত হইল। তিনি বলিলেন, "এস আমরা তাহাকে লইয়া তীর্থযাত্রা উপলক্ষে বারাণসী গমন করি। তাহা হইলে তথায় রামানুজ নিশ্চয়ই গঙ্গাগর্ভে নিপতিত হইয়া প্রাণত্যাগ করিবে। আমাদেরও বিনা পাপকার্য্য দ্বারা অভীষ্ট সিদ্ধ হইবে।"

এইরূপ পরামর্শ স্থির হইবার পর কয়েকজন ছাত্র

রামানুজকে যাদবের নিকট ডাকিয়া আনিলেন এবং যাদবও তাঁহাকে কৃত্রিম আনন্দের সহিত পুনর্গ্রহণ করিলেন।

কিছুদিন পরে একদিন যাদব শিষ্যগণকে আহ্বান করিয়া বলিলেন,—বৎসগণ! আমি বৃদ্ধ হইয়াছি। শীঘ্রই আমাকে ইহধাম পরিত্যাগ করিতে হইবে। আমার একান্ত ইচ্ছা যে আমার শেষ জীবন গঙ্গাতীরে অতিবাহিত করি।

যেমন রামের সহিত লক্ষ্মণের নাম জড়িত, শ্রীকৃষ্ণের সহিত বলরামের নাম নিত্য সংযুক্ত, শ্রীচৈতন্যের নাম নিতাই ভিন্ন সম্পূর্ণ হয় না, সেইরূপ রামানুজের সহিত গোবিন্দের নাম একসূত্রে গ্রথিত। এই গোবিন্দ রামানুজের মাতৃস্বসা ধ্যান্তিমতীর পুত্র—সুতরাং সম্পর্কে রামানুজের ভ্রাতা। রামানুজ যখন বিদ্যাশিক্ষার জন্য কাঞ্চীনগরে যাদবপ্রকাশের নিকট আইসেন, তখন গোবিন্দও তাঁহার সহপাঠীরূপে তথায় আশ্রয় লাভ করেন।

যাদবপ্রকাশের প্রস্তাব শ্রবণ করিয়া শিষ্যগণ সকলেই মহানন্দে তীর্থপর্য্যটন করিবার জন্য যাত্রা করিলেন। রামানুজ এবং গোবিন্দও তাঁহাদের সহযাত্রী হইলেন।

যখন সশিষ্য যাদবপ্রকাশ বিন্ধ্যাচলের পর্ব্বতরাজির মধ্যে আসিয়া উপস্থিত হইলেন, তখন গোবিন্দ তাঁহার তীর্থযাত্রার মূল উদ্দেশ্য সম্বন্ধে সন্দিহান হইলেন। যাদবের কৃত্রিম স্নেহ ও শিষ্যগণের যত্ন দেখিয়া ভ্রাতা রামানুজের ভাবী অমঙ্গল চিন্তায় তিনি কাতর হইলেন। পরদিন অতি প্রত্যূষে যখন রামানুজ প্রাতঃকৃত্য সমাপনার্থ গভীর জঙ্গল মধ্যে প্রবেশ করিলেন, গোবিন্দ তাঁহার পশ্চাদনুগমন পূর্ব্বক এক নিভৃত স্থানে যাইয়া রামানুজকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "ভ্রাতঃ! আমার বোধ হইতেছে যে এই তীর্থযাত্রা প্রসঙ্গ মধ্যে কোনও গূঢ় কারণ নিহিত আছে। আমার বিশ্বাস যাদবপ্রকাশ তোমার অসাধারণ জ্ঞান ও বুদ্ধি দেখিয়া তোমার উপর ঈর্ষাপরবশ হইয়া তোমাকে প্রবঞ্চনা করতঃ বারাণসীক্ষেত্রে লইয়া যাইতেছেন। তোমাকে বিনষ্ট করাই তাঁহার ও তাঁহার শিষ্যগণের মুখ্য উদ্দেশ্য। যাহা হউক, তুমি আর ফিরিয়া যাইও না। এই স্থান হইতে পলায়ন করিয়া আত্মরক্ষা কর।" এই বলিয়া গোবিন্দ তথা হইতে চলিয়া গেলেন।

রামানুজও সেই নিবিড় অরণ্য মধ্যে ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে করিতে বহুদূরে যাইয়া পড়িলেন। ক্রমে ক্লান্ত, পরিশ্রান্ত এবং ক্ষুৎপিপাসায় কাতর হইয়া এক বৃক্ষতলে সংজ্ঞাহীন হইয়া নিপতিত হইলেন।

সংজ্ঞাপ্রাপ্ত হইলে পর তিনি দেখিলেন এক ব্যাধ ও ব্যাধপত্নী তাঁহার নিকট দাঁড়াইয়া আছেন। তাঁহাদের দেখিবামাত্র তিনি গাত্রোত্থান করিয়া তাঁহাদিগকে প্রণাম করিলেন এবং জিজ্ঞাসা করিলেন—"আপনারা কে? কোথা হইতে আসিতেছেন? এবং কোথায় যাইবেন?" ব্যাধ উত্তর করিল, আমরা বহুদূর হইতে—তুষারাবৃত হিমাচলস্থ সিদ্ধাশ্রম হইতে আসিতেছি এবং পবিত্র সত্যাব্রত (কাঞ্চী) নগরে গমন করিতেছি। রামানুজ বলিলেন,—"আমিও সেই স্থানে যাইব, কিন্তু আমি পথহারা হইয়া বিপন্ন হইয়াছি। আপনারা না আসিলে আমি অদৃষ্টের উপর নির্ভর করিয়া এই স্থানেই পড়িয়া থাকিতাম। আপনারা এক্ষণে আমাকে দয়া করিয়া এই বিজন অরণ্যের বাহিরে লইয়া চলুন।" ব্যাধ বলিল, "তবে আইস"। রামানুজ তাহাদের পশ্চাদনুগমন করিতে লাগিলেন। কিছুক্ষণ পরে তাঁহারা একটি পথ দেখিতে পাইলেন এবং সেই পথ দিয়া সন্ধ্যা পর্য্যন্ত গমন করিয়া একস্থানে একটি বৃহৎ বৃক্ষতলে রাত্রিযাপনার্থ আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। বলা বাহুল্য যে, সে দিবস তাঁহাদিগকে অনাহারেই থাকিতে হইয়াছিল।

প্রাতঃকালে নিদ্রাভঙ্গ হইলে পর রামানুজ দেখিলেন যে, ব্যাধ ও ব্যাধপত্নী তথা হইতে অন্তর্হিত হইয়াছেন। তৎপরে কিয়দ্দূর গমন করিয়া তিনি কাঞ্চীনগরস্থিত বরদ দেবের মন্দিরের পুণ্য কোটী-বিমান দেখিতে পাইলেন। তখন তাঁহার মনে এক অভূতপূর্ব্ব আনন্দ উপস্থিত হইল।

কথিত আছে, যে দিবস রামানুজ ব্যাধ ও ব্যাধপত্নী সহ বৃক্ষতলে রাত্রিযাপন করিতে বাধ্য হয়েন, উক্ত দিবস মধ্য রাত্রে ব্যাধপত্নী অতিশয় পিপাসিত হইয়া তাঁহার স্বামীকে জল আনয়ন করিবার জন্য অনুরোধ করেন। ব্যাধ বলিলেন, "হে সুভগে, এই গহন কানন মধ্যে এত অধিক রাত্রিতে আমি কোথা হইতে জল আনয়ন করিব। তুমি একটু অপেক্ষা কর, রাত্রি প্রভাত হইলেই আমি কোন কূপ হইতে স্বচ্ছ নির্ম্মল এবং শীতল বারি আনয়ন করিয়া তোমার পিপাসা শান্তি করিব।" এই কথা শুনিয়া রামানুজ ভাবিলেন, "হায়! আমি কি হতভাগ্য, এই স্থানের পথ-ঘাটে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞতাবশতঃ আমি আমার উপকারী বন্ধুগণের এ সময় কোন উপকার করিতে পারিলাম না।"

যাহা হউক, রামানুজের বিশ্বাস হইয়াছিল যে সেই ব্যাধ ও ব্যাধপত্নী ছদ্মবেশী শ্রীরামচন্দ্র এবং তাঁহার পত্নী সীতাদেবী। তাঁহারা তাঁহার দুঃখে কাতর হইয়া তাঁহাকে মহারণ্য হইতে উদ্ধার করিয়া তাঁহার প্রার্থিত কাঞ্চী নগরে পৌঁছাইয়া দিয়াছিলেন। এই বিশ্বাসবশতঃ তিনি কাঞ্চীতে অবস্থান কালে প্রতি দিবস এক পূর্ণপাত্র জল বরদদেবের সেবার জন্য উপস্থিত করিতেন।

এদিকে যাদবপ্রকাশ এবং তাঁহার শিষ্যগণ রামানুজ

ও গোবিন্দকে দেখিতে না পাইয়া অত্যন্ত চিন্তিত হইলেন। তাঁহাদের মনে নানাপ্রকার সন্দেহ হইতে লাগিল। এমন সময় গোবিন্দ তথায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। গোবিন্দকে দেখিয়া যাদবপ্রকাশ তাঁহাকে নানা প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলেন। যাদব জিজ্ঞাসা করিলেন "রামানুজ কোথায়?" এই কথা শুনিয়া গোবিন্দ কৃত্রিম শোকের সহিত বলিলেন—"হায়! তাঁহার কি হইল। আমি মনে করিয়াছিলাম তিনি আপনার সহিত গিয়াছেন।" তৎপরে তিনি "হা ভ্রাতঃ তুমি কোথায় গেলে, হায়! আমার কি হইল," ইত্যাদি কাতর উক্তিতে বিলাপ করিতে লাগিলেন। তাঁহার স্বাভাবিক কাতরতা এবং ক্রন্দন শুনিয়া সকলেই অনুমান করিলেন যে গোবিন্দ রামানুজ সম্বন্ধে কিছুই জানে না। বোধ হয় তিনি অধিক রাত্রে বনের মধ্যে যাইয়া কোন হিংস্রক জন্তুর হস্তে প্রাণত্যাগ করিয়াছেন। তৎপরে যাদব সশিষ্য গন্তব্য পথে অগ্রসর হইলেন।

কথিত আছে, একদিন যাদব সশিষ্য গঙ্গাস্নান করিতে যাইলেন; গোবিন্দও তাঁহাদের সঙ্গে যাইলেন। যখন গোবিন্দ স্নান করিয়া উঠিবেন, তখন দেখিলেন যে একটি শিবলিঙ্গ তাঁহার হস্তে সংযুক্ত রহিয়াছে। তৎক্ষণাৎ তিনি যাদবপ্রকাশ ও শিষ্যগণকে তাহা দেখাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "ইহার অর্থ কি?" যাদব ও তাঁহার শিষ্যগণ তদ্দৃষ্টে অত্যন্ত আশ্চর্যান্বিত হইলেন এবং বলিলেন, "তুমিই ধন্য, তোমারই যথার্থ গঙ্গাস্নান হইয়াছে। ভগবান গঙ্গাধর তোমার প্রতি প্রসন্ন হইয়াছেন। এরূপ ভাগ্য সহজে কাহারও হয় না।" যাহা হউক, এই দিন হইতেই গোবিন্দকে সকলে ভক্তি ও শ্রদ্ধা করিতে লাগিলেন।

কিছুদিন পরে তাঁহারা তীর্থযাত্রা শেষ করিয়া কাঞ্চী নগরে প্রত্যাগমন করিলেন। পথিমধ্যে গোবিন্দ সেই লিঙ্গ স্থাপন করিবার উপযুক্ত স্থান অন্বেষণ করিবার জন্য যাদবের অনুমতি লইয়া পশ্চাতে রহিয়া গেলেন।

যাদবপ্রকাশ এবং তাঁহার শিষ্যগণ কাঞ্চীনগরে ফিরিয়া আসিয়া রামানুজকে দেখিয়া বড়ই আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন এবং যখন রামানুজের নিকট সকল বৃত্তান্ত অবগত হইলেন, তখন ভাবিলেন রামানুজ সাধারণ ব্যক্তি নন। যাদবপ্রকাশ রামানুজকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন "বৎস, আমরা মনে করিয়াছিলাম যে তুমি হিংস্র জন্তুর হস্তে পড়িয়া জীবলীলা সম্বরণ করিয়াছ। যাহা হউক তোমাকে পুনঃপ্রাপ্ত হইয়া পরম সুখী হইলাম। তৎপরে রামানুজ যাদবপ্রকাশের মঠে পূর্ব্ববৎ যোগদান করিতে লাগিলেন।"

এই সময় দাক্ষিণাত্যে যমুনাচার্য্য অসাধারণ পাণ্ডিত্য সহকারে বৈষ্ণবধর্ম্ম প্রচার করিতেছিলেন। তিনি রামানুজ ও যাদবপ্রকাশ সম্বন্ধে সকল কথা শুনিয়া ভাবিলেন যে রামানুজের ন্যায় ব্যক্তি দ্বারাই বৈষ্ণবধর্ম্ম প্রচারের বিশেষ সুবিধা হইবে; সুতরাং সত্বর তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তাঁহাকে বৈষ্ণবধর্ম্ম বিশেষভাবে শিক্ষা দেওয়া কর্ত্তব্য। তিনি সশিষ্য কাঞ্চীনগরাভিমুখে যাত্রা করিলেন। কাঞ্চীনগরে তিরুকাচ্ছি নম্বী বা কাঞ্চীপূর্ণ নামক তাঁহার এক প্রিয় শিষ্য ছিলেন। তিনি যমুনাচার্য্যের আগমনবার্ত্তা অবগত হইয়া কাঞ্চীনিবাসী কতিপয় বিশিষ্ট ভদ্রলোকের সহিত তাঁহার অভ্যর্থনার জন্য অগ্রসর হইলেন। তৎপরে সকলে মিলিত হইয়া বরদরাজ দেবের মন্দিরে গমন করিলেন।

বরদরাজ-দেবের পূজা সমাপন করিয়া যখন যমুনাচার্য্য মন্দির প্রদক্ষিণ করিতেছিলেন তখন একদল লোকের প্রতি তাঁহার দৃষ্টি পড়িল। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন "উহারা কে?" নম্বী বলিলেন "সন্ন্যাসী যাদবপ্রকাশ ও তাহার শিষ্যগণ।" এই কথা অবগত হইয়া তিনি অত্যন্ত আনন্দিত হইলেন এবং বলিলেন "ঐ দলের মধ্যে সম্ভবতঃ রামানুজও আছেন।" নম্বী উত্তর করিলেন "হাঁ দেব, ঐ দলের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা দীর্ঘাঙ্গ ব্যক্তিই রামানুজ।" যমুনাচার্য্য সেই গৌরাঙ্গ মূর্ত্তির প্রতি একদৃষ্টে চাহিয়া রহিলেন।

কিছু দিন পরে যমুনাচার্য্য শ্রীরঙ্গমে প্রত্যাগমন করিলেন। কিন্তু সে সময় রামানুজের সহিত স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া সাক্ষাৎ করা বা তাঁহাকে ডাকিয়া পাঠান যুক্তিসঙ্গত বিবেচনা করিলেন না।

প্রবাদ আছে যে, যমুনাচার্য্যের কাঞ্চী ত্যাগ করিবার কিছু দিন পরে—সেই প্রদেশের রাজার কন্যাকে ব্রহ্মরাক্ষস নামক ভূতে অধিকার করে। রাজা নানা স্থান হইতে বিখ্যাত রোজা আনাইলেন কিন্তু কেহই কিছু করিতে পারিলেন না। এক দিন একজন রাজ-অমাত্য বলিলেন যে, যদি যাদবপ্রকাশের ন্যায় সন্ন্যাসী একবার রাজবাটীতে পদার্পন করেন তাহা হইলে ব্রহ্মরাক্ষস তৎক্ষণাৎ পলায়ন করিবে। এই কথা শুনিয়া রাজা সশিষ্য যাদবপ্রকাশকে নিমন্ত্রণ করিয়া পাঠাইলেন। যাদবপ্রকাশ সন্দেশবাহককে বলিলেন—"যদি ঐ ব্রহ্মরাক্ষস এতাদৃশ ক্ষমতাবান যে তাহাকে দুরীভূত করিবার জন্য আমার উপস্থিতি আবশ্যক বিবেচিত হয়, তাহা হইলে তুমি ফিরিয়া গিয়া আমার নাম করিয়া ব্রহ্মরাক্ষসকে বল, যেন সে রাজকন্যাকে পরিত্যাগ করিয়া এ অঞ্চল হইতে পলায়ন করে।" দূত-মুখে এই কথা শুনিয়া ব্রহ্মরাক্ষস বলিলেন—"যদি যাদবপ্রকাশ সত্যসত্যই আমার ভয়ে ভীত হইয়া থাকেন, তবে

তাঁহাকে এস্থান হইতে চলিয়া যাইতে বল।” ব্রহ্ম-রাক্ষসের এইরূপ স্পর্দ্ধা ও অপমানসূচক বাক্য শুনিয়া যাদবপ্রকাশ ক্রোধে অন্ধবৎ হইয়া সশিষ্য রাজভবনে উপস্থিত হইলেন এবং সর্ব্বসমক্ষে মন্ত্রোচারণ করিতে করিতে ব্রহ্মরাক্ষসাশ্রিত রাজকন্যার প্রতি ধাবমান হইলেন। রাজকন্যা তাঁহার প্রতি পদ প্রসারণ করিয়া উত্তেজিত ভাবে চীৎকার করিয়া উঠিল—“অরে মূঢ়! তুই ঐ সামান্য মন্ত্র পাঠ করিয়া আমাকে দূর করিতে ইচ্ছা করিয়াছিস্। তোর ঐ মন্ত্র আমি বিশেষরূপে অবগত আছি। তাহা এই। তুই ময়ূরের ন্যায় হত-বীর্য্য, কাষ্ঠখণ্ডের ন্যায় মূর্খ। তুই তোর পূর্ব্ব জন্ম সম্বন্ধে কি জানিস্ আর আমার বিষয়ই বা কি জানিস্, সর্ব্বজন সমক্ষে উহা বিবৃত কর্।”

এই কথা শুনিয়া যাদবপ্রকাশ লজ্জায় অধোবদন হইয়া রহিলেন। তৎপরে যাদবপ্রকাশ ব্রহ্মরাক্ষসকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন “তুমি হয় ত সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্ব-বিদ্যা-বিশারদ হইতে পার; আচ্ছা, তুমিই কেন আমাদের উভয়ের পূর্ব্ব-জন্ম-কথা সর্ব্বজন সমক্ষে প্রকাশ কর না? ব্রহ্মরাক্ষস বলিল—“পূর্ব্বজন্মে তুই জন্তু-বিশেষরূপে মদুরান্তক হ্রদে বাস করিতিস্। তথায় তীর্থযাত্রী কতিপয় পরম বৈষ্ণব ব্রাহ্মণের উচ্ছি-ষ্টান্ন ভক্ষণ করিয়া ইহ জন্মে ব্রাহ্মণত্ব ও ব্রহ্মবিদ্যা লাভ করিয়াছিস। আমি পূর্ব্বে উচ্চ ব্রাহ্মণ-কুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলাম; যোগসাধনার নিয়ম ভঙ্গ করা অপরাধে ব্রহ্মরাক্ষস হইয়াছি, কিন্তু তাই বলিয়া পূর্ব্বস্মৃতি নষ্ট হয় নাই।” তৎপরে যাদবপ্রকাশ বলিলেন—“সে যাহাই হউক, এখানে এমন কি কেহ উপস্থিত আছেন—যাঁহার আজ্ঞায় তুমি রাজকন্যাকে পরিত্যাগ করিতে পার?” রাজকন্যা তখন রামানুজের নিকট যাইয়া তাঁহার চরণে নিপতিত হইয়া বলিলেন “যদি এই মহাপুরুষ আজ্ঞা করেন, তাহা হইলে আমি অবিলম্বে এখান হইতে চলিয়া যাইব।” যাদবপ্রকাশের অনুরোধে রামানুজ ব্রহ্ম-রাক্ষসকে পরিত্যাগ করিতে আজ্ঞা করিলেন। তখন ব্রহ্মরাক্ষস বলিল “প্রভু, আপনার আদেশ শিরোধার্য্য; তবে আপনি একবার আমার এই অপবিত্র মস্তকে পদ-স্থাপন করিয়া আমার মুক্তিপথ পরিষ্কার করিয়া দিন।” রামানুজ তাহাই করিলেন। অতঃপর রাজকন্যা সুস্থ হইলে রাজা কন্যাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন “বৎসে এই মহাপুরুষই তোমাকে ব্রহ্মরাক্ষসের হস্ত হইতে রক্ষা করিয়াছেন, ইহার পদধূলি গ্রহণ কর।” তৎপরে রাজা রামানুজকে যথোপযুক্ত পুরস্কার প্রদান করিতে ইচ্ছা করিলে তিনি তৎগ্রহণে অনিচ্ছা প্রকাশ করিয়া যাদবপ্রকাশ ও অন্যান্য শিষ্যগণ সমভিব্যাহারে মঠাভি-মুখে যাত্রা করিলেন।

এদিকে যমুনাচার্য্য ক্রমে জীবনের সীমান্তে উপস্থিত হইতে লাগিলেন। তাঁহার এক চিন্তা উপস্থিত হইল যে তাঁহার মৃত্যুর পর কে তাঁহার স্থান অধিকার করিবার উপযুক্ত হইবে—কাহার স্কন্ধে তিনি সেই গুরুভার অর্পণ করিয়া মরজগত হইতে অবসর গ্রহণ করিবেন? তিনি মনে মনে বলিলেন—হায়! যদি যাদবপ্রকাশ হইতে রামানুজকে স্বতন্ত্র করিবার ক্ষমতা থাকিত তাহা হইলে তাঁহার স্কন্ধে এই গুরুভার চাপাইয়া নিশ্চিন্ত হইতে পারিতাম। হে বরদরাজ, হে দেব, আমার এই শুভ-সংঘটন করাইয়া দিন আমি রামানুজকে ভিক্ষা মাগি-তেছি।

ভক্তের অন্তরের কথা ভগবান সর্ব্বদাই রক্ষা করেন। শীঘ্রই তাঁহার রামানুজলাভের পথ পরিষ্কার হইল। এক দিবস যাদবপ্রকাশ বৃহদারণ্যক উপনিষৎ হইতে “সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম” “নেহ নানাস্তি কিঞ্চন” বাক্যের ব্যাখ্যা করিতে করিতে বলিলেন যে অদ্বৈত মতই শ্রেষ্ঠ, কারণ ইহা ঈশ্বরের প্রকৃত অস্তিত্ব নির্দ্ধারণ করে। রামানুজ এই বাক্য স্বীকার না করিয়া বিশিষ্টাদ্বৈত মতের প্রাধান্য জ্ঞাপন করিলেন। ইহাতে যাদবপ্রকাশ অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া রামানুজকে বলিলেন, “তুমি আবার আমার সহিত তর্কে প্রবৃত্ত হইয়াছ? আমার নিকট আর তোমার শিক্ষা হইতে পারে না। যে কেহ তোমাকে ভাল শিক্ষা দিতে পারেন তুমি এখনই তাঁহার নিকট গমন কর।” রামানুজ সানন্দ মনে গৃহে প্রত্যাগমন করিয়া স্বীয় জননীকে সকল কথা জ্ঞাপন করিলেন। তাঁহার মাতা বলিলেন, “ভাল বৎস, যাদবপ্রকাশের নিকট তুমি যথেষ্ট বেদান্ত শিক্ষা করিয়াছ। এক্ষণে বরদরাজ দেবের প্রিয় ভক্ত পণ্ডিত কাঞ্চীপূর্ণের নিকট গমন কর। তিনি তোমাকে তোমার ভবিষ্যৎ শিক্ষা সম্বন্ধে যাহা উপদেশ দিবেন সেই মত কার্য্য করিবে।” তৎপরে মাতৃ-আদেশ অনুসারে রামানুজ নম্বীর নিকট উপস্থিত হইয়া উপদেশ প্রার্থনা করিলেন। নম্বী বলিলেন, ভগবান্ বরদরাজ তোমা কর্ত্তৃক আনীত কূপজল বড় ভালবাসেন। তুমি পূর্ব্ববৎ তাঁহাকে ঐরূপ জল দ্বারা সন্তুষ্ট কর। তদবধি রামানুজ পুনরায় আনন্দের সহিত পূর্ব্ব কার্য্যে ব্রতী হইলেন।

অল্পদিন পরে যাদবপ্রকাশের সহিত রামানুজের বিচ্ছেদ এবং তাঁহার বরদরাজ দেবের সেবায় পুনর্নিযুক্ত হওয়ার কথা বৃদ্ধ যমুনাচার্য্যের নিকট পৌঁছিল। এই কথা শুনিয়া যমুনাচার্য্যের আনন্দের সীমা রহিল না। তিনি তাঁহার প্রধান শিষ্য মহাপূর্ণকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন—“বৎস! ভগবানের ইচ্ছা পূর্ণ হইয়াছে। তুমি এই দণ্ডেই কাঞ্চী যাত্রা করিয়া রামানুজকে আমার নিকট

আনয়ন কর।" মহাপূর্ণ গুরুবাক্য শিরোধার্য্য করিয়া কাঞ্চী অভিমুখে যাত্রা করিলেন।

মহাপূর্ণ কাঞ্চীতে পৌছিয়া কাঞ্চীপূর্ণকে সকল কথা জ্ঞাপন করিলেন। নম্বী তাঁহাকে যে পথ দিয়া রামানুজ প্রতিদিন বরদরাজের সেবার জন্য জলপূর্ণ কুম্ভ আনয়ন করিতেন, সেই পথ দেখাইয়া দিলেন এবং তথায় অপেক্ষা করিতে বলিলেন। তিনি আরও বলিয়া দিলেন যে তিনি যেন তথায় অবস্থান কালে যমুনাচার্য্যকৃত বরদরাজ দেবের স্তোত্র পাঠ করিতে থাকেন। মহাপূর্ণ নম্বীর আদেশ মত কার্য্য করিলেন। যখন তিনি "স্বাভাবিকা" * ইত্যাদি একাদশ শ্লোকে উপনীত হইলেন, তখন দেখিতে পাইলেন রামানুজ জলপূর্ণ কুম্ভ স্কন্ধে করিয়া মন্দিরাভিমুখে গমন করিতেছেন। এই স্তোত্রটি রামানুজের এত ভাল লাগিল যে, তিনি তৎক্ষণাৎ তথায় দাঁড়াইয়া পড়িলেন এবং মহাপূর্ণকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "এই মন্ত্রটি কাহার রচিত এবং কোন্ মহাপুরুষ দ্বারা গীত হইয়াছিল?" মহাপূর্ণ বলিলেন, "শ্রীরঙ্গম-নিবাসী যমুনাচার্য্যনামক জনৈক সন্ন্যাসী এই স্তোত্রটি রচনা করিয়াছেন এবং তিনিই ইহার গায়ক।" রামানুজ বলিলেন, "আমি কি সেই সাধু সন্ন্যাসীর সাক্ষাৎ পাইতে পারি?" মহাপূর্ণ উত্তর করিলেন, "ইহা অতি সহজ। আমি আপনাকে তাঁহার নিকট লইয়া যাইতে পারি।" এই কথা শুনিয়া রামানুজ বলিলেন, "তবে আপনি অনুগ্রহপূর্ব্বক একটু অপেক্ষা করুন আমি মন্দিরে এই জলকুম্ভটি দিয়া আসি।" মহাপূর্ণ বলিলেন, "তাহাই হউক"। তৎপরে রামানুজ দ্রুতপদে মন্দির মধ্যে প্রবেশ করিলেন এবং বরদরাজের নিকট অনুমতি ভিক্ষা করিয়া কাঞ্চীপূর্ণের নিকট উপস্থিত হইলেন। কাঞ্চীপূর্ণ তাঁহার অভিপ্রায় অবগত হইয়া বলিলেন, "প্রিয়তম রামানুজ, তোমার শ্রীরঙ্গম-যাত্রার কথা অবগত হইয়া আমি যারপর নাই প্রীত হইলাম। কারণ তুমি যাঁহার নিকট যাইতেছ সেই মহাপুরুষ যমুনাচার্য্য আমার এবং মহাপূর্ণের গুরু ও ধর্ম্মপিতা। ইহার পর রামানুজ কাঞ্চীপূর্ণের নিকট বিদায় গ্রহণ করিয়া মহাপূর্ণের সহিত শ্রীরঙ্গম যাত্রা করিলেন।

রঙ্গালয় ও দেশোন্নতি।

(শ্রীক্ষেমেন্দ্র নাথ ঠাকুর বি-এস্‌সি)

আজ আমাদের সম্মুখে জীবনমরণের সমস্যা আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। আজ আমাদের দেখিতে হইবে যে, আমরা জীবনের পথে—উন্নতির পথে যাইতেছি অথবা মরণের পথে—ধ্বংসের পথে যাইতেছি।

কতক্ষণ বোঝা যায় যে মনুষ্যদেহে জীবন আছে?—যতক্ষণ সে মরণের সহিত যুদ্ধ করিতে পারে। কতক্ষণ বোঝা যায় একটা দেশের জীবন আছে?—যতক্ষণ সে অন্যায়ের বিরুদ্ধে দাঁড়াইবার মত সাহস ও স্বাধীনতা রাখে। আজ আমাদের কোন্ অবস্থা উপস্থিত?

আমরা দেশের উন্নতি করিতে বদ্ধপরিকর হইয়াছি। কিন্তু দেশের উন্নতি করিবার উপকরণ কি বিলাসলাস্য, নাট্যকলা, নৃত্যলীলা?—যে দেশের অসংখ্য লোক অনাহারে মৃত্যুগ্রাসে পড়িতেছে—যে দেশে নরনারীর ক্রন্দনে ও দুঃখের গুরুভারে আকাশ এবং সর্ব্বংসহা ধরণীও কাঁপিয়া উঠিতেছে, দুর্ভিক্ষ ও মহামারী যে দেশের নিত্য সহচর, সে দেশকে উঠাইবার অব্যর্থ উপায় কি রঙ্গালয়ে অভিনয়দর্শন? এখন কি আমাদের আমোদ করিবার সময়,—বিলাসে কালক্ষেপ করিবার সময়? মহাত্মা ম্যাট্‌সিনি যখন বিদ্যালয়ের ছাত্র ছিলেন তখন হইতেই শোকপরিচ্ছদ ধারণ করিতেন। জিজ্ঞাসা করিলে বলিতেন, যে দেশের এত দুরবস্থা সে দেশে বিলাসিতা সাজে না। ইতালীর তদানীন্তন কালের অবস্থা হইতে আমাদের অবস্থা আরও কত শোচনীয়। আর আমরা কি না শোকসন্তপ্ত হইবার পরিবর্ত্তে বিলাসিতায় মগ্ন—দীনের দুঃখে ব্যথিত হইবার পরিবর্ত্তে রঙ্গালয়ের ঘৃণ্য আমোদে প্রমত্ত। রঙ্গালয়ের নৃত্যলাস্য কি শোকসন্তপ্ত মানুষের হৃদয়ে শান্তিপ্রদানের জন্য প্রবর্ত্তিত হইয়াছে—না তরলমতি লোকদের অন্তরে চাঞ্চল্য ও অশান্তিবর্দ্ধনের জন্য প্রবর্ত্তিত হইয়াছে? কোনও যুগে কোনও সম্প্রদায় বা জাতিই নৃত্য বা অভিনয় দ্বারা জগতে উন্নতিলাভ করিতে বা চরিত্রবান্ জাতি বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে নাই। যে যুগে যে জাতিই খ্যাতিলাভ করিয়াছেন, তাঁহারা সকলেই এই সকল কার্য্য হইতে বহুদূরে অবস্থান করিয়াছেন। তাঁহারা জানিতেন যে রঙ্গালয়ের অভিনয় মানুষের মনকে বিপথেই লইয়া যাইতে

---

* এই একাদশ শ্লোকের অর্থ এই প্রকার—হে ব্রহ্ম—ব্রহ্মা, শিব এবং ইন্দ্র তোমার মহিমা-সাগরের বিন্দুমাত্র। তোমার সর্ব্বজ্ঞতা এবং অনন্তত্ব কেহই অস্বীকার করিতে পারে না।

সহায়তা করে—কখনই ধর্ম্মের দিকে টানিয়া আনিতে পারে না কারণ চিত্তচাঞ্চল্যকারী সুপ্রচুর নৃত্যগীতবাদ্য শুনিয়া, বিলাসলাস্য, চটুলহাস্য দর্শন করিয়া সাধারণতঃ কেহই অন্বেষণ করিতে বা স্মরণ রাখিতে দৌড়াইবে না যে, সেই সকল নৃত্যগীতের মধ্যে কোথায় ধর্ম্মের কোন্ উপদেশ দেওয়া হইয়াছে। পঙ্কের মধ্যে রত্ন থাকিতে পারে, কিন্তু সুদুষ্করযত্ন বিনা কি তাহা উদ্ধার করা যায়? দুঃখের বিষয়, সাধারণ লোকে তত যত্ন ও ধৈর্য্য লইতে পারে না; ফলে তাহাদের পঙ্ক মাখিয়া মলিন হওয়াই সার হয়।

মহাপুরুষদের জীবনী পাঠে আমরা জানিতে পারি যে, তাঁহাদের উপদেশ শ্রবণ ও পাঠ করিয়া সহস্র সহস্র পাপী সুপথে প্রত্যাগমন করিয়াছে। কিন্তু নাট্যমঞ্চে সেই মহাপুরুষগণেরই জীবনীর অভিনয় দেখিয়া, তাঁহাদের সেই সকল উপদেশ-বাণীই রঙ্গমঞ্চ হইতে শুনিয়া, কেহ ধর্ম্মপরায়ণ হইয়াছেন বলিয়া শোনা যায় নাই—ধর্ম্মপরায়ণ হওয়া ত দূরের কথা ধর্ম্মের স্থায়ীভাব কাহারও হৃদয়ে জাগরূক হয় কি না সন্দেহ। দর্শকগণের কথা ত দূরের কথা, যে সকল অভিনেতা সেই সকল মহাপুরুষ সাজিয়া অভিনয় করেন—অভিনয় সৌকর্য্যার্থ ক্রমাগত সেই সকল মহাপুরুষগণের বাণী কণ্ঠস্থ করিলেও তাঁহাদেরও ত কোনই পরিবর্ত্তন দেখা যায় না। কিরূপেই বা হইবে? অভিনয়-বিদ্যাই যে মিথ্যার ভিত্তির উপর স্থাপিত। পৃথিবীর সকল বিদ্যা, সকল জ্ঞানই সত্যের উপর স্থাপিত—কবি, লেখক বা বৈজ্ঞানিক যাহা তাঁহার সত্য মনের ভাব তাহাই সাধারণতঃ প্রকাশ করিয়া থাকেন—অন্ততঃ লোকে তাঁহাদের রচনাবলীর মতকেই তাঁহাদের মনের সত্যভাব ধরিয়া লইয়া তদনুযায়ী সমালোচনা করে, কিন্তু বেচারী অভিনেতার বেলায় সবই বিপরীত। অভিনেতা যতই নিজের প্রকৃত ভাবকে লুকাইয়া মিথ্যাভাব ফুটাইয়া তুলিতে পারিবেন ততই লোকের প্রশংসা পাইবেন—তাঁহার সত্য প্রকৃতি প্রকাশ পাইলেই বরং অপযশের ভাগী হইবেন। সকল বিদ্যাশিক্ষার্থীই সত্যের পূজা করেন, একমাত্র অভিনয়বিদ্যাশিক্ষার্থীকেই মিথ্যার পদতলে আপনাকে বলি দিতে হয়। এমন কি অভিনয়বিদ্যাশিক্ষায় মিথ্যার এত পূজা করিতে হয় যে "অভিনয় করা"র অর্থই দাঁড়াইয়াছে "ভণ্ডামী করা।" কাহারও ভণ্ডামী আমরা বুঝিতে পারিলে অবজ্ঞাভরে বলি "লোকটা ত বেশ অভিনয় করে।" এত গভীররূপে মিথ্যার ভিত্তির উপর দাঁড়াইয়া আছে যে বিদ্যা, তাহা কি কখন মানুষের মনে সত্যের জ্যোতি বিকীর্ণ করিতে পারে? সুতরাং অভিনয় দর্শন করিয়া যদি কেহ ধর্ম্মভাবাপন্ন না হয়—যদি কাহারও মনে স্থায়ীরূপে দয়াদাক্ষিণ্যবীরত্বাদি সদ্ভাবসমূহ অঙ্কিত না হয় তাহাতে আশ্চর্য্য হইবার কি আছে? যেমন নকল সাধুর অভিনয় দর্শনে কেহ ধর্ম্মপরায়ণ হয় না, তেমনি রঙ্গালয়ের ভণ্ড বীরগণের বীরত্বে বিমোহিত হইয়াও কেহই কখন যুদ্ধে আত্মবিসর্জ্জন করে নাই। অভিনয়দর্শন সমর্থনের জন্য অনেকে বলেন যে তাঁহারা ভাল কাজে উৎসাহ পাইবার জন্য রঙ্গালয়ে যান। এই সকল শ্রেণীর লোককে জিজ্ঞাসা করি, দেশবিদেশে যত মহৎলোক জন্মিয়াছেন তাঁহাদিগের ভিতর কি এমন একজনও আছেন যিনি অভিনয় দেখিয়া মঙ্গলকার্য্যে আত্ম-নিয়োগে ইচ্ছুক হইয়াছিলেন? বর্ত্তমান ভারতেরই কথা দেখা যাক্। রাজা রামমোহন রায়, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ, ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র হইতে পরমহংস রামকৃষ্ণ, স্বামীবিবেকানন্দ, মহাত্মা গান্ধী, বিদ্যাসাগর, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন, আলি ভ্রাতৃদ্বয়প্রমুখ কেহ কি অভিনয় দেখিয়া তবে স্বদেশের মঙ্গল করিতে প্রণোদিত হইয়াছিলেন? অভিনয়দর্শনে চিত্ত যেরূপ চঞ্চল হয় তাহাতে কি দেশের কোনও মঙ্গল করিবার আশা থাকে? আজ কত বৎসর অভিনয় হইয়া আসিতেছে—তাহাদের সহস্র সহস্র দর্শক বা অভিনেতার মধ্যে কি একজনও অভিনয়দর্শনের ফলে মঙ্গলকার্য্যে নিযুক্ত হইয়াছেন? অভিনয় দেখিয়া কি কেহ সৎ-কর্ম্মে মন দিতে গিয়াছেন?—ক্রমাগত মিথ্যার মধ্যে থাকিয়া কি সৎকর্ম্ম করিবার সাহস ও ইচ্ছা অর্জ্জন করা যায়? মিথ্যার অবিরত আঘাতে কি সৎকর্ম্মের বা সত্যের মেরুদণ্ড স্থির রাখা যায়?

অনেকে আবার বলেন তাঁহারা শিক্ষালাভের জন্য—উপদেশ পাইবার উদ্দেশ্যে অভিনয় দেখিতে যান্। ইহাঁদের স্বীয় মনকে প্রবোধ দিবার পন্থা আবিষ্কার করিবার শক্তি দেখিলে স্তম্ভিত হইতে

হয়। ইঁহারা বিনা পয়সায় শিক্ষালাভের জন্য মহামহোপাধ্যায় বা এল্ এল্ ডি পণ্ডিতগণের বাড়ী যান না—বিনা পয়সায় উপদেশ পাইবার উদ্দেশ্যে নিয়মিত কোন ধর্ম্মসভাদিতে যান না, অথচ পয়সা খরচ করিয়া সমস্ত রাত্রি জাগরণ করিয়া মহামূল্য স্বাস্থ্যের মূলে কুঠারাঘাত করিয়া রঙ্গালয়ে উপদেশ ও শিক্ষা পাইবার জন্য গিয়া থাকেন!! ইহা অপেক্ষা আত্মপ্রতারণা আর কি হইতে পারে? বন্ধুগণ, ভাবের ঘরে চুরি করিও না। ঠিক করিয়া বল দেখি, তোমরা কি উপদেশ লইতে রঙ্গালয়ে যাও? কি উপদেশ লইয়া ঘরে ফিরিয়া আইস? আজ যদি রঙ্গালয় হইতে অভিনেত্রীগণকে অপসারিত করা যায় তখনই তোমাদের কথার সত্যাসত্যের প্রমাণ হইয়া যায়।

এই সকল ব্যক্তি রঙ্গালয়ে শিক্ষা করিতে যায় বটে—কিন্তু তাহা ধর্ম্ম বা কর্ম্ম শিক্ষা নহে কিন্তু লালসাশিক্ষা। রঙ্গালয়েই অনেক নিষ্কলঙ্ক যুবকের লাম্পট্যবিদ্যায় প্রথম হাতেখড়ি হয়; রঙ্গালয়ের সাহায্যেই অনেক যুবকের ধ্বংসের পথ প্রথম উন্মুক্ত হয়। এই সকল যুবক সমাজসংস্কার করিবার ইচ্ছায় সমাজের দোষ দেখিতে পয়সা খরচ করিয়া রঙ্গালয়ে যান, কিন্তু অবশেষে নিজেরাই সেই সকল পাপে জড়াইয়া যান। ইহাঁদিগকে জিজ্ঞাসা করি, সমাজসংস্কার করিবার পূর্ব্বে কি নিজের সংস্কার করিলে ভাল হয় না? আজ যদি নাট্যশালার সহস্র সহস্র ভক্ত সমাজসংস্কারের পূর্ব্বে নিজের সংস্কার করিতেন তাহা হইলেই ত সমাজসংস্কার আপনা হইতেই হইয়া যাইত। তাহা হইলে সমাজসংস্কারের জন্য কি আর রঙ্গালয়ে যাইতে হয়? আর এক কথা, অভিনয়দর্শনে কি সত্যই সমাজসংস্কার হয়? তাহা যদি হইত, তাহা হইলে আজ আর অস্পৃশ্যতা থাকিত না—তাহা হইলে আজ আর পণপ্রথা থাকিত না—তাহা হইলে এখনও আমাদের দেশে শতবিধ অনাচার কদাচার থাকিত না। এত বৎসরের মধ্যে মাত্র কয়েকটী সংস্কার অভিনয়ের দ্বারা হইয়াছে বলিলেও বলা যায়; যথা:—বহুবিবাহপ্রথা দূর এবং নীলের অত্যাচার বারণ। যদিও ইহাদের কতটা যে অভিনয় দেখিয়া এবং কতটাই বা পারিপার্শ্বিক প্রভাবে হইয়াছে, তাহা বলা শক্ত। ব্রাহ্মসমাজের অভ্যুত্থান, একপত্নীক ইংরাজগণের আদর্শ প্রভৃতি পারিপার্শ্বিক প্রভাবই যে বহুবিবাহপ্রথা দূর হওয়ার একটী প্রধান কারণ তাহা বোধ হয় অস্বীকার করা যায় না। সেইরূপ নীলকরগণের অকথিত অত্যাচারাদির পারিপার্শ্বিক প্রভাব যে নীলের অত্যাচারে বাধা দিবার এক প্রধান কারণ তাহাও বোধ হয় অস্বীকার করা যায় না; কারণ প্রধানতঃ কৃষকগণই এই অত্যাচারের বিরুদ্ধে উঠিয়াছিল এবং বোধ হয় নিঃসন্দেহেই বলা যায় যে তাহাদের অধিকাংশই রঙ্গালয়ে অভিনয় দর্শন ত দূরের কথা, সম্ভবতঃ বিলাতী ধরণের রঙ্গালয়ের নামও শোনে নাই।

কাজেই যে সকল যুবক সমাজসংস্কারের উদ্দেশ্যে রঙ্গালয়ে যাইতেছেন বলিয়া আত্মসমর্থন করেন আমরা তাঁহাদিগকে সাবধান করিয়া বলিতেছি যে, বন্ধুগণ, সময় থাকিতে সাবধান হও। পাপের পথ অতি পিচ্ছিল—একবার পড়িলে আর উঠিবার প্রায় সম্ভাবনাই থাকে না। আত্মপ্রতারণা ছাড়। "পাপকে ঘৃণা কর কিন্তু পাপীকে করিও না," এই সূত্র ধরিয়া পাপীর সংসর্গ করিতে ছুটিও না। আর্টের জন্য আর্ট প্রভৃতি মোহময় কথায় ভুলিও না। সমাজের যে সকল দোষ তোমার অজ্ঞাত বা প্রচ্ছন্ন আছে তাহার প্রত্যেকটীই যে তোমার জানিতে হইবে এমন কোন কথা নাই। সকল পাপ, সকল দোষ—সকলের দেখিবার উপযুক্ত নহে। সকল রোগ সকলের দূর করিবার চেষ্টা করা সাধ্যায়ত্ত নহে। যিনি রোগ দূরীকরণরূপ মহৎকার্য্যে মনপ্রাণ সমর্পণ করিয়াছেন তিনিই সেই সকল রোগ দেখিবার উপযুক্ত। কুষ্ঠচিকিৎসক উপযুক্ত সতর্কতা অবলম্বন করিতে জানেন বলিয়া কেবল তিনিই কুষ্ঠাক্রান্তের সংস্পর্শে আসিতে পারেন। কুষ্ঠাক্রান্ত ব্যক্তি রোগযাতনায় কষ্ট পাইলেও যেমন বিশ্বশুদ্ধ লোকের তাহার কাছে যাইয়া কুষ্ঠাক্রান্ত হওয়া সমাজের পক্ষে হিতকর নহে, সেইরূপ কেবল ধর্ম্মবলে বলীয়ান্ সমাজসংস্কারকই সমাজের পাপ দেখিতে ও তাহা দূর করিতে নিযুক্ত হইতে পারেন। সমাজের সকলেই সকল পাপের ছবি দেখিবার উপযুক্ত নহেন; কারণ যাঁহাদের তত ধর্ম্মবল নাই তাঁহাদের পক্ষে উপযুক্ত সতর্কতা না

লইয়া কুষ্ঠরোগীর সংস্পর্শে আসিয়া কুষ্ঠক্রান্ত হওয়ার ন্যায়, পাপীর সংস্পর্শে আসিয়া পাপীকে সংশোধন করিবার পরিবর্ত্তে সেই পাপে ডুবিয়া যাওয়া কিছুমাত্র আশ্চর্য্য নহে। আর যাঁহাদের সেরূপ ধর্ম্মবল আছে তাঁহারা রঙ্গালয়ের মিথ্যা-দৃশ্যে সময় নষ্ট করেন না। তাঁহারা জানেন যে অভিনয় দেখিয়া কথনই অসৎকর্ম্মের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিবার বল অর্জ্জন করা যায় না বরং নৈতিক অবনতি হওয়াই সম্ভব।

রঙ্গালয়ে পাপের ছবি মাত্র দর্শন করিয়া যদি দর্শকগণের নৈতিক অবনতি হইতে পারে, তবে ইহা কি সম্ভব যে যাহারা অভিনয় করে তাহাদের নৈতিক অবনতি হইবে না?

আমাদের সত্য জীবনে আমরা যথাসাধ্য যে পাপকে এড়াইয়া চলিবার চেষ্টা করি, অভিনয়-কালে অভিনেতাগণকে সেই সকল পাপেরই দৃশ্য নিজ শরীরে ফুটাইয়া তুলিতে হয়। মানুষ পাপের অধীন হইয়া, রিপুর বশ হইয়া, জ্ঞান হারাইয়া যে সকল লজ্জাকর অকার্য্য কুকার্য্য করে—যে সকল কার্য্য নির্জ্জন ঘরে একলা স্মরণ করিতেও ঘৃণা ও লজ্জাবোধ হয়—অভিনেতাগণকে সজ্ঞানে জানিয়া শুনিয়াও সাধারণের সম্মুখে সেই সকল কার্য্য সম্পন্ন করিতে হয়—সেই সকল বাক্য উচ্চারণ করিতে হয়—ইহা অপেক্ষা সজ্ঞান মনুষ্যের পক্ষে আর হীনতর বৃত্তি কি হইতে পারে?

মানুষের প্রকৃতিই এই যে, কোনও কাজ, বিশেষতঃ মন্দ কাজ (অবজ্ঞাভরেও) ক্রমাগত করিতে করিতে তাহা তাহার স্বভাব হইয়া দাঁড়ায়। তখন সে অভ্যাসবশেই অনিচ্ছাসত্বেও সামান্য অসাবধান হইলেই সেই অভ্যস্ত কুকাজ করিয়া বসে। কাজেই এইরূপ হীনবৃত্তি অভিনয়স্থলেও বারংবার করিতে করিতেও যে অভিনেতার নৈতিক জীবনে একটুও ছাপ পড়ে না তাহা সম্ভব নহে। অভিনেত্রীগণের পক্ষেও ঠিক্ এই কথা প্রযুজ্য। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই, নৈতিক জীবনের অধোগতির সম্ভাবনা সত্বেও আজকাল আবার কেহ কেহ নটীশ্রেণীর দ্বারা অভিনয় করা-ইয়া তুষ্ট না হইয়া ভদ্রমহিলাগণকে এই পথে নামাইয়া জাতীয় জীবনকে ধ্বংসের পথে লইয়া যাইতে ও ভারতমহিলাদের সম্বন্ধে বিদেশীয়দের অন্যায় ও অসঙ্গত উক্তিকে সত্য বলিয়া প্রমাণ করিতে চাহিতেছেন; কারণ অভিনয়ের দ্বারা যে নৈতিক অবনতি হওয়া সম্ভব তাহা আমরা দেখিতে পাইতেছি।

যাঁহারা বলেন, পুরুষ নটগণের কি নৈতিক ক্ষতি হয় না—যত ক্ষতি কি নারীর বেলায়? তাঁহাদের বলি, কে বলে পুরুষ নটগণের ক্ষতি হয় না? কিন্তু পুরুষ বেশীর ভাগ বাহিরের কাজে ব্যাপৃত থাকে বলিয়াই পুরুষের বেলায় তত ক্ষতি হয় না যত ক্ষতি হয় গৃহলক্ষ্মী নারীর বেলায়।

নারীর উপর জাতিগঠনের ভার। শিশুর উপর মাতার প্রভাব যত অধিক এমন আর কাহারও নহে। আবার মানুষের উপর শৈশবকালের কার্য্য-কলাপাদির প্রভাবই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। মাতা যদি ধর্ম্মবলে চরিত্রবলে বলীয়সী না হন তবে শিশুকে উত্তরকালে যত ধর্ম্মোপদেশই দেওয়া হউক তাহার ধার্ম্মিক হইবার সম্ভাবনা অতি অল্প। সেই জন্যই প্রবাদ আছে যে, যেমন মা তার তেমনি ছেলে। অবশ্য মাতা সুচরিত্র হইলেই যে সন্তান দুশ্চরিত্র হইবে না আমরা তাহা বলি না, কিন্তু সেরূপ সম্ভাবনা খুব অল্প। তবে লোকের স্বভা-বতই মন্দের প্রতি আকর্ষণ থাকায় কখন কখন সেরূপ উদাহরণ পাওয়া যায়; কিন্তু সুচরিত্র মাতার সুচরিত্র পুত্রের উদাহরণই প্রচুর। কিন্তু দুশ্চরিত্র মাতার সুচরিত্র পুত্রের বিষয় সহস্রে একটী পাওয়া যায় ত যথেষ্ট।

যতজন পুরুষের চরিত্রের বল নাই, আজ যদি আমাদের দেশে ততজন নারীরও চরিত্রবল না থাকিত, তবে জাতিহিসাবে আমাদের নাম ধরাপৃষ্ঠ হইতে এতদিনে মুছিয়া যাইত! কিন্তু সৌভাগ্যের বিষয় আমাদের দেশ এখনও সে বিপদে পতিত হয় নাই—এখনও আমাদের দেশের নারীগণের ধর্ম্মবল, চরিত্রবল, পুরুষ অপেক্ষা যথেষ্ট অধিক। সেই জন্যই আজও এই দেশে অশিক্ষিত লোকও ধর্ম্মের মহিমা বুঝে—সেই জন্যই আজও এ জাতি অন্যান্য প্রাচীন জাতির ন্যায় লুপ্ত হইয়া যায় নাই।

দেশকে ধ্বংস হইতে রক্ষা করিবার জন্যই আমরা সাবধান করিয়া দিতেছি যে, ভদ্রমহিলা-

গণকে রঙ্গালয়ে নামাইবার ফল অতি মন্দ হইবে—ইহা দ্বারা দেশকে উৎসন্নের পথে লইয়া যাওয়া হইবে। এ বিষয়ে পাশ্চাত্যের অনুকরণ করিলে চলিবে না। পাশ্চাত্যদেশ স্বাধীন আমাদের দেশ পরাধীন। স্বাধীনদেশে যে সকল কাজ চলিতে পারে, পরাধীনদেশে তাহা চলিতে পারে না। স্বাধীনদেশে কোনও বিষয়ের অপব্যবহার দেখিলেই তাহা আইন করিয়া বন্ধ করা যায়—পরাধীনদেশে তাহা কখনই সম্ভব নহে। দেশ ধ্বংসের পথে যাইলেও—সকলে তাহা বুঝিতে পারিলেও—ইচ্ছা করিলেই স্বাধীন দেশের ন্যায় আইন করিয়া অধীনদেশের বিপদ ও পাপ দূর করা যায় না। তাহা যদি সম্ভব হইত তবে জাতি-বর্ণ-নির্ব্বিশেষে সকলেই আপত্তি করা সত্বেও, যে মদ আমাদের দেশকে ধ্বংসের পথে লইয়া চলিয়াছে তাহা কেন বন্ধ করা যাইতেছে না? তবে কেন আজও এই দেশে অবাধ বাণিজ্য চলিতেছে? এই-রূপ শত শত উদাহরণ দেওয়া যায়। কিন্তু আমেরিকা স্বাধীন বলিয়া দেশের মত হওয়া মাত্রই মদ্যবিক্রয় বন্ধ হইল, জার্ম্মাণীতে অবাধ বাণিজ্য রহিত হইল। সেই জন্য আমরা বলিতেছি যে, যাহাতে সামান্য মাত্রও অনিষ্টের আশঙ্কা আছে তাহা পাশ্চাত্যের অনুকরণে এই পরাধীন দেশে আনিলে দেশকে ধ্বংসের অভিমুখে লইয়া যাওয়া হইবে। আমাদের এই মজা দেখি যে, যেগুলি পাশ্চাত্যগণের সর্ববাদিসম্মত গুণ আমরা সেগুলি গ্রহণ করিবার চেষ্টা করি না; কিন্তু যেগুলিতে মতভেদ আছে—যেগুলিতে অনিষ্টের সম্ভাবনা আছে—যেগুলি মন্দ সুতরাং অনুকরণ করা সহজ, সেইগুলি এদেশে আনিবার চেষ্টা করিয়া দেশকে সর্ব্বনাশের পথে অগ্রসর হইতে সাহায্য করি। বঙ্গদেশে রঙ্গালয়ের সূত্রপাত হইতে যাঁহারা তাহার নিয়মিত দর্শক হইয়া আসিতেছেন তাঁহারাও বলেন, "নটীর কার্য্য আমাদের দেশে কুলাঙ্গনা-গণের মধ্যে প্রসার না হওয়াই প্রার্থনীয়।" ইঁহাদের সকলের মত ও বিবেকবুদ্ধির নিষেধ অগ্রাহ্য করিয়াও কি ক্ষণস্থায়ী সুখের অথবা ক্ষণ-স্থায়ী যশের লোভে দেশের চিরস্থায়ী একটী অমঙ্গল ডাকিয়া আনা ঠিক? মন্দ বিষয়ে না হয় পাশ্চাত্যের নকল না-ই হইল। সাধে কি বলে আমাদের মন দাসভাবে পূর্ণ? যে দেশের যুবক-গণের সম্মুখে বিরাট কর্ম্মক্ষেত্র পড়িয়া আছে—একজন সমস্ত জীবন ধরিয়া বিনিদ্র হইয়া কাজ করিলেও যে দেশে কার্য্যের শেষ হয় না, সেই দেশের যুবকগণ এখন কিনা আমোদপ্রমোদে অর্থো-পার্জ্জন করিতে চান? যে দেশের উন্নতিকল্পে শত শত ধর্ম্মবীর কর্ম্মবীরগণ স্বীয় শরীরের শেষ রক্তবিন্দু পর্য্যন্ত দান করিয়া গিয়াছেন, সেই দেশের কর্ম্মক্ষম যুবকগণ আজ কি না চান বিলাসের সুকোমল শয্যায় গা ঢালিয়া দিয়া রঙ্গালয়ে আস্ফালন করিয়া দেশোদ্ধার করিতে? দেশোদ্ধার করা কি এতই সহজ? কেবল দেশনেতার মৃত্যুতে শোকযাত্রা করিলে হইবে না, শোকসভায় উপস্থিত হইয়া চোখের জলের বড় বড় ফোঁটা ফেলিলে হইবে না, দেশনেতার মহৎ জীবনের অনুসরণ কর। অনুসন্ধান করিয়া দেখ, দেশনেতা যিনি, তিনি কখনই রঙ্গালয়ে অভিনয় দেখিয়া বা অভিনয় করিয়া দেশসেবায় প্রবুদ্ধ হন নাই, কিন্তু দেশের সত্য দুঃখ চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ করিয়াই তিনি ব্যথিত হইয়াছিলেন; রঙ্গালয়ের অভিনয় হইতে দেশের দুঃখ অনুভব করেন নাই।

বর্ষচিন্তা।

(শ্রীচিন্তামণি চট্টোপাধ্যায়)

পূর্ণ একটি বৎসর অনন্ত কালসাগরে বিলীন হইয়া গেল। আমরা আবার নববর্ষে প্রবেশলাভ করিয়াছি। কয়েক বৎসরের মধ্যে আমরা অনেকগুলি রত্নকে জলা-ঞ্জলি দিয়াছি। কর্ম্মী অশ্বিনীকুমার দত্ত, প্রতিভাসম্পন্ন রাসবিহারী ঘোষ, তারকনাথ পালিত ও সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর দেশ অন্ধকার করিয়া চলিয়া গিয়াছেন। গত পূর্ব্ববর্ষে বঙ্গের উজ্জ্বলতম রত্ন আশুতোষ মুখোপাধ্যায়, আশুতোষ চৌধুরী ও জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরমহাশয়কে হারাইয়াছি। গত বর্ষে বিসর্জ্জন দিয়াছি চিত্তরঞ্জন দাশ, সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, আর, জি, ভাণ্ডার-কর এবং ঋষিকল্প দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়কে। আরও হারাইয়াছি স্যর কে. জি গুপ্ত প্রবীণ সিভি-লিয়নকে, নাটোরাধিপতি জগদিন্দ্রনাথকে এবং বিনয়ী ও সৎসাহসী টাকীর জমিদার যতীন্দ্রনাথ রায়চৌধুরীকে। যে সমস্ত মহাজন বিদায় গ্রহণ করিয়া চলিয়া যাই-

তেছেন, দেশের দুর্ভাগ্য বশতঃ তাঁহাদের স্থান অধিকার করিবার লোক নাই। ইঁহারা চলিয়া গিয়াছেন, কিন্তু পশ্চাতে তাঁহারা কর্ম্মোদ্যমের উৎসাহের অনন্ত বীর্য্যের প্রতিভার ও বিনয়ের যে আদর্শ রাখিয়া গেলেন, তাহা ভাবী বংশীয়গণের অন্তরে চিরদিনের জন্য আশার আলোক বিস্তার করিতে থাকিবে; সকলেই আপন আপন জীবনকে সুগঠিত করিবার যথেষ্ট উপকরণ প্রাপ্ত হইবেন। বর্ষার জলোচ্ছ্বাসে নদীর দুই কূল ভাঙ্গিয়া যে মৃত্তিকাস্তূপ ভাসাইয়া লইয়া যায় তাহাতে দেশের আভ্যন্তরীণ কল্যাণ সাধিত হয় না বটে, কিন্তু নদীমুখে প্রকাণ্ড চর বিরচিত হয়। ঠিক তেমনই দেশের আদর্শ-স্থানীয় মহাজনগণ যখন চিরবিদায় গ্রহণ করিয়া চলিয়া যান, তখন সাময়িক ভাবে দেশের ক্ষতি হইলেও তাঁহাদের সমুন্নত জীবনের যে আলেখ্য পশ্চাতে রাখিয়া যান, তাহার ফলে নিজ দেশ ও নিজ সমাজ পরিপুষ্ট হইবার ও নবভাবে বিগঠিত হইবার যথেষ্ট উপাদান লাভ করে। মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়ের পরবর্ত্তী সময় হইতে এদেশে উল্লিখিত মহাজনগণের নবজীবনের স্পন্দনে চারিদিকে যে অভ্যুদয় পরিলক্ষিত হইয়াছে, তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই।

গত বর্ষের প্রথম উল্লেখযোগ্য বিষয় হইতেছে স্বাদেশিকতার প্রসার। অনেকে মনে করিয়াছিলেন যে দেশবন্ধুর মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে স্বরাজ্যদল অবসন্ন হইয়া পড়িবে, তাহার বলবীর্য্য ক্ষুণ্ণ হইয়া যাইবে। কিন্তু দেখিতেছি নানা প্রতিকূল অবস্থার সঙ্গে সংগ্রাম করিয়া স্বরাজ্যদল দিন দিন আপন প্রভাব বিস্তার করিতেছেন। বিলাতী বসন-ভূষণের চাকচিক্যের স্থলে দেশের হস্তজাত শিল্প আপন স্থান অধিকার করিয়া বসিতেছে। বেশবিন্যাসে সারল্য ও মিতব্যয়িতার পরিচয় দিন দিন পরিলক্ষিত হইতেছে।

সত্যের উপরে যাহার প্রতিষ্ঠা তাহার কোন দিন বিনাশ নাই, ইহাই আমাদের অন্তরের প্রগাঢ় বিশ্বাস। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের তিরোভাবের পূর্ব্বে আমরা তাঁহাকে বারবার বলিতাম যে, 'আপনি ত চলিলেন, কিন্তু ব্রাহ্মসমাজের কি হইবে—এমন অলন্ত আদর্শ আর কে দেখাইতে পারিবে?' তাহার উত্তরে তিনি আমাদের নিরাশার ভাব বিদূরিত করিবার জন্য বলিতেন যে, 'সত্যের বিনাশ নাই; নিশ্চয় জানিও সত্যের উপর যে ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রতিষ্ঠা, তাহা কখনও বিনষ্ট হইবে না। তাহা না হইলে রাজা রামমোহন রায়ের বোঝা কেন আমার স্কন্ধে আসিয়া পড়িবে? আমার সন্তানসন্ততি যদি সে ভাবে ব্রাহ্মসমাজ ও ব্রাহ্মধর্ম্মকে আশ্রয় না দেন, নিশ্চয় জানিও অন্য কেহ উত্থিত হইয়া এই ব্রাহ্মধর্ম্মকে রক্ষা করিবেন, ইহাতে কিছুমাত্র সন্দিহান হইও না।' তাঁহার অনন্ত বিশ্বাসের বাণী শুনিয়া আমরা স্তব্ধ হইয়া যাইতাম। আমাদের সর্ব্ববিধ অবিশ্বাস ও নিরাশার ভাব বিদূরিত হইয়া যাইত।

আমরা এখানে এইটুকু মাত্র বলিতে চাই যে, স্বাধীনতা মানবের জন্মগত অধিকার, কিন্তু সেই অধিকারের যোগ্যতা লাভ আমাদের সাধনাসাপেক্ষ। ভগবানের মঙ্গল বিধানে আমরা ইংরাজের সংস্পর্শে আসিয়াছিলাম। তাঁহাদের সংস্পর্শে যে আমরা কতকটা এই অধিকার লাভ করিয়াছি, তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। ইংরাজের শাসনে না আসিলে এত অল্প দিনের মধ্যে আমাদের দেশের ভাগ্যাকাশ সুপ্রসন্ন হইতে পারিত না। কিন্তু বালকের বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে অভিভাবকের শাসনদণ্ডের কাঠিন্য যেমন শিথিল করিবার বিশেষ আবশ্যক হয়, যাহাতে সে মুক্ত বায়ুতে বিহার করিবার যোগ্যতা লাভ করিতে পারে, অভিভাবকের সে দিকেও যেমন তীক্ষ্ণ দৃষ্টি থাকে, রাজার পক্ষেও তেমনি নিজের স্বার্থের প্রতি দৃষ্টি না রাখিয়া উদার ভাবে প্রজার মঙ্গলের জন্য বিধি-ব্যবস্থা প্রণয়নের প্রয়োজন; তাহা না হইলে প্রজার মনে কৃতজ্ঞতার সঞ্চার না হইয়া ঈর্ষা ও বিদ্বেষের ভাব জলিয়া উঠে।

এবার বর্ষশেষে হিন্দু-মুসলমানের লজ্জাকর বিরোধ-বিসংবাদ কলিকাতার রাজপথকে রক্তে কলঙ্কিত করিয়া তুলিয়াছিল। চারিদিকে এরূপ বিভীষিকার সঞ্চার হইয়াছিল যে, অনেক হিন্দু ও মুসলমান সহর ত্যাগ করিয়া পলায়ন করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। সপ্তাহব্যাপী যে অশান্তির সৃষ্টি হইয়াছিল, নববর্ষ সঞ্চারের পরেও তাহা শেষ হয় নাই। ফলে অনেক হিন্দু ও মুসলমান হত এবং আহত হইয়াছেন। এইরূপ খণ্ডযুদ্ধ কলিকাতার মধ্যে আর কখনও ঘটিয়াছে বলিয়া মনে হয় না। আর্য্যসমাজের শোভাযাত্রা বাহির হইয়াছিল, মসজিদের সম্মুখ দিয়া যাইবার সময় মুসলমানগণের ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটে ও তাহার ফলে পরস্পরের মধ্যে মারামারির সূচনা হয়; কিন্তু পরে আর্য্যসমাজ-সম্প্রদায় ছাড়াও অন্যান্য সমগ্র হিন্দুসম্প্রদায়ের উপরে কি জানি কোন্ কারণে সহসা মুসলমানের বিদ্বেষ প্রসারিত হইয়া পড়িল। হিন্দুর শিবালয় বিচূর্ণ হইল। প্রতিহিংসার কারণে মুসলমানের ভজনালয়ও বিধ্বস্ত হইল। হিন্দুর অন্যান্য দেবালয় আক্রমণ করিবার জন্য বিপুল আয়োজন চলিল। কিন্তু কলেজের যুবা ছাত্র, শিখ, হিন্দুস্থানী ও মাড়োয়ারীগণের সম্মিলিত চেষ্টায় তাহাদের সে প্রযত্ন ব্যর্থ হইয়া গেল। অনেকে এইরূপ অনুযোগ করেন যে, পুলিশ অধিকতর ঔদাস্যের পরিবর্ত্তে অধিকতর সতর্কতা

ও তৎপরতার পরিচয় দিলে এতগুলি হত্যা ও সাংঘাতিক মারপিট অনুষ্ঠিত হইতে পারিত না। ভাগ্যক্রমে হিন্দু ও মুসলমান সম্প্রদায়ের অধিকাংশ সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি এই সমস্ত গোলযোগের পৃষ্ঠপোষকতা করেন নাই। উভয় দলের গুণ্ডাগণই এই সকল অত্যাচারের জন্য প্রধানত দায়ী, ইহাই সকলের ধারণা।

সোমনাথের মন্দিরভঙ্গের পর হইতে প্রায় আট নয় শত বৎসর ধরিয়া মুসলমানগণের হস্তে কত শত হিন্দু ও বৌদ্ধ-মন্দির যে চূর্ণ-বিচূর্ণ হইয়াছে, আজ কে তাহার ইয়ত্তা করিবে? হিন্দুর উপর এই যে অনর্থক নিপীড়ন, ইহা অন্যান্য বিষয়ে সুসভ্য মুসলমানের যে ঘোর কলঙ্ক তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। কিন্তু আমাদের মনে হয় যে, মুসলমানের মসজিদভঙ্গে হিন্দুর অগ্রসর হওয়া এবারকার বিরোধের বিশেষত্ব। ব্যাপারটি যে ঘৃণার্হ ও লজ্জাকর তাহা কোন রকমেই অস্বীকার করা যায় না। কিন্তু দেবমন্দির রক্ষা প্রভৃতি কার্য্যে এবারে হিন্দুরা যে সাহসের পরিচয় দান করিয়াছেন তাহা অভিনব ও উভয় সম্প্রদায়েরই কল্যাণকর; এবং ইহা হইতে ভবিষ্যতে সবিশেষ আশা হয় যে, বাঙ্গালি হিন্দুগণ একদিন সাহসে ও শৌর্য্যে উন্নতি লাভ করিতে পারিবেন।

মহাত্মা গান্ধী একবার বলিয়াছিলেন যে, হিন্দু ও মুসলমান পরস্পরের মধ্যে নিজ নিজ বলের পরীক্ষা দিবার অবসর না পাইলে উভয়ে স্ব-স্ব অধিকার স্থির করিয়া লইতে পারিবে না। উত্তর ও পূর্ব্ববঙ্গে আজ কয়েক বৎসর ধরিয়া মুসলমানের হস্তে হিন্দু-নারীনির্য্যাতনের সংবাদ পাওয়া যাইতেছে। এই সকল স্থলে পুলিস-নিরপেক্ষ ও আদালত-নিরপেক্ষ আত্মবল প্রয়োগের প্রয়োজন আছে বলিয়া আমাদের মনে হয়; তাহা না হইলে এ সমস্ত নির্য্যাতনের অবসান হইবে না। পরস্পরের বল যখন পরস্পরে বুঝিতে পারিবে তখন হইতেই প্রকৃত শান্তি প্রতিষ্ঠার সুযোগ ঘটিবে।

কলিকাতাব্যাপী এই অরাজকতার স্থলে বর্ত্তমানে শৃঙ্খলা স্থাপিত হইয়াছে। পুলিশ ও গোরাসৈন্যের সমাবেশই এই শান্তিস্থাপনের অন্যতম কারণ। ভবিষ্যতে যাহাতে উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে আবার সখ্য স্থাপিত হয় তাহার জন্য উভয় দলের নেতারা যথেষ্ট চেষ্টা করিতেছেন, তজ্জন্য তাঁহারা আমাদের কৃতজ্ঞতাভাজন। আমরা হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে শান্তি ও মিলনের প্রয়াসী। শান্তির রাজ্য প্রতিষ্ঠা করাই ধর্ম্মের একমাত্র লক্ষ্য। তবে এইরূপ অশান্তির ভিতর দিয়াই যে শান্তির প্রতিষ্ঠা হইয়া থাকে, ইহাও স্মরণে রাখিতে হইবে।

বিগত বৎসরে তিন ব্রাহ্মসমাজের কার্য্য পূর্ব্ববৎ চলিয়া আসিয়াছে। পরস্পরের মধ্যে মিলনের ভাব অগ্রসর হইতেছে। কিন্তু অর্থাভাব ও আন্তরিকতার অভাব সকল দলই অনুভব করিতেছেন। মফঃস্বলস্থ ব্রাহ্মসমাজগুলিও বিপন্ন; অর্থাভাবে প্রচারকদিগকে পোষণ করিতে অক্ষম হইয়া পড়িতেছেন। ইহা নিতান্ত দুঃখের কথা বলিতে হইবে। কিন্তু ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রভাব ধীরে ধীরে শিক্ষিতগণের হৃদয়ে যে স্থায়ী আসন বিস্তার করিতেছে, তাহা আমরা প্রত্যক্ষ করিতেছি। ভগবানের করুণার উপরেই আমাদের সমধিক নির্ভর। তাঁহার মঙ্গলবিধানে আমাদের সর্ব্ববিধ অভাব বিদূরিত হইবে; সমগ্র দেশে শান্তির রাজ্য ও জাতিনির্বিশেষে ভ্রাতৃভাব সুপ্রতিষ্ঠিত হইবে, ইহাই আমাদের বিশ্বাস।

সাংখ্যে ঈশ্বরবাদ।

(অধ্যাপক ৺অভয়কুমার মজুমদার এম-এ লিখিত ইংরাজী নিবন্ধের শ্রীযতীন্দ্রকুমার মজুমদার এম-এ, পি. এইচ-ডি কৃত অনুবাদ)

ঈশ্বরাস্তিত্বের সাক্ষাৎ প্রমাণ।

আমরা পূর্ব্বে 'সাংখ্যপ্রবচন-সূত্রের' যে সূত্রগুলিতে ঈশ্বরের অস্তিত্ব অস্বীকার করা হইয়াছে বলিয়া মনে হয়, কেবল সেই সূত্রগুলিই পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছি। কিন্তু আরও অন্যান্য সূত্র আছে, যেগুলি ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করিয়াছে বলিয়াই মনে হয়; সুতরাং তাহারা ঈশ্বরের অস্তিত্বের স্পষ্ট প্রমাণ দিতেছে। আমরা এক্ষণে সেই সূত্রগুলির বিচার ও আলোচনা করিয়া দেখিব।

(ক) আমরা পূর্ব্বেই দেখাইয়াছি যে, সাংখ্য-প্রবচনের ৯৬ ও ৯৯ সূত্রে ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকৃত হইয়াছে। কিন্তু এ সম্বন্ধে অধিকতর দৃঢ় ও স্পষ্ট প্রমাণ দিতে পারে এই প্রকার আরও অন্য সূত্র আছে। "সহি সর্ব্ববিৎ সর্ব্বকর্ত্তা" ও "ঈদৃশেশ্বরসিদ্ধিঃ সিদ্ধা" (সাংখ্যপ্রবচনসূত্র, ৩য় অধ্যায়—সূঃ ৫৬ ও ৫৭), এই দুইটী সূত্র দেখা যাউক। এই সূত্র দুইটীর মধ্যে প্রথম সূত্রটীর অর্থ পরিষ্কাররূপে বুঝিবার জন্য ইহাকে ইহার পূর্ব্ববর্ত্তী দুইটী সূত্রের সহিত একত্র পাঠ করিতে হইবে। সে সূত্র দুইটী এই—"ন কারণলয়াৎ কৃতকৃত্যতা মগ্নবদুত্থানাৎ", ও "অকার্য্যত্বেঽপি তদ্‌যোগঃ পারবশ্যাৎ"। প্রথমটীর অর্থ—"কারণরূপা প্রকৃতিতে লীন হইলেও কৃতকার্য্যতা নাই অর্থাৎ উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয় না; কারণ, জলেতে মগ্ন ব্যক্তির উত্থানের ন্যায় পুনরায় উত্থান আছে।" দ্বিতীয়টীর অর্থ—"যদিও প্রকৃতি কার্য্য অর্থাৎ কোনও কিছু হইতে উৎপাদ্য বস্তু নহে, অথবা অপরের দ্বারা স্বকার্য্যে প্রণোদিতও নহে, তথাপি তাহার পুনরুত্থান অপরের

অধীনতা হইতেই সম্ভূত।" এখন প্রশ্ন হইতে পারে, প্রকৃতি কাহার অধীন? বিজ্ঞানভিক্ষু অর্থ করিয়াছেন—"পারবশ্যাৎ পুরুষার্থতন্ত্রত্বাৎ। বিবেকখ্যাতিরূপ-পুরুষার্থ-বশেন প্রকৃত্যা পুনরুত্থাপ্যতে স্বলীন ইত্যর্থঃ", অর্থাৎ "'পারবশ্য' অর্থে পুরুষের উদ্দেশ্যরূপ শাসনের অধীনতা হেতু। (প্রকৃতি-পুরুষ-) বিবেক-প্রকাশরূপ পুরুষের উদ্দেশ্যের অধীনতা হেতু প্রকৃতির মধ্যে লীন ব্যক্তি পুনরায় প্রকৃতির দ্বারাই উত্থাপিত হয়। ইহাই তাৎপর্য্য"। 'পারবশ্য' পদের যে 'পুরুষার্থতন্ত্রত্ব' অর্থাৎ 'পুরুষের উদ্দেশ্যরূপ শাসনাধীনত্ব' বলিয়া অর্থ করা হইয়াছে, তাহা একেবারে অস্বাভাবিক। 'পারবশ্য' শব্দটী 'পরবশ' শব্দ হইতে উৎপন্ন, এবং এই পরবশ (পর = অন্য + বশ = অধীন হওয়া) শব্দের অর্থ অপরের অধীন; সুতরাং পারবশ্য-শব্দের অর্থ—'অন্যের নিকট অধীনতা' হওয়াই উচিত। অনিরুদ্ধ অবিকল এই অর্থই করিয়াছেন। কারণ, 'পারবশ্যাৎ' শব্দের অর্থ তিনি করিয়াছেন—'পরতন্ত্রত্বাৎ' অর্থাৎ অপরের নিকট অধীনতা হেতু এবং 'পর' পদটীর তিনি অর্থ করিয়াছেন 'আত্মা'। এখন প্রশ্ন হইতেছে যে প্রকৃতি এই যে আত্মার অধীন, সেই আত্মা কে? পরবর্ত্তী সূত্রে ইহার উত্তর দেওয়া হইয়াছে—'সহি সর্ব্ববিৎ সর্ব্বকর্ত্তা', অর্থাৎ 'তিনি সবই জানেন এবং সবই করেন—সর্ব্বজ্ঞ ও সর্ব্বকর্ত্তা'। এখানে 'সঃ' অর্থাৎ তিনি—এই শব্দের দ্বারা স্পষ্টতঃই ঈশ্বরই বুঝায়; কারণ একমাত্র ঈশ্বরই সকল জানিতে পারেন ও সকল করিতে পারেন। কিন্তু বিজ্ঞানভিক্ষু ইহার ভিন্নরূপ অর্থ করিয়াছেন। তিনি বলেন—"সহি পূর্ব্বসর্গে কারণলীনঃ সর্গান্তরে সর্ব্ববিৎ সর্ব্বকর্ত্তেশ্বর আদিপুরুষো ভবতি প্রকৃতিলয়ে তস্যৈব প্রকৃতিপদপ্রাপ্ত্যৌচিত্যাৎ", অর্থাৎ "কারণ, যিনি পূর্ব্বসৃষ্টিতে প্রকৃতিরূপ কারণেতে লীন ছিলেন, পরসৃষ্টিতে তিনি সর্ব্বজ্ঞ ও সর্ব্বকর্ত্তা ঈশ্বরস্বভাবাপন্ন আদিপুরুষ হয়েন; কারণ, তাঁহার প্রকৃতিতে লীন হওয়া হেতুই প্রকৃতিপদ প্রাপ্তি তাঁহারই পক্ষে উপযুক্ত"। সুতরাং 'সঃ' অর্থাৎ 'তিনি' এই শব্দে বিজ্ঞান পুরুষকেই বুঝেন, ঈশ্বরকে মোটেই নয়। কিন্তু এই অর্থের দ্বারা বিজ্ঞান কয়েকটী ভীষণ ভুল করিয়াছেন। যে সকল পুরুষ মুক্তিলাভ করে না, প্রলয়কালে তাহারাই প্রকৃতিতে লীন হয়—মুক্তপুরুষেরা হ'ন না, এবং কেবল অমুক্ত (বা বদ্ধ) পুরুষেরাই পরবর্ত্তী সৃষ্টিতে উত্থিত হয় এবং তাহাদের পূর্ব্বসংস্কার অনুসারে কাজ করিতে থাকে। এখন প্রশ্ন হইতেছে—যাহারা এখনও বদ্ধ, এখনও যাহারা আত্মজ্ঞান লাভ করে নাই, সেই সকল অমুক্ত পুরুষেরা কিরূপে সর্ব্বজ্ঞ ও সর্ব্বকর্ত্তা ঈশ্বর হইতে পারে? অধিকন্তু 'সঃ' পদটী একবচনান্ত, সুতরাং ইহাতে মাত্র একজন পুরুষকেই বুঝায়। এখন জিজ্ঞাস্য এই যে, এই অসংখ্য পুরুষের মধ্যে কোন্ পুরুষটী সর্ব্বজ্ঞ ও সর্ব্বকর্ত্তা ঈশ্বর? হয় সকলেই ঈশ্বর হইবে, নতুবা কেহই হইবে না। আবার বিজ্ঞান পরবর্ত্তী সূত্রের ব্যাখ্যা করিবার সময় নিজেই স্বীকার করিয়াছেন যে, সান্নিধ্য হেতু এক নিত্য ঈশ্বরের প্রমাণ আছে বলিয়া শ্রুতি ও স্মৃতি সর্ব্বত্রই স্বীকৃত হইতেছে। (সান্নিধ্যমাত্রেশ্বরস্য সিদ্ধিস্তু শ্রুতিস্মৃতিষু সর্ব্বসম্মতেত্যর্থঃ)। সেই পরবর্ত্তী সূত্রটী এই—"ঈদৃশেশ্বরসিদ্ধিঃ সিদ্ধা", অর্থাৎ "এইরূপ ঈশ্বরের অস্তিত্ব সিদ্ধ বা প্রমাণিত"। 'ঈদৃশ' শব্দটী পূর্ব্ব সূত্রের সহিত এই সূত্রের সম্বন্ধ স্থাপন করিয়া বুঝাইতেছে যে 'এইরূপ' অর্থাৎ সর্ব্বজ্ঞ ও সর্ব্বকর্ত্তা। কিন্তু বিজ্ঞান 'সঃ' পদটীর যেরূপ অর্থ করেন তাহাতে এই দুইটী সূত্র পরস্পর বিচ্ছিন্ন বা অসম্বদ্ধ হইয়া পড়ে। কারণ, যদি 'সঃ'-পদটী পুরুষকে বুঝায়, তাহা হইলে 'সর্ব্বজ্ঞ' ও 'সর্ব্বকর্ত্তা' এই পদ দুইটী পুরুষেরই বিশেষণ হইয়া পড়ে, এবং দ্বিতীয় সূত্রের ঈশ্বরের বিশেষণ হইতে পারে না। তাহাই যদি হয়, তাহা হইলে 'ঈদৃশ' শব্দটী হয় অর্থহীন হইয়া পড়ে, নতুবা ইহার কোনও অস্বাভাবিক অর্থ করিতে হয়। এই সকল বিচার হইতে আমরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হই যে, 'সঃ'-পদটী ঈশ্বরকেই বুঝাইতেছে।

অনিরুদ্ধও উক্ত (৫৬) সূত্রটীর অবিকল এইরূপ অর্থই করিয়াছেন। তিনি বলেন, "পরঃ আত্মা কিংরূপঃ? ইত্যত্র আহ,—'সহি সর্ব্ববিৎ সর্ব্বকর্ত্তা'॥ প্রকৃতিপ্রতিবিম্বিতত্বাৎ এবম্ অভিমানঃ"। অর্থাৎ কেহ জিজ্ঞাসা করিতে পারে "'পর আত্মা কিরূপ?' ইহার উত্তরে সূত্রকার বলিতেছেন—'তিনি সর্ব্বজ্ঞ ও সর্ব্বকর্ত্তা'। এই অভিমান অর্থাৎ আত্মোপলব্ধি বা আত্মস্বরূপজ্ঞান প্রকৃতিতে প্রতিবিম্বিত হওয়াতেই উদিত হইতেছে বা হয়"। ৫৭ সূত্রটীর অনিরুদ্ধ এইরূপ অর্থ করিয়াছেন—"তাত্ত্বিকম্ এব কর্তৃত্বং ভবতু, কিং প্রতিবিম্বকল্পনয়া? তথা চ ন্যায়াভিমতঃ এব ঈশ্বরঃ অস্তি? ইত্যত্রাহ—যদি অস্মদভিমতঃ আত্মা ঈশ্বরঃ, ভবতু। ন্যায়াভিমতে চ প্রমাণং নাস্তি। এতচ্চ প্রথমাধ্যায়ে 'ঈশ্বরাসিদ্ধেঃ' ইতি সূত্রে বর্ণিতম্। দ্বিতীয়াধ্যায়ে 'বিমুক্তবিমোক্ষার্থম্' ইতি সূত্রে স্বার্থং পরার্থঞ্চ প্রধানপ্রবৃত্তিঃ ইতি উক্তম্। অত্র স্বার্থস্য গৌণত্বম্।" অর্থাৎ "আত্মার কর্তৃত্ব প্রতিবিম্ব না হইয়া বাস্তবিকই হউক না কেন? কারণ, কেহ ত প্রশ্ন করিতে পারে যে কর্তৃত্বকে প্রতিবিম্ব মনে করিবার কি আবশ্যক? সুতরাং ইহা হইতে পাওয়া যায় যে ন্যায়দর্শনে যে ঈশ্বরের ধারণা করা হইয়াছে তিনিই আছেন। এই সম্বন্ধে সূত্রকারের অভিপ্রায় এই—ইহা দ্বারা যদি তোমার এই কথা বলিবার ইচ্ছা থাকে যে আমাদের ধারণার বিষয়ী-

ভূত আত্মাই ঈশ্বর, তাহা হইলে তাহাই হউক। কিন্তু ন্যায়দর্শনে যেরূপ ঈশ্বরের কথা বলা হইয়াছে সেরূপ ঈশ্বরের অস্তিত্বের কোনও প্রমাণ নাই। এই কথাই প্রথম অধ্যায়ের ৯২ সূত্রে বলা হইয়াছে—'কারণ ঈশ্বর প্রমাণের বিষয় নহেন', এবং দ্বিতীয় অধ্যায়ের প্রথম সূত্রেও বলা হইয়াছে—'প্রকৃতির কর্তৃত্ব বা জনয়িতৃত্ব হয় মুক্ত-পুরুষদিগের মুক্তির জন্য, নতুবা তাহার নিজেরই জন্য'।" এস্থলে অনিরুদ্ধ স্পষ্টই স্বীকার করিয়াছেন যে ৫৬ সূত্রে আত্মার যে কথা বলা হইয়াছে, এবং প্রকৃতিমধ্যে প্রতিবিম্বিতত্ব হেতু সর্ব্বজ্ঞ ও সর্ব্বকর্তৃরূপে তিনি যে আত্মার ধারণা করিয়াছেন—তিনিই ঈশ্বর। তিনি কেবল ন্যায়দর্শনে যে ঈশ্বরের কথা বলা হইয়াছে—যিনি বস্তুতই সর্ব্বজ্ঞ ও সর্ব্বকর্ত্তা কিন্তু প্রতিবিম্বিতরূপে নহেন—তাঁহারই অস্তিত্ব অস্বীকার করেন। ইহার সহিত পঞ্চম অধ্যায়ের ১১৬ সূত্রটীও বিবেচনা করিতে হইবে—সূত্রটী এই—"সমাধি-সুষুপ্তি-মোক্ষেষু ব্রহ্মরূপতা।" অর্থাৎ "সমাধি, সুষুপ্তি ও মোক্ষের অবস্থায় পুরুষ ব্রহ্মরূপে (ঈশ্বররূপে) অবস্থিতি করেন"। এখানে 'ব্রহ্মরূপতা' এই শব্দটী বিশেষরূপে লক্ষ্য করিতে হইবে। ইহার যথার্থ অর্থ কি? অনিরুদ্ধ এইরূপ অর্থ করিয়াছেন—"ব্রহ্মণা সহ তুল্যরূপতা, সর্ব্বত্র বাহ্যাসংবেদসাৎ, ন তু ব্রহ্মরূপতা", অর্থাৎ "ব্রহ্মের সদৃশ রূপ প্রাপ্তির অবস্থা, যেহেতু তখন সর্ব্বত্রই বাহ্যবস্তুজ্ঞানের অভাব ঘটে—কিন্তু ব্রহ্মত্বপ্রাপ্তির অবস্থা নহে।" বৈদান্তিক মহাদেব ইহার অর্থ করেন—"ব্রহ্মরূপপ্রাপ্তির অবস্থা" অর্থাৎ "বেদনার অনহুভূতি।" বিজ্ঞানভিক্ষু অর্থ করেন—"ব্রহ্মরূপতা বুদ্ধিবৃত্তিবিলয়তস্তদৌপাধিক-পরিচ্ছেদ-বিগমেন স্বস্বরূপপূর্ণতয়াবস্থানম্"। অর্থাৎ, "ব্রহ্মরূপতার অর্থ নিজ স্বরূপে বা নিজ যথার্থরূপে পূর্ণ হইয়া অবস্থান, কারণ বুদ্ধিবিকারের বিলয় হওয়ায় বুদ্ধি-বিকারজনিত যে ঔপাধিক বা বাহ্যধর্ম্মারোপরূপ পরিচ্ছেদ বা গণ্ডী, তাহাও বিলীন হয়।" ইনি আরও বলেন—"অস্মচ্ছাস্ত্রে চ ব্রহ্মশব্দ ঔপাধিকপরিচ্ছেদ-মালিন্যাদিরহিত-পরিপূর্ণচেতন-সামান্যবাচী, ন তু ব্রহ্মমীমাংসায়ামিবৈশ্বর্য্যোপলক্ষিতপুরুষমাত্রবাচীতি বিবেক্তব্যম্"। অর্থাৎ "এবং আমাদের শাস্ত্রে 'ব্রহ্ম'-শব্দটী বুঝায় সাধারণতঃ সচেতন বা বুদ্ধিবিশিষ্ট সত্তা—যাহা স্বয়ং সম্পূর্ণ এবং উপাধিকৃত বা বহিরারোপিত গণ্ডী, মলিনতা প্রভৃতি বর্জ্জিত; কিন্তু ইহাতে বেদান্তের ন্যায় সর্ব্বেশ্বরত্বলক্ষণলক্ষিত সেই বিশিষ্ট পুরুষকে (ঈশ্বরকে বা ব্রহ্মকে) বুঝায় না, এই পার্থক্য মনে রাখিতে হইবে।" উপরি-উক্ত সূত্রটীতে অন্ততঃ অনিরুদ্ধ ও মহাদেব স্বীকার করিয়াছেন যে, সাংখ্যকার ব্রহ্ম বা ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করেন—যে ঈশ্বর বা ব্রহ্মের ভাব বা তদনুরূপ ভাব পুরুষ সমাধি, সুষুপ্তি ও মোক্ষ অবস্থায় প্রাপ্ত হয়—যে অবস্থায় পুরুষ উপাধিকৃত সীমার বন্ধন বা বহিরাবরণ হইতে মুক্ত। ইহা দ্বারা আরও প্রমাণ হয় যে পুরুষ বস্তুতঃ ব্রহ্ম বা ঈশ্বর হইতে ভিন্ন নহে, কিন্তু পুরুষ কেবল উপাধি বা বহিরাবরণ দ্বারা মণ্ডিত হইয়াই, অর্থাৎ প্রকৃতি ও তাহার বিকৃতির সহিত যুক্ত হইয়াই ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন হয়। এই স্বীকারোক্তিগুলি আমরা একটু অবহিতভাবে বিচার করিলে সহজেই দেখিতে পাই যে, ঈশ্বর বা ব্রহ্ম নামে কেবল একমাত্র পুরুষই আছেন এবং তিনি প্রকৃতির সহিত মিলিত হইয়া ভিন্ন ভিন্ন রূপ গ্রহণ করেন এবং তদ্দ্বারা সংখ্যাতীত জীব বা পুরুষরূপে আপনাকে বহুধা প্রতিপন্ন করেন। বিজ্ঞানভিক্ষুর ব্যাখ্যা ভ্রান্ত বলিয়া মনে হয়; কারণ, তাঁহার ব্যাখ্যানুসারে সমাধি, সুষুপ্তি ও মোক্ষাবস্থায় যদি পুরুষই (জীবই) ব্রহ্মরূপতা প্রাপ্ত হয়, তাহা হইলে তাহাদের মধ্যে তখন কি প্রভেদ থাকে? সে ক্ষেত্রে তাহারা কি একেবারে এক হইয়া যায় না? তাহারা এক হইলে কিরূপে বহুত্ব থাকিতে পারে? পার্থক্য বা প্রভেদ হইতেই বহুত্ব, এবং প্রভেদাভাবে বহুত্ব থাকিতে পারে না। সুতরাং বিজ্ঞানের নিজের ব্যাখ্যাই আমাদিগকে এই তত্ত্বে উপনীত করে যে, সকল জীবই (পুরুষই) বস্তুতঃ এক ও অভিন্ন, অর্থাৎ তাহারা একই পুরুষের (ব্রহ্মের) বিভিন্ন প্রকাশ মাত্র। ব্রহ্ম বা ঈশ্বররূপী একমাত্র পুরুষই আপনাকে বহুধা করিয়া জীবনামধারী সংখ্যাতীত পুরুষরূপে প্রতিভাত হইতেছেন; সুতরাং বিজ্ঞানের ব্যাখ্যার শেষাংশটীও ঐরূপ ভ্রান্ত।

বৈদান্তিক মহাদেব 'স হি' শব্দে 'প্রকৃতিপদার্থই' বুঝেন। ইহা আরও অসম্ভব। তিনি মনে করেন যে, অচেতন প্রকৃতির অধ্যক্ষরূপে একটা সচেতন পুরুষের প্রয়োজন এবং সেই সচেতন পুরুষের সর্ব্বজ্ঞ ও সর্ব্বকর্ত্তা হওয়া চাই-ই—এই মতবাদটী বর্ত্তমান সূত্রে সূত্রকার খণ্ডন করিয়াছেন। তিনি আরও বলেন যে প্রকৃতির পরিণামপ্রাপ্তির স্বভাব থাকায় ইহা সম্পূর্ণ সম্ভব যে, প্রকৃতি জ্ঞানের পরিণামরূপে পরিবর্ত্তিত হইতে পারে, এইরূপই ইহার তাৎপর্য্য। কিন্তু এরূপ অনুমান আদৌ কিরূপে হইতে পারে তাহা বুঝা কঠিন। আমরা পূর্ব্বেই দেখিয়াছি যে, ইহার ঠিক অব্যবহিত পূর্ব্বসূত্রে (৫৫সূঃ) প্রশ্ন উঠিয়াছে—প্রকৃতি কাহার অধীন? এবং তাহার উত্তর এই সূত্রে দেওয়া হইয়াছে। অনিরুদ্ধ ও বিজ্ঞান উভয়েরই এই মত। সুতরাং মহাদেবের অনুমান সম্পূর্ণ অসঙ্গত ও অযৌক্তিক; কারণ তাহা হইলে এই সূত্রটী ও পূর্ব্ববর্ত্তী সূত্রটী একেবারে অসংলগ্ন হইয়া পড়ে। আরও একটী বৈষম্য ঘটে যে, অচেতন প্রকৃতি কিরূপে

সর্ব্বজ্ঞ হইতে পারে? মহাদেবের ব্যাখ্যা বড় অদ্ভুত। তিনি বলেন যে যেহেতু কেবলমাত্র প্রকৃতিই পরিণাম-স্বভাবা, সুতরাং সে নিজেকে চেতনরূপে, অতএব সর্ব্বজ্ঞরূপে, পরিণত করিতে পারে। কিন্তু মহাদেব ভুলিয়া যাইতেছেন যে প্রকৃতি কেবল নিজের প্রকৃত স্বভাবের সহিত সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়াই নিজেকে পরিবর্ত্তিত করিতে সক্ষম, এবং প্রকৃতি অচেতনস্বভাব হওয়ায় নিজেকে এইরূপে পরিবর্ত্তিত করিতে পারে না যাহাতে সে চেতনস্বভাবা হইতে পারে; কারণ, তাহা হইলে ইহাতে পরিণতি বা ক্রমবিকাশের নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটে। অবশ্য এখানে প্রশ্ন উঠিতে পারে যে, চেতনস্বভাব মহৎ বা বুদ্ধি তাহা হইলে কিরূপে প্রকৃতির সর্ব্বপ্রথম পরিণাম হয়? প্রকৃতি স্বয়ং যদি অচেতন বা জড়স্বভাবা হয়, তাহা হইলে সে কিরূপে চেতনকে উৎপন্ন করিতে পারে? ইহার উত্তর এই যে, সাংখ্যদর্শনের ইহা একটী স্বতঃসিদ্ধ মত যে, প্রকৃতির বিপরিণাম চেতনরূপী পুরুষের সহিত সংযোগ বশতঃই ঘটিয়া থাকে, সুতরাং প্রকৃতির চেতনা আভাসরূপিণী (apparent)—বাস্তব (real) নহে, অর্থাৎ একটী জবাফুল কোন স্ফটিকের গাত্রে প্রতিবিম্বিত হইলে স্ফটিকের গাত্রটী যেমন লোহিত দেখায়, কিন্তু ঐ লৌহিত্য স্ফটিকের বাস্তব সম্পত্তি নয়; সেইরূপ পুরুষের চেতনা বা বুদ্ধি প্রকৃতির উপর প্রতিবিম্বিত হওয়াতেই প্রকৃতিকে চেতনরূপিণী বলিয়া বোধ হয়; সুতরাং প্রকৃতির চেতনা ধারকরা—আভাসময়ীমাত্র, তাহার প্রকৃত স্বভাব অচেতন। (ইহাই সাংখ্যমতের সাধারণ লৌকিক ব্যাখ্যা, কিন্তু আমরা পরে দেখাইব যে ইহার একটী নিগূঢ় তাৎপর্য্য আছে।)। কিন্তু আরও আপত্তি হইতে পারে যে, প্রকৃতি চেতনস্বভাব প্রাপ্ত হইবার পর সর্ব্বজ্ঞাও হইতে পারে; কিন্তু তাহা অসম্ভব। কারণ, 'সর্ব্বজ্ঞ' শব্দের অর্থ যিনি সবই জানেন, এবং প্রকৃতিকে সর্ব্বজ্ঞা হইতে হইলে তাহার একথা অবশ্যই জানিতে হইবে যে সর্ব্বজ্ঞা হইবার পূর্ব্বে প্রকৃতি কিছুই জানিত না—সে অচেতন ও জড়স্বভাবা ছিল—অর্থাৎ চেতনসম্পন্না ও জ্ঞানস্বভাবা হইবার পূর্ব্বে প্রকৃতি চেতনসম্পন্না ও জ্ঞানস্বভাবাই ছিল—এ যুক্তি একেবারেই অসম্ভব ও স্ববিরোধী। এই সকল কারণে আমরা মহাদেবের ব্যাখ্যা পরিহার করিব ও অনিরুদ্ধ যেরূপ বলিয়াছেন সেইরূপ বলিব যে 'স'-শব্দে পরমাত্মা বা ঈশ্বরকেই বুঝায়, প্রকৃতিকে নহে।

সুতরাং আমরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারি যে, প্রকৃতি যে আত্মার অধীন থাকিয়া ও যাঁহার প্রভাবে প্রভাবান্বিত হইয়া পুনরাবির্ভূত হন এবং সৃষ্টি করেন, সেই আত্মা সর্ব্বজ্ঞ ও সর্ব্বকর্ত্তা ঈশ্বর ব্যতীত আর কেহই নহেন। এখানে প্রশ্ন হইতে পারে যে, শ্রুতিবাক্যানুযায়ী সাংখ্য বলেন যে ঈশ্বর নিষ্ক্রিয়; সুতরাং কিরূপে তিনি সর্ব্বকর্ত্তা হইতে পারেন? উত্তর এই যে, প্রকৃতি ঈশ্বরের প্রভাবে ও পরিচালনাতেই কার্য্য করে বলিয়া ঈশ্বরকে অন্ততঃ পরোক্ষ ভাবেও, সর্ব্বকার্য্যের ও সর্ব্বকর্ত্তৃত্বের মূল উৎস বলা যাইতে পারে, যেরূপ রাজা যুদ্ধ করিতেছেন বলা হয় (সাংখ্যের দৃষ্টান্ত)—যদিও তিনি বাস্তবিক যুদ্ধ করেন না, তাঁহার সৈন্যেরাই তাঁহার আজ্ঞাধীনে, তাঁহারই পরিচালনায় যুদ্ধ করে। ইহাই ইহার সাধারণ উত্তর; কিন্তু আমি পরে প্রমাণ করিব যে ঈশ্বরই প্রকৃত কর্ত্তা—প্রকৃতি কেবল তাঁহার হস্তের যন্ত্রমাত্র।

ভ্রান্ত পথিক।

(শ্রীপঞ্চানন রায়)

আরোহিয়া রুদ্ধবাজী
কর্ণধারমুক্ত মনোরথে,
অন্ধসম ফিরিলাম
জীবনের সুদুর্গম পথে;

লক্ষ্যহীন ভ্রমিয়াছি
অভ্রচুম্বী নগরাজশিরে
সুনিবিড় বনরাজি-
অভ্যন্তরে পশিয়াছি ধীরে।

আঁখির আদেশে আমি
শুনি নাই প্রাণের আহ্বান,
মোহাবেগপূর্ণচিতে
মানি নাই বিশ্বের বিধান।

শুধু যাহা ক্ষণতরে
উঠেছিল চিত্তে জেগে মোর—
সেই ক্ষণিকের নেশা
করেছিল অন্তর বিভোর।

ভাবি নাই, বুঝি নাই—
ছুটিয়াছি শুধু তারি আশে,
স্তব্ধ আজি হেরি তারে
সমুদ্যত মোর সর্ব্বনাশে।

বহু দুঃখ ভুঞ্জিয়াছি
বাধা বহু করেছি লঙ্ঘন
কিন্তু হায় বৃথা হেরি
আমরণ মম পর্য্যটন।

অগ্রগামী শত সাথী
　　হর্ষে করে পাথের সঞ্চয়,
পথভ্রান্ত শ্রান্ত আমি
　　সর্ব্বহারা ! ফিরি বিশ্বময় ।

কত ক্লেশ-ঘনঘটা
　　ক্ষেত্র কত করেছে উজ্জ্বল,
অনুর্ব্বর ক্ষেত্রে মোর
　　সর্ব্বচেষ্টা হয়েছে বিফল ।

অভিজ্ঞতা অজ্ঞতার
　　পরিণত—অপূর্ব্ব সন্দেশ !
এ বিচিত্র ইতিহাস
　　শুনে নাই কভু কোন দেশ ।

বিঘ্নবাহী যে বিভ্রম
　　ঘটাইল এ দৃঢ় প্রমাদ,
প্রাণ চাহে তার সনে
　　ঘটাইতে চিরস্থায়ী বাদ ।

তাই আজি এ দুর্দ্দিনে
　　সিন্ধুবক্ষে হয়ে মজ্জমান
তরিবারে পারাবার
　　প্রাজ্ঞ কর্ণধার চাহে প্রাণ ।

এ সঙ্কটে বন্ধু তুমি
　　শুনি মম কাতর আহ্বান—
শ্রেষ্ঠ প্রদর্শকরূপে
　　ধরি' পথ হও আগুয়ান ।

ব্রহ্মসঙ্গীত-স্বরলিপি ।

মিশ্র বারোয়াঁ—দাদ্‌রা ।

তোমার দয়া চাই জননী
　　তোমার দয়া চাই
অঙ্গে আমার নাই শকতি
　　ভকতি-মোর নাই ।
কতবারই আলম্ব বাতি
　　নিভে গেল ঝড়ে—
　　পরাণ কাঁপে ডরে,
এবার আমি জেনেছি ঠিক্
　　আর গতি মোর নাই
তোমার অমল চরণ বিনা
　　সকলি বৃথাই ।

তোমার দয়া ঝরুলে পরে
মরুর বুকে নিঝর ঝরে
শুষ্ক তরু মুঞ্জরে সে
　　মোহন মন্তরে ।
তাইতো তোমার চরণতলে
　　এসেছি গো ফিরে—
　　ভাসি-নয়ন নীরে,
চরণধূলা দাও জননী
　　আর কিছু না চাই
সকল গ্লানি—মনের গ্লানি
　　দিয়েযে মুছাই ॥

কথা সুর ও স্বরলিপি—শ্রীনির্ম্মলচন্দ্র বড়াল বি-এল ।

১´ • ১´ • ১´
II সা সরা জ্ঞা । জ্ঞা জ্ঞা । I রজ্ঞা মপা . পা । পা পা -। I জমা জ্ঞা রা ।
তো মা• র্ দ য়া • চা• •ই জ ন নী • তো মা •

• ১´ • ১´ •
। সা ন্া ন্া I সা -। -। । -। -। -। I পা -। পা । পা পধা -ণা ।
র দ য়া চাই • • • • • অ ঙ্ গে আ• মা• র্

১´ • ১´ • ১´
। ণা ধা ধা । পা পা -। I ধা ধপা -। । মা গা মা I গমা পা -। ।
না ই শ ক তি • ভ ক • তি মো র্ না• ই •

•
। -। -। -। II
• • •

১´ • ১´ • ১´
II পা পা মা। গা গা মা I পা না নর্সা। র্সা র্সা -া I র্রজ্ঞা র্জ্ঞা -া।
ক ত • বার ই • আ ন্ দু • বা ভি • নি ভে •

• ১´ • ১´ •
। র্রা র্সা র্রা I না র্সা -া। -া -া -া I না না -পা। পা না -া I
গে ল • ঝ ড়ে • • • • প রা ণ্ কাঁ পে •

১´ • ১´ • ১´ •
I না র্সা -া। -া -া -া I পর্সা র্সা -া র্সা র্সা র্রা I র্সা ণা -া। ধা পা -া I
ড রে • • • • এ বা র্ আ মি • জে নে • ছি ঠি ক্

১´ • ১´ • ১´
I ণা -া ণা। ধা পা মা I পা -া -া। -া -া -া I সা সরা- জ্ঞা।
আ র গ তি মো র্ নাই • • • • • তো মা • র্

• ১´ • ১´ •
। জ্ঞা জ্ঞা -া I পা পা -া। পা পা -া I রমা জ্ঞা- রা। সা -রা ন্া I
অ ম ল্ চ র ণ বি না • স ক • লি • র

১´ •
I সা -া -া। -া -া -া II
থাই • ৯ ৯ • •

১´ • ১´ • ১´
II সা সরা -জ্ঞা। রা জ্ঞা -া I রা -া জ্ঞা। রা জ্ঞা -া I পা পা -া।
তো মা • র দ য়া • ঝ র্ লে প রে • ম রু র

• ১´ • ১´ •
। পা পা -া I রমা জ্ঞা -া। রা সা -া I পা -া পা। পা পধা -ণা I
বু কে • নি • ঝ র্ ঝ রে • শু ষ ক ত রু • •

১´ • ১´ • ১´
I ণা -া ণা। ধা পা -া I ধা ধা পা। মগা -া মা I পা -া -া।
মু ন্ জ রে সে • মো হ ন্ ম ন্ ত রে • •

•
। -া -া -া II
• • •

১´ • ১´ • ১´
II পা -া মা। পা গা মা I পা না -া। না র্সা -া I র্জ্ঞা র্জ্ঞা -া।
তা ই তো তো মা র্ চ র ণ ত লে • এ সে •

• ১´ • ১´ •
। র্রা র্সা র্রা I না র্সা -া। -া -া -া I না না পা। পা মা -া I
ছি গো • কি রে • • • • ভা সি • ন য় ন্

১´ • ১´ • ১´
I না র্সা -া। -া -া -া I পা র্সা -া। র্সা র্সা র্রা I র্সা -া ণা।
নী রে • • • • চ র ণ ধূ লা • দা ও অ

• ১´ • ১´ •
। ধা পা -া I ণা -া ণা। ধা পা মা I পা -া -া। -া -া -া I
ন নী • আ র কি ছু না • চাই • • • • •

১´ • ১´ • ১´
। জ্ঞা জ্ঞা -া। জ্ঞা জ্ঞা -রা I পা পা -া। পা পা -া I রমা জ্ঞা -াr।
স ক ল্ গ্লা নি • ম নে র্ গ্লা নি • নি• মে •

• ১´
। সা -রা ন্া I সা -া -া। -া -া -া II
বে • য় ছাই • • • • •

দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

(শ্রীনৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়)

বিগত শতাব্দীর বাংলা সাহিত্যের সমালোচনা করিবার সময় আমরা অনেকে সেই সময়কার পারিপার্শ্বিক আবহাওয়ার কথা ভুলিয়া যাই এবং অধিকাংশ স্থলে আমরা বর্ত্তমানের তুলাদণ্ডে সেই যুগের অনেককে বিচার করিয়া গ্রহণ করিবার সময় একটা ভুল করি; সে ভুলটী এই যে, আমরা সেই সময়কার কথা ও মাপ দিয়া তাঁহাদের ওজন করি না; আমরা তাঁহাদের ওজন করি আজকালকার দাঁড়িপাল্লায়। যে কয়জন দারুণ দুঃসাহসী পুরুষ লোকাপবাদ ও তাচ্ছিল্যের মধ্য দিয়া সামান্য বাঁশ আর তক্তা সাজাইয়া বাংলার নাট্য-মঞ্চের প্রতিষ্ঠা করিয়া গেলেন—আজ রঙ্গমঞ্চের স্বাভাবিক ক্রমোন্নতির ফলে তাঁহাদের সেই আদিম প্রচেষ্টাগুলি অতি সামান্য লাগিতে পারে; কিন্তু কলা লক্ষ্মীই জানেন, তাঁহাদের অন্তরের নিষ্ঠা ও গভীরতা কত গাঢ় ছিল। বঙ্কিমচন্দ্র যেদিন প্রথম প্রতিভার অসম দুঃসাহসিকতায় সাহিত্যে নব নব মানব সৃষ্টি করিয়া বাংলা সাহিত্যকে নব জন্মদান করিলেন, আজ হয় ত সে পথে রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্রের নর-নারী সব ভিড় করিয়া চলিয়াছে, কিন্তু বঙ্কিমকে বুঝিতে হইলে বাংলার তখনকার পারিপার্শ্বিক সাহিত্যজগতের কথা ভাবিতে হইবে। বাংলা সাহিত্যের আকাশে তখনও "আত্তির কুয়া কুয়া কইছে", বাংলার সমাজে তখনও সদ্য বিধবাকে ধুতুরার ফল খাওয়াইয়া পাগল করিয়া বাঁশের খোঁচায় চিতায় পুড়াইয়া সতীকরা হইতেছে, বাংলার গ্রামে গ্রামে তখন অন্যূন বিংশ-পত্নী-সৌভাগ্যবান্ কুলীন ব্রাহ্মণ একরাত্রে অষ্টমবর্ষীয়া হইতে আরম্ভ করিয়া প্রায়-বৃদ্ধা অনূঢ়া বালিকার আইবুড়ো নাম ঘুচাইয়া পরলোকের সুব্যবস্থার নামে বিবাহ করিতেছে—; এই অসম্ভব বীভৎস জগতের মাঝখানে কোথা হইতে জোয়ারে আসিল—অপরূপ মানব-মানবীর দল; আয়েষা, কুন্দ, শৈবলিনী, কপালকুণ্ডলা, নগেন্দ্রনাথ, প্রতাপ, চন্দ্রশেখর, মহেন্দ্র ইত্যাদি। বঙ্কিমচন্দ্রের দিকে আমরা চাহিয়া থাকি—কিন্তু দৃষ্টি আরো একটু ঘুরাইয়া ফেলিলে দেখিতে পাইব, কি ভয়ানক প্রাণহীন অন্ধকারের সমুদ্র! সেই অন্ধকার সমুদ্রের দিকে চাহিয়া মনে হয়, এই মহাদ্যুতি সূর্য্য কেমন করিয়া ঐ সমুদ্র মথিয়া উঠিল!

এই সমস্ত কথা বলিতেছিলাম, কেন না দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের স্বপ্ন-প্রয়াণকে বুঝিতে হইলে স্মরণ রাখিতে হইবে যে, ইহা রচিত হইয়াছিল পঞ্চাশ বৎসর আগে—রবীন্দ্র-সাহিত্যের পূর্ব্বে। বাংলা-ভাষা তখনও কিশোর-কবির মনে নীরবে নব-সৃষ্টির আশায় বসিয়াছিল, বাংলার কথায় ও সুরে তখনও সহজদেবতা ধরা দেন নাই। পঞ্চাশ বৎসরের সাধনার বলে দিগ্বিজয়ী কবি আজ বাংলা ভাষা ও ভাবের অঙ্গে যে অপূর্ব্ব নিপুণতা ও লীলার সঞ্চার আনিয়াছেন তখনকার দিনে ভাষার ও ভাবের সে সহজ মিলন ও তাহাদের অপূর্ব্ব লীলাময় গতি দ্বিজেন্দ্রনাথের স্বপ্ন-প্রয়াণে স্পষ্ট দেখিতে পাওয়া যায়। আমার মনে হয়, যেন তরুণ রবীন্দ্রনাথ স্বপ্ন-প্রয়াণের অঙ্গের আড়ালে লুকাইয়া আছেন। বাংলা ভাষা আজ যে নমনীয়তার অধিকারী হইয়াছে, পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে স্বপ্ন-প্রয়াণে তাহার সুস্পষ্ট সম্ভাবনা ছিল।

ভাষার ক্রমোন্নতির ফলে দেখা যায় যে, ভাষার অর্থের পরিসর ক্রমশ বাড়িয়া যায়। অল্প কথায় এমন ভাব প্রকাশ করা যায়, যাহার ভাব বহুদূর বিস্তৃত; অনেক সময় শব্দ এমন হইয়া ওঠে যে, সে তাহার অভিধানগত অর্থকে ছাড়াইয়া এক বৃহত্তর সূক্ষ্ম সত্তা গ্রহণ করে। শব্দ তখন মনোময় হইয়া ওঠে। তাহার অর্থ তখন অভিধানকে ছাড়াইয়া যায়। রবীন্দ্রনাথ বাংলা ভাষাকে এই মনোময় জগতে আনিয়াছেন। এই মনোময় জগতে শব্দ শুধু একটা ইঙ্গিত হইয়া ওঠে; সীমাবদ্ধ অক্ষরের ভাষা হৃদয়ের যে সব অসীম কামনা ও বেদনা তাহারই প্রতীক হয় এবং অর্থে যাহা বলিয়া বুঝাইতে পারে না ইঙ্গিতে তাহা বুঝায়। রবীন্দ্রনাথের এই ইঙ্গিতময়ী অপূর্ব্ব ভাষা দ্বিজেন্দ্রনাথের স্বপ্নপ্রয়াণের মধ্যে পাই। দ্বিজেন্দ্রনাথই প্রথম এই ভাষা প্রয়োগ করেন। সেই সময়কার অন্যান্য কবিদের সহিত রবীন্দ্রনাথের যে স্পষ্ট প্রভেদ চোখে লাগে তাহা মনে হয় ভাষার এই ক্রমোন্নতির জন্য। হেমচন্দ্র অথবা নবীনচন্দ্রের ভাষা এই দূরপ্রসারী ইঙ্গিতময় সত্তা লাভ করে নাই।

সুদূর নগর গ্রামে বাজে দ্বিপ্রহর

অথবা—

মহাকবি আদিকবি—
ছন্দে উঠে শশি রবি
ছন্দে পুন অস্তাচলে যায়—

একেবারে রবীন্দ্রনাথের ভাষা ও ভঙ্গী! মনে হয় রবীন্দ্রনাথের—

"ছন্দে উঠিছে তারকা
ছন্দে কনক রবি—"

এই ভাষার সহিত দ্বিজেন্দ্রনাথের ভাষার সংযোগ আছে। স্বপ্ন-প্রয়াণের ভাষা অপূর্ব্ব। এই রকম সহজ লীলাময় ভাষায় বাংলা সাহিত্যে আর কোন কাব্য লেখা নাই। রবীন্দ্রনাথ বাংলা ভাষায় বহু নব শব্দ দিয়াছেন ও বহু

শব্দে নব নব ভঙ্গী দিয়াছেন—দ্বিজেন্দ্রনাথ তাঁর পূর্ব্বেই সে কাজে হাত দেন।

অই মম তপ
অই মম জপ
অই চাঁদে উনমাদ বাসনা-জলধি।

অথবা—

আমরা যখন যাব বন-সামিয়ানা তল দিয়া ...”
ডাকিলে সাড়া দিবার নাহি-লোক!
নিশ্বাসিয়া ওঠে ঝাউ কত যেন হইয়াছে শোক!
শাখা-বাহু উদ্যমিয়া খেদায় আলোক—
(রবীন্দ্রনাথ—“অরণ্য উদ্যত-বাহু করে হাহাকার”)

অথবা—

গীত মাত্র পিয়া
রহে যেন জিয়া!
শুনিতে শুনিতে আঁখি উঠিল বাদলি’।

অন্যত্র—

এই বেলা পড় সরি; পরে বলে করো না আড়াল
ঝাট দিয়া ফেলি তারা-কুসুমের এসব জঞ্জাল,
আসিছেন প্রভু মোর ত্রিলোক-বাঞ্ছিত-দরশন

অথবা—কবির বিষয়ে বলিতে গিয়া সেখানে বলিয়াছেন—

চিরকাল তুমি অরণ্যের পাখী, থাকিবেও তথা
চিরকাল! বলিতেছি আমি সেই অরণ্যের কথা,
যে অরণ্য বাতাসের সনে মুখামুখি কথা কয়
ডরে না ঝড়ে ঝাপটে, দিগন্ত-প্রাচীরে বদ্ধ নয়... * *

এবং—

সন্ধ্যা না হইতে যবে—পূর্ণিমার প্রেম-পিপাসায়
পূর্ব্ব দিকে শশী
উঠি’ আছে বসি
ফুল কুড়াতেছি মোরা বকুল তলায়।

এই সমস্ত উদাহরণে দ্বিজেন্দ্রনাথের ভাষার অপূর্ব্ব ভঙ্গী ও সহজ সৌন্দর্য্য স্পষ্ট বোঝা যায়। লালসার রূপবর্ণনায় ও অন্যান্য স্থলে প্রায়ই কবি ভারতচন্দ্রের কথা মনে পড়ে। ভাষার স্বচ্ছন্দ গতির দিকে চাহিয়া মনে হয়, স্বপ্ন-প্রয়াণের কবি যেন ভারতচন্দ্রের স্মৃতিকে বহন করিয়া আসিয়াছেন।

এখন স্বপ্ন-প্রয়াণের কথা বলা প্রয়োজন।

“জীবন-স্মৃতি”তে রবীন্দ্রনাথ এই কাব্য-সৃষ্টির কথা উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন, “বড়দাদা তখন দক্ষিণের বারান্দায় বিছানা পাতিয়া সামনে ছোট ডেস্ক লইয়া স্বপ্নপ্রয়াণ লিখিতেছেন। বড়দাদা লিখিতেছেন আর শুনাইতেছেন, আর ঘন ঘন হাস্যে বারান্দা ভরিয়া উঠিতেছে। * * * বসন্তে আমের বোল যেমন অকালে অজস্র ঝরিয়া পড়িয়া গাছের তলা ছাইয়া ফেলে তেমনি স্বপ্ন-প্রয়াণের কত পরিত্যক্ত পত্র বাড়ীময় ছড়াছড়ি যাইত তাহার ঠিকানা নাই। বড়দাদার কবিকল্পনার এত প্রচুর প্রাণ-শক্তি ছিল যে, তাঁহার যতটা আবশ্যক তাহার চেয়ে তিনি ফলাইতেন বেশী। তাই অনেক লিখিয়া ফেলিয়া দিতেন। সেইগুলি কুড়াইয়া রাখিলে বঙ্গসাহিত্যের একটা সাজি ভরিয়া তোলা যাইত। * * স্বপ্ন-প্রয়াণ যেন একটা রূপকের অপরূপ রাজপ্রাসাদ। তাহার কত রকমের কক্ষ, গবাক্ষ, চিত্র, মূর্ত্তি, কারুনৈপুণ্য। * *”

স্বপ্ন-প্রয়াণের যে কবি একদিন অমর্ত্ত্য লোকে কল্পনার প্রেমে বিমোহিত হইয়া মন্দাকিনীর সলিল-সিকতায় সহিত আপনার বেদনার অশ্রু মিশাইয়াছিলেন, সে কবি দ্বিজেন্দ্রনাথ স্বয়ং।

জগতে দুই শ্রেণীর কবি ও কাব্য দেখা যায়। একজনের কাব্যই জীবন, অপর জনের জীবনই কাব্য। দ্বিজেন্দ্রনাথের জীবনখানি একখানি কাব্য—আদিম কবির সারল্যে ভরা, একান্ত জ্ঞানের আলোকে উদ্ভাসিত একখানি মধুর কাব্য! স্বপ্ন-প্রয়াণের নায়ক কবি কল্পনার প্রেমে বিমোহিত হইয়া তাহার হাতে ধরা দিবার জন্য জীবনখানি প্রদীপ-শিখার মত সারা রাত্রি ব্যাপিয়া একান্ত নির্ভরে জ্বালিয়া রাখিয়াছিল, ঠিক সেই রকম দ্বিজেন্দ্রনাথও সমস্ত জীবন মঙ্গলময় জ্ঞানের আরাধনায় অতিবাহিত করিয়াছিলেন—যে জ্ঞান তাঁহাকে এমন সুন্দর ও মহান্ এক অনুভূতি দিয়াছিল, যাহার সাহায্যে সত্যই তিনি জীবন দিয়া বলিতে পারিয়াছিলেন—“সর্ব্বা দিশা মম মিত্রং ভবন্ত”—সমস্ত দিক আমার মিত্র হউক! “মিত্রস্য চক্ষুষা সমীক্ষামহে,”—মিত্রের চক্ষু লইয়া আমরা দেখি।

শান্তি-নিকেতনের আমলকী-কুঞ্জের নিত্য-অভ্যাগত পরদেশী বিহঙ্গরা আকাশ-যাত্রার অবসরে আর অভ্যর্থনার জন্য সেই পরম স্নেহময় গৃহস্বামীটিকে দেখিতে পাইবে না। নিত্য অভ্যস্ত চড়ুই-এর দল অন্ধ অভ্যাসের বশে বারে বারে আসিয়া ফিরিয়া যাইবে। তপোবন পরিত্যাগ করিয়া তাপস চলিয়া গিয়াছেন; তাপসের স্নেহ-মন্ত্র-সঞ্জীবিত সমস্ত নির্ব্বাক অরণ্য ব্যথিত হইবে।

দ্বিজেন্দ্রনাথ যখন বিশ্রাম করিতেন, তখন গণিতের কোনও গূঢ় তত্ত্ব লইয়া চিন্তায় মগ্ন থাকিতেন। সেই সময় তিনি বলিতেন, “এই সবে একটু বিশ্রাম করিতেছি।”

“অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিকারী হইয়াও স্বেচ্ছায় তিনি দরিদ্র ছিলেন। পিতৃদত্ত মাসহারার সবটাই জ্যেষ্ঠপুত্র দীপেন্দ্রনাথের হাতে যাইত, নিজে কিছুই রাখিতেন না।

তাঁর নিয়মিত আহার-বস্ত্রের কখনো অপ্রতুল হইত না কিন্তু একটী কাম্যবস্তুর অভাব মধ্যে মধ্যে অনুভব করিতেন—সেটী লেখার জন্য ও বাক্স তৈরীর জন্য কাগজ। একদিন শুনি, জোড়াসাঁকোতে তাঁর চাকরকে কাকুতি-মিনতির স্বরে বলিতেছেন—"বাঁপুকে গিয়ে বলিস্‌ আজ যদি আমায় একটা দোয়ানি দেয়, আমি একখানা খাতা আনাই।" *

স্বপ্ন-প্রয়াণ লিখিয়া কবি যখন যাহাকে পাইতেন তাহাকেই শোনাইতেন। শ্রোতার জ্ঞানবুদ্ধির তারতম্যের কথা একেবারেই মনে থাকিত না।

"তিনি আমাদের (সরলা দেবী) শ্রোতা করে তাঁর স্বপ্ন-প্রয়াণ শোনাতেন, ভালো বুঝতে পারতাম না। তাতেই মজা লাগত। মুখ চেপে হাসি টিপে রাখতাম, বাইরে এসেই হেসেই সারা। একদিন আমাদের সঙ্গে তারা দাসীও শ্রোতৃবৃন্দের একজন ছিল। শুনতে শুনতে সে গড় হয়ে প্রণাম করলে। বড়মামা (দ্বিজেন্দ্রনাথ) উচ্চহাস্যে জিজ্ঞাসা করলেন, 'ও কি? প্রণাম করছিস্‌ কাকে?' সে বল্লে, 'ঠাকুর-দেবতার নাম শুনলে পেন্নাম কর্ত্তে হয় না'?"

স্বপ্ন-প্রয়াণের যাঁহারা ঠাকুর-দেবতা তাঁহাদের নাম করি—কল্পনা, মায়া, লালসা, কামনা, আনন্দ ইত্যাদি। অবশ্য ইঁহারাই জীবনের দেবতা। ইঁহাদের পাষাণ-দেউলে অহরহ মানব দলে দলে আহুতি দিয়া চলিয়াছে।

স্বপ্ন-প্রয়াণের রূপকের বাহ্য-অংশকে বলা যাইতে পারে, কবির সহিত কল্পনা দেবীর পরিণয়। স্বপ্ন-প্রয়াণে দ্বিজেন্দ্রনাথ একটী কবির সৃষ্টি করিয়াছেন, যে কবি বিশ্বের অন্তর-লোকের অধিষ্ঠাতা আনন্দময় পুরুষ।

সুপ্তিতে ডুবিয়া গেল জাগরণ
সাগর-সীমায় যথা অস্ত যায় জলন্ত তপন

তখন স্বপ্ন আসিয়া কবির শিয়রে পদ্ম-কর বুলাইল। স্বপ্নের পদ্ম-পরশে কবি "অচেতন হইয়া চেতন লাভ করিল—ঘুমন্তে জাগিল।"

স্বপ্নের কৃপায়
অন্ধে আঁখি পায়

সেই স্বপ্ন-দৃষ্টির সাহায্যে কবি ছায়াপথ দিয়া স্বপ্ন-দেবীর সঙ্গে চলিয়াছেন। কোন্‌ কূলহীন পারাবারে কামচারী রথ চলিয়াছে কবি জানে না। সারথীও নির্ব্বাক। ইহা কবির বাস্তব-রাজ্য হইতে মনোরাজ্যে প্রয়াণ। সেখানে,

দলি স্বর্ণরেণু
চরে কামধেনু
কল্পতরু-ছায়া তলে রঙ্গে হাসে ধরা।

সেইখানে রহিয়াছে বিগত আনন্দের পৃথিবী। সেইখানে আদি-জননী মায়ার স্বর্গ-ভবনে কল্পনার সহিত কবির দেখা। তারপর কবি রসাতল ও স্বর্গ সমস্ত ঘুরিয়া দেখেন,—লালসা, কুৎসা, ঘৃণা, পাপ কি কি রকমে আপনার প্রতাপ বিস্তার করিয়া রহিয়াছে। এই সমস্ত রূপকের বর্ণনায় মানবী-ভাব এত সুন্দর ফুটিয়াছে যে, এখানে সংক্ষিপ্ত ভাবে তাহার পরিচয় দিতে গেলে রসহীন নীতি-কথার মত শোনাইবে। কবির কল্পনা-দেবীর নিকট হইতে বিচ্ছিন্ন অবস্থা, বিষাদপুরের দৃশ্য, লালসার রূপ ও কীর্ত্তি—এমন সরল ও সহজ, যে কখনই মনে হয় না যে, কোনও নীতির রূপক পড়িতেছি। এই সমস্ত ঘটনার উপর কাব্যের একটা সুন্দর আবরণ আছে যাহা পাঠ করিলেই প্রতীয়মান হয়। স্বপ্ন-প্রয়াণের শেষে নায়ক-কবি বিষাদে অধীর হইয়া বলিতেছেন,

কবি কহে, কাহারে বুঝিবে কেবা, সব পৃথিবীর
অই দশা নিরখিয়া মন মোর হয়েছে অধীর—
কিছুতে না হয় তৃপ্ত! কি আছে এ-ছার ভব-ধামে
আছে বটে প্রেম-রত্ন! কিন্তু কোথা! প্রেম শুধু নামে!
চাবি-বন্ধ হৃদয় সকলি প্রায়, দৃঢ়মুষ্টি কর!
পদ প্রসারিতে মানা চারিদিকে গণ্ডি-আঁকা ঘর।

কবির সমস্ত ভ্রমণের মধ্যে যে সমস্ত অন্যায় ও অত্যাচারের ছবি দেখিয়াছেন তাহার স্মৃতিতে ভারাক্রান্ত হইয়া কবির চিত্ত দুলিয়া উঠিয়াছে। কোথাও—

এর অভিমান উঠে সকল হইতে উচ্চে চড়ি'
সাধ যায় চরাচর পদতলে যাক্‌ গড়াগড়ি
ও দাঁড়ায় কর-যোড়ে অত্যাচার-ভারে অবনত
যত ভার চাপাও ততই সহে বলদের মত।

এই লালসা আর হীন বাসনার জগৎ হইতে কবির বিষাদ-কণ্ঠ চায় সেই স্থান, যেখানে—

* * * হৃদয় সবার—
এক ছাঁচে ঢালা, কেহ নহে পর, এক বাসস্থান
সকল জগ-জনের; ক্ষুধা তৃষ্ণা সবার সমান।

আজ স্বপ্ন-প্রয়াণের স্বপ্ন-লোক ছাড়িয়া বিংশ শতাব্দীর জাগর বাস্তব-লোকে হিংসা আর লালসার সংগ্রামের শ্রান্ত অবসানে সেই প্রশ্ন উঠিয়াছে—

কোথায় সেই স্থান? মানব কি আবার মিলিবে না আপনার আদিগৌরবে? কাহার অন্তরে সেই মন্ত্র আছে, যার তেজে মানবের মহাযজ্ঞশালার দুয়ার আবার খুলিবে? জেনোয়ার মন্ত্রণা-সভায়? ভার্সেই কনফারেন্সে? লুকার্ণোর চুক্তিতে?

এ প্রশ্ন আজ পৃথিবীর উপরে চন্দ্র-সূর্য্যের মত দুলিতেছে। এ প্রশ্ন দুলুক্‌—কিন্তু স্বপ্ন-প্রয়াণের ঋষি-কবি তাঁর স্বপ্ন-কাব্যে কবিকেই ভার দিয়াছেন এই প্রশ্নের উত্তরের জন্য। নায়ক-কবিকে সুসঙ্গ বলিতেছে—হে কবি, তোমার কণ্ঠে বিলাপের ধ্বনি কেন? তুমি অরণ্যের পাখী, তোমার মুখে বিলাপের ধ্বনি কি সাজে? তুমি চিরকাল অরণ্যের পাখী—যে অরণ্য বাতাসের সঙ্গে মুখামুখি কথা কয়, যে অরণ্য ঝড়-ঝাপটে ভয় করে না—দিগন্ত-প্রাচীরে বদ্ধ নয়—তুমি সেই অরণ্যের পাখী? তোমার কণ্ঠে বিলাপ-ধ্বনি? তোমার বাণীতে আছে অসাধ্য-সাধন মন্ত্র! তুমি আঁধার নিশীথে প্রভাত-সূর্য্যকে ডাকিয়া আন—দুরন্ত শীতে তোমার কুঞ্জ-ভবনে তুমি শিশিরকে বাষ্প করিয়া উড়াইয়া দক্ষিণ বাতাসের পথ করিয়া দাও—অসাধ্য-সাধন মন্ত্র তো তোমার কণ্ঠে!

এই অসাধ্য-সাধন মন্ত্র আজ ভারতের দিগ্বিজয়ী কবির তন্ত্রীতে বাজিতেছে। দ্বিজেন্দ্রনাথের স্বপ্ন রবীন্দ্রনাথের বীণায় অগ্নি-মূর্ত্তি লইয়া উঠিতেছে—সে অগ্নির তেজে দিগন্তের অন্ধকার সমুদ্রের এ-পারে আর ও-পারের মাঝখানে মাঝে মাঝে এক আলোর স্বপ্ন-সেতু সৃষ্টির সাড়া পাওয়া যাইতেছে, আবার কখন তরল অন্ধকারের হিম-স্রোত আসিয়া পড়িতেছে। শুধু ঊর্দ্ধে সেই প্রশ্নটী

* শ্রীমতী সরলা দেবী।

একটী তারার মত জ্বলিতেছে—মানবের মহাযজ্ঞশালার দুয়ার খুলিবে কবে ? *

সংবাদ।

স্মৃতিসভা। বিগত ২৮শে চৈত্র মঙ্গলবার শ্রদ্ধেয় ৺আশুতোষ চৌধুরী মহাশয়ের স্মৃতিসভা কলিকাতা টাউনহলে হইয়াছিল। মহারাজাধিরাজ বর্দ্ধমান সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। এই উপলক্ষে বহু গণ্যমান্য লোকের সমাগম হয়। বর্দ্ধমানাধিপতি তাঁহার প্রারম্ভিক বক্তৃতাতে এই সভার কালবিলম্বের হেতু নির্দ্দেশ করিয়া বলেন যে, যদিও আশুবাবু দুই বৎসর পূর্ব্বে পরলোক গমন করিয়াছেন, কিন্তু বঙ্গের প্রতি অধিবাসী তাঁহার স্মৃতি সমানভাবে বহন করিয়া আসিতেছে। তাঁহার প্রতিভা ছিল সর্ব্বতোমুখী, আর ছিল শিল্প ও সঙ্গীতের উপর তাঁহার প্রগাঢ় অনুরাগ; তাঁহার আবাস-নিকেতনে যাইলে উহারই প্রকৃষ্ট পরিচয় মিলিত। আশু বাবু ও তাঁহার পত্নী প্রতিভা দেবীর সুমিষ্ট ব্যবহারে সকলেই পরিতৃপ্ত হইতেন। এদেশের বর্ত্তমান রাজনৈতিক জাগরণের মূলে তাঁহাকে দেখিতে পাই। যাঁহারা মাতৃভুমির জন্য অসাধারণ ত্যাগ স্বীকার করিয়াছেন, ভারতের ভাবী ইতিহাস রচনার সময়ে, তাঁহাদের মধ্যে আশুতোষের নাম সমুচ্চ স্থান অধিকার করিবে। পরে বিচারপতি শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয় বিচারকরূপে আশুবাবুর কৃতিত্বের উল্লেখ করেন; এবং একথাও সাহ্লাদে উল্লেখ করেন যে, আশুবাবুর শিক্ষাদীক্ষা বিলাতে হইলেও ভারতবাসী বলিয়া তাঁহার আত্মসম্মানবোধ এক দিনের জন্যও তাঁহাকে পরিহার করে নাই। মিঃ বি, এল, মিত্র বলেন যে, আশুবাবু আইন ব্যবসায়ীগণের অলঙ্কারস্বরূপ ছিলেন। তিনি শিক্ষিত বাঙ্গালীর আদর্শ ছিলেন। শ্রীযুক্ত বিপিনচন্দ্র পাল বলেন যে আশুবাবুর সমুচ্চ চরিত্র সকলকে আকৃষ্ট করিত। বিজিত জাতির যে কোন রাজনৈতিক দাবী অর্থাৎ politics থাকিতে পারে না, এই কথা তিনিই সর্ব্বপ্রথম ঘোষণা করিয়া এদেশের রাজনৈতিক আন্দোলনকে আশুবাবু একটী নূতন পথে পরিচালিত করেন। তাঁহার সহিত কথোপকথনে উদার ভাব অন্তরে স্বতঃই জাগিয়া উঠিত। মিঃ টি, সি গোস্বামী বলেন যে, আশুতোষের সর্ব্বতোমুখী প্রতিভা অল্প পরিচয়ে আয়ত্ত করা সুকঠিন। এদেশের জাতীয় শিক্ষার সঙ্গে তাঁহার নাম ঘনিষ্ঠভাবে বিজড়িত। তিনি ঠিকই বুঝিয়াছিলেন যে এদেশের প্রদত্ত শিক্ষা দাসত্বভাবকে আরও বাড়াইয়া দেয়। শ্রীযুক্ত জে, এম সেন গুপ্ত ওজস্বিনী ভাষায় বলেন যে, আশুতোষ কর্ম্মী সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের দক্ষিণ হস্ত স্বরূপ ছিলেন। কি জাতীয় শিক্ষা, কি জাতীয় ব্যাঙ্ক, কি হিন্দুস্থান বীমা অফিস, কি লক্ষ্মী কটন মিল—এ সকলেরই সঙ্গে আশুবাবুর নাম বিজড়িত; এ সকলেরই মধ্যে তাঁহার কীর্ত্তি। তিনি অন্যের সঙ্গে মিলিয়া জাতীয়তার যে সুদৃঢ় ভিত্তি স্থাপন করিয়া গিয়াছেন, আমরা সেই ভিত্তিরই উপর নির্ম্মাণ কার্য্য আরম্ভ করিয়া দিয়াছি। তিনি যে পথ দেখাইয়া গিয়াছেন, আমরা সেই পথেরই অগ্রযাত্রী পথিক মাত্র। তাঁহার সুশ্লিষ্ট জীবনের কথা আজ মনে পড়িতেছে। মধুর তাঁহার বাক্যবিন্যাস, মধুর তাঁহার ব্যবহার, মধুর তাঁহার জাগরণের আহ্বান, মধুর তাঁহার আনন্দপূর্ণ মূর্ত্তি এবং মধুরতম তাঁহার তাপদগ্ধ শেষ জীবনের নির্জ্জন বিশ্রামের ছবি। তিনি দেশের সমুচ্চ লোকবৃন্দের অন্যতম। Mr. W. C. Wordsworth ইউরোপীয়গণের প্রতিনিধিরূপে শিক্ষা ব্যাপারে আশুতোষের আন্তরিকতার কথা উল্লেখ করেন এবং ইহাও বলেন যে, আশুতোষের ভিতরে দৃঢ়তা ও নির্ভীকতার ভাব যথেষ্ট পরিমাণে থাকিলেও তিনি সুবিবেচক, বিনয়ী, গঠনকামী এবং কর্ম্মী লোক ছিলেন।

আশুতোষের তিরোধানে এইরূপে আন্তরিক বেদনা প্রদর্শনের পরে বর্দ্ধমানাধিপতিকে সভাপতি করিয়া তাঁহার স্মৃতিরক্ষার ব্যয় নির্ব্বাহার্থে অর্থ সংগ্রহ করিবার জন্য একটি Committee বিগঠিত হইবার প্রস্তাব হইয়া সভা ভঙ্গ হয়।

বলা বাহুল্য যে শ্রদ্ধেয় আশুবাবু বহুদিন ধরিয়া আদিব্রাহ্মসমাজের সভাপতি ছিলেন।

পূজ্যপাদ রবীন্দ্রনাথের জন্মোৎসব। গত ২৫শে বৈশাখ শনিবার প্রাতঃকালে পূজ্যপাদ রবীন্দ্রনাথের পঞ্চষষ্টিতম সাম্বৎসরিক জন্মতিথি-উৎসব বোলপুর শান্তিনিকেতনের আম্রকুঞ্জে সুসম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। এই উপলক্ষে তথায় এদেশের এবং বিদেশের বহু গণ্যমান্য লোকের সমাগম হইয়াছিল। বিশ্বভারতীর সুযোগ্য পণ্ডিত শ্রীযুক্ত বিধুশেখর শাস্ত্রী মহাশয় শঙ্খ ও ঘণ্টার মঙ্গল বাদ্যে শাস্ত্রীয় পদ্ধতি অনুসারে জন্মতিথির অনুষ্ঠানটী স্বস্তিবাচন ও শান্তিবাচন পূর্ব্বক যথারীতি সুসম্পন্ন করিয়াছিলেন। অনেকগুলি সময়োপযোগী সঙ্গীত গীত হইয়াছিল এবং সর্ব্বশেষে প্রচুর ভোজের আয়োজন ছিল। উৎসব-রজনীতে আশ্রম-কন্যাকাগণ কর্ত্তৃক রবীন্দ্রনাথের নববিরচিত "নটীর পূজা" নামক নাট্যগ্রন্থের অভিনয় প্রয়োগকৌশলে সমাগত সম্মানার্হ অতিথিগণের মনোহরণ করিয়াছিল। আমরা দেশের ও দশের শুভার্থী হইয়া ভগবানের নিকটে পূজ্যপাদ রবীন্দ্রনাথের দীর্ঘায়ু প্রার্থনা করিতেছি।

গার্হস্থ্য-সংবাদ।

শ্রাদ্ধ।—গত ২৭শে ফাল্গুন বৃহস্পতিবার প্রবীণ ব্রাহ্ম শ্রীযুক্ত রাধাকান্ত আইচ মহাশয়ের সুযোগ্যা পত্নী ইচ্ছাময়ী দেবী তাঁহার নোয়াখালীর বাসভবনে পরলোকগত হইয়াছেন। তদুপলক্ষে গত ২৭শে চৈত্র শ্রীযুক্ত রাধাকান্ত আইচ মহাশয় তাঁহার কুমিল্লা নগরীর বাসাটীতে পুত্রগণসহ তদীয় পরলোকবাসিনী পত্নীর আদ্যশ্রাদ্ধ সম্পন্ন করিয়াছেন। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের প্রচারক শ্রীযুক্ত অমৃতলাল গুপ্ত মহাশয় আচার্য্যের কার্য্য করিয়াছিলেন। এই অনুষ্ঠানটীর বিশেষত্ব এই যে, ইহাতে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ-প্রবর্ত্তিত একেশ্বরবাদ-সম্মত বিশুদ্ধ পদ্ধতি অনুসারে যথারীতি দানসামগ্রী উৎসর্গ করা

* "কল্লোল"—চৈত্র, ১৩৩২ সাল।

হইয়াছিল। ভগবান এই পুণ্যময়ী রমণীর লোকান্তরিত আত্মার কল্যাণ বিধান করুন।

শোক-সংবাদ।

৺কৃষ্ণগোবিন্দ গুপ্ত। বিগত ১৫ই চৈত্র সোমবার বঙ্গের কৃতী সন্তান সার কৃষ্ণগোবিন্দ গুপ্ত তাঁহার বালিগঞ্জের আবাস-নিকেতনে ৭৫ বৎসর বয়সে পরলোক গমন করিয়াছেন। তাঁহার পিতা শ্রদ্ধেয় কালীনারায়ণ গুপ্ত মহাশয়ের সঙ্গে ব্রাহ্মসমাজের ঘনিষ্ঠতম যোগ ছিল। তাঁহাকে মধ্যে মধ্যে আদিব্রাহ্মসমাজের মাসিক সভায় দেখিতাম। পণ্ডিত হেমচন্দ্র বিদ্যারত্ন একবার ঢাকায় গিয়া আদিব্রাহ্মসমাজের পদ্ধতি অনুসারে তাঁহার একটি কন্যার বিবাহ দিয়া আসেন। তাঁহার রচিত একখানি ব্রহ্মসঙ্গীত পুস্তক আমাদের নিকটে আছে; উহার নাম ভাবসঙ্গীত। উহা তাঁহার সরল হৃদয়ের উচ্ছ্বাসে পূর্ণ। সার কৃষ্ণগোবিন্দ ১৮৭৩ সালে সিভিল সার্ভিস পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া প্রতিযোগিতায় দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেন। তিনি ব্যারিষ্টারি পরীক্ষায়ও উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন। তিনি আপনার প্রতিভা গুণে রেভিনিউ বোর্ডের মেম্বর পর্য্যন্ত হইয়াছিলেন। বাঙ্গালীর মধ্যে তিনিই সর্ব্বপ্রথম এই পদ অধিকার করেন। ১৯০৬ খৃষ্টাব্দে তিনি Fishery Commissionএ নিযুক্ত হইয়া মৎস্যতত্ত্ব অনুসন্ধান করিবার জন্য ইউরোপ ও আমেরিকা পর্য্যটন করিয়া আসেন। ১৯০৭ সালে তিনি India Councilএর জনৈক সভ্য নিযুক্ত হন। বাঙ্গালীর মধ্যে তাঁহারই এই প্রথম অধিকারলাভ। ১৯১৫ খৃষ্টাব্দে তিনি উহা হইতে অবসর প্রাপ্ত হন। এইরূপে তাঁহার সুদীর্ঘ জীবনের ৪২ বৎসর কাল রাজসেবায় অতিবাহিত হয়। ইহার পাঁচ বৎসর পরে সৈন্যবিভাগ সম্বন্ধে যে, Lord Eshers Commission বসিয়াছিল তাহাতেও তাঁহাকে কার্য্য করিতে হইয়াছে। কোন প্রাদেশিক শাসনকর্ত্তা অর্থাৎ গবর্ণর হওয়ার অবসর তাঁহার শেষ জীবনে আসিয়াছিল বটে, কিন্তু বাঙ্গালী বলিয়া হইতে পারেন নাই; অথচ তাঁহা অপেক্ষা জুনিয়ার সিভিলিয়ন আসামের শাসনকর্ত্তা হইয়া গেলেন। K, C, S, I এই উপাধি লাভ তাঁহার ভাগ্যে ঘটিয়াছিল। তিনি তাঁহার দক্ষতাগুণে কি দেশীয় কি বিদেশীয় সকলের শ্রদ্ধাভাজন হইতে পারিয়াছিলেন। তাঁহার তিনটি পুত্র, সকলেই প্রতিভাশালী ও কৃতী। পাঁচটি কন্যা উপযুক্ত পাত্রের সহিত বিবাহসূত্রে গ্রথিত। তাঁহার অভাবে ব্রাহ্মসমাজে পরিচয় দিবার মত একটি মহাজনের বিলক্ষণ অভাব ঘটিল। ঈশ্বর তাঁহার সুশীতল ক্রোড়ে পরলোকগত আত্মাকে স্থান দান করুন।

৺নীলমণি দে। মান্যবর সিভিলিয়ান কে. সি. দে অর্থাৎ কিরণচন্দ্র দে মহাশয়ের সম্প্রতি পিতৃবিয়োগ হইয়াছে। ইঁহার পিতা নীলমণি দে স্বর্গীয় কিশোরীচাঁদ মিত্র মহাশয়ের জামাতা ছিলেন। মিষ্টার দে আপনার শিক্ষা ও প্রতিভাগুণে রেভিনিউ বোর্ডের মেম্বর হইয়াছেন। তিনি নগ্নপদে ধুতি-পরিধানে চাদরে অর্দ্ধ-আবৃত দেহে আত্মীয় ও বন্ধুবান্ধবগণের দ্বারে গিয়া 'দায়' জানাইয়া বেড়াইতেছেন। তাঁহার এভাব আমাদের বড় মিষ্ট লাগিল। পরমেশ্বর পরলোকগত আত্মার কল্যাণ বিধান করুন।

৺যতীন্দ্রনাথ রায় চৌধুরী। টাকীর সুপ্রসিদ্ধ জমিদার প্রখ্যাতনামা রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী মহাশয় গত ২৪শে চৈত্র বুধবার রাত্রিতে তাঁহার বরাহ-নগরের বাসভবনে হঠাৎ পরলোকগত হইয়াছেন। মৃত্যুর পূর্ব্বে তাঁহার বিশেষ কোন পীড়া হয় নাই। হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়া অকস্মাৎ রুদ্ধ হওয়ায় তাঁহার মৃত্যু ঘটিয়াছে। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়ঃক্রম মাত্র তেষট্টি বৎসর হইয়াছিল। টাকীর সুপ্রসিদ্ধ কায়স্থ জমিদার বংশের নাম বাঙ্গালায় চির-প্রখ্যাত। এই বংশেরই অন্যতম সুসন্তান স্বর্গীয় কালীনাথ মুন্সী, মহাত্মা রাজা রামমোহন রায় ও প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুর প্রভৃতির সহিত যুক্ত হইয়া 'ব্রহ্মসভার' প্রতিষ্ঠা করেন এবং দীর্ঘ দিন উহার ট্রাষ্টীরূপে কার্য্য করিয়া যান। যতীন্দ্রনাথ এই মহাত্মারই বংশধর। পিতামহের ন্যায় ব্রাহ্মসমাজের সহিত ইহার প্রত্যক্ষ যোগ না থাকিলেও ইনি ব্রাহ্মসমাজের কার্য্যে শ্রদ্ধাশীল ও সহানুভূতিসম্পন্ন ছিলেন। যতীন্দ্রনাথ স্বয়ং সুবিদ্বান্—কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এম-এ বি-এল ছিলেন এবং আমরণ ছাত্রের ন্যায় অধ্যয়নশীল জীবন যাপন করিয়া গিয়াছেন। সংস্কৃত ও বাঙ্গালা সাহিত্যে ইঁহার অসাধারণ অধিকার ছিল। বঙ্গসাহিত্য ও দর্শনশাস্ত্রের প্রতি ইঁহার প্রগাঢ় প্রীতি পরিলক্ষিত হইত। ইহার ফলে ইনি আজীবন বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সহিত সংযুক্ত ছিলেন এবং একবার পরিষদের বাৎসরিক অধিবেশনে দর্শনশাখার সভাপতি পদেও ব্রতী হইয়াছিলেন। স্বাদেশিকতার ক্ষেত্রেও ইঁহার প্রীতির যথেষ্ট নিদর্শন পাওয়া যায়। ১৩১২ সালের স্বদেশী আন্দোলনকে পল্লী অঞ্চলে প্রসারিত করিবার কার্য্যে ইঁহার যথেষ্ট প্রভাব ও প্রযত্ন দৃষ্ট হইয়াছিল। বর্ত্তমানের খদ্দর আন্দোলনেও ইনি নিশ্চল ছিলেন না। সর্ব্ববিধ সাধারণ কর্ম্মে চিরদিন ইনি উৎসাহশীল ছিলেন। সর্ব্বোপরি ধনী-দরিদ্র-নির্ব্বিশেষে সকলের প্রতি বিনয়-নম্র ব্যবহারে ইঁহার স্বভাবের বৈশিষ্ট্য ও মাধুর্য্য পরিলক্ষিত হইত। শোনা যায়, ইনি ইঁহার স্বজাতীয় কর্ম্মচারীদিগের সহিত নিত্য একসঙ্গে আহারে বসিতেন এবং আহার্য্য পরিবেশনে কোনওরূপ ইতরবিশেষ থাকিত না। এরূপ মহানুভব ব্যক্তির ঈদৃশ অকস্মাৎ মৃত্যু বাঙ্গালার দুর্ভাগ্যেরই পরিচায়ক। আমরা ইঁহার শোকসন্তপ্ত পরিজনদিগকে এই গভীর শোকে আমাদের আন্তরিক সমবেদনা জানাইতেছি। ভগবান ইঁহার লোকান্তরিত আত্মার কল্যাণ বিধান করুন।

তত্ত্ববোধিনীর নিয়মাবলী।

গ্রাহক।

১। তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার বর্ষ বৈশাখ হইতে আরম্ভ হয়। বৎসরের যে কোন সময় গ্রাহক হইলেও সেই বর্ষের প্রথম হইতেই পত্রিকা লইতে হইবে।

২। অগ্রিম বার্ষিক মূল্য সডাক ৩৵০ আনা। অসমর্থ, মহিলা ও ছাত্রদের জন্য ২৵০।

৩। অনিবার্য্য কারণ ব্যতীত পত্রিকা প্রতি মাসের প্রথম সপ্তাহের মধ্যেই প্রকাশিত হয়।

৪। তিন আনার ডাকটিকিট, নাম ও ঠিকানাযুক্ত খাম পাঠাইলে একখণ্ড পত্রিকা নমুনা স্বরূপ পাঠান হয়। হাতে হাতে নমুনা দেওয়া হয় না।

৫। গ্রাহকগণ অনুরোধ করিয়া পত্র লিখিলে ভি-পিতে পত্রিকা পাঠান হয়। অতিরিক্ত খরচ প্রায় ।০ চারি আনা লাগে।

৬। ঠিকানা পরিবর্ত্তন করিতে হইলে পূর্ব্ব মাসের ২২শে তারিখের মধ্যে জানাইতে হইবে।

৭। বার্ষিক মূল্য অগ্রিম দেয়।

৮। যিনি পাঁচ জন গ্রাহক সংগ্রহ করিয়া দিবেন তিনি একবৎসর বিনা মূল্যে পত্রিকা পাইবেন।

প্রবন্ধ।

৯। তত্ত্ববোধিনীতে ধর্ম্ম, ইতিহাস, বিজ্ঞান, কৃষি, শিল্প, জীবনী, সমাজ-সমস্যা, সাহিত্য, ভ্রমণ, ব্যবসায়-বাণিজ্য প্রভৃতি সর্ব্বপ্রকার কল্যাণকর ও উন্নতিবিষয়ক প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়।

১০। লেখক যতই নবীন হউন, রচনা প্রকাশোপযোগী হইলেই সাদরে গ্রহণ করা হয়। নবীন লেখকগণের নিকট হইতে আমরা প্রধানতঃ সরল ভাষায় লিখিত বিজ্ঞান (রসায়ন-বিজ্ঞান, পদার্থ-বিজ্ঞান, প্রাণি-বিজ্ঞান ইত্যাদি বিজ্ঞানের সর্ব্ববিধ বিভাগ) এবং অর্থনীতি, শিল্প, বাণিজ্য, সমাজতত্ত্ব ও ভ্রমণসম্বন্ধীয় প্রবন্ধ পাইবার আশা করি।

১১। রচনার সঙ্গেই উপযুক্ত ষ্ট্যাম্প ও নামধাম-যুক্ত খাম দেওয়া থাকিলে রচনা (প্রবন্ধ বা কবিতা) মনোনীত হওয়ার সংবাদ অথবা অমনোনীত হইলে পাণ্ডুলিপি ফেরত দেওয়া যায়। তবে ডাকের গোলযোগে হারাইলে আমরা দায়ী হইব না।

১২। রচনাদি সম্পাদকের নামে পাঠাইতে হইবে।

বিজ্ঞাপন।

১৩। বিজ্ঞাপনদাতাগণ মনে রাখিবেন যে এই পত্রিকা ৮৪ বৎসর চলিতেছে, অথচ ইহার বিজ্ঞাপনের হার সর্ব্বাপেক্ষা সুলভ; এবং এই পত্রিকার এক পৃষ্ঠা অন্য পত্রিকার দুই পৃষ্ঠার সমান।

সাধারণ	১ পৃষ্ঠা	....	১০৲	প্রতিমাসে।
"	½ "	....	৬৲	"
"	¼ "	....	৪৲	"
"	⅛ "	....	২৲	"

কভারের	১ম	পৃষ্ঠার		নিম্নভাগে	......	১০৲
"	২য়	"			......	১৫৲
"	"	"	অর্দ্ধেক		......	৮৲
"	৩য়	"			......	১২৲
"	"	"	অর্দ্ধেক		......	৭৲
"	৪র্থ	"	"		......	২০৲
"	"	"	অর্দ্ধেক		......	১০৲

১৪। বিজ্ঞাপনের মূল্য অগ্রিম দেয়। যে মাসে মূল্য না পাওয়া যাইবে সে মাসে বিজ্ঞাপন বন্ধ করিয়া দেওয়া হইবে।

১৫। এককালে এক বৎসরের বন্দোবস্ত করিয়া ৬ মাসের মূল্য অগ্রিম দিলে শতকরা ২৫৲ টাকা, ৬ মাসের বন্দোবস্ত করিয়া ৪ মাসের মূল্য দিলে শতকরা ১২৲ টাকা এবং ৩ মাসের বন্দোবস্তে ২ মাসের অগ্রিম দিলে শতকরা ৬৲ টাকা কমিশন দেওয়া হয়।

১৬। পুরাতন বিজ্ঞাপন সম্বন্ধে পূর্ব্ব নিয়ম বলবৎ রহিল।

১৭। এজেন্ট হইলে টাকায় ।০ আনা কমিশন পাইবেন।

১৮। মূল্যাদি কার্য্যাধ্যক্ষের নামে এবং বিনিময় ও সমালোচনার পুস্তকাদি সম্পাদকের নামে পাঠাইতে হইবে।

আদিব্রাহ্মসমাজ
৫৫, আপার চিৎপুর রোড
কলিকাতা।

কার্য্যাধ্যক্ষ—
শ্রীসুরেশচন্দ্র সাংখ্যবেদান্ততীর্থ।

Tattwabodhini Patrika

একবিংশ কল্প
চতুর্থ ভাগ
জ্যৈষ্ঠ, ব্রাহ্মসম্বৎ ৯৭।

৯৯৪ সংখ্যা ১৮৪৮ শক

তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা

"ব্রহ্ম বা একমিদমগ্র আসীন্নান্যৎ কিঞ্চনাসীত্তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রন্নিরবয়বমেকমেবাদ্বিতীয়ম্ সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয়ং সর্ব্ববিৎ সর্ব্বশক্তিমদ্ধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্যসাধনঞ্চ তদুপাসনমেব"।

সম্পাদক—শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর

কলিগতাব্দ ৫০২৭। সম্বৎ ১৯৮৩। খৃঃ ১৯২৬। শক ১৮৪৮। সাল ১৩৩৩।

৫৫ নং অপার চিৎপুর রোড্ কলিকাতা, আদিব্রাহ্মসমাজ যন্ত্রে শ্রীরণগোপাল চক্রবর্ত্তী দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত।
সাল ১৩৩৩। খৃঃ ১৯২৬। সম্বৎ ১৯৮৩। কলিগতাব্দ ৫০২৭। জ্যৈষ্ঠ।

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার বার্ষিক মূল্য ৩৲ টাকা ডাকমাশুল ৵০ আনা। এই সংখ্যার মূল্য ।০ আনা। { আদিব্রাহ্মসমাজের কর্ম্মাধ্যক্ষের নামে পাঠাইতে হইবে।

একবিংশ কল্প
চতুর্থ ভাগ
জ্যৈষ্ঠ, ব্রাহ্মসম্বৎ ৯৭।

৯২৪ সংখ্যা ১৮৪৮ শক

তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা

ব্রহ্ম বা একমিদমগ্র আসীন্নান্যৎ কিঞ্চনাসীত্তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রন্নিরবয়বমেকমেবাদ্বিতীয়ম্ সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয়ং সর্ব্ববিৎ সর্ব্বশক্তিমদ্ধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্যসাধনঞ্চ তদুপাসনমেব"।

সম্পাদক—শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর

কলিগতাব্দ ৫০২৭। সম্বৎ ১৯৮৩। খৃঃ ১৯২৬। শক ১৮৪৮। সাল ১৩৩৩।

বন্ধু-আমার !

(শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর)

৫। জীবনলাভ।

বন্ধু! আমার সঙ্গে লুকোচুরি খেলা খেলিতে তোমার বড় ভাল লাগে—না? তুমি মনে কর, গাছের আড়ালে ফুলের আড়ালে লুকাইয়া থাকিলে তোমাকে ধরিতে পারিব না? সকল সময়ে তাহা খাটে না। যাক—লুকোচুরি খেলা এখন থাক। আজ এই পূর্ণিমা রাত্রে তুমি এসো—আমি তোমার সঙ্গে বেড়াই আর মনের কথা কই। আকাশের চাঁদ, দখিনে বাতাস, আম্রমুকুলের উন্মাদক সুবাস, শতবিধ ফুলের ও মাটির সুগন্ধ সমস্তই আমাকে পাগল করিয়া তুলিতেছে। তোমার বিরহে কাঁদিয়া কাটিয়া অনেক দিন গিয়াছে। এখন তোমাকে পাইয়াছি—লাবণ্যে স্বর্গমর্ত্ত্য ছাইয়া গিয়াছে; এখন সর্ব্বত্রই বসন্তের বাতাস বহিতেছে; এখন সকলই আনন্দময়, সকলই মধুময়। ধরণীর কাণায় কাণায় যেন শোভা উছলিয়া উঠিতেছে। সমস্ত জগত যেন নবযৌবনে ঢলঢল করিতেছে।

লুকোচুরি খেলিবার পূর্ব্বে তুমি যখন আমার কাছে বসিয়াছিলে, সেই সময়ে আমি শুভ্র সুগন্ধ ফুলের একটী মালা গাঁথিয়া রাখিয়াছি—আজ তোমার চরণপূজা করিয়া সেই মালা তোমাকে পরাইব বলিয়া। রাত্রি অনেক হইয়াছে। আমার ভালবাসা তোমার চরণে দিয়া সার্থক করিবার জন্য আমার প্রাণ ব্যাকুল হইয়া উঠিতেছে। আজ তোমার চরণ পূজা করিতে না পারিলে এমন অবসর আবার কবে আসিবে, কবে আবার এমন মিলন হইবে, তাহা বলিতে পারি না। তুমি আমার হৃদয়ের পূজা গ্রহণ কর—আমার ভালবাসার যদি এতটুকু নিদ্রিত থাকে, তবে তাহাও জাগিয়া উঠুক। ভালবাসার এ কি আশ্চর্য্য কথা—ব্যথা না পাইলেও সুখ, ব্যথা পাইলেও সুখ—সমস্ত ক্ষণই যেন নিজের প্রাণ তোমার হাতে তুলিয়া দিবার জন্য উন্মুখ! এক মুহূর্ত্তের জন্য হয় তো তোমার দেখা পাইব—কিন্তু সেই এক মুহূর্ত্তেরই জন্য, যেন নিমেষের ভিতর কত সুদীর্ঘ সুদীর্ঘ বৎসর অনায়াসে কাটিয়া যায়। আমি তোমার ভালবাসায় ডুবিয়া গিয়া যখন তোমার জন্য কাঁদি, তখন তুমি হাস; আবার আমি যখন সংসারসুখে মত্ত হইয়া হাসি, তখন তুমি আমার জন্য কাঁদ—ভালবাসার এ কি লীলাখেলা! ভালবাসার তত্ত্ব পাইয়াছি—জীবন দিয়া জীবনলাভ।

৬। বিপথে।

বন্ধু গো! তোমার বন্ধুর দুর্দ্দশা একবার দেখিয়া যাও। তোমাকে বারেক ছাড়িয়া অন্যত্র গিয়াছিলাম বলিয়া আমার কি দশা হইয়াছে, একবার আসিয়া দেখ। আমি শ্রান্ত ক্লান্ত দেহে এই পথের ধারে আসিয়া পড়িয়াছি—কোথায় আসিয়াছি, কিছুই তো বুঝিতে পারিতেছি না—

চারিদিকে কাঁটার বন। ক্ষুধায় তৃষ্ণায় আকুল হইয়া পড়িয়াছি। আমার এই কষ্টের সময় বন্ধু হে! তুমি কোথায় আছ? একবার এসো—আমাকে পথ দেখাও। তোমারই জন্য তো এই জীবন রক্ষা করিয়া আসিয়াছি। কিন্তু আর না—আমার এ জীবন রাখিতে আর ইচ্ছা করিতেছে না—বিস্বাদ—বিস্বাদ! কাহার জন্যই বা জীবন রাখিব? সকল ছাড়িয়া তোমারই পশ্চাতে চলিয়া আসিলাম; আর আজ কি না, দৈবাৎ একবার ভুল করিয়া একটুখানি এদিক ওদিক সরিয়া গিয়াছি—অমনি তুমি তোমার বন্ধুকে ছাড়িয়া অদৃশ্য হইয়া গেলে? এক আধবার ভুলভ্রান্তি করিলে সংসারে তো মার্জ্জনা নাই দেখিয়াছি; কিন্তু তোমার কাছেও যদি ভুলভ্রান্তির জন্য মার্জ্জনা না পাইব, তবে তোমাকে বন্ধু বলিয়া ধরার কি দরকার ছিল? তোমার বন্ধুকে যদি বাঁচাইতে চাও, তবে আর বিলম্ব করিও না—শীঘ্র আসিয়া দেখা দাও—পথ দেখাও বন্ধু—পথ দেখাও—এই কাঁটার বনে শত বিষাক্ত কীটের মধ্যে আর এক মুহূর্ত্তও থাকিতে পারি না।

৭। বিষাদ।

বন্ধু হে! তোমাকে হারাইয়া আজ আমি কি অবস্থায় এদিকে ওদিকে ছুটিয়া বেড়াইতেছি, তাহা তো তুমি দেখিতেছ। দেহ শতবিধ কণ্টকের আঘাতে ক্ষতবিক্ষত হইয়া গিয়াছে। অনেক ঘুরিয়া ফিরিয়া আজ শ্রান্তচরণে ক্লান্তদেহে তোমার চরণতলে দুদণ্ডের জন্য আশ্রয় পাইব ভাবিয়া এই সুদৃশ্য বৃক্ষলতায় পরিশোভিত এবং সুগন্ধ রাশি রাশি ফুলে ফুলে ভরা এই বনের ধারে আসিয়া বসিয়াছি। এ সময়ে বন্ধু হে! তুমি আমাকে ছাড়িয়া কোথায় যাও? আমার প্রাণের উদ্বেলিত বেদনার তরঙ্গ কি তোমার হৃদয়ে পৌঁছিতেছে না? তোমার জন্য আমি এই যে পাগল হইয়া গিয়াছি, ইহাই দেখিতে কি তোমার বড় আনন্দ হয়? আজ কত দিন ধরিয়া তোমার আশাপথ চাহিয়া আছি। এই জগতে তোমার নাম লইয়া যেখানে যাই, সেইখানেই যেন চারিদিকে উৎসবের খেলা চলিতে থাকে; কিন্তু প্রাণের বন্ধু! আজ এ কি! আজ যে দিকেই চাই, যেন আনন্দ ফুটিতেই চায় না—হৃদয় যেন বিষাদে নিমগ্ন থাকিতে চায়—তোমার সংসারকে উদাসনয়নে দেখিতে চায়—যেন কোন কিছুতেই সত্যের ছাপ নাই—যেন সমস্তই একটা প্রকাণ্ড প্রহেলিকা! বন্ধু—বন্ধু! এসো মুহূর্ত্তের জন্য এসো—আমার নয়নের জল মুছাইয়া দাও—আমাকে এই আকাশজোড়া বিরাট অন্ধকার হইতে রক্ষা কর; আমার প্রাণে আশা দাও যে, তুমি আমার নিত্যসঙ্গী হইয়া আছ—আমি অভয় প্রাপ্ত হই।

৮। আবির্ভাব সম্বাদে।

বন্ধু গো! মনে হইতেছে তুমি আমার কাতর ডাক শুনিয়াছ এবং তোমার এই দীনদুঃখী বন্ধুকে আলিঙ্গন করিবার জন্য ছুটিয়া আসিতেছ। তুমি আসিতেছ—আমার জানিবার পূর্ব্বেই এই গাছপালা, এই বন উপবন, এই বনের পাখী, ইহারা জানিতে পারিয়াছে মনে হয়। তাই আজ সমস্ত বন উপবন ফুলে ফুলে ছাইয়া গিয়াছে; মলয় বাতাস ঝুরু ঝুরু প্রবাহিত হইয়া ধীরে ধীরে তোমারই গাত্রের সুগন্ধ বহন করিয়া আনিতেছে; তাহারই তালে তালে গাছপালা কচি কচি পাতার হাত পা নাড়িয়া কত না গ্রীবাভঙ্গীর সঙ্গে নৃত্য করিতেছে। তোমার আগমনবার্ত্তা শুনিয়া প্রকৃতিদেবী আজ নব নব ফুলহার গাঁথিয়া তোমার চরণে উপহার দিবার ব্যবস্থা করিতেছেন। আমারও প্রাণের ভিতর কত নূতন ভাব, কত নূতন বাসনা উদ্বেলিত হইয়া উঠিতেছে—মনটাকে যেন এই দেহের ভিতরে বন্ধ করিয়া ধরিয়া রাখিতে পারিতেছি না। সমস্ত প্রাণটাই যেন আজ বাহির হইয়া আসিতে চাহিতেছে—মনে হইতেছে, আজ যদি পাখীদের মত আমার ডানা হইত, তাহা হইলে তোমার এখানে আসিবার পূর্ব্বেই আমিই তোমার চরণে গিয়া আছড়াইয়া পড়িতাম। বন্ধু! তোমার অভাবে আমার প্রাণটা শূন্য হইয়া গিয়াছিল। আজ তুমি আসিতেছ শুনিয়াই আমার প্রাণটা আবার ভরিয়া উঠিতেছে। তোমার পার্শ্বে আমি দুই মুহূর্ত্ত বসিতে পারিব, এবং তুমি আমার সখাসুহৃৎরূপে আমারই পার্শ্বে নিত্যসঙ্গী থাকিবে, এ আনন্দ আমি আর কাহাকে জানাইব? এসো—এসো বন্ধু! আর বিলম্ব করিও না—প্রাণ আমার উতলা হইয়া উঠি-

যাছে—এসো—এসো—আর আমি স্থির হইয়া থাকিতে পারিতেছি না।

বঙ্গে পঞ্চব্রাহ্মণ কয়বার আসেন ?

(শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর)

আদিশূরের কীর্ত্তি অক্ষুণ্ণ কেন ?

বঙ্গের সামাজিক ইতিহাস আলোচনা করিলে বোঝা যায় যে, আদিশূরের যশ ও কীর্ত্তি উজ্জ্বল আকারে অক্ষুণ্ণভাবে নামিয়া আসিবার জন্য যে কোন কারণ থাক না কেন, জীবনের শেষভাগে তাঁহা কর্ত্তৃক পুত্রেষ্টি যজ্ঞ উপলক্ষে পঞ্চ ব্রাহ্মণ আনয়ন যে তাহার সর্ব্বপ্রধান কারণ, সে বিষয়ে কোন সন্দেহই নাই। ইহা ঐতিহাসিক সত্য হউক বা নাই হউক, অন্তত প্রবল জনশ্রুতি এই যে, রাজা আদিশূর বঙ্গদেশে পঞ্চগোত্রের পঞ্চ-ব্রাহ্মণ আনাইয়া বাস করাইয়াছিলেন। আদিশূর তাঁহার রাজ্যকালের ভিতর শৌর্য্য বীর্য্য প্রভৃতি বিবিধ রাজোচিত গুণের বিশেষ পরিচয় দিয়া যে অনন্যসাধারণ খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন, তাহাও সকল কুলগ্রন্থেরই সম্মত। কিন্তু আজ সে আদি-শূরও নাই, তাঁহার সে রাজ্যও নাই। তথাপি আজও যে আমরা তাঁহার যশ কীর্ত্তন করি, তাহার সর্ব্বপ্রধান কারণ হইল বঙ্গদেশে পঞ্চ ব্রাহ্মণ সংস্থাপন। বঙ্গদেশে যে শাণ্ডিল্যপ্রমুখ পঞ্চগোত্রীয় ব্রাহ্মণ, বলিতে গেলে, সকল বিষয়ে শ্রেষ্ঠতা ও প্রাধান্য লাভ করিয়াছেন, আদিশূরানীত ঐ পঞ্চ ব্রাহ্মণই তাঁহাদের পূর্ব্বপুরুষ বলিয়া প্রসিদ্ধি আছে। আজ কি পূর্ব্ববঙ্গে, কি পশ্চিম বঙ্গে, রাঢ়ীয় ও বারেন্দ্রদিগের এত যে প্রতিপত্তি দেখিতেছি, ইহার সম্পূর্ণ না হউক, অনেকটা মূল হইতেছে ঐ পঞ্চ ব্রাহ্মণের তপোবীর্য্য। তাঁহাদের গৌরব না করিয়া আমরা দাঁড়াইব কোথায় ? কাজেই পূর্ব্বপুরুষ-দিগের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিতে গেলেই ঐ পঞ্চ মহাপুরুষকে যে রাজা এদেশে আনাইয়া যথাযুক্ত-রূপে বসতি করাইয়াছিলেন, প্রত্যক্ষে বা পরোক্ষে সেই রাজা আদিশূরেরও নাম যে কোন না কোন প্রকারে আমাদের স্মৃতিপটে জাগ্রত হইয়া উঠিবে, তাঁহারও যশ ও কীর্ত্তি যে আমাদের মধ্যে পুরুষানু-ক্রমে বিঘোষিত হইবে তাহা আর আশ্চর্য্য কি।

রাষ্ট্রীয় ইতিহাসের অভাব।

ইতিহাস বলিতে বর্ত্তমানে প্রধানত রাষ্ট্রীয় ইতিহাসই ধরা যায়। যে সকল গ্রন্থে সংগ্রাম, রাজ্যহরণ প্রভৃতি বর্ণিত থাকে, সেই সকল গ্রন্থই আজকাল আমাদের নিকটে সাধারণত ইতিহাসরূপে পরিচিত হয়। পাশ্চাত্যদিগের নিকটেই আমরা এই ধারণা প্রাপ্ত হইয়াছি। পাশ্চাত্য ভূখণ্ডের আগ্নেয় পর্ব্বত সংগ্রামের সর্ব্বসংহারক অগ্নি চতু-র্দ্দিকে নিক্ষিপ্ত করিতে আজও বিরত হয় নাই। কিন্তু এই ভারতভূমি হইতে বহুকাল যাবৎ ভগবান সংগ্রামের অগ্ন্যুদগার একপ্রকার নির্ব্বাপিত করিয়া দিয়াছেন বলিলেও চলে। বর্ত্তমানে ভারতের এমনই অবস্থা যে, ভারতবাসী ক্ষাত্রবলের সফলতার প্রতি হতাদর প্রকাশে বাধ্য হইয়াছে। ভগবানের যেন ইচ্ছাই নয় যে, আমরা আবার ক্ষাত্রবলের সহায়তায় পাশবিক যুদ্ধে অবতীর্ণ হই। বহুকাল যাবৎ অহিংসাধর্ম্মের চর্চ্চায় অভ্যস্ত হইবার ফলে আজ সাধারণত ভারতবাসী ক্ষাত্রবল প্রয়োগে অনিচ্ছুক ; আবার, ভগবৎবিধানে আমাদের এমন অবস্থাও ঘটিয়াছে যে, ইচ্ছা করিলেও ক্ষাত্রবল প্রয়োগে আমাদের অধিকারই নাই। এই কারণে, আমাদের দেশে রাষ্ট্রীয় ইতিহাসের বড়ই অভাব ; যদি বা কোন গ্রন্থে রাষ্ট্রীয় ইতিহাসের কোন উল্লেখ থাকে, তবে তাহাও স্পর্শমাত্রে।

সামাজিক ইতিহাসের অভাব নাই।

কিন্তু আমাদের দেশে সামাজিক ইতিহাসের বড় একটা অভাব ছিল না, বরঞ্চ প্রাচুর্য্যই ছিল বলিয়া বোধ হয়। দেশে দীর্ঘকালব্যাপী শান্তি প্রতিষ্ঠিত থাকিলে যাহা হয়, তাহাই ঘটিয়াছিল — বঙ্গের ইতিহাসে সামাজিক ব্যাপারগুলিই প্রধান স্থান অধিকার করিয়া বসিল। আমাদের দেশে একটা সাধারণ সংস্কার আছে যে, পুরাণাদি এতই কল্পনাপূর্ণ যে, সেগুলির মধ্যে কোন প্রকার ইতি-হাসের ধারা সন্ধান করিতে গেলে গোলোকধাঁধায় পড়িয়া যাইতে হয়। অনেকেরই মতে মুসলমান-দিগের আগমনের পূর্ব্ববর্ত্তী কালের ভারতের প্রকৃত ইতিহাস সংগ্রহের কোনই উপায় নাই। সুখের বিষয়, এই ভ্রান্ত সংস্কার ধীরে ধীরে অন্তর্হিত হই-বার উপক্রম করিতেছে। কিন্তু বড়ই আক্ষেপের

কথা, রাষ্ট্রীয় বা সামাজিক ইতিহাসের যাহা কিছু মূল পুঁথি বা সহস্র বৎসর পূর্ব্বে পাওয়া যাইত, তাহাও বর্গী, বিধর্ম্মী ও বিদেশী প্রভৃতির অত্যাচারে এবং অনেক স্থলে গৃহদাহ, জলপ্লাবন প্রভৃতি প্রাকৃতিক দুর্দ্দৈবের কারণে বিনষ্ট হইয়া গিয়াছে, ইহা আমরা পূর্ব্বে আদিশূরকথায় বলিয়া আসিয়াছি। তদ্ব্যতীত, এখন বলাও অসম্ভব যে, কোথায় কোন্ তাম্রফলক বা প্রস্তরফলক ভবিষ্যৎ ঐতিহাসিকদিগের নিকট আত্মপ্রকাশ করিবার ইচ্ছায় বর্ত্তমানে আত্মগোপন করিয়া আছে। বিস্তর ইতিহাস, বিস্তর তাম্রফলক ও শিলালিপি বিলুপ্ত হইলেও এখনও যাহা পাওয়া যায়, তাহা হইতেই এদেশের ইতিহাস, বিশেষত সামাজিক ইতিহাস সংগ্রহ করা যে সম্পূর্ণ অসম্ভব, তাহা আমরা মনে করি না। এই সকল উপকরণ অবলম্বনেই আমরা আজও আমাদের পূর্ব্বপুরুষ ভট্টনারায়ণপ্রমুখ পঞ্চ ব্রাহ্মণ সম্বন্ধে নানা তথ্য সংগ্রহে সক্ষম হইয়াছি।

আদিশূর গৌড়পতি।

এই সকল ইতিহাস হইতে আমরা পাই যে, এক সময়ে রাজা অশোক প্রভৃতি পরাক্রান্ত অনেকগুলি বৌদ্ধ নৃপতির যত্নে ও চেষ্টায় বৌদ্ধধর্ম্মের প্রবল বন্যার মুখে বেদভিত্তি হিন্দুধর্ম্ম ভাসিয়া যাইবার উপক্রম করিয়াছিল। সম্বৎ দশম শতাব্দীর মাঝামাঝি (বা খৃষ্টীয় নবম শতাব্দীর শেষ ভাগে) কান্যকুব্জ প্রভৃতি দুই একটী রাজ্য ব্যতীত সমগ্র আর্য্যাবর্ত্তকে বৌদ্ধধর্ম্ম সমাচ্ছন্ন করিয়া ফেলিয়াছিল বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। মগধরাজ্য ও গৌড়রাজ্য বিশেষভাবে বৌদ্ধধর্ম্মের অধীনতা স্বীকার করিয়াছিল। অনুমান হয় যে, আদিশূরের সময়ে বৌদ্ধগণের মধ্যে ধর্ম্মের নামে নানাবিধ অনাচার কদাচার প্রবেশ লাভ করাতে বৌদ্ধধর্ম্মের বিরুদ্ধে বৈদিক হিন্দুধর্ম্মের একটা প্রবল প্রতিঘাত-তরঙ্গ উঠিয়াছিল; এবং সেই তরঙ্গের সূত্র অবলম্বনেই বৈদিক ধর্ম্মের একান্ত অনুরাগী বঙ্গাধিপতি আদিশূর বৌদ্ধ পালবংশীয় নৃপতিদিগের হস্ত হইতে গৌড়রাজ্য কাড়িয়া লইয়া গৌড়াধিপতিরূপে মূর্দ্ধাভিষিক্ত হন। আদিশূরের বংশই বৈদিক ধর্ম্মের পক্ষপাতী ছিলেন, তাই বংশপ্রতিষ্ঠাতা শালবান রাজা কুলগ্রন্থে "স্বধর্ম্মপরিপালক" রূপে উল্লিখিত হইয়াছেন।

আদিশূরের পূর্ব্বেও এদেশে অনেক ব্রাহ্মণের বাস ছিল।

এদেশবাসী জনসাধারণের বিশ্বাস এই যে, রাজা আদিশূর ক্ষিতীশপ্রমুখ বা ভট্টনারায়ণপ্রমুখ যে পঞ্চগোত্রীয় পঞ্চ ব্রাহ্মণ আনাইয়াছিলেন, তাঁহাদের পূর্ব্বে কান্যকুব্জ প্রভৃতি বিদেশ হইতে কোনও ব্রাহ্মণের এদেশে আসিয়া বসবাস তো দূরের কথা, আগমনই ঘটে নাই। কেবল তাহাই নহে, ঐতিহাসিকগণ যেই আবিষ্কার করিলেন যে, আদিশূরের পূর্ব্বেও এদেশে বন্দ্যঘটী ও সাবর্ণ্যগোত্রীয় ব্রাহ্মণের বাস ছিল, অমনি তাঁহারা স্থির করিলেন যে, আদিশূর কর্ত্তৃক ব্রাহ্মণ আনয়নের কথা সর্ব্বৈব কাল্পনিক *। আমরা ইহা স্বীকার করি না। বঙ্গরাজ্য ও তাহার পার্শ্ববর্ত্তী গৌড়রাজ্য যেরূপ বহু পূর্ব্বাবধি প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছিল, তাহাতে দেশবিদেশ হইতে অন্যান্য লোকের ন্যায় বিভিন্নগোত্রীয় ব্রাহ্মণদিগেরও বহুপূর্ব্বাবধি যাতায়াত মোটেই অসম্ভব ছিল না। হয়তো এই একটী কাকতালীয় ঘটনা ঘটিয়াছিল যে, কোন শাণ্ডিল্যগোত্রীয় ব্রাহ্মণ পূর্ব্বাবধিই বন্দ্যঘটী গ্রাম পাইয়া সেখানে বাস করিতেছিলেন, এবং উত্তরকালে ভট্টনারায়ণের বংশধর আদিবরাহও রাজার নিকটে ঐ বন্দ্যঘটী গ্রামই লাভ করিয়া বন্দ্যঘটী গ্রামীণ হইয়াছিলেন। তাই বলিয়া আদিশূরের সময়ে শাণ্ডিল্যগোত্রীয় ব্রাহ্মণের বঙ্গদেশে আগমন অস্বীকার করা যাইতে পারে না। আদিশূরের সমসময়ে বঙ্গদেশ একটী সুবৃহৎ রাজ্য ছিল এবং একে একে তাহার অনেকগুলি পরাক্রান্ত রাজাও হইয়াছিলেন। অনুমান হয়, বঙ্গদেশের অধিকাংশ প্রজা বৌদ্ধধর্ম্মের অনুরাগী হইলেও তাহার রাজারা বৈদিক ধর্ম্মের পক্ষপাতী ছিলেন বলিয়া মধ্যে মধ্যে জাঁকজমকের সহিত যাগযজ্ঞ করিতে ভাল বাসিতেন। এই সকল যাগযজ্ঞ উপলক্ষে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন প্রদেশ হইতে অনেক ব্রাহ্মণের আগমন যে ঘটিয়াছিল, তাহা অনেকটা নিঃসংশয়ে বলা যাইতে পারে।

কুলগ্রন্থে তিনবার পঞ্চব্রাহ্মণ আগমনের বিশেষ উল্লেখ।

ভারতের এক রাজার দেশ হইতে অপর

* গৌ, ব্রা, ৫২পৃঃ।

রাজার দেশে, বিশেষত কান্যকুব্জ ও বঙ্গদেশের পরস্পরের মধ্যে যে অবাধ গতিবিধি ছিল, তাহার প্রমাণের জন্য আমাদিগকে অধিক দূর যাইতে হইবে না। ক্ষিতীশবংশাবলী চরিত গ্রন্থে আছে, আদিশূর যখন যজ্ঞ করিবার অভিপ্রায় সভাস্থ ব্রাহ্মণদিগকে জানাইলেন, এবং তদুত্তরে ব্রাহ্মণগণ যখন বৈদিক যজ্ঞ করিবার অক্ষমতা জ্ঞাপন করিলেন, তখন সভাস্থ একজন ব্রাহ্মণ নিবেদন করিলেন যে, তিনি ইতিপূর্ব্বে কান্যকুব্জে গিয়াছিলেন, এবং সেখানে ব্রাহ্মণদিগকে বৈদিক যজ্ঞানুষ্ঠানে কৃতকার্য্য দেখিয়া অনতিপূর্ব্বেই বঙ্গদেশে ফিরিয়া আসিয়াছেন *। সাধারণতঃ এইরূপ অবাধ যাতায়াতের ব্যবস্থা থাকিলেও জনশ্রুতি ও তাহার মূল কুলগ্রন্থসমূহ আলোচনা করিলে অনুমান হয় যে, অন্তত তিনবার তিনটী সুবৃহৎ যজ্ঞানুষ্ঠান উপলক্ষে পাঁচ-পাঁচটী ব্রাহ্মণ বঙ্গদেশে বিশেষভাবে সমানীত হন।

রিক্ত।

গান।

(শ্রীনির্ম্মলচন্দ্র বড়াল)

রিক্ত করিয়া লয়ে গো আমায়
তোমার সুধায় ভরিবে;
বারে বারে এই ব্যথা দিয়ে দিয়ে
সকল হৃদয় হরিবে।
তাইতো গো তুমি ধন জন মান
সব হতে কাড়ি' লইলে এ প্রাণ,
অশ্রুসলিলে ধুলে দুনয়ান—
আপন যে মোরে করিবে।
তাই ভাল মোর, তাই ভাল—
নয়নের জল—সেই ভাল,
তব সনে যদি দরশন মিলে
বিষজ্বালা আরো আরো ঢালো।
দাও দাও মোরে বেদনার দান ;
বেদনার রঙে রাঙ্গা হোক্ প্রাণ
বক্ষশোণিতে বাহিরাক্ গান
তুমি সে হার কণ্ঠে পরিবে॥

রঙ্গালয় ও দেশোন্নতি।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

(শ্রীক্ষেমেন্দ্রনাথ ঠাকুর বি. এস্ সি)

সকলেই বলিতেছেন যে এখন আমাদের দেশের ভয়ানক দুর্দ্দিন আসিয়া উপস্থিত। কিন্তু এই দুর্দ্দিনে আমরা কি করিতেছি? বিগত যুদ্ধের সময়ে বিলাতের দুর্দ্দিনে সেই দেশের অনেক রঙ্গালয় ও আমোদপ্রমোদের ক্ষেত্র বন্ধ হইয়া গিয়াছিল। সকলেই তখন লড়াই করিতে ছুটিয়াছিল। আমরা তো বিলাতের নকলে এ দেশেও মহিলাগণকে রঙ্গালয়ে নামাইতে প্রবৃত্ত; কিন্তু বিলাতের নকলে দেশের দুর্দ্দিনে কি রঙ্গালয়ের অভিনয় বন্ধ করিতেছি?—না, আরও নূতন নূতন রঙ্গালয় খুলিয়া দেশকে উন্নতির (?) পথে লইয়া যাইবার ব্যবস্থা করিতেছি—মহিলাগণকে নাট্যশালার মিথ্যার আসরে নামাইতে চাহিতেছি?—দেশের ভূমিলক্ষ্মী আজ আমাদের প্রতি কাতর নয়নে চাহিয়া রহিয়াছেন, কিন্তু আমরা চলিয়াছি অভিনেত্রীর চটুল হাস্যে ও নৃত্য-ভঙ্গিমার মোহে অন্ধ হইতে। দেশের শিল্পবাণিজ্য আমাদিগকে কর্ম্মের ভেরীনিনাদে আহ্বান করিতেছে, কিন্তু আমরা চলিয়াছি আমোদপ্রমোদের পঙ্কিল স্রোতে ভাসিতে। আজ কোনও শিল্প বা বাণিজ্যের জন্য সামান্য টাকাও পাওয়া যায় না, কিন্তু সুবৃহৎ রঙ্গালয় স্থাপন ও পরিচালনের উপযোগী যথেষ্ট অর্থ দেখিতে দেখিতে সংগ্রহ হইয়া যায়। আজ আমরা শিল্পবাণিজ্যের উন্নতি-চিন্তায় আমাদের মস্তিষ্কের অপব্যয় না করিয়া রঙ্গালয়ের উন্নতিকল্পে প্রাণপাত করিতে দৃঢ়সঙ্কল্প হইয়াছি। আমাদের উন্নতির আর বাকী কি? কোনও দরিদ্রকে একটী পয়সা দান করিতে হইলেও আমরা মূর্চ্ছা যাই, কিন্তু রঙ্গালয়ে দশ বিশ টাকাও অনায়াসে হাসিমুখেই ব্যয় করি।—এই সবই কি উন্নতির লক্ষণ নয়?

কেহ কেহ আবার বলেন যে রঙ্গালয় নাকি সত্যসত্যই আমাদের উন্নতির লক্ষণ। উহা নাকি আমাদের উন্নতির পক্ষে প্রয়োজনীয় না হইলে এত দিন টিকিয়া থাকিতে পারিত না। কিন্তু এই যুক্তি একেবারে ভিত্তিহীন। তাহা হইলে ত সর্ব্ববিধ নেশাই উন্নতির পক্ষে প্রয়োজনীয় বলিতে হয়; কারণ সুরা হইতে কোকেন পর্য্যন্ত যত মাদকদ্রব্য আজ পর্য্যন্ত আবিষ্কৃত হইয়াছে তাহাদের সবগুলিই ত এ পর্য্যন্ত বেশ টিকিয়া আছে। অতএব স্পষ্টই বোঝা যায়, টিকিয়া আছে বলিয়াই যে সেটি প্রয়োজনীয় তাহা হইতেই পারে না। এ যুক্তি যুক্তিই নয়। জীবনের উন্নতির জন্য মাদক-

---

* "অথ তৎসভোপবিষ্টঃ কশ্চিদ্ব্রাহ্মণোঽচিরমেব কান্যকুব্জদেশা-[illegible] জগাদ"—ক্ষি বং ১পৃঃ।

দ্রব্যাদির ন্যায় রঙ্গালয়েরও কোন প্রয়োজন আছে বলিয়া মনে করি না। কিন্তু তথাপি লোকে তাহা জানিয়া অথবা না জানিয়া উহাতে আকৃষ্ট হইতেছে। কে তাহাতে বাধা দিবে? দেশের চিন্তাধারার পরিচালকগণ?—তাঁহারাই যে এ সকলের কর্ত্তা। তাঁহাদেরই কুদৃষ্টান্তে দিন দিন অশিক্ষিত দরিদ্রগণও বিলাসিতার পথে গমন করিয়া স্বকীয় সর্ব্বনাশের পথ উন্মুক্ত করিতেছে। এ দেশের দারিদ্র্যের প্রধান কারণ কেবল অজন্মা নয়, কেবল বিদেশে রপ্তানি নয়—কিন্তু বিলাসিতা, অমিতব্যয়িতা ও চরিত্রহীনতা। এই সমুদয় দোষেরই অন্যতম প্রধান কারণ রঙ্গালয়। আর দেশের তথাকথিত পরিচালকগণ ধ্বংসের মূল রঙ্গালয়গমনের কুদৃষ্টান্ত দেখাইয়া দেশের কি অমঙ্গলই না ডাকিয়া আনিতেছেন! কে এ অমঙ্গলকে প্রতিরুদ্ধ করিবে?—শিক্ষিতসমাজ?—এদেশ রক্ষার পক্ষে শিক্ষিতসমাজকে এক সময়ে প্রধান সহায় মনে হইত; মনে হইত, শিক্ষিতসমাজ আদর্শের উজ্জ্বল বর্ত্তিকা লইয়া অগ্রসর হইলে এদেশের সকলেই সেই আদর্শে অনুপ্রাণিত হইবে; কিন্তু হায়, শিক্ষিতসমাজে এখন সারি সারি অনিষ্টকর আসক্তির বাতি জ্বালাইবার বহুল চেষ্টা চলিতেছে। ক্ষণস্থায়ী আমোদের লোভে তাঁহারা অজ্ঞানীর ন্যায় দেশের কি ঘোর অনিষ্টই না করিতেছেন?—আর আমোদই বা কিসের?—যদি আজ কোন ম্যাটসিনি, রায়েল্পী, পার্কার বা গ্যারিবল্ডি এদেশে জন্মিতেন তবে তিনি কি আজ আমোদে প্রমত্ত হইতেন?—না গভীর দুঃখের কালিমায় আচ্ছন্ন হইয়া নির্জ্জনে দেশের দুঃখের জন্য কাঁদিতে বসিতেন? কিন্তু আমরা আজ আমোদে মাতিয়া—মধুভাবে ডুবিয়া হাসিয়া বেড়াইতেছি—দেশের উন্নতি অপেক্ষা 'আর্ট'এর উন্নতিসাধনে ব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছি; তাহাতে দেশ যায় ত যাউক; ক্ষতি নাই!—চারুকলা বা আর্ট ত পরিপুষ্টি লাভ করিবে—তাহা হইলেই হইল!!!

যে দেশের চিন্তাধারার পরিচালকগণও লালসা সংযম করিতে পারেন না—যে দেশের নেতৃবৃন্দের অধিকাংশ বিলাসে বিমুগ্ধ, সে দেশের উন্নতি কোথায়? মহাজনের পথেই ত জনসাধারণ চলিবে। যে দেশে মহাজনরূপে কথিত ব্যক্তিগণও কামনার পঙ্কিলহ্রদে হাবুডুবু খান সে দেশে কিরূপে আশা করা যায় যে, জনসাধারণ দুর্নীতিকে বিষবৎ দেখিবে? এবং যে দেশের জনসাধারণ দুর্নীতিনিমগ্ন, সে দেশের লোক সময় কোথায় পাইবে যে দেশের অন্নচিন্তার সমাধান করিবে? আমরা দেশবাসীকে আহ্বান করিয়া বলিতেছি, যাঁহারা দেশকে বিলাসের পথে লইয়া যান, ধ্বংসের পথে লইয়া যান তাঁহারা যত বড়ই হউন, তাঁহারা দেশনেতা নন। তাঁহাদের বিদ্যাবুদ্ধি যতই থাকুক না কেন, দেশ যেন তাঁহাদের অনুসরণ না করে। দেশবাসীর প্রধান কর্ত্তব্য, দেশের বর্ত্তমান বিলাসস্রোতকে সবলে বাধা দেওয়া।

অনেকে আবার এই বাধা দেওয়াকে স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ মনে করেন। আশ্চর্য্য ধারণা ইহাদের স্বাধীনতা সম্বন্ধে!! যে বিলাসিতার কারণে ইতিহাসপ্রসিদ্ধ জাতিসকল ধ্বংস হইয়া গিয়াছে, যে বিলাসিতার কুফল চাক্ষুষ ও যুক্তির সাহায্যেও প্রত্যক্ষ করিতেছি, তাহাতে বাধা দেওয়া কি স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ? মানুষের শরীর মন আত্মাকে বিলাসের অনলে ধ্বংস হইতে না দিলে কি স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করা হয়, অথবা তাহার উন্মত্ততায় বাধা দেওয়া হয়? যদি কেহ আত্মহত্যা করিতে যায় অথবা নিজের ঘরে আগুন লাগাইতে চায়, তাহাতে বাধা দেওয়াও কি স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ? ইহা যদি স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ হয় তবে আমরা সহস্রবার স্বাধীনতায় এইরূপ হস্তক্ষেপ প্রার্থনা করি। আমরা স্বাধীনতার নামে স্বেচ্ছাচারিতা বা উন্মত্ততা চাহি না।

শেষে আমরা একটী কথা বলিতে চাহি। ব্রাহ্মধর্ম্মকে হৃদয়ে উপলব্ধি করিলে কেহ আধুনিক রঙ্গালয়ে গমন সমর্থন করিতে পারেন কি না সন্দেহ। ব্রাহ্মধর্ম্মের, সকল সত্যধর্ম্মেরই মূল মন্ত্র ভগবানের সঙ্গে আত্মার যোগসাধন। রঙ্গালয়ে অভিনয় করা বা দেখা যে এই যোগসাধনে সহায়তা করে না, তাহা বিবেচক ব্যক্তিমাত্রেই স্বীকার করিবেন। রঙ্গালয়েও গমন করিবেন, আর নিজেকে ব্রাহ্ম বলিয়া পরিচয় দিবেন, অধিকাংশ স্থলেই ইহাও অসম্ভব। ব্রাহ্ম নামধারীদের মধ্যে কেহ কেহ রঙ্গালয়ে যান ও অভিনয় করেন বলিয়া ব্রাহ্মসমাজ যে উহার পক্ষপাতী ধরিতে হইবে এমন কোন কারণ নাই। বুঝিতে হইবে যে, তাঁহারা ব্রাহ্মবংশীয় হইলেও ব্রাহ্ম নন, বা ব্রাহ্মধর্ম্ম পালন করেন না। যিনি ব্রাহ্মধর্ম্ম পালন করেন তিনি যে দেশ, যে কাল বা যে জাতিরই হউন না কেন তিনিই ব্রাহ্ম। 'জাতব্রাহ্ম' বলিয়া কথাই হইতে পারে না। যেমন ব্রাহ্মণের পুত্র হইলেই ব্রাহ্মণ হওয়া যায়, তদ্রূপ ব্রাহ্মের পুত্র হইলেই ব্রাহ্ম হওয়া যায় না। কার্য্য ও গুণ দ্বারাই ব্রাহ্মত্ব নিরূপিত হয়; কখনই জন্মদ্বারা ব্রাহ্মত্ব নিরূপিত হইতে পারে না। রাজা রামমোহন রায়, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ অথবা ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্রকে ভক্তি করিলেই ব্রাহ্ম হওয়া যায় না; ব্রাহ্মপদ্ধতিমতে বিবাহাদি অনুষ্ঠানমাত্র করিলেও ব্রাহ্ম হওয়া যায় না; কিন্তু যিনি সত্যের উপাসক, যিনি আপনাকে যোগসাধনের পথে অগ্রসর করেন তিনিই ব্রাহ্ম। আমি যদি দুষ্কর্ম্মের

অভিমুখে মনকে পরিচালিত করি তাহা হইলে আমি ব্রাহ্মবংশে জাত হওয়া সত্বেও ব্রাহ্ম নহি। ব্রাহ্মত্ব বংশগত নহে কিন্তু কর্ম্মগত। ব্রাহ্মবংশে জাত হইয়াও, ব্রাহ্মপদ্ধতিমতে অনুষ্ঠানাদি করিয়াও যে ব্যক্তি মদ্যপানাদি দুষ্কর্ম্ম করে, সে সেই সকল দুষ্কর্ম্ম দ্বারাই সুস্পষ্ট প্রমাণ করে যে সে ব্রাহ্ম নহে ; কারণ প্রকৃত ব্রাহ্ম কখন জানিয়া শুনিয়া দুষ্কর্ম্ম করিতে পারেন না। তবে দুষ্কৃতকারী যে ব্রাহ্মপদ্ধতিমতে অনুষ্ঠানাদি করে তাহা সে ব্রাহ্মধর্ম্ম মানে বলিয়াই যে করে তাহা নহে, কিন্তু সাংসারিক স্বার্থের ও সুখের অনুরোধেই সে ঐ কার্য্য করে। মুখে ব্রাহ্ম বলিয়া দাবী করিলেও সে ব্রাহ্ম নহে। রঙ্গালয়ে যদি স্ত্রীলোকের অংশ স্ত্রীলোকের দ্বারা অভিনীত না হয় তবে সে রঙ্গালয় যে টিকিতে পারে না, তাহা পরীক্ষিত হইয়া গিয়াছে। সুতরাং ইহা সুস্পষ্ট যে, রঙ্গালয় সুনীতিপূর্ণ গ্রন্থ অভিনয় করিলেও সুনীতির পরিপোষক নয়। অতএব সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতিকামী ব্রহ্মপরায়ণ সাধুর পক্ষে রঙ্গালয় গমন কিছুতেই সমর্থন করা যায় না, কারণ তিনি কখনই দুর্নীতির পৃষ্ঠপোষক হইতে পারেন না।

উপসংহারে বক্তব্য, এই বিপদের দায়িত্ব কোনও বিশেষ একটী সমাজের উপর ফেলিয়া নিশ্চিন্ত হইলেও চলিবে না। যে কারণেই হউক বিপদ আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে—এই বিপদ আমাদের দেশের—মাত্র কোনও বিশেষ সমাজের নহে। দেশের সকল হিতৈষী ব্যক্তির—সকল হিতৈষী সংবাদপত্রের কর্ত্তব্য, দেশকে এ বিপদের বিষয়ে সাবধান করিয়া দেওয়া। যাঁহারা ভারতমহিলাদের সম্বন্ধে বিদেশীয়দের অন্যায় ও অসঙ্গত উক্তিতে চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছিলেন, আজ সেই উক্তিরই সত্যতা প্রতিপন্ন করিবার পথে যে সকল আয়োজন চলিয়াছে তাহার প্রতিবাদ না করিয়াও তাঁহারা কিরূপে স্থির আছেন? যে চারুকলা বা আর্ট স্পষ্টই বিজ্ঞাপনের সাহায্যে সাধারণকে লালসার কীট হইবার জন্য আহ্বান করে, যে রঙ্গালয়ের বিজ্ঞাপন দিবার জন্য বিদেশীদের উক্ত উক্তি অপেক্ষাও হীন ভাষা ও ভাব ব্যবহার করিতে হয়—সেই দেশবিধ্বংসী রঙ্গালয়ের বিরুদ্ধে মত প্রকাশ না করিয়া শিষ্টসমাজসেবিত সংবাদপত্রসমূহ কিরূপে মৌন অবলম্বন করিয়া আছেন, বুঝি না। সংবাদপত্রসম্পাদকগণ নাট্যশালা সম্বন্ধে এতটা নির্ব্বাক কেন? তাঁহারা কি রঙ্গালয়ের নিয়মিত ভক্তগণের অধিকাংশের অবনতি চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ করিয়াও নাট্যশালার অপকারিতা বুঝিতেছেন না, অথবা রঙ্গালয়সমূহ হইতে বিনা মূল্যে প্রবেশপত্র (pass) পাইয়া অভিনয় দর্শনের ক্ষণস্থায়ী সুখের লোভে দেশের এত বড় অমঙ্গল কার্য্যের বিরুদ্ধে সামান্যমাত্রও আপত্তি করিতে সাহস করিতেছেন না, অথবা 'বড়' 'বড়' লোক ইহার পৃষ্ঠপোষক বলিয়া ভয়ে সত্য সমালোচনা করেন না? যদি ইহারা সেই ভয়েই সমালোচনা না করেন তবে বলিতে হইবে যে, এদেশের উদ্ধারের আশা এখনও বহুদূরে। যে দেশের সম্পাদকগণের লোকমতগঠনের সাহস নাই—যে দেশের সম্পাদকগণ অন্যায়ের বিরুদ্ধে দাঁড়াইতে ভয় পান—যে দেশের সম্পাদকগণ 'গ্রাহক কমিয়া যাইলে অর্থহানি হইবে' এই ভয়ে সত্য কথা বলিতে সাহস করেন না, সেই অর্থলিপ্সু দেশে স্বরাজের চীৎকার বৃথা। অর্থলাভ হইলেই যদি অন্যায় কার্য্যেও উৎসাহ দেওয়া বা তাহার বিরুদ্ধে না দাঁড়ান দোষের না হয় তবে মীরজাফর প্রভৃতি আর কি দোষ করিয়াছেন? তাঁহারাও ত অর্থপ্রাপ্তির আশাতেই অন্যায় কার্য্যে উৎসাহ দিয়াছিলেন—অর্থলোভেই ত তাঁহারা জানিয়া শুনিয়াও অন্যায়ের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হন নাই। আমরা আজ এই সকল সম্পাদককে ডাকিয়া বলিতেছি, মীরজাফর আদির পন্থা পরিত্যাগ করুন, অর্থলোভে দেশের সর্ব্বনাশ ডাকিয়া আনিবেন না। ক্ষণস্থায়ী অর্থের লোভে তাঁহারা যদি দেশের এই মহা অনিষ্টের বিরুদ্ধে দাঁড়াইতে ইতস্ততঃ করেন ত তাঁহাদের স্মরণ রাখা উচিত যে, তাঁহাদের এই ইতস্ততঃ করার ফল কেবল যে দেশ ভোগ করিবে তাহা নহে—দেশের সঙ্গে সঙ্গেই তাঁহাদের সন্তানসন্ততিকেও উহা ভোগ করিতে হইবে। দেশকে পরাধীন করিতে সাহায্য করায় মীরজাফর আদির সন্তানসন্ততি যে সেই পরাধীনতার দুঃখ ও কষ্ট হইতে নিষ্কৃতি পাইয়াছে তাহা নহে—দেশের আর সকলের সহিত তাহাদিগকেও সমান ভাবেই পরাধীনতা-পাপের ক্লেশ ভোগ করিতে হইতেছে। মনে রাখিবেন, অর্থলিপ্সু হইয়া আজ দেশের দুর্নীতির তালে তাল দিলেও ইহার পরিণাম ভীষণ হইবে। আজ দেশ বিলাসমোহে অচেতন হইয়া বুঝিতে পারিতেছে না—কোন্ পথে চলিয়াছে। কিন্তু কাল যখন মোহ কাটিয়া যাইবে—যখন জ্ঞান ফিরিয়া আসিবে—তখন যাহারা জানিয়া শুনিয়াও তাহাকে অবনতির পথে ঠেলিয়া লইয়া চলিয়াছিল তাহাদের সে কিছুতেই ক্ষমা করিবে না—তাহা নিঃসন্দেহ। ফরাসিবিপ্লবের সময়ে যাহারা উন্নতির ছদ্মবেশে দেশকে অবনতিতে লইয়া যাইতেছিল, তাহাদের নামে বিপ্লবের মোহে মুগ্ধ ফরাসীগণ মাতিয়া উঠিত। কিন্তু যখন মোহ কাটিয়া যাইল—চেতনা ফিরিয়া আসিল তখন রোবস্পীয়র্ প্রমুখ সেই সকল ব্যক্তিকেই দেশকে অবনতির পথে লইয়া যাওয়ার দোষে হত্যা করিবার জন্য ফরাসী জনসাধারণ উন্মত্ত হইয়া উঠিয়াছিল। সেই জন্যই আমরা সকল মান্যগণ্য লোককে আহ্বান করিয়া বলিতেছি, জানিয়া শুনিয়াও ক্ষণস্থায়ী অর্থের বা যশের বা

সুখের লোভে দেশের দুর্নীতির বিরুদ্ধে দাঁড়াইতে ভয় পাইয়া অধর্ম্মকে ডাকিয়া আনিবেন না। এখন কিছুদিন অধর্ম্মের ফলে সুখ অর্থমানযশলাভ হইলেও ইহার পরিণাম ভীষণ। সর্ব্বদা স্মরণ রাখিবেন।

অধর্ম্মেণৈধতে তাবত্ততো ভদ্রাণি পশ্যতি।
ততঃ সপত্নান্ জয়তি সমূলস্তু বিনশ্যতি॥

অধর্ম্মের দ্বারা আপাততঃ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় ও কুশল লাভ করে, এবং শত্রুগণকে জয় করে কিন্তু শেষে সমূলে বিনাশ প্রাপ্ত হয়।

সংহিতাকালীন আর্য্যাবর্ত্ত।

(শ্রীঅশোকনাথ ভট্টাচার্য্য)

'সপ্তসিন্ধু' শীর্ষক প্রবন্ধে আমরা দেখাইয়াছি যে, ত্রিসপ্তনদীপরিবেষ্টিত সিন্ধুনদের তীরভাগই ছিল প্রাচীনতম কালের আর্য্য-নিবাসকেন্দ্র। ঐতরেয়কে দেখিতে পাওয়া যায়—"যস্তেজোব্রহ্মবর্চ্চসমিচ্ছেৎ…প্রাঙ্ স ইয়াৎ, যোঽন্নাদ্যমিচ্ছেৎ…দক্ষিণা স ইয়াৎ, যঃ সোমপীথমিচ্ছেৎ …উদঙ্ স ইয়াৎ" (১। ২। ২)। পূর্ব্বাদি দিক্‌সমূহের উল্লেখ করিলেই "কাহার পূর্ব্ব, দক্ষিণ বা উত্তর?"—এ প্রশ্নটি স্বভাবতঃ মনোমধ্যে উদিত হয়। আমরা মনে করি সিন্ধুই এখানে অভিপ্রেত অবধি। সিন্ধুর পূর্ব্ব, দক্ষিণ ইত্যাদি স্বীকারে পূর্ব্বোক্ত শ্রুতি রক্ষিত হয়। সিন্ধুর পূর্ব্বে যজ্ঞানুষ্ঠানবাহুল্যনিবন্ধন ব্রহ্মবর্চ্চসলাভের সহায়তা হইত, শতদ্রু-সিন্ধুসঙ্গমের দক্ষিণভূভাগে ভূমির উর্ব্বরতা ও জলবায়ুর নাতিশীতোষ্ণতাপ্রযুক্ত প্রচুর শস্য উৎপন্ন হইত। পশ্চিমে অরণ্যপ্রাচুর্য্য হেতু বহু পশু দৃষ্ট হইত; এবং শতদ্রুসিন্ধুসঙ্গমের উত্তরাংশে শীতপ্রাবল্য হেতু সোমলতা উৎপন্ন হইত *। ঐতরেয়ালোচন গ্রন্থে পূজনীয় সত্যব্রত সামশ্রমী মহোদয় এই বিষয় বেশ স্পষ্টরূপে বুঝাইয়া দিয়াছেন। প্রাচীনতম আর্য্যাবাসের মেরুদণ্ডস্বরূপ ছিল সিন্ধুনদ। এই 'সিন্ধু'কে পাশ্চাত্য জাতিগণ স্বভাবতঃ 'হিন্দু' উচ্চারণ করিতেন, এবং ইহা হইতে 'হিন্দুস্তান' (সিন্ধুস্থান) শব্দের উৎপত্তি।

অতি খরস্রোতা রসা নামক সিন্ধুসঙ্গতা নদী ছিল এই আর্য্যাবাসের উত্তর সীমা। এ সম্বন্ধে শৌনক বলিয়াছেন—"কিমিচ্ছন্তী পণিভিরসুরৈর্নিগূঢ়া গা অন্বেষ্টুং সরমাং দেবশুনীমিন্দ্রেণ প্রহিতামযুগুভিঃ পণয়ো মিত্রীয়ন্তঃ প্রোচুঃ, স তান্ যুগ্মাভ্যাভিরপিচ্ছন্তী প্রত্যাচষ্টে।" আমরা এখানে ইহার সায়ণ-ভাষ্যের মর্ম্মানুবাদ প্রদান করিতেছি, —"ইন্দ্রপুরোহিত বৃহস্পতির গাভীগুলি বলনামক অসুরের অনুচর পণিনামক অসুরগণ কর্ত্তৃক অপহৃত হইলে বৃহস্পতির প্রেরণায় ইন্দ্র গাভী-অন্বেষণের নিমিত্ত সরমা নামক দেবশুনীকে প্রেরণ করেন। তিনিও মহাস্রোতা নদী উত্তীর্ণ হইয়া গুপ্তস্থানে রক্ষিত গাভীগুলি দেখিতে পান। এদিকে পণিগণও এই সংবাদ পাইয়া সরমার সহিত মৈত্রীকরণে ইচ্ছুক হইয়া তাঁহার সহিত এইরূপ কথাবার্ত্তা স্থির করেন……।" বস্তুতঃ এখানে পণি অর্থে বণিক্, সার্থবাহ। নিরুক্তকার বলিতেছেন—"পণির্বণিগ্ ভবতি" (২। ৫। ৩); "অসুরাঃ=বলবন্তঃ" (৩।২।২)। প্রকৃতপক্ষে 'অসুর' অর্থে এস্থলে 'আর্য্যেতর' বুঝায় *। সরমা দেবশুনী নিশ্চয়ই অসাধারণ গুণবিশিষ্টা সুশিক্ষিতা কোন কুক্কুরী †। বলপুরীর গুহা আর্য্যশাসনবহিস্থ কোন পর্ব্বতপ্রদেশ বোধ হয়। অনার্য্য কর্ত্তৃক অপহৃত গাভী কুক্কুরী সহায়ে আর্য্যগণ কর্ত্তৃক পুনর্লব্ধ হইয়াছিল, ইহাই ইহার সারমর্ম্ম। অপরাংশ রাজনৈতিক কাব্যমাত্র। ইহার কথঞ্চিৎ আভাস পাওয়া যায় ঋক্‌সংহিতার দশমমণ্ডলে—

"কিমিচ্ছন্তী সরমা প্রেদমানড্ দূরে হ্যধ্বা জগুরিঃ পরাচৈঃ।
কাস্মে হেতিঃ কা পরিতক্ম্যাসীৎ কথং রসায়াঃ অতরঃ পয়াংসি।"
(১০।১০৮।১) ইত্যাদি

এই রসার উল্লেখ ঋক্‌সংহিতায় বহুস্থলে দেখিতে পাওয়া যায়—"গিরেরিব প্ররসা অস্য পিম্বিরে দত্রাণি পুরুভোজসঃ" (৮। ৪৯। ২)। ইহা হইতে স্পষ্ট বোধ হয় যে, রসা গিরিসম্ভূতা। আরও মনে হয়, যথা সিন্ধুর পূর্ব্বভাগে অবস্থিত সপ্তনদীর সাধারণ নাম ছিল 'গঙ্গা'; 'সরস্বতী' যেমন একাই প্রাধান্যবশতঃ অন্য বহু নদীর বাচক ছিল; তেমনই সিন্ধুর পশ্চিমভূভাগস্থ সপ্তনদীর বাচক ছিল 'রসা'। অথবা, গঙ্গা যেরূপ নদীমাত্রেরই সাধারণ নাম, সরস্বতী যেমন নদীমাত্রেরই সাধারণ নাম, রসাও সেইরূপ ছিল। এইজন্য নিরুক্তকার গঙ্গা শব্দের নিরুক্তি করিয়াছেন 'গঙ্গা গমনাৎ'; সরস্বতী শব্দের নিরুক্তি করিয়াছেন 'সর ইত্যুদকনাম, সর্ত্তেস্তদ্বতী'; এবং রসা শব্দেরও নিরুক্তি করিয়াছেন "রসা নদী, রসতেঃ শব্দকর্ম্মণঃ।" সুতরাং রসা নদীসাধারণেরও বোধিকা। পূর্ব্বোক্ত মন্ত্রে (৪। ৪৯। ২) "রসাঃ" বহুবচন দেখিয়া ইহাই বোধ হইয়া থাকে। অন্ততঃ রসার দ্বিত্ব সম্বন্ধে আমরা স্পষ্ট প্রমাণ পাইয়াছি—"তৃষ্টাময়া" ইত্যাদি নদীস্তুতির ষষ্ঠ ঋকে রসাকে সিন্ধুসঙ্গতা বলা হইয়াছে, আবার

---

* সোম শীতপ্রধানপ্রদেশেই উৎপন্ন হয়।

* "অসুর" শব্দের বৈদিক অর্থ দৈত্য নহে। অসুর শব্দ বরুণ, ইন্দ্র প্রভৃতি দেবতাগণের উদ্দেশে ব্যবহৃত হইয়াছে—ইহার অর্থ, শত্রুনাশক, প্রাণদায়ক, সর্ব্বশক্তিমান্ cp:—অহুরমজ্দা (আবেস্তা)। "দৈত্য" অর্থ অপেক্ষাকৃত আধুনিক।

† অথবা Amazon শ্রেণীর কোন রমণী? তঃ সং।

(১০।২২।৪) ঋকে "সমুদ্রং রসয়া সহাহুঃ" রসাকে সমুদ্রসঙ্গত বলা হইতেছে। সুতরাং দুটি রসার অস্তিত্ব এস্থলে স্বীকার করা ব্যতীত গত্যন্তর নাই। সমুদ্রসঙ্গতা এই দ্বিতীয়া রসা, আর্য্যাবর্ত্তের বহির্ভা, খোরাশান্ রাজ্যান্তর্গত আবেস্তাবর্ণিত 'রংহা' *। এই রসা তদানীন্তন আর্য্যাবাসের পশ্চিম সীমা ছিল এবং সরমা-পণিসংবাদ ইহার তীরেই সঙ্ঘটিত হইয়াছিল †।

অংশুমতী প্রভৃতি নদীগুলি আর্য্যাবাসভূমির অন্তর্গতা ছিল। অংশুমতী (ঋ, সং ৮। ৯৬। ১৩, ১৪, ১৫) যমুনাসঙ্গতা, দৃষদ্বতীর পূর্ব্বভাগে স্থিতা। অশ্মন্বতী (ঋ, সং, ১০। ৫৩। ৮), ঘর্ঘরার পশ্চিমে শতদ্রুর পূর্ব্বে উত্তর-দক্ষিণে প্রবহমানা বিনশনপ্রদেশীয়া। (ঋ, সং ১। ১০৪। ১, ২, ৩) ঋকে বর্ণিত শিফানামক নদী নিষধদেশীয়া, ইহা প্রথম ঋকে নিষদ শব্দের উল্লেখে স্পষ্টই অনুমিত হয়। (৬। ২৭। ৫, ৭) ঋক্‌দ্বয়ে বর্ণিত 'হরিযূপীয়া' ও 'যব্যাবতী' নামক নদীদ্বয় আফ্‌গানিস্থান মধ্যবর্ত্তী বলিয়া বোধ হয়। ইহাদিগের আধুনিক নাম "হরিরুদ্" ও ঝোব (Zhob)।

ঋক্‌সংহিতায় ১০। ২৭। ১৭ মন্ত্রে যে অক্ষা নদীর নাম দৃষ্ট হয়, উহা আধুনিক Oxus বা মহাকবি বর্ণিত বক্ষু।

নদীস্তুতি মধ্যে যে শ্বেতী নদীর নাম পাওয়া যায়, তাহার অপর নাম অর্জ্জুনী, ইহা "সপ্তসিন্ধু" প্রবন্ধে বর্ণিত হইয়াছে। এই শ্বেতী শ্বেতপর্ব্বত হইতে উদ্ভূত; শতপথে দেখিতে পাই—প্রাচ্যোহন্যা নদ্যঃ স্যন্দন্তে শ্বেতেভ্যঃ পর্ব্বতেভ্যঃ প্রতীচ্যোহন্যাঃ (১৪. ৬. ৮. ৯)। শ্বেতয়াবরী নামে অপর যে একটি নদীর নাম পাওয়া যায় (ঋ, সং, ৮। ৩৬। ১৮), তাহাও সম্ভবতঃ এই শ্বেতপর্ব্বত হইতে উদ্ভূত। সংহিতায় সরযূর নাম তিনবার দৃষ্ট হয়। এই সরযূ তক্ষশিলানগরীতলবাহিনী সিন্ধুসঙ্গতা নদী।

বাজসনেয়ি-সংহিতায় 'কাম্পিল্যবাসিনী' শব্দ (২৩, ১৮) দৃষ্টিগোচর হয়। এই কাম্পীল্যনগরী দশার্ণ প্রদেশের পূর্ব্বভাগে অবস্থিতা দক্ষিণ-পাঞ্চালের রাজধানী আধুনিক কম্পিলনগরী ‡। সাঙ্কাস্য (সাঙ্কাশ্য ?) উহার নৈঋতে, ইক্ষুমতী নদীতীরে অবস্থিত ছিল। উহা জনকভ্রাতা কুশধ্বজের রাজধানী বলিয়া রামায়ণে বর্ণনা পাওয়া যায়। বুদ্ধদেব এখানে ত্রয়স্ত্রিংশ স্বর্গ হইতে অবতরণ করিয়াছিলেন। এবং এস্থলে ইহা মথুরার আঠার যোজন অগ্নিকোণে বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। [Fa Hvan XVII : 18 yojanas S. E. of Mathura]. Cunningham উহাকে ইক্ষুমতীতীরস্থ সঙ্কিশ বা সঙ্কিশ বসন্তপুরের প্রাচীন নাম বলিয়া স্বীকার করেন। আমরা উহাই পূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি। Vincent Smith ইহাতে বিশ্বাস করেন না; তিনি বলেন, "The Elephant Pillar at Sankisa can not be the Lion Pillar seen by Yuan Chwang". He would look for it in the N. E. corner of the Ita district (Introd to Cun Geography,—S. N. Mazumdar Shastri M. A. P. R. S.—P. 706). বৃহদারণ্যকোক্ত (৩, ৩, ১) কপিপ্রদেশ ইহারই সন্নিকটে। হর্ষবর্দ্ধনের "মধুবন প্লেটে" উহার নাম পাওয়া যায় কপিত্থিকা, বরাহমিহির উহার নাম করিয়াছেন কাপিত্থক; ওয়াঙ্‌ চোয়াঙের গ্রন্থের টীকায় দৃষ্ট হয় যে উহারই প্রাচীন নাম Seng-ka-She (সাঙ্কাস্য)। নিরুক্তমধ্যে যে কপিষ্ঠলপ্রদেশের উল্লেখ পাওয়া যায় (৪, ১৪) উহা এই কপিপ্রদেশ বলিয়াই মনে হয়। অনতিপ্রাচীন পুরাণেতিহাস-বর্ণিত যক্ষু, বক্ষু, সীতা, গৌরী প্রভৃতি নদীগুলি বৈদিক আর্য্যপরিব্রাজকগণের বিজ্ঞাত হইলেও তাঁহাদিগের বাসস্থানের অন্তর্ভুক্ত ছিল না, ইহা নিঃসন্দেহে বলা যায়। এমন কি, বিন্দুসরোবর, মানস-সরোবর, রাবণহ্রদ প্রভৃতিও ঐরূপ পরিচিত হইলেও প্রাচীনতম কালে আর্য্যনিবাসের বহির্ভুক্ত ছিল বলিয়াই বোধ হয়।

পাণিনি-সূত্র-গ্রথিত কাপিশনগর আর্য্যাবর্ত্তের অন্তর্গত। কানিংহাম সাহেব উহাকে কপিশা বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন, কিন্তু উহার প্রকৃত নাম কাপিশী। উৎকৃষ্ট মধু ও দ্রাক্ষার জন্য স্থানটি বিখ্যাত (কাপিশায়নী সুরা, কাপিশায়নী দ্রাক্ষা, কাপিশায়নং মধু)। সুরার উল্লেখ পাণিনিসূত্রে না থাকিলেও অর্থশাস্ত্রে পাওয়া যায় *। "Y. Ch's Ka-pi-shih also gives the same sound and is nearer to the original than the classical forms of Kapisa" †,

ঋকসংহিতায় একটি মন্ত্র দৃষ্ট হয়—

"প্রাতে মা বৃহতো মাদয়ন্তি
প্রবাতেজা ইরিণে বর্বৃতানাঃ।

* বিশ্বকোষ দ্রষ্টব্য।

† ইহা প্রাচীনতম আর্য্যাবাসের সীমা, পরবর্ত্তী সংহিতাকালে ইহা আরও পশ্চিমে বিস্তৃত হইয়াছিল।

‡ Kampilya (Mod. Kampil in Forokhabad dist, U. P.) was the capital of south Panchala......Panchala raughly corresponds to Budaon, Furrukhabad and the adjoining districts of U. P.—(Introduction to Cunningham's Ancient Geography of India P, 704-5) - S, N. Mazumdar.

* পা. সূ. ৪.২.১ এবং কৌ. অ. শা. ২. ২৫.

† I. C. A. G. P. 671.

সোমস্যেব মৌজবতস্য ভক্ষো
বিভীদকো জাগৃবির্মহ্যমচ্ছান্॥"—(১০।৩৪।১)

ইহার অর্থ লইয়া অনেকে অনেক গোলমাল করিয়াছেন। সায়ণ ইরিণ শব্দের অর্থ করিয়াছেন আস্ফার; অন্যত্র তিনি 'ইরিণ' শব্দের অর্থ উষরপ্রদেশ, নিম্নতটাকদেশ ইত্যাদিও করিয়াছেন। Macdonell সাহেব অর্থ করিয়াছেন 'diceboard' এবং রমেশচন্দ্র দত্ত 'ছক' বলিয়া অনুবাদ করিয়াছেন। যাস্ক ব্যাখ্যা করিয়াছেন—'ইরিণং নির্ঋণমৃণাতেরপার্ণং ভবতি অপরতা অস্মাদোষধয় ইতি বা।" দুর্গাচার্য্য ইহার টীকা লিখিবার সময় বলিয়াছেন—"ইরিণে বধ্তাপাঃ নিগতর্ণে আস্ফুরকস্থানে বর্তমানা; ন হি তত্র পুত্র-পৌত্রানুগমৃণং ভবতি।" সত্যব্রত সামশ্রমী মহাশয় যাস্কের প্রথম অর্থ স্বীকার করিয়া "ইরিণে, ইরাণ নামক পারস্যদেশে" এই অপূর্ব্ব অর্থ আবিষ্কার করিয়াছেন। এবং ইহার সমর্থনরূপে দুর্গাচার্য্যের উক্তি স্বীকার করিয়া বলিতেছেন, "তদ্দেশীয়ানাং হি ভারতীয়ানামিব পুত্রপৌত্রাদিষপি পিতৃপৈতামহমৃণং ন সংক্রমতে।...মূজবান্ পর্ব্বতস্তু কৈলাসগিরেঃ পশ্চিমস্থোঽদ্যাপি রাজতে।" (ঐতরেয়ালোচন, পৃঃ ৩৫)। অতএব তাঁহার অনুমানে মূজবান্ পর্ব্বত ও ঈরাণপ্রদেশ বৈদিক আর্য্যাবাসের অন্তর্ভুক্ত ছিল।

অথর্ব্ববেদের পঞ্চম কাণ্ডে দ্বাবিংশতিতম সূক্তের তৃতীয় ঋকে পরুষ নামক জনপদের, চতুর্থে মহাবৃষপ্রদেশের, পঞ্চম এবং সপ্তমে মূজবৎ প্রদেশ ও বহ্লিকদেশের এবং চতুর্দ্দশে অঙ্গমগধমূজবৎ গন্ধারী প্রভৃতি দেশের উল্লেখ দৃষ্ট হয়। এবং এগুলি সমস্তই অনার্য্যবাসস্থল রূপে ঐ সময়ে পরিগণিত হইত সন্দেহ নাই, অন্যথা তক্মস্থাপন লইয়া বিশেষ বিরোধ উপস্থিত হয়। উক্ত সূক্তের একটি মন্ত্রে—

"গন্ধারিভ্যো মূজবদ্ভ্যোঽঙ্গেভ্যো মগধেভ্যঃ।
প্রৈষ্যন্ জনমিব শেবধিং তক্মানং পরিদদ্মসি॥"

আথর্ব্বণগণের যে আর্য্যাবাসমধ্যে তক্মস্থাপন অভিপ্রেত ছিল ইহাও সঙ্গত মনে হয় না। সুতরাং এরূপ ব্যবহার যে অনার্য্যজুষ্ট প্রদেশেই বর্ত্তমান ছিল সে বিষয়ে আমরা নিঃসন্দেহ। কিন্তু "সপ্তসিন্ধু" প্রবন্ধে আমরা দেখাইয়াছি যে, গান্ধার (কান্দাহার) ও পরুষ (পেশাবর) আর্য্যাবর্ত্তের অন্তর্ভুক্ত ছিল, সুতরাং অথর্ব্ববেদের প্রামাণ্যে ইহাদিগকে অনার্য্যনিবাস বলা যায় কিরূপে? ইহার উত্তরে বক্তব্য এই যে, ঋক্ সংহিতার সময় যে প্রদেশ আর্য্যজুষ্ট ছিল, অথর্ব্বসংহিতার যুগে (উক্ত মন্ত্রদ্রষ্টার সময়ে) তাহা যে অনার্য্যসেবিত হইয়া দাঁড়ায় নাই তাহা কে বলিবে? বেদ এক, অখণ্ড, অদ্বিতীয়, অপৌরুষেয় হইলেও মন্ত্রসমূহের সূক্ষ্মাকারে পরমেশ্বরে অবস্থিতি হইতে দ্রষ্টা ঋষিগণের সকাশে একই সময়ে যুগপৎ স্থূলরূপ প্রাপ্তি ঘটে নাই। বিভিন্ন যুগে বিভিন্ন মন্ত্র সেই বিশেষ যুগের বিশেষত্ব দ্বারা পরিশোভিত হইয়া আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল (Revelation)*। সুতরাং ঋঙ্মন্ত্রে ও আথর্ব্বণ মন্ত্রে বিরোধ হইবার আশঙ্কা নাই।

ঋক্‌সংহিতা পাঠে জানা যায় যে, মূজবান্ পর্ব্বতে উৎকৃষ্ট সোম পাওয়া যাইত; কিন্তু এতদ্ব্যতীত উহা যে আর্য্যসাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল তাহার কোনই প্রমাণ নাই। পরন্তু ঐতরেয় ব্রাহ্মণে দেখা যায় যে, সোম অনার্য্যগণের অধিকারেই ছিল; মহাবৃষ প্রদেশসম্বন্ধেও এই কথাই বলা যায়। শতপথব্রাহ্মণে (১২।৩।১) যদিও শ্বেত পর্ব্বতের পশ্চিমস্থ বহ্লিক প্রদেশের আর্য্যাবাসত্ব প্রমাণিত হয়, তথাপি অথর্ব্বসংহিতাকালে উহাকে অনার্য্যনিবাস বলাই সঙ্গত। কালভেদে অবস্থাভেদ এসকল স্থলে অবশ্য স্বীকার্য্য। অঙ্গরাজ্য ত মাত্র দুর্য্যোধনাদির সময় হইতে আর্য্যাবাসে পরিণত হয়†। অনার্য্যাবাস বলিয়া মগধের নিন্দা ঋক্‌সংহিতায় দৃষ্ট হয়—

"কিং তে কৃণ্বন্তি কীকটেষু গাবো
নাশিরং দুহ্রে ন তপন্তি ধর্ম্মম্।" (৩।৫৩।১৪)

নিরুক্তকার ইহার অর্থ করিয়াছেন—"কীকটো নাম দেশোঽনার্য্যনিবাসঃ।" (৬—৬—৪) এই কীকটই মগধ। এ সম্বন্ধে প্রসিদ্ধ স্মৃতিবচন আছে—

"কীকটেষু গয়া পুণ্যা, পুণ্যা নদী পুনঃপুনা।
চ্যবনস্যাশ্রমং পুণ্যং পুণ্যং রাজগৃহং বনম্॥"

গয়াদি স্থান মগধের অন্তর্গত।

উপসংহারে বক্তব্য এই যে, মূজবান্ পর্ব্বত আর্য্যাবাসের অন্তর্ভুক্ত হউক বা না হউক, উহা তদানীন্তন আর্য্যনিবাসের সীমা (উত্তরসীমা) বলিয়া পরিগণিত হইত। এই জন্য বাজসনেয়িসংহিতায় দৃষ্ট হয়—"তেন পরো মূজবতোঽতীহি" (২।৬১)। রুদ্র নামক মৃত্যুদেবতার মূজবানের পরপারে গমনের প্রার্থনা দেখিয়া ইহাকেই এই নববিস্তৃত আর্য্যাবাসের উত্তর সীমা বলিয়া অনুমান করা হইয়া থাকে।

সুতরাং সংহিতাকালীন আর্য্যাবর্ত্তের চতুঃসীমা নির্দ্দেশ করিতে গিয়া আমরা বলিতে পারি যে—

আধুনিক এসিয়ামাইনর উহার পশ্চিম সীমা‡ অঙ্গবঙ্গ

* ভবিষ্যতে সামর্থ্য ও অবসর থাকিলে বেদের অপৌরুষেয়ত্ব সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ লিখিতে বাসনা রহিল।

† "অঙ্গবঙ্গকলিঙ্গেষু সৌরাষ্ট্রমগধেষু চ।
তীর্থযাত্রাং বিনা গচ্ছন্ পুনঃসংস্কারমর্হতি॥"
ইহার আর ব্যাখ্যার প্রয়োজন নাই।

‡ সামশ্রমী মহোদয়ের "ইরিণ অর্থে ঈরানপ্রদেশ" এই অপূর্ব্ব ব্যাখ্যা স্বীকার না করিলেও পারস্যের কিয়দংশ ও মেসোপোটেমিয়া প্রভৃতি আধুনিক ভূভাগ তৎকালে যে আর্য্যাবাসের অন্তর্ভুক্ত ছিল তাহার অন্য প্রমাণ পাওয়া যায়। (vide "সপ্তসিন্ধু", তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, ফাল্গুন, ১০০১)।

প্রদেশ পূর্ব্বসীমা, সিন্ধুসাগরসঙ্গম উহার দক্ষিণসীমা ও মুজবান্ পর্ব্বত উহার উত্তরসীমারূপে অবস্থিত ছিল। ইহার পরে আর্য্যাবাস কিরূপে আরও বিস্তৃতিলাভ করিল তাহা অন্য প্রবন্ধে বলিবার ইচ্ছা রহিল।

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

(শ্রীমন্মথনাথ ঘোষ এম-এ)

হঠাৎ নবাব : এই প্রহসনের আখ্যানভাগ সংক্ষেপে এই। কোনও দোকানী হঠাৎ কিছু ধনলাভ করিয়া বড়লোকের ন্যায় চলিতে আরম্ভ করে। তাহার দুহিতা এক দরিদ্র যুবাকে ভালবাসিয়াছিল, কিন্তু দরিদ্র বলিয়া সে কিছুতেই সেই যুবার হস্তে কন্যা সম্প্রদান করিতে সম্মত হইল না। তখন ঐ যুবা কতিপয় বন্ধুর সাহায্যে তুর্কের নবাব সাজিয়া ছদ্মবেশে তাহাকে প্রতারিত করিল এবং ধনী জামাতা হইবে এই লোভে দোকানী তখন তাহার কন্যাকে সেই যুবার হস্তে সম্প্রদান করিল। বলা বাহুল্য এই গ্রন্থখানিতে প্রচুর হাস্য রস আছে এবং ইহা পরবর্ত্তী বহু প্রহসনের আদর্শ স্বরূপ হইয়াছিল।

ব্যবসায়বাণিজ্য ও ষ্টীমার পরিচালনা।

এই সময়ে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ কিছুদিন তাঁহার ভগিনী স্বর্ণকুমারী দেবীর স্বামী কংগ্রেসের বিখ্যাত কর্ম্মী জানকীনাথ ঘোষাল মহাশয়ের সহযোগে পাটের ব্যবসায় করিয়াছিলেন। পরে উহা বন্ধ করিয়া তিনি শিয়ালদহে কিছুদিন নীলের চাষ করেন। ব্যবসায়ে বেশ লাভ হইয়াছিল। কিন্তু শীঘ্রই নীলের বাজার খারাপ হওয়াতে তিনি এই ব্যবসায় বন্ধ করিয়া দেন।

এই সময়ে একদিন 'এক্সচেঞ্জ গেজেটে' এক বিজ্ঞাপন দেখিয়া জ্যোতিরিন্দ্রনাথ মধ্যাহ্নে নীলামে গেলেন এবং বাটি ফিরিয়া আসিয়া খবর দিলেন যে, সাত হাজার টাকা দিয়া তিনি একটি জাহাজের খোল কিনিয়াছেন। ইহার উপর এঞ্জিন জুড়িয়া কামরা প্রস্তুত করিয়া একটা সম্পূর্ণ জাহাজ প্রস্তুত করিতে হইবে। বাঙ্গালায় বাঙ্গালীর মধ্যে তিনি অগ্রণী হইয়া প্রথম ষ্টীমার পরিচালনা করিবেন। আকাঙ্ক্ষায় তিনি মাতিয়া উঠিলেন এবং সুদক্ষ য়ুরোপীয় এঞ্জিনিয়ারদিগের তত্ত্বাবধানে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের—জ্যোতিরিন্দ্রনাথ বলি কেন বাঙ্গালীর—প্রথম ষ্টীমার "সরোজিনী" কিছু দিনের মধ্যেই প্রস্তুত হইল; এবং সুনিপুণ ফরাসী পোতাধ্যক্ষের দ্বারা পরিচালিত হইতে লাগিল। ক্রমে ক্রমে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ বিপুল অর্থব্যয়ে "বঙ্গলক্ষ্মী", "স্বদেশী", "ভারত" এবং "লর্ড রিপণ" নামে আরও কয়েকখানি ষ্টীমার ক্রয় করেন। এই সকল জাহাজ খুলনা এবং বরিশালের মধ্যে যাত্রী লইয়া গমনাগমন করিত এবং সময়ে সময়ে কলিকাতাতেও বাণিজ্যদ্রব্য বহন করিয়া আনি।

জ্যোতিরিন্দ্রনাথের ষ্টীমার পরিচালনা কার্য্য আরম্ভ হইবার অব্যবহিত পূর্ব্বে 'ফ্লোটিলা কোম্পানী' নামক এক য়ুরোপীয় কোম্পানী ষ্টীমার পরিচালনা আরম্ভ করিয়া দিয়াছিল। উভয় দলের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলিতে লাগিল।

বাঙ্গালীর দেশাত্মবোধ তখন জাগরিত হইয়াছে। পূর্ব্ববঙ্গে সর্ব্বত্র স্বদেশানুরাগী সজ্জনগণ স্বদেশী জাহাজের উন্নতির জন্য চেষ্টা পাইতে লাগিলেন এবং সংকীর্ত্তন, বক্তৃতা প্রভৃতি দ্বারা দেশবাসীকে বিদেশী জাহাজে আরোহণ করিতে নিষেধ করা হইতে লাগিল। "বালকে" প্রকাশিত এবং 'প্রবন্ধমঞ্জরী'তে পুনর্মুদ্রিত জ্যোতিরিন্দ্রনাথের 'বরিশালের পত্র' হইতে কিয়দংশ এই স্থানে উদ্ধারযোগ্য :—

"তুমি অবশ্য জান এখানে আমার যেমন জাহাজ চলবে তেমনি ফ্লোটিলা কোম্পানীরও জাহাজ চলবে। আমাদের উভয়ের মধ্যে খুব প্রতিদ্বন্দ্বিতা। ফ্লোটিলা কোম্পানীর অনেক খরচপত্র লোকজনের ব্যয়, কিন্তু তারা প্রায়ই যাত্রী পায় না। অধিকাংশ যাত্রী আমাদের জাহাজে যায়। তাদের বিস্তর ক্ষতি হচ্চে তবু তারা সমান নিয়মিত ভাবে জাহাজ চালাচ্চে—যত্নের একটু ত্রুটি কিম্বা শৈথিল্য করে না; আর তারা প্রকাশ্যভাবে বলে—বাঙ্গালীর অধ্যবসায় নাই, তারা আমাদের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা ক'রে কতদিন জাহাজ চালাতে পারবে? এখানে আমাদের জাহাজ যাতে স্থায়ী হয় তার জন্য এখানকার লোকের, বিশেষতঃ ইস্কুলের ছাত্রদের অপরিসীম উৎসাহ ও যত্ন। এমন উৎসাহ আমি কখন দেখিনি, তাদের ভাব দেখে চমৎকৃত হতে হয়। প্রত্যহ খুব ভোরে আমাদের জাহাজ এখান থেকে যাত্রী নিয়ে খুলনায় যায় ফ্লোটিলা কোম্পানীর জাহাজও সেই সময় যায়। পাছে আমাদের জাহাজে লোক না গিয়ে প্রতিপক্ষের জাহাজে যায়, এই জন্য কতকগুলি ভদ্রলোক ও স্কুলের ছাত্র রাত্রি ৪টার সময় উঠে' দলবদ্ধ হয়ে উৎসাহের সহিত জাহাজের ঘাটে প্রত্যহ উপস্থিত হন ও যদি কোন যাত্রী প্রতিপক্ষের জাহাজে যেতে চায়, তাকে অনেক প্রকার বুঝিয়ে এমন কি, পায়ে পর্য্যন্ত ধরে ফিরিয়ে আনেন—যেখানে জালি বোটে করে প্রতিপক্ষের জাহাজে লোক উঠছে সেখান পর্য্যন্ত গিয়ে তাদের বুঝাতে থাকেন—'আমাদের কথাটি একবার শুনুন, তারপর যে জাহাজে ইচ্ছা হয় যাবেন। আপনারা বাঙ্গালী, বাঙ্গালীর জাহাজ থাকতে কেন

আপনারা ইংরাজদিগের জাহাজে যাবেন? দেশের টাকা দেশে থাকে এটা কি প্রার্থনীয় নহে? প্রতিপক্ষের জাহাজে স্বদেশীয়দিগের প্রতি কুব্যবহার করা হত, অপমান করা হত,—আমাদের নিমন্ত্রণেই আমাদের আহ্বানেই ঠাকুর বাবুরা এখানে জাহাজ এনেছেন, তখন কি আপনার ও-জাহাজে যাওয়া উচিত? 'তা বটে, যা বল্লে তার উত্তর নাই, চল ঐ জাহাজে যাওয়া যাক্।' এই বলে যাত্রীরা আমাদের জাহাজে অনেকে ফিরে আসেন। একটি বার বৎসর বয়স্ক বালক ঘাটে সেদিন বক্তৃতা দিয়াছিল। 'হে ভাই সকল, তোমরা আপনার জাহাজ থাকতে পরের জাহাজে যাইবা না। উহাদের ঐ যে জাহাজ দেখিতেছ, উহার যেরূপ গঠন তাহাতে একটু বেশী বাতাস উঠিলেই দোদুল্যমান হইয়া জলগর্ভে নিমগ্ন হইবে। তাহার সাক্ষী দেখ, উহারা এখানে জাহাজ রাখিতে পারে নাই—ওপারে লইয়া গিয়াছে এবং এই বাতাসেই দোদুল্যমান হইতেছে, যদি তোমরা প্রাণ বাঁচাইতে চাও ত ভাই সকল, ঐ জাহাজে যাইবা না—" এই কথা শুনে নীচশ্রেণী লোকদের ভয় হল আর প্রতিপক্ষের জাহাজে তারা গেল না। ঝড় হোক বৃষ্টি হোক রৌদ্র হোক—যে কোন বাধা হোক, কিছুই না মেনে তাঁরা জাহাজের সিটি (বাঁশির ডাক) শুনবামাত্র দৌড়ে ঘাটে এসে উপস্থিত হন। তাঁহারা বলেন আমাদের সিটি তাঁহাদের এমন মিষ্টি লাগে ও তা শুনতে পেলে তাঁহাদের এমন আমোদ হয় যে তাহা বলবার নয়। বন্ধুদের সুপরিচিত গলার স্বর দূর হতে শুনলে যেমন বুঝা যায় কে আসছে তেমনি সিটি শুনলেই কোন্ জাহাজ আসছে তাঁ'রা বুঝতে পারেন। ঐ আজ "ভারত" আসছে, ঐ "লর্ড রিপণ" আসছে, ঐ "বঙ্গলক্ষ্মী" আসছে, ঐ "স্বদেশী" আসছে—এই বলে সকলে উৎসাহের সহিত হাস্যমুখে দলবদ্ধ হয়ে ঘাটে এসে উপস্থিত হন। সেদিন একজন বলছিলেন, যেমন বৃন্দাবনের শ্রীকৃষ্ণের বংশীধ্বনিতে হৃদয় আকৃষ্ট হত, সেইরূপ তাঁহাদেরও হৃদয় আকৃষ্ট হয়। আবার প্রতিপক্ষের জাহাজের নাম পর্য্যন্ত তাঁরা সইতে পারেন না—তার সিটিও তাঁদের কাণে অত্যন্ত কর্কশ লাগে। প্রতিপক্ষের জাহাজ যদি কোনদিন যাত্রী পায়—সেদিন তাঁদের আপসোসের আর সীমা থাকে না।

সেদিন আমাকে অভ্যর্থনা করবার জন্য এখানে যে বৃহৎ সভা হয়েছিল, তাতে একটি বক্তা আমার ষ্টীমারের উল্লেখ করতে করতে হঠাৎ আপনাকে সম্বরণ করে বল্লেন—তাঁর ষ্টীমার ভুলক্রমে বলেছি—ইহা তো আমাদেরই ষ্টীমার—এই কথাটি আমার বড় ভাল লেগেছিল। সেদিন সে সভায় অনেক লোক একত্র হয়েছিলেন, একটি প্রকাণ্ড গৃহ লোকে পূর্ণ হয়ে গিয়েছিল, এখানকার হাকিম, উকীল, জমিদার, দোকানদার, মহাজন অনেকেই উপস্থিত ছিলেন। এখানকার প্রধান জমীদার শ্রীযুক্ত বরদাকান্ত রায় সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। অনেকগুলি সুবক্তা সেদিন বক্তৃতা করেছিলেন। সে দিন ছাত্রদিগের আহ্লাদ ও উৎসাহের সীমা ছিল না। তারা আপনারাই সভার বিজ্ঞাপন ঘরে ঘরে গিয়ে বণ্টন করেছিল, গাছের পাতা দিয়ে ঘরটি সুন্দর সাজিয়েছিল। তাদের উৎসাহ দেখলে নিরাশ প্রাণেও আশার সঞ্চার হয়—নিরুদ্যম হৃদয়ে উদ্যমের ভাব আসে।"

বলা বাহুল্য এইরূপ প্রতিদ্বন্দ্বিতার ফলে উভয় পক্ষেই আর্থিক ক্ষতি অগ্রাহ্য করিয়া প্রতিপক্ষকে সমূলে উৎপাটিত করিবার চেষ্টা পাইতে লাগিল। ফ্লোটিলা কোম্পানী টিকিটের মূল্য হ্রাস করিলেন, জ্যোতিরিন্দ্রনাথও তদপেক্ষা মূল্য হ্রাস করিলেন। এইরূপ করিতে করিতে একরূপ বিনামূল্যেই যাত্রীগণকে লইয়া যাওয়া হইতে লাগিল। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ সর্ব্বস্ব পণ করিয়া বিপক্ষকে উচ্ছেদ করিতে প্রয়াস পাইলেন। শুনিয়াছি সময়ে সময়ে যাত্রীগণের নিকট টিকিটের মূল্য লওয়া দূরে থাকুক, বিনামূল্যে তাহাদিগকে মিষ্টান্ন খাওয়াইয়া স্বদেশী জাহাজে লওয়া হইত। স্বদেশী ষ্টীমার পরিচালনায় এই প্রথম উদ্যম সফল করিবার জন্য, দেশের গৌরব রক্ষা করিবার জন্য, স্বদেশপ্রাণ জ্যোতিরিন্দ্রনাথ সর্ব্বস্ব ধরিয়া দিলেন। রবীন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন—"প্রতিযোগিতার তাড়নায় জাহাজের পর জাহাজ তৈরি হইল, ক্ষতির পর ক্ষতি পড়িতে লাগিল এবং আয়ের অঙ্ক ক্রমশই ক্ষীণ হইতে হইতে টিকিটের মূল্যের উপসর্গটা সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হইয়া গেল, বরিশাল খুলনার ষ্টীমার লাইনে সত্যযুগ আবির্ভাবের উপক্রম হইল। যাত্রীরা যে কেবল বিনা ভাড়ায় যাতায়াত সুরু করিল তাহা নহে, তাহারা বিনামূল্যে মিষ্টান্ন খাইতে আরম্ভ করিল। ইহার উপরে বরিশালের ভলান্টিয়ারের দল স্বদেশী কীর্ত্তন গাহিয়া কোমর বাঁধিয়া যাত্রী সংগ্রহে লাগিয়া গেল। সুতরাং জাহাজে যাত্রীর অভাব হইল না, কিন্তু আর সকল প্রকার অভাবই বাড়িল বই কমিল না। অঙ্কশাস্ত্রের মধ্যে স্বদেশহিতৈষিতার উৎসাহ প্রবেশ করিবার পথ পায় না; কীর্ত্তন যতই জমুক, উত্তেজনা যতই বাড়ুক, গণিত আপনার নামতা ভুলিতে পারিল না। সুতরাং তিন ত্রিক্‌খে নয় ঠিক তালে তালে ফড়িঙের মত লাফ দিতে দিতে ঋণের পথে অগ্রসর হইতে লাগিল।

"অব্যবসায়ী ভাবুক মানুষের একটা কুহক এই যে, লোকেরা তাঁহাদিগকে অতি সহজেই চিনিতে পারে,

কিন্তু তাঁহারা লোক চিনিতে পারেন না, অথচ তাঁহারা যে চেনেন না এইটুকু মাত্র শিখিতে তাঁহাদের বিস্তর খরচ এবং ততোধিক বিলম্ব হয় এবং সেই শিক্ষা কাজে লাগানো তাঁহাদের দ্বারা ইহজীবনেও ঘটে না। যাত্রীরা যখন বিনামূল্যে মিষ্টান্ন খাইতেছিল তখন জ্যোতিদাদার কর্ম্মচারীরা যে তপস্বীর মত উপবাস করিতেছিল এমন কোনো লক্ষণ দেখা যায় নাই; অতএব যাত্রীদের জন্যও জলযোগের ব্যবস্থা ছিল, কর্ম্মচারীরাও বঞ্চিত হয় নাই; কিন্তু সকলের চেয়ে মহত্তম লাভ রহিল জ্যোতিদাদার—সে তাঁহার এই সর্ব্বস্ব ক্ষতি স্বীকার।"

প্রভূত ক্ষতি স্বীকার করিয়াও জ্যোতিরিন্দ্রনাথ আরও কিছুদিন দেশের জন্য ষ্টীমার পরিচালনা করিয়াছিলেন। শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলেন, প্রতিপক্ষগণ ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া আর একটি য়ুরোপীয় কোম্পানীকে (হোরমিলার কোং) সমুদয় স্বত্ব বিক্রয় করেন। একটি য়ুরোপীয় কোম্পানীকে ফেল করিয়া অপর একটি কোম্পানীকে ফেল করিবার শক্তি না থাকায় জ্যোতিরিন্দ্রনাথ হতাশ হইয়া পড়িলেন। এই সময় একটি দুর্ঘটনা ঘটিল। তাঁহার "স্বদেশী" নামক জাহাজ খুলনা হইতে বাণিজ্যদ্রব্য লইয়া নির্ব্বিঘ্নে সমস্ত পথ আসিয়া হাওড়ার পুলে ঠেকিয়া হঠাৎ জলমগ্ন হইল। জাহাজের বাণিজ্যদ্রব্যাদিও সমস্ত নষ্ট হইয়া গেল। কেহ কেহ বলেন জ্যোতিরিন্দ্রনাথের কোনও কর্ম্মচারীর বিশ্বাসঘাতকতার ফলে এই দুর্ঘটনা ঘটিয়াছিল। এই দুর্ঘটনায় জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ষ্টীমার পরিচালনা কার্য্য বন্ধ করিতে বাধ্য হইলেন। বাবু (পরে রাজা) প্যারীমোহন মুখোপাধ্যায় মহাশয় এই সময় প্রতিপক্ষগণের নিকট হইতে একটি প্রস্তাব আনিলেন যে তাঁহারা উপযুক্ত মূল্যে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের সমস্ত কারবার ক্রয় করিতে প্রস্তুত। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ অগত্যা এই প্রস্তাবে সম্মত হইলেন। ন্যায্য মূল্য অপেক্ষা অতিরিক্ত অর্থ পাইলেও জ্যোতিরিন্দ্রনাথ তাঁহার প্রভূত ঋণ সম্পূর্ণরূপে পরিশোধ করিতে সমর্থ হইলেন না। এই সময়ে দানবীর পরোপকারী স্যর তারকনাথ পালিত তাঁহার বন্ধুর উপকারার্থে অগ্রসর হইলেন। তিনি উত্তমর্ণদিগকে বুঝাইয়া এবং স্বয়ং প্রভূত অর্থ সাহায্য করিয়া জ্যোতিরিন্দ্রনাথকে ঋণমুক্ত করিয়াছিলেন। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ এই জন্য তারকনাথের প্রতি চিরকৃতজ্ঞ ছিলেন।

এইরূপে, রবীন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন, জ্যোতিরিন্দ্রনাথের সাত হাজার টাকায় ক্রীত জাহাজের খোল ভর্ত্তি হইয়াছিল "কেবল এঞ্জিন ও কামরায় নহে, ঋণে এবং সর্ব্বনাশে। কিন্তু একথা মনে রাখিতে হইবে এই সকল চেষ্টায় ক্ষতি যাহা, সে একলা তিনিই স্বীকার করিয়াছেন, আর ইহার লাভ যাহা তাহা নিশ্চয়ই এখনো তাঁহার দেশের খাতায় জমা হইয়া আছে। পৃথিবীতে এইরূপ বেহিসাবী লোকেরাই দেশের কর্ম্মক্ষেত্রের উপর দিয়া বারম্বার নিষ্ফল অধ্যবসায়ের বন্যা বহাইয়া দিতে থাকেন; সে বন্যা হঠাৎ চলিয়া যায়, কিন্তু তাহা স্তরে স্তরে যে পলি রাখিয়া চলে তাহাতেই দেশের মাটিকে প্রাণপূর্ণ করিয়া তোলে—তাহার পর ফসলের দিন যখন আসে তখন তাঁহাদের কথা কাহারও মনে থাকে না বটে, কিন্তু সমস্ত জীবন যাঁহারা ক্ষতি বহন করিয়াই আসিয়াছেন মৃত্যুর পরবর্ত্তী এই ক্ষতিটুকুও তাঁহারা অনায়াসে স্বীকার করিতে পারিবেন।"

আচার্য্য স্যর জগদীশচন্দ্র বসু একদিন আমাদিগকে স্মরণ করাইয়া দিয়াছিলেন, "প্রবাল-কঙ্কাল হইতেই মহাদ্বীপের উৎপত্তি হইয়া থাকে।" আমরা বিশ্বাস করি, স্বদেশপ্রেমিক জ্যোতিরিন্দ্রনাথের স্বপ্ন অদূর ভবিষ্যতে সফল হইয়া স্বদেশের গৌরব বিঘোষিত করিবে।

"বালক"। যে সময়ে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ষ্টীমার পরিচালন কার্য্যে ব্যাপৃত ছিলেন, তিনি সে সময়ে সাহিত্য ও শিল্পচর্চ্চায় অনবহিত ছিলেন না। ঠিক এই সময়েই (১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে) সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের সহধর্ম্মিণী মাননীয়া শ্রীযুক্তা জ্ঞানদানন্দিনী দেবীকে সম্পাদিকা করিয়া রবীন্দ্রনাথ কিশোরবয়স্কগণের জন্য "বালক" নামক একখানি সচিত্র মাসিকপত্র প্রকাশ করেন। শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলেন যে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের ভবনে ১১ই মাঘ মাঘোৎসব হইয়া যাইবার পর তিনি ও পরিবারস্থ অপর কয়েকজন বালক পরদিন ভাঙ্গা আসরে "১২ই মাঘ" করিতেন। বালকবালিকারা মিলিয়া নানাপ্রকার আবৃত্তি, সঙ্গীত প্রভৃতি নির্দ্দোষ আমোদ করিতেন। এইরূপ এক ১২ই মাঘের সম্মিলনীতে ৺হিতেন্দ্রনাথ প্রমুখ তাঁহারা কয়েকজন স্থির করেন একটা বালক-বালিকা পরিচালিত মাসিকপত্র বাহির করিতে হইবে। বোধ হয় এই প্রস্তাব হইতেই রবীন্দ্রনাথের মনে 'বালক' প্রকাশের ইচ্ছা উদিত হইয়া থাকিবে। বালকে, পরিবারস্থ অন্যান্য লেখক-লেখিকাগণের সঙ্গে জ্যোতিরিন্দ্রনাথও কয়েকটি প্রবন্ধ লিখেন। তন্মধ্যে "মুখচেনা" নামক প্রবন্ধটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। উহাতে বাঙ্গালার কয়েকজন বিখ্যাত ব্যক্তির প্রকৃতিসহ শিরসামুদ্রিকানুসারে তাঁহাদের চরিত্রসমালোচনা প্রকাশিত হইয়াছিল। প্রবন্ধটি 'প্রবন্ধমঞ্জরীতে' পুনর্মুদ্রিত হইয়াছে।

এমিয়েলের জার্নাল।

(শ্রীহিমাংশুপ্রকাশ রায় কর্ত্তৃক অনুবাদিত)

শুদ্ধমাত্র একটি বস্তুরই প্রয়োজন—ঈশ্বরকেই প্রাপ্ত হওয়া। আমাদের জ্ঞানেন্দ্রিয় সকল ঈশ্বরের সমীপবর্ত্তী হইবার পক্ষে বিভিন্ন দ্বারস্বরূপ। আমাদের বহির্জ্জগতের সহায়-সম্বলসমূহ, আমাদের অন্তর্জ্জগতের চিৎশক্তি-নিচয় ও হৃদবৃত্তিসমুদয়—আমাদের নিজস্ব যাহা কিছু, এ সমস্তই ঈশ্বরকে সম্ভোগের নিমিত্ত, ঈশ্বরকে বন্দনার নিমিত্ত ভিন্ন ভিন্ন পন্থারূপে বিদ্যমান। যাবতীয় ধ্বংসশীল পদার্থ হইতে প্রাণপণ চেষ্টায় মনকে নির্লিপ্ত রাখিয়া, বিশ্লিষ্ট রাখিয়া, যাহা পূর্ণ, যাহা অক্ষয়, যাহা অবিনশ্বর, যাহা অশেষ তাহাতেই মনকে একান্তভাবে আসক্ত রাখা, সংযুক্ত রাখা, ইহাই আমাদিগকে সর্ব্বপ্রযত্নে শিক্ষা করিতে হইবে। জগতের, যাবতীয় বস্তুকে সম্ভোগ করিব সত্য বটে, কিন্তু তাহা অনন্তকালের বস্তুজ্ঞানে নহে—গচ্ছিত বস্তুরূপেই।……ঈশ্বরকে অর্চ্চনা করা, তাঁহাকে জ্ঞাত হওয়া, প্রাপ্ত হওয়া, উপলব্ধি করা, সেই উপলব্ধিকে প্রচার করা, সেই উপলব্ধিতে কর্ম্ম করা—ইহাই আমার বিধি-ব্যবস্থা, আমার কর্ত্তব্য, আমার সন্তোষ, আমার স্বর্গ। যাহা সংঘটিত হইবার তাহা সংঘটিত হউক—এমন কি, যদি মৃত্যু ঘটে ঘটুক। কেবল তাঁহার সহিত শান্তিতে সম্মিলিত হও, ঈশ্বরসান্নিধ্যে ঈশ্বরসহযোগে কালযাপন কর। তোমার পার্থিব জীবন নৈসর্গিক শক্তিনিচয়ের করতলগত, এবং তাহাদের বিরুদ্ধে যাইবার ক্ষমতাও তোমার নাই; সুতরাং তদ্বিষয়ে তাহাদেরই হস্তে আত্মসমর্পণ কর। যদি মৃত্যু আমাকে সময় দান করে—উত্তম। যদি মৃত্যুর আহ্বান নিকটবর্ত্তী হয়—অধিকতর উত্তম। পার্থিবোন্নতির ব্যর্থতা প্রযুক্ত অৰ্দ্ধ-মৃত্যুই যদি আক্রমণ করে, তাহাও যে পরম শুভই—কারণ শৌর্য্যের, নৈতিক বীর্য্যের, আত্মোৎসর্গের ত্রিবিধ মার্গ আমার সম্মুখে যেন প্রসারিত দেখিতে পাই, তন্নিমিত্তই পার্থিবোন্নতির পন্থা আমার নিকট অবরুদ্ধ রহিল। প্রত্যেক জীবনেই মহত্ত্বের বীজ নিহিত আছে এবং যেহেতু ব্রহ্মকে অতিক্রম করিয়া ব্রহ্মসত্তার বাহিরে বিহার করা আমাদের পক্ষে অসম্ভব, সেইজন্য সজ্ঞানে ব্রহ্মেতে অবস্থান করাই সর্ব্বাপেক্ষা প্রশস্ত কার্য্য।

বার্লিন
১৩ই জুলাই, ১৮৪৮।

তোমার সান্নিধ্যে এইমাত্র যে এক ঘণ্টা কালক্ষেপণ করিলাম, সেজন্য হে আমার প্রভু, তোমাকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি। তোমার অভিপ্রায় আমার সম্মুখে উজ্জ্বলরূপে প্রতিভাত হইল। আমার প্রভূত পাপরাশির গুরুত্ব নিরূপণ করিয়া, আমার দুঃখবেদনা গণনা করিয়া, আমার প্রতি তোমার প্রগাঢ় প্রেম অনুভব করিলাম। আমার ক্ষুদ্রতা—আমার শূন্যতা আমি মর্ম্মে মর্ম্মে হৃদয়ঙ্গম করিলাম। তুমি তোমার অগাধ শান্তি আমাকে প্রদান করিলে। সংশয়াতীতরূপে বুঝিলাম তিক্ততার মধ্যে মিষ্টতা, দুঃখ-পীড়নের মধ্যে হর্ষোল্লাস, বশ্যতার মধ্যে শক্তি। যে পিতা আমাদিগকে দণ্ডবিধান করেন, সেই পিতাই আমাদিগকে প্রেম প্রদান করেন। জীবনের উৎসর্গে নবজীবন প্রাপ্তি, সর্ব্বত্যাগে সর্ব্বজয়ী, সম্পূর্ণ রিক্ততায় পরমাত্মাকে লাভ—ইহা অসম্ভব ব্যাপার বলিয়া প্রতীত হয়, কিন্তু ইহার অভ্যন্তরে মহান সত্য বিরাজিত। যে ব্যক্তি দুঃখ-আঘাত প্রাপ্ত হয় নাই, সে আনন্দের প্রকৃত আস্বাদন লাভ করে নাই। ত্রাণের নিমিত্ত ঈশ্বর-মনোনীত আত্মাগণ অপেক্ষা অনুতাপানলে পূত আত্মা-রাই অধিকতর সুখী।

জিনেভা
২৭শে অক্টোবর, ১৮৫৩।

মঙ্গলের বলে অমঙ্গলের যে রূপান্তর ঘটে ইহাই অত্যাশ্চর্য্য অলৌকিক ব্যাপার। স্বাধীন মানবগণকে ভগবানের মধ্যে পৌঁছাইয়া উদ্ধার করা, পাপ-ভারাক্রান্ত জগতকে পুণ্য-রাজ্যে নীত করা, ইহা-তেই সৃষ্টির সার্থকতা, ইহাতেই অনন্ত করুণাময়ের শাশ্বত ইচ্ছাশক্তির সফলতা। ধর্ম্মালোক স্পর্শে আমূল পরিবর্ত্তিত প্রত্যেক আত্মাই নিখিল জগতের উদ্ধার ও পরিবর্ত্তন সম্বন্ধে এক একটি সাক্ষীস্বরূপ। সুখী হওয়া, অনন্ত জীবন লাভ করা, ঈশ্বরেতে অবস্থিতি, ত্রাণ পাওয়া—এ সমস্তই অভিন্ন, এ সমস্ত একই, এবং ইহাদের প্রত্যেকটিরই অর্থ—জীবন-রহস্যের সমাধান। ক্লেশের ন্যায় আনন্দও নিবিড় হইতে নিবিড়তর হয়। শাশ্বত শান্তি উত্তরোত্তর ঘনীভূত স্বর্গীয় উল্লাস,—এক-মাত্র ইহাই চিরবর্দ্ধনশীল, ইহাই একমাত্র ভূমানন্দ; সীমাবিবর্জ্জিত, যেহেতু বিশ্বপতি সীমাশূন্য এবং অদ্বিতীয়। প্রেমের দ্বারা জগৎপতিকে জয় করিয়া নিজস্ব করা ভিন্ন আনন্দের অন্য কোন অর্থই নাই।

জীবনের মূল মস্তিষ্কের চিন্তায় নহে, অন্তরের ভাবে নহে, চিত্তের ইচ্ছাশক্তিতে নহে—এমন কি, যে চৈতন্য চিন্তা করে, অনুভব করে, ইচ্ছা করে, সেই চৈতন্যতেও নহে; কারণ সত্য এই সকল উপায়ে লাভ করা সম্ভব হইলেও, সে লাভ চিরস্থায়ী না হইতেও পারে। চৈত-ন্যের স্থিতিস্থান হইতেও গভীরতর প্রদেশে আত্মিকের অভিব্যক্তি। সেই প্রদেশেই মানবপ্রকৃতির সারাংশের বাস। এই সর্ব্বশেষ দুরন্তম ক্ষেত্রে যে সকল সত্যের

প্রবেশাধিকার, তাহাই আমাদিগের আপনার এবং সেই সমস্ত সত্যই নিঃসংশয়রূপে আমাদিগের জীবন—তাহারাই আমাদিগের সম্পত্তি অপেক্ষা অধিক। সেই সত্য সকল সহজ ও গতিশীল, স্বতঃপ্রবৃত্ত ও আমাদের জ্ঞানাতীত। সত্য এবং আমাদিগের মধ্যে যতদিন পর্য্যন্ত আমরা ব্যবধান সৃষ্টি করিয়া চলি, ততদিন পর্য্যন্ত আমরা প্রকৃত সত্য-জীবনের বহির্ভাগেই বিচরণ করি। আমাদের চিন্তা, ভাব, বাসনা, অহমিকার জ্ঞান—এই সকল আমাদের যথার্থ জীবন নহে। বিশ্রাম ও শান্তি অনন্ত জীবন ভিন্ন কুত্রাপি প্রাপ্ত হওয়া যায় না; অনন্ত জীবনই পারমার্থিক জীবন এবং সেই জীবনই পরম ব্রহ্ম। মানবজীবনের সত্যই ব্রহ্মজীবনে পরিণত হওয়া। সত্যকে তখনই কেবল আমাদের নিজেদের বলিয়া নির্দ্দেশ করিতে পারি, তখনই সত্য কেবল অবিনশ্বর হয়; কারণ সত্য তখন আমাদের বাহিরের কোনো স্বতন্ত্র বস্তু নহে, আমাদের অন্তরের এইরূপও নহে, কিন্তু আমরাই সত্য এবং সত্যই আমরা। আমরা নিজেরাই একটি সত্য, একটি ইচ্ছা, ব্রহ্মের একটি কর্ম্মফল। স্বাধীনতা তখন আমাদের প্রকৃতির মজ্জাগত। সৃষ্ট জীব স্রষ্টারই সঙ্গে একাত্ম হইয়া অবস্থিত—প্রেমসূত্রে বদ্ধ হইয়া তাহারা অভিন্ন। এই মিলন ব্যতীত জীবাত্মার গত্যন্তর নাই, এই মিলনেই ইহার শিক্ষা সম্পূর্ণ, এই মিলনেই ইহার শেষ অক্ষয় আনন্দ আরম্ভ, এই মিলনেই সীমাবদ্ধ পার্থিব কাল-সূর্য্যের তিরোধান এবং চিরন্তন আনন্দ-সূর্য্যের আবির্ভাব।

নগণ্য দূর্ব্বারও এমন কোন একটিও দল নাই, যে দল রহস্যের কোন কাহিনী বর্ণনা না করে; এমন একটিও হৃদয় নাই, যে হৃদয় আপনার মধ্যে কোন অলৌকিক উপন্যাস সৃজন না করে; এমন কোনই জীবন নাই, যে জীবন তাহার নিভৃত মর্ম্মস্থলে কোন রহস্যের কণ্টক নীরবে বহন না করে। সর্ব্বস্থানেই দুঃখ-বেদনা, সর্ব্বস্থানেই আশা-ভরসা, সর্ব্বস্থানেই মিলনান্তক ও সর্ব্বস্থানেই বিয়োগান্তক নাটক। পাষাণকারী শক্তির ফলে সুদূর অতীত যুগের পাষাণীভূত জীবের বিজড়িত সঙ্কুচিত দেহমধ্যে যৌবনের যে মহা পীড়ন ও আলোড়ন-বিলোড়ন লক্ষিত হয়, সেই লক্ষ্য-প্রসূত চিন্তাই কবিকুল ও ঈশ্বরপরায়ণ ব্যক্তিগণের নিকট ঐন্দ্রজালিকের মোহন দণ্ডস্বরূপ। সেই চিন্তাই পার্থিব স্থূল চক্ষুর কঠিন মোহাবরণগুলিকে ছিন্ন করিয়া মানবজীবনকে স্পষ্টরূপে নিরীক্ষণ করিবার পক্ষে আমাদিগকে দৃষ্টি দান করে। সেই চিন্তাই কর্ণকুহরে অশ্রুতপূর্ব্ব সুমিষ্ট অজস্র সুর-সম্মিলিত সঙ্গীত ধ্বনিত করিয়া তোলে এবং প্রকৃতির অনন্ত ভাষা তখনই আমাদিগের নিকট অর্থময় হইয়া উঠে। ব্যর্থপ্রেম মানবকে প্রকৃতির অনন্ত জ্ঞানে বিভূষিত করে এবং দুঃখবেদনা মানবকে ত্রিকালদর্শী ঋষির পদে প্রতিষ্ঠিত করে।

ঐ দেশে ঐ দিবসে ভিন্ন সময়ে।

শ্রীমতী গার্গী দেবীর বিলাতগমনে ব্রহ্মোপাসনা।

(শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর)

বেদগান।

ওঁপিতা নোঽসি। পিতা নো বোধি
নমস্তেঽস্তু। মা মা হিংসীঃ।
বিশ্বানি দেব সবিতর্দুরিতানি পরাসুব।
যদ্ভদ্রং তন্ন আসুব।
নমঃ শম্ভবায় চ ময়োভবায় চ
নমঃ শঙ্করায় চ ময়স্করায় চ
নমঃ শিবায় চ শিবতরায় চ ॥
ওঁ পিতা তুমি। জ্ঞানদাতা হে।
নমি তোমা। ছেড়োনাকো মোরে।
সমগ্র দেব হে পিতা, দুরিত মোর করি' দূর।
আশীষ তব বরিষ।
নমি দেব শম্ভব শুভদাতা হে
নমি দেব শঙ্কর শুভাকর হে
নমি দেব শিব শিবতর তোমায় হে ॥

ঈশ্বরপ্রীতিকাম হইয়া তাঁহার উপাসনায় এসো আমরা সকলে প্রবৃত্ত হই।

উদ্বোধন।

ওঁ তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং সদা পশ্যন্তি সূরয়ঃ দিবীব চক্ষুরাততং ॥

চক্ষু যেমন আকাশে বিস্তৃত পদার্থসকল দর্শন করে, সেইরূপ শ্রদ্ধাবান ধীরেরা সেই সর্ব্বব্যাপী পরমাত্মার পরম পদ সর্ব্বত্র দর্শন করিয়া থাকেন।

সেই পরমদেবতা সম্মুখের এই অনন্ত আকাশে জাজ্বল্যমান প্রকাশ পাইতেছেন। অখিল ব্রহ্মাণ্ড সেই মঙ্গলময় বিশ্ববিধাতা ভগবানকেই অবলম্বন করিয়া রহিয়াছে। তিনি আমাদের প্রত্যেকের আত্মাতেও অন্তর্যামীরূপে স্বপ্রকাশমূর্ত্তিতে প্রকাশ পাইতেছেন। সেই আত্মার আত্মাকে, সেই শুদ্ধ অপাপবিদ্ধ পরমেশ্বরকে আত্মাতে প্রত্যক্ষ করিয়া এসো ভক্তিভরে তাঁহারই চরণে কোটী কোটী প্রণিপাত করি।

প্রণাম।

ওঁ যো দেবোঽগ্নৌ যোঽপ্সু যো বিশ্বং ভুবনমাবিবেশ।
য ওষধীষু যো বনস্পতিষু তস্মৈ দেবায় নমো নমঃ ॥

যে দেবতা অগ্নিতে, যিনি জলেতে, যিনি বিশ্বসংসারে প্রবিষ্ট হইয়া আছেন; যিনি ওষধিতে, যিনি বনস্পতিতে; সেই দেবতাকে বার বার নমস্কার করি।

সমাধান।

ওঁ সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম। আনন্দরূপমমৃতং যদ্বিভাতি। শান্তং শিবমদ্বৈতং। শুদ্ধমপাপবিদ্ধং।

যে সিদ্ধিদাতা বিধাতাপুরুষ আমাদের পূজাগ্রহণের নিমিত্ত এখনই এখানে বর্ত্তমান রহিয়াছেন, তিনি সত্যস্বরূপ, জ্ঞানস্বরূপ, অনন্তস্বরূপ পরব্রহ্ম। তিনি আনন্দরূপে অমৃতরূপে প্রকাশ পাইতেছেন। তিনি শান্ত, মঙ্গল, অদ্বিতীয়। তিনি শুদ্ধ, অপাপবিদ্ধ। অনন্যমনা হইয়া প্রীতিপূর্ব্বক স্বীয় আত্মাকে শুদ্ধ অপাপবিদ্ধ সেই অদ্বিতীয় মঙ্গলস্বরূপে সমাধান করি।

এতস্মাজ্জায়তে প্রাণো মনঃ সর্ব্বেন্দ্রিয়াণি চ।
খং বায়ুর্জ্যোতিরাপঃ পৃথিবী বিশ্বস্য ধারিণী॥
ভয়াদস্যাগ্নিস্তপতি ভয়াত্তপতি সূর্য্যঃ।
ভয়াদিন্দ্রশ্চ বায়ুশ্চ মৃত্যুর্ধাবতি পঞ্চমঃ॥

ইহা হইতে প্রাণ, মন ও সমুদয় ইন্দ্রিয়, এবং আকাশ, বায়ু, জ্যোতি, জল ও সকলের আধার এই পৃথিবী উৎপন্ন হয়। ইঁহার ভয়ে অগ্নি প্রজ্বলিত হইতেছে, ইঁহার ভয়ে সূর্য্য উত্তাপ দিতেছে; ইঁহার ভয়ে মেঘ বারিবর্ষণ করিতেছে, বায়ু সঞ্চলিত হইতেছে এবং মৃত্যু সঞ্চরণ করিতেছে।

স্তোত্র।

ওঁ নমস্তে সতে তে জগৎকারণায়।
নমস্তে চিতে সর্ব্বলোকাশ্রয়ায়॥
নমোঽদ্বৈততত্ত্বায় মুক্তিপ্রদায়।
নমো ব্রহ্মণে ব্যাপিনে শাশ্বতায়॥
ত্বমেকং শরণ্যং ত্বমেকং বরেণ্যং।
ত্বমেকং জগৎপালকং স্বপ্রকাশং॥
ত্বমেকং জগৎকর্ত্তৃপাতৃপ্রহর্ত্তৃ।
ত্বমেকং পরং নিশ্চলং নির্ব্বিকল্পং॥
ভয়ানাং ভয়ং ভীষণং ভীষণানাং।
গতিঃ প্রাণিনাং পাবনং পাবনানাং॥
মহোচ্চৈঃ পদানাং নিয়ন্তৃ ত্বমেকম্।
পরেষাং পরং রক্ষণং রক্ষণানাং॥
বয়স্ত্বাং স্মরামো বয়স্ত্বাং ভজামো।
বয়স্ত্বাং জগৎসাক্ষিরূপং নমামঃ॥
সদেকং নিধানং নিরালম্বমীশং।
ভবাম্ভোধিপোতং শরণ্যং ব্রজামঃ॥

তুমি সৎস্বরূপ ও জগতের কারণ, এবং জ্ঞানস্বরূপ ও সকলের আশ্রয়, তোমাকে নমস্কার। তুমি মুক্তিদাতা, অদ্বিতীয়, নিত্য ও সর্ব্বব্যাপী ব্রহ্ম, তোমাকে নমস্কার। তুমিই সকলের আশ্রয়স্থান, তুমিই কেবল বরণীয়; তুমিই এক এই জগতের পালক ও স্বপ্রকাশ। তুমিই জগতের সৃষ্টিস্থিতিপ্রলয়কর্ত্তা; তুমিই সকলের শ্রেষ্ঠ, নিশ্চল ও দ্বিধাশূন্য। তুমি সকল ভয়ের ভয় ও ভয়ানকের ভয়ানক; তুমি প্রাণীগণের গতি ও পাবনের পাবন। তুমিই মহোচ্চ পদসকলের নিয়ন্তা, শ্রেষ্ঠ হইতেও শ্রেষ্ঠ এবং রক্ষকদিগেরও রক্ষক। আমরা তোমাকে স্মরণ করি, আমরা তোমাকে ভজনা করি। তুমি জগতের সাক্ষী, আমরা তোমাকে নমস্কার করি। সত্যস্বরূপ, আশ্রয়স্বরূপ, অবলম্বরহিত, সংসারসাগরের তরণী অদ্বিতীয় ঈশ্বরের শরণাপন্ন হই।

গান।

কুকভ—তেওট।

তাঁহারি শরণ লয়ে রহিও—শরণ লয়ে রহিও।
যাঁহারি কৃপায় তুমি খুলিলে নয়ন—তাঁরে আগে দেখিও॥

উপদেশ।

প্রাণাধিকা গার্গী! বিলাতযাত্রার মুখে আমি তোমাকে দুই-চারিটী কথা বলিতে চাই—তুমি সেগুলি অবহিত হইয়া শ্রবণ কর এবং সযত্নে অন্তরে ধারণ করিও। আনন্দময়কেও যেমন বলিয়াছিলাম, তেমনই তোমাকেও বলিতেছি—আমি তোমাকে যাহা কিছু বলিব, তাহার সর্ব্বপ্রথম কথা এই যে, ঈশ্বরকে ভুলিও না; তাহার মধ্য কথা এই যে, ঈশ্বরকে ভুলিও না; তাহার সর্ব্বশেষ কথা এই যে, ঈশ্বরকে ভুলিও না। সম্পদে, বিপদে সুখে দুঃখে তাঁহাকে সকল সময়ে, সকল স্থানে ও সকল অবস্থায় স্বপ্রকাশ দেখিবে—তাহা হইলেই বিপদজাল কাটিয়া যাইবে এবং দুঃখশোক হইতে মুক্তিলাভ করিবে; সুখ-সম্পদ তোমার হস্তগত হইবে এবং মঙ্গল ও উন্নতি তোমার পার্শ্বচর হইবে।

তুমি তোমার স্বামীর মঙ্গল কামনা করিয়া সমস্ত ভাবনা অতিক্রম করিয়া বিদেশযাত্রার উদ্যত হইয়াছ। এতদিন তুমি আমাদের নিকটে থাকিয়া নিত্য আনন্দবর্দ্ধন করিতেছিলে; কিন্তু এখন তোমাকে তোমাদের মঙ্গলকামনা করিয়া আমরাও আনন্দিতমনে বিদেশযাত্রায় অনুমতি দিতেছি। এতদিন তোমার মনে কোন প্রশ্ন উঠিলে তুমি আমাদিগকে জিজ্ঞাসা করিতে; আবার আমাদের মনে কোন প্রশ্ন উঠিলে আমরা তোমাকে জিজ্ঞাসা করিতাম। এই প্রকারে আমরা পরস্পর পরস্পরের উন্নতির পথে অগ্রসর হইবার সহায়তা করিতাম। এখন অবধি তোমার পক্ষে আমাদের অভিজ্ঞতার আশ্রয় লাভ করিবার বেশী সুবিধা হইবে না; এখন অবধি তোমাকে নিজের উপরেই নির্ভর

করিয়া চলিতে হইবে; প্রতি পদে সংসারের পথে ধীরভাবে বিবেচনা করিয়া চলিতে হইবে।

নিজের বুদ্ধিবিবেচনার উপর নির্ভর করিতে হইবে বলিয়া ভয় পাইও না। ইহা নিশ্চিত জানিও যে তোমার অন্তরে অকিঞ্চনগুরু সর্ব্বদাই জাগ্রত আছেন। কোন বিষয়ে তোমার যদি কোন সংশয় উপস্থিত হয়, তবে, সন্তান যেমন সংশয়ে পড়িলে নির্ভয়ে পিতামাতার নিকটে মীমাংসার জন্য ছুটিয়া যায়, তুমিও সেইরূপ নির্ভয়ে সেই সদা জাগ্রত অকিঞ্চনগুরুকে পথ দেখাইবার জন্য আহ্বান করিবে; তুমি অবাক হইয়া দেখিবে যে, তিনি তোমার সংশয় বিদূরিত করিয়া দেবেন এবং তুমি কোন্ পথে চলিলে তোমার মঙ্গল হইবে, তাহা মুহূর্ত্তের মধ্যে দেখাইয়া দেবেন। ছোট বড় যে কোন প্রশ্ন তোমার মনে উপস্থিত হইবে, আমার অভিজ্ঞতালব্ধ এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ কর—প্রত্যেক প্রশ্ন জননীর নিকটে কন্যার ন্যায় তাঁহার চরণে নিবেদন করিবে—এবং তাঁহার আদেশ গ্রহণ করিয়া যদি তুমি প্রত্যেক কর্ম্মে প্রবৃত্ত হও, তাহা হইলে অমঙ্গল তোমাকে স্পর্শ করিতে পারিবে না। তিনি সকল গুরুর গুরু; তিনিই একমাত্র অভ্রান্ত গুরু। জগতে এমন কেহই নাই, যিনি তাঁহার মত তোমাকে সদুপদেশ দিতে পারিবেন। তোমাকে আমি সর্ব্বপ্রথম এই মন্ত্র দিতেছি—তুমি দিনে নিশীথে তাঁহাকে অন্তরে সর্ব্বদাই অকিঞ্চনগুরুরূপে প্রত্যক্ষ করিবার চেষ্টা করিবে।

ভগবান কেবল অকিঞ্চনগুরু নন, তিনি আমাদের প্রত্যেকের অন্তর্যামী ভগবান—তিনি আমাদের প্রত্যেকের অন্তরে থাকিয়া আমাদিগকে মঙ্গল ও উন্নতির সঙ্গে সুখসম্পদলাভেরও পথে পরিচালিত করিতেছেন। তিনিই সকল ঐশ্বর্য্যের একমাত্র অধীশ্বর। সুখসম্পদ লাভের জন্য খুবই চেষ্টা করিবে, কিন্তু তাহা লাভ করিলে তাহার অপব্যবহার করিবে না। ব্রাহ্মধর্ম্মের উপদেশ এই যে, ধর্ম্মে অর্থে, জ্ঞানে মানে সর্ব্ববিধ ভাল বিষয়ে শ্রেষ্ঠতম স্থান অধিকার করিবার সর্ব্বতোভাবে চেষ্টা করিবে। ভগবানের আদেশ ও নির্দ্দেশ অনুসারে যদি চলিতে থাক, তবে দেখিবে, সকল বিষয়ে শ্রেষ্ঠতম স্থান অধিকার করা বিশেষ কঠিন হইবে না। তুমি কেবল নিজে এইভাবে অগ্রসর হইয়া ক্ষান্ত থাকিবে না; তোমার স্বামী ও পুত্রকন্যাদিগকেও এই ভাবে শিক্ষা দিবে ও উৎসাহিত করিবে; দেখিবে, তোমার গৃহ অচিরে কিরূপ উজ্জ্বল শ্রী ধারণ করে।

ভগবানকে সমুদয় হৃদয় দিয়া প্রীতি করিবে এবং তাঁহার প্রিয়কার্য্য সাধনে সর্ব্বদাই আপনাকে নিরত রাখিবে, ব্রাহ্মধর্ম্মের এই বীজমন্ত্রকে তুমি তোমার প্রাণেরও বীজমন্ত্ররূপে ধারণ করিয়া রাখিবে। ভগবানের সঙ্গে যোগসাধনের ইহাই একমাত্র উপায়। তাঁহাকে অন্তরের সঙ্গে প্রীতি করিতে থাকিলে স্পষ্ট অনুভব করিবে যে, তিনি কেবল এই বহিঃপ্রকৃতির মধ্যে নাই, কিন্তু তিনি তাঁহার স্নেহপ্রেমে তোমাকে অন্তরে বাহিরে বর্ম্মদুর্গরূপে ঘিরিয়া আছেন। বিদেশে যাইতেছ—তোমার প্রতি আমার বিশেষ উপদেশ এই যে, প্রতিদিন সমস্ত কার্য্যের আরম্ভে সকল বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করিয়া ভগবানের উপাসনা করিতে, তাঁহার সঙ্গে আত্মার যোগসাধন করিতে কখনও ভুলিও না। কোনও সূত্রে সংশয়বাদকে অন্তরে স্থান দিয়া নিজের বিনাশ নিজে ডাকিয়া আনিও না। তাঁহার সঙ্গে নিয়মিত যোগসাধন করিলে সকল কর্ম্মে আশ্চর্য্য তেজ ও শক্তি অনুভব করিবে। তখন তুমি বুঝিতে পারিবে যে, এই সমগ্র বিশ্বজগতের যিনি স্রষ্টা ও বিধাতা, তিনিই তোমারও সত্যই পিতামাতা এবং সখা ও সুহৃৎ। তাঁহাকে হৃদয়ে ধারণ করিলে, তিনি যেমন এখানে তোমাকে কত গুরুতর বিপদ হইতে রক্ষা করিয়া আসিয়াছেন, তেমনই তিনি তোমাকে মহাসাগরবক্ষে এবং সেই সুদূর প্রবাসভূমিতেও রক্ষা করিবেন। প্রাণাধিক আনন্দময়কে যেমন তিনি মৃত্যুর মুখ হইতে ফিরাইয়া আনিয়াছেন, সেইরূপ তোমাকেও তিনি সকল বিপদ আপদ হইতে মুক্ত করিয়া দেশে স্বামীর সঙ্গে তোমাকে গৌরবান্বিত করিয়া সুস্থশরীরে ও সুস্থমনে ফিরাইয়া আনিবেন।

সে দিন আমি তোমাকে ব্রাহ্মধর্ম্মে দীক্ষা প্রদান করিয়াছি। ব্রাহ্মধর্ম্মের অগ্নিময় দীক্ষা গ্রহণ করিয়া আর পশ্চাতে পড়িয়া থাকিও না—উন্নতির পথে ও মঙ্গলের পথে স্বামী ও সন্তানগণের সহিত ক্রমাগতই দ্রুতপদে অগ্রসর হইতে থাকিবে। ভুলভ্রান্তি হওয়া কিছু আশ্চর্য্য নয়—কিন্তু তাহার জন্য কিছুমাত্র ভীত হইও না; সমস্তই ভগবানের চরণে নিবেদন করিয়া দিবে—পদ্মপত্রে যেমন জল দাঁড়াইতে পারে না, সেইরূপ ভগবানের চরণে নিবেদিত মনেও ভুলভ্রান্তি দাঁড়াইতেও পারে না, বা তাহার কোন দাগও অঙ্কিত হইতে পারে না। তুমি যেখানে যাইতেছ, সেখানে শতবিধ প্রলোভন বিপথে লইয়া যাইবার জন্য উন্মুখ হইয়া আছে। তোমরা পরস্পর পরস্পরকে সেই সকল প্রলোভনের অতীত থাকিবার জন্য সাহায্য করিবে। নানা ঘাতপ্রতিঘাতে সেখানে তোমাদিগকে ব্রাহ্মধর্ম্ম হইতে, ভগবানের চরণ হইতে দূরে লইয়া যাইবার চেষ্টা করিবে। সাবধান, সাবধান, সাবধান—তাঁহা হইতে আপনাকে কদাপি বিচ্ছিন্ন করিও না। তাঁহার প্রতি সংশয় আসিলেই জানিবে

যে, আত্মা রোগে পড়িয়াছে; তখনই চিকিৎসক সেই ভগবানকে ব্যাকুলপ্রাণে ডাকিবে—তিনিই তোমার আত্মাকে রোগমুক্ত করিবেন। তাঁহার ন্যায় আত্মা ও মনের চিকিৎসক কোথাও পাইবে না।

সর্ব্বশেষে তোমার প্রতি আমার উপদেশ এই যে, বিলাতের চাকচিক্যে নিজের জন্মভূমিকে ভুলিও না। যে ধর্ম্মে তুমি পরিপুষ্ট হইয়াছ, যাহার সংযত স্বাধীনতা তোমাকে ঈশ্বরের পথে এতদূর অগ্রসর করিয়া দিয়াছে, সেই ধর্ম্ম ভারতেরই ধর্ম্ম। ধর্ম্মই দেহ, মন ও আত্মা সর্ব্ববিষয়ক উন্নতির মূল। জন্মভূমি দরিদ্র হইলেও তাহার শাকভাতে তোমার শরীর মন ও আত্মাকে যথাসাধ্য গড়িয়া তুলিয়া তোমাকে সেই ধর্ম্মবলের অধিকারী করিয়াছে; পিতামাতার ভাইভগ্নীর অকৃত্রিম স্নেহযত্নে লালিত-পালিত হইয়া আজ তুমি ভগবানের সঙ্গে যোগসাধনের পথে অগ্রসর হইয়াছ—মনুষ্য হইয়া সেই জন্মভূমিকে, পিতামাতা ভাই-ভগ্নী প্রভৃতি আত্মীয়স্বজনকে ভুলিয়া যাইও না। দেশের ভাবের সঙ্গে প্রাণের যোগ রাখিলেই পরিণামে জয়যুক্ত হইবে। এই সত্যটী তোমরা উভয়েই প্রাণের ভিতর গাঁথিয়া রাখিবে। এইভাবে ব্রাহ্মধর্ম্মকে জীবনে পরিণত করিলেই সকল বিষয়ে, কি জ্ঞানে, কি বিদ্যায়, কি ধর্ম্মে, কি অর্থে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ স্থান সহজেই অধিকার করিতে পারিবে। জন্মভূমি এবং তোমার পিতামাতা দরিদ্র বলিয়া আপনাকে ধিক্কার দিও না।

আনন্দময়কে যে আশীর্ব্বাদ দিয়াছিলাম, তুমিও আমার সেই আশীর্ব্বাদ গ্রহণ কর—তুমি কখনই ভগবানকে পরিত্যাগ করিও না, ভগবান কর্ত্তৃক তুমি সর্ব্বদাই অপরিত্যক্ত থাক। আশীর্ব্বাদ করি, তুমি তোমার স্বামীর প্রেমের অনন্যপাত্র হও এবং তাঁহার জ্ঞানে, কর্ম্মে ও ধর্ম্মে বড় হইবার পথে সহায় হও। আশীর্ব্বাদ করি, তোমরা উভয়ে দীর্ঘায়ু লাভ করিয়া ভগবানে শ্রদ্ধাবান থাক; তোমাদের গৃহ ধনে পুত্রে পরিপূর্ণ হোক; তোমাদের পরিবার দানশীল হইয়া দেশের কল্যাণসাধনে নিরত হউক।

হে পরমাত্মন্! তোমারই আদেশে আমার প্রাণাধিকা কন্যা শ্রীমতী গার্গী তাহার স্বামীর কল্যাণউদ্দেশ্যে বিলাত যাত্রা করিতেছে। তোমার নিকট ব্যাকুল অন্তরে এই প্রার্থনা করিতেছি—এখানে তুমি যেমন আমাকে যত্ন করিয়া ইহাকে সকল প্রকার বিপদ আপদ হইতে, এমন কি মৃত্যুর মুখ হইতেও বাঁচাইয়াছ, সেইরূপ সেই সুদূর প্রবাসে এবং সমুদ্রবক্ষে ইহাকে নিজের ক্রোড়ে রাখিয়া সকল প্রকার বিপদ আপদ হইতে দূরে রাখিও। এই যাত্রার পরিণামে তোমার মঙ্গল ইচ্ছা পূর্ণ হোক; আনন্দময়ের কল্যাণ হোক; দেশের মঙ্গল হোক; পরিবারের গৌরববৃদ্ধি হোক এবং ইহাদের গৃহসংসার তোমার মঙ্গল কিরণে উদ্ভাসিত হইয়া উঠুক এবং সর্ব্বাঙ্গীন শ্রীসম্পন্ন হোক।

ওঁ য একোঽবর্ণোবহুধাশক্তিযোগাৎ
বর্ণাননেকান্নিহিতার্থোদধাতি।
বিচৈতি চান্তে বিশ্বমাদৌ সদেবঃ
স নো বুদ্ধ্যা শুভয়া সংযুনক্তু॥

যিনি এক এবং বর্ণহীন; এবং যিনি প্রজাদিগের প্রয়োজন জানিয়া বহুপ্রকার শক্তিযোগে বিবিধ কাম্য বস্তু বিধান করিতেছেন, সমুদায় ব্রহ্মাণ্ড আদ্যন্তমধ্যে যাঁহাতে ব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছে, তিনি দীপ্যমান পরমেশ্বর, তিনি আমাদিগকে শুভবুদ্ধি প্রদান করুন।

সাংখ্যে ঈশ্বরবাদ।

(অধ্যাপক ৺অভয়কুমার মজুমদার এম-এ লিখিত ইংরাজী নিবন্ধের শ্রীযতীন্দ্রকুমার মজুমদার এম-এ, পি. এইচ-ডি কৃত অনুবাদ)

ঈশ্বরাস্তিত্বের সাক্ষাৎপ্রমাণ।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

এক্ষণে দেখা যাউক, সাংখ্যদর্শনসম্বন্ধে সমধিক প্রামাণিক গ্রন্থ 'সাংখ্যকারিকা'তে ঈশ্বরের অস্তিত্ব সম্বন্ধে কোনও স্পষ্ট প্রমাণ আছে কি না। আমার মতে আছে। দশম ও একাদশ শ্লোকে ইহা স্পষ্টই বলা হইয়াছে যে, জগতে যেরূপ কেবল এক পরমা প্রকৃতি আছে, সেইরূপ কেবল এক পরম পুরুষও আছেন। সেই শ্লোক দুইটী এই—"হেতুমদনিত্যমব্যাপি সক্রিয়মনেকমাশ্রিতং লিঙ্গম্। সাবয়বং পরতন্ত্রং ব্যক্তং, বিপরীতমব্যক্তম্"। ১০॥ "ত্রিগুণমবিবেকি বিষয়ঃ সামান্যমচেতনং প্রসবধর্ম্মি। ব্যক্তং তথা প্রধানং তদ্বিপরীতস্তথা চ পুমান্" ॥ ১১ ॥ অর্থাৎ, "ব্যক্ত—হেতুবিশিষ্ট, অনিত্য, অব্যাপী, সক্রিয়, অনেক, আশ্রিত, বিশেষণযুক্ত, সাবয়ব ও পরতন্ত্র; অব্যক্ত—ইহার বিপরীত"। ১০। "ব্যক্ত—ত্রিগুণ, অবিবেকী, বিষয়াতীত, সামান্য, অচেতন ও প্রসবধর্ম্মী; প্রকৃতি বা প্রধানও এইরূপই; পূর্ব্বোক্ত বিষয়ের ন্যায় পুরুষ এই সকল বিষয়েও ইহার বিপরীত"। ১১। এখানে শেষোক্ত বাক্যটী—'তদ্বিপরীতস্তথা চ পুমান্", অর্থাৎ "পুরুষ বা আত্মা পূর্ব্বোক্ত বিষয়ের ন্যায় এই সকল বিষয়েও ইহার বিপরীত"—লক্ষ্য করিতে হইবে। ইহার অর্থ এই যে, পুরুষ বা আত্মা যেরূপ গুণবিশিষ্ট তাহা ব্যক্তের গুণের বিপরীত; সুতরাং এইরূপে পরিগণনা করা যায়—পুরুষ অজ, নিত্য, সর্ব্বব্যাপী, অপরিবর্ত্তনীয়, অদ্বিতীয়,

অনাশ্রিত (নিরবলম্ব), অবিচ্ছেদ্য, নিরবয়ব, স্বতন্ত্র, ত্রিগুণাতীত, বিবেকী, অবিষয় বা আধ্যাত্মিক, বিশিষ্ট বা অসামান্য, চেতন ও অপ্রসবধর্ম্মী। উপরি-উক্ত তালিকায় পুরুষের একটী গুণ আমাদিগকে লক্ষ্য করিতে হইবে, সে গুণটী—'এক বা অদ্বিতীয়'। এখানে পুরুষ বা আত্মাকে এক অদ্বিতীয় বলা হইয়াছে ; এই এক বা অদ্বিতীয় শব্দটী অতিশয় অর্থপূর্ণ এবং ব্যাখ্যাকারগণের মধ্যে যথেষ্ট মতভেদের কারণ হইয়াছে। সুতরাং আত্মা বা পুরুষ এক অথবা বহু এই সমস্যার মীমাংসা সম্পূর্ণরূপে এই শব্দটার যথার্থ অর্থের উপর নির্ভর করিতেছে। গৌড়পাদ বলেন—"অনেকং ব্যক্তমেকমব্যক্তং তথা চ পুমানপ্যেকঃ", অর্থাৎ "ব্যক্ত বহু, অব্যক্ত এক, সেইরূপ পুরুষও এক"। বাচস্পতি মিশ্র ভিন্ন অর্থ করিতেছেন—"স্যাদেতৎ অহেতুমত্ব-নিত্যত্বাদি-প্রধানসাধর্ম্ম্যমস্তি পুরুষস্য, এবমনেকত্বং ব্যক্ত-সাধর্ম্ম্যং। তৎ কথমুচ্যতে তদ্বিপরীতঃ পুমানিত্যত্র আহ তথাচেতি চকারঃ—অপ্যর্থঃ"। অর্থাৎ "পুরুষ প্রকৃতির ন্যায় অজ, নিত্য প্রভৃতি হউন্ ; তিনি ব্যক্তের ন্যায় বহুও বটে ; যদি তাহাই হয়, তবে কিরূপে বলা হয় যে পুরুষ ব্যক্তের বিপরীতধর্ম্মী, এই জন্য বলা হইয়াছে যে পুরুষ ব্যক্তেরও ন্যায় বটে। এখানে 'চ'র অর্থ 'অপি' অর্থাৎ 'ও'।" বাচস্পতি বলেন যে তাঁহার এই ব্যাখ্যা যাহাতে পুরুষের বহুত্ব সম্বন্ধে বলা হইয়াছে সেই ১৮শ সূত্র হইতে আসিতেছে। সাংখ্যচন্দ্রিকা এই ব্যাখ্যার সমর্থন করিয়াছেন। অধ্যাপক উইল্‌সন্ বাচস্পতির সহিত একমত হইয়া বলিয়াছেন—"আত্মার গুণগুলি যে প্রকৃতিজাত দ্রব্যের গুণগুলির বিপরীত—এই সাধারণ মতের কেবল একস্থানে একটু পরিবর্ত্তন আবশ্যক। ব্যক্ত (discrete principle) বহু, অনেক বলিয়া অভিহিত ; সুতরাং আত্মার অদ্বিতীয় বা এক হওয়া উচিত, এবং সাংখ্য-ভাষ্য অনুসারেও ইহা তাহাই বটে। অপরপক্ষে আত্মার বহু-সংখ্যকত্বহেতু সাংখ্য-তত্ত্বকৌমুদী আত্মাকে ব্যক্তের সহিত এক করিয়াছেন। ... ... সাংখ্য-চন্দ্রিকা এই ব্যাখ্যা সমর্থন করিয়াছেন—" 'তথা চ'" এই শব্দদ্বয়ের দ্বারা এই বুঝায় যে আত্মা অনেকসংখ্যাহেতু ব্যক্তের অনুরূপ।" বস্তুতঃ ইহাই সাংখ্যের মত, কারণ পরে ১৮ সূত্রে ইহাই প্রতিপাদিত হইয়াছে এবং কপিলসূত্রেরও অনুবর্ত্তী ; 'অবস্থাভেদে বহুপুরুষত্ব সিদ্ধ হইয়াছে,' অর্থাৎ 'সাধুপুরুষেরা পুনরায় স্বর্গে জন্মগ্রহণ করেন, দুরাত্মারা নরকে পুনর্জন্ম লাভ করে ; নির্ব্বোধেরা ভ্রমেতে ঘুরিয়া বেড়ায়, এবং জ্ঞানীরা মুক্তিলাভ করে'। সুতরাং, হয় গৌড়পাদ ভুল করিয়াছেন, অথবা তাঁহার 'এক'-শব্দে বুঝিতে হইবে যে সাধারণ হিসাবে আত্মা এক নহে, পরন্তু জন্মজন্মান্তরে বা উৎক্রমণে ইহা এক বা বহু ; অথবা কোলব্রুক সাহেব যেরূপ বলিয়াছেন (রয়েল এসিয়াটিক্ সোসাইটি-অনুবাদ ১ম খণ্ড পৃঃ—৩১) 'অবিভক্ত'। সূত্রগুলিতেও এই জন্য বলা হইয়াছে যে 'আকাশ যেরূপ বহু পাত্রে সম্বদ্ধ হইতে পারে, সেইরূপ এক আত্মারও পাত্র বা আধারভেদে বহুভাবে মিলন সম্ভব।' সুতরাং আত্মার এই একত্ব সেই বিশেষ আত্মাতেই প্রযোজ্য, যাহা বহু জন্মজন্মান্তর, মৃত্যু, বন্ধন ও মোক্ষ প্রভৃতির অধীন ; কারণ ভাষ্যকার বলিতেছেন—'এক পুরুষই পুনরায় জন্মগ্রহণ করে, অপর পুরুষ নহে। সুতরাং গৌড়পাদ যে আত্মার একত্বের কথা বলিতেছেন তাহা নিশ্চয়ই এই অর্থেই বুঝিতে হইবে।'

বাচস্পতির উক্ত ব্যাখ্যা কষ্টকল্পিত এবং ১০ম ও ১১শ কারিকার ভাবের সহিত অসঙ্গত বলিয়া বোধ হয়। যদি 'তথা চ'র অর্থ বাস্তবিকই 'ব্যক্তের ন্যায়' হয়, তাহা হইলে ইহা বুঝা কঠিন যে এই সাদৃশ্য ১০ম সূত্রে যে সকল গুণ বলা হইয়াছে তাহাদের পক্ষে প্রযুক্ত না হইয়া একটীমাত্র গুণের (অনেকত্ব) পক্ষেই কেবল খাটিবে কেন ? যদি বহু বলিয়া পুরুষ ব্যক্তের সদৃশ হয়, তাহা হইলে পুরুষ কেন জন্মবিশিষ্ট, অনিত্য, পরিচ্ছিন্ন প্রভৃতি গুণবিষয়েও প্রকৃতির সদৃশ হইবেন না ? বাচস্পতি এই বিশেষত্বের কোনও কৈফিয়ৎ দেন না। কিন্তু তথাপি অপরে আপত্তি করিতে পারে যে জন্ম প্রভৃতি গুণগুলি পুরুষের পক্ষে প্রযোজ্য নহে ; পুরুষ জাত প্রভৃতি ধারণার বহির্ভূত, কারণ পুরুষ যদি জন্মাদিবিশিষ্ট হয়েন, তাহা হইলে তিনি ব্যক্তের শ্রেণীভুক্ত হইয়া পড়েন ; কিন্তু ইহা ৩য় সূত্রের সহিত অসঙ্গত হইয়া পড়ে। কারণ, সেস্থানে ইহা স্পষ্টই বলা হইয়াছে যে পুরুষ, প্রকৃতি এবং তাহার কার্য্য, উভয় হইতেই ভিন্ন ('ন প্রকৃতির্ন বিকৃতিঃ পুরুষঃ')। এই আপত্তির উত্তর এই যে যদি পুরুষ ব্যক্ত হইতে ভিন্ন হয়েন, তাহা হইলে তিনি প্রকৃতি হইতেও ভিন্ন, তথাপি অজত্ব প্রভৃতি বিষয়ে প্রকৃতির সদৃশ ; সুতরাং, জন্ম প্রভৃতি ব্যক্তের গুণ সম্বন্ধেও কেন তিনি ব্যক্তের সদৃশ হইবেন না ? অবশ্য পত্রপাঠ উত্তর হইতে পারে যে, দুই বিরুদ্ধধর্ম্মী গুণ একই অভিন্ন বস্তুতে থাকিতে পারে না। তাহা সত্য নহে। এক অভিন্ন বস্তুর বিরুদ্ধ গুণ থাকিতে পারে। বাস্তবিক পক্ষে 'বিরুদ্ধ' বলিয়া কোনও কিছু নাই ; তাহারা কেবল 'বিভিন্ন' এই কথা বলা যাইতে পারে। পৃথিবীতে সকল বস্তুরই ভিন্ন ভিন্ন স্থান আছে, এবং যখন তাহারা স্ব স্ব স্থানে থাকে তখন তাহারা পরস্পরের সহিত সম্পূর্ণ সামঞ্জস্যযুক্ত ; তাহারা স্বস্থানচ্যুত হইলেই বিরুদ্ধতা ও অসামঞ্জস্য আসিয়া উপস্থিত হয়। সুতরাং, আপাতঃ

বিরুদ্ধ বস্তু যদি স্ব স্ব স্থানে স্থাপিত হয় তাহা হইলে একত্র *থাকিলেও পরস্পর বিরুদ্ধ হয় না।* (১ম অধ্যায় ১২—খ দ্রষ্টব্য)। সুতরাং, যদিও প্রকৃতি এক, তথাপি ইহার মধ্যে বহু হইবার শক্তি নিহিত আছে, কারণ অন্যথা উহা কখনও বহুধা বিভক্ত হইতে পারিত না। যদি প্রকৃতি কেবল একই হইত এবং নিজেতেই আবদ্ধ থাকিত তাহা হইলে উহা বহুরূপে প্রকাশিত হইতে পারিত না। সুতরাং প্রকৃতির একত্বের মধ্যেই তাহার বহুত্বের বীজও নিহিত আছে—প্রকৃতি একে বহু। প্রকৃতির অপরাপর গুণের পক্ষেও এই একই কথা। প্রকৃতি একই কালে অজও বটে আবার উৎপত্তিবিশিষ্টাও বটে, নিত্যও বটে অনিত্যও বটে, অসীমও বটে সসীমও বটে, ইত্যাদি। প্রকৃতি যদি কেবলমাত্র অজ, নিত্য, অসীম প্রভৃতি হইত, এবং তাহার মধ্যে যদি জায়মানত্ব, অনিত্যত্ব ও অসীমত্ব প্রভৃতির বীজ নিহিত না থাকিত, তাহা হইলে উহার মধ্য হইতে যাহা কিছু জাত, অনিত্য ও পরিচ্ছিন্ন তাহা উৎপন্ন হইতে পারিত না, সৃষ্টি বা অভিব্যক্তি অসম্ভব হইত। কিন্তু সাংখ্যকার যথেষ্ট বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিয়া বলেন যে প্রকৃতি বিশুদ্ধভাবে একরূপ নহে; কিন্তু সত্ত্ব, রজ ও তমোরূপ বিভিন্ন উপাদানে সম্মিলিত হইয়া জটিল একরূপ। বস্তুতঃ প্রকৃতির নিজস্ব বিশেষ গুণ আছে এবং ইহার জন্য সে ব্যক্ত হইতে ভিন্ন; পক্ষান্তরে প্রকৃতি হইতে প্রকৃতিরই অংশরূপে অভিব্যক্ত বস্তুর ধর্ম্ম বা গুণও তাহার আছে, এবং সেই স্থলেই সে ব্যক্তের সদৃশ। এই মতটী সাংখ্যের উপদিষ্ট তথ্যের বিরুদ্ধে নহে, সাংখ্যের কার্য্যকারণবাদ (সৎকার্য্যবাদ) বা অভিব্যক্তিবাদ নিম্নলিখিত প্রকারে এই মতের সমর্থন করিয়াছে; ৯ম কারিকায় বলা হইয়াছে—"অসদকরণাদুপাদানগ্রহণাৎ সর্ব্বসম্ভবাভাবাৎ। শক্তস্য শক্যকরণাৎ কারণভাবাচ্চ সৎকার্য্যম্‌" ॥ অর্থাৎ "কার্য্যরূপে পরিণত হইবার পূর্ব্বে কার্য্য কারণকে অবলম্বন করিয়াই অবস্থান করে; কারণ, যাহার অস্তিত্ব নাই তাহা কারণের কোনও চেষ্টাতেই সম্ভূত হইবার নহে। উপাদানসমূহও কার্য্যোপযোগী বুঝিয়া নির্ব্বাচিত হয়; প্রত্যেক বস্তুই প্রত্যেক উপায় দ্বারা সাধ্য নহে; যাহা যে কার্য্যে সমর্থ তাহা সেই কার্য্যই করে এবং কার্য্যও কারণের স্বভাবাপন্ন হয়।" এই শ্লোকটীতে এই বাক্যটী বিশেষভাবে লক্ষ্য করিতে হইবে—'কারণভাবাৎ', অর্থাৎ "কারণং যল্লক্ষণং তল্লক্ষণমেব কার্য্যমপি", অর্থাৎ 'কারণের যে লক্ষণ কার্য্যেরও অবিকল সেই লক্ষণই হয় (গৌড়পাদ), অথবা 'কার্য্যস্য কারণাত্মত্বাৎ' অর্থাৎ 'কার্য্য ও কারণ একাত্ম হওয়াতে' (বাচস্পতি)। এখন আমরা এই মতবাদটী যদি প্রকৃতি ও তাহার কার্য্যের প্রতি প্রয়োগ করি, তাহা হইলে আমরা কিরূপে বলিতে পারি যে প্রকৃতি কেবল এক, অনাদি, নিত্য ইত্যাদি, এবং তাহার কার্য্যগুলি কেবলই বহু, উৎপত্তিমান, অনিত্য, ইত্যাদি? যদি কারণ ও কার্য্য একধর্ম্মাক্রান্ত হয়, তাহা হইলে তাহাদের মধ্যে সাধারণ লক্ষণ বিরাজিত থাকিবে, যদিও অভিব্যক্তির পর কার্য্য নূতনরূপ ধারণ করে এবং কারণ হইতে ভিন্ন অন্য কতকগুলি গুণ প্রাপ্ত হয়। কিন্তু ইহাতে একথা বুঝায় না যে এই অপর লক্ষণগুলির বীজ কারণে নিহিত থাকে না, যেহেতু কারণে সেগুলি নিহিত না থাকিলে, কার্য্যে এরূপ কতকগুলি গুণ থাকিবে যাহার কারণ মূল কারণে ছিল না—কিন্তু তদ্ব্যতিরিক্ত অন্য কিছুতে ছিল; অর্থাৎ সরলভাবে বলিতে হয় যে ইহার নিজের কারণের মধ্যে ইহার উপাদান কারণ যথেষ্ট ছিল না, পরন্তু কারণান্তরের প্রয়োজন হইয়াছিল। ব্যক্তের সম্বন্ধে সেই অপর কারণটী কি হইবে? সাংখ্য প্রকৃতি ব্যতীত আর অন্য কোনও কারণ স্বীকার করেন না; সুতরাং প্রকৃতিকেই কেবল যথেষ্ট কারণ বলিয়া গ্রহণ করিতে হইবে; অর্থাৎ প্রকৃতির ভিতরেই ব্যক্তের সকল গুণের বীজ নিহিত আছে বলিতে হইবে। ইহাতে ইহাই সিদ্ধ হইতেছে যে প্রকৃতির মধ্যে পরস্পর-বিরোধী দুই শ্রেণীর গুণ আছে—এক শ্রেণী প্রকৃতির নিজের স্বাভাবিক (অর্থাৎ অব্যক্ত) অবস্থার এবং অপর শ্রেণী তাহার কার্য্যাবস্থার।

উপরি-উক্ত যুক্তিটী দেখাইতেছে যে একই বস্তুর মধ্যে বিরুদ্ধধর্ম্মাক্রান্ত গুণ থাকিতে পারে এবং বস্তুতঃ জগতে সকল বস্তুরই মধ্যে বিরুদ্ধ গুণ আছে; উদাহরণস্বরূপ বলা যাইতে পারে, প্রত্যেক বস্তুই একটীমাত্র অথচ বহু গুণান্বিত—প্রত্যেক বস্তুই একটী সম্পূর্ণ সমষ্টি (A single whole) অথচ বহু অংশের দ্বারা গঠিত; অথবা অন্যভাবে বলা যায় যে প্রত্যেক বস্তুই একের মধ্যে বহু—একরূপ অথচ বৈচিত্র্যময়। পুরুষ সম্বন্ধেও অবিকল এই কথাই সত্য। তিনি এক হইয়াও বহু, অজ হইয়াও জাত, নিত্য হইয়াও অনিত্য, অসীম হইয়াও সসীম ইত্যাদি। তিনি একপুরুষ হইয়াও বহুপুরুষে প্রবিভক্ত; তিনি সকল উৎপন্ন বা কারণবিশিষ্ট কার্য্যের অনাদি কারণ; তিনি নিত্য হইয়া সকল অনিত্য বস্তু বা জীবে তত্তদ্রূপে প্রকাশবান্‌। তিনি অসীম হইয়া সকল সসীম বস্তু ধারণ করিতেছেন। পুরুষ যদি কেবলমাত্র বিশুদ্ধ এক, যদি কেবল অপ্রবিভেদ্য একরূপই হইতেন, তাহা হইলে বহু হইতে পারিতেন না; তিনি যদি কেবল অজ হইতেন এবং তাঁহাতে উৎপন্ন জগতের কোনও বীজ নিহিত না থাকিত, তাহা হইলে উৎপন্ন যাহা কিছু তাহা হইতে পারিত না; তিনি যদি

কেবল নিত্য শাশ্বত ও অসীম হইতেন এবং তাঁহাতে অনিত্য ও সসীমের কোনও বীজ নিহিত না থাকিত, তাহা হইলে কোনও কিছুই অনিত্য ও সসীম হইতে পারিত না। অথবা অন্যভাবে বলিতে গেলে বলিতে হয় যে, যদিও পুরুষ স্বভাবতঃ ও স্বরূপতঃই এক, অজ, নিত্য, অসীম ইত্যাদি, তথাপি তিনি বহু, জাত, অনিত্য, সসীম ইত্যাদি রূপেও প্রতিভাত হয়েন; এবং 'তদ্বিপরীতস্তথাচ পুমান্' ইহার একটি ব্যাখ্যা আছে, যাহা আমাদিগের এই অনুমানেরই সমর্থন করিয়াছে। ইহার অর্থ হইতে পারে যে পুরুষ তাহাদিগের (ব্যক্ত ও প্রধানের) বিপরীত ও সদৃশও বটে। এই ব্যাখ্যাটীই আমার নিকট সত্য ও নির্দ্দোষ বলিয়া বোধ হয়। এ সম্বন্ধে আমি পরে আরও বিস্তৃতভাবে আলোচনা করিব। অধ্যাপক উইলসন্ ও ডাঃ কোল্‌ব্রুক্ যে ব্যাখ্যা করিয়াছেন—পুরুষ এই অর্থে এক যে তিনি তাঁহার বহু জন্ম-জন্মান্তরে এক ও অভিন্ন ব্যক্তি থাকেন—তাহা প্রত্যক্ষতঃই অসম্ভব।

চাষার গান।

(শ্রীনির্ম্মলচন্দ্র বড়াল)

বাউল সুর।

ও ভাই, আমরা করি চাষ
ও ভাই, আমরা করি চাষ;
এই হল নিয়ে আর গোধন নিয়ে
সুখেই করি বাস
ও ভাই, আমরা করি চাষ।
সারাবেলা মাঠে মাঠে
রৌদ্রে জলে দিবস কাটে
অনেক দুখে ধরার বুকে
জাগাই অমল হাস।

ও ভাই হল আমাদের বল
ও ভাই হল আমাদের বল
এই হল আমাদের অন্ন জোগায়
পণ্য ও কম্বল।
ও ভাই হল আমাদের বল।
সবুজ ধানে ক্ষেত্র ভরে
আনন্দেতে নেত্র ঝরে
সহজ সুখে দিবস কাটে
মোরা নই-যে কারুর দাস,
ও ভাই আমরা করি চাষ॥

শ্রীরামানুজ স্বামী।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

(শ্রীকালীপ্রসন্ন বিশ্বাস)

শ্রীরঙ্গমে পৌছিবামাত্র রামানুজ ও মহাপূর্ণ দেখিলেন যে, একটি সুদীর্ঘ জনস্রোত তাঁহাদিগের দিকে আসিতেছে। এই ব্যাপার দেখিয়া মহাপূর্ণ একজন পথিককে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, এই জনস্রোত কোথা হইতে বা কিজন্য আসিতেছে? পথিক কাতরকণ্ঠে বলিলেন—"হায়, আপনি কি শুনেন নাই যে, আমাদের গুরুদেব যমুনাচার্য্য চির-সমাধিতে মগ্ন হইয়াছেন? আমরা তাঁহার পার্থিব দেহ লইয়া সমাধিক্ষেত্রে গমন করিতেছি।" এই সংবাদ প্রাপ্তিমাত্র উভয়েই অচেতন হইয়া পড়িয়া গেলেন। রামানুজ শোকে অধিকতর কাতর হইলেন। যাঁহাকে দেখিবার জন্য তিনি সুদূর কাঞ্চী হইতে তথায় উপস্থিত হইয়াছেন তাঁহাকে জীবিত দেখিতে পাইলেন না, তাঁহার জীবনের এত আশার একেবারেই মূলচ্ছেদ হইল, ইহাতে যে তিনি এতদূর কাতর হইবেন তাহা সম্পূর্ণ স্বাভাবিক। মহাপূর্ণ বলিলেন—"ইহা ভগবানের কার্য্য, বিলাপ করিলে কি হইবে? ভগবান দয়ানিধান; ইহার মধ্যেও না জানি তাঁহার কত দয়া সঞ্চিত আছে। তিনি যাহা করেন তাহাই মঙ্গল। গুরুদেবের মৃত্যুরও নিশ্চয়ই কোন মঙ্গল উদ্দেশ্য আছে। আসুন, আমরা তাঁহার মৃতদেহ দর্শন করিয়া আসি।"

তৎপরে তাঁহারা সমাধিক্ষেত্রে গমন করিলেন। যমুনাচার্য্যের অন্যান্য শিষ্যগণ মহাপূর্ণকে দেখিয়া যুগপৎ হর্ষ ও দুঃখের সহিত তাঁহারা যথাযোগ্য অভ্যর্থনা করিলেন। মহাপূর্ণও তাঁহাদের সহিত রামানুজকে পরিচিত করিয়া দিলেন। কারণ সকলেই জানিতেন যে, তাঁহাদের গুরুদেব মৃত্যুর পূর্ব্বে এই রামানুজকে দেখিবার জন্য অত্যন্ত উৎসুক হইয়াছিলেন এবং সেই জন্যই মহাপূর্ণকে তিনি কাঞ্চীধামে প্রেরণ করিয়াছিলেন।

রামানুজ যমুনাচার্য্যের মৃতদেহ দর্শন করিয়া বলিলেন, "আমি নিতান্ত দুর্ভাগ্য নহি; কারণ, যে পার্থিব দেহপিঞ্জর সেই মহাপুরুষকে এতদিন ধারণ করিয়াছিল তাহা এখনও অন্তর্হিত হয় নাই।" ভক্তগণ বলেন যে, এই কথা বলিবার পরই রামানুজ দেখিলেন যে, যমুনাচার্য্যের মৃতদেহের দক্ষিণ হস্তের তিনটি অঙ্গুলি বদ্ধ রহিয়াছে। তখন তিনি সকলকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"এ কি?" শিষ্যগণ বলিলেন—"যখন তিনি জীবিত ছিলেন তখন তো তাঁহার অঙ্গুলি বদ্ধ ছিল না; আমরা ইহার অর্থ কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না।" রামানুজ বলিলেন, "বোধ হয় তাঁহার মৃত্যুর পূর্ব্বে কোনরূপ বাসনা অসম্পূর্ণ থাকিয়া গিয়াছে। তিনি যখন শেষ উপদেশ দেন, তখন কি

তাঁহার কোন অসম্পূর্ণ বাসনার কথা প্রকাশ করিয়াছিলেন?" শিষ্যগণ বলিলেন, "হায়; এখন আমাদের স্মরণ হইতেছে যে, ব্যাস ও পরাশর প্রভৃতি মহামুনিগণের প্রতি তাঁহার অচলা ভক্তি ছিল। তিনি দুঃখপ্রকাশ করিয়াছিলেন যে, তাঁহার বার্দ্ধক্য এবং শারীরিক ক্লেশ-বশতঃ তিনি ব্যাসদেববিরচিত ব্রহ্মসূত্রের বিশিষ্টাদ্বৈত ভাষ্য লিখিয়া যাইতে পারিলেন না।" এই কথা শুনিয়া রামানুজ বলিলেন, "যদি আমি বাঁচিয়া থাকি, যদি তিনি আমার ন্যায় অধম ব্যক্তির উপর সত্য সত্যই কৃপাপরবশ হইয়া থাকেন, এবং যদি ভগবান আমার প্রার্থনা শ্রবণ করেন, আমি সর্ব্বজন সমক্ষে প্রতিজ্ঞা করিতেছি যে, আমিই তাঁহার জীবনের শেস বাসনা পূর্ণ করিব। যদি আমার এই সেবায় তাঁহার সম্মতি থাকে তবে তাহার নিদর্শনস্বরূপ বদ্ধ অঙ্গুলীত্রয় মুক্ত হউক।" এই কথা বলিবামাত্র শবদেহের বদ্ধ অঙ্গুলী খুলিয়া গেল। এবম্বিধ আশ্চর্য্য ঘটনা দেখিয়া সকলেই বিস্মিত হইলেন। রামানুজ যে যমুনাচার্য্যের স্থান অধিকার করিবার উপযুক্ত পাত্র, সে বিষয়ে কাহারও সন্দেহ রহিল না। তখন যমুনাচার্য্যের প্রধান শিষ্য বররঙ্গ রামানুজের সম্মুখে গমন করিয়া বলিলেন—"প্রভো, আপনিই আমাদের গুরুদেবের প্রিয়তম ভক্ত, আপনার উপরেই তাঁহার দৈবশক্তি নিপতিত হইয়াছে।" তৎপরে তিনি অন্যান্য শিষ্যগণকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন—"হে বন্ধুগণ! এই মহাপুরুষই আমাদের ভবিষ্যৎ গুরু। ইঁহাকে দেখিবার জন্যই আমাদের গুরুদেব বাসনা করিয়াছিলেন; কারণ স্বহস্তে ইঁহাকে তাঁহার স্থানাভিষিক্ত করিবার ইচ্ছা তাঁহার ছিল। অতএব ইনিই এক্ষণে আমাদের গুরু—ইঁহারই প্রদর্শিত পথ অবলম্বন করিয়া আমরা সেই ব্রহ্মস্বরূপে লীন হইব।" এই কথা শুনিয়া সকলে সমস্বরে বলিয়া উঠিলেন—"তাহাই হউক"। তৎপরে রামানুজ বলিলেন "আমার ন্যায় ক্ষুদ্র ব্যক্তির উপরে তিনি অতি গুরুভার অর্পণ করিয়া গিয়াছেন। আমি বিশ্বাস করি যে, ভগবান আমাকে সেই গুরুভার বহন করিবার উপযুক্ত শক্তি দিবেন। তিনি গুরুদেবের চির-বাঞ্ছিত ইচ্ছা পূর্ণ করিবার সহায় হইবেন।" তদনন্তর যমুনাচার্য্যের শবদেহ সমাধিস্থ করিয়া সকলে মঠাভিমুখে প্রত্যাগমন করিলেন।

কিছুদিন পরে কাঞ্চীনগরে প্রত্যাগমন করিয়া রামানুজ সবিশেষ ঘটনা কাঞ্চীপূর্ণের নিকট বিবৃত করিলেন। নম্বী যমুনাচার্য্যের তীরোভাব সংবাদ পাইয়া যার পর নাই দুঃখিত হইলেন; কিন্তু তিনি দেখিলেন যে, রামানুজ তাঁহা অপেক্ষাও শোকার্ত্ত হইয়াছেন। ইহা দেখিয়া তিনি রামানুজকে বলিলেন—"আর বিলাপ করিলে কি হইবে? কাঞ্চীশ্বরের উপর বিশ্বাস স্থাপন করুন। মঙ্গলময়ের ইচ্ছায় তাঁহার মঙ্গল ইচ্ছা পূর্ণ হইবে।"

রামানুজ নম্বীর সান্ত্বনা বাক্যে শোক পরিত্যাগ পূর্ব্বক পুনরায় পূর্ব্ববৎ বরদরাজের সেবাকার্য্যে নিযুক্ত হইলেন। নম্বীর প্রতি তাঁহার ভক্তি ও শ্রদ্ধা ক্রমশঃই বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতে লাগিল। নম্বীও তাঁহার প্রতি আসক্ত হইতে লাগিলেন। এই নিকটতর সম্বন্ধে রামানুজ নম্বীর মহত্ত্ব ও আধ্যাত্মিক উৎকর্ষ দেখিয়া তাঁহার প্রতি এতদূর আকৃষ্ট হইলেন যে নম্বী নীচ কুলোদ্ভূত হইলেও স্বয়ং ব্রাহ্মণ সন্তান হইয়া তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করিলেন।

একদিন রামানুজ নম্বীর নিকট গমন করিয়া তাঁহাকে প্রণাম পূর্ব্বক বলিলেন "হে মহাভাগ, হে দেব, যদি দয়া করিয়া আমাকে আপনার পদতলে বসিয়া মোক্ষপদ প্রাপ্ত হইবার জন্য উপযুক্ত জ্ঞানলাভ করিতে অনুমতি করেন তবে এদাস চির কৃতার্থ হয়।" নম্বী এবম্বিধ প্রকারে সম্মানিত হইয়া বলিলেন "বৎস, অমন কথা বলিও না। তোমার গুরুপদ লাভ করিবার শক্তি আমাতে সম্ভবে না। বোধ হয় বরদরাজদেবের আমার প্রতি অনুগ্রহ দেখিয়া তুমি এইরূপ অনুরোধ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছ।" রামানুজ তাঁহাকে বাধা দিয়া বলিলেন "কিন্তু শাস্ত্র আমাদিগকে শিক্ষা দিতেছে যে, সকল জাতির মধ্যেই মহৎ ব্যক্তি জন্ম গ্রহণ করিতে পারেন। যাঁহারা ব্রহ্মকে জানিয়াছেন তাঁহাদের প্রচলিত জাতিভেদ প্রথা অতি সামান্য বলিয়াই জ্ঞান করা উচিত। নম্বী বলিলেন—"না না, আমি সম্পূর্ণরূপে অনুপযুক্ত। এতদ্ভিন্ন প্রচলিত জাতিভেদ প্রথা রক্ষা করা কি আমাদের কর্ত্তব্য নহে? ঋষিগণের এই জাতি সম্বন্ধীয় প্রথা প্রচলন করিবার কি কিছু উদ্দেশ্য নাই? গীতায় শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন—

'যদ্‌যদাচরতি শ্রেষ্ঠস্তত্তদেবেতরো জনঃ।
স যৎ প্রমাণং কুরুতে লোকস্তদনুবর্ত্ততে॥'

শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি যে যে আচরণ করিয়া থাকেন, সাধারণ লোকেও সেইরূপই আচরণ করে, এবং শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি যাহা প্রমাণ বলিয়া গণ্য করেন সাধারণ লোকে তাহারই অনুবর্ত্তী হয়।

'ন মে পার্থাস্তি কর্ত্তব্যং ত্রিষু লোকেষু কিঞ্চন।
নানবাপ্তমবাপ্তব্যং বর্ত্ত এব চ কর্ম্মণি॥'

হে পার্থ! দেখ, আমার কিছুই কর্ত্তব্য কর্ম্ম নাই, অর্থাৎ কোন কর্ম্ম করার প্রয়োজনই নাই, কারণ এই ত্রিভুবনে আমার কিছুই অপ্রাপ্ত পদার্থ নাই এবং প্রাপ্তব্যও কিছুই নাই; তথাপি আমি বিহিত কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতেছি।

'যদি হ্যহং ন বর্ত্তেয়ং জাতু কর্ম্মণ্যতন্দ্রিতঃ ।
মম বর্ত্মানুবর্ত্তন্তে মনুষ্যাঃ পার্থ ! সর্ব্বশঃ ॥'

কারণ, আমি যদি অতন্দ্রিত ভাবে কদাপি কর্ম্মানুষ্ঠান না করি, হে পার্থ! তবে সমস্ত মনুষ্যই আমার পথের অনুসরণ করিবে।

'উৎসীদেয়ুরিমে লোকা ন কুর্য্যাং কর্ম্ম চেদহম্ ।
সঙ্করস্য চ কর্ত্তা স্যামুপহন্যামিমাঃ প্রজাঃ ॥'

সুতরাং আমি যদি কর্ম্ম না করি, তবে কর্ম্মহীন হইয়া সমস্ত লোক নষ্ট হইবে। বিহিতানুষ্ঠান এবং নিষিদ্ধের বর্জ্জনাভাবে সংসারে ধর্ম্মসঙ্কর, আশ্রমসঙ্কর ও বর্ণ-সঙ্করাদি হইবে; সুতরাং আমার দ্বারাই এই ঘটনা ঘটিল, এবং তাহার ফলে সমস্ত প্রজা বিনষ্ট হইবে; সুতরাং তাহার কারণও আমি হইলাম; এই নিমিত্ত আমিই সমস্ত কর্ম্ম অনুষ্ঠান করিয়া থাকি।

'চাতুর্ব্বর্ণ্যং ময়া সৃষ্টং গুণ-কর্ম্ম-বিভাগশঃ ।
তস্য কর্ত্তারমপি মাং বিদ্ধ্যকর্ত্তারমব্যয়ম্ ॥'

সত্ত্ব, রজ ও তমগুণের বিভাগ দ্বারা এবং চেষ্টা বা ক্রিয়া-বিভাগ দ্বারা আমি ব্রাহ্মণাদি চতুর্ব্বর্ণ সৃষ্টি করিয়াছি। অথচ আমাকে অকর্ত্তা বলিয়াই বুঝিবে; কারণ আমি অব্যয়, অর্থাৎ আমার অবস্থার কোন প্রকার পরিবর্ত্তন হইতে পারে না।

অতএব হে মহাভাগ! তুমি মহাজন-সমাদৃত এই চাতুর্ব্বর্ণ্য ধর্ম্মকে তুচ্ছ জ্ঞান করিয়া সমাজবিশৃঙ্খলতা সৃষ্টি করিও না। কারণ শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন—

'শ্রেয়ান্ স্বধর্ম্মো বিগুণঃ পরধর্ম্মাৎ স্বনুষ্ঠিতাৎ ।
স্বধর্ম্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরধর্ম্মোভয়াবহঃ ॥'

যদিও স্বধর্ম্ম পরধর্ম্মের তুলনায় অপ্রশস্ত বলিয়া বোধ হয়, তথাপি স্বধর্ম্ম প্রতিপালন করা কর্ত্তব্য। স্বধর্ম্মে নিধনও কল্যাণজনক, কিন্তু পরধর্ম্মকে ভয়াবহ বলিয়া জানিবে।

সুতরাং হে রামানুজ! ব্রাহ্মণসন্তান হইয়া আমার ন্যায় নীচ জাতীয় ব্যক্তি জ্ঞানী হইলেও তাহার শিষ্যত্ব স্বীকার করা তোমার কদাপি উচিত নহে।"

ব্রহ্মসঙ্গীত-স্বরলিপি।

রাগিণী মেঘমিশ্র—তাল ঠুংরি।

জীবন-আঁধারে মোর কে তুমি সহায় আছ—এস।
চারিদিকে ঘনঘোর, অন্ধ এ পান্থ, কে তুমি সহায় আছ—এস।
বিজলী ঝিলিক হানে আকাশে, হুঙ্কারি ফেরে বনে বাতাসে,
সকল পরাণ কাঁপে তরাসে—কে তুমি সহায় আছ, এস।
এ দুখরাতে তোমা ডাকি, অন্ধের কে গো তুমি আঁখি!
দেখা দাও নিরাশ্রয় জনে দেখা দাও আশাহত মনে
বেদনা-মথিত জীবনে অমৃত-নিঝর কে গো—এস!

কথা, সুর ও স্বরলিপি—শ্রীনির্ম্মলচন্দ্র বড়াল বি-এল্।

II মা মা রা রা। সা সা সা -া I পা সা সা সা। ন্সা -রা জ্ঞা সা I
জী ব ন আঁ ধা রে মো র্ কে তু মি স হা॰ য় আ ছ

I রপা -মপা -া -া। রা -া -া -া I মা মা মা পা। পা পা পা -া I
এ॰ ॰॰ ॰ ॰ স ॰ ॰ ॰ চা রি দি কে ঘ ন ঘো র্

I পা -া পা মা। পা -া পা -া I সা সা সা সা। ন্সা -রা জ্ঞা সা I
অ ন্ ধ এ পা ন্ থ ॰ কে তু মি স হা॰ য় আ ছ

I রপা -মপা -া -া। রা -া -া -া II
এ॰ ॰॰ ॰ ॰ স ॰ ॰ ॰

১´ • ১´ •
[না না না]
II { মা পা পনা না । না -া না নর্সা I র্সা র্সা র্সা -া । -া -া -া -া I
• বি জ লী॰ ঝি লি ক্ হা নে॰ আ কা শে • • •• • •

১´ • ১´ •
[-া -া -া -া]
I র্সা -া ণা ধা । পা মা মা পা । পা র্রা র্রা -া । র্মজ্ঞা -া -া -া } I
হু ঙ্ কা রি ফে রে ব নে বা তা সে • •• • • •

১´ • ১´ •
I না না না না । র্সা -া র্সা র্রা I র্সা ণা ধা -া । -পা -া -া -া I
স ক ল প্ রা ণ কাঁ পে ত্র া সে • • • • •

১´ • ১´ •
I সা সা সা সা । ন্সা -রা জ্ঞা সা I রপা -মপা -া -া । রা -া -া -া II
কে তু মি স হা॰ র আ ছ এ॰ •• • • স • • •

১´ • ১´ •
II { ন্া ন্া ন্া ন্া । ন্া -া ন্া সা I ধন্া -সরা ন্সা -া । -া -া -া -া I
এ দু খ রা তে ॰ তো মা ডা॰ •• কি • • • • •

১´ • ১´ •
[-া -া -া -া]
I প্া সা সা -া । সা সা সা রা I ন্সা -রা রা -া । -মজ্ঞা -া -া -া } II
অ ন্ ধে র্ কে গো তু মি আঁ॰ • খি • •• • • •

১´ • ১´ •
II { মা পা পা -া । পা পা ণা ণা I মা -পা পা -া । -া -া -া -ণ I
দে খা দা ও নি রা শ্র য় জ • নে • • • • •

১´ • ১´ •
I না না ন্া -া । না না না র্সা I -র্সা র্সা -া । -া -া -া -া } I
দে খা দা ও আ শা হ ত ম ॰ নে • • • • •

১´ • ১´ •
I পা র্সা র্সা র্সা । র্সা র্সা র্সা -র্রা I নর্সা -র্রা র্রা -া । -া -া -া -া I
বে দ না ম থি ত জী • ব॰ • নে • • • • •

১´ • ১´ •
I সা সা সা সা । ন্সা -রা জ্ঞা সা I রপা -মপা -া -া । রা -া -া -া II II
অ মৃ ত নি ঝ॰ র্ কে গো এ॰ •• • • স • • •

———*———

বাঁশী বাজান কি ভাল ?

(শ্রীনলিনীকান্ত চট্টোপাধ্যায়)

সাধারণতঃ অনেকেই বলিয়া থাকেন, "ওরে বাঁশী বাজাস্ নে, বুকের অসুখ হবে, মুখ দিয়ে রক্ত উঠ্‌বে" ইত্যাদি। এ কথাটা কতদূর সত্য তাহা বিবেচ্য। শুধু বাঁশী বাজাইয়াই মুখ দিয়া রক্ত উঠিয়া লোক মারা গিয়াছে, এমন কোন সংবাদ এতাবৎ পাওয়া যায় নাই। যাহারা সর্ব্বদা বাঁশী বাজাইতে চাহেন তাঁহাদের চরিত্র নির্ম্মল হওয়া অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। বাঁশী না বাজাইলেও ইন্দ্রিয়াসক্ত ব্যক্তি বা যাঁহারা অধিক পরিমাণে মদ গাঁজা প্রভৃতিতে আসক্ত তাঁহাদেরই বুক বা যকৃৎ (লিভার) হইতে রক্ত উঠিয়া থাকে। বংশীবাদকগণের মধ্যে যদি কাহারও ঐ সকল দোষ থাকে এবং সেজন্য যদি তাহার অসুখ হয় তজ্জন্য বাঁশী বাজানই যে রোগের কারণ তাহা বলা উচিত নহে। যদি তাহা হইত তবে শ্রীকৃষ্ণের সময়কার কথা ছাড়িয়া দিয়া আধুনিক যুগের শ্রীচৈতন্য দেবের নগরসঙ্কীর্ত্তনে যাঁহারা রামশিঙ্গা বাজাইতেন অথবা নিরীহ পল্লীবাসী বা কৃষকগণের মধ্যে যাহারা বাঁশী বাজাইয়া থাকে, তাহাদেরও বুকের রোগ হইত বা মুখ দিয়া রক্ত উঠিত।

জগতের যাহা কিছু সুন্দর ও শ্রেষ্ঠ সমস্তই শ্রীভগবানে বিরাজিত। বিভিন্ন রূপ ধারণ করিয়াও ভগবান বাঁশীর মোহ ভুলিতে পারেন নাই। যদি বাঁশী বাজান খারাপই হইবে তবে বিষ্ণু শঙ্খ, মহাদেব শিঙ্গা, কৃষ্ণ বেণু ও বলরাম রামশিঙ্গা বাজাইবেন কেন ? যুদ্ধ বা শুভকার্য্যে শঙ্খধ্বনির প্রচলন কেন ছিল ? হিন্দুর ঘরে প্রত্যহ সকাল-সন্ধ্যায় পূজায় ও শুভকার্য্যে শঙ্খ বাজিয়া তীব্র গম্ভীর স্বরে আনন্দ-সংবাদ প্রচার করিতেছে। যে জিনিষটি ভালর পরিচায়ক তাহা হইতে কখনও মন্দ হইতে পারে না।

সঙ্গীত যোগের একটি অঙ্গ। যোগসাধনায় চিত্তবৃত্তির নিরোধ প্রয়োজন এবং সে কারণ শ্বাস-প্রশ্বাসের গতিবিধিও তদনুযায়ী নির্দ্ধারিত করিতে হয়। যে সকল প্রক্রিয়ায় এই কার্য্য সম্পন্ন হয় তাহা অনেকের পক্ষে সহজসাধ্য নহে। সেজন্য মহাযোগী মহাদেব সঙ্গীতের সৃষ্টি করেন। পৃথিবীর সকল জাতিরই ধর্ম্মগ্রন্থে উল্লিখিত আছে যে, সৃষ্টির পূর্ব্বে কেবলমাত্র শব্দ ছিল। শাস্ত্রগ্রন্থাদি পাঠে জানা যায় যে, প্রথমে প্রণবধ্বনি ঝঙ্কৃত হয়। যাঁহারা একালে নিষ্ঠাবান বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণমুখে (ওঁ) ওঙ্কার উচ্চারিত হইতে শুনিয়াছেন তাঁহারা সহজেই বুঝিতে পারিবেন অ-উ-ম এই তিন অক্ষর মিলিত হইয়া যে ভাবে ওঁ উচ্চারিত হয়, ঐ ছন্দে যে কোনও বাদ্যযন্ত্রে 'সা—মা' বাজাইলে সেইরূপ শব্দ হয়। সা হইতে মা ইহার মধ্যে সা, রে, গা, মা এই চারিটি সুর আছে। পঞ্চাননের চারিটি মুখ হইতে যথাক্রমে অ-উ-ম (সা, রে, গা, মা) ধ্বনিত হইয়া পঞ্চম মুখ হইতে পূর্ণস্বরে (ওঁ) ওঙ্কারের গুরুগম্ভীর সুর বাহির হয়। এই কারণেই বোধহয় ধ্যানে মহাদেবের পঞ্চমুখ বর্ণিত হইয়া থাকিবে। সামগানেও ঐ চারিটি সুর মাত্র (সা, রে, গা, মা) ব্যবহৃত হয়। গ্রাম্য বা 'গেঁয়' গানের সুর একঘেয়ে হইলেও তাহাতে সাধারণতঃ ৩, ৪ বা ৫টি সুর ব্যবহৃত হয়। একটু লক্ষ্য করিলেই ইহার সত্যাসত্য বুঝিতে পারিবেন। সে কারণ মনে হয় প্রথমে পূর্ব্বোক্ত ঐ চারিটি সুরই সৃষ্ট হইয়াছিল। পরে দেশ-কাল-পাত্রভেদে আবশ্যকানুযায়ী অপর সুরগুলি এবং নানা রাগরাগিণীর সৃষ্টি হইয়াছিল। সাধনা ব্যতীত সঠিকভাবে ওঙ্কার (ওঁ) উচ্চারিত হয় না। ওঙ্কার ধ্বনিত করিতে সা (-রে, গা-) মা উচ্চারণ করিতে হয়। সা, রে, গা, মা সঙ্গীতের প্রধান অঙ্গ, সুতরাং সঙ্গীতও যোগের অঙ্গ। এখন বাঁশীর সহিত যোগের সম্পর্ক কি, তাহাই আলোচ্য। যোগীরা কাপড় বা কলার মাঝ (কলা গাছের ভিতরকার অত্যন্ত নরম কচি সাদা পাতা) গলার ভিতর ঢুকাইয়া বাহির করিয়া লইয়া "ধৌতি" করিতেন। বাঁশী, শঙ্খ বা শিঙ্গা বাজাইলে সেই কার্য্যই হইয়া থাকে। যাঁহাদের পক্ষে "ধৌতি" সহজসাধ্য নহে তাঁহাদের জন্যই বাঁশী প্রভৃতির সৃষ্টি। "ধৌতির" উদ্দেশ্য, যোগের সুবিধা জন্য শ্বাস-প্রশ্বাসের পথ সম্পূর্ণরূপে পরিষ্কার রাখা। বাঁশী বাজাইয়াও সেই কাজ হয়।

এই প্রসঙ্গে একটি সত্য ঘটনার উল্লেখ না করিয়া থাকিতে পারিলাম না। সে আজ অনেক দিনের কথা—আমার কোনও এক বন্ধু একজন উচ্চশ্রেণীর বংশীবাদক। তিনি প্রত্যহ দিনেরাতে ১০.১২ ঘণ্টা করিয়া বাঁশী বাজাইতেন। এই ভাবেই বাল্যজীবন হইতে যৌবনের শেষ পর্য্যন্ত অতিবাহিত করিয়া হঠাৎ একদিন অসুখে পড়েন। বুকের বা গলার রোগ নহে, বিষমজ্বরে প্রায় ৮।৯ মাস কাল ভুগিয়া সুস্থ হইলে শরীর বড় দুর্ব্বল বলিয়া বাঁশী বাজাইতে চিকিৎসক নিষেধ করেন। বাঁশী বাজানই তাঁহার একমাত্র উপজীবিকা ছিল। রোগশয্যায় ৮।৯ মাস পড়িয়া থাকায় সঞ্চিত অর্থ সমস্তই খরচ হইয়াছিল, উপরন্তু তিনি ঋণগ্রস্ত হইয়াছিলেন। বাঁশী না বাজাইলে কিরূপেই বা তাঁহার সংসার চলিবে এই ভাবনায় তিনি কাতর হইলেন। যাহা হউক তাঁহার মনিব দয়া করিয়া তাঁহাকে বাঁশীর পরিবর্ত্তে হারমনিয়ম বাজাইবার অনুমতি দিলেন। তিনি হারমনিয়ম বাজাইতে আরম্ভ করিলেন। ইহারই আট মাস পরে তাঁহার হাঁপানি রোগ জন্মিল। অনেক অর্থব্যয় করিয়া যথারীতি

চিকিৎসায় কোনও সুফল হইল না। তাঁহাকে কঙ্কালসার দেখিয়া তাঁহারই এক বন্ধু প্রস্তাব করেন যে, "তুমি বাঁশী বাজান বন্ধ করাতেই এই রোগ হয়েছে।"

সেই সময় সেখানে তাঁহার চিকিৎসকও উপস্থিত ছিলেন। রোগী বলিলেন "ডাক্তারেরা সকলেই বাঁশী বাজাতে নিষেধ করেছেন।" এমন সময়ে কবিরাজ মহাশয়ও বলে উঠলেন যে "নিদান ঐ কথাই বলেন; এ সব রোগে বাঁশী বাজান, ধূমপান একেবারেই নিষিদ্ধ।" তখন আমার হঠাৎ মনে হ'ল যে নিদানে যদি বাঁশী বাজান নিষিদ্ধ, তবে নিদানের রচয়িতা মহাদেবের হাতে শিঙ্গা কেন? মনের ভাব ব্যক্ত করিয়া ফেলিলাম। কবিরাজ মহাশয়ের সহিত সামান্য একটু তর্কও হইল। এই প্রসঙ্গে আমি বলিয়াছিলাম যে দেবদেবীর ধ্যান তাঁহাদের ভক্তরাই রচনা করিয়াছিলেন; দেবতারা নিজগুণ বর্ণনা করিয়া নিশ্চয়ই নিজ নিজ ধ্যান লিখেন নাই। উপাস্য দেবতার গুণাবলী কীর্ত্তন করিয়াই ভক্তেরা ধ্যান রচনা করিয়াছিলেন। মাত্র দুই-একটি উদাহরণ দিয়া আমি বুঝাইবার প্রয়াস করিয়াছিলাম। প্রথমতঃ সাগরমন্থনের সময় নিদানরচয়িতা মহাদেব, সকলের পরিত্যক্ত মহাবিষ কালকূট কেন কণ্ঠে ধারণ করিলেন? যে বিষ পৃথিবীতে পড়িলে পৃথিবী ছারখার হইত সেই কালকূট, মৃত্যুঞ্জয় মহেশ্বর উদরস্থ করিতে ভয় পাইয়াই কি কণ্ঠ হইতে নামাইলেন না?" কবিরাজ মহাশয়ের বিরক্তির মাত্রা বেশ বৃদ্ধি পাইতেছিল বুঝিয়াও আমি চুপ করিতে পারি নাই। আমি আবার বলিলাম যে, কণ্ঠে 'ঘড়ঘড়' শব্দ আরম্ভ হইলে অর্থাৎ নিদান অবস্থায় বিষপ্রয়োগই বিধি। তাই নিদানগ্রন্থকারের মূর্ত্তিতে উহা স্বপ্রকাশ। কোন্ বিষ কোথা হইতে সংগ্রহ করিতে হইবে তাহাও ফণিভূষণ বিশ্বেশ্বর নিজ শ্রীঅঙ্গের সাপ দেখাইয়া ইঙ্গিত করিয়াছেন। মহাদেবের ন্যায় সাধু-সন্ন্যাসীগণও ভস্ম মাখিয়া থাকেন। সাধুরাই বলিয়া থাকেন যে ছাই মাখিলে শরীরের তাপ এরূপ বৃদ্ধি পায় যে, দারুণ শীতেও গাত্রবস্ত্রের প্রয়োজন হয় না। ভস্মের আরও একটা গুণ আছে; ছাই মাখিয়া থাকিলে বাহিরের উত্তাপ দেহ মধ্যে প্রবেশ করিতে পারে না, তাই আগুনের সম্মুখে সন্ন্যাসীরা বসিয়া থাকিতে পারেন।

আবার দেখুন, মহাদেব শ্মশানে কেন থাকেন? শ্মশানবাসী ও শ্মশানচারীগণের সুস্থ ও সবল দেহ, শ্মশানভ্রমণের উপকারিতা সম্বন্ধে সাক্ষ্য দিয়া উহার কারণ প্রদর্শন করিবে। আরও দেখুন, কবিরাজমহাশয়! (এইখানে কবিরাজ মহাশয় এরূপ রাগ করিয়া আমার দিকে চাহিয়াছিলেন যে, আজ দশ বার বৎসরের কথা হইলেও সে দৃশ্য এখনও আমার চোখে ভাসিতেছে) শিবের কাণে ধুতুরা ফুল; পারিজাত কি শিবের দুষ্প্রাপ্য ছিল? গোলাপ, বেল, জুঁই, গন্ধরাজও কি কৈলাসে ছিল না? তা নয়—কবিরাজ মহাশয়, ঐ ধুতরা পাতায় (Stramonium) চুরুট করিয়া ধূমপান করিলে (যে ধূমপান আপনারা বারণ করছেন) হাঁপানী সারে। বাজারে ঐ চুরুট বিক্রী হয় তাও ত জানেন।"

উপস্থিত সকলেই অত্যন্ত আগ্রহের সহিত আমার কথা মন দিয়া শুনিতেছেন দেখিয়া আমি আবার বলিতে লাগিলাম। "শিঙ্গা বাজাইয়া ডমরুর তালে তালে নৃত্য করারও একটা মহান্ উদ্দেশ্য নিশ্চয়ই আছে। নৃত্য যে স্বাস্থ্যপ্রদ একথা য়ুরোপীগণও উচ্চকণ্ঠে স্বীকার করেন। ইহা সপ্রমাণ হইয়াছে যে, অনেক রকম ব্যাধি নৃত্য দ্বারা প্রশমিত হয়। এমন কি, কতকগুলি ব্যাধি নৃত্যকারকে আক্রমণ করিতেও পারে না। যখন মহাদেবের অঙ্গের প্রত্যেক আভরণের উপকারিতা বুঝা যাইতেছে তখন 'শিঙ্গার' উপকারিতা নিশ্চয়ই আছে। উহাতে অনিষ্ট কদাচ হইতে পারে না। যিনি শিব অর্থাৎ মঙ্গলময় বলিয়া উক্ত হন, তিনি কি কখনও অমঙ্গলকর কোনও জিনিষ ব্যবহার করিতে পারেন? পূর্ব্বেই বলিয়াছি শিঙ্গাও বাঁশী সাধনের একটি সহজ উপায়।"

'সেদিনকার মত সভা ভঙ্গ হইল। আমার রুগ্ন বন্ধুটি বাড়ী ফিরিয়া আমার প্রস্তাব অনুযায়ী বাঁশী বাজাইবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। রুগ্ন দেহ ও দুর্ব্বল হৃদয় লইয়া বাঁশীর ওস্তাদ বিফলমনোরথ হইলেন—বাঁশী বাজাইতে পারিলেন না—উপরন্তু বুকে ফিক ব্যথা ধরিল; অনেক কষ্টে, পরে সুস্থ হইলেন। নিরাশ না হইয়া কষ্ট সহ্য করিয়াও তিনি উপর্য্যুপরি কয়েকদিন চেষ্টা করিয়া অবশেষে কোনওরূপে পঞ্চম দিনে বাঁশী বাজাইতে সমর্থ হইলেন। হাঁপানী রোগীর যেমন সামান্য কথা বলিতে গেলেই কাশি হয়, গয়ার উঠে, বাঁশী বাজাইবার চেষ্টার সময়ও সেইরূপ উঠিত, ইহা বলা বাহুল্য মাত্র। কিন্তু যেদিন বাঁশী হইতে সঠিক সুর বাহির হইল, সেই দিন তিনি একখানি গৎ সম্পূর্ণ বাজাইতে না বাজাইতে সবুজ রঙের মাংসপিণ্ডবৎ এক টুকরা গয়ার সবেগে বাহির হইল। উহা দেখিয়া বন্ধুর আমার অত্যন্ত আশা ও আনন্দ হইয়াছিল। তিনি বলিলেন আজ ৩।৪ বৎসরের মধ্যে এরূপ ধরণের গয়ার কখনও বাহির হয় নাই। দ্বিগুণ উৎসাহে প্রত্যহ নিয়মিতভাবে কষ্ট সহ্য করিয়াও বাঁশী বাজাইতে লাগিলেন। প্রত্যহ এক আধটুকরা ঐ ধরণের গয়ার উঠিত। এক দিন অনেকখানি একসঙ্গে উঠিয়া যাওয়ায় বন্ধুবর অত্যন্ত সুস্থ বোধ করিলেন। বাস্তবিকই সেইদিন হইতেই তাঁহার হাঁপানী সারিয়া গেল।

ইহার অনেকদিন পরে আমার এক আত্মীয়ের ৭।৮ বৎসরের কন্যার হাঁপানী হয়। তাহাকে আমি শাঁখ বাজাইতে বলিয়াছিলাম। উপরোক্ত ঘটনা শুনিয়া তিনিও সাগ্রহে সেইমত ব্যবস্থা করিলেন। ফলে বালিকা রোগমুক্তা হইয়াছিল। ইহা হইতে বুঝা যায় যে, বাঁশী বাজাইলে রোগ ত হয়ই না বরং দেহ ভাল থাকে। অন্যায় অত্যাচারে দেহ রুগ্ন করিয়া বাঁশীর দোষ দেওয়া কি যুক্তিযুক্ত?

ttwabodhini Patrika

Reg. No. C. 462.

একবিংশ কল্প

চতুর্থ ভাগ

আষাঢ়, ব্রাহ্মসম্বৎ ৯৭।

৯১৫ সংখ্যা | ১৮৪৮ শক

তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা

"ব্রহ্ম বা একমিদমগ্র আসীন্নান্যৎ কিঞ্চনাসীত্তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রন্নিরবয়বমেকমেবাদ্বিতীয়ম্ সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয়ং সর্ব্ববিৎ সর্ব্বশক্তিমদ্ধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্যসাধনঞ্চ তদুপাসনমেব"।

সম্পাদক—শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৫৫ নং অপার চিৎপুর রোড্ কলিকাতা, আদিব্রাহ্মসমাজ যন্ত্রে শ্রীরণগোপাল চক্রবর্ত্তী দ্বারা মুদ্রিত ও
সাল ১৩৩৩। খৃঃ ১৯২৬। সম্বৎ ১৯৮৩। কলিগতাব্দ ৫০২৭। আষাঢ়।

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার বার্ষিক মূল্য ৩ টাকা ডাকমাশুল ৷৴০ আনা। এই সংখ্যার মূল্য ৷০ আনা। — আদিব্রাহ্মসমাজের কর্ম্মাধ্যক্ষে পাঠাইতে হইবে।

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ-অঙ্কিত—শ্রীপ্রমথ চৌধুরী

তদীয় পত্নী শ্রীমতী ইন্দিরা দেবী চৌধুরাণী

উইলিয়ম রদেনষ্টাইন্
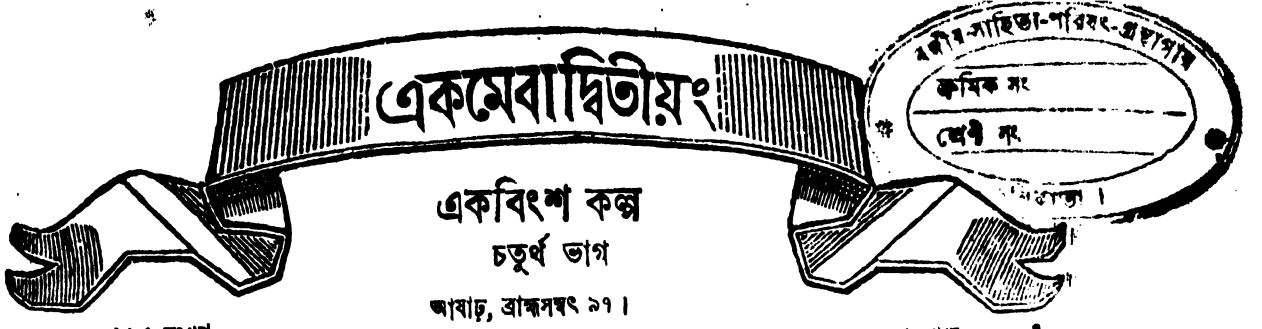
"ব্রহ্ম বা একমিদমগ্র আসীন্নান্যৎ কিঞ্চনাসীত্তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রন্নিরবয়বমেকমেবাদ্বিতীয়ম্ সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয়ং সর্ব্ববিৎ সর্ব্বশক্তিমদ্ধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্যসাধনঞ্চ তদুপাসনমেব"।

সম্পাদক—শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর

কলিগতাব্দ ৫০২৭। সম্বৎ ১৯৮৩। খৃঃ ১৯২৬। শক ১৮৪৮। সাল ১৩৩৩।

ধর্ম্মে সাম্প্রদায়িকতা ও দ্বন্দ্ববিবাদ।

(শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর)

সাম্প্রদায়িকতা বিবাদের কারণ।

সময়ে সময়ে সাম্প্রদায়িক বিবাদবিরোধের ভূমিকম্পে সমগ্র সমাজ বিকম্পিত হইয়া উঠে। যেখানে ইহার উৎপত্তি হয় বা সূত্রপাত হয়, কেবল তাহারই চতুঃসীমার মধ্যে নয়, কিন্তু তাহার চতুঃসীমা ছাড়াইয়াও দেশবিদেশে ইহার আঘাত স্পর্শ করে। এই সকল সামাজিক ভূমিকম্পের কারণ আর যাহা কিছু থাক না কেন, ধর্ম্মের সাম্প্রদায়িক ভাব যে ইহার আবির্ভাব হওয়ার পক্ষে অনেক পরিমাণে সহায়তা করে, সে বিষয়ে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। এই সেদিন যে ভীষণ বিরোধ-বিবাদ রাজধানীর উপর দিয়া বহিয়া গিয়াছে, যাহার শেষ তরঙ্গ কেবল বঙ্গদেশ নহে, কিন্তু সমগ্র ভারতভূমিকে আজ পর্য্যন্ত আলোড়িত করিয়া তুলিতেছে, সেই প্রচণ্ড বিরোধবিবাদের অন্তর্নিহিত সত্যসত্য অন্য কোন কারণ ছিল কি না, তাহা জানা যায় নাই; কিন্তু তাহার অন্যতর প্রকাশ্য কারণ যে ধর্ম্মবিষয়ক সাম্প্রদায়িকতা, তাহা কেহই অস্বীকার করেন না। রাজা রামমোহন রায়ের সময়েও হিন্দুদিগের শত শাখা, শত ধর্ম্মসম্প্রদায়েরই ভিতর বড়ই তীব্র বিরোধ জাগ্রত ছিল। এই প্রকার বিরোধের কারণেই শাক্ত-বৈষ্ণবের দ্বন্দ্ব আজ পর্য্যন্ত অনেক স্থলে ধর্ম্ম-বিষয়ক প্রবল সাম্প্রদায়িক বিবাদের উপমাস্থল হইয়া পড়িয়াছে।

রাজা রামমোহন রায় ও ব্রহ্মজ্ঞান প্রচার।

ধর্ম্মসম্প্রদায়সমূহের পরস্পরের মধ্যে তীব্র বিরোধবিবাদ এবং তাহার কুফল রাজা রামমোহন রায়ের প্রত্যক্ষ হওয়াতে তাঁহার স্বভাবত কোমল হৃদয় দুঃখে উদ্বেলিত হইয়া উঠিল। তিনি এই সাম্প্রদায়িক বিবাদ নির্মূল করিবার উপায় অনু-সন্ধানে প্রবৃত্ত হইলেন। ভগবানের দয়াতে তাঁহার হৃদয় হইতে দুঃখের ব্যথার ভিতর দিয়া অসাম্প্র-দায়িক ধর্ম্মের মহাবাণী সমুত্থিত হইল। তিনি বুঝিলেন যে, অসাম্প্রদায়িক সত্যধর্ম্ম জনসাধারণ গ্রহণ না করিলে, সকল ধর্ম্মের মূল উৎস অদ্বিতীয় ব্রহ্মনামের অমৃতমন্ত্র উপলব্ধি না করিলে সাম্প্রদায়িকতামূলক বিবাদের মূলে কুঠারাঘাত পড়িবে না, কাজেই সময়ে সময়ে সেই বিরোধের অগ্ন্যুৎপাত জাগ্রত হইবার আশঙ্কা তিরোহিত হইবে না। এই খাঁটি সত্য উপলব্ধি করিয়া রাজা রামমোহন রায় বলিতে গেলে একমাত্র ব্রহ্মজ্ঞান-প্রচারকল্পেই সমস্ত হৃদয় মন অর্পণ করিলেন।

ব্রহ্মজ্ঞানের বীজমন্ত্র।

রাজা রামমোহন রায়ের উত্তরাধিকারী স্বরূপে

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ব্রহ্মজ্ঞানের যে "স্বল্পাক্ষর ও সারদিগ্ধ" বীজমন্ত্র ভারতবাসীকে, জগতবাসীকে, দিয়া গিয়াছেন, সেই অমূল্য মন্ত্রটী হইতেছে—তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্যসাধনঞ্চ তদুপাসনমেব—তাঁহাকে সমস্ত হৃদয়ের সহিত প্রীতি করা এবং তাঁহার প্রিয়কার্য্য সাধনই তাঁহার একমাত্র উপাসনা। এই বীজমন্ত্র এতই অসাম্প্রদায়িক যে,কোনও ধর্ম্মই এই বীজমন্ত্রকে অতিক্রম করিয়া দাঁড়াইতেই পারে না। সুতরাং এই বীজমন্ত্রের উপর দাঁড়াইলে কোনও প্রকার সাম্প্রদায়িকতামূলক বিরোধবিবাদ আসিবার যে সম্ভাবনাই থাকে না, তাহা বলাই বাহুল্য।

ব্রহ্মনাম প্রচারের সময়।

সেই অমোঘ ব্রহ্মমন্ত্র প্রচারের বর্ত্তমান সময়ই তো উপযুক্ত অবসর। বর্ত্তমান সময়ে আমরা জীবনমরণের সন্ধিক্ষণে আসিয়া দাঁড়াইয়াছি। পুরাতন যুগের প্রাচীন মতামতের প্রাচীন ভাবরাজির জীর্ণ ও শুষ্ক পত্রসকল মর্ম্মরধ্বনির সঙ্গে নিত্যই ঝরিয়া পড়িতেছে এবং তাহার স্থলে নবীন যুগের নব নব ভাবের হরিৎপত্রসকল তাহাদের হাস্যমুখ বাড়াইয়া দিতেছে। প্রাচীন ও নবীন যুগের এই সন্ধিক্ষণে দিকে দিকে তাঁহার মধুময় নামপ্রচারের উপযুক্ত সময় আসিয়াছে। বিভিন্ন ধর্ম্মসম্প্রদায়ের ঘাতপ্রতিঘাতে সংঘর্ষ-প্রতিসংঘর্ষে যখন আমাদের সমাজের প্রাণ, দেশের জীবন মরুভূমির মত শুষ্ক হইবার উপক্রম করিতেছে, এই চরম সময়ই তো ব্রহ্মনামের সঞ্জীবনী সুধা পান করাইবার উপযুক্ত সময়।

ব্রহ্মমন্ত্রের দুই অঙ্গ।

এই ব্রহ্মমন্ত্রের দুইটী মুখ্য অঙ্গ—একটী ভগবানকে প্রীতি করা, দ্বিতীয়টী তাঁহার প্রিয়কার্য্য সাধন করা। এই দুইটী পরস্পর ঘনিষ্ঠসম্বন্ধে সম্বন্ধ হইলেও একটু আলোচনা করিলেই উভয়ের পার্থক্য উপলব্ধ হইবে—একটী অন্তর্মুখী, দ্বিতীয়টী বহির্মুখী। অন্তর্মুখী প্রথম অঙ্গ লইয়া ধর্ম্মসম্প্রদায়সমূহের মধ্যে বড় একটা বিরোধ দেখা যায় না; কারণ সকল সম্প্রদায়েরই এ সম্বন্ধে একই কথা যে, ভগবানকে সমস্ত হৃদয় দিয়া প্রীতি করিতে হইবে। এই সত্যটীকে হৃদয়ে ধারণ না করিলে তাঁহার প্রিয়কার্য্যসাধনের কথাই উঠিতে পারে না। কিন্তু এই সত্যটীকে হৃদয়ে ধরিলেও অনেক সময়ে গোলযোগের উৎপত্তি হয় ঐ বীজমন্ত্রের দ্বিতীয় বহির্মুখী অঙ্গ লইয়া—তাঁহার প্রিয়কার্য্য সাধন লইয়া। কিরূপ কার্য্যের ভিতর দিয়া তাঁহার প্রতি হৃদয়ের প্রীতি সম্যক প্রকাশ পাইবে, কোন্ কার্য্যই বা সত্য সত্য ভগবানের প্রিয়, এই সকল লইয়াই অধিকাংশ স্থলেই শত মতভেদ ও বিবাদবিসম্বাদের সৃষ্টি হয়।

অন্তর্দৃষ্টি ও তাহার ফল।

নিজের অন্তরে দৃষ্টি করিলে ভগবানকে প্রত্যেক মানবের অন্তরে অধিষ্ঠিত মানবমাত্রেরই পিতামাতা বলিয়া উপলব্ধি করা যায়। এই অন্তর্দৃষ্টি আমাদের প্রত্যেকের আবশ্যক বলিয়া ভগবান প্রত্যেক মানবেরই অন্তরে উহা নিহিত করিয়া দিয়াছেন। ইহারই ফলে মানুষ নিজের আত্মার প্রতি দৃষ্টিনিক্ষেপ করিতে পারে এবং নিজের সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি ও মঙ্গলের মূল কোন্ কার্য্য, এক কথায় ভগবানের প্রিয় কোন্ কার্য্য তাহারও সন্ধান পাইবার অধিকার রাখে। এই অন্তর্দৃষ্টিতে প্রত্যেক মানবের জন্মগত অধিকার। অবস্থাবিশেষে কাহারও অন্তর্দৃষ্টি সদা জাগ্রত থাকে, কাহারও বা তাহা সুপ্ত বা নিদ্রিত থাকে। যাঁহার অন্তর্দৃষ্টি জাগ্রত থাকে, তিনি সমগ্র বিশ্বচক্রের ভিতরে এক অনুপম প্রেমবন্ধন উপলব্ধি করেন। সমস্ত প্রেমের মূল, সকল জ্ঞানের উৎস সেই পরমজ্যোতিকে তিনি সহজেই উপলব্ধি করেন, তাঁহার সকল সংশয় বিদূরিত হয়, তাঁহাকে বিরোধবিবাদ স্পর্শ করিতে পারে না। তাঁহার নিকট কিছুই অজ্ঞাত থাকে না—প্রেমসূর্য্যো যদি ভাতি হৃদয়ে সকলং হস্তগতং—অন্তরে প্রেমসূর্য্য প্রকাশিত হইলে সকলই হস্তগত। তখন বাহিরের স্থূল ও অন্তরের সূক্ষ্ম, উভয়বিধ জ্যোতির এক আশ্চর্য্য সংমিশ্রণ হয়—বাহিরের স্থূল জ্যোতি অন্তরে সুন্দররূপে প্রতিফলিত হয় এবং অন্তরের সূক্ষ্ম জ্যোতি বাহিরে বিকশিত হইয়া পড়ে। যাঁহাদের অন্তরে এই আশ্চর্য্য সংমিশ্রণ সংঘটিত হয়, সেই সাধকদিগকে আমরা ঋষিপদে বরণ করি।

অন্তর্দৃষ্টি হারাইবার ফল।

সেই প্রাচীন বৈদিক কালে ভারতের ঋষিরা কেবল কঠোর সংযম ও অন্তর্দৃষ্টির বলে ভগবানকে আত্মস্থ করিতে পারিয়াছিলেন এবং সেই ব্রহ্মযোগ অবলম্বনেই তাঁহার প্রিয়কার্য্যেরও সন্ধান লাভ করিয়াছিলেন। তাহার ফলে তাঁহারা ভারতভূমিকে উন্নতি ও মঙ্গলের পথে অনেকদূর অগ্রসর করিয়া দিতে পারিয়াছিলেন। কিন্তু আজ আমরা আমাদের অযত্ন ও নিশ্চেষ্টতার কারণে আমরা সেই অমূল্য ব্রহ্মজ্ঞানকে হারাইতে বসিয়াছি, তৎপরিবর্ত্তে আঁকড়াইয়া ধরিয়া আছি কতকগুলি বাঁধিবুলি এবং ধর্ম্মের বহিরাবরণ বা খোসা। ব্রহ্মজ্ঞান হারাইবার সঙ্গে সঙ্গে আমরা আমাদের আত্মার স্বাধীনতাও হারাইয়া ফেলিতেছি, সুতরাং কুসংস্কার প্রভৃতি শতবিধ অমঙ্গলের মূল সাম্প্রদায়িকতা এবং তাহা হইতে উৎপন্ন যাগযজ্ঞ প্রভৃতি ধর্ম্মের বহিরাবরণ দেশের সর্ব্বাঙ্গ আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিয়াছে; দেশে বিদেশে মুর্ত্তিপূজা, মনুষ্যপূজা প্রভৃতি, জাগ্রত দেবতা অনন্তজ্ঞান পূর্ণপুরুষের স্থান অধিকার করিতে চলিয়াছে এবং তাহার ফলে আমাদের জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে সাম্প্রদায়িক দ্বেষবিদ্বেষের উৎস খুলিয়া গিয়া তাহার পাপপঙ্কে চারিদিক ডুবাইয়া দিতে অগ্রসর হইতেছে।

পূর্ণ পুরুষেই চরম পরিতৃপ্তি।

দেশকে যদি আমরা বাঁচাইতে চাই, সমাজকে যদি আমরা সত্যই রক্ষা করিতে চাই, তবে সেই পূর্ণ পুরুষের উপাসনা পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য আমাদিগের প্রাণপণ যত্ন করিতে হইবে। ব্রহ্মনামের অমোঘ পতাকা সুপ্রতিষ্ঠিত হইলেই দেশের সর্ব্বত্র শান্তির মঙ্গলবায়ু পুনঃপ্রবাহিত হইবে। সত্যের সঙ্গে মিথ্যার সামঞ্জস্য করিয়া লইলে প্রকৃত মঙ্গললাভের সম্ভাবনা নাই। অসাম্প্রদায়িক সত্যধর্ম্মের সঙ্গে সাম্প্রদায়িক ধর্ম্মের মিলন সাধিত করিতে গেলে শান্তি সুদূরপরাহত। এই অসঙ্গত সামঞ্জস্য করিবই বা কি? আমাদের দেবতা কি জাগ্রত নন? আমরা যে ভগবানকে জাগ্রত দেবতা বলি, তাহা কি শুধু মুখের কথা, তাহা কি কেবল জনশ্রুতি মাত্র? তাহা কখনই নয়—তাহা প্রত্যক্ষ সত্য, জ্বলন্ত সত্য। চারিদিকে চাহিয়া দেখ—দেখিবে, সেই অনন্ত পুরুষ হইতে নিঃসৃত প্রাণের কি খেলাই চলিতেছে, শক্তির কি খেলাই চলিতেছে, জ্ঞানের কি খেলাই চলিতেছে। এই সকলই সেই মঙ্গলময় বিধাতাপুরুষেরই হস্তের প্রত্যক্ষ পরিচয় দিতেছে। যে অবিনাশী পুরুষকে, যে তৃপ্তির স্থল শান্তির আলয় পরমেশ্বরকে পাইবার জন্য সহস্র সুখের মধ্যে, সহস্র ভোগবিলাসের মধ্যে প্রত্যেক মানবের প্রাণ অন্তত একবার না একবার অতৃপ্তি ও অশান্তির সুতীব্র জ্বালা অনুভব করে, এবং যাঁহার প্রেমধারা বর্ষিত হইয়া সেই জ্বালা দূর করিয়া দেয়, সেই প্রেমময় দেবতা যদি জাগ্রত না হইবেন তো অন্য কোন্ দেবতাকে জাগ্রত ধরিব? সেই অন্তর্যামী ভগবানকে ছাড়িয়া মৃৎপাষাণ অগ্নিজলকে ধরিয়া কি আমরা তৃপ্তিলাভ করিতে পারি? আমরা সচেতন পুরুষ, আমাদের জ্ঞান-প্রেম অচেতন বস্তুতে কখনই তৃপ্তিলাভ করিতে পারে না। সেই প্রকার অপূর্ণ আমাদের জ্ঞান-প্রেম অপূর্ণ কোন মনুষ্য বা দেবতাতেও চরম পরিতৃপ্তি লাভ করিতে পারে না। আমাদের জ্ঞান ও প্রেম সচেতন ও পূর্ণপুরুষেই চরম পরিতৃপ্তি লাভ করিতে চায় এবং পারে।

ঋষিদের ঘোষণা।

ভারতের ঋষিরা সেই মূল সত্য, সেই আনন্দস্বরূপ বিগতবিবাদ অন্তর্যামী ভগবানকে অন্তরে প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহারা ধর্ম্মের বহিরাবরণ, ধর্ম্মের খোসা লইয়াই পরিতৃপ্ত থাকিতে পারেন নাই। তাঁহাদের ভিতর যাঁহাদের অন্তর্দৃষ্টি বিশেষ জাগ্রত হইয়া উঠিয়াছিল, তাঁহারা আবার অন্তরাত্মাকে সাক্ষী রাখিয়া নির্ভয়ে উপনিষদের স্পষ্ট ভাষায় ধর্ম্মের বহিরাবরণের প্রতি অতিরিক্ত অনুরাগের নিষ্ফলতা ও অপকারিতা ঘোষণা করিয়া বলিলেন—"মানুষের শিক্ষার যত কিছু অঙ্গ বা উপকরণ আছে, এমন কি তিন বেদ পর্য্যন্ত, সে সমস্তই অপরা, অশ্রেষ্ঠ; একমাত্র ব্রহ্মজ্ঞানই শ্রেষ্ঠ। তাঁহারা বুঝিয়াছিলেন যে, একমাত্র ব্রহ্মজ্ঞানই সমস্ত দ্বন্দ্ববিবাদ, সমস্ত দ্বেষহিংসা বিদূরিত করিবার অনন্যসাধারণ ও অমোঘ উপায়। তাই তাঁহারা অকুতোভয়ে,

ধর্ম্মের বহিরাবরণের অনুষ্ঠাতার প্রতি সুতীব্র করুণা ও উপেক্ষার দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া বলিলেন—পরব্রহ্মকে না জানিয়া সহস্র সহস্র বৎসর ধরিয়া যাগযজ্ঞ করিতে থাকিলেও তাহা নিষ্ফল হয়। "মঙ্গলস্বরূপ পরমেশ্বরকে না জানিয়া অন্যমনস্ক ও বিষয়াসক্ত হইয়া বাহ্য আড়ম্বরের সহিত দিবারাত্র তাঁহার উপাসনা করিলেও বা লোকরঞ্জন বৃথা যাগযজ্ঞ ক্রিয়াকলাপে শরীর ও মনকে নিপাত করিলেও, অথবা মানমর্য্যাদা, যশ ও কীর্ত্তি প্রাপ্তির আশ্বাসে আপনার যথাসর্ব্বস্ব বিতরণ করিয়া দিলেও ঈশ্বরের সহিত তাহার কিছুমাত্র সম্বন্ধ নিবদ্ধ করা হয় না, সুতরাং তাহার অনন্ত ফল লাভ হয় না।" ঋষিরা অন্তর্দৃষ্টির সাহায্যে আত্মার অন্তরতম প্রদেশে আত্মার আত্মা পরমাত্মাকে দেখিয়া নির্ব্বাক হইলেন। তখন তাঁহাদের আত্মা হইতে এই অমৃতবাণী ফুটিয়া উঠিল—"রসোবৈ সঃ" তিনি রসস্বরূপ, এই নিঃসংশয় সত্য প্রকাশ পাইল—"কো হ্যেবান্যাৎ কঃ প্রাণ্যাৎ যদেষ আকাশ আনন্দো ন স্যাৎ" কেহই শরীরচেষ্টা করিত না, কেহই জীবিত থাকিত না, যদি আকাশে এই আনন্দস্বরূপ পরব্রহ্ম না থাকিতেন। যে ব্রহ্মজ্ঞানের জন্য জগতের কত লোক হতাশহৃদয়ে ব্রহ্মাণ্ড অন্বেষণ করিয়া ফিরিতেছে; কত লোক যাহার জন্য আপনার সমুদয় ভোগসুখ বিসর্জ্জন দিয়াও আপনাদিগকে কৃতার্থ মনে করিতেছে, সেই ব্রহ্মজ্ঞান ঋষিরা আমাদের হাতে প্রত্যক্ষভাবে তুলিয়া দিলেও আমরা তাহা অনায়াসে পরিত্যাগ করিয়া যাগযজ্ঞ প্রভৃতির বৃথা আড়ম্বর, ধর্ম্মের খোসা লইয়া নিজেদের বিনাশের পথ কিরূপে দিনে দিনে উন্মুক্ত ও বিস্তৃত করিতেছি তাহা দেখিয়াও দেখিতে চাই না।

সত্য ও মিথ্যার মিলন অসম্ভব।

আমরা রাজনীতিক্ষেত্রেও যেমন নিত্যই প্রত্যক্ষ করি যে, তেল ও জলের ন্যায় সত্যের সঙ্গে মিথ্যার কিছুতেই প্রকৃত মিলন হয় না, সেইরূপ অধ্যাত্মরাজ্যেও দেখি যে, সমাজ বল, সাংসারিক সুখসম্পদ বল, যাহারই দোহাই দিয়া হোক না কেন, সত্যের সঙ্গে মিথ্যার কিছুতেই মিল হইতে পারে না। এরূপ মিলনসাধনের চেষ্টার ফলে পরিণামে যে কিরূপ দুর্গতি ভোগ হয়, ভারতের ইতিহাস তাহা প্রতিপদে প্রতিপন্ন করিতেছে।

ব্রহ্মপূজায় আহ্বান।

এসো, সত্যের সঙ্গে মিথ্যার মিলন সাধনের বৃথা চেষ্টা পরিত্যাগ করিয়া, ধর্ম্মের খোসায় প্রতি অতিরিক্ত অনুরাগ স্থাপনের চেষ্টা পরিত্যাগ করিয়া, সকল দেবতার যিনি পরম দেবতা, তাঁহাকেই আত্মার স্বর্ণসিংহাসনে সুপ্রতিষ্ঠিত করি, এবং বিপদে সম্পদে তাঁহারই প্রদত্ত অমোঘ ব্রহ্মমন্ত্র সর্ব্বত্র প্রচার করি।

ভীষাস্মাদ্বাতঃ পবতে ভীষোদেতি সূর্য্যঃ।
ভীষাস্মাদগ্নিশ্চেন্দ্রশ্চ মৃত্যুর্দ্ধাবতি পঞ্চমঃ॥

ইঁহার ভয়ে বায়ু প্রবাহিত হইতেছে, ইঁহার ভয়ে সূর্য্য উদিত হইতেছে; ইঁহার ভয়ে অগ্নি, মেঘ ও মৃত্যু নিজ নিজ কর্ম্মে ধাবিত হইতেছে। যে মঙ্গলাকর অক্ষর পুরুষের শাসনে বায়ু, অগ্নি, সূর্য্য, মেঘ ও মৃত্যু সকলে মিলিত হইয়া এই জগতের মঙ্গলসাধনে নিয়ত প্রবৃত্ত রহিয়াছে, যাগযজ্ঞ, মনুষ্যপূজা, মূর্ত্তিপূজা প্রভৃতি ধর্ম্মের বহিরাচরণের বৃথা আড়ম্বরে মগ্ন না থাকিয়া, শ্রেষ্ঠতম জ্ঞানযোগ অবলম্বন পূর্ব্বক সেই দেবদেব পরব্রহ্মকে জানিয়া সমস্ত হৃদয়ের শ্রদ্ধাভক্তির পূজার্ঘ্য নিবেদন কর এবং তাঁহার প্রিয় কার্য্যসাধনে সদাসর্ব্বদা নিরত থাক; দেখিবে, নিজের কল্যাণ, পরিবার ও সমাজের কল্যাণ, দেশের মঙ্গল বিকশিত শতদলের মত প্রস্ফুটিত হইবে; দ্বেষহিংসা, দ্বন্দ্ববিবাদ বিদূরিত হইবে।

তোমারে নমস্কার।

(শ্রীনির্ম্মলচন্দ্র বড়াল)

সকলের মাঝে এসেছ যে তুমি
তোমারে নমস্কার,
গোপন হৃদয়ে দেখা দিলে তুমি
তোমারে নমস্কার।
এসেছ যে তুমি সুনীল আকাশে
গন্ধমধুর দক্ষিণ বাতাসে
কুসুম-বিকাশে রবি শশী হাসে
তোমারে নমস্কার।

সব সুখে দুখে, আলো ও ছায়ায়
তোমারে নমস্কার,
স্নেহ-প্রীতি এই মমতা-মায়ায়
তোমারে নমস্কার।

জীবনের এই নানা খেলা কাজে
দাঁড়ালে যে দ্বারে কত রূপে সাজে
কতবার এলে—মন যে ভুলালে
তোমারে নমস্কার।

পাঠালে আমারে সংসারে এই
তোমারে নমস্কার,
বন্ধন মাঝে মুক্তি যে দিলে
তোমারে নমস্কার।

প্রতি ধূলিকণা প্রতি তৃণমাঝে
তোমারি মহিমা মাধুরী বিরাজে
দেখিতে যে দিলে ও রূপ নিখিলে
তোমারে নমস্কার॥

উড়িষ্যায় পাঠান মোগল ও মারহাট্টা-শাসন।

(রায় মহাশয় শ্রীসতীন্দ্রনারায়ণ রায় বি-এল)

স্বনামধন্য পাঠানসেনাপতি বক্তিয়ার খিলিজী ত্রয়োদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে বঙ্গ বিজয় করিবার পর, বঙ্গের শেষ স্বাধীন নৃপতি লক্ষ্মণসেন উড়িষ্যার রাজধানী পুরী নগরীতে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন, এরূপ প্রবাদ আছে। বক্তিয়ার খিলিজী বঙ্গবিজয়ের পর উড়িষ্যাবিজয়ের সংকল্প করিয়াছিলেন মাত্র, সে সংকল্প কার্য্যে পরিণত করিতে পারেন নাই। টোঘন খাঁ নামক পাঠানসেনাপতি ১২৪৩ খৃষ্টাব্দে সৈন্য-সামন্ত লইয়া সর্ব্বপ্রথমে উড়িষ্যা আক্রমণ করেন। কিন্তু সে অভিযানে কোন ফলোদয় হয় নাই। উড়িষ্যার বৃত্তিভোগী সৈন্যগণ দুর্গম গিরিবর্ম্ম হইতে দলে দলে বাহির হইয়া সহজেই পাঠানদিগকে দেশ হইতে বিতাড়িত করিয়া দিল। ১২৫৩ খৃষ্টাব্দে বঙ্গের পাঠানগণ আর একবার উড়িষ্যা আক্রমণের চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু পূর্ব্বের ন্যায় সেবারও তাঁহাদিগকে বিফলমনোরথ হইতে হইয়াছিল। ১৩০০ হইতে ১৫০০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত দুইশত বৎসর ধরিয়া উড়িষ্যার হিন্দুরাজগণের সহিত বঙ্গের পাঠানরাজগণের নানা সন্ধি-বিগ্রহ হইয়াছিল। সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ হইয়াই উভয় পক্ষ সন্ধি ভঙ্গ করিবার অবসর খুঁজিয়া বেড়াইতেন। এই দুইশত বৎসর ব্যাপী খণ্ডযুদ্ধে পাঠানগণ উড়িষ্যার কিছুই করিতে পারেন নাই। ষোড়শ শতাব্দীতে উড়িষ্যার হিন্দু রাজা মুসলমানের সহিত মিলিত হইয়া দাক্ষিণাত্যের বিখ্যাত হিন্দু রাজা কৃষ্ণরায়কে আক্রমণ করেন। কৃষ্ণরায় দাক্ষিণাত্যের প্রবলপ্রতাপান্বিত হিন্দুনৃপতি ছিলেন; নর্ম্মদা নদী হইতে কুমারিকা পর্য্যন্ত তাঁহার রাজ্য বিস্তৃত ছিল। মুসলমানের সহিত মিলিত হইয়াও উৎকলরাজ কৃষ্ণরায়কে পরাজিত করিতে পারিলেন না। যুদ্ধাবসানে উড়িষ্যার রাজা কৃষ্ণরায়ের হস্তে স্বীয় কন্যাকে সমর্পণ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। অন্ধ্রদেশে আজিও কৃষ্ণরায়ের বীরত্বগাথা বালকবালিকার মুখে কীর্ত্তিত হয়। কৃষ্ণরায় তৈলঙ্গবংশীয় ছিলেন। ১৫২৪ খৃষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার রাজ্য ছিন্ন-ভিন্ন হইয়া যায়।

১৫৬৭ খৃষ্টাব্দে বঙ্গাধিপতি সুলেমানের বিখ্যাত সেনাপতি কালাপাহাড় উড়িষ্যা আক্রমণ করেন। প্রবাদ এই যে, কালাপাহাড় একজন স্বধর্ম্মনিষ্ঠ ব্রাহ্মণ ছিলেন। কেহ কেহ বলেন, মুসলমানগণ জোর করিয়া তাঁহাকে ইসলামধর্ম্ম গ্রহণ করিতে বাধ্য করেন; আবার কেহ কেহ বলেন যে, তিনি নবাবকন্যার প্রণয়পাশে আবদ্ধ হইয়া মুসলমান হন। ধর্ম্মান্তর গ্রহণ করিবার পর তিনি ঘোরতর হিন্দুধর্ম্মদ্বেষী হইয়া দেবমন্দির ভস্মীভূত ও দেববিগ্রহ চূর্ণবিচূর্ণ ও বিকৃত করিতে লাগিলেন। প্রবাদ এই যে, তাঁহার জয়ডঙ্কার শব্দেই হিন্দু দেব-দেবীর হস্ত-পদ ও নাসিকা খসিয়া পড়িত। কালাপাহাড়ের উড়িষ্যা-অভিযানের একমাত্র লক্ষ্য, হিন্দু-দেবদেবীর অবমাননা ও হিন্দুধর্ম্মের উপর কশাঘাত। তিনি পাঠানবাহিনী লইয়া উড়িষ্যার একপ্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত সমস্ত দেশ বিধ্বস্ত ও ছারখার করেন। পুরী নগরী অবরোধ করিয়া জগন্নাথদেবের দারুময় মূর্ত্তিকে রত্নবেদী হইতে বিচ্যুত করিয়া ভস্মীভূত করিবার চেষ্টা করেন; কিন্তু প্রবাদ আছে যে, জনৈক সেবক পাণ্ডা জীবন তুচ্ছ করিয়া অগ্নিমুখ হইতে সেই অর্দ্ধদগ্ধ দারুমূর্ত্তি রক্ষা করিয়াছিলেন। কালাপাহাড়ের ঈদৃশ আচরণে সমগ্র হিন্দুজাতি ভীত ও সন্ত্রস্ত হইয়া পড়েন। তাহার ফলে হিন্দুগণ স্বদেশ ও স্বধর্ম্ম রক্ষার জন্য সঙ্ঘবদ্ধ না হইয়া নিরাশা ও অবসাদে দিন দিন ম্রিয়মাণ হইয়া পড়িতে লাগিলেন এবং পাঠানবাহিনীর সম্মুখে ফেরুপালের ন্যায় পলাইতে লাগিলেন।

সুলেমানের মৃত্যুর পর দাউদ খাঁ বঙ্গের সিংহাসনে আরোহণ করিলেন। সম্রাট আকবরের সহিত তাঁহার সংঘর্ষ উপস্থিত হইল। পরে সন্ধির সর্ত্তানুসারে বঙ্গদেশ আকবরের সাম্রাজ্যভুক্ত হইল, এবং দাউদ খাঁ উড়িষ্যা দেশে রাজত্ব করিতে স্বীকৃত হইলেন। মোগল ও পাঠানের মধ্যে সে সময় প্রবল বিদ্বেষ ভাব বর্ত্তমান ছিল;

দুর্দ্ধর্ষ পাঠানগণ মোগল কর্ত্তৃক হিন্দুস্থানের সিংহাসন হইতে অপসারিত হইয়াছিলেন। দাউদ খাঁ উড়িষ্যায় আসিয়াই আকবরের সহিত যুদ্ধ করিবার জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিলেন। বঙ্গের পাঠানগণও তাঁহার সহিত যোগদান করিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছিলেন। দাউদ খাঁ পাঠানদিগকে একতাসূত্রে বদ্ধ করিয়া মোগলের সহিত ভাগ্যপরীক্ষা করিতে কৃতনিশ্চয় হইলেন। কিন্তু ভাগ্য-লক্ষ্মী তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া মোগলদিগের অঙ্ক-শায়িনী হইয়াছিলেন। আকবরের প্রসিদ্ধ হিন্দু সেনাপতি তোডরমল, মোগলমারী নামক স্থানে পাঠানবাহিনীকে পরাজিত করিয়া উড়িষ্যাকে আকবরের সাম্রাজ্যভুক্ত করিলেন। দাউদ খাঁ বীরের ন্যায় যুদ্ধ করিতে করিতে রণক্ষেত্রে জীবন বিসর্জ্জন দিয়াছিলেন। তিনি পাঠান-দিগের শেষ বীর। তাঁহার মৃত্যুর পর উড়িষ্যার পাঠানগণ বহুবার বিদ্রোহানল প্রজ্বলিত করিয়াও উপযুক্ত নেতার অভাবে কোন বারেই সাফল্য লাভ করিতে পারেন নাই। তোডরমল পাঠানদিগকে দমন করিয়াই ক্ষান্ত হন নাই, তিনি দেশে সুশাসন প্রতিষ্ঠা করিতে বিশেষ যত্নবান হইয়াছিলেন। সর্ব্বপ্রথমে তিনি উড়িষ্যার জমি জরিপ করিয়া রাজস্ব আদায়ের সুবন্দোবস্ত করিয়াছিলেন। হিন্দু রাজস্ববিভাগ রূপান্তরিত হইল—ছোট ছোট বিভাগ এক-এক জন তালুক-চৌধুরীর হস্তে সমর্পিত হইল। এই সকল তালুক-চৌধুরীগণ তালুক-কাননগোইর অধীনে কার্য্য করিতেন। এক-একটী পরগণা হইতে, তালুক-কাননগোইগণ রাজস্ব আদায় করিয়া সরকারের বা জেলার খাজনাখানায় জমা দিতেন। পূর্ব্বের ন্যায় প্রত্যেক চৌধুরী ও কাননগোর অধীনে খণ্ডায়েত ও পাইক সৈন্য থাকিত। মোগল কাননগোদিগের বংশধরগণ ইংরাজশাসনে জমিদার বলিয়া গণ্য হন। সুশাসন প্রতিষ্ঠার সহিত দেশ ধনধান্যে পূর্ণ হইল। দেশের হিন্দু অধিবাসীদিগকে করায়ত্ত করিবার মানসে তোডরমল বর্ত্তমান পুরীর মহারাজার পূর্ব্বপুরুষকে মহারাজা উপাধি দান করিয়াছিলেন। জগন্নাথদেবের পূজা ও পাণ্ডাগণের প্রতিপোষণের জন্য তোডরমল বিস্তৃত জমিদারী দান করেন।

১৫৮৩ ও ১৫৯১ খৃষ্টাব্দে উড়িষ্যার পাঠানগণ পুনরায় মস্তকোত্তোলন করিয়া বিদ্রোহী হইয়াছিলেন। রাজা মানসিংহ সে সময় বাংলার মোগলাধীন শাসনকর্ত্তা। তিনি সহজেই উড়িষ্যার পাঠানদিগকে পরাস্ত করিয়া দেশে শান্তি স্থাপন করিয়াছিলেন। কৌশলে প্রলোভন দেখাইয়া তিনি উড়িষ্যার পাঠানদিগকে যশোহর জেলায় জাইগীর গ্রহণ করিতে স্বীকৃত করেন; ভূমিদানের লোভ দেখাইয়া উড়িষ্যার নানা স্থানে পাঠানদিগের এক-একটী বিচ্ছিন্ন উপনিবেশ স্থাপন করেন। এই ভেদনীতির বলে পাঠান-গণ বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়েন। ক্রমে ক্রমে তাঁহারা সহনশীল ও ভীরুস্বভাবাপন্ন হইয়াছিলেন। ১৬৯৫ খৃষ্টাব্দে উড়িষ্যার পাঠানগণ পুনরায় বিদ্রোহী হন। কিন্তু স্ফুলিঙ্গেই সেই বিদ্রোহাগ্নি নির্ব্বাপিত হইয়াছিল।

১৭৪২ খৃষ্টাব্দে মারহাট্টা অশ্বারোহী সৈন্য সর্ব্বপ্রথমে বঙ্গদেশে প্রবেশ করে। রাজ্যবিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে উপ-যুক্ত নায়কের অভাবে মারহাট্টা সৈন্যগণ লুণ্ঠনপ্রিয় হইয়াছিল। তাহারা উড়িষ্যার দুর্গমপ্রদেশে সেনা-সমাবেশ করিয়া সুবিধামত বাংলার সমতল ক্ষেত্র লুণ্ঠন করিত। এই সকল লুণ্ঠনকারী মারহাট্টা সৈন্যগণকে বর্গী বলিত। মোগল ফৌজ তাহাদিগের পশ্চাৎ ধাবন করিলে তাহারা উড়িষ্যার দুর্গম প্রদেশে পলাইয়া যাইত। সেই সকল দুর্গম স্থান হইতে তাহাদিগকে বাহির করিয়া বিনাশ করিবার সামর্থ্য কাহারও ছিল না। অবশেষে ১৭৫১ খৃষ্টাব্দে বাংলার মোগল শাসনকর্ত্তা আলিবার্দ্দি খাঁ বাংলাদেশে শান্তিরক্ষার জন্য মারহাট্টাদিগের সহিত সন্ধিস্থাপন করিয়া তাহাদিগকে উড়িষ্যা ছাড়িয়া দিয়া-ছিলেন। ১৭৫১ হইতে ১৮০৩ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত মারহাট্টাগণ উড়িষ্যার সর্ব্বময় কর্ত্তা ছিলেন।

আকবর বাদশাহের দূরদর্শী সেনাপতিগণ যে নীতি অবলম্বন করিয়াছিলেন, সেই নীতির ফলে প্রায় শতাধিক বর্ষ উড়িষ্যায় শান্তি বিরাজ করিয়াছিল। গুরুতর অরাজকতা সেই সময়ের মধ্যে কোন দিন দেশের মর্ম্মস্থল স্পর্শ করিতে পারে নাই। মোগলসাম্রাজ্যের পতনের পূর্ব্বাভাসের সহিত উড়িষ্যার মোগলশাসনকর্ত্তারা যথেচ্ছা-চারী হইয়া পড়িয়াছিলেন। প্রজার সুখশান্তি বা শাসন-কার্য্যের উৎকর্ষের দিকে লক্ষ্য না রাখিয়া নিজ নিজ স্বার্থসাধনের জন্যই তাঁহারা সর্ব্বদা ব্যস্ত থাকিতেন। তবুও মোগলশাসনের শেষ সময় পর্য্যন্ত উড়িষ্যাদেশে বিশৃঙ্খলা ও অরাজকতা কোন দিন বদ্ধমূল হইতে পারে নাই। ১৭৫১ খৃষ্টাব্দে মারহাট্টাশাসনের সূত্রপাতের সহিত উড়িষ্যায় নিরবচ্ছিন্ন অরাজকতা ও বিশৃঙ্খলতা উপস্থিত হওয়ায় প্রজাদিগের দুর্দ্দশার একশেষ হইয়াছিল। প্রকৃতপক্ষে মারহাট্টাগণ উড়িষ্যায় কোন দিন শাসনযন্ত্র সুনিয়ন্ত্রিত করিবার চেষ্টা করেন নাই। মারহাট্টাগণ তাঁহাদিগের নিজের দেশে শান্তি ও শৃঙ্খলার প্রতিষ্ঠা করিয়া, যে প্রকার সুচারুরূপে শাসনকার্য্য চালাইতেন, হিন্দু রাজাদিগের ইতিহাসে সেরূপ দৃষ্টান্ত নিতান্ত বিরল। উড়িষ্যা নামমাত্র নাগপুরের ভোন্‌সলা রাজার অধীনে ছিল, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে মারহাট্টা সামরিক শাসনকর্ত্তাই দেশে সর্ব্বেসর্ব্বা ছিলেন। এই শাসনকর্ত্তার পদপ্রার্থী হইয়া লোক নাগপুর-দরবারে নীলামের ডাক ডাকিত

এবং যাহার উৎকোচ বা উপঢৌকনের মাত্রা বেশী হইত তাঁহাকেই শাসনের ভার দিয়া নাগপুর-দরবার উড়িষ্যায় পাঠাইতেন। ফলে মারহাট্টা-শাসনকর্ত্তা ও তাহার সাঙ্গোপাঙ্গগণ প্রজার রক্ত শোষণ করিয়া নিজের স্বার্থসিদ্ধির জন্য সর্ব্বদাই চেষ্টিত থাকিতেন। সময় সময় লুট-তরাজ করিয়া প্রজার সর্ব্বস্ব অপহরণ করিতে তাঁহাদিগের কিছুমাত্র কুণ্ঠাবোধ হইত না। মারহাট্টা অশ্বারোহী সৈন্যগণ লুণ্ঠনকার্য্যে শাসনকর্ত্তার দক্ষিণহস্তস্বরূপ ছিল। হিন্দু-মুসলমান-নির্ব্বিশেষে ধর্ম্মাধর্ম্মের বিচার না করিয়া মারহাট্টা শাসনকর্ত্তারা পরস্বাপহরণ করিয়া অর্থসঞ্চয় করিতেন। পুরীর যাত্রীদিগের নিকট হইতে কর গ্রহণ করিবার প্রথা মারহাট্টাগণই উদ্ভাবন করিয়াছিলেন। এদেশবাসীর প্রতি মারহাট্টাগণের কোনও সহানুভূতি ছিল না। পাঠানগণের ন্যায় এদেশে চিরস্থায়ীরূপে বাস করিবার প্রবৃত্তি তাঁহাদের ছিল না। দেশব্যাপী অত্যাচার ও অবিচারের প্রতিকার করিবার চেষ্টা নাগপুর-দরবার কোন দিন করেন নাই। উড়িষ্যায় যে সকল ঘটনা সংঘটিত হইত, নাগপুর-দরবার তাহা ঘুণাক্ষরেও জানিতে পারিতেন না। দেশব্যাপী অরাজকতার ফলে ১৭৭০ ও ১৭৭৯ খৃষ্টাব্দে দেশে ভীষণ দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইয়াছিল। সহস্র সহস্র লোক সেই সময় মৃত্যুমুখে পতিত হয়। জমিদারদিগকে যে কোন উপায়ে অর্থসংগ্রহ করিয়া নির্দ্দিষ্ট সময়ে মারহাট্টাদিগের কোষাগারে জমা দিতে হইত। কিস্তী খিলাপ হইলে বা রাজস্ব সামান্য পরিমাণে নির্দ্দিষ্ট সংখ্যার কম হইলে, তাহাদিগকে যাবজ্জীবন কারাভোগ করিতে হইত। কথিত আছে যে, সে সময় কিস্তী খিলাপকারী জমিদারদিগের জন্য এক-একটী বৃহৎ লৌহ পিঞ্জর থাকিত; সেই পিঞ্জরে ধান ও জল খাইয়া তাহাদিগকে জীবন ধারণ করিতে হইত। ফলে রাজস্ব খিলাপকারীগণ বন্দী হইবার অল্পদিনের মধ্যেই প্রাণত্যাগ করিতেন। বলা বাহুল্য যে, বন্দী হইবার সঙ্গে সঙ্গেই তাঁহাদিগের স্থাবর অস্থাবর সমস্ত সম্পত্তি মারহাট্টাগণ বাজেয়াপ্ত করিয়া লইতেন এবং তাঁহার স্থলে আর একজন রাজস্ব আদায়কারী নিযুক্ত করিয়া পাঠাইতেন। লুণ্ঠন ও পীড়নের চাপে, গ্রামসকল অরণ্যে পরিণত হইয়াছিল, এবং দেশের ধনাঢ্য ব্যক্তিগণ সর্ব্বদাই প্রাণভয়ে জীবন্মৃত হইয়া রহিতেন। দেশবাসিগণ এইরূপ নির্ম্মমভাবে সর্ব্বদাই পদদলিত হইয়া জীবন ও সম্পত্তি রক্ষার জন্য সচেষ্ট হইলেন। দেশের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিগণ তাঁহাদিগের নিজ নিজ গ্রামে এক-একটী গড় বা দুর্গবিশেষ নির্ম্মাণ করিলেন। দূরে মারহাট্টা অশ্বসেনা আসিতেছে শুনিতে পাইলেই দেশবাসিগণ গৃহ ত্যাগ করিয়া নিজ নিজ বহুমূল্য সম্পত্তি ও পুত্র-কলত্র লইয়া গড়ে আশ্রয় গ্রহণ করিতেন। মারহাট্টা সৈন্য চলিয়া গেলে পর তাঁহারা নিজ নিজ গ্রামে পুনরায় গমন করিতেন। গড়াধিপতি আশ্রয়দাতাগণ দুই চারদিনের জন্য নিজপুরে তাঁহাদিগকে আহার্য্য সামগ্রী যোগাইতেন। গড়ের পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামবাসিগণ সকলেই গড়াধিপতির অনুগত থাকিতেন; এবং আপদে বিপদে সাহায্য করিয়া উপকারের ঋণ পরিশোধ করিতেন। আজিও উড়িষ্যার নানাস্থানে এই সকল গড়ের ভগ্নাবশেষ দেখা যায়। প্রায় সমস্ত গড়ই একই প্রণালীতে নির্ম্মিত হইত। সর্ব্বপ্রথমে একটী গভীর পরিখার বেষ্টনীর মধ্যে মৃত্তিকানির্ম্মিত উচ্চ বাঁধ দেওয়া যাইত। এই বাঁধটীর উপর ঘন-সন্নিবিষ্ট কাঁটা বাঁশের ঝাড় লাগান হইত। কিছুদিন পরে কাঁটা বাঁশের দুর্ভেদ্য প্রাচীর গড়ের বহিঃপ্রাচীরস্বরূপ বিরাজ করিত; তীর বা কামানের গুলিও সে প্রাচীর সহসা ভেদ করিতে পারিত না। পরে অপেক্ষাকৃত স্বল্পায়তন পরিখা ও প্রস্তরনির্ম্মিত প্রাচীরের বেষ্টনী দেওয়া হইত। প্রত্যেক গড়ের ভিতর বিস্তৃত গোলাঘর, সেনানিবাস ও সাধারণ প্রজার আশ্রয়স্থান থাকিত। রাজার "নবর" বা প্রাসাদ গড়ের মধ্যস্থলে নির্ম্মিত হইত। দুইটী পরিখা-বেষ্টনীর উপর টানা পুল থাকিত। সেখানে সশস্ত্র সৈনিকগণ গড়রক্ষার জন্য সর্ব্বদা পাহারা দিত। এইরূপ দুর্গ দখল করা মারহাট্টা সৈন্যগণের পক্ষে একরূপ অসম্ভব ছিল।

মারহাট্ট-শাসনের অরাজকতা উড়িষ্যার জাতীয় জীবনে চিরস্থায়ী রেখা অঙ্কিত করিয়া গিয়াছে। প্রায় পঞ্চদশ বর্ষব্যাপী অত্যাচার লুণ্ঠন এবং অবিচারে দেশের মতি-গতি পরিবর্ত্তিত হইয়া গিয়াছিল। উড়িষ্যাবাসীদিগকে অনেকে গম্ভীরবেদী দুর্ব্বল ও ভীরুস্বভাব বলিয়া মনে করিয়া থাকেন। পূর্ব্ববর্ত্তী হিন্দু-রাজগণের ইতিহাসে উৎকলীয়দিগের শৌর্য্য-বীর্য্যের অনেক জলন্ত দৃষ্টান্ত দেখা গিয়াছে। অনেকের মতে পঞ্চদশ বর্ষব্যাপী ভীষণ অরাজকতার ফলে উৎকলবাসীর যে নৈতিক অবনতি হইয়াছিল, এখনও ইহারা তাহা শোধরাইতে পারে নাই।

উড়িষ্যার মারহাট্টা সামরিক শাসনকর্ত্তা যে শাসন-নীতি প্রচলন করিয়াছিলেন তাহার কঠোরতা ও নির্ম্মমতা কল্পনায় হৃদয়ঙ্গম করিলে এতদ্দেশবাসিগণের তৎকালীন নৈতিক অবনতির কথা আমরা সহজেই বুঝিতে পারিব। যে কোনও দেশে এইরূপ অরাজকতা এবং অবিচার হইলে জাতীয় চরিত্র উৎকলবাসীর মত হীন ও অবনত হইত, তাহাতে অণুমাত্র সন্দেহ নাই।

অরাজকতার গভীর ছায়াপাতেও ধর্ম্মপ্রাণ উড়িষ্যাবাসীর নির্ম্মল হৃদয় কোনও দিন চিরস্থায়ী ভাবে নৈতিক অবনতির পঙ্কিলতায় নিমগ্ন হয় নাই। যে দেশে প্রতাপরুদ্রের ন্যায় ধর্ম্মপরায়ণ আদর্শ রাজা ছিলেন ও যে দেশকে মহাপ্রভু অপূর্ব্ব ধর্ম্মপ্রচারের কর্ম্মভূমি করিয়াছিলেন, রাজনৈতিক ঝঞ্ঝায় সে দেশের অবনতি কখনও চিরস্থায়ী হইতে পারে না। বস্তুতঃ উড়িষ্যাবাসীদিগের দৈনিক জীবনে আজিও আমরা ভক্তি, প্রীতি, সৎসাহস ও সাধুতার শত শত দৃষ্টান্ত দেখিতে পাই। মারহাট্টা শাসন-যুগে অরাজকতার ছায়া দেশে যে নৈতিক অবনতি আনয়ন করিয়াছিল, তদ্দারা দেশের ধনাঢ্যগণই অনেক পরিমাণে হীনস্বভাব হইয়াছিলেন; কিন্তু দেশের কৃষাণ, কর্ম্মকার প্রভৃতি শ্রমজীবীদিগের বিশেষ কোনও অবনতি হয় নাই। তাহারা এখনও পূর্ব্বের ন্যায়, সরল উদারস্বভাব ও সত্যভাষী রহিয়াছে। সাধারণ প্রজাকুলের মধ্যে এখনও যে নৈতিক বল দেখা যায়, তাহা দেশের কার্য্যে নিয়োজিত হইলে প্রভূত কল্যাণ সাধিত হইতে পারে। ১৮০৩ খৃষ্টাব্দে উড়িষ্যার ভাগ্যদেবতা সুপ্রসন্ন হইলেন, ভারতবর্ষের গবর্ণর জেনারেল লর্ড ওয়েলেস্‌লি বঙ্গ ও সংগ্রাম প্রদেশে মারহাট্টার লুণ্ঠনভীতি নিবারণের জন্য উড়িষ্যা বিজয় করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন এবং স্বল্পায়াসেই তাঁহার মনোরথ সিদ্ধ হইল। ইংরাজসৈন্যের আগমনে মারহাট্টাগণ উড়িষ্যা পরিত্যাগ করিলেন।

উপসংহারে আমাদের বক্তব্য এই যে, উড়িষ্যায় মারহাট্টার শাসন-পদ্ধতি দেখিয়া কেহ যেন অনুমান না করেন যে, মহাশক্তিশালী মারহাট্টা জাতির শাসনপ্রথা এই ভাবেরই ছিল। তাঁহাদের দেশে এবং সন্নিকটবর্ত্তী বিজিত দেশে তাঁহাদের শাসনশৃঙ্খলা সুনিবদ্ধ ও সুনিয়ন্ত্রিত ছিল। কিন্তু পাণিপথ যুদ্ধের পর মারহাট্টা জাতির মেরুদণ্ড চূর্ণ হইয়াছিল এবং আত্মকলহ ও গৃহবিবাদে মারহাট্টা ইতিহাস কলঙ্কিত হইয়াছিল। মহাবীর শিবাজী বা বাজীরাও আর জন্মগ্রহণ করেন নাই। নৈতিক-মেরুদণ্ডহীন বিশৃঙ্খল মারহাট্টা-শাসনা, অধীনস্থ কর্ম্মচারীগণের অবনতি এবং সুদূরস্থিত সামরিক শাসনকর্ত্তাদের স্বেচ্ছাচারিতা দমন করিতে পারে নাই। একটা জাতি পতনোন্মুখ হইলে যে সব দোষ ঘটে, পতনোন্মুখ মারহাট্টা জাতিরও তাহাই ঘটিবে—ইহাতে আর আশ্চর্য্য কি? যে স্বাধীনতাপ্রিয় শৌর্য্যশালী মারহাট্টাজাতি ভারতে এক বিরাট হিন্দুসাম্রাজ্য গঠনের উন্মাদনায় বলদৃপ্ত মোগলসাম্রাজ্যের ধ্বংসসাধন করিয়াছিল, পতন সময়ে নেতৃহীন সেই জাতিই যে অর্থপ্রিয় লুণ্ঠনকারী বর্গীর দল গঠন করিয়া অমানুষিক অত্যাচারে ভারতবাসীর ভীতির সঞ্চার করিয়াছিল—ইহা কালের অমোঘ বিধান। এই সব অত্যাচার-কাহিনীর মধ্যেও তাঁহাদের উদারতা, ধর্ম্মপ্রিয়তা ও দানশীলতার দৃষ্টান্তের অভাব নাই। উৎকলের অনেক মঠ ও দেবমন্দির এবং প্রতিষ্ঠিত বিগ্রহের সেবা-পূজার জন্য মারহাট্টা-শাসনকর্ত্তাদের প্রদত্ত জায়গার ও বৃত্তি আজিও বিদ্যমান রহিয়াছে এবং স্থানে স্থানে প্রজার মঙ্গলের জন্য বাঁধ পারখা ও দেবমন্দিরের ভগ্নাবশেষ পড়িয়া আছে।

বিশেষ, বিজিত জাতিকে নিপীড়ন করা এবং তাহাদের জাতীয় চরিত্র বিমলিন ও হীনপ্রভ করা সভ্যতাভিমানী জাতির মধ্যে আজিও প্রচলিত আছে। নববলদৃপ্ত সুসভ্য জাপানের কোরিয়া-শাসনপ্রণালী কি লুণ্ঠনকারী বর্গী অপেক্ষাও ভয়াবহ নহে? আফ্রিকাদেশে বেলজিয়ান জাতির কঙ্গোশাসন-প্রথা কি বর্গী অপেক্ষা হৃদয়হীনতার পরিচায়ক নহে? আমেরিকার আদিম অধিবাসী ও নিগ্রোজাতির উপর স্বাধীনতাপ্রিয় বীরস্বাভিমানী মার্কিন জাতির অত্যাচার কি বর্গীর অপেক্ষা ভয়ঙ্কর নহে? সুতরাং মারহাট্টা জাতির পতনসময়ে যে লুণ্ঠনপ্রিয়তা, অত্যাচার ও বিজিত জাতির নিষ্পেষণ দেখা যায়, তাহা আধুনিক অন্যান্য জাতির ইতিহাসে বিরল নহে; এবং তাহার দ্বারা কোনও জাতির চরিত্রের বিচার করা চলে না।

"নীরব ভগ্নী" সম্প্রদায়।

(শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর)

ইটালি যাঁহারা ভ্রমণ করিয়াছেন, তাঁহারা বোধ হয়, তথাকার "ট্রাপিস্‌ট্" সন্ন্যাসী সম্প্রদায় এবং তাঁহাদের আমরণ নীরবতা সাধন সম্বন্ধে কিছু সংবাদ রাখেন। কিন্তু খুব অল্প লোকেই জানেন যে, ফ্রান্সে এক ভগ্নীসম্প্রদায় আছে, যাহার সভ্যগণ "কখনও কথা বলেন না।" অনেক পুরুষ মানুষ ইহা শুনিয়া হয় তো অবিশ্বাসের হাসি হাসিবেন, কিন্তু ইহা খাঁটি সত্য। বিয়ারিট্‌জ নামক স্থানের নিকটে ইহাদের একটা মঠ আছে। সেই মঠে ইহারা স্বেচ্ছায় নীরবতা সাধনে ব্রতী হন। নির্জন কারাবাস গুরুতর অপরাধের শাস্তি বলিয়া গণ্য হয়; কিন্তু আশ্চর্য্য! এক দল স্ত্রীলোক,—তাঁদের মধ্যে অধিকাংশ ভদ্রমহিলা,—পৃথিবীর সমস্ত ত্যাগ করিয়া দেহকে পীড়ন করেন, একটী ছোট ঘরে বাস করেন এবং ভগবৎপ্রদত্ত বাক্‌শক্তির মহান অধিকার ইচ্ছাপূর্ব্বক সত্যসত্যই দূরে পরিত্যাগ করেন। আমরা

যাহা অত্যন্ত কষ্টকর বোধ করি, তাঁহারা তাহাই স্বেচ্ছায় গ্রহণ করেন—তাঁহারা স্বেচ্ছায় বধির ও মূক হন। বধির, কারণ তাঁদের সঙ্গে কথা বলিবার কেহ থাকে না; এবং মূক, কারণ কথা কহিবার জন্য তাঁদের মুখ খোলা নিষিদ্ধ। যতদূর জানা যায়, সমস্ত পৃথিবীতে স্ত্রীলোকের স্বেচ্ছায় আমরণ নীরবতা সাধনের ব্রত গ্রহণ করিবার জন্য এই একটী মাত্র মঠ আছে।

খৃষ্টীয় ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভ ভাগে এই বিচিত্র সম্প্রদায় প্রতিষ্ঠিত হয়, এবং এই মঠের মধ্যে চল্লিশ-পঞ্চাশটী মহিলাকে সর্ব্বদাই থাকিতে দেখা গিয়াছে—তাঁরা মঠ ছাড়িয়া কোথাও যান না, পরস্পরের সহিত কখনও বাক্যালাপ করেন না, প্রার্থনার সময় ব্যতীত অথবা কাজের সময় প্রয়োজন না হইলে কখনও চক্ষু ঊর্দ্ধে উত্তোলিত করেন না, বাগানে নীরব পদক্ষেপে ভ্রমণ করেন। মুখের উপর লম্বা কৃষ্ণবর্ণ অবগুণ্ঠন ফেলিয়া রাখেন, যাহাতে তাঁহারাও কাহাকে দেখিতে না পান এবং অপর কেহও তাঁহাদিগকে দেখিতে না পায়। এই প্রকার জীবন্মৃত অবস্থায় তাঁরা মঠের গির্জ্জায় অবনত মস্তকে এবং বক্ষের উপরে দুইটী হাত উপর্য্যুপরি রাখিয়া যাইতে থাকেন। তাঁহারা এই প্রকারে সংসারের প্রলোভন হইতে রক্ষা পাইবার আশায় বৎসরের পর বৎসর গির্জ্জা হইতে refectory, এবং তথা হইতে বাসগুহায় নীরবে গম্ভীরভাবে নিত্য যাতায়াত করেন—বাহিরের মুক্ত সুনীল গগনের প্রতি তাকাইতেও যেন তাঁরা ভয় পান।

ফটক হইতে বালির একটা রাস্তা চলিয়াছে, তার দুই ধারে উঁচু কৃষ্ণবর্ণ পাইন বৃক্ষের সারি চলিয়াছে এবং নাগফণির বেড়া চলিয়াছে, যাহাতে কেহ কোনমতে নিকটে আসিয়া উঁকি ঝুঁকি মারিতে না পারে। "ভগ্নী"-গণ নিজ নিজ কার্য্যে ব্যাপৃত থাকেন, কে আসিল বা কে গেল, সে দিকে কোন ভ্রূক্ষেপও করেন না। তাঁদের নিঃশব্দে কৃত সমস্ত কাজের উপর যেন দুঃখের একটা আবেষ্টন পড়িয়া থাকে। বোধ হয়, তাঁরা যখন গাছের পাতা কাটা প্রভৃতির মত বাহিরের কোন কাজে লিপ্ত থাকেন, তখনই সূর্য্যকিরণে বাহির হইয়া পাখীদের কলকণ্ঠের গান শুনিয়া প্রাণটাকে একটু জুড়াইতে পারেন।

স্বভাবতই, কোন নীরবভগ্নী কোন অতিথিকে মঠাদি দেখাইয়া বেড়াইতে পারেন না; আগন্তুক কাহারও সঙ্গে থাকা গুরুতর অপরাধ; অপরিচিত কোন ভাষায় তাঁহাদের কাহাকেও প্রশ্নাদি করা তাঁহার পক্ষে অপমানজনক। কারণ ইঁহাদের মঠের নিকটে আর একটী যে বৃহৎ মঠ আছে, যেখানে সুন্দর সূচীশিল্পের কার্য্য হয়, সেই মঠ হইতে দুইটী "ভগ্নী" আসিয়া পথপ্রদর্শকের কাজ করেন। এই নীরবতার সমাধিমন্দিরে প্রতি পদক্ষেপে দেয়ালে লিখিত এক-একটী প্রার্থনা দৃষ্ট হয়।

মঠের ভিতরেই একটী প্রার্থনামন্দির আছে—খুব সাদাসিদা, সম্পূর্ণ অলঙ্কারবিহীন। কিন্তু উহারই মধ্যে দেখা যায় যে, মঠের ডান দিকে একটী ক্ষুদ্র গৃহ শুভ্র ক্যালিকো পর্দ্দার দ্বারা সমাবৃত। এই গৃহে "নীরবভগ্নী"-গণ নিজেরা প্রার্থনা করেন। কি শীত, কি গ্রীষ্ম, সকল ঋতুতেই ভোর সাড়ে চারিটার সময় তাঁহাদের নিদ্রা ভাঙ্গাইয়া দেওয়া হয় এবং তাঁহারা ৪॥ ঘটিকা হইতে ৭॥ ঘটিকা পর্য্যন্ত সেই গৃহে মালা জপ করেন। পরে আরও দুই ঘণ্টা ধরিয়া তাঁহারা নীরবে প্রার্থনা পুনরাবৃত্তি করিতে থাকেন। রাষিয়াতে "বলমো" নামে এক সুপ্রসিদ্ধ "বিহার" ছিল; সেখানে প্রতিদিন মধ্যরাত্রে এইভাবে প্রার্থনার জন্য সন্ন্যাসীদিগের নিদ্রাভঙ্গ করা হইত। তাঁহারা গ্রীকপন্থী বলিয়া প্রার্থনা উচ্চৈঃস্বরে গান করিতেন, কিন্তু রোমান ক্যাথলিকপন্থী এই নীরবপন্থী অদ্ভুত সম্প্রদায় নিজেদের প্রার্থনামন্দিরেও নীরব।

এই নীরবভগ্নীগণ প্রতিদিন "কর্ত্রীমাতা"র নিকট হইতে যথাকর্ত্তব্যের আদেশ প্রাপ্ত হন। তিনি ইঁহাদিগকে নামের পরিবর্ত্তে সংখ্যা দ্বারা নির্দ্দেশ করেন। ঐ আদেশ ব্যতীত তাঁহারা অন্য কোন বিষয়ে প্রশ্ন করা অনাবশ্যক বিবেচনা করেন। কিন্তু যদি কার্য্যসূত্রে কোন প্রশ্ন করা নিতান্তই আবশ্যক হয়, তাহা হইলে একটী প্রশ্ন করিতে পারেন এবং তাহার একটী উত্তরও গ্রহণ করিতে পারেন—ইহার অধিক নয়। কথোপকথন সর্ব্বতোভাবে নিষিদ্ধ।

মঠে শিক্ষানবিস হিসাবে তাঁহাদিগকে দুই বৎসর থাকিতে হয়। তাহার পর যিনি ইচ্ছা করিবেন, তিনি এই ব্রত গ্রহণ করিতে পারিবেন। ব্রতগ্রহণের পর কেহই মঠের সীমা অতিক্রম করেন না, এমন কি মৃত্যুতেও নয়। মঠের সীমার ভিতরেই একটী সমাধিস্থান আছে—সেখানে বালুকার নিম্নে মৃতব্যক্তিকে সমাহিত করা হয় এবং কতকগুলি শামুক ঝিনুকের দ্বারা সেই কবর চিহ্নিত করা হয়। যাঁহারা জীবিত থাকেন, তাঁহারাই মাটি খুঁড়িয়া কবর প্রস্তুত করেন, শবদেহ ধীরে ধীরে তুলিয়া শুভ্র বস্ত্রে আবৃত করেন এবং সেই গর্ত্তে নামাইয়া দেন; সকলে মিলিয়া বালুকা দ্বারা সেই গর্ত্তটী পূর্ণ করেন এবং সেইখানে বালুকায় একটা স্তূপ করেন। একমাত্র সাগরকূলে প্রাপ্ত শামুক-ঝিনুকই সেই কবরকে সমলঙ্কৃত করে; একটীও ফুল দেওয়া হয় না, বা কোন প্রস্তরফলকের দ্বারাও উহা চিহ্নিত করা হয়

না। এ প্রকার মর্ম্মস্পর্শী সমাধিব্যবস্থা অপর কোন স্থানে আছে বলিয়া শোনা যায় না।

মঠের দরজা খুলিয়াই refectoryতে প্রবেশ করিতে হয়। ঘরটী এতই অন্ধকার যে প্রবেশ করিবার সময় ভয়ে গা ছমছম করিতে থাকে। এই ঘরে কোন রকম পাকা মেজে নাই—বালুকারাশি মাত্র। এই বালুকারাশিতে পা ডুবিয়া যায়। ঘরের দুই দিকে কাঠের লম্বা টেবিল ও বেঞ্চি আছে। প্রত্যেক স্ত্রীলোকের নিজ নিজ নির্দ্দিষ্ট দেরাজ আছে; টেবিলের উপর একটী তোয়ালে রাখা থাকে, তাহাই টেবিলঢাকার কাজ করে; সেই সঙ্গে কাঠের চামচ কাঁটাও থাকে।

ঘরটী অত্যন্ত শীতল, এমন কি বসন্ত কালে, যখন গোলাপফুল প্রস্ফুটিত হইয়া উঠে, সে সময়েও ঘরটী অত্যন্ত স্যাঁতসেঁতে বোধ হয়। সেখানে আগুন জ্বালাইবার কোন ব্যবস্থা নাই। বুঝাই যাইতেছে, শীতকালে ভগ্নীগণকে কি কষ্টই সহ্য করিতে হয়। টেবিলের উপর অল্প অল্প ব্যবধানে জলপূর্ণ নানা আকার ও বর্ণের মাটির পানপাত্র সাজানো থাকে। তাঁহাদের আহারও খুব সাদাসিদা; কিন্তু তাঁহাদের আহারের সময় কেহ উপস্থিত থাকিতে পারে না। ঐ অন্ধকার ঠাণ্ডা ঘরে এই ভগ্নীগণ নীরবে খাদ্য গ্রহণ করেন। এস্থলেও তাঁদের কোনপ্রকার অনুরাগ বা সহানুভূতি প্রকাশ করা নিষিদ্ধ!

প্রতি শুক্রবার, কষ্টসহনের মাত্রা বাড়াইবার জন্য ভগ্নীগণ হাঁটু গাড়িয়া আহার করেন! তাহা ব্যতীত "কর্ত্রীভগ্নী" যে কোন দিন যে কোন সময়ে ঘণ্টা বাজাইলেই প্রত্যেক ভগ্নী সেই মুহূর্ত্তে যে অবস্থায় থাকেন, ঠিক সেই অবস্থায়ই থাকিতে হইবে। হয়তো কাঁটা দ্বারা বিঁধিয়া আলু কেহ মুখে ফেলিতে যাইতেছেন, কেহ বা পানপাত্র তুলিয়া জলপানে উদ্যত হইয়াছেন—যিনি যে অবস্থাতেই ঘণ্টা শুনিবেন, তিনি কর্ত্রীভগ্নীর অধীনতা ও নিজের অনুতাপ প্রদর্শনের জন্য ঠিক সেই অবস্থাতেই থাকিবেন। পুনরায় ঘণ্টা বাজিলে তবে তাঁহারা পুনরায় আহারে অগ্রসর হইতে অনুমতি প্রাপ্ত হন। এই প্রকার অধীনতাকেই তাঁহারা ঈশ্বরের নিকট আত্মবলি মনে করেন এবং ইহাকেই তাঁহারা সিদ্ধির অত্যুন্নত অবস্থা মনে করেন। তাঁহাদের মন্ত্র হইতেছে "একমাত্র ঈশ্বর"। তাঁহাদের সর্ব্বপ্রধান কার্য্য হইল নীরব প্রার্থনা—তাঁহাদের শরীর খুব সাদাসিদা খাদ্যের দ্বারা রক্ষিত হয়। আমোদপ্রমোদ, এমন কি গ্রন্থপাঠ—এ সমস্তেরই সম্পূর্ণ অভাব বলিলেই হয়। কেহ অসুস্থ হইলে তাঁহারা কর্ত্রীমাতাকে বলিতে পারেন, কিন্তু নিতান্ত অসুস্থ হইলেই চিকিৎসক আনা হয়। বলা বাহুল্য, এই অবস্থায় ভগ্নীদের মধ্যে ভয়াবহ রক্তহীনতার প্রাচুর্য্যই দৃষ্ট হয়।

মঠের সীমার ভিতরেই ছিটেবেড়া ও তৃণাচ্ছাদিত একটী ঘর আছে—তাহাই এই সম্প্রদায়ের সংস্থাপিত সর্ব্বপ্রথম গির্জ্জা। ইহারই নিকটে ঐ প্রকার আর একটী গৃহ দেখা যায়—ইহার কোনও দরজা জানালা নাই, কেবল সম্মুখস্থ দরজার শিরোদেশস্থ অর্দ্ধেকখানি একেবারে খোলা—তাহার ভিতর দিয়াই যেটুকু আলো প্রবেশ করে। সেই ঘরে একটী ছোট লোহার খাট, একটী ছোট স্নানপাত্র, একটী বাক্সের উপরে একটী পানপাত্র এবং একটী চৌকি। বর্ত্তমান মঠ প্রস্তুত হইবার প্রায় কুড়ি বৎসর পূর্ব্বে ইহাই মঠরূপে ব্যবহৃত হইত। বলা বাহুল্য, এই ঘরের দরজা দিয়া হিম প্রবেশ করিত এবং "খড়ের চাল" দিয়া বৃষ্টি প্রবেশ করিত। এখনকার মঠের ছাদ দিয়া আর জল পড়ে না এবং এক গৃহ হইতে গৃহান্তরে প্রবেশের জন্য একটী ঢাকা পথ আছে। অন্যদিকে যে কিছু বেশী সুবিধা হইয়াছে তাহা নয়। তাঁহাদের ঘরের প্রত্যেক কোণে "একমাত্র ঈশ্বর" লিখিত আছে—ঈশ্বরের জন্য দেহমনপ্রাণ সমস্ত বলি দেওয়াই হইল এই সম্প্রদায়ের একমাত্র লক্ষ্য।

ইহাঁদের পোষাক সাদা ফ্লানেলের নির্ম্মিত। সুদীর্ঘ ফ্লানেলনির্ম্মিত apron গলা হইতে প্রায় গোড়ালি পর্য্যন্ত নামিয়া আসে। তাঁহারা দড়ির প্রস্তুত একটী করিয়া কোমরবন্ধ পরেন, কিন্তু খালি পায়ে চলেন না, sabot পরেন। তাঁদের দেহের একদিকে এক বৃহৎ জপমালা থাকে এবং বক্ষের উপরে তাঁরা ধাতুনির্ম্মিত একটী ক্রশ্ ধারণ করেন। মস্তকে খুব আঁটসাট্টা সাদা কাপড়ের টুপি পরেন। সমস্তের উপরে একটা কৃষ্ণবর্ণের অবগুণ্ঠন পরেন, তাহা দ্বারা তাঁহাদের মুখ প্রায়ই সমস্তটা ঢাকা পড়ে; এই অবগুণ্ঠনের পশ্চাৎ দিকে একটা বস্ত্রখণ্ড-নির্ম্মিত ক্রশ সেলাই করা আছে। যখন তাঁহারা বাগানে যান, তখন বেঙ্গের ছাতার মত প্রকাণ্ড খড়ের টুপি পরেন—এই টুপি এত বড় যে, ইহার নিম্নে মানুষটী অতি ক্ষুদ্রকায় বোধ হয়।

১৮১১ খৃষ্টাব্দে ডিউক অব ওয়েলিংটন যে স্থানে তাঁর প্রধান আড্ডা করিয়াছিলেন, সেই স্থানের সংলগ্ন স্থানে এই সম্প্রদায় থাকেন বলিয়া সম্ভবত মহারাণী ভিক্টোরিয়া বিয়ারিট্জে সাম্রাজ্ঞী ইউজিনীর সহিত অবস্থানকালে এই মঠ একাধিকবার পরিদর্শন করিয়াছিলেন।

এখানকার সমস্তই এত নিস্তব্ধ যে, মনে হয় যেন পাখীরাও গান গাহিয়া এখানকার নিস্তব্ধতা ভাঙ্গিতে সাহস করে না। যে সকল ভগ্নী অতিথি ও আগন্তুকদিগকে পথ দেখান, তাঁহারা নিজেও ফুস ফুস্ করিয়া কথা বলেন এবং অভ্যাগতদিগকেও সেই প্রকারে কথা কহিতে অনুরোধ করেন।

চারিদিকে যে সমস্ত প্রবচন লিখিত আছে, সেগুলির একটীও হর্ষোদ্দীপক নয়, সেগুলির অধিকাংশ মৃত্যুর কথা স্মরণ করাইয়া দেয়, অথবা বলিয়া দেয় যে আমরা পাপী।

আশ্চর্য্য এই যে, জ্ঞানোন্নত ইউরোপের মধ্যে আজও এইরূপ কুসংস্কারান্ধ ধর্ম্মসম্প্রদায় আছে। এই সম্প্রদায় কাহারও কোন উপকারসাধনে অগ্রসর হন না; কোন রোগীর সেবায় নিরত হন না; বালক-বালিকার শিক্ষাদানে প্রবৃত্ত হন না; মদ্যপায়ী বা দুষ্কর্ম্মনিরতদিগের সংশোধনে জীবনসমর্পণ করেন না। এই সকল ঈশ্বরের প্রিয়কার্য্যসাধনে প্রবৃত্ত হইবার পরিবর্ত্তে দেহ ও মনকে শুকাইয়া ফেলিয়া ইঁহারা মনে করেন যে, তাঁহারা ঈশ্বরের প্রিয়কার্য্য সাধন করিতেছেন।*

প্রাচ্য সঙ্গীতের বাণী।

(শ্রীবাণী দেবী)

১। সঙ্গীতের উন্নতিসাধনে সামঞ্জস্য আবশ্যক।

বর্ত্তমানে সকল বিষয়েই দলাদলির একটা হাওয়া উঠিয়াছে দেখা যায়। এখন আমরা অধিকাংশ স্থলেই ধীরভাবে বিচার করা ছাড়িয়া দিয়া নিজের নিজের জেদ বজায় রাখিতেই অগ্রসর হই বলিয়া মনে হয়। সঙ্গীতের ন্যায় মধুর, কোমল ও অসাম্প্রদায়িক বিষয়ও এই দলাদলির হাত হইতে রক্ষা পায় নাই। প্রাচীন ও নবীন, এই উভয়পন্থীদিগের কেহ কাহারও বক্তব্য ধীরভাবে শুনিয়া বিচার করিতে চান বলিয়া মনে হয় না। প্রাচীনপন্থীরা যদি বলিলেন যে, সঙ্গীত যদি বলিতে হয় তো ধ্রুপদকেই বলিতে হয়, অমনি তদুত্তরে নবীনপন্থীরা বলিলেন যে, ধ্রুপদ তো সঙ্গীতই নয়, উহা কতকগুলি স্বরের যেন-তেন-প্রকারেণ সংমিশ্রণ মাত্র; সঙ্গীত যদি বলিতে হয়, তবে টপ্পাই প্রকৃত সঙ্গীত; কারণ উহা দ্বারা শত শত লোকের মন বিমুগ্ধ করা যাইতে পারে। এইরূপে রাজায় রাজায় যুদ্ধ হয়, উলুখাগড়ার প্রাণ যায়—প্রাচীন ও নবীনপন্থী মহারথীদের মধ্যে মহাবিবাদ লাগিয়া যায়, মধ্য হইতে, এই সকল গোলমাল দেখিয়া কোন্ প্রকার সঙ্গীত চর্চ্চা করা কর্ত্তব্য, তদ্বিষয়ে জনসাধারণ দিশাহারা হইয়া পড়ে। কিন্তু যাঁহারা যথার্থ প্রাণের সহিত সঙ্গীত ভালবাসেন এবং চান যে, জনসাধারণের মধ্যে সঙ্গীতের প্রচার প্রসারিত হোক, তাঁহাদের কর্ত্তব্য—এই দুর্দ্দিনে কলহবিবাদ পরিত্যাগ করিয়া সঙ্গীতবিষয়ক প্রকৃত তত্ত্বসকল খুঁজিয়া বাহির করিয়া উভয়পন্থীর মধ্যে সামঞ্জস্য সংস্থাপন করা, উভয় পন্থীর ভিতরে সাম্প্রদায়িকতার বৃদ্ধি হইতে না দেওয়া।

২। নবীন পন্থী।

ভারতের নবীনপন্থীদিগের প্রধান আশ্রয়স্থান বলিতে গেলে প্রতীচ্য ভূখণ্ডের সঙ্গীতজ্ঞ পণ্ডিতগণ। নবীনপন্থীদিগের বিরক্তিভাজন হইবার আশঙ্কা সত্ত্বেও, সত্যকথা বলিতে হইলে আমরা বলিতে বাধ্য যে, অনেক স্থলেই আমরা দেখি যে, তাঁহারা নানা কারণে প্রতীচ্য সঙ্গীতজ্ঞদিগেরই মতামত সকল বিভিন্ন ভাষায়, বিভিন্ন আকারে ও বিভিন্ন পরিচ্ছদে সুসজ্জিত করিয়া পুনঃ-প্রকাশিত করেন। তাঁহারা এই প্রকারে যেসকল ধারকরা যুক্তির অবতারণা করেন, আমরা সসঙ্কোচে বলিতে বাধ্য হইতেছি যে, স্বভাবতই তাহার অনেকগুলি আমাদের নিকট বড়ই ভাসাভাসা বোধ হয়—তাহাদের সারবত্তা খুবই অল্প বলিয়া আমাদের নিকট প্রতীয়মান হয়। সম্প্রতি কয়েকজন প্রতীচ্য সঙ্গীতজ্ঞ প্রাচ্য সঙ্গীতের সুমিষ্ট রস প্রাণে উপলব্ধি করিয়া উহার সপক্ষে লেখনী ধারণ করিতেছেন দেখা যায়। সুতরাং আশা হইতেছে, নবীনপন্থীগণও শীঘ্র ঐ সকল প্রতীচ্য সঙ্গীতজ্ঞদিগকে অনুসরণ করিয়া আমাদের চিরন্তন প্রাচ্য সঙ্গীতের প্রতি অনুরাগ প্রদর্শনে অগ্রসর হইবেন।

৩। মর্ম্মগ্রহণে অনুরাগ আবশ্যক।

পাশ্চাত্য সঙ্গীতজ্ঞদিগের মধ্যে খুব অল্পসংখ্যক ব্যক্তিই সঙ্গীতবিষয়ক প্রকৃত তত্ত্বের অনুসন্ধানে অগ্রসর হন। তাঁহাদের অনেকেই গতানুগতিক পন্থা অবলম্বন করিয়া মুখস্থ বিদ্যার উপরেই নিজেদের কৃতিত্ব দেখাইতে উদ্যত হন। যে দুইচারিজন প্রকৃত তত্ত্বের অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হন, তাঁহাদেরও মধ্যে কয়জনই বা প্রাচ্য সঙ্গীতের মর্ম্মে প্রবেশ করিবার চেষ্টা করেন? সঙ্গীত, চিত্র প্রভৃতি যে কোন ললিতকলা বল, তাহার মর্ম্মে প্রবেশ করিতে গেলে সর্ব্বপ্রথমে তাহার প্রতি একটা আন্তরিক গভীর অনুরাগ চাই। হৃদয়ের প্রকৃত অনুরাগ ব্যতীত কোন ললিতকলার মর্ম্মগ্রহণ করা অসম্ভব। যে ললিতকলার প্রতি যাহার যে পরিমাণে অনুরাগ উপজাত হইবে, তদনুপাতেই অনুরাগী ব্যক্তি সেই কলার মর্ম্মকথা ধরিতে পারিবেন।

ভারতীয় সঙ্গীত ও শ্রুতি।

পাশ্চাত্য সঙ্গীতজ্ঞদিগের মধ্যে প্রাচ্য সঙ্গীতের অনুরাগী ও তত্ত্বানুসন্ধায়ীর সংখ্যা কম হইবার কারণ এই যে, প্রকৃত প্রাচ্য সঙ্গীত বলিতে গেলে প্রতীচ্য ভূখণ্ডে অজ্ঞাত। পিয়ানোর বাঁধা ঠুনঠুনির ভিতর দিয়া বা হারমোনিয়মের বাঁধা সুরের ভিতর দিয়া অসম্পূর্ণ স্বরলিপির সাহায্যে প্রাচ্যসঙ্গীতের সূক্ষ্ম ও সুমিষ্ট ভাবসকল প্রকাশ করা সম্ভবপর নয়। ভারতীয় সঙ্গীতের মূল প্রাণ বা বৈশিষ্ট্যই হইল ঋষিদের আবিষ্কৃত বিভিন্ন

* পিয়ারসন ম্যাগাজীন।

স্বরমধ্যবর্ত্তী সূক্ষ্ম শ্রুতিসমূহ। সেইসকল সূক্ষ্ম ও অতি সূক্ষ্ম শ্রুতি অবলম্বনেই ভারতীয় সঙ্গীতের প্রাণ অভিব্যক্ত হইয়া উঠে। সুগায়কের সিদ্ধকণ্ঠের ন্যায় কোনও যন্ত্রেই ঐ শ্রুতিসমূহ সুচারুরূপে পরিস্ফুট হয় না। বেহালা প্রভৃতি যে সকল যন্ত্রে স্বর হইতে স্বরান্তরে নামিবার কালে অন্তঃস্বরসমূহে সহজে ও স্বাধীনভাবে ওঠা-নামা যায়, সেই সকল যন্ত্রেই শ্রুতিসমূহের কতকগুলিমাত্র প্রকাশ করা সম্ভবপর হয়। কিন্তু পিয়ানো প্রভৃতির ন্যায় বাঁধা সুরের কোনও যন্ত্রেই অন্তঃস্বরগুলি, সুতরাং শ্রুতিসমূহও সম্যক প্রকাশ করা অসম্ভব।

শ্রুতি বুঝিবার জন্য অনুরাগ চাই।

এই সকল শ্রুতি উপলব্ধি করিবার জন্য আন্তরিক অনুরাগ চাই এবং সেই সঙ্গে অভ্যস্ত কান চাই। শুনিয়াছি, পূজ্যপাদ দ্বারকানাথ ঠাকুর বিলাতে কয়েকজন সুপ্রসিদ্ধ গুণী জ্ঞানী ব্যক্তিকে দেশীয় সঙ্গীত শুনাইয়াছিলেন, তাঁহাদের কানে সেই সঙ্গীত "জংলী গান" বলিয়া অনুভূত হইয়াছিল। এই সেদিন বিলাতে সঙ্গীত-সম্বন্ধীয় এক আন্তর্জ্জাতিক সভার অধিবেশন হইয়াছিল। সেই অধিবেশনে কয়েকজন বক্তা ভারতীয় সঙ্গীতকে অম্লানবদনে কতকগুলি সুরের অযথামিশ্রণ বা jumble of sounds বলিয়া উল্লেখ করিলেন।* ইহাতে তাঁহাদেরই ভারতীয় সঙ্গীতে অনভিজ্ঞতা এবং প্রাণের সঙ্কীর্ণতা প্রকাশ পাইয়াছে মাত্র। আমরাও যখন সর্ব্বপ্রথম বিদেশীয় গান শুনিয়াছিলাম, তখন তাহার তার-স্বরের 'কু'-ধ্বনি আমাদের কানে বড়ই কর্কশ লাগিয়াছিল। ক্রমে অনুরাগভরে শুনিতে শুনিতে উহারও মাধুর্য্য উপলব্ধি করিতে শিখিলাম। সেইরূপ আমরা নিশ্চয়সহকারে বলিতে পারি যে, পাশ্চাত্য-সঙ্গীতজ্ঞেরাও মনোযোগ সহকারে অনুরাগভরে প্রাচ্য সঙ্গীত শুনিতে থাকিলে উহার ভিতরকার তত্ত্ব উপলব্ধি করিতে পারিবেন এবং শ্রুতির মহিমা বুঝিতে পারিবেন। ভারতে পাশ্চাত্যদিগের প্রথম আবির্ভাবকালে তাঁহারা এদেশের সাহিত্য, দর্শন, ভাস্কর্য্য প্রভৃতি কোন-কিছুরই ভিতরে ভাল কিছুই দেখিতে পান নাই—সমস্তই বর্ব্বরোচিত বলিয়া নির্দ্দেশ করিতে দ্বিধা করেন নাই। কিন্তু ক্রমে ক্রমে এই সকল বিষয় অনুরাগভরে আলোচনা করিবার ফলে এখন তাঁহারা ঐসকলের প্রশংসা শতমুখে ধ্বনিত করেন। এতদিন পরে যখন পাশ্চাত্য সঙ্গীতজ্ঞ পণ্ডিতেরা অনুরাগভরে ভারতীয় সঙ্গীত আলোচনা করিতে আরম্ভ করিয়াছেন, তখন আমরা বিশ্বাস করি যে, অনতিবিলম্বে ভারতীয় সঙ্গীত তাঁহাদের হৃদয় অধিকার করিয়া বসিবে। এখনও সঙ্গীত-সম্বন্ধীয় পাশ্চাত্যগ্রন্থসমূহে ভারতীয় সঙ্গীতের কথা স্থান তো পায়ই না; যদি বা এককোণে একটু স্থান পায়, তবে তাহাকে দুইচার কথায় নিতান্ত "আদিমতম" অর্থাৎ বর্ব্বর অসভ্যদিগের উপযুক্ত গান বলিয়া ছাড়িয়া দেওয়া হয়, ইহাতে ঐ সকল শ্রোতা ও গ্রন্থকার প্রভৃতিরই ভারতীয় সঙ্গীতে অনভিজ্ঞতা এবং প্রাণের সঙ্কীর্ণতা প্রকাশ পায় মাত্র। দুঃখের বিষয়, অনেক সুশিক্ষিত ভারতবাসীও নিজেদের দেশের সঙ্গীতের প্রকৃত ধারার দিকে লক্ষ্য না রাখিয়া এবং পিতৃপিতামহাগত শিক্ষার মূল প্রাণ উপলব্ধি করিতে না পারিয়া কেবল কতকগুলি ভাসা-ভাসা জ্ঞানের দ্বারা পরিচালিত হইয়া প্রাচ্যসঙ্গীতে অনভিজ্ঞ পাশ্চাত্যগ্রন্থকারদিগেরই উক্তির প্রতিধ্বনি করেন দেখা যায়।

সঙ্গীতের প্রাণ অসাম্প্রদায়িক।

ভগবান সঙ্গীতের ভাব মানবমাত্রেরই অন্তরে নিহিত করিয়া দিয়াছেন। তাই কোথায় সুমেরু, আর কোথায় কুমেরু, সকল স্থানেই দেখা যায় যে, লোকেরা গান গাইয়া অন্তরে আনন্দস্বরূপের আভাসলাভে আনন্দে বিভোর হইয়া যায়। কিন্তু একই সূর্য্যের কিরণধারা যেমন গ্রীষ্মপ্রধান ও শীতপ্রধান দেশে বিভিন্ন আকারে ও শক্তিতে প্রকাশ পায়, সেইরূপ একই সঙ্গীতের প্রাণ বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন মানবমণ্ডলীর মধ্যে বিভিন্ন আকারে অভিব্যক্ত হইয়া উঠে। দেশ ও জাতিবিশেষে সঙ্গীত বিভিন্ন আকারে অভিব্যক্ত হইলেও উহার মূলপ্রাণ হইল অসাম্প্রদায়িক—সর্ব্ববিধ সঙ্কীর্ণতার অতীত। সঙ্গীতের মূলপ্রাণে দেশ-কাল-অবস্থাভেদে কোন প্রভেদ আছে কি না সন্দেহ।

প্রাচ্যসঙ্গীত ও রাগরাগিণী।

প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সঙ্গীতের মধ্যে এই প্রকার প্রভেদ বা বিভিন্ন আকারের অভিব্যক্তির কারণ কি? আমরা দেখিতে পাই, প্রাচ্যসঙ্গীত প্রধানতঃ melody বা রাগরাগিণীর ভিতর দিয়া আত্মপ্রকাশ করে; পাশ্চাত্য-সঙ্গীত প্রধানতঃ harmony বা স্বরসম্বাদের ভিতর দিয়া আত্মপ্রকাশ করে। এইভাবে প্রাচ্য ও প্রতীচ্য সঙ্গীতের বিভিন্ন আকারে আত্মপ্রকাশ করিবার কারণ কি? যাঁহারা পাশ্চাত্য ভূখণ্ডের এবং ভারতের ইতিহাসের ধারার প্রতি মনোযোগ দিয়াছেন, তাঁহাদের নিকট এই প্রভেদের কারণ সহজেই উপলব্ধ হইবে। আলোচনার ফলে আমরা বুঝিয়াছি এই যে, প্রাচ্যভারতের অন্তর্নিষ্ঠ ভাব এবং পাশ্চাত্যদিগের বহির্নিষ্ঠ ভাবই এই প্রভেদের প্রধান

* সংবাদপত্রে (Musical Opinion—1925 বা Jan 1926 to March 1926'র issue'র ভিতরে) দেখিলাম যে, জর্ম্মাণীতে এক ব্যক্তি এক পিয়ানো নির্ম্মাণ করিয়াছেন। তাহাতে শ্রুতিসমূহ নাকি প্রকাশ করা যায়। আমাদের কিন্তু ইহা বিশ্বাস হয় না। সেই পিয়ানোতে নাকি কোন গীত স্বরসম্বদ্ধ বা harmonised করিয়া বাজান হইয়াছিল। শ্রোতৃবর্গ ভাবিয়াছিলেন যে, বাদক বুঝি ইচ্ছা করিয়াই ভুল বাজাইয়াছিলেন।

কারণ। ভারতের উষ্ণপ্রধান ভাব, ভারতের মাটির উর্ব্বরতা, ভারতের মলয় বায়ু, শত শত নদীনির্ঝরিণীর কুলু কুলু গান, প্রভাতে ও সন্ধ্যায় সূর্য্যচন্দ্রের উদয়াস্তের সঙ্গে শতবিধ বিহগের শতবিধ কলতান, এ সমস্তই ভারতবাসীকে ভগবৎবিধানে সেই আদিমকাল অবধি অন্তর্নিষ্ঠ করিয়া তুলিবার জন্য উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছে। ইহারই ফলে ভারতবাসীর জীবনের সকল বিভাগেরই ভিতর দিয়া, দর্শন, সাহিত্য, বিজ্ঞান, ললিতকলা প্রভৃতি সকল বিষয়েরই ভিতর দিয়া পরমাত্মার সঙ্গে আত্মার প্রত্যক্ষ যোগের ভাব যেন ফুটিয়া উঠিতে চায়। ইহারই ফলে প্রাচীন ভারতের বিজ্ঞানের অনেক অংশ বিলুপ্ত হইয়া গেলেও বেদ, উপনিষদ, মহাভারত, রামায়ণ, তন্ত্র, পুরাণ প্রভৃতি ধর্ম্মসাহিত্যে ভারতবাসীর অন্তরে একাধিপত্য স্থাপন করিয়া আছে বলিলে অত্যুক্তি হইবে না। এই কারণে ভারতে সঙ্ঘবদ্ধ ভাবের অসম্ভাব না থাকিলেও নিঃসঙ্গ ভাবেরই প্রাধান্য দেখা যায়। এই কারণেই যে রাগরাগিণীর আকারে সঙ্গীত নিঃসঙ্গ অবস্থায় সুচারুরূপে গাইতে পারা যায়, সেই আকারই এদেশে সম্যক প্রসার লাভ করিয়াছে। বৈদিক ঋষি প্রাণের সরল ভাষায় বলিয়াছেন যে, এই আকাশে যে তেজোময় অমৃতময় পুরুষ, এই আত্মাতে যে তেজোময় অমৃতময় পুরুষ, তাঁহাকে জানিয়াই সাধক মৃত্যুকে অতিক্রম করেন। প্রকৃত প্রাচ্যসঙ্গীতে ঋষির এই কথাই তানলয় সংযোগে ধ্বনিত হইতে চায়।

পাশ্চাত্যসঙ্গীত ও স্বরসম্বাদ।

ইহার বিপরীতে, পাশ্চাত্য ভূখণ্ডের শীতপ্রধান ভাব, তথাকার ভূমির উর্ব্বরতাসম্পাদনের জন্য কঠোর পরিশ্রমের প্রয়োজন, বৎসরের অধিকাংশ সময়ে শীতবায়ু বহমান হইবার কারণে গৃহ মধ্যে বদ্ধ থাকার আবশ্যকতা, অধিকাংশ সময়ে সূর্য্যচন্দ্রের উদয়াস্ত দেখিতে না পাওয়া, বিহগগীতের অভাব, এ সমস্তই ভগবৎবিধানে পাশ্চাত্য জগতে সভ্যতার আবির্ভাব অবধি পাশ্চাত্যবাসীকে বহির্নিষ্ঠ করিবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিয়াছে; পাশ্চাত্যবাসীর প্রাণ অধিকাংশ সময়ে বাহিরে ছুটিয়া গিয়া সকলের সঙ্গে মিলিতভাবে আমোদপ্রমোদে মত্ত থাকিতে চায়। ইহারই ফলে, পাশ্চাত্যদিগের জীবনের সকল বিভাগেরই ভিতর দিয়া, পরমাত্মার সঙ্গে মানবাত্মার যোগের পরিবর্ত্তে জনসাধারণের পরস্পরের যোগের কথাই ফুটিয়া উঠিতে চায়। প্রাচ্যভারতে ভগবৎপ্রীতিই কেন্দ্র এবং মানবপ্রীতি পরিধিরূপে গৃহীত হয়। পাশ্চাত্যদেশে লোকে মানবপ্রীতিকে কেন্দ্র করিয়া ভগবৎপ্রীতিতে উঠিতে চায়। ইহারই ফলে সেখানে অন্যান্য বিষয় অপেক্ষা বিজ্ঞানই জনসাধারণের অন্তর সমধিক অধিকার করিয়া আছে। সেখানে নিঃসঙ্গ ভাবের অসদ্ভাব না থাকিলেও সঙ্ঘবদ্ধ ভাবেরই প্রাধান্য দেখা যায়। এবং সেই কারণেই যে স্বরসম্বাদ বা হার্মনির আকারে সঙ্গীত সঙ্ঘবদ্ধ অবস্থায় গাইতে পারা যায়, সেই স্বরসম্বাদের আকারই পাশ্চাত্য ভূখণ্ডে প্রসার লাভ করিয়াছে।

ভারতীয় সঙ্গীতে স্বাধীনতা।

ভগবান প্রাচ্য সঙ্গীতের মূল কেন্দ্র বলিয়া, অন্তর্নিষ্ঠ ভাব উহার মূল প্রাণ বলিয়া, প্রাচ্যসঙ্গীত ভগবানের এই মুক্ত প্রকৃতির সঙ্গে এবং ভগবন্নিহিত মানবাত্মার বিচিত্র কর্ম্ম ও ভাবের সঙ্গে ছন্দে ছন্দে নৃত্য করিবার অধিকার রাখে। প্রাচ্যবাসী যখন মুক্ত গগনের প্রতি চক্ষু উত্তোলন করে এবং অগণিত গ্রহ-তারকার, অসংখ্য উজ্জ্বল নক্ষত্রপুঞ্জের ছন্দে ছন্দে উদয়াস্ত দর্শন করে; যখন সে কনকতপনকে মহাসাগরের কুক্ষিভেদ করিয়া অরুণাচল হইতে উদিত হইতে এবং সন্ধ্যাকালে সকলের অজানত নীরবে পূরবী রাগিণী গাইতে গাইতে অস্তাচলে অস্তমিত হইতে দেখে; যখন সে ছয় ঋতুকে ভগবানের আদেশে নিয়মিতরূপে মানবের মঙ্গলসাধনে নিরত দেখে, তখন তাহার হৃদয় কি একঘেয়ে কোন একটি সুরে বা তালে আবদ্ধ থাকিতে পারে? তখন তাহার হৃদয় সঙ্গীতের শতবিধ বর্ণে উদ্ভাসিত হইয়া উঠে, শতবিধ গন্ধে ভরিয়া যায় এবং শতবিধ ছন্দে নৃত্য করিতে থাকে। এই কারণেই ভারতের সঙ্গীতে ছয় রাগ ও ছত্রিশ রাগিণী ও তাহাদেরই বিভিন্ন সংমিশ্রণে উৎপন্ন শতবিধ সুর এবং শতবিধ তাল দৃষ্ট হয়। আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস, প্রাচ্যসঙ্গীতের এই ভাবটি প্রাণের ভিতর উপলব্ধি করিতে পারিলে, এই শতবিধ সুর ও তালেই আমরা সঙ্গীতের বন্ধনের পরিবর্ত্তে প্রকৃত মুক্তিই দেখিতে পাইব। এই মুক্তি উচ্ছৃঙ্খলতা নয়, উদ্দাম মুক্তি নয়। যে বন্ধন সঙ্কীর্ণতার গণ্ডী আনয়ন করে, সেই সর্ব্বাঙ্গীন বন্ধনকে পরিহার করিতে চাহিলেও, এই মুক্তি যথাযথ বন্ধনকে পরিত্যাগ করিতে চায় না। ইহা সর্ব্বতোবন্ধন ও উদ্দাম মুক্তি উভয়ের মধ্যবর্ত্তী সামঞ্জস্যের পথে থাকিয়া সঙ্গীতের নিত্যনব রসধারা বিকশিত করিবার অধিকার চায় ও রাখে। এই প্রকার মুক্তিই ভারতীয় সঙ্গীতকে স্বাধীনতার বিমল আবরণে আবৃত করিয়া রাখিয়াছে। এই প্রকার সামঞ্জস্যের উপর চলিতেন, বলিয়াই এদেশে সঙ্গীতঋষিগণ প্রয়োজনমত নূতন নূতন বিধিবিধান প্রণয়নে পশ্চাৎপদ হইতেন না।

বিধিনিষেধের সঙ্গতি।

রবিশশী গ্রহতারা যে ছন্দে নৃত্য করিতে করিতে নিত্য নবঋতু, নিত্য নব পুষ্পপত্রের জন্মদান করিয়া

নিজ নিজ কক্ষে পরিভ্রমণ করিতেছে, সেই ছন্দের সঙ্গে প্রাচ্যসঙ্গীতের রাগরাগিণী এক অচ্ছেদ্য বন্ধনে আবদ্ধ থাকিবার কারণে, ঋষিরা ধ্যানস্থ দৃষ্টিতে যে রাগ-রাগিণীকে যে সময়ে যে অবস্থায় গীত হইবার উপযুক্ত বলিয়া বিধি দিয়াছেন, সেই সময়ে ও সেই অবস্থায় সেই রাগ-রাগিণী গান করাই বিহিত, এবং বিরুদ্ধ রাগ-রাগিণী গান করা অবিহিত বলিয়া প্রাচ্যসঙ্গীতনায়কেরা মনে করেন। ইহার প্রকৃত মর্ম্ম ও উপযোগিতা পরীক্ষা করিবার জন্য আমাদিগকে বেশী দূরে যাইতে হইবে না। প্রভাতে সূর্য্যোদয়ের সময়ে যদি পূরবী রাগিণী গীত হয়, অথবা পূরবী রাগিণী ও চৌতালের সাহায্যে যদি আমাদের চঞ্চল ভাব প্রকাশ করিবার চেষ্টা করা যায়; আর ভৈরোঁ রাগের দ্বারা যদি সন্ধ্যার ভাব, অথবা ভৈরবী রাগিণী ও ঠুংরী বা খেমটা তালের সাহায্যে দুঃখের মর্ম্মভেদী আকুলতা ব্যক্ত করিতে যাওয়া যায়, তবেই ঋষিদের বিধিনিষেধের সঙ্গতি উপলব্ধ হইবে। * সমাজ রক্ষা করিতে গেলে, ব্যক্তিগত স্বার্থে আঘাত করে বলিয়া চৌর্য্যবৃত্তিকে যেমন শাস্তিযোগ্য বলিয়া স্থির করিতে হইয়াছে, সেইরূপ সঙ্গীতেরও প্রকৃতি সুরক্ষিত করিবার জন্যই ঋষিরা দেশকালঅবস্থাবিশেষে যথাসঙ্গত বিধি-নিষেধের বন্ধন নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিয়াছেন। এইরূপ বিধিনিষেধের বিধান দিয়াছেন বলিয়াই যে ঋষিরা গায়কদিগের স্বাধীনতার হস্তপদ সম্পূর্ণ বাঁধিয়া দিয়াছেন তাহা নহে। তাঁহারা প্রয়োজনমত রঙ্গভূমিতে বা রাজ-সভা প্রভৃতি স্থলে রাজাজ্ঞা প্রভৃতি কারণে বিনা কালবিচারে সকল রাগ-রাগিণীই গাইবার বিধান দিয়া স্বাধীনতার মর্য্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছেন। স্বাধীনভাবে গাইবার অনুকূল অনেক বিধিবিধান আমাদের শাস্ত্রে আছে দেখা যায়।

শ্রুতির উপরেই ভারতীয় সঙ্গীতের বৈশিষ্ট্য।

ভারতীয় সঙ্গীত-শাস্ত্রোক্ত বিধিনিষেধের তত্ত্বটী শাস্ত্রে যেরূপ উল্লিখিত হইয়াছে, প্রাচ্য সঙ্গীতের তত্ত্বানুসন্ধায়ী অনেক প্রতীচ্য সঙ্গীতবিৎ তাহা নিজ নিজ গ্রন্থে উল্লেখ করিয়াছেন বটে; কিন্তু আমাদের মনে হয় তাঁহাদের মধ্যে খুব অল্পসংখ্যকই ইহার মূলগত ভাবটী প্রাণের ভিতর উপলব্ধি করিয়াছেন। কোন কোন পাশ্চাত্য সঙ্গীতজ্ঞ নির্দ্দিষ্ট সময়ে রাগরাগিণী গাইবার বিষয় লইয়া এক আধটুকু উপহাস করিতেও বিরত হন নাই। পাশ্চাত্য সঙ্গীতজ্ঞেরা নিজেদের শিক্ষাদীক্ষা ও অভি-রুচিমত তথাকথিত প্রাচ্য সঙ্গীতের দুই-চারিটী তান-মাত্র স্বরলিপির সাহায্যে নিজ নিজ গ্রন্থে প্রকাশ করিয়া তাহাকেই প্রকৃত প্রাচ্য সঙ্গীতের আদর্শরূপে দাঁড় করাইতে চান। কাজেই তাঁহারা ঐপ্রকার বিধিনিষেধ নিজেরাও বুঝিতে পারেন না, অপরকেও বুঝাইতে অসমর্থ হন। তাঁহারা ভুলিয়া যান যে, বিশুদ্ধ ভারতীয় সঙ্গীত পাশ্চাত্য ঢঙে কাটাছাঁটা আকারে অনুবাদ করিয়া সর্ব্বতোভাবে প্রকাশ করা অসম্ভব। যথা-সময়ে ও যথাস্থানে শ্রুতিগুলি যথাযথরূপে প্রকাশ করিবার উপরেই ভারতীয় সঙ্গীতের বৈশিষ্ট্য নির্ভর করে।

ধর্ম্মসঙ্গীতেই প্রাচ্যসঙ্গীতের বিকাশ ও পরিসমাপ্তি।

প্রাচ্যসঙ্গীত মূলতঃ ভগবৎকেন্দ্রক এবং সেই সূত্রে উহা প্রকৃতির অন্তর্নিহিত তত্ত্বের উপর গ্রথিত বলিয়া ধর্ম্মসঙ্গীতেই উহার প্রধান বিকাশ ও পরিসমাপ্তি হইয়া-ছিল। ইউরোপেও গ্রীকদিগের দেবদেবীর পূজা উপ-লক্ষেই সঙ্গীতের প্রসারের সূত্রপাত হইয়া ক্রমে খৃষ্টধর্ম্মের প্রচারের সঙ্গে গির্জ্জায় উহা বিশেষ স্থানলাভ করিলেও নানা কারণে ধর্ম্মেতে পরিসমাপ্তি লাভ করিতে পারে নাই। আমাদের দেশে ধর্ম্মেতে সঙ্গীতের বিকাশ ও পরিসমাপ্তির কারণেই ঋষিরা সঙ্গীতকে নাদব্রহ্মরূপে অভিহিত করিয়া উহাকে মুক্তিলাভের সহজ ও সুগম সাধন বলিয়া গিয়াছেন। এই কারণেই ভগবানের পূজার জন্য রচিত সামগানেই প্রাচ্য সঙ্গীতের আশ্চর্য্য অভিব্যক্তি হইয়াছিল। আমরা শুনিয়াছি, পূজ্যপাদ মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ বলিতেন যে, প্রকৃত সামগানের ন্যায় মধুর গান তিনি জীবনে শ্রবণ করেন নাই।

পাশ্চাত্য সঙ্গীত ও বহির্নিষ্ঠতা।

বহির্নিষ্ঠতা পাশ্চাত্যসঙ্গীতের মূলপ্রাণ বলিয়া, উহা সকল সঙ্গীতের মূল উৎস ভগবানকে সর্ব্বতোভাবে বরণ করিতে পারে নাই। তাই পাশ্চাত্য সঙ্গীতে বিশ্বজগতের—প্রকৃতির সর্ব্বত্র অনুপ্রবাহিত রসস্রোতের পরিবর্ত্তে ব্যক্তি-গত ভাবেরই প্রাধান্য দেখা যায়। এখন মোটামুটি দেখা যায় যে, কোন এক সমাজের অন্তর্ভুক্ত ব্যক্তিগণের মনের ভাব সাধারণতঃ প্রায় একই ধাঁচে বা আদর্শে সংগঠিত হয়। বলা বাহুল্য, মাত্র ব্যক্তিগত ভাবের উপর প্রধানত যে সঙ্গীত গ্রথিত, সে সঙ্গীত সহজে গগন-

---

* প্রতীচ্য সঙ্গীতে সান্ধ্যগীতির বৈশিষ্ট্য আলোচনা করিলেও এইপ্রকার বিধিনিষেধের সঙ্গতি স্পষ্ট বোঝা যাইবে। এই সকল সান্ধ্যগীতি প্রভাতে গান করা হয় না, এবং করিলেও কানে নিতান্তই বিসদৃশ ঠেকে। রসিনি একবার কৌতুকচ্ছলে হর্ষ ব্যক্ত করিবার স্থলে বিষাদগীতি এবং বিষাদের স্থানে হর্ষগীতি কোনও রঙ্গমঞ্চে করাইয়া শ্রোতৃবর্গের নিকট প্রহৃত হইতে হইতে কষ্টে রক্ষা পাইয়াছিলেন।

স্পর্শী উচ্চ স্তরে উঠিতে পারে না। বেশ একটু অনুধাবন পূর্ব্বক দেখিলে দেখা যাইবে যে, এই কারণে ধরণধারণ তাল ও রচনাপ্রণালী বিষয়ে পাশ্চাত্য সঙ্গীতে মোটামুটি একই আকারপ্রকার দৃষ্ট হয়। এই কারণে, পাশ্চাত্য সঙ্গীতে বিশ্বপ্রকৃতির সামান্য স্পর্শ স্বভাবত থাকিতে বাধ্য হইলেও উহাতে বিশ্বপ্রকৃতির শতবিধ ছন্দ ও সুর অনুপ্রবিষ্ট হইতে পারে নাই। একথা অবশ্য অস্বীকার করা যায় না যে, কোন ব্যক্তিবিশেষের প্রাণ সাধারণ অপেক্ষা উচ্চতর ভাবে অনুপ্রাণিত হইলে তাঁহার রচিত সঙ্গীতও অপেক্ষাকৃত উচ্চতর স্তরে সমুত্থিত হইবে। কিন্তু দেখা গিয়াছে যে, পাশ্চাত্য সঙ্গীতরচয়িতাগণের যিনি যত উচ্চভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া সঙ্গীত রচনা করিয়াছেন, তাঁহার সঙ্গীতে ততই প্রাচ্য সঙ্গীতের অনুরূপ রাগরাগিণীরই প্রাধান্য বিকশিত হইয়া উঠিয়াছে। পাশ্চাত্য সঙ্গীতে বিশ্বপ্রকৃতির সম্যক্ স্পর্শ থাকে না বলিয়া উহা দেশ-কাল-অবস্থা-নির্ব্বিশেষে গাইলে বিশেষ দোষাবহ মনে হয় না। পাশ্চাত্য সঙ্গীত প্রকৃতির সম্পূর্ণ অনুগামী নয় বলিয়াই পাশ্চাত্য সঙ্গীতবিৎ পণ্ডিতেরা বুঝিতে পারেন না যে, মল্লার গাওয়ার সঙ্গে মেঘ হওয়া ও বারিবর্ষণের কি ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ, অথবা দীপক রাগের সঙ্গেই বা বিশ্বদহনের কি ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ। ইহা তো জানা কথা যে, এক শ্রেণীর শিকারী বিভিন্নজাতীয় পক্ষীর কণ্ঠস্বরের অবিকল নকল করে, এবং জাল পাতিয়া লুকাইয়া থাকে। তখন সেই সকল বিভিন্নজাতীয় পক্ষীরা ঐ সকল কণ্ঠস্বরের প্রত্যুত্তরে ঝুপঝাপ করিয়া আকাশ হইতে নামিয়া আসে। ইহাও তো এক পরীক্ষিত বৈজ্ঞানিক সত্য যে, বেহালা প্রভৃতি বাদ্যযন্ত্রে ধ্বনিবিশেষ উৎপাদন করিয়া কাচ ভাঙ্গিয়া ফেলা যায়। সেইরূপ ভারতের সঙ্গীত-ঋষিগণ ধ্যানদৃষ্টিতে মল্লার প্রভৃতি বিশেষ বিশেষ রাগিণীর সহিত প্রকৃতির বিশেষ বিশেষ অবস্থার যোগ যে আবিষ্কার করিয়াছিলেন এবং তাঁহারা বিশেষ বিশেষ রাগিণী গাইয়া প্রকৃতি হইতে যে বিশেষ বিশেষ ভাবে সাড়া পাইতেন, তাহা কিছু আশ্চর্য্য নহে। আজ তাহা আমাদের নিকট উপহাসের বস্তু হইতে পারে, কিন্তু দুইদিন পরে উহা বিজ্ঞানসম্মত সত্য বলিয়া প্রতিপন্ন হইবে বলিয়া বিশ্বাস করি।

সঙ্গীতঋষিগণের উদারতা।

ভারতের ঋষিগণ সঙ্গীতে কেবল যে স্বাধীনতা ও প্রকৃতির অনুসরণ বা স্বাভাবিকতার পক্ষপাতী ছিলেন তাহা নহে। তাঁহাদের হৃদয় অত্যন্ত উদার ছিল—তাঁহারা নিজেদের প্রচারিত সঙ্গীত ব্যতীত অন্যান্য সঙ্গীতকেও আপনার বলিয়া গ্রহণ করিতে কুণ্ঠিত হইতেন না। তাঁহাদের উদার হৃদয়ের কথা আমরা প্রায়ই ভুলিয়া যাই। কিন্তু সেটী ভুলিলে চলিবে না; তাহা হইলে আমরা কোন বিষয়েই ভারতের ইতিহাসের ধারা বুঝিতে পারিব না। সমাজের দুই-একটী কঠোর বিধিনিষেধের বিধান বিক্ষিপ্তভাবে উল্লেখ করিয়া ঋষিদিগকে অনুদার বলিয়া ছাপ মারিলে কেবল তাঁহাদের উপর নহে, নিজেদের উপর অন্যায় করা হইবে। তাঁহাদের প্রচারিত বিবাহ প্রভৃতি সামাজিক ব্যবস্থা আলোচনা করিলে তাঁহাদের অনুপম উদারতা সম্যক্ উপলব্ধ হইবে। তাঁহাদের উদারতা কেবল সামাজিক বিধিনিষেধেই ব্যক্ত হয় নাই; সঙ্গীতের ন্যায় ললিতকলা সম্বন্ধেও তাঁহাদের যথেষ্ট উদারতা দৃষ্ট হয়। তাঁহারা যখন ভগবানকে সঙ্গীতের কেন্দ্র করিয়া প্রকৃতিরই অনুগামী হইয়া বিধিনিষেধের ব্যবস্থা করিয়াছেন, তখন তাঁহারা বিধিনিবদ্ধ সঙ্গীতের ন্যায় জনপ্রিয় কৃষাণগীত প্রভৃতিকেও সঙ্গীতের মধ্যে স্থান দিতে বাধ্য। বস্তুতই দেখি যে, তাঁহারা ঐ সমস্ত সঙ্গীতকে 'দেশী' নামে গ্রহণ করিয়াছেন—গ্রহণ না করিলে তাঁহাদের প্রতি এখন যে শ্রদ্ধাঞ্জলি সমুত্থিত হইতেছে, তাহা সমুত্থিত হইত কিনা সন্দেহ। সভ্যতার কঠিন আঘাতে প্রাণের সরল ও সরস ভাব যেখানে চূর্ণ-বিচূর্ণ হয় নাই,—সেখানেই জনপ্রিয় স্বভাবজাত 'দেশী' সঙ্গীতের যথেষ্ট প্রচলন দেখা যায়। এই দেশী গীতের সাহায্যেই মানবমাত্রেই সদ্য সদ্য সমুত্থিত প্রেম, হর্ষ, দুঃখ, শোক প্রভৃতি আত্মপ্রকাশ করিবার চেষ্টা করে। তাই কোন দেশেই জনপ্রিয় 'দেশী' গীতের বিশেষ অভাব আছে বলিয়া মনে হয় না। অধ্যাপক মোক্ষমূলর প্রভৃতি পণ্ডিতেরা ঋগ্বেদ প্রভৃতিকে 'কৃষাণগীতি' বলিয়াছেন। আমরা তাঁহাদের সহিত একমত হইতে পারি না। আমাদের দেশী কৃষাণগীতের মধ্যে নিধুবাবুর টপ্পা, বাউলগীত, কীর্ত্তন, সারিগান প্রভৃতি সমাবিষ্ট হইতে পারে। এই সকল দেশী গানের অনেক শ্রেণী সভ্যতার অগ্রগমনের সম্মুখে অন্তর্হিত হইবার উপক্রম করিতেছে। অনেক পাশ্চাত্য সঙ্গীতজ্ঞের মতে, পাশ্চাত্য ভূখণ্ডেও পূর্ব্বের ন্যায় আজকাল খাঁটি দেশী কৃষাণগীতি নাকি শুনিতে পাওয়া যায় না। জগতে জ্ঞানবিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে ব্যক্তির ন্যায় জাতিসমূহের ও সমাজসমূহেরও সহজাত ভাবোচ্ছ্বাস সদ্য সদ্য বাহিরে প্রকাশ করিবার ভাব স্বভাবতই অন্তর্হিত হইয়া পড়িতেছে। নিম্নশ্রেণীর লোকদেরও ভিতর যেটুকু জ্ঞানের আলোক প্রবেশ করিতেছে, তদনুপাতেই তাহারা প্রাণের কথা সরল ভাষা ও সরল সুরের সরল গাথায় প্রকাশ করিবার ক্ষমতা হারাইয়া ফেলিতেছে এবং স্বতউত্থিত ভাবসমূহকে অস্বাভাবিক ভাবে চাপা দিতে শিখিতেছে।

জাতির যে অন্তঃস্ফূর্ত্তির ভিতর দিয়া কৃষাণগীত ফুটিয়া উঠে, বর্ত্তমান শিক্ষাদীক্ষার গুণে সেই অন্তঃস্ফূর্ত্তি ধীরে ধীরে শূন্যে মিলাইয়া যাইতেছে। বর্ত্তমান যুগে জগতে এই অন্তঃস্ফূর্ত্তি দেখিতে পাওয়া বড়ই দুর্লভ। তাহার কারণ এই যে, যে পাশ্চাত্য শিক্ষাদীক্ষার প্রাণ হইল—পরস্পরকে প্রতিপদে ঠেলিয়া-ঠুলিয়া নিজের আসন অধিকার করা; যাহার প্রধান মন্ত্র হইল স্বার্থপরতা ও আত্মগোপন, সেই পাশ্চাত্য শিক্ষাদীক্ষা আজ সমগ্র জগতকে আয়ত্ত করিতে উন্মুখ হইয়া আছে। যে মুক্ত বিকাশের ভাব আমাদিগকে প্রকৃতির সঙ্গে যোগযুক্ত করে, সে ভাব পাশ্চাত্য শিক্ষার মধ্যে খুব কমই পাওয়া যায়। সেই কারণে পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রসারের সঙ্গে জগতে জ্বালাযন্ত্রণারই বৃদ্ধি হইতেছে, প্রকৃত অন্তঃস্ফূর্ত্তি জাগ্রত হইবার অবসর পাইতেছে না।

ভারতীয় সঙ্গীত ও সামঞ্জস্য।

জনপ্রিয় দেশী কৃষাণগীত সহসা সমুত্থিত ও সহজ ভাবোচ্ছ্বাসের ভিত্তির উপর গ্রথিত হইয়া সহজ সুরের সাহায্যে আত্মপ্রকাশ করিবার চেষ্টা করে। আর, বিশুদ্ধ সঙ্গীতের ভিত্তি হইল সঙ্গীতবিজ্ঞান—ইহা সঙ্গীতের বৈজ্ঞানিক নিয়মের উপর সংস্থাপিত; সেই সকল নিয়ম জ্ঞানসংযোগে আলোচিত হইয়া বিশুদ্ধ সঙ্গীতরচনায় প্রযুক্ত হয়। ভারত যেমন দেশবিদেশের লোককে অকুতোভয়ে আশ্রয় প্রদান করিতে দ্বিধা করে নাই; ভারতের মূল সার সত্যধর্ম্মে যেমন সকল ধর্ম্মের সহজ সমাবেশ হয়, সেইরূপ ভারতের সঙ্গীতেও দেশী বা বিজ্ঞানসিদ্ধ, সকল প্রকার সঙ্গীতই সমাবেশ লাভ করিয়াছে। কেবল এদেশেরই বিশুদ্ধ ও দেশী নহে, কিন্তু ভারতের সঙ্গীতে দেশবিদেশের ও বিভিন্ন জাতির মধ্যে অভিব্যক্ত সঙ্গীতেরও সমাবেশ হইতে দেওয়া উচিত। এই ব্রহ্মচক্র বিভিন্ন শক্তির সামঞ্জস্যের উপরেই প্রতিষ্ঠিত হইয়া চলিতেছে, সজীব রহিয়াছে। সেইরূপ ভারতীয় সঙ্গীতকে প্রকৃতপক্ষে সজীব রাখিতে চাইলে, বিশ্বজয়ী শক্তিরূপে দাঁড় করাইতে চাহিলে, বিধিনিষেধের নিয়ম ও স্বাধীনতার মুক্তভাব, এই উভয়ের সামঞ্জস্যজনিত সংযত স্বাধীনতার উপর তাহাকে প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে, এবং সভ্য-অসভ্য নির্ব্বিশেষে সকল জাতির, সকল দেশের সঙ্গীতকে তাহার ক্রোড়ে সাদরে স্থান দেওয়াইতে হইবে; ভারতীয় সঙ্গীতকে বিশুদ্ধ রাগরাগিণী বা বিদেশীয় স্বরসম্বাদের সাহায্যে বিকশিত হইয়া উঠিবার স্বাধীনতা দিতে হইবে। ভারতবাসীর আধ্যাত্মিকতা প্রবলভাবে জাগরূক থাকাতে, ভগবদ্ভক্তি তাহার সকল কার্য্যের মূলকেন্দ্রে থাকাতে, ভারতের প্রাচীন বিশুদ্ধ সঙ্গীত যথাসম্ভব প্রকৃতির সঙ্গে সামঞ্জস্য বিধান পূর্ব্বক আজ পর্য্যন্ত সজীব থাকিতে পারিয়াছে, মৃত্যুমুখে পতিত হয় নাই। এই কারণে ভারতে জ্ঞানচর্চ্চা যথেষ্ট পরিমাণে বিস্তৃতি লাভ করিলেও তাহা শতসহস্র বিপ্লবের ভিতরেও জাতীয় প্রাণের অন্তঃস্ফূর্ত্তি সম্পূর্ণ বিনষ্ট করিতে পারে নাই। এখানে, কি বিশুদ্ধ সঙ্গীত, কি কৃষাণসঙ্গীত, কোন সঙ্গীতই প্রকৃতির সঙ্গে সংযোগ বিচ্ছিন্ন করিয়া দণ্ডায়মান নহে। পাশ্চাত্য ভূখণ্ডে সঙ্গীত সাধারণতঃ আমোদপ্রমোদেরই একটা অঙ্গরূপে পরিগণিত হয়। কিন্তু এদেশে সঙ্গীত কেবল কলাকৌশল নয়, কেবল বাহার দিবার জিনিস নয়। নিশ্বাসপ্রশ্বাস, যেমন জীবনের অপরিহার্য্য অঙ্গ, এদেশে সঙ্গীতও সেইরূপ লোকের প্রাণ—অপরিহার্য্য অঙ্গ। তাহার কারণ, যে ভগবান প্রতি অণুপরমাণু ব্যাপ্ত করিয়া রহিয়াছেন, আমাদের দেশে সঙ্গীত সেই ভগবানেই পর্য্যবসিত বলিয়া স্বীকৃত হয়; ইহা ভগবৎপ্রাপ্তির অন্যতর উৎকৃষ্ট সাধনরূপে ব্যবহৃত হয়। এই কারণেই সঙ্গীত প্রাচ্যবাসীকে পরাধীনতার কঠোর নিষ্পেষণের মধ্যেও সজীব রাখিতে পারিয়াছে, আনন্দস্বরূপের অন্ততঃ কণামাত্র আনন্দও উপলব্ধি করিবার অধিকার প্রদান করিয়াছে।

আমার প্রাণে প্রাচ্য সঙ্গীতের যে বাণী ধ্বনিত হইয়া উঠিয়াছে, আজ তাহাই আমি সঙ্গীতজ্ঞদিগের সম্মুখে সসঙ্কোচে উপস্থিত করিলাম। সুপ্রসিদ্ধ নিউটনের পদানুসরণ করিয়া আমিও বলিতেছি যে, প্রাচ্য সঙ্গীতের মহাসাগরের তীরে বসিয়া দুই চারিটী উপলখণ্ড মাত্র সংগ্রহ করিয়াছি। কোথায় বা তানসেন সদারঙ্গ, কোথায় বা ভক্তিমতী মীরাবাই, আর কোথায় বা আমার মত ব্যক্তি! তথাপি ভগবানের করুণাস্বরূপে যে বাণী আমার প্রাণে স্পর্শ করিয়াছে, তাহা সকলের সম্মুখে উপস্থিত না করিয়া শান্তিলাভ করিতে পারিলাম না। উপরে যাহা বলিয়া আসিয়াছি, তাহা হইতেই প্রাচ্য সঙ্গীতের সেই বাণী বোধ হয় পরিস্ফুট হইয়াছে। সেই বাণীর একটি কথা হইতেছে এই যে, সঙ্গীতে স্বাধীন ভাব খেলিবার অবসর দিতে হইবে। সঙ্গীতকে আটেঘাটে বিধিনিষেধের নিশ্বাসরোধকর জালে বাঁধিয়া মৃত্যুমুখে প্রেরণ করিলে চলিবে না; বিধিনিষেধের সঙ্গে তাহাকে স্বাধীনতার মুক্ত বায়ু সেবন করাইতে হইবে। সঙ্গীতকে একদিকে উচ্ছৃঙ্খল মুক্তির পথে ছাড়িয়া দিলে চলিবে না, অপরদিকে বিধিনিষেধের নিষ্পেষণে তাহাকে বাঁধিয়া মারিলে চলিবে না—তাহাকে সামঞ্জস্যের পথে, সংযত স্বাধীনতার পথে পরিচালিত করিতে হইবে।

প্রাচ্য সঙ্গীতের বাণীর দ্বিতীয় কথা এই যে, স্বাধীনতার সঙ্গে সঙ্গে উহাকে উদারতার উপর দাঁড় করাইতে হইবে। সত্যধর্ম্ম যেমন আস্তিক বা নাস্তিক, কাহাকেও

স্বীয় আশ্রয় হইতে বঞ্চিত করিতে পারেন না, সেইরূপ ভারতের সত্য সঙ্গীতও শাস্ত্রীয় বা 'দেশী', এদেশীয় বা বিদেশীয়, কোন সঙ্গীতকেই অস্পৃশ্য বলিয়া দূরে সরাইয়া রাখিতে পারেন না। ভারতীয় জ্যোতিষশাস্ত্রে যেমন অপর দেশের জ্যোতিষ গৃহীত হইবার ফলে তাহার উন্নতি-সাধনই হইয়াছে, সেইরূপ ভারতীয় সঙ্গীতশাস্ত্রের উন্নতি-সাধনে ইচ্ছা করিলে সঙ্গীতকে তাহার মূল প্রকৃতি অসাম্প্রদায়িকতার উপর দাঁড় করাইতে হইবে, তাহার উদার সার্ব্বভৌমিক ভাব রক্ষা করিতে হইবে; দেশ-বিদেশের সঙ্গীতকে ভারতীয় সঙ্গীতের অন্তর্ভুক্ত করিয়া ইহার সার্ব্বজনীন ভাব সুপ্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে।

প্রাচ্য সঙ্গীতের বাণীর শেষ কথা এই যে, সঙ্গীতকে যেমন স্বাধীনতা দিতে হইবে, যেমন তাহাকে উদার ভিত্তির উপর দাঁড় করাইতে হইবে, সেইরূপ তাহার স্বাভাবিক ভাবও বজায় রাখিতে হইবে। এই স্বাভাবিকতা হইতেই প্রাচ্য সঙ্গীতে যেমন বিভিন্ন রাগরাগিণীরও উৎপত্তি হইয়াছে, সেইরূপ বিভিন্ন সময় বিভিন্ন রাগ-রাগিণী গাইবারও রীতি প্রচলিত হইয়াছে। শতবিধ বৈচিত্র্যের উৎস স্বাভাবিকতা হইতে সঙ্গীতকে বিচ্যুত করিলে সঙ্গীত জড়প্রায় হইয়া পড়িবে; তখন তাহাকে অকালমৃত্যু হইতে কিছুতেই রক্ষা করা যাইবে না, সে সঙ্গীত ভারতবাসীকে সঞ্জীবনী শক্তিতে জাগাইতে পারিবে না।

সঙ্গীতজ্ঞদিগের নিকট আমার নিবেদন এই যে, তাঁহারা প্রাচ্য সঙ্গীতের বাণী অন্তরে গ্রহণ করিয়া প্রাচ্য সঙ্গীতকে কেবল এক দেশে নয়, কেবল এক জাতির মধ্যে নয়, কিন্তু সকল দেশে, সকল জাতির মধ্যে জয়যুক্ত করুন। ভগবানের চরণে আমার এই প্রার্থনা—পুরাকালের ন্যায় আজ আবার ভারতীয় সঙ্গীতের চরণে জগতের মস্তক অবনত হউক; ভারতীয় সঙ্গীত আবার সকলের অন্তরে মুক্তির দীপ্তদীপ প্রজ্বলিত করুক।

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ।

(শ্রীমন্মথনাথ ঘোষ এম-এ)

পত্নীবিয়োগ। ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের সুযোগ্যা সহধর্ম্মিণী অকস্মাৎ মৃত্যুমুখে পতিত হন। তিনি রমণীয় গুণগ্রামের অধিকারিণী ছিলেন এবং যদিও পরিবারস্থা অন্যান্য মহিলাগণের ন্যায় তিনি স্বয়ং সাহিত্যসেবা দ্বারা বঙ্গসাহিত্য সমৃদ্ধ করেন নাই, মাননীয়া শ্রীমতী স্বর্ণকুমারী দেবীর নিকট শ্রুত হইয়াছি যে, তিনি অত্যন্ত সাহিত্যানুরাগিণী ছিলেন এবং সর্ব্বদা সাহিত্যালোচনায় আনন্দ অনুভব করিতেন। স্বর্ণকুমারী বলেন, তিনি প্রায় তাঁহার সমবয়স্কা ছিলেন বলিয়া তাঁহাদের মধ্যে গভীর প্রীতির সম্বন্ধ ছিল। সাহিত্যানুরাগ এই প্রীতির সম্বন্ধ দৃঢ়তর করিয়াছিল। এই দুর্ঘটনায় পরিবারস্থ সকলেই নিরতিশয় ব্যথিত হন। প্রিয়তমা পত্নীর অকালবিয়োগে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ প্রথমে শোকে মুহ্যমান হইয়া পড়েন। (এই সময়েই দ্বিজেন্দ্রনাথ ও তাঁহার ভ্রাতৃগণ "ভারতী"র সম্পাদন-ভার স্বর্ণকুমারীর হস্তে অর্পণ করেন)।

কিন্তু ঈশ্বর-বিশ্বাসী জ্যোতিরিন্দ্রনাথের মনে এই গভীর দুঃখ অধিককাল স্থায়ী হয় নাই। তাঁহার একজন বন্ধু বলেন যে, এরূপ অবস্থায় সচরাচর লোকে হয় চরিত্রের পবিত্রতা রক্ষা করিয়া চিরজীবন বিষণ্ণভাবে অতিবাহিত করে, নতুবা চরিত্রভ্রষ্ট হয়। নিঃসন্তান জ্যোতিরিন্দ্রনাথের বয়ঃক্রম তখন ৩৬ বৎসর মাত্র। তাহার পর তিনি প্রায় চল্লিশ বৎসর জীবিত ছিলেন। এই সুদীর্ঘ কাল তিনি তাঁহার চরিত্রের নির্ম্মলতা রক্ষা করিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি একদিনও ভগবানে বিশ্বাস হারাইয়া বিষাদে আচ্ছন্ন হন নাই। তাঁহাকে দেখিলে বোধ হইত তাঁহার হৃদয় সর্ব্বদা আনন্দে পরিপূর্ণ। সাহিত্য, সঙ্গীত ও চিত্রবিদ্যার সাধনায় তিনি একনিষ্ঠ সাধকগণের ন্যায় নিমগ্ন থাকিয়া অনির্ব্বচনীয় আনন্দ উপভোগ করিতেন এবং সকলকে উপভোগ করাইতেন। বার্দ্ধক্যেও তিনি শিশুর ন্যায় সরল ছিলেন এবং আনন্দের সহিত বালক-বালিকাগণের শিশুসুলভ ক্রীড়া ও গানে যোগদান করিতেন। তাঁহার আনন্দপূর্ণ আনন দেখিলে মনে হইত তিনিই যথার্থ আনন্দময়ের উপাসক।

সাধনা। ১৮৯১ খৃষ্টাব্দে রবীন্দ্রনাথ সুবিখ্যাত মাসিক পত্র "সাধনার" প্রতিষ্ঠা করেন। চারি বৎসর এই মাসিক পত্র বঙ্গবাসীকে যে অনির্ব্বচনীয় আনন্দ দান করিয়াছে তাহা বাঙ্গালা সাময়িক সাহিত্যের ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লিখিত থাকিবে। অন্যান্য প্রতিভাশালী লেখকগণের সহিত জ্যোতিরিন্দ্রনাথও এই মাসিকপত্রে নানা বিষয়ে প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন। "আধুনিক মস্তিষ্কতত্ত্ব ও ফ্রেনলজি", "লোকচেনা" প্রভৃতি প্রবন্ধ বিশেষ উল্লেখযোগ্য। বাঙ্গালা সাহিত্যে এ সকল বিষয়ে তাঁহার পূর্ব্বে আর কেহ আলোচনা করেন নাই।

চিত্রাঙ্কন। এই সময় হইতে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ রীতিমত পরিচিত অপরিচিত সকল ব্যক্তির মুখের প্রতিকৃতি অঙ্কিত করিতে আরম্ভ করেন। তাঁহার খাতায় অসংখ্য ব্যক্তির প্রতিকৃতি অঙ্কিত আছে। রাজা মহারাজা হইতে পাখা টানা কুলীও তাঁহার খাতায়

সসম্মানে স্থান পাইয়াছে। এই চিত্রগুলির একটু বিশেষত্ব আছে। বিখ্যাত চিত্রকর উইলিয়ম রদেনষ্টাইন্ তাঁহার কয়েকটি চিত্র দেখিয়া মোহিত হন এবং তাঁহারই অনুরোধে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ কতকগুলি চিত্র মুদ্রিত করিবার অনুমতি দেন। ১৯১৪ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত এই চিত্রপুস্তকের ভূমিকায় রদেনষ্টাইন্ যাহা লিখিয়াছেন তাহার মর্ম্ম এই :—

"দুই তিন বৎসর পূর্ব্বে আমার কোনও বন্ধু কর্ত্তৃক প্রেরিত একটি বাঙ্গালা সাময়িক পত্রে কতকগুলি চিত্রের ক্ষুদ্র প্রতিলিপি দেখিয়াছিলাম—সে চিত্রগুলিতে একটি বিশিষ্টতা ছিল। গত বৎসর যখন শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ইংলণ্ডে আগমন করিয়াছিলেন তখন আমি জানিতে পারি যে, চিত্রগুলি তাঁহারই এক সহোদরের অঙ্কিত। তিনি কতকগুলি মূল চিত্রের জন্য তৎক্ষণাৎ পত্র লিখেন এবং আমি জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের অনুগ্রহে তাঁহার কয়েকখানি ছবির খাতা প্রাপ্ত হই। চিত্রাঙ্কন ঠাকুর মহাশয়ের ব্যবসায় নহে। নিজের অনুরাগ বশতঃ ও আনন্দলাভার্থ তিনি বহুদিন হইতে আত্মীয় ও বন্ধুগণের চিত্র অঙ্কিত করিয়া আসিতেছেন, এবং সখের চিত্রকরগণের নিকট আমরা যে একাগ্রতা ও যথার্থতা আশা করিয়া থাকি অথচ প্রায়ই দেখিতে পাই না, সেই গুণগুলি জ্যোতিরিন্দ্রনাথের চিত্রে প্রচুর পরিমাণে পরিলক্ষিত হয়। অঙ্কিত মুখগুলিতে এমন একটি আকৃতির সচেতনভাব আছে যাহা প্রায়ই দেখিতে পাওয়া যায় না। আমার আরও বোধ হয় চিত্রগুলি সর্ব্বাপেক্ষা স্বাভাবিক ভাবে অঙ্কিত হইয়াছে। উহাতে পাশ্চাত্য আদর্শের অনুকরণ বা মোগল আদর্শের অনুসরণের জ্ঞানকৃত চেষ্টা নাই। ভারতীয় মহিলাগণের চিত্রগুলি বিশেষভাবে প্রশংসনীয়। সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতাব্দীতে য়ুরোপীয় চিত্রকরগণ নারীসৌন্দর্য্যের এরূপ ম্লান ও চেতনাহীন কল্পনার প্রভাবে প্রভাবিত ছিলেন যে, আলোচ্য চিত্রগুলির ন্যায় স্বাভাবিক ও প্রাণময় চিত্রের জন্য ডুরার ও হলবীনের যুগে ফিরিয়া যাইতে হয়। চিত্রগুলিতে জীবনের পরিদৃশ্যমান অপূর্ব্ব বিচিত্রতা ও মনোহারিতা লক্ষ্য করিয়া আমি একটি কথা বুঝিতে পারি না যে, কেন ভারতবর্ষের নবীন যুগের চিত্রকরগণ মোগল ও রাজপুত আদর্শ হইতে বিষয় এবং অঙ্কনপদ্ধতি গ্রহণ করিতেছেন।

"আধুনিক ভারতীয় চিত্রকলার বিকাশের ইতিহাসে ইহা একটি ক্ষণস্থায়ী রূপভেদ বলিয়া বোধ হয়। নিশ্চয়ই য়ুরোপীয় অপকৃষ্ট শিল্পের অনুকরণ এবং তুচ্ছ ও নীরস বিষয়ের অনুসরণের প্রবৃত্তি প্রতিরোধ করিবার প্রশংসনীয় অভিপ্রায়ই ইহার মূলীভূত কারণ। কিন্তু য়ুরোপীয় শিল্পে উচ্চশ্রেণীর চিত্রাঙ্কন এবং মহতী কল্পনারও অভাব নাই এবং ইহাদের প্রভাবও বোধ হয় অপকারী নহে, যদিও সম্ভবতঃ ভারতবর্ষে এরূপ চিত্রের নিদর্শন অল্পই আমদানী হইয়াছে। কোন বিজাতীয় পদ্ধতির জ্ঞানকৃত অনুকরণে কোনও সজীব চিত্রকরসম্প্রদায় গঠন করা অসম্ভব বটে, কিন্তু জ্ঞানপূর্ব্বক পুরাতন পদ্ধতির অনুকরণের দ্বারাও এরূপ সম্প্রদায়কে জীবনদান করা যায় না। অনুকরণ দ্বারা নূতন শিল্পপদ্ধতির সৃষ্টি হয় না,—উহার উৎপত্তি চিত্তের আবেগময়ী কল্পনায়। ভাবের চাষ হইতেই শিল্পের উৎপত্তি, এবং সাধারণ কৃষিকর্ম্মের ন্যায় ইহাতেও অসীম পরিশ্রম, নিপুণতা, ধৈর্য্য এবং অদম্য অধ্যবসায়ের আবশ্যক এবং ইহা ব্যতীত সরস ও স্বাস্থ্যকর ফল উৎপন্ন হইতে পারে না। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের চিত্রসমূহে আমি এই আবেগময়ী কল্পনার আভাস দেখিতে পাই। ইহা অতি সরল ও আড়ম্বরবিহীন; কিন্তু তাঁহার প্রত্যেক চিত্র দেখিলে বুঝিতে পারা যায় যে, যাঁহার চিত্র তিনি অঙ্কিত করিয়াছেন তাঁহার মুখাকৃতির কমনীয়তা ও চরিত্রের গাম্ভীর্য্য প্রকাশ করিবার প্রবল ইচ্ছায় তিনি প্রণোদিত ছিলেন।

"আমরা সচরাচর রাজা মহারাজাদিগের রাজবেশপরিহিত চিত্র কিম্বা ভ্রমণবৃত্তান্ত-বিষয়ক পুস্তকে অদ্ভুত রকমের আলোকচিত্র দেখিতে এরূপ অভ্যস্ত হইয়াছি যে এই সকল সুশিক্ষিত ভারতীয় মহিলা ও ভদ্রব্যক্তিগণের (যাঁহাদের বিষয় আমরা ইংলণ্ডে অল্পই শুনিতে পাই বা জানিতে পারি) চিত্রদর্শন অত্যন্ত অভিনব ও আনন্দজনক। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁহার অঙ্কিত ২৫ খানি চিত্রের প্রতিলিপি মিঃ এমেরি ওয়াকার দ্বারা প্রস্তুত করাইবার অনুমতি দিয়াছেন এবং আমার বিশ্বাস যে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের উপন্যাসগ্রন্থাবলী পাঠ করিয়া আমরা বাঙ্গালী জীবনের যেরূপ ঘনিষ্ঠ পরিচয় পাই, এই সকল চিত্র হইতেও আমরা অনেকেই সেইরূপ পরিচয় পাইতে পারি।

"আমি আধুনিক প্রতিকৃতি অতি অল্পই দেখিয়াছি যাহাতে এইরূপ সৌন্দর্য্য ও মনোভাব প্রকাশের ক্ষমতা অভিব্যক্ত হইয়াছে।"

তত্ত্ববোধিনীর বর্ত্তমান সংখ্যায় জ্যোতিরিন্দ্রনাথ-অঙ্কিত কয়েকখানি চিত্রের প্রতিলিপি প্রদত্ত হইল। আশা করি উহা হইতে পাঠকগণ উইলিয়াম রদেনষ্টাইনের উক্তির সত্যতা হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হইবেন।

'হিতে বিপরীত।'—পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ কিছুকাল নাটক-প্রহসনাদি রচনা হইতে বিরত হইয়াছিলেন। একদিন মাননীয়া শ্রীযুক্তা জ্ঞানদানন্দিনী দেবী তাঁহাকে বলেন, "তুমি অনেকদিন নাটক

রচনা কর নাই—একখানি নাটক লেখ।" জ্যোতিরিন্দ্রনাথ প্রথমে সম্মত হন নাই, কিন্তু তাঁহার ভ্রাতৃজায়া তাঁহার আপত্তি অগ্রাহ্য করিয়া, তাঁহাকে এক গৃহে আবদ্ধ করিয়া রাখিলেন, এবং যতক্ষণ নাটক লেখা শেষ না হয় ততক্ষণ মুক্তি প্রদান করিবেন না এইরূপ অভিপ্রায় ব্যক্ত করিলেন। এইরূপে দায়ে পড়িয়া জ্যোতিরিন্দ্রনাথ তাঁহার ক্ষুদ্র নাটিকা 'হিতে বিপরীত' লিখিতে বাধ্য হন। এই নাটিকাখানি ১৮৯৬ খৃষ্টাব্দে (১৩০৩ বঙ্গাব্দ ১৪ই বৈশাখ) প্রকাশিত হয় এবং দ্বিজেন্দ্রনাথের জ্যেষ্ঠ পুত্র দ্বীপেন্দ্রনাথের কন্যা নলিনী দেবীর সহিত ডাক্তার সুহৃদনাথ চৌধুরীর শুভ বিবাহোপলক্ষে নাতিনীকে উপহারস্বরূপ প্রদত্ত হয়। উৎসর্গ-পত্রটী এইরূপ :—

নাতিনীর শুভ বিবাহে উপহার
নলিনি, জুটল তোর সুহৃদ্ ভ্রমর,
বিধি মিলাইয়া দিল মনোমত বর।
কি দিয়া তুষিব তোরে কি আছে রতন,
সম্বলের মধ্যে মোর একটু যতন।
যতনে গাঁথিনু তাই বাক্যময় হার,
কৌতুক-যৌতুক এই লহ উপহার।

এই নাটিকাখানি মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের বাটীতে ও সঙ্গীত-সমাজে বহুবার অভিনীত হইয়াছিল।

'স্বরলিপি' 'গীতিমালা' ও 'বীণাবাদিনী।'—

জ্যোতিরিন্দ্রনাথের চেষ্টায় 'ভারতী' ও 'সাধনা' মাসিকপত্রে সর্ব্বপ্রথম বাঙ্গালা গানের স্বরলিপি প্রকাশিত হইতে আরম্ভ হয়। ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ 'ডোয়ার্কিন এণ্ড সন' নামক বিখ্যাত বাদ্যযন্ত্র-বিক্রেতাদিগের সাহায্যে 'স্বরলিপি-গীতি-মালা' নামক এক স্বরলিপি-সম্বলিত ১৬৮টী বাঙ্গলা গানের সংগ্রহ প্রকাশ করেন। উক্ত গ্রন্থে 'সংখ্যামাত্রিক' স্বরলিপির পরিবর্ত্তে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের উদ্ভাবিত 'আকারমাত্রিক' স্বরলিপি ব্যবহৃত হয়। উক্ত ব্যবসায়ের প্রতিষ্ঠাতা ও স্বত্বাধিকারী শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ ঘোষ মহাশয়ের পুত্র শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র ঘোষমহাশয় এই সঙ্গীত-গ্রন্থ প্রকাশ সম্বন্ধে লিখিয়াছেন—

"১৮৯৭ খৃষ্টাব্দে আমি প্রথম জ্যোতিবাবুর সহিত পরিচিত হই। আমি তখন সবে কলেজ পরিত্যাগ করিয়া আমার পিতৃদেব-প্রতিষ্ঠিত 'ডোয়ার্কিন এণ্ড সন' নামে বিখ্যাত ব্যবসায়ে প্রবিষ্ট হইয়াছি। তখন আমাদের দোকান ২৬৭ বহুবাজার ষ্ট্রীটে অবস্থিত ছিল। জ্যোতিবাবু প্রায় প্রত্যহ আমার পিতা বাবু দ্বারকানাথ ঘোষ মহাশয়ের সঙ্গে দেখা করিতে আসিতেন—কারণ তখন "স্বরলিপি-গীতি-মালা" যন্ত্রস্থ। পিতৃদেব উক্ত পুস্তক প্রকাশের যাবতীয় ব্যয় নির্ব্বাহ করিবার ভার গ্রহণ করেন এবং জ্যোতিবাবু স্বাভাবিক মহত্বসহকারে উহার বিক্রয়লব্ধ সমস্ত অর্থ তাঁহাকে দিতে প্রতিশ্রুত হন। "সাধনা" মাসিকপত্রে জ্যোতিবাবু যে 'আকারমাত্রিক স্বরলিপি'র প্রবর্ত্তন করেন, সেই পদ্ধতি গ্রন্থে অবলম্বিত হয়। 'স্বরলিপি-গীতিমালা' দ্বারা আকারমাত্রিক স্বরলিপির বহুল প্রচার হয়। এই নূতন স্বরলিপি-পদ্ধতি সঙ্গীত ও বাদ্যশিক্ষা সরল ও সহজ করিয়াছে। ইহার আর একটি গুণ এই যে, সচরাচর মুদ্রাযন্ত্রে যে সকল অক্ষর বা চিহ্ন থাকে তাহা দ্বারাই স্বরলিপি মুদ্রিত করা যাইতে পারে। গানের স্বরলিপি রীতিমত প্রকাশ করা আজি কালি প্রায় সকল বাঙ্গলা মাসিক পত্রেরই অঙ্গ হইয়াছে। জ্যোতিবাবু এই স্বরলিপি-পদ্ধতি আবিষ্কৃত না করিলে ইহা সম্ভব হইত না।"

'স্বরলিপি-গীতি-মালা' ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দে মে মাসে (১৩০৪ বঙ্গাব্দে) প্রকাশিত হয়। এদেশে সঙ্গীতবিদ্যা বিস্তারের জন্য জ্যোতিরিন্দ্রনাথ কতদূর আগ্রহশীল ছিলেন তাহার পরিচয় প্রদানার্থ আমরা উক্ত গ্রন্থে শিক্ষার্থীর প্রতি গ্রন্থকারের নিবেদন হইতে দুইটি মাত্র পংক্তি উদ্ধৃত করিতেছি :—

"যদি কোন শিক্ষার্থী স্বরলিপির কোন অংশ ঠিক বুঝিতে না পারেন, তাহা হইলে আমাকে পত্রের দ্বারা জানাইলে আমি তাহা বুঝাইয়া দিতে যথাসাধ্য চেষ্টা করিব। অথবা গ্রন্থস্থিত কোন গান যদি মৌখিক শুনিতে ইচ্ছা করেন, কিংবা নিয়মিতরূপে গান শিক্ষা করিতে চাহেন, তাহা হইলে তাহারও বন্দোবস্ত করা যাইতে পারে।"

স্বরলিপি-গীতি-মালা প্রকাশের অব্যবহিত পরেই জ্যোতিরিন্দ্রনাথ 'ডোয়ার্কিন এণ্ড সন্'এর সাহায্যে সঙ্গীত ও স্বরলিপি-প্রকাশিনী একটি মাসিক পত্রিকা—'বীণাবাদিনী' সম্পাদন করিতে আরম্ভ করেন। এতৎসম্বন্ধে শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের স্মৃতিকথা হইতে আরও কিয়দংশ উদ্ধৃত করা যাইতে পারে :—

"স্বরলিপি-গীতি-মালা প্রকাশের অল্পদিন পরেই জ্যোতিবাবু ভারতীয় সঙ্গীতবিদ্যার বিস্তার কল্পে বাঙ্গালা ভাষায় একটি মাসিক পত্রিকা প্রকাশ করিবার কল্পনা করিলেন। আমার পিতৃদেব তাঁহাকে উৎসাহ দিলেন এবং উহা প্রকাশের যাবতীয় ব্যয়ভার গ্রহণ করিতে এবং প্রয়োজন হইলে ক্ষতি স্বীকার করিতেও সম্মত হইলেন। ফলে ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দে জুলাই মাসে 'বীণাবাদিনী' নাম্নী মাসিক পত্রিকা প্রকাশিত হইল। সঙ্গীতসম্বন্ধীয় মৌলিক প্রবন্ধ ব্যতীত 'বীণাবাদিনী'তে বহু নূতন ও পুরাতন সঙ্গীতের স্বরলিপি প্রকাশিত হইয়াছিল। এই মাসিক পত্রিকা প্রবর্ত্তনের দুই বৎসর পরে রহিত হয়; কারণ,

তখন জ্যোতিরিন্দ্রনাথ-প্রতিষ্ঠিত সঙ্গীত-সমাজের মুখপত্র স্বরূপ 'সঙ্গীত-প্রকাশিকা' প্রচারিত হইতে আরম্ভ হয়।

"জ্যোতিবাবু 'বীণাবাদিনী'র প্রতিষ্ঠার জন্য অসাধারণ পরিশ্রম করিয়াছিলেন। তিনি স্বয়ং বহু স্বরলিপি ও মন্তব্যাদি লিখিতেন, অন্যান্য লেখক-লেখিকাদিগের নিকট হইতে রচনা সংগ্রহ করিতেন, স্বয়ং প্রুফ দেখিতেন, গ্রাহক সংগ্রহ করিতেন, বন্ধুদিগের নিকট হইতে পত্রিকার মূল্য আদায় করিয়া দিতেন। তখন তিনি বালীগঞ্জে থাকিতেন, কিন্তু প্রত্যহ 'বীণাবাদিনী' যেখানে মুদ্রিত হইত সেই ভারতমিহির প্রেসে স্বয়ং গিয়া কম্পোজিটর-দিগকে উপদেশ দিতেন বা প্রুফ সংশোধন করিয়া দিতেন।

"জ্যোতিবাবু ভারতীয় বাদ্যযন্ত্র সেতার ও এস্রাজ বড় ভালবাসিতেন। তিনি আমাদিগকে এই যন্ত্রদ্বয় নির্ম্মাণ ও বিক্রয়ের জন্য প্রায়ই অনুরোধ করিতেন এবং যখন আমরা এই সকল যন্ত্র নির্ম্মাণে হস্তক্ষেপ করি তখন তিনি পরম আনন্দ প্রকাশ করিয়াছিলেন।"

'ভারত-সঙ্গীত-সমাজ'। পুণায় অবস্থান-কালে তত্রত্য 'গায়ন সমাজ' দেখিয়া জ্যোতিরিন্দ্রনাথ কলিকাতায় 'সঙ্গীত-সমাজ' প্রতিষ্ঠার সংকল্প করেন। সঙ্গীতবিদ্যার প্রচার ইহার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। বহু সঙ্গীতানুরাগী ভদ্রমহোদয় জ্যোতিরিন্দ্রনাথের এই সাধু সংকল্পে যোগদান করেন এবং মহাত্মা কালীপ্রসন্ন সিংহের বাটীতে "ভারতসঙ্গীত-সমাজ" সর্ব্বপ্রথমে স্থাপিত হয়। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথকে এই সমাজপ্রতিষ্ঠার সংকল্প জ্ঞাত করাইলে তিনি এক সহস্র টাকা সাহায্য করিবার অঙ্গীকার করেন। ঠাকুরপরিবার হইতে আরও সহস্রাধিক টাকা সংগৃহীত হইয়াছিল। বাঙ্গালার অভিজাতগণ এই সমাজের প্রতিষ্ঠাকল্পে মুক্তহস্তে অর্থ সাহায্য করিয়াছিলেন। কিন্তু, কুমার মন্মথনাথ মিত্র রায় বাহাদুর বলেন, এই সমাজপ্রতিষ্ঠার কল্পনার জন্যই কেবল সঙ্গীতসমাজ জ্যোতিরিন্দ্রনাথের নিকট ঋণী নহে, প্রথম অবস্থায় ইহার জন্য জ্যোতিরিন্দ্রনাথ প্রাণপাত পরিশ্রম করিয়াছিলেন। এক-একদিন রাত্রি ২টা ৩টা পর্য্যন্ত তিনি সমাজগৃহে থাকিয়া অভিনয় ও সঙ্গীত শিক্ষা দিতেন। তাঁহার অধ্যবসায় ও পরিশ্রম ব্যতীত এই প্রতিষ্ঠানটি দাঁড়াইতে পারিত না। সমাজপ্রতিষ্ঠার অল্পকাল পরেই সঙ্গীতসমাজের কয়েকজন সভ্যের মধ্যে প্রাধান্য লইয়া বিরোধ ঘটে। এমন কি, ইহা লইয়া ফৌজদারী মোকদ্দমা পর্য্যন্ত হয়। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ, কুমার মন্মথনাথ মিত্র প্রমুখ কয়েকজন সভ্যের সহযোগিতায় 'ভারত-সঙ্গীত-সমাজ' কালীপ্রসন্ন সিংহের বাটী হইতে স্থানান্তরিত করেন। বিপক্ষগণ 'সঙ্গীতসমিতি' নাম দিয়া একটী সঙ্গীতসমাজ কালীপ্রসন্ন সিংহের বাটীতে স্থাপিত করেন। 'সঙ্গীতসমিতি' বহুদিন বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে, কিন্তু 'ভারত-সঙ্গীত-সমাজ' এখনও জ্যোতিরিন্দ্রনাথের কীর্ত্তিমন্দির স্বরূপ বিরাজিত আছে। জ্যোতি-রিন্দ্রনাথই সঙ্গীতসমাজের প্রথম সম্পাদক। বহুদিন সম্পাদকের কার্য্য করিয়া অবশেষে তিনি উহার অন্যতম সভাপতি নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন। এই সঙ্গীতসমাজে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের 'অশ্রুমতী' 'অলীকবাবু' 'হিতে বিপরীত' প্রভৃতি নাটক ও প্রহসন বহুবার অভিনীত হইয়াছিল। এইখানে অভিনয়ের জন্য তিনি কয়েকখানি গীতিনাট্যও রচনা করিয়াছিলেন, যথা—পুনর্ব্বসন্ত, বসন্ত-লীলা, ধ্যানভঙ্গ। ইহার মধ্যে পুনর্ব্বসন্তগীতিনাট্যখানি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। বহুদিন পূর্ব্বে একদা ষ্টীমারে বেড়াইতে বেড়াইতে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ও তদীয় অভিন্ন-হৃদয় সুহৃদ সুকবি অক্ষয়চন্দ্র চৌধুরী কতকগুলি গান রচনা করেন এবং সেইগুলি সংযোজিত করিয়া যোড়া-সাঁকোর বাটীতে অভিনয়ার্থ "মানভঞ্জ" নামক একখানি গীতিনাট্য প্রণয়ন করেন। এই 'মানভঞ্জ'ই ঈষৎ পরিবর্ত্তিত করিয়া 'পুনর্বসন্ত' রচিত হয়। 'পুনবসন্তে' মহাকবি সেক্সপিয়ের Midsummer Night's dream এর ছায়া লক্ষিত হয়।

এই "অদ্ভুত-রসমিশ্র গীতিনাট্যে" জ্যোতিরিন্দ্রনাথের অপূর্ব্ব নাটকীয় রচনাশক্তির পরিচয় পাওয়া যায়। ইহাতে বঙ্গের অনেক প্রসিদ্ধ কবির সুললিত সঙ্গীত সন্নিবিষ্ট হওয়ায় উহার উপাদেয়তা বর্দ্ধিত হইয়াছে। ইহার গানগুলি এবং জ্যোতিরিন্দ্রনাথ-প্রদত্ত সুরগুলি এত মিষ্ট যে এই গীতিনাট্যখানি সে সময়ে সঙ্গীতানু-রাগিগণের নিকট যথেষ্ট সমাদর প্রাপ্ত হইয়াছিল এবং সঙ্গীতসমাজে বহুবার অভিনীত হইয়াছিল।

ব্রহ্মসঙ্গীত-স্বরলিপি।

ইমন পূরবী—দাদরা।

বেলা চলে যায় তোমা পানে চেয়ে।
দিবানিশি একা বসি আঁধার ঘরে শূন্য হিয়ে ॥
কবে হবে পূর্ণ আশা সার্থ হবে ভালবাসা
ভেসে যাবে উছল প্রেমে হৃদয়তীরে জননী হে।
কত লোকে তো যায় মা চলে
চায় নাকো কেও বারেক ফিরে—
পথের ধারে কে কোথা প'ড়ে;
মরণ-ছোঁয়া কে বা ছেলে
তারেও তুমি যাওনা ভুলে
তারেও তুমি লও মা তুলে আদর করে জননী হে ॥

কথা ও সুর—শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর। স্বরলিপি—শ্রীবাণী দেবী।

II গা গা -ঋা। ঋধা পাঃ -ঋাঃ I গা -া ঋা। গা ঋা -া I সা -া -া।
বে লা • চ• লে • যা • য় তো • • মা • •

। সঋা -সঋা -সন্া I -াঃ সঃ ঋা। গা -া -া I {গঋা গঋপা -া।
পা• •• •• • নে চে য়ে • • দি• বা•• •

। পঋা ধপপা -া I পা ঋাপধপা ঋাপঃ• ঋা•। গমা গা -া } I গা ঋা -ঋধা।
নি• শি•• • এ কা••• •• • ব• সি • আঁ ধা র

। পাঃ ঋাঃ গা I -া গঋা -গঋপা। ঋা গা -া I -ঋা -গা -ঋা I
ঘ • রে • শূ• ••• ন্য হি • • • •

। -া সা -া II
• য়ে •

II গা গা -া। পা ধা -পা I র্সা -া র্সা। র্সাঃ নঃ র্ঋর্সা I -া -া -া।
ক বে • হ বে • পূ • র্ণ আ • শা•• • • •

। র্সা -া না I ধাঃ -ঋাঃ ধা। -া ধা না I ধনর্সনা -র্না ধপা। ঃ -ঋাঃ -গা -া I
সা • র্থ হ • বে • ভা ল বা• • সা• • • • •

I { গঋা গঋপা -া। গঋা ধপা -া I ঋাপধা ধপাঃ ঋাঃ। গমা গা -া } I
ভে• সে•• • যা• বে • উ•• ছ ল্ প্রে• মে •

I গা গাঃ মঃ। গা রা -গরা I সা সধ্া -সা। সরা -সরগমা -গরা I গা -া -া।
স্ব দ র্ তী রে • • জ ন• • নী• • • • • • হে • •

। পা -া -া II
• • •

II গা -গা -মা। গা -া রা I সাঃ -ধ্ঃ সা। রা গা -া I
ক ত • লো ক্ ত যায় • মা চ লে •

I গমা -গমপা পা। পমা পা -া I মপধা ধপাঃ মাঃ। গমা গা -া I
চা• • • য় না কো• কে ও বা• • রে ক্ ফি• রে •

I গা গা মা। মধা পাঃ মাঃ I গা -া -মা। গা রা -গরা I -সা -ধ্া -সা।
প থে র্ ধা• রে • কে • • কো থা • • • • •

। -রসা রা গা I -া -া -া। -া -া -া II
• • প ড়ে • • • • • •

II গা গা -া। পা ধাঃ পঃ I পর্সা -া র্সনা। র্সা র্সা -া I র্সা র্সা না।
ম র ণ্ ছোঁ য়া • কে• • বা• ছে লে • তা রে ও

। ধমা ধা -া I ধনা -ধনর্সা না। ধনা ধপপাঃ -মাঃ I -গা -া -া। -া -া -া I
তু• মি • বা• • • ও না তু• লে• • • • • • • • •

I {গমা পা -া। মা পা -া I মপধনা -া ধা। পমা গমা -গা I -া -া -া।
তা• রে ও তু মি • ল• • • ও মা তু• লে• • • • •

। গা গাঃ মঃ I গা রা গরা। সা সধ্া সা I সরা -সরগমা গরা।
আ দ র্ ক রে • • জ ন• • নী• • • • • • •

। গা -া -া } II II
হে • •

সাংখ্যে ঈশ্বরবাদ।

(অধ্যাপক ৺অভয়কুমার মজুমদার এম-এ লিখিত ইংরাজী নিবন্ধের শ্রীযতীন্দ্রকুমার মজুমদার এম-এ, পি-এইচ. ডি কৃত অনুবাদ)

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

ঈশ্বরাস্তিত্বের সাক্ষাৎ প্রমাণ।

সমস্ত কাঠিন্যটা দশম ও একাদশ কারিকা-দুইটীর সহিত ১৮শ কারিকার সামঞ্জস্য দৃশ্যতঃ অসম্ভব হওয়াতেই উত্থিত হইয়াছে। সেই ১৮শ কারিকাটী এই—"জন্ম-মরণ-করণানাং প্রতিনিয়মাদযুগপৎপ্রবৃত্তেশ্চ পুরুষ-বহুত্বং সিদ্ধং ত্রৈগুণ্য-বিপর্য্যয়াচ্চৈব।" অর্থাৎ "জন্ম, মরণ ও করণ সম্বন্ধে পৃথক্ পৃথক্ নিয়ম হেতু, অযুগপৎ প্রবৃত্তি হেতু, আর ত্রৈগুণ্যের বিপর্য্যয় হেতু পুরুষের বহুত্ব সিদ্ধ হয়"। স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে যে, এই সূত্রটী পুরুষের বহুত্ব প্রমাণ করিবার চেষ্টা করিতেছে; সুতরাং দৃশ্যতঃ ইহা ১০ম ও ১১শ কারিকার সহিত অসমঞ্জস; কারণ ঐ দুই কারিকায় পুরুষ যে এক, এই কথা বলা হইয়াছে। দৃশ্যতঃ এই অসামঞ্জস্য হইতেই ১৮শ কারিকাটীর অর্থ পরিবর্ত্তন করিবার চেষ্টা হইয়াছে, যাহাতে ১০ম ও ১১শ কারিকার সহিত ইহার অর্থের সামঞ্জস্য রহে। কিন্তু এইরূপ অর্থের পরিবর্ত্তন না করিয়া উহাদিগকে সমঞ্জস করিবার কোনও চেষ্টাই হয় নাই। এখন জিজ্ঞাস্য, কারিকাগুলি কি বাস্তবিকই অসমঞ্জস? আমার মতে নহে। ১০ম ও ১১শ কারিকায় পরমপুরুষের কথা বলা হইয়াছে এবং ১৮শ কারিকায় উপাধিযুক্ত জীবের কথাই বলা হইয়াছে। আপত্তি হইতে পারে যে, সাংখ্য মাত্র পঁচিশটী তত্ত্ব স্বীকার করে এবং তাহার মধ্যে পুরুষ অন্যতম; সুতরাং সাংখ্যে কেবল একপ্রকার পুরুষের কথাই বলা হইয়াছে, দুই প্রকার পুরুষের কথা নহে; এবং যে একপ্রকার পুরুষের কথা হইয়াছে তিনি অবশ্য ব্যক্তের সহিত যুক্ত, সুতরাং বহু। অবশ্য একথা সত্য নহে। আমরা পূর্ব্বে দেখিয়াছি যে, সাংখ্য-প্রবচন-সূত্রে দুই প্রকার সূত্রে দুই প্রকার পুরুষের কথা বলা হইয়াছে—ঈশ্বর ও জীব। সাংখ্য-কারিকা সম্বন্ধেও তাহাই। একথা সত্য যে, সাংখ্য-কারিকার কোথাও ঈশ্বরের উল্লেখ নাই; কিন্তু ইহার কারণ বোধ হয় এই যে 'ঈশ্বর' শব্দটীর ভিন্ন ভিন্ন অর্থ আছে; বিশেষতঃ শ্রুতিতে 'ব্রহ্ম' অর্থে 'ঈশ্বর' শব্দটীর ব্যবহার কোথাও হয় নাই; অথবা এই কারণেও হইতে পারে যে সাংখ্য-কারিকা, ঈশ্বর ও জীবের স্বভাবগত (essential) কোনও ভেদ স্বীকার করে না, কারণ জীব ঈশ্বরেরই প্রকাশ। কিন্তু কারণ যাহাই হউক্ না কেন, এ যুক্তিটী অবশ্য ঠিক নহে যে সাংখ্য-কারিকাতে 'ঈশ্বর'-শব্দটীর কোনও উল্লেখ না থাকায় একথা বলা যাইতে পারে যে তাঁহার অস্তিত্ব অস্বীকৃত হইয়াছে। আমি দেখাইব যে 'পুরুষ' বা 'আত্মা' অর্থে সাংখ্য-কারিকা কখনও ঈশ্বরকে কখনও বা জীবকে বুঝাইতেছে।

আমরা যদি ১৮শ কারিকাটীকে আর একটু যত্ন-সহকারে পরীক্ষা করি তাহা হইলে দেখিতে পাইব যে, পুরুষের বহুত্ব প্রমাণের জন্য যে সকল যুক্তি দেওয়া হইয়াছে তাহাতে উহা বাস্তবিক প্রমাণিত হয় না। জন্ম, মরণ, ইন্দ্রিয়, প্রবৃত্তি ও ত্রিগুণ—এ সকলই প্রকৃতির অথবা প্রকৃতি-তত্ত্বের ধর্ম্ম; ইহার কোনটীই পুরুষের ধর্ম্ম হইতে পারে না। কারণ স্বভাবতঃ নিত্য ও অসীম হওয়াতে পুরুষের জন্ম বা মরণ হইতে পারে না; সর্ব্বব্যাপী হওয়াতে কোনও ইন্দ্রিয় থাকিতে পারে না; নিষ্ক্রিয় হওয়াতে পুরুষ কার্য্য করিতে পারেন না এবং অখণ্ড ও নিরবয়ব বলিয়া তিনি গুণাতীত। সুতরাং জন্ম, মৃত্যু ও ইন্দ্রিয়ের পৃথক্ পৃথক্ বিধান বা নিয়ম, প্রবৃত্তির অযৌগপদ্য ও ত্রিগুণের বিপর্য্যয় হেতু পুরুষবহুত্ব প্রতিপন্ন হয় না, কিন্তু উহা ইহাই প্রতিপন্ন করিতেছে যে প্রকৃতি পুরুষের সহিত যুক্ত হইয়া যে উপাধিগুলির মধ্য দিয়া সপ্রকাশ হয় তাহাই বহু। এ সম্বন্ধে আরও পরিষ্কার করিয়া বলা আবশ্যক। মানুষের দুইটী দিক্ আছে—একটী চৈতন্যের দিক্ অপরটী জড়ের দিক্; অথবা সাংখ্যের কথায় বলিতে গেলে বলিতে হয় যে, মানুষের একটী দিক্ আছে যাহা হইতেছে পুরুষ এবং অপর একটী দিক্ আছে, যাহা হইতেছে উপাধিরূপী প্রকৃতি; যথা—মহৎ অথবা বুদ্ধি, অহঙ্কার, মন, দশ জ্ঞানকর্ম্মেন্দ্রিয়, পঞ্চ তন্মাত্র ও পঞ্চ মহাভূত। মানুষ প্রকৃতি ও পুরুষ বা আত্মা ও অনাত্মার সমন্বয় (synthesis)। মানুষের মধ্যে পুরুষই অসীম, অপরিবর্ত্তনশীল, নিত্য, সর্ব্বব্যাপী, নিষ্ক্রিয় ও অসঙ্গ; কিন্তু তাহার প্রকৃতি বস্তুতঃ সসীম, পরিবর্ত্তনশীল, কালে আবদ্ধ, অসর্ব্বব্যাপী, ক্রিয়াশীল ও সঙ্গযুক্ত। সুতরাং জন্ম, মৃত্যু প্রভৃতি মানুষের মধ্যে যে প্রকৃতি আছে তাহারই ধর্ম্ম, আর তাহার মধ্যে যে পুরুষ আছেন—তিনি এ সকলের অতীত। কাজেই আমরা দেখিতে পাইতেছি যে ১৮শ কারিকা পুরুষের বহুত্ব প্রতিপন্ন করিতে চাহে না (ইহা অসম্ভব), কিন্তু প্রকৃতির উপাধির বহুত্বই প্রতিপন্ন করিতে চাহে। অধিকন্তু ইহা স্পষ্টীকৃত হইতেছে যে, ১০ম ও ১১শ কারিকায় পুরুষের যে একত্বের কথা বলা হইয়াছে ১৮শ কারিকা পরোক্ষভাবে তাহাই প্রতিপন্ন করিতেছে।

কিন্তু এ প্রশ্ন এখনও হইতে পারে যে ১৮শ কারিকায় পুরুষের যে বহুত্ব স্বীকৃত হইতেছে, তাহার সহিত পুরুষের একত্ব কিরূপে সমঞ্জস হইতে পারে? অথবা, পুরুষ কি করিয়া এককালে এক ও বহু হইতে পারেন? এই প্রশ্নটী দর্শনশাস্ত্রের একটী অত্যাবশ্যকীয় বিষয় এবং ইহাতে দর্শনের 'এক ও বহুর' প্রাচীন সমস্যা (The problem of the one and the many) উত্থিত হইতেছে। মানুষই এ বিষয়ের প্রকৃষ্ট উদাহরণ—মানুষ এককালে এক ও বহু। মানুষ পুরুষ ও প্রকৃতির সমন্বয় (unity)। যে কোনও উপায়েই—সান্নিধ্য হেতু বা অন্য কোনও উপায়ে—এই দুইটী বিভিন্ন জিনিষ মানুষে সমন্বিত হইয়া থাকুক না কেন, একথা অস্বীকার করা যায় না যে মানুষ একে বহু। কিন্তু কেবল একথা বলিলেই সমস্যাটীর মীমাংসা হইবে না। আমাদিগকে একথা প্রমাণ করিতে হইবে যে, এক পরমপুরুষ আছেন এবং জীবসকল তাঁহারই অংশ বা বিভিন্ন প্রকাশ মাত্র। কেবল এই উপায়েই আমরা 'এক ও বহুর' সমস্যাটীর মীমাংসা করিতে সক্ষম হইব। এ বিষয়ে সাংখ্যের মত কি? সাংখ্যকারিকা ও সাংখ্যের অন্যান্য পুস্তকগুলিতে পুরুষের লক্ষণটী কেবল সাধারণভাবেই করা হইয়াছে, যদিও তাহারা বলিতেছে যে, পুরুষ বহু; অর্থাৎ জীবের ভিন্ন লক্ষণ প্রদত্ত হয় নাই—তাহাদের একটী সাধারণ লক্ষণই দেওয়া হইয়াছে। জীবও অসীম, অপরিবর্ত্তনশীল, সর্ব্বব্যাপী ইত্যাদি; অর্থাৎ পরমপুরুষের যে গুণগুলি আছে জীবেরও সেগুলি আছে। কাজেই তাহারা সকলেই অবিকল একরূপ, কিন্তু তথাপি তাহারা ভিন্ন ও বহু। ইহা কিরূপে সম্ভবপর? একথা কেবল সম্ভব হইতে পারে যদি আমরা বিবেচনা করিতে পারি যে, বস্তুতঃ এক পুরুষই বিদ্যমান এবং অন্যান্য পুরুষ তাঁহার অংশ বা বিভিন্ন প্রকাশ মাত্র। অথবা সাংখ্যের কথায় বলিতে গেলে—প্রত্যেক জীবই কোনও নির্দ্দিষ্ট উপায়ে প্রকৃতিযুক্ত পরমপুরুষ। এই কারণেই সাংখ্য জীবকে অসীম, নিত্য, প্রভৃতি বলিতেছে। ইহার অন্য কোনও প্রকার মীমাংসা হইতে পারে না, কারণ 'পূর্ণস্বভাব' তথাপি 'বহু'—পুরুষের এই দুইটী বিশেষণ অসমঞ্জস হইয়া পড়ে, যদি আমরা এই কথা ধরি যে তাহারা সম্পূর্ণ ভিন্ন ও স্বাধীন; যেহেতু একেবারে ভিন্ন হওয়াতে তাহারা পরস্পরকে সীমাবদ্ধ করিয়া ফেলে এবং তাহাতে তাহাদের পূর্ণত্বেরও লাঘব ঘটে।

আমরা যদি সাংখ্য-সূত্রের কথা ধরি, তাহা হইলে দেখিতে পাই যে ইহাও উপরি-উক্ত বিষয় সম্বন্ধে একই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছে। পুরুষবহুত্ব প্রতিপন্ন করিয়া (১অঃ ১৪৯সূঃ ও ৬অঃ ৪৫সূঃ দেখ) ইহা বলিতেছে—"উপাধিভেদেঽপ্যেকস্য নানাযোগ আকাশস্যেব ঘটাদিভিঃ" (১অঃ ১৫০সূঃ)। অর্থাৎ "উপাধির বিভিন্নতা হেতু একই আত্মা বহুরূপে প্রতিভাত হয়, যেরূপ ভিন্ন ভিন্ন ঘটাদিসংযোগ হেতু একই আকাশকে বহুরূপ দেখায়।" অনিরুদ্ধ ও বিজ্ঞানভিক্ষু বিবেচনা করেন যে, এই সূত্রটীতে বৈদান্তিকদের মতের কথা বলা হইয়াছে এবং সাংখ্যকার ইহার খণ্ডন করিতেছেন। কিন্তু এই মতের পরিপোষক কোনও প্রমাণ নাই। এই সূত্রটীকে নিম্নলিখিত সূত্রটীর সহিত তুলনা করিয়া দেখা যাউক—"গতিশ্রুতিরপ্যুপাধিযোগাদাকাশবৎ" (৫১ সূঃ), অর্থাৎ "শ্রুতি পুরুষের গতি সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন তাহা ইহাঁর উপাধি সম্বন্ধেই, যেরূপ আকাশ সম্বন্ধে"। বিজ্ঞানভিক্ষু এই সূত্রটীর এইরূপ ব্যাখ্যা করিতেছেন—"যা চ গতিশ্রুতিরপি পুরুষেঽস্তি সা বিভুত্ব-শ্রুতিস্মৃতিযুক্ত্যনুরোধেনাকাশস্যেবোপাধিযোগাদেব মন্তব্যেত্যর্থঃ। অত্র চ প্রমাণম্—'ঘটসংবৃতমাকাশং নীয়মানে ঘটে যথা। ঘটো নীয়েত নাকাশং তদ্বজ্জীবো নভোপমঃ।'" অর্থাৎ, "অবশ্য বেদেতে পুরুষের গতি সম্বন্ধে উক্তি আছে। কিন্তু এগুলি শ্রুতি ও স্মৃতিতে পুরুষের সর্ব্বব্যাপিত্বের বিষয় যাহা বলা হইয়াছে তাহার সহিত সমন্বয় করিয়াই বুঝিতে হইবে; সুতরাং উহা কোন পুরুষের সম্বন্ধেই বলা হইয়াছে, এইরূপ ধরিতে হইবে, যেরূপ আকাশের গতি উহার উপাধিতেই প্রযুক্ত হইতে পারে। এ সম্বন্ধে প্রমাণ এই—যখন একটী ঘট একস্থান হইতে স্থানান্তরে লইয়া যাওয়া হয়, তখন সেই ঘটেতে আবদ্ধ আকাশ যেরূপ গতিযুক্ত বলিয়া প্রতীয়মান হয় কিন্তু বস্তুতঃ ঘটটিই গতিমান—আকাশ নহে, সেইরূপ উপাধিযুক্ত জীবও এ সম্বন্ধে আকাশের ন্যায়। ব্রহ্মবিন্দু উপনিষদ্, ১৩"। ৬ অধ্যায়ের ৫৯ সূত্রটীর সহিত এইটী পাঠ করিতে হইবে। সেই সূত্রটী এই—"গতিশ্রুতেশ্চ ব্যাপকত্বেঽপ্যুপাধিযোগাদ্ভোগদেশকাললাভো ব্যোমবৎ", অর্থাৎ "এবং যদিও আত্মা সর্ব্বব্যাপী, তথাপি শ্রুতিতে ইহার গতিসম্বন্ধে যাহা বলা হইয়াছে তদনুসারে কালক্রমে উপাধিসংযোগে ইহার ভোগদেশের সহিত সম্বন্ধ স্থাপিত হয়, যেরূপ আকাশ সম্বন্ধে।" এখানে বিজ্ঞানভিক্ষু স্পষ্টতঃই স্বীকার করিতেছেন যে উপরি-উক্ত সূত্রগুলি সাংখ্যেরই মত প্রকাশ করিতেছে যে, আত্মা স্বভাবতঃ এক, নিত্য ও সর্ব্বব্যাপী, কিন্তু উপাধিসংযোগে সীমাবদ্ধ ও ভিন্ন বলিয়া প্রতীয়মান হয়। সুতরাং আমরা দেখিতে পাইতেছি যে প্রথম অধ্যায়ের ১৫০ সূত্রের বিজ্ঞানভিক্ষু যে ব্যাখ্যা করিয়াছেন তাহা স্পষ্টতই ভ্রান্ত এবং শেষোক্ত দুইটী সূত্রের তিনি যে ব্যাখ্যা করিয়াছেন তাহার সঙ্গে অসমঞ্জস। ভ্রমাপনোদনের জন্য ১৫০ সূত্রটীর সহিত যুক্ত যে ১৫১, ১৫২,

১৫৩ ও ১৫৪ সূত্রগুলি—তাহাও বিবেচনা করিয়া দেখিতে হইবে।

১৫১ সূত্রটী এই—"উপাধির্ভিদ্যতে নতু তদ্বান্", অর্থাৎ "উপাধি ভিন্ন, কিন্তু তাহার ধারক নহেন"। ইহার প্রকৃত তাৎপর্য্য এই যে, যেরূপ ঘটাদি উপাধিভেদে আকাশকে ভিন্নরূপ দেখায় কিন্তু ইহা বস্তুতঃ যাহা তাহাই থাকে, সেইরূপ আত্মা স্বভাবতঃ যাহা তাহাই থাকিলেও উপাধিভেদে ভিন্ন বলিয়া প্রতীয়মান হয়। অনিরুদ্ধ ও বিজ্ঞানভিক্ষু ১৫০ সূত্রের যে ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহার সহিত সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়াই ইহার ভিন্ন ব্যাখ্যা করিয়াছেন। কিন্তু আমরা দেখিয়াছি যে ১৫০ সূত্রের তাঁহারা যে ব্যাখ্যা করিয়াছেন তাহা ভ্রান্ত; সুতরাং এই সূত্রটীরও তাঁহারা যে ব্যাখ্যা করিয়াছেন তাহাও ভ্রান্ত।

১৫২ সূত্রটী এই—"এবমেকত্বেন পরিবর্তমানস্য ন বিরুদ্ধধর্ম্মাধ্যাসঃ", অর্থাৎ "একরূপে যে আত্মা সর্ব্বত্র বিরাজমান তাহাতে বিরুদ্ধ ধর্ম্মের অধ্যাস বা আরোপ হইতে পারে না।" আত্মা যদি বস্তুতঃ এক হয় তাহা হইলে ইহা কিরূপে বহু হইতে পারে, এবং কিরূপেই বা পরস্পরবিরোধী ধর্ম্ম—একত্ব ও বহুত্ব—এককালে ইহাতে থাকিতে পারে? পূর্ব্বোক্ত সূত্রটী এই আপত্তির উত্তরস্বরূপ। অনিরুদ্ধ ও বিজ্ঞানভিক্ষু এই সূত্রটীর ভিন্ন অর্থ করিয়াছেন; কিন্তু এবিষয়ে আমরা পূর্ব্বোক্ত সূত্রটী সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছি এই সূত্র সম্বন্ধেও সেই কথা।

১৫৩ সূত্রটী এই—"অন্যধর্ম্মত্বেঽপি নারোপাৎ তৎসিদ্ধিরেকত্বাৎ", অর্থাৎ "প্রকৃতির ধর্ম্ম হওয়ায় বহুত্ব আত্মার উপর কেবল আরোপিত হইয়াছে, কিন্তু আত্মা এক হওয়ায় ইহা বস্তুতঃ আত্মার ধর্ম্ম নহে।" অথবা সহজ কথায় বলিতে গেলে বহুত্ব বাস্তবিক প্রকৃতিরই ধর্ম্ম, কিন্তু প্রকৃতি যখন পুরুষের সহিত যুক্ত হয় তখন স্বভাবতঃ এক হইলেও পুরুষকে বহু দেখায়। অনিরুদ্ধ ও বিজ্ঞানভিক্ষু ইহার ভিন্ন অর্থ করিয়াছেন, কিন্তু পূর্ব্বোক্ত সূত্রগুলির ব্যাখ্যার ন্যায় তাঁহাদের এই ব্যাখ্যাটীও ভ্রান্ত।

১৫৪ সূত্রটী এই—"নাদ্বৈতশ্রুতিবিরোধো জাতিপরত্বাৎ", অর্থাৎ "সাংখ্যে যে পুরুষের বহুত্বের কথা বলা হইয়াছে তাহার সহিত বেদের পুরুষের একত্বের—অদ্বৈতত্বের কোনও বিরোধ নাই, কারণ এই উক্তিগুলি পুরুষের জাতিত্ব সম্বন্ধে।" এই সূত্রটী একটী নূতন বিষয়ের অবতারণা করিতেছে এবং সাংখ্যকারিকার ১০, ১১ ও ১৮ শ্লোকের ব্যাখ্যা সম্বন্ধে যে গোলযোগ উত্থিত হইয়াছিল, তাহার মীমাংসার একটী উপায় বলিয়া দিতেছে। কেহ কেহ বলেন যে, পুরুষের একত্ব বলিতে তাহার জাতিগত একত্বকেই বুঝাইতেছে, অপর পক্ষে পুরুষের বহুত্ব বলিতে তাহার ব্যক্তিগত (species) বহুত্বকেই বুঝাইতেছে। অর্থাৎ, পুরুষকে যখন এক বলা যায় তখন ইহাকে জাতিরূপেই বুঝায়, এবং যখন বহু বলা যায় তখন ইহাকে ব্যক্তিরূপেই, অর্থাৎ জীবরূপে বুঝায়। কিন্তু এখানে 'জাতি'র যে দুইটী অর্থ হইতে পারে সে বিষয়ে যাহাতে গোলমাল না হইয়া যায় তাহাতে সতর্ক হইতে হইবে। ব্যবহারিক ন্যায়ে (formal logic) 'জাতি'শব্দে একজাতীয় জিনিষের সাধারণ গুণগুলি বুঝায়। সুতরাং 'জাতি' অর্থে কোনও বাস্তব জিনিষকে বুঝায় না, কেবল কতকগুলি গুণের সমষ্টিকেই বুঝায়; আর ব্যক্তিই হইতেছে বাস্তব জিনিষ, অর্থাৎ যাহার গুণ আছে। 'জাতির' এই অর্থে জীবই বাস্তব এবং পরমপুরুষের কোন বাস্তব সত্তা নাই; ইহা কেবল জীবের সাধারণ গুণগুলির সমষ্টিমাত্র। কিন্তু আমরা পূর্ব্বে দেখাইয়াছি যে পরমপুরুষের এই অর্থ হইতে পারে না। 'জাতি'র অপর একটী অর্থ আছে। দর্শনশাস্ত্রমতে 'জাতি' অর্থে একটী বাস্তব পদার্থকে বুঝায়, ব্যক্তিসকল ইহারই প্রকাশ মাত্র (হেগেল ও তাঁহার অনুচরদিগের মত)। এই অর্থে পরমপুরুষই একমাত্র বাস্তব পদার্থ এবং জীবসকল তাঁহার প্রকাশমাত্র, সুতরাং জীবসকল পরমপুরুষের ন্যায়ই বাস্তব। সাংখ্যকারিকাপ্রণেতা যখন বলিতেছেন যে, পুরুষ এককালেই এক ও বহু, তখন তিনি 'জাতি' ও 'ব্যক্তির' উপরি-উক্ত অর্থই বুঝিতেছেন। এখানে একথা লক্ষ্য করিতে হইবে যে, যাঁহারা বলেন যে পুরুষের একত্ব একটী জাতিবাচক শব্দ মাত্র, তাঁহারা ভুলিয়া যান যে সাংখ্যমতে পুরুষের এমন কোনও গুণ নাই যাহা দ্বারা এক হইতে অপরকে পৃথক করা যাইতে পারে; এবং আমরা পূর্ব্বেই প্রমাণ করিয়াছি যে জন্ম, মৃত্যু প্রভৃতি গুণগুলি পুরুষের নহে, কিন্তু যে উপাধির সহিত পুরুষ যুক্ত উহারা তাহারই গুণ। সুতরাং যাহা দ্বারা এক পুরুষকে অপর পুরুষ হইতে পৃথক করা যাইতে পারে, এরূপ কোনও গুণ না থাকায়, পুরুষের বহুত্ব প্রমাণিত হইতে পারে না। সংক্ষেপে, পুরুষ এক এবং উপাধিযুক্ত হইয়াই তিনি বহুরূপে প্রকাশবান।

গ্রন্থপরিচয়।

গীতা-রহস্য—শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা-রহস্য অথবা কর্ম্মযোগশাস্ত্র। লেখক বালগঙ্গাধর তিলক, অনুবাদক শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর। মূল্য ৩৲ টাকা। আদি ব্রাহ্মসমাজ ৫৫নং আপার চিৎপুর রোড, কলিকাতা হইতে শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

ভারত-তিলক বালগঙ্গাধর তিলক রাজনীতিক বলিয়া

স্বদেশে ও বিদেশে যেমন পরিচিত, প্রগাঢ় পাণ্ডিত্যের জন্য তেমনই বিদ্বজ্জনসমাজে সমাদৃত। সরকার রাজনীতিক কারণে তাঁহাকে যখন কারারুদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিলেন, তখনও তাঁহার শ্রমবিরতি ছিল না—সেই অবস্থায় তিনি আর্য্যজাতির আদিভূমি সম্বন্ধে অনেক গবেষণা করিয়াছিলেন। অনেকে হয় ত জানেন না, প্রথমবার যখন তাঁহাকে কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়, তখন বিলাতের কোবিদসমাজ তাঁহাকে মুক্তি দিবার জন্য সরকারকে অনুরোধ করিয়াছিলেন এবং সে কার্য্যে আচার্য্য ম্যাক্সমূলার অগ্রণী ছিলেন।

দ্বিতীয়বার কারারুদ্ধ হইয়া তিনি গীতার ব্যাখ্যা রচনা করেন।

তিলক আর্য্যজাতির আদিভূমি সম্বন্ধে যেমন প্রত্নতত্ত্বের আলোচনা করিয়াছিলেন, তেমনই গীতায় উক্ত কর্ম্মযোগের স্বরূপ দেশবাসীকে বুঝাইয়াছেন।

"গীতা সুগীতা কর্ত্তব্যা কিমন্যৈঃ শাস্ত্রবিস্তরৈঃ।"

বাস্তবিক গীতা অনন্ত জ্ঞানের আকর। প্রাচীন ব্যাখ্যাকারদিগের মধ্যেও ধর্ম্মভেদে গীতার ভিন্ন ভিন্ন ব্যাখ্যা দেখা যায়। প্রতীচ্য জ্ঞানের আলোকেও গীতার ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। যে সকল ভারতবাসী সে কার্য্যে আত্মনিয়োগ করিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে বোম্বাই হাইকোর্টের জজ অকালনির্ব্বাপিত-জীবনদীপ কাশীনাথ ত্র্যম্বক তেলাং মহাশয়ের নাম সর্ব্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য। বঙ্গদেশে সাহিত্যসম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র পরিণত বয়সে গীতার ব্যাখ্যা করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। 'প্রচারে' তাহা ধারাবাহিকরূপে প্রকাশিত হইতেছিল। বাঙ্গালীর দুর্ভাগ্য, তিনি সে ব্যাখ্যা সম্পূর্ণ করিয়া যাইতে পারেন নাই।

ভারতের এই নবযুগে লোকমান্য বালগঙ্গাধর তিলক তাঁহার প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য ও ভূয়োদর্শন লইয়া গীতার ব্যাখ্যা করিয়াছেন। তাঁহার ব্যাখ্যা অমূল্য বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। ভক্তির দিক হইতে গীতার ব্যাখ্যা অনেক হইয়াছে—এ ব্যাখ্যা কর্ম্মের দিক হইতে। আজ যখন আমাদের দেশে কর্ম্মের তূর্য্যনাদ ধ্বনিত হইয়াছে, তখন তিলকের মত কর্ম্মী কি ভাবে গীতার ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহা জানিয়া রাখা দেশবাসীর পক্ষে প্রয়োজন।

তিলকের এই মহাগ্রন্থ বাঙ্গালা ভাষায় অনূদিত হওয়ায় বাঙ্গালা সাহিত্যের সমৃদ্ধি বৃদ্ধি হইয়াছে। তিলকের মূল মারাঠি পুস্তক হইতে শ্রীযুত জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর এই অনুবাদ করিয়াছেন। অনুবাদ পাঠ করিলে অনুবাদকে মূল বলিয়া ভ্রম হয়।

আজ বাঙ্গালায় গীতা সম্বন্ধে এরূপ পুস্তক আর প্রকাশিত হয় নাই। বাঙ্গালার শিক্ষিত সমাজে যে এই পুস্তকের আদর হইবে, সে বিষয়ে আমাদের কিছুমাত্র সন্দেহ নাই।

তিলকমহাশয়ের এই রচনা ভারতের অন্যান্য ভাষাতেও অনূদিত হইয়াছে। গীতা সাম্প্রদায়িক ভাব হইতে বহু উচ্চে অবস্থিত এবং বিশুদ্ধ জ্ঞানই তাহার ভিত্তি। সেইজন্য গীতাপাঠে সকল মতাবলম্বীই উপকৃত হইতে পারেন। সেইজন্যই য়ুরোপে ও মার্কিণেও গীতা অনূদিত ও আদৃত হইয়াছে। এদেশে গীতা হিন্দুর পরম আদরের। যাঁহারা মনোযোগ সহকারে গীতা পাঠ করিয়াছেন, তাঁহারাও কর্ম্মবীর বালগঙ্গাধর তিলক মহাশয়ের এই কর্ম্মযোগ-শাস্ত্রের ব্যাখ্যায় অনেক নূতন বিষয় পাইবেন। 'দৈনিক বসুমতী'—১৩৩১ ১লা মাঘ।

ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রকৃতি। আদি ব্রাহ্মসমাজের এবং তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার সম্পাদক শ্রীযুক্ত ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর তত্ত্বনিধি বি-এ কর্ত্তৃক বিরচিত এবং 'আলো ও ছায়া' প্রভৃতি গ্রন্থরচয়িত্রী শ্রীমতী কামিনী রায় বি-এ কর্ত্তৃক লিখিত ভূমিকাসম্বলিত। মূল্য এক টাকা মাত্র। এই পুস্তকে ভগবানের আশ্বাসবাণী—ব্রাহ্মধর্ম্মের বাণী,—ব্রাহ্মধর্ম্মের অসাম্প্রদায়িকতা, সত্য ধর্ম্ম ও উপধর্ম্ম, ঈশ্বর ও মানব, ঈশ্বর মঙ্গলময় এবং ঈশ্বর অন্তর্য্যামী,—প্রভৃতি ভগবত্তত্ত্ব বিষয়ক বিস্তর আলোচনা সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। গ্রন্থকারের প্রগাঢ় আন্তরিকতা এই গ্রন্থের পত্রে পত্রে ফুটিয়া উঠিয়াছে। এই পুস্তকে স্থলবিশেষে আমাদের মতবিরোধ থাকিলেও এরূপ পুস্তক যে ভগবদ্বিশ্বাসীর পক্ষে আলোচ্য তাহা বলা বাহুল্য মাত্র। কাগজ ছাপা এবং বাঁধাই উত্তম। ১৬০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। প্রাপ্তিস্থান,—আদি ব্রাহ্মসমাজ; ৫৫ নং আপার চিৎপুর রোড—যোড়াসাঁকো—কলিকাতা। বঙ্গবাসী—১৩৩১ সাল, ১৬ই ফাল্গুন।

চিন্তাশীল লেখক বলিয়া বাঙ্গলা সাহিত্যে ক্ষিতীন্দ্রবাবু সুপরিচিত। অল্পদিন পূর্ব্বে তাঁহার "আর্ট ও সাহিত্য" নামক উৎকৃষ্ট গ্রন্থ বাঙ্গলা সাহিত্যের গৌরববৃদ্ধি করিয়াছে। বর্ত্তমান গ্রন্থে ক্ষিতীন্দ্রবাবু ব্রাহ্মধর্ম্মের দার্শনিক ভিত্তি ও তাহার স্বরূপ বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছেন। উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধে ব্রাহ্মধর্ম্মের উদ্ভব আকস্মিক ব্যাপার নহে; ইহা প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের ভাবসংঘর্ষের স্বাভাবিক পরিণতি। ব্রাহ্মধর্ম্ম সনাতন হিন্দুধর্ম্মেরই মূলতত্ত্বের উপর প্রতিষ্ঠিত। ক্ষিতীন্দ্রবাবু সহজ ভাষায়, সরল ও প্রাঞ্জলভাবে এই গ্রন্থে ব্রাহ্মধর্ম্মের কথা বিবৃত করিয়াছেন। ইহাতে দুর্ব্বোধ্য দার্শনিক কূটতর্ক নাই। যাঁহারা ব্রাহ্মধর্ম্মের সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানেন না, অথচ তাহার সম্বন্ধে নানারূপ অদ্ভুত ধারণা পোষণ করেন, তাঁহাদিগকে এই গ্রন্থ পাঠ করিয়া দেখিতে অনুরোধ করি। ব্রাহ্মধর্ম্ম যে বর্ত্তমান যুগে আমাদের দেশে একটি

বিশেষ শক্তি সঞ্চার করিয়াছে, তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই; এই শক্তির মূল উৎস কোথায়, তাহা জানিতে হইলে ক্ষিতীন্দ্রবাবুর গ্রন্থ পাঠ করা প্রয়োজন। অনেক ব্রাহ্ম লেখকের রচনার মধ্যে আমরা সনাতন হিন্দু ধর্ম্মের প্রতি একটা কুসংস্কারপূর্ণ অবজ্ঞার ভাব দেখিতে পাই; ক্ষিতীন্দ্র বাবু যথাসম্ভব সাম্প্রদায়িক কুসংস্কারমুক্ত উদার মনোভাব লইয়াই গ্রন্থখানি লিখিয়াছেন। ইহা তাঁহার পক্ষে কম প্রশংসার কথা নহে। প্রসিদ্ধ কবি শ্রীমতী কামিনী রায় এই গ্রন্থের একটী সুচিন্তিত ভূমিকা লিখিয়াছেন। আমরা এই গ্রন্থের বহুল প্রচার কামনা করি। আয়তন হিসাবে গ্রন্থখানির মূল্য অতি সুলভ।

আনন্দবাজার—৮ই শ্রাবণ, ১৩৩১ সাল।

"ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রকৃতি" পঞ্চদশ কথায় ১৬০ পৃষ্ঠায় সমাপ্ত হইয়াছে। প্রত্যেকটী কথা এমন সরল সুন্দর ভাষায় লিখিত হইয়াছে যে ইচ্ছা হয় ইহা প্রতিদিন পাঠ করি। শ্রীযুক্ত ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় সুপরিচিত লেখক, তাঁহার ভাষা যে সুন্দর তৎসম্বন্ধে মতভেদ নাই। তিনি এই গ্রন্থে যে সমস্ত কথা লিখিয়াছেন, তাহা প্রাণে প্রাণে অনুভব না করিতে পারিলে কখনই এরূপ প্রাঞ্জল ভাষায় লিখিতে পারিতেন না বলিয়া আমাদের বিশ্বাস। গ্রন্থখানা ধর্ম্মপ্রাণা, বিদুষী, 'আলো ও ছায়া' প্রভৃতি গ্রন্থরচয়িত্রী শ্রীমতী কামিনী রায় মহোদয়ার ভূমিকায় আরও মনোজ্ঞ হইয়াছে।

ত্রিশ বৎসর পূর্ব্বেও ব্রাহ্মসমাজস্থ অনেক লোক তাঁহাদের বিদ্যা, বুদ্ধি, প্রেম, ভক্তি ও সরলতা থাকা সত্ত্বেও কেবল ব্রাহ্মসমাজের অন্তর্ভুক্ত বলিয়া অযথা নিন্দিত হইয়াছেন। সাধু যাঁহাদের সংকল্প, ঈশ্বর তাঁহাদের সহায়। আজ সেই ব্রাহ্মসমাজের মত প্রাচীন সমাজে অবাধে চলিতেছে। সেইজন্য সাহস করিয়া বলিতে পারি, ক্ষিতীন্দ্র বাবুর এই গ্রন্থ প্রাচীন সমাজেও আদরণীয় হইবে। আমার মনে হয়, এই রকমের একখানা গ্রন্থ বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্য হওয়া সঙ্গত; সাম্প্রদায়িকতা দোষে এই গ্রন্থখানা দূষিত হইলেও মূল ধর্ম্মতত্ত্ব সুন্দররূপে লিখিত হইয়াছে।

কলেজের ছেলেরা এই গ্রন্থ পাঠ করিলে অনেক শান্তি পাইবেন। ধর্ম্মজীবন সম্বন্ধে কোনও বিশেষ ধারণা না থাকায় পাঠ্যাবস্থায় অনেক ছাত্রকে কুপথে পতিত হইতে দেখা যায়। এই সরল সহজ গ্রন্থখানা পাঠ করিলে ধর্ম্মের বীজমন্ত্র কি তাহা উত্তমরূপে বুঝা যায়। ধর্ম্ম বিষয়ে জ্ঞান থাকিলে সেই ভাবে না চলিয়া থাকা যায় না।

গ্রন্থের দশম কথা, "মামেকং শরণং ব্রজ" ৯১ পৃষ্ঠা হইতে ১০১ পৃষ্ঠায় লিখিত হইয়াছে। এই কথা প্রতিদিন পাঠ করিলে সাংসারিক দুঃখ হইতে শান্তি পাওয়া যায়।

আমরা আশা করি শ্রীযুক্ত ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় এই জাতীয় গ্রন্থ আরও লিখিয়া মানবজাতির কল্যাণ করিবেন।

প্রতিভা—মাঘ-ফাল্গুন-চৈত্র ১৩৩১।

প্রভাতী। (হিতৈষণা গ্রন্থাবলী ২৫নং) শ্রীযুক্ত ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রণীত। মূল্য ৷৹ আনা। ৫৫নং অপার চিৎপুর রোড—আদি ব্রাহ্মসমাজ যন্ত্রালয়ে মুদ্রিত।

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের পৌত্র, এবং তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার সুযোগ্য সম্পাদক শ্রীযুক্ত ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের লেখনী অক্লান্ত। ইঁহার পবিত্র লেখনী হইতে যে সকল সৎ-সাহিত্য পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছে, তৎসমুদয় অনেকের সুপরিচিত। আলোচ্য গ্রন্থখানি তাঁহার রচিত "হিতৈষণা গ্রন্থাবলী"র অন্যতম। গ্রন্থকার ভূমিকায় লিখিয়াছেন:—"ইহা একখানি গদ্য-পদ্যের গীতিকাব্য।" কেহ মনে করিবেন না যে ইহাতে পদ্য-রচনা আছে; গ্রন্থখানি আগাগোড়া কবিতাময় গদ্যে রচিত। ইহাতে যে গীতি আছে, তাহা ভগবদ্ভক্তের নির্ম্মল আত্মা হইতে ঝঙ্কৃত হইয়া উঠিয়াছে। সুতরাং গ্রন্থখানি পবিত্র ভাবে ও পবিত্র চিন্তায় ভরপূর। পড়িতে পড়িতে মনের অন্ধকার দূরীভূত হয়, হৃদয় নির্ম্মল হয়, এবং আত্মা সুপ্রসন্ন হয়। আজি-কালিকার দিনে বাঙ্গলা সাহিত্যে এরূপ পবিত্র গ্রন্থ অতিশয় বিরল। বাঙ্গালীর নিকটে এরূপ গ্রন্থের সমাদর হইলে বুঝিব, বাঙ্গালী সত্য সত্যই উন্নত জীবন লাভের জন্য ব্যাকুল হইয়াছে। বাঙ্গালীর কি সেরূপ শুভদিন আসিয়াছে? পুস্তকের ভাষা কিরূপ সরল ও সুন্দর, তাহার একটু নমুনা আমরা যদৃচ্ছাক্রমে একস্থান হইতে উদ্ধৃত করিয়া দেখাইতেছি:—

"স্বাধীন পুরুষের সন্তান তুমি! স্বাধীনতাই তোমার জন্মগত অধিকার। রিপুগণ তোমাকে দিবানিশি তাহাদের জালে ঘিরিয়া ফেলিবার চেষ্টায় আছে। সাবধান—স্বাধীনতা কিছুতেই হারাইও না। এক মুহূর্ত্তের স্বাধীনতা—অনন্ত জীবনের পথ প্রদর্শন করে। স্বাধীনতার শিঙ্গা বাজাইয়া দাও—স্বাধীনতার সহচর—প্রেম, ভক্তি দয়া প্রভৃতি—সকলে চলিয়া আসুক। রিপুগণের সঙ্গে লাগাইয়া দাও মহাসংগ্রাম। ইন্দ্রিয়-অশ্বের উপর চড়িয়া পড়—সংযমের লাগামে তাহাকে নিজের আয়ত্ত করিয়া যাও—ঐ সেনাপতি স্বাধীন পুরুষের নিকট হইতে আদেশ লইয়া এস, কি করিতে হইবে। হৃদয়কে ক্ষতবিক্ষত হইতে দিও না—নিজের গৃহে শত্রুগণকে প্রবেশ করিতে দিও না। নিদ্রিত থাকিয়া শত্রুগণের উৎসাহ-বর্দ্ধন করিও না—জাগিয়া উঠ। বিবেক-বিচারের শাণিত তরবারি ধারণ কর—আর ভগবানের নামে জয়ধ্বনি করিয়া বিপক্ষ রিপুগণের মধ্যে মৃত্যুর আগুন ছড়াইয়া দাও।" ইত্যাদি। এইরূপ সুন্দর সরল ভাষা নির্ম্মল তটিনীর উল্লাসময়

স্রোতের ন্যায় সর্ব্বত্র নাচিতে নাচিতে চলিয়াছে। পুস্তকের মুদ্রণ যেরূপ সুন্দর, বাঁধাইও তদ্রূপ। এই ক্ষুদ্র পবিত্র গ্রন্থখানি পাঠ করিয়া আমরা আনন্দিত হইয়াছি; পাঠকগণও আনন্দিত হইবেন সন্দেহ নাই।

গন্ধবণিক্—জ্যৈষ্ঠ ১৩৩২।

সংবাদ।

ভবানীপুর ব্রাহ্মসমাজের সাম্বৎসরিক উৎসব—বিগত ৭ই, ৮ই ও ৯ই আষাঢ় তিন দিন ধরিয়া ভবানীপুর ব্রাহ্মসমাজের চতুঃসপ্ততিতম সাম্বৎসরিক উৎসব যথারীতি সুসম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। গত ৭ই আষাঢ় মঙ্গলবার সন্ধ্যা ৭।৹ ঘটিকায় শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত ভবসিন্ধু দত্ত শ্রীযুক্ত অনাথকৃষ্ণ শীল মহাশয়ের সহযোগিতায় 'ছায়াচিত্র' যোগে শ্রীমন্মহর্ষিদেব সম্বন্ধে একটী সুন্দর বক্তৃতা দেন। বক্তৃতাটী বর্ণনাভঙ্গিতে উপস্থিত শ্রোতৃবর্গের বড়ই হৃদয়গ্রাহী হইয়াছিল।

গত ৮ই আষাঢ় বুধবার সন্ধ্যা ৭।৹ ঘটিকায় শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত বরদাকান্ত বসু বিএ, ও পণ্ডিত শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র সাংখ্য-বেদান্ততীর্থ বেদী গ্রহণ করেন। সাংখ্যতীর্থমহাশয় শ্রীযুক্ত শিতিকণ্ঠ মল্লিকের অনুরোধক্রমে তাঁহার "পাপের উৎপত্তি ও তাহার প্রতীকার" বিষয়ে লিখিত নিবেদন পাঠ করেন। উহা আগামী শ্রাবণ-সংখ্যা পত্রিকায় প্রকাশিত হইবে। বরদা বাবুর আরাধনা ও উপদেশ অতি সুন্দর হইয়াছিল।

গত ৯ই আষাঢ় বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা ৭॥ ঘটিকার সময়ে জন্মোৎসব উপলক্ষে শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর বি-এ, তত্ত্বনিধি ও শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত চিন্তামণি চট্টোপাধ্যায় বি-এল, বেদী গ্রহণ করেন। চিন্তামণি বাবু একটী সুগম্ভীর উদ্বোধন করিলে ক্ষিতীন্দ্র বাবু "ধর্ম্মে সাম্প্রদায়িকতা ও দ্বন্দ্ব-বিবাদ" বিষয়ে সময়োপযোগী একটি সুন্দর উপদেশ পাঠ করেন। গত কল্যের 'নিবেদন' ও অদ্যকার এই 'উপদেশ' মুদ্রিত হইয়া পূর্ব্বেই উপাসকমণ্ডলীর হস্তে বিতরণ করা হয়। ক্ষিতীন্দ্রবাবুর উপদেশটী এই আষাঢ়-সংখ্যা পত্রিকায় প্রকাশিত হইল।

কয়েকটী হিন্দু ও মুসলমান ভদ্র যুবক সম্মিলিতভাবে গত ৮ই ও ৯ই আষাঢ়ের সঙ্গীতের ভার গ্রহণ করেন। তাঁহাদের সমবেতকণ্ঠে গীত ব্রহ্মসঙ্গীত গুলি আমাদের বড় ভাল লাগিয়াছিল। গত ৭ই আষাঢ় ভবসিন্ধু বাবু রাজা রামমোহন রায়ের "ভাব সেই একে" ইত্যাদি সঙ্গীতটী অতি উৎসাহের সহিত গাহিয়াছিলেন।

তত্ত্ববোধিনী-পত্রিকা—সর্ব্বপ্রকার সাম্প্রদায়িকতা পরিত্যাগ পূর্ব্বক কায়মনোবাক্যে সত্যের আরাধনাই তত্ত্ববোধিনীর এই সুদীর্ঘ জীবনের একমাত্র ব্রত। ব্রত কঠিন হইলেও, সুখের বিষয়, তাহার ভঙ্গাপরাধ কোনও দিন ইহাকে স্পর্শ করে নাই। যাঁহারা ইহার নিয়মিত পাঠক, তাঁহারা ইহার অকপট সত্যসেবার পরিচয় প্রতি মাসেই পাইয়া থাকেন। বর্ত্তমান যুগে তত্ত্ববোধিনীই বোধ হয় একমাত্র পত্রিকা, যে গতানুগতিকতার মোহে পড়িয়া বহিঃসৌন্দর্য্যকেই চরম বলিয়া মানিয়া লয় নাই; আকারে-প্রকারে যুগোচিত দীনতা ইহার থাকিলেও প্রবন্ধগুলি যে সত্যই জ্ঞানগর্ভ ও মূল্যবান তাহা বিভিন্ন সাময়িকে উহাদের অনেকগুলি নিয়মিত উদ্ধৃত হওয়াতেই হৃদয়ঙ্গম হয়। সম্প্রতি 'আনন্দবাজার-পত্রিকা' 'শিক্ষা-সমাচার' ও 'তত্ত্বকৌমুদী' প্রভৃতিতে ইহার কয়েকটী প্রবন্ধ উদ্ধৃত হইয়াছে। আদিব্রাহ্মসমাজের 'অসাম্প্রদায়িকতা' কেবল মৌখিক নহে—ইহা সত্যসত্যই এত উদার যে প্রত্যেক সম্প্রদায়ের লোকই ইহাকে 'একান্ত আপনার' ভাবিয়া প্রীতি ও প্রেমে অভিষিক্ত করেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ হিন্দুসমাজের মুখপত্র বরিশালের 'কাশীপুরনিবাসীর' গত ১৫ই আষাঢ়ের মন্তব্যটী আমরা নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম:—

"কলিকাতা আদি ব্রাহ্মসমাজের তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার লিখায় আমাদের হিন্দু সমাজের উপকার হইবে বলিয়া আশা হইতেছে। সম্পাদক শ্রীযুক্ত ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর আমাদের ব্রাহ্মণ-সমাজের ইতিহাস প্রকাশ করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। "বঙ্গে পঞ্চ ব্রাহ্মণ কয়বার আসেন" শীর্ষক প্রবন্ধটী সম্পূর্ণ আমাদের মতানুরূপ না হইলেও ব্রাহ্মণের গৌরববর্দ্ধক প্রবন্ধ আদি ব্রাহ্মসমাজ মুদ্রিত করিয়া আমাদিগকে কৃতজ্ঞতাপাশে নিবদ্ধ করিয়াছেন। ক্ষিতীন্দ্রবাবু ব্রাহ্মণবংশে জন্মলাভ করিয়া ব্রাহ্মণের করণীয় কার্য্য করিতেছেন, ইহা আমরা বলিতে বাধ্য"।

স্থানান্তরে আদিব্রাহ্মসমাজ হইতে প্রকাশিত পুস্তকাবলী সম্বন্ধে যে গ্রন্থপরিচয় প্রকাশ করিলাম, উহা হইতেও আমাদের কথার সত্যতা প্রমাণিত হইবে।

বিজ্ঞাপন।

Tattwabodhini Patrika Reg. No. C. 432.

একবিংশ কল্প
চতুর্থ ভাগ
শ্রাবণ, ব্রাহ্মসম্বৎ ৯৭।

৯৯৬ সংখ্যা ১৮৪৮ শক

তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা

"ব্রহ্ম বা একমিদমগ্র আসীন্নান্যৎ কিঞ্চনাসীত্তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রন্নিরবয়বমেকমেবাদ্বিতীয়ম্ সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয়ং সর্ব্ববিৎ সর্ব্বশক্তিমদ্ধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্যসাধনঞ্চ তদুপাসনমেব"।

সম্পাদক—শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৫৫ নং অপার চিৎপুর রোড্ কলিকাতা, আদিব্রাহ্মসমাজ যন্ত্রে শ্রীরণগোপাল চক্রবর্ত্তী দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

সাল ১৩৩৩। খৃঃ ১৯২৬। সম্বৎ ১৯৮৩। কলিগতাব্দ ৫০২৭। শ্রাবণ।

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার বার্ষিক মূল্য ৩৲ টাকা
ডাকমাশুল ৷৵ আনা। এই সংখ্যার মূল্য ।০ আনা।
আদিব্রাহ্মসমাজের কর্ম্মাধ্যক্ষের নামে পাঠাইতে হইবে।

একমেবাদ্বিতীয়ং

একবিংশ কল্প
চতুর্থ ভাগ

শ্রাবণ, ব্রাহ্মসম্বৎ ৯৭।

৯৯৬ সংখ্যা ১৮৪৮ শক

তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা

"ব্রহ্ম বা একমিদমগ্র আসীন্নান্যৎ কিঞ্চনাসীত্তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রন্নিরবয়বমেকমেবাদ্বিতীয়ম্ সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয়ং সর্ব্ববিৎ সর্ব্বশক্তিমদ্ধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্যসাধনঞ্চ তদুপাসনমেব"।

সম্পাদক—শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর

কলিগতাব্দ ৫০২৭। সম্বৎ ১৯৮৩। খৃঃ ১৯২৬। শক ১৮৪৮। সাল ১৩৩৩।

বন্ধু আমার!

(শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর)

৯। সন্ধান পথে।

বন্ধু হে! তুমি আমায় ডাক দিয়াছ। তোমার সেই ডাক শুনিয়া আমি আজ তোমার সন্ধানে বাহির হইয়াছি। কিন্তু তোমার এ কি লুকোচুরি—তুমি অনবরত ডাক দিতেছ, আর সেই ডাকের প্রতিধ্বনিতে ভূধর সাগর বন উপবন গগন ভুবন সমস্তই ভরিয়া উঠিতেছে; তাই আমি প্রতিনিয়তই তোমার ডাক শুনিতে পাইলেও তুমি যে ঠিক কোথায় আছ, তাহা ধরিতে পারিতেছি না! তুমি ডাকিতেছ, আর আমি তোমাকে খুঁজিয়া পাইতেছি না—এক এক সময় ইহার জন্য আমার প্রাণ এতই আকুল-ব্যাকুল হইয়া উঠে যে, আমি আর স্থির থাকিতে পারি না; এক মুহূর্ত্তও আমার বাঁচিয়া থাকিতে ইচ্ছা হয় না। আমি যে সুখের জন্য তোমাকে পাইতে চাই, তাহা মনে করিও না। আসল কথা এই যে, তোমাকে ছাড়িয়া এক মুহূর্ত্তও আমি থাকিতে পারি না। আমি জানিয়াছি, তুমি আমার কি রকম বন্ধু—তাহা জানিয়া আমি তোমা হইতে দূরে কি প্রকারে সরিয়া থাকিব? তুমি যদি আজ আমাকে দেখা না দাও—দিও না; আমি তোমার জন্য সুদীর্ঘ দিবসরাত্রি, সুদীর্ঘ ঋতু সম্বৎসর প্রতীক্ষা করিয়া বসিয়া থাকিব, কিন্তু তবু আমি অপর কাহারও আশ্রয় গ্রহণ করিতে ধাবিত হইব না। আমাকে দুঃখ দিয়া যদি তোমার সুখ হয় হৌক, কিন্তু বন্ধু! দেখো, আমাকে মরিতে দিও না। বন্ধু! আবার তুমি ডাক দিতেছ! তোমার ডাক শুনিয়া তো আমি পাগল হইয়া গিয়াছি। বাহিরে সমস্ত বন উপবন তো তন্ন তন্ন করিয়া খুঁজিলাম—কোথাও তো তোমায় দেখিতে পাইলাম না, অথচ প্রতি মুহূর্ত্তেই তোমার ডাক শুনিতেছি। দাঁড়াও—এবার তোমাকে ধরিবার ব্যবস্থা করিতেছি। আমি এত সন্ধানে তোমার সন্ধান করিলাম, কিন্তু অন্তঃপুরে গিয়া তোমার সন্ধান করিবার কথা একবারও মনে পড়িল না—আশ্চর্য্য! এবার একবার অন্তঃপুরে গিয়া সন্ধান করিয়া দেখি—দেখি, তোমার সন্ধান পাওয়া যায় কি না।

১০। অন্তরে।

বন্ধু! তুমি যে অন্তঃপুরে আসিয়া খেলা করিতে থাকিবে, আর সেখান হইতে আমাকে ক্রমাগত ডাক দিবে, তাহা কি প্রকারে বুঝিব? আমি তোমাকে বাহিরে বাহিরে খুঁজিয়াই হয়রাণ হইতেছিলাম। ভালই হইয়াছে যে, আমি তোমাকে অন্তঃপুরে দেখা পাইয়াছি। দাঁড়াও বন্ধু! আমার প্রাণের পূজা একটু তোমার চরণে নিবেদন করি। তোমাকে আজ আমার জ্ঞানের প্রদীপ জ্বালাইয়া আরতি করি। দেখ বন্ধু! তুমি অন্তঃপুরে আসিবে

জানিয়া সেখান হইতে যত মলিনতার আগাছা ছিল, সমস্তই তুলিয়া ফেলিয়াছি। এখন সেখানে শুভ ভাব ও শুভ কর্ম্মের চারাগাছ বসিয়াছে। আজ দেখ, সেই সমস্ত গাছে কেমন বিশুভ্র সুন্দর ও সুগন্ধ ফুল ফুটিয়াছে। এই সমস্ত ফুল তোমার হাতে তুলিয়া দিতে আমার প্রাণ ছটফট করিতেছে; এই সমস্ত ফুল দিয়াই তোমার চরণপূজা করিতে আমার প্রাণ আকুল হইতেছে। মনে পড়ে— তোমারই সুবৃহৎ বাগান হইতে তোমারই এই সমস্ত চারাগাছ আমার অন্তঃপুরের বাগানে বসাইবার জন্য পাঠাইয়া দিয়াছিলে? কেবল পাঠাইয়া তুমি ক্ষান্ত হও নাই—আমার অজানতই তুমি আবার সেগুলি সযত্নে বসাইয়া দিলে—কাহাকেও তাহাতে হস্তক্ষেপ করিতে দাও নাই। আজ যখন তুমি আমার সেই অন্তঃপুরে আসিয়াছ, তোমাকে যখন এত নিকটে পাইয়াছি, তখন গঙ্গাজলে গঙ্গাপূজা না করিয়া, তোমারই দেওয়া গাছের ফুলে তোমারই পূজা না করিয়া কিছুতেই ক্ষান্ত হইব না। তোমাকে আজ আমার অন্তঃপুরের সর্ব্বত্র ঘুরাইয়া আনিব, দেখিবে—সেখানে কত রকমেরই ফুল ফুটিয়াছে—তুমি তাহার সুগন্ধে আনন্দিত হইয়া উঠিবে। তোমাকে আজ আমার অন্তঃপুরে পাইয়া আমার কি যে আনন্দ হইতেছে, তাহা শত মুখেও ব্যক্ত করিতে পারি না। আজ আমার কাছে এই আকাশ মধুময়, এই চন্দ্রতারকা মধুময়, আমার অন্তর বাহির সমস্তই মধুময়।

১১। বিরহে।

বন্ধু! বন্ধু! তোমার অদর্শনে যে এত জ্বালা, তা আগে জানিতাম না। দিনরাত যে কোথা হইতে আসে, আর কোথায় চলিয়া যায়, তাহা চক্ষে যেন দেখিতেই পাই না। সমস্ত দিন, সারা রাত্রি প্রাণের ভিতর কি যেন এক আগুন জ্বলিতে থাকে। চারিদিকেই যেন অন্ধকার দেখি। চন্দ্র সূর্য্য—কিছুই তো আর চক্ষে দেখিতে পাই না— অন্ধকার—অন্ধকার! দেখা দাও বন্ধু—দেখা দাও। তুমি যাহার সঙ্গে বন্ধু পাতাইয়াছ, সেই বন্ধু যদি মৃত্যুমুখে পড়ে, তাহাই কি তোমার ভাল লাগিবে? বন্ধু! প্রাণ বাহির হইবার পূর্ব্বে একটীবার দেখা দাও। তুমি কি প্রীতিদৃষ্টিতে ভালবাসার চক্ষে আমাকে দেখা দিয়াছিলে, সে দৃষ্টি যে আমার নয়নের প্রতি অণুপরমাণুতে বাঁধা আছে। সে দৃষ্টি যে কিছুতেই ভুলিতে পারি না। সে দৃষ্টি ভুলিবার পূর্ব্বে যেন আমার শতবার মৃত্যু হয়। না—না—আমি আর কথা কহিতে পারিতেছি না। প্রাণের ভিতর কি এক আগুন থাকিয়া থাকিয়া ঝলসিয়া উঠিতেছে। সেই আগুন আমাকে তিলে তিলে দগ্ধ করিতেছে, তাহা আমি বেশ বুঝিতেছি জানিতেছি; অথচ সেই আগুনে দগ্ধ হওয়াই বড় মিষ্ট লাগিতেছে—সেই আগুনকে প্রাণের ভিতর আঁকড়াইয়া ধরিতেই যেন বড় ভাল লাগে, তাহাতেই যেন জীবন পাই। লোকে বুঝি ইহাকেই বিরহের আগুন বলে। এই আগুন এত ভাল লাগে বলিয়াই ইহার বিষয়ে অশ্রুবারিসিক্ত এত সুমিষ্ট কবিতা প্রাণের উৎস হইতে বাহির হয়। এই বিরহের আগুনে, বন্ধু তুমি আসিয়া দেখ, আমার সেই পূর্ব্বের হাসি, প্রাণের সেই তরল আমোদ আহ্লাদ সমস্তই ভস্মীভূত হইয়া গিয়াছে; কিন্তু এই বিরহে প্রাণটা যে সমস্তক্ষণ তোমাতেই ডুবিয়া রহিয়াছে,—তাহাতেই কি এক গভীর আনন্দ সমস্ত প্রাণটাকে আচ্ছাদিত করিয়া রাখিয়াছে। তোমার আশাতেই আমি এত দিন এত রাত তোমার অদর্শনের সুতীব্র জ্বালা সহ্য করিয়া আসিয়াছি। বন্ধু গো! আর আমাকে নিরাশ করিও না, আমার হৃদয়মন ভাঙ্গিয়া দিও না—একবার—বন্ধু আমার—একবার আসিয়া দেখা দাও—আমার সমুদয় দেহমন তোমার মুখের অরুণজ্যোতিতে উদ্ভাসিত হইয়া উঠুক।

১২। প্রেমপ্রবাহে।

বন্ধু হে! আমি তোমার ভালবাসার জালে পড়িয়াছি, তাহা তো তুমি দেখিতে পাইতেছ। কিন্তু তুমিও যে জালে পড়া হইতে বাদ পড়িয়াছ, তাহা তো আমার মনে হয় না। আমার বেশ মনে হইতেছে, তুমিও আমার ভালবাসার জালে পড়িয়া গিয়াছ। তোমার বিরহে আমার তো বুক চক্ষের জলে ভাসিয়া যায়, আমারও বিরহে কি তোমার হৃদয় অশ্রুজলে ভাসিয়া যায় না? তাহা যদি না হইবে, তবে আমা হইতে দূরে সরিয়া গিয়া আবার আমার কাছে ফিরিয়া আস কেন? থাকিতে পার

না বলিয়াই তো আস ? আমার হৃদয় তো তোমাকে দিয়া বসিয়াছি --তোমার সমস্ত হৃদয়খানি আমি পাই না কেন ? তোমার এতটুকু ভালবাসা যদি পাই,অন্তত তোমার ভালবাসার এতটুকু যাহাতে না হারাই, তাই তো আমি তোমার প্রেমে আপনাকে ভাসাইয়া দিয়াছি। আমার তুমিই সব—তোমাকেই আমি অকূলের কূল বলিয়া চিনিয়াছি। আমি তাই নির্ভয়ে ভাসিয়া পড়িয়াছি—তোমার সঙ্গে মিলিব বলিয়া সকল সংসার ছাড়িয়া দিয়াছি—পরীক্ষা করিতেছি যে, তুমি আমার নিকট সমস্ত ক্ষণ ধরা দাও কি না। কিন্তু যাই বল বন্ধু—তোমাকে ভালবাসিলে যে এত জ্বালা, এত দুঃখ, তাহা আমি আগে জানিতাম না। সমস্তক্ষণই তো ভয়েই সারা হই, কখন্ কি কাজ করি, যাহা তোমার অপ্রিয় হইতে পারে। যাই হোক্, বন্ধু ! যদি দৈবাৎ তোমার কোন অপ্রিয় কাজ করিয়া ফেলি, তাহা তুমি ক্ষমা করিও—আমাদের বন্ধুতা যেন বিচ্ছিন্ন না হয়। আমি সুখসম্পদ কিছুই চাহি না, যদি তোমাকে নিত্যসঙ্গী পাই। আমার গর্ব্বগুমর সমস্তই গিয়াছে—এখন তুমি আমাকে তোমার বন্ধু বলিয়া গ্রহণ কর—তাহাতেই কৃতার্থ হইব।

১৩। শান্তিভিক্ষা।

বন্ধু গো ! আর তো পারি না। প্রাণের ভিতর অশান্তি উদ্বেলিত হইয়া উঠিতেছে। যতই চাই অশান্তিকে দমনে রাখিতে, অশান্তি যেন ততই ফুটিয়া উঠিতে চায়। কেন ?—জানি, তুমিই আমার জীবনের একমাত্র কর্ণধার, তবু কেন অশান্তি সজোরে আক্রমণ করে ? এই অশান্তির জ্বালায় কতই ছুটিয়া ছুটিয়া বেড়াই—এ কাজে সে কাজে কত কাজেই না হাত দিই—তবু তো প্রাণ হইতে অশান্তিকে তাড়াইতে পারি না ? কেন বন্ধু—কেন ? তোমার পার্শ্বে যখন বসিবার দুদণ্ড অবসর পাই, তখনই যাহা একটু শান্তি পাই ; তোমা হইতে একটুখানি সরিয়া গেলেই শতবিধ কাজের কথা আসিয়া পড়ে। আমি তোমার চোখে চোখ রাখিয়া কাজ করি বটে, কিন্তু প্রাণের ভিতর সমস্তক্ষণই ধুকফুকানি হইতে থাকে—সর্ব্বদাই একটা ভাবনা হইতে থাকে যে, আমি ঠিক তোমার আদেশমত, অভিপ্রায়মত কাজগুলি সমাধা করিতেছি কি না। ধুকফুকানির আর একটা কারণ মনে হয় যে, আমার যাহা কিছু আবশ্যক হয়, তাহা তোমার কাছে চাই—কিন্তু তাহার পরে মনে হয়, পাইব, কি, পাইব না ? বন্ধু ! তুমি আমার প্রাণের বন্ধু বলিয়াই আমার যাহা আবশ্যক, তাহা তোমার কাছেই ভিক্ষা করি। আমি ঠিক করিয়াছি—আমি সংসারে কাহারও নিকট ভিক্ষার জন্য হাত পাতিব না। তোমার নিকট ভিক্ষা করিবার আর একটী কারণ এই যে, ভিক্ষা করিতে গেলেই তো আগে তোমার কাছে দাঁড়াইতে হইবে। তোমার কাছে দাঁড়াইলে, বন্ধু ! তুমি যে প্রকার আদর কর, আমার উপর তোমার যে প্রকার স্নেহদৃষ্টি নিক্ষেপ কর, তাহাতে মনে হয়, আমি বুক চিরিয়া আমার সমুদয় প্রাণখানি তোমার হাতে তুলিয়া দিই। কি মধুর হাসি যে তুমি হাস, এ সংসারে একমাত্র জননীর হাসি ব্যতীত আর কোথাও তাহার তুলনা পাই না। তখন আমার সমুদয় প্রেম সমুদয় ভালবাসা আমি মনে মনে তোমারই চরণে নিবেদন করিয়া তবে সুখ পাই আরাম পাই। বন্ধু ! বন্ধু ! আমি আর আমার হৃদয়কে উপড়াইতে পারিতেছি না—তুমি তোমার হাতে তাহা উপড়াইয়া লও—তোমার দেওয়া ব্যথায় আমি জীবনলাভ করি। হৃদয়টীকে লইবার সঙ্গে সঙ্গে তোমার স্নেহপ্রেমের উপর যদি আমার প্রাণের এককোণে এতটুকু সংশয় থাকে, তবে সে সংশয়টুকুও উৎপাটিত করিয়া ফেল। আমার মনপ্রাণ একটুখানি শান্তিলাভ করুক ; আমি ধুকফুকানির হস্ত হইতে রক্ষা পাই।

পাপ ও তাহার প্রতীকার। *

(শ্রীশিতিকণ্ঠ মল্লিক)

মানুষের জীবন একটী মহা সংগ্রাম-স্থল। মানুষ দ্বিভাবাপন্ন। তাহাতে পশু-ভাব এবং দেব-ভাব, দুই ভাবই আছে। কৈশোরে পদার্পণ করিবার সময়, মানুষ এই দুই ভাবের সন্ধিস্থলে আসিয়া

* ভবানীপুর ব্রাহ্মসমাজের চতুঃসপ্ততিতম জন্মোৎসব উপলক্ষে গত ৮ই আষাঢ় বুধবার, সান্ধ্যোপাসনায় পঠিত।

উপস্থিত হয়। তখন হইতেই তাহার অন্তরে এই দুই ভাবে প্রতি-নিয়ত সংগ্রাম আরম্ভ হয়। পশু-ভাব, মানুষকে এক দিকে লইয়া যাইতে চাহে এবং দেব-ভাব ঠিক তাহার বিপরীত দিকে তাহাকে আকর্ষণ ক'রে। "শ্রেয়শ্চ প্রেয়শ্চ মনুষ্যমেতস্তৌ সম্পরীত্য বিবিনক্তি ধীরঃ। তয়োঃ শ্রেয় আদনানস্য সাধু ভবতি হীয়তেঽর্থাৎ য উ প্রেয়োবৃণীতে॥" পশুভাব যে পথে যাইতে বলে তাহা প্রেয়—তাহা আপাত-মনোরম। কারণ ইন্দ্রিয়সুখ—বিষয়সুখ তাহার লক্ষ্য। দেবভাব যে দিকে আকর্ষণ করে, তাহাই মানুষের পক্ষে শ্রেয়। যেহেতু তাহা মানুষকে সত্যের পথে—স্বর্গের পথে—অমৃতের পথে লইয়া যায়। প্রেয় ক্ষণভঙ্গুর ক্ষয়িষ্ণু সুখ মানুষের সম্মুখে ধরে। শ্রেয় অক্ষয় শান্তিসুখ—ব্রহ্মের সহিত নিত্য সহবাস-জনিত ভূমানন্দ, প্রেমানন্দ, ব্রহ্মানন্দ আনিয়া দিতে চাহে। একটী দৃষ্টান্ত—কখন হয়ত একটা মিথ্যা কথা বলিলে, একটু প্রবঞ্চনা করিলে একটা বিষয় লাভ হয়,অথবা কোন বিষয় রক্ষা পায়। এই সময় অসুর ভাব মিথ্যা কহিতে বা প্রবঞ্চনা করিতে প্রবৃত্তি দিতে থাকে ; এবং অপর দিক্ হইতে দেবভাব তাহাকে প্রতিনিবৃত্ত করিবার চেষ্টা করে। এই সংগ্রামে বিবেক মানুষের সহায় হয়। কিন্তু তথাপি, অনেক সময়ে অসুর জয়লাভ করে এবং মানুষ নিষিদ্ধ পাপ কার্য্য করিয়া ফেলে। এই প্রকারে মানবাত্মায় পাপের উৎপত্তি হয়। পাপগ্রস্ত হইয়া মানুষ পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করে না। প্রকৃত প্রস্তাবে, ওল্ড টেষ্টামেন্টের ঐ উক্তি, একটী সুন্দর আখ্যায়িকা (parable) মাত্র। বালক-বালিকারা পাপশূন্য, নির্ম্মল এবং সরল-স্বভাব। মহামুনি যিশু বলিয়াছেন, "Suffer the little children to come unto me and forbid them not, for such is the kingdom of God." (Mark x. 14) ছোট ছোট বালক-বালিকাদিগকে আমার নিকট আসিতে দাও, নিষেধ করিও না ; কারণ স্বর্গরাজ্য উহাদেরই মতন। ওল্ড্ টেষ্টামেন্টের ঐ উক্তি স্বয়ং ঈশাই খণ্ডন করিয়াছেন। মানুষের জীবনে, সংগ্রাম না থাকিলে, তাহাতে এবং অপরাপর জীবে কোন প্রভেদ থাকিত না। দুঃখ-দারিদ্র্যের সহিত সংগ্রাম না থাকিলে, সুখ-স্বচ্ছন্দতার আস্বাদন এত মিষ্ট লাগিত না। সংগ্রামের দ্বারা অসত্যকে পরাভূত করিতে না হইলে, সত্যের এবম্প্রকার মর্য্যাদা থাকিত না। পাপের সহিত সংগ্রাম করিয়া জয়লাভ করিতে না হইলে, ধর্ম্মজীবনের এতাধিক গৌরব থাকিত না। সংগ্রামবশতই মানুষের জীবনে পতন ও উত্থান লক্ষিত হয় ; মানুষ পড়ে এবং উঠে। কিন্তু যে ক্রমাগত পড়ে, তাহার উঠিবার শক্তি ক্রমশঃ লোপ পাইতে থাকে। তখন সে লঘু হইতে গুরুতর পাপপঙ্কে ডুবিয়া মরে। সে চুরি, ডাকাতি, অবলা নারীর উপর পাশব অত্যাচার এবং নরহত্যা পর্য্যন্ত করিতে কুণ্ঠিত হয় না। তাহাকে নরপশু বলে—আকারে মানুষ, কিন্তু আচরণে হিংস্র পশু অপেক্ষাও জঘন্য। যিনি প্রথম প্রথম পড়িয়া আর পড়েন না—ক্রমশঃ ঊর্দ্ধে, উন্নতির এক সোপান হইতে উচ্চতর সোপানে উঠিয়া যান, প্রলোভনে বিকলচিত্ত হন না, তিনিই মানুষ-দেবতা—নর-হরি—ব্রহ্মের ভাগ্যবান প্রিয় পুত্র বা কন্যা। বিনা সাধনে, মানুষ এই উন্নত স্থানে উপনীত হইতে পারে না। সঙ্গীত, বাদ্য ও চিত্রবিদ্যা শিক্ষা করা, জ্ঞানোপার্জ্জন ও ধনোপার্জ্জন করা, কত পরিশ্রম ও সাধনাসাপেক্ষ। আর পাপ-সংগ্রামে জয়ী হইয়া, ব্রহ্মের দিকে অগ্রসর হইয়া, তাঁহাকে ধরা, বিনা সাধনে সম্ভব হইতে পারে ?—কখনই না।

ব্রহ্মযজ্ঞ।

মানুষের স্বভাব এই যে, চিরদিন এক প্রকার অবস্থা তাহার ভাল লাগে না। এক প্রকার আহার পরিচ্ছদ, এক স্থানে বাস এবং একই জলবায়ু, তাহার তৃপ্তিকর হয় না। ব্রহ্মের সৃষ্টি বিচিত্র। মানুষ বিচিত্রতা ও পরিবর্ত্তনের জন্য লালায়িত। সাধন সম্বন্ধেও ঠিক ঐরূপ ; ব্রহ্মপূজা একটী সাধন। প্রায় প্রতি হিন্দু গৃহস্থের বাটীতে দেবতা আছেন ; তাঁহার নিত্য পূজা হইয়া থাকে। কিন্তু তাহা পুরাতন হইয়া পড়ে। সুতরাং তাহাতে মন তৃপ্তি মানে না। পরিবারস্থ সকলে, তাহাতে যোগ দেন না। সেইজন্য নৈমিত্তিক পূজার ব্যবস্থা হইয়াছে। তাহা কেবল সেই পরি-

বারের নহে, সমস্ত গ্রামের ও নিকটবর্ত্তী লোকালয়ের আনন্দভূমি হয়। নৈমিত্তিক পূজার ইহা এক প্রধান উদ্দেশ্য। বৈদিক ঋষিগণ নিত্যপূজা ভিন্ন মধ্যে মধ্যে যাগ-যজ্ঞ করিতেন। ব্রহ্মবাদীও প্রতিদিন অন্ততঃ দুই সন্ধ্যা ব্রহ্মপূজা করিয়া থাকেন; তদ্ভিন্ন সাধকমণ্ডলীর সঙ্গে সাপ্তাহিক পূজা করেন। কিন্তু তাহাতে পরিতৃপ্ত না হইয়া, আবার ব্রহ্মোৎসবের আয়োজন করেন। ঐ সকল ব্রহ্মোৎসব, এক-একটী ব্রহ্ম যজ্ঞ। ইহা আধ্যাত্মিক ব্যাপার। ব্রহ্ম অশরীরী, জ্ঞান-স্বরূপ, চৈতন্যময় পরমাত্মা। মানবাত্মাও নিরবয়ব। তাহার রিপুগণ—পাপ-তাপ, মোহ-মায়া, এবং দয়া, প্রেম, ভক্তি ও কৃতজ্ঞতা—সকলই নিরাকার। সুতরাং ব্রহ্মযজ্ঞ আধ্যাত্মিক ভিন্ন হইতেই পারে না। ইহাতে জড়ভাব কোনও প্রকারে আসিতে পারে না। স্বয়ং ব্রহ্মই এ যজ্ঞের যজ্ঞেশ্বর। এ যজ্ঞে, যজ্ঞকাষ্ঠ আহরণ করিতে হয় না। যজ্ঞকুণ্ড খনন করিতে হয় না। যজ্ঞাগ্নি প্রজ্বলিত করিতে হয় না। ঘৃত, দধি, ক্ষীর, নবনীত প্রভৃতি উপাদেয় খাদ্যসামগ্রী আহুতি দিবার এবং হোতার আবশ্যক হয় না। প্রত্যেক সাধকই হোতা। অতএব ইহা আধ্যাত্মিক ক্রিয়াপূর্ণ। সরল বিশ্বাস, বিশুদ্ধ জ্ঞান, অকৃত্রিম প্রেম, ভক্তি, কৃতজ্ঞতা এবং কাতর প্রার্থনা এ যজ্ঞের উপকরণ। পাপমুক্ত এবং শুদ্ধচিত্ত হইবার জন্য, সেই "শুদ্ধমপাপবিদ্ধং" পরব্রহ্মের চরণ-তলে উপনীত হওয়া এই যজ্ঞের উদ্দেশ্য। মোহ-জনিত পাপের প্রতীকার লাভের অভিপ্রায়ে ইহা একটী প্রধান সাধন।

পাপের প্রতীকার।

ব্রহ্ম-যজ্ঞ একটী সাধন-ক্ষেত্র। শুধু আরাধনা প্রার্থনা এবং সঙ্গীতে ইহা উদ্‌যাপন করিলে, ইহার মহৎ উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে না। পাপই মানবাত্মার সর্ব্বনাশ করে। আমরা কেন পরমাত্মাকে জ্ঞাননেত্রে দেখিতে পাই না? কেন তাঁহাকে আপনার অন্তর-বাহিরে উপলব্ধি করিতে পারি না? স্বচ্ছ সরোবর-বক্ষ পঙ্কিল অথবা চঞ্চল হইলে, তাহাতে কোনও পদার্থের প্রতিবিম্ব দেখা যায় না—বালুরাশি স্থানান্তরিত না করিলে, অন্তঃসলিলা ফল্গুনদীর নির্ম্মল জল পাওয়া যায় না—পাপ-কলুষিত মানবাত্মা দেদীপ্যমান পরব্রহ্মকে দেখিতে সক্ষম হয় না—তাঁহার সত্য-সুন্দর-মঙ্গল মুখচ্ছবি তাহাতে প্রতিফলিত হয় না। পাপই অন্তরায়—পাপই পরমাত্মাকে আড়াল করিয়া দাঁড়ায়। ব্রহ্মযজ্ঞকে আমাদের পাপ-মোচনের উপায় করা চাই। ব্রহ্ম জ্যোতিষ্মান্ মহাপুরুষ। প্রজ্বলিত হুতাশনের ন্যায় তিনি আমাদের অন্তরাত্মায় ও শরীরের শিরায় শিরায় বর্ত্তমান। সেই হুতাশনের শুভ্র জ্যোতিঃ আমাদের অন্তর-বাহির আলোকময় করিয়া রহিয়াছে। অগ্নি সমস্ত মলা ভস্মীভূত করিয়া সকল দ্রব্যকে পরিশুদ্ধ করে। খাদ-মিশ্রিত স্বর্ণ-রৌপ্য, সুনিপুণ স্বর্ণকার কর্ত্তৃক অগ্নি-যোগে বিশুদ্ধ হয়। লোলজিহ্ব সর্ব্বভুক্ ব্রহ্মাগ্নি আমাদের অপবিত্রতা ও পাপরাশি দগ্ধবিদগ্ধ করিয়া আত্মাকে বিমল করিবে। যজ্ঞক্ষেত্রে আমাদের পাপ, তাপ, মলিনতা ও দুর্ব্বলতা সেই ব্রহ্মহুতাশনে আহুতি দিতে হইবে।

আহুতি—কি কি আহুতি দিতে হইবে?

স্বার্থপরতা মানুষের বিষম শত্রু। স্বার্থ-সাধন জন্য মানুষ না পারে এমন কর্ম্মই নাই। মিথ্যা কথা, প্রবঞ্চনা ও পরদ্রোহিতার মূলে স্বার্থপরতা। স্বার্থ-সাধন-কল্পে মানুষ এ সকলই করিতে প্রস্তুত। আপন প্রয়োজনে প্রতিবেশীর নিকট হইতে ব্যবহারোপযোগী দ্রব্য-সামগ্রী আমরা লই এবং কার্য্য সমাপনান্তে, পুনঃ পুনঃ না চাহিলে, তাহা ফিরাইয়া দেই না। যাহারা আমার নিকট অর্থ পাইবে, ডাকিয়া তাহাদের ন্যায্য প্রাপ্য পরিশোধ করা দূরের কথা, বার বার তাগাদা না করিলে দেই না। জনসমাজে কত প্রকার অভাব, রোগ ও যন্ত্রণা; অথচ আপনাকে লইয়া আমরা এত ব্যস্ত, সে দিকে দৃষ্টিপাত করি না। সর্ব্বাগ্রে এই স্বার্থপরতাকে "ব্রহ্মাগ্নয়ে স্বাহা" বলিয়া আহুতি দিতে হইবে।

রিপুগণ মধ্যে কাম ও ক্রোধ বড়ই ভয়ানক। আমরা রমণীর মুখশ্রীতে ব্রহ্মেরই সৌন্দর্য্য উপলব্ধি করিয়া সর্ব্বদা পবিত্র দৃষ্টিতে তাহা অবলোকন করিতে সক্ষম হই না; ক্রোধের হস্ত হইতে নিষ্কৃতি পাই না। ক্ষমা ও ধৈর্য্য এখনও অভ্যাস হয়

নাই। ব্রহ্মাগ্নিতে এই কাম ও ক্রোধকে আহুতি দিতে হইবে।

পরনিন্দা ও পরগ্লানিতে, মানুষ সাতিশয় আনন্দ লাভ করে। আমা অপেক্ষা কেহ গুণে বা জ্ঞান-ধর্ম্মে বড়, ইহা সহজে বিশ্বাস করিতে চাহি না। অপূর্ণ, সীমাবদ্ধ, ক্ষুদ্র মানুষ যে একেবারে দোষশূন্য হইতে পারে না, ইহা ভুলিয়া গিয়া—গুণ না দেখিয়াই—তাহার কেবল ছিদ্রানুসন্ধান করিতে আমাদের মন স্বতঃই ধাবিত হয়; এমন কি, খ্যাতনামা মহাত্মারাও আমাদের নিকট অব্যাহতি পান না। পাপপুণ্যের বিচারক অন্তর্যামী ব্রহ্ম, এ কথায় বিশ্বাস স্থাপন করিয়া পরগ্লানি করিতে নিবৃত্ত হই না। "ব্রহ্মাগ্নয়ে স্বাহা" বলিয়া পরনিন্দা-রূপ মহাপাপকে আহুতি দিতে হয়।

অহঙ্কার অপেক্ষা রিপু নাই—"নাহঙ্কারাৎ পরো রিপুঃ"। অহঙ্কার এমন অজ্ঞাতসারে মানুষের অন্তরে প্রবেশ করে যে, অতি বিচক্ষণ, বিজ্ঞ ও বুদ্ধিমান ব্যক্তিও অনেক সময়ে তাহার হাত এড়াইতে পারেন না। যাহার অহঙ্কার করিবার কিছুই নাই—রূপ নাই, বিদ্যা-বুদ্ধি নাই, ঐশ্বর্য্য নাই এবং পুণ্য নাই, সেও আত্মশ্লাঘা করিতে ছাড়ে না। এই দুর্ব্বলতা আহুতি দেওয়া চাই।

আমরা ঘোর সংসারাসক্ত। বিষয়সুখ আমাদের জীবনের সর্ব্বস্ব ধন। হৃদয়-সিংহাসনে অবিনাশী ব্রহ্মকে না বসাইয়া, সেই স্থানে অস্থায়ী অসার সংসারসুখকে স্থাপিত করিয়াছি। কোনও দুই পদার্থ এক সময়ে, একই স্থান অধিকার করিয়া থাকিতে পারে না। বিষয়বিরাগ না হইলে ব্রহ্মানুরাগ হয় না। এই সত্য জানিয়াও জানি না, বুঝিয়াও বুঝি না। ব্রহ্মের আদেশে, কর্ত্তব্য-জ্ঞানে, সংসার-ধর্ম্ম পালন করি না। তাঁহাকে ভুলিয়া সুখ অন্বেষণ করি। এই কারণে আমাদের এত দুর্গতি। কাজেকাজেই অনিত্য বিষয়-সুখ হারাইলে হাহাকার করি—শোকদুঃখে মুহ্যমান হইয়া, ব্রহ্মের মঙ্গলস্বরূপে সন্দিহান হই। এই বিষয়লালসা ব্রহ্মাগ্নিতে আহুতি দিতে হইবে।

অনুতাপ।

শুধু আহুতি দিলে হইবে না। কৃত পাপ জন্য অনুতাপ চাই। অনুতাপ এই সাধনের একটী প্রধান অঙ্গ। পাপের প্রায়শ্চিত্ত অনুতাপ ভিন্ন হয় না। আধ্যাত্মিক রাজ্যে কীট বা অগ্নিপূর্ণ নরক নাই। উত্তপ্ত লৌহদণ্ড পাপীর মস্তকে নিপতিত হয় না। অশরীরী আত্মার শারীরিক দণ্ড হইতে পারে না। অনুতাপাগ্নিতে আত্মার শোধন হয়। প্রকৃত আত্মগ্লানি সহজ ব্যাপার নহে। তাহা মানুষকে অস্থির করে। পানাহারে রুচি থাকে না। নিদ্রা হয় না। পাপ মার্জ্জনা করিলেন, যতক্ষণ ব্রহ্মের এই আশ্বাসবাণী প্রাণে বুঝিতে না পারা যায়, ততক্ষণ কিছুতেই শান্তি পাওয়া যায় না। ঐ বাণী শুনিলে, তবে আত্মা সুস্থ ও প্রকৃতস্থ হইবে। এই প্রকার অনুতাপ পরিত্রাতার নিকট ভিক্ষা করা আবশ্যক।

সঙ্কল্প।

রিপুগণকে ব্রহ্মাগ্নিতে আহুতি দিলাম। আত্মগ্লানির জন্য পাপ-তাপহারী ব্রহ্মের নিকট প্রার্থনা করিলাম। কিন্তু প্রলোভনে পড়িয়া আমাদের আবার পতন হইতে পারে। সেইজন্য প্রতিজ্ঞার বল (willforce) আবশ্যক। কিছুতেই কুচিন্তায় কুআলাপে, কুসংসর্গে ও কুকর্ম্মে লিপ্ত হইব না, এরূপ দৃঢ়সংকল্প চাই। এই সাধুসঙ্কল্প শুদ্ধস্বরূপ পরব্রহ্ম নিশ্চয়ই সিদ্ধ করিবেন। সাধক বুঝিতে পারুন আর না পারুন, ইহা ধ্রুব সত্য যে, প্রকৃত অনুতাপ এবং সাধু সঙ্কল্পের পশ্চাতে, স্বয়ং ব্রহ্ম বর্ত্তমান থাকেন। অপূর্ণ, ক্ষুদ্র মানুষের কি সাধ্য যে, ব্রহ্মের অমোঘ সাহায্য ব্যতীত, পাপের সহিত যুদ্ধে—সংসার-সংগ্রামে, জয়ী হইতে পারে?

ব্রহ্ম-কৃপা।

সর্ব্বোপরি ব্রহ্মকৃপার জন্য সরল প্রার্থনার প্রয়োজন। ব্রহ্মকৃপা মানুষের একমাত্র বল ও ভরসা। তাঁহার চরণে আত্ম-সমর্পণ করিতে হইবে। আত্মার কল্যাণ উদ্দেশে, তাঁহার বিধান সকল অবনত মস্তকে গ্রহণ করিতে হইবে। আমাদের উদ্ধারের জন্যই তাঁহার সব ব্যবস্থা, ইহা আমরা বুঝিয়া উঠিতে না পারিলেও, তাঁহার পদে নির্ভর করত, বুক পাতিয়া, পিঠ পাতিয়া, তৎসমুদয় সহ্য করিতে হইবে। ব্রহ্মকৃপা ভিন্ন জীবের গত্যন্তর নাই।

পঞ্চব্রাহ্মণ ও সাতশতী।

(শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর)

কোন্ তিনবার পঞ্চ ব্রাহ্মণ আসেন ?

আদিশূরের কালনির্ণয় উপলক্ষে যে সকল মত আলোচনা করিয়া আসিয়াছি, সেই সকল মতে উল্লিখিত সংখ্যাগুলি সম্বতবাচী ধরিলে আমরা বিশেষভাবে পঞ্চ ব্রাহ্মণ আসিবার মোটামুটি তিনটী কালবিভাগ দেখিতে পাই—(১) সম্বত সপ্তম শতাব্দীর শেষাশেষি (আনুমানিক ৬৭৫ সম্বত); (২) সম্বত দশম শতাব্দীর মাঝামাঝি (৯৩৯ সম্বত ৯৫৪ সম্বতের মাঝামাঝি); এবং (৩) সম্বত দশম শতাব্দীর শেষাশেষি (৯৮৯ সম্বত-৯৯৯ সম্বত)। আমরা দেখি যে, সমস্ত সংখ্যাগুলি সম্বতবাচী ধরিলে জনশ্রুতি ও কুলগ্রন্থসমূহের মধ্যে সুসঙ্গতি ও সামঞ্জস্য সুন্দর রক্ষিত হয়। সম্বত দশম শতাব্দীর শেষাশেষি অন্তত একবার পঞ্চ ব্রাহ্মণ আসিয়াছিলেন, এই মত যাঁহারা পোষণ করেন, তাঁহারা প্রায় সকলেই বলেন যে, ঐ সময়ে ভট্টনারায়ণপ্রমুখ পঞ্চব্রাহ্মণই আসিয়াছিলেন। যাঁহারা অপর দুই সময়ে পঞ্চব্রাহ্মণের আগমন সমর্থন করেন, তাঁহারা প্রায় সকলেই ক্ষিতীশপ্রমুখ পঞ্চব্রাহ্মণেরই আগমন সমর্থন করিয়াছেন। আমাদের কিন্তু কুলগ্রন্থ ও জনশ্রুতি আলোচনার ফলে এই অনুমান হয় যে, সম্বত সপ্তম শতাব্দীর শেষাশেষি একবার যে পঞ্চব্রাহ্মণ আসেন, তাঁহাদের নাম কুলগ্রন্থকারেরা বিস্মৃত হইয়া কেবল গোত্রমাত্র উল্লেখ করিয়াছেন। পরে দশম শতাব্দীর মাঝামাঝি একবার ক্ষিতীশপ্রমুখ পঞ্চব্রাহ্মণ আসিয়াছিলেন ; এবং দশম শতাব্দীর শেষাশেষি তৃতীয়বারে ভট্টনারায়ণপ্রমুখ পঞ্চব্রাহ্মণ আসিয়াছিলেন। ক্ষিতীশপ্রমুখ এবং ভট্টনারায়ণপ্রমুখ উভয় পঞ্চব্রাহ্মণই আদিশূরের রাজত্বকালের ভিতরে তাঁহারই আহ্বানে আসিয়াছিলেন।

শূদ্রক রাজার কথা।

আমরা উক্ত আলোচনায় দেখিয়া আসিয়াছি যে, কুলতত্ত্বার্ণব গ্রন্থের ৫৪ম শ্লোকে ৬৭৫ বৎসরে পঞ্চব্রাহ্মণের বঙ্গদেশে আসিবার কথা উল্লিখিত হইয়াছে। সেই স্থলে আমরা এই সংশয়ও ব্যক্ত করিয়াছি যে, সম্ভবত কুলতত্ত্বার্ণব গ্রন্থ সমগ্র পাওয়া যায় নাই—পাওয়া গেলে হয়তো দেখা যাইত যে, গ্রন্থকার বিভিন্ন বৎসরে বিভিন্ন থাকে পাঁচ পাঁচ গোত্রের পাঁচ পাঁচ ব্রাহ্মণ আসিবার কথা বলিতে চাহিয়াছেন। ঐ গ্রন্থের একাদশ ও দ্বাদশ শ্লোকে দেখা যায় যে, "পুরা অর্থাৎ পূর্ব্বকালে অন্ধ্রবংশোদ্ভব অপুত্রক রাজা শূদ্রক কর্ত্তৃক পুত্রেষ্টি যজ্ঞের কারণেই সারস্বত দেশ হইতে ব্রাহ্মণেরা সমানীত হইয়া যজ্ঞান্তে এই ব্রাহ্মণবর্জ্জিত বঙ্গদেশে স্থাপিত হইয়াছিলেন" *। ইহার পরে ৫৪ম শ্লোকে ৬৭৫ বৎসরে পঞ্চব্রাহ্মণের আগমন যাহা উল্লিখিত হইয়াছে †, আমাদের বলবৎ অনুমান হয় যে, এই বৎসরের সহিত ঐ শূদ্রকসমানীত ব্রাহ্মণদিগের আগমনের বিশেষ সম্বন্ধ আছে। সম্ভবত প্রতিলিপি করিবার সময় উক্ত বৎসরের উপর ক্ষিতীশ প্রভৃতির আগমন চাপাইয়া দেওয়া হইয়াছে। "বিপ্রবর্জ্জিতে" বিশেষণের দ্বারা প্রতিপন্ন হইতেছে, শূদ্রক রাজার সময় বঙ্গদেশে বৌদ্ধধর্ম্মের অত্যন্ত প্রাবল্য হইয়াছিল—বৈদিক ধর্ম্ম তিরোহিতপ্রায় হইয়াছিল। আর, বঙ্গদেশে সারস্বত ব্রাহ্মণ স্থাপনের কথা হইতে বুঝা যায় যে, যে সময়ে বঙ্গদেশে বৌদ্ধধর্ম্ম অত্যন্ত প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল, সে সময়ে শূদ্রকনামে অন্ধ্রবংশীয় এক বঙ্গেশ্বর ছিলেন। ‡

সারস্বত ও সপ্তসতী।

শূদ্রকসমানীত এই সারস্বত ব্রাহ্মণেরা কালে, অন্ততঃ আদিশূরের সময়ে, সপ্তসতী ব্রাহ্মণে পরিণত হয় §। এদেশে "গাঁই" বা গ্রামীণ হইবার

---

* পুরাহ্ন্ধ্রবংশজেনৈব শূদ্রকেণ মহাত্মনা।
অপুত্রকেণ ভূপেন পুত্রেষ্টিযজ্ঞহেতবে। ১১
দেশাৎ সারস্বতাৎ রম্যাৎ সমানীয় প্রযত্নতঃ।
যজ্ঞান্তেঽস্মিন্ বঙ্গদেশে স্থাপিতা বিপ্রবর্জ্জিতে। ১২

† কোলাঞ্চতো দ্বিজবরা মিলিতা হি বঙ্গে।
শাকে শরাক্ষিঋতুমে জলদগ্নিতুল্যাঃ। ৫৪

‡ আমরা দেখি, ৬১৯ খৃষ্টাব্দে সম্পাদিত তাম্রশাসনে "মহারাজাধিরাজ শশাঙ্ক চতুরুদধিসলিল-বীচি-মেখলা-নিলীন-সদ্বীপ-গিরি-পত্তনবতী বসুন্ধরায়" অধীশ্বর বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছেন। Epigraphia Indica Vol VI P 143—গৌ. রা. ১১পৃঃ। এই শশাঙ্কই অন্ধ্রবংশীয় গৌড়পতি শূদ্রক নন তো? একই রাজা বিভিন্ন নামধারী নন তো ?

§ (ক) "সারস্বতদেশীয়বিপ্রাঃ সপ্তশতীতি ভাষায়াং কথ্যন্তে" —৺ বংশীধর বিদ্যারত্ন সংগৃহীত ; প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব শ্রীনগেন্দ্রনাথ প্রণীত ব্রাহ্মণকাণ্ড ১১৪ পৃঃ।

(খ) "এতে সারস্বতদেশাৎ গৌড়রাজ্যে সমাগতাঃ।" ঐ ঐ

প্রণালী হইতে দেখা যায় যে, "গ্রাম" হইতেই "গাঁই"য়ের উৎপত্তি হইয়া থাকে। সেই কারণে আমাদের অনুমান হয় যে, ঐ সারস্বত ব্রাহ্মণেরা সম্ভবত সপ্তশতী নামক এক বৃহৎ গণ্ডগ্রামে * বাস করাতে সপ্তশতী আখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। অথবা এরূপও হইতে পারে যে, আদিশূরের পূর্ব্বেই ঐ প্রথমাগত সারস্বত ব্রাহ্মণেরা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতে হইতে ক্রমে সাতশতপ্রায় ঘরে বা পরিবারে দাঁড়াইয়াছিলেন। তখন ক্রমশ হয়তো সেই সপ্তশত ঘর হইতে তাঁহাদের গ্রামও সাতশতী নাম পাইল; আবার সেই সাতশতী গ্রাম হইতেই তথাকার সারস্বত ব্রাহ্মণেরাও সাতশতী ডাকনাম প্রাপ্ত হইলেন। উপরে ৭৩পৃষ্ঠার পাদটীকায় উদ্ধৃত বংশীবিদ্যারত্নসংগৃহীত এই বিষয়ক কারিকার সত্যতা অনেকের মতে সন্দেহের অতীত না হইলেও উহা হইতে এটুকু বুঝা যায় যে, কুলগ্রন্থকারদের মধ্যে সারস্বত ও সপ্তশতী ব্রাহ্মণদের পরস্পরের একটা ঘনিষ্টতম সম্বন্ধের অস্তিত্ব জানা ছিল †।

বীরসিংহের নিকট সপ্তশতী ব্রাহ্মণ প্রেরণের আখ্যায়িকা।

কুলগ্রন্থে আদিশূর কর্ত্তৃক পঞ্চব্রাহ্মণ আনয়ন সম্বন্ধে এই একটি আখ্যায়িকা লিখিত আছে ‡: 'অন্যান্য দেশ জয় করিয়া আদিশূর কাশীরাজকে অধীনতা স্বীকার করিবার জন্য আহ্বান করিয়া

* বর্ত্তমান "সাতশইকা"—রাঢ়দেশের পূর্ব্বাংশে অবস্থিত। এই সপ্তশতিকা জনপদের কতকাংশ এখন বর্দ্ধমান জেলায় "সাতশতকা" বা "সাতশইকা" পরগণায় পরিণত হইয়াছে। ইহার বর্ত্তমান সীমা উত্তরে ব্রহ্মাণী নদী, দক্ষিণপূর্ব্ব সীমা ভাগীরথী ও পশ্চিমে সাহাবাদ পরগণা। জরিপের মানচিত্রে এই পরগণা "সাতশতকা" নামে চিহ্নিত হইয়াছে। Indian Atlas Sheet no. 120 ব্রা, কা, ১১৫পৃঃ।

† তদা সপ্তশতীত্যাখ্যাং প্রাপুঃ সারস্বতা অপি ॥ ৪৯শ্লো, কু.-তং

‡ গৌড়েশ্বরো নরবরোঽভবদাদিশূরঃ
নানা বিদেশনৃপতের্ম্মুকুটাঙ্কিতাংঘ্রিঃ।
জেতা বলাদ্দলিতবৈরিকুলঃ কুলীনঃ
দাতাবদাতকুলমাধবশূরসূনুঃ ॥
অঙ্গান্ বঙ্গান্ কলিঙ্গান্ বিবিধ
নৃপবরামাত্তর্জ্জলান্ বিদেশান্।
কর্ণাটং কর্ণকল্পং নরবরভটকৈরন্বিতং কামরূপং ॥
সৌরাষ্ট্রং মাগধাস্তং নৃপমপি জিতবান্ বালবং জানবঞ্চ।
কাশী ইন্দ্রস্থলাভিরানৃপমপি সহসা তস্য সৈন্যাধিকারী ॥

স চৈকদা দূতমাহ—
রে রে দূত সুবুদ্ধিমন্ মম কৃতে কাশীন্দ্রমাশু ব্রজ।
তস্মৈতৎ কথয়স্ব মন্নৃপবরং তূর্ণং তদস্মেরিতং ॥
নো চেদেবমথাস্তু কর্ত্তুমতুলং যুদ্ধং সুসজ্জস্ব ভোঃ।
যেনাহং বিদলীকরোমি চ বলং দন্তীবরং ভাবনং ॥
আকর্ণ্য বাক্যং স নরেন্দ্রযোজ্যং যযৌ দ্রুতং দূতবরশ্চ কাশ্যাং।
দ্বারস্থলং বীক্ষ্য চ তস্য রাজ্ঞঃ প্রোবাচ মাং জ্ঞাপয় হে নরেন্দ্র ॥
কলয় কলয় রাজন্ মদ্বচো বীরসিংহ
ত্বয়ি কথয়িতুমাস্তে চাদিশূরস্য দূতঃ।
কৃত ইতি সহসা স্বং দূতমত্রানয়স্ব
বিহিতমিদমবোচৎ চাশুরাজসভায়াং ॥
অথ নৃপবরমগ্র্যং রাজসিংহাসনস্থং
তুরগগজেন্দ্ররাজভিঃ পত্তিভিশ্চ।
ত্রুহিণবদনজাতৈর্ব্বেষ্টিতং প্রাগ্‌দেশং
দ্বিজনরকুলমৌক্তৈর্দ্দর্শয়ামাস দূতং ॥
রাজানং তং নমস্কৃত্য যথাযোগ্যং কৃতাঞ্জলিঃ।
সভাপ্রভাবং কীর্ত্তিঞ্চ রাজ্ঞোঽসৌ বক্তুমর্হসি ॥
কস্ত্বং প্রস্থাপিতঃ কেন কুতো বা ব্রূহি তত্ত্বতঃ।
ইতি রাজ্ঞা স পৃষ্টোঽসৌ ততঃ প্রোবাচ সত্বরং ॥
দূতোঽহং নৃপবংশমৌক্তিকমণিশ্রীরাদিশূরোঽহং
তস্যাজ্ঞামধিগম্য সাম্প্রতমিহায়াতঃ সভায়াস্তব।
তস্যাকর্ণয় দেহি যৎসমুচিতং শীঘ্রং করং কাময়ে
নো চেৎ শক্তিসমন্বিতো ভব ময়া যুদ্ধায় ভূপাত্মজ ॥
তচ্ছ্রুত্বা বীরসিংহঃ ক্রোধেনারক্তনয়নো বভূব বীরসিংহনরনোপদেশতঃ কৌশলং কিমপি চিন্তয়ন্নাহ।
আদিশূরনৃপচক্রবর্ত্তিনো দূতমাক্ষিপত কোপি কোপতঃ।
বীরসিংহদূতোঽপি আদিশূরদূতং প্রতি আহ ॥
মত্তভাবশগতেন সম্প্রতং বীরভাবমধিগম্য গর্জ্জিতং।
বীরসিংহনৃপসন্নিধাবাদিশূরকরিণা কিমকারি ॥
ততঃ বীরসিংহেন লিপিঃক্রিয়তে।
স্বস্তি শ্রীযুতকাদিশূরনৃপতৌ বর্গে সমুজ্জৃম্ভতে
শ্রীমন্ বীরমহীপতে যদি ভবান্ যুদ্ধং ময়া সজ্জতে।
আগচ্ছ স্বয়মত্র সম্প্রতি তদা সামন্তসৈন্যান্বিতো
রাজ্যং তে দ্বিজবেদযজ্ঞরহিতং নো মান্যমস্মাদৃশৈঃ ॥
ততঃ প্রণম্য রাজানং লিপিং লব্ধ্বা বিচক্ষণঃ।
আদিশূরং নৃপং নত্বা জ্ঞাপয়ামাস তাং ক্রবং ॥
শ্রুত্বা রোষবশাদশেষনৃপতিশ্রেণীসমভ্যর্চ্চিতো
যোদ্ধাযোদ্ধুমলঞ্চকার নৃপতিঃ শ্রীআদিশূরঃ স্বয়ং ॥
দৃষ্ট্বা তাবদমাত্যবিশ্ববিজয়ী প্রোবাচ বাচং বিভো
বিশ্রামং কুরু তে দ্বিজং নিজবলং কৃত্বা তু যোৎস্যামহে ॥
শ্রুত্বামাত্যবচঃ সসাজ্জতমহাসৈন্যাসঙ্গী প্রভস্থৌ
দূতস্তত্রাহ রাজন্ কুরু মম বচনাদদ্য বিশ্রামমত্র ॥
নেতব্যং ছদ্মভাবং বলমিদমখিলং বীরসিংহদ্বিজেন্দ্রৈঃ
শূদ্রাগর্ভেষু জাতা নরবরভবতস্তত্র বিপ্রে পতন্তাঃ ॥
ততো দূতো রাজানমাহ।
তস্মাত্ত্বং দ্বিজবর্য্যামানয় ততো যুক্তির্ময়া দীয়তে
সম্প্রোতে বৃষবাহনেন সহসা যুদ্ধায় জাতোদ্যমাঃ।
গত্বা তত্র সমাচরন্তু সহসা তদ্রাজ্যভঙ্গং কুরু তদা
ন দ্রোহঃ ক্রিয়তে চ তেন নৃপতে গোব্রাহ্মণানাং যতঃ ॥
ততো রাজা আদিশূরো নিজদেশস্থনিরগ্নিক ব্রাহ্মণান্ আহূয় আজ্ঞাপয়ামাস।
যূয়ং গবারোহণেন শস্ত্রবস্তঃ বীরসিংহপুরে গত্বা সাগ্নিক ব্রাহ্মণান্ আনয়ত। যদি স রাজা সহজে ন ব্রাহ্মণান্ দদ্যাৎ তদা তদ্রাজ্যনাশং ভবদ্ভিঃ কার্য্যমিতি।
ততো বিপ্রা উচুঃ—
রাজংস্ত্বদ্বচনং ন বৈধবচনং যদ্গবারোহণং তৎকর্ত্তুং
নৈব হি সম্মতা বয়মহো নো সিদ্ধশ্চেৎপীড়নং।
কর্ত্তায়ং যদি কর্ম্মধর্ম্মরহিতং কুৎসিতং রাজবাক্যাৎ
স্থানং তত্র ন চাত্র ভূসুরকুলে কর্দ্দণঃ কুত্র চ স্যাৎ ॥
আহ আদিশূরঃ—
আনীতাশ্চ ভবদ্ভিরেব যদি তে সাগ্নিকা বিপ্রবর্য্যা
গোবাহাদিষু দোষতঃ খলু ময়া মোচিতাঃ সাধুকার্য্যাঃ।
যুষ্মৎকার্য্যবিধিঞ্চ তৈঃ সমমহং সঞ্চারয়িষ্যে হিতং
যুষ্মৎসন্নিহিতে ধ্রুবং নিগদিতং চৈতন্ময়াঙ্গীকৃতং ॥
ততো রাজবাক্যং শ্রুত্বা সপ্তশতপরিমিত ব্রাহ্মণা গবারোহণেন চেলুঃ রাজ আজ্ঞয়া।

তাঁহার নিকট দূত পাঠাইলেন। দূতের কথা শুনিয়া কাশীরাজ মহা ক্রুদ্ধ হইলেন এবং "দ্বিজ-বেদযজ্ঞরহিত তোমার রাজ্য আমার মত লোকের নিকট কখনই মান্য নহে" বলিয়া আদিশূরকে যুদ্ধে আহ্বান করিলেন। আদিশূর যুদ্ধসজ্জার আদেশ প্রদান করিলে সেই দূত তাঁহাকে নিবেদন করিল —"আমার এই যুক্তি যে, আপনি কতকগুলি ব্রাহ্মণকে বৃষোপরি স্থাপন করিয়া যুদ্ধার্থে প্রেরণ করুন; গোব্রাহ্মণ দেখিয়া আর সেই রাজা যুদ্ধ করিতে পারিবেন না, কাজেই আপনার জয় হইবে।" তখন রাজা স্বরাজ্যবাসী নিরগ্নিক ব্রাহ্মণ-গণকে ডাকাইয়া তদনুযায়ী আদেশ করিলেন। গবারোহণ ব্রাহ্মণের পক্ষে নিষিদ্ধ বলিয়া সেই সকল ব্রাহ্মণ রাজার আদেশ পালন করিতে অস্বী-কার করায় আদিশূর তাঁহাদিগকে বলিলেন— "আপনারা যদি সাগ্নিক ব্রাহ্মণ আনিতে পারেন, তবে আমি আপনাদের নিকট সত্য অঙ্গীকার করি-তেছি যে, সাধুকার্য্য দ্বারা আপনাদিগকে গোবাহন-জন্য দোষ হইতে মুক্ত করিয়া দিব।" রাজার আশ্বাসবাক্যে সপ্তশত ব্রাহ্মণ গোবাহনে যাত্রা করিলেন। তাঁহারা বীরসিংহপুরে গিয়া বীরসিংহের রাজ্যনাশে প্রবৃত্ত হইলেন। বীরসিংহ তখন পঞ্চ সাগ্নিক ব্রাহ্মণকে গৌড়দেশে পাঠাইলেন। আদি-শূরের মৃত্যুসময়ে সেই সপ্তশত নিরগ্নিক ব্রাহ্মণের মধ্যে ২৮জন জীবিত ছিলেন।

আখ্যায়িকা উল্লেখের কারণ।

এত সহজে যদি কান্যকুব্জরাজ্য জয় করা

যাইত, তবে তো ভাবনাই ছিল না। বীরসিংহের সহিত আদিশূরের এই যুদ্ধসম্বাদ এতই হাস্যকর যে, ইহা উল্লেখযোগ্যই নহে। আশ্চর্য্য এই যে, ধ্রুবানন্দমিশ্রের পুত্র সর্ব্বানন্দমিশ্রও সম্ভবত বাচ-স্পতিমিশ্রের উক্তি অনুসরণ করিয়া তাঁহারও গ্রন্থে এই আখ্যায়িকাকে স্থান দিয়াছেন *। আমরা

পৃষ্ঠস্থলে বাণধনুর্দ্ধানাঃ বৃষাধিরূঢ়াঃ সমরে নিবিষ্টাঃ
দ্বিজাতয়ঃ সপ্তশতপ্রমাণাঃ শ্রীবীরসিংহস্য পুরে প্রবিষ্টাঃ।
ততস্তত্র তে গত্বা রাজ্যনাশং প্রচক্রু-
স্তদ্দৃষ্ট্বা বীরসিংহস্য দূতো বিজ্ঞাপয়ামাস নৃপং ॥
বৃষারূঢ়াবিপ্রাঃ ক্ষিতিতলে ভবতো রাজ্যনাশং প্রচক্রুঃ
দ্বিজং দত্ত্বা তেভ্যস্তব ধরণীং মন্ত্রিণা চৈবমুক্তং।
সমাহূয় স্বীয়ং দ্বিজবরমসৌ ভূপতি-
স্তং বভাসে প্রযাহি ত্বং গৌড়ে সহ পরিজনৈর্দীয়তে তত্র বৃত্তিঃ ॥
আরুহ্য পঞ্চতুরগান্ অসিবাণতূণকোদণ্ডরম্যকবচাদিশরীরবেশাঃ।
কোলাঞ্চতো দ্বিজবরা মিলিতোহি গৌড়ে
রাজাদিশূরপুরতোজ্জ্বলদগ্নিতুল্যাঃ ॥

অতঃপরঞ্চাদিশূরো মমার। * * ততো দেশস্থ নিরগ্নিক সপ্তশত ব্রাহ্মণানাং মধ্যে অষ্টাবিংশতি দ্বিজাতয়ঃ সন্তি তেভ্যঃ সামগায়িকাদাষ্টাবিংশতি বাসস্থানানি দদৌ ॥ বাচস্পতিমিশ্রের কুল-রাম—ব্রা॰ কা॰ ৮১-৮২ পৃষ্ঠা।

এই উদ্ধৃত অংশের পাঠ বিশুদ্ধ বলিয়া মনে হয় না—আমি যদ্দৃষ্টং তল্লিখিতং করিয়াছি—লেখক।

* ততো লিপিং নরপতিঃ প্রেরয়ামাস সত্বরং।
কান্যকুব্জেশ্বরশ্রীমদ্ বীরসিংহনৃপান্তিকে ॥ ১৮
* * *
মন্ত্রী দূতমুবাচেদং মূর্খস্তে নৃপতির্ধ্রুবং।
পতিতো বঙ্গদেশস্থ ন শ্রুতঃ স ইতি কচিৎ ॥ ২১
তীর্থযাত্রাং বিনা গচ্ছন্ দ্বিজঃ সংস্কারমর্হতি।
অতো বঙ্গাখ্যদেশেতু ন গমিষ্যন্তি বৈ দ্বিজাঃ ॥ ২২
* * *
ততঃ প্রণম্য রাজানং লিপিং লব্ধ্বা বিচক্ষণঃ।
আদিশূরান্তিকে দূতো হ্যানুপূর্ব্বমবর্ণয়ৎ ॥ ৩৪
শ্রুত্বা রোষবশং গতো নরপতিঃ শ্রীআদিশূরস্ততো
যোদ্ধুন্ যোদ্ধুমরংচকার সহসা হ্যাদেশমেব স্বয়ং।
তজ্জ্ঞাত্বা সচিবাগ্রণীর্নৃপবরং প্রোবাচ কিঞ্চিৎক্ষণং
বিশ্রামং কুরু ভো দ্বিজঃ নিজবলং কৃত্বা তু যোৎস্যাম্যহং ॥৩৫
গোবিপ্রপ্রতিপালকঃ স নৃপতির্ধর্ম্মাত্মনামগ্রণী
স্তস্মাৎ বিপ্রগণান্ স্বরাজ্যনিলয়ানানীয় সংপ্রেরয়।
যুদ্ধার্থং বৃষবাহনেন সহসা দৃষ্ট্বা দ্বিজান্ সৈনিকান্
গোবিপ্রক্ষয়শঙ্কয়া ন নৃপতির্যোদ্ধুং প্রবর্ত্তিষ্যতে ॥ ৩৬
শ্রুত্বামাত্যবচস্ততো দ্বিজগণানাহূয় চোবাচ তান্
ধৃত্বা সৈনিকবেশমেব সমরে গোবাহনেনাধুনা।
যূয়ং গচ্ছত হে ধরামরগণাঃ শ্রীকান্যকুব্জেশ্বরং
জিত্বা কৌশলতঃ সুসাধয়ত মে তূর্ণং মনস্কামনাং ॥ ৩৭
ভূদেবা নৃপতের্নিশম্য বচনং প্রাহুর্নৃপং ধর্ম্মপং
বিপ্রাণাং বৃষবাহনেন গমনং নো বৈধকার্য্যং স্মৃতং।
তস্মাদন্যমুপায়মেব নৃপতে নিশ্চিত্য কার্য্যং কুরু
ভূপৈরগ্রজধর্ম্ম এব সততং সংরক্ষণীয়ো যতঃ ॥ ৩৮
রাজোবাচ কৃতাঞ্জলির্দ্বিজবরান্ শ্রুত্বাতু তেষাংগির
আনীতাশ্চ ভবদ্ভিরেব যদি তে পৃথ্বীস্থরাঃ সাগ্নিকাঃ।
গোবাহাৎ দ্বিজদোষতঃ খলুতদা সংমোচয়িষ্যেহপ্যহং
যুষ্মৎসন্নিহিতে ধ্রুবং নিগদিতং চৈতন্ময়াঙ্গীকৃতং ॥ ৩৯
শ্রুত্বা নৃপস্যাভয়বাক্যমেতৎ বিপ্রাস্ততঃ সপ্তশতপ্রমাণাঃ।
গোবাহনা বাণধনুর্দ্ধানাঃ শ্রীকান্যকুব্জেশপুরং যযুস্তে ॥ ৪০
বেদানুচ্চৈঃ প্রগায়ন্তো রণবেশধরা দ্বিজাঃ।
গোবাহনস্থা যুদ্ধায় সর্ব্বে তেহতিসমুদ্যতাঃ ॥ ৪১
দৃষ্ট্বা তান্ সবিস্ময়ং প্রাহুঃ কান্যকুব্জবলানিচ।
কিংকর্ত্তব্যং রণেহস্মাভিরিতি চিন্তামুপাগমন্ ॥ ৪২
রণোদ্যমাৎ বিনির্বর্ত্ত্য গোবিপ্রবধশঙ্কয়া।
বীরসিংহান্তিকে সর্ব্বং কথয়ামাসুরদ্ভুতং ॥ ৪৩
যুদ্ধে পরাজয়ঃ শ্রেয়ান্ ধর্ম্মসংরক্ষণায় চ।
বিচিন্ত্যৈবং তদা রাজা রণাৎপ্রতিনিবর্ত্তিতঃ ॥ ৪৪
যজ্ঞার্থং ব্রাহ্মণানাঞ্চ প্রেরণায় স ধর্ম্মবিৎ।
অঙ্গীকারং ততঃ কৃত্বা লিপিঞ্চ প্রদদৌধ্রুবং ॥ ৪৫
সেনাপতিস্ততস্তূর্ণং সৈন্যবেশধরৈর্দ্বিজৈঃ।
প্রত্যাগতঃ কান্যকুব্জাদাদিশূরস্য সন্নিধৌ ॥ ৪৬
কথয়িত্বা যথাবৃত্তং দদৌ ভূপায় তল্লিপিং।
পঠিত্বা তাং লিপিং রাজা হর্ষেণ মহতাবৃতঃ ॥ ৪৭
ততঃ সপ্তশতান্ বিপ্রান্ গোবাহাদিজদোষতঃ।
প্রায়শ্চিত্তাদিবিধিনা মোচয়ামাস তৎক্ষণাৎ ॥ ৪৮
সৈন্যবেশধরা বিপ্রা যে সপ্তশতসংখ্যকাঃ।
তদা সপ্তশতীত্যাখ্যাং প্রাপুঃ সারস্বতা অপি ॥ ৪৯—কু-তং

৩
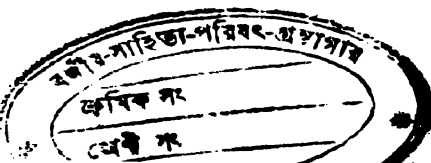
আখ্যায়িকাটীর উল্লেখ করিলাম ইহাই দেখাইবার জন্য যে, এখানে কান্যকুব্জেশ্বর বীরসিংহকে কাশীরও রাজা বলা হইয়াছে; দ্বিতীয়ত, কাশী ও কান্যকুব্জেরই মধ্যবর্ত্তী ভূভাগকে সম্ভবত কোলাঞ্চ বলা হইত। এবং তৃতীয়ত, বৌদ্ধধর্ম্মের পর ব্রাহ্মণ্য-ধর্ম্ম যখন আবার প্রবল হইতে লাগিল, সেই সময়ে সম্ভবত বৌদ্ধপ্রভাবে ব্রাহ্মণ্যহীন * সাতশতী ব্রাহ্মণদিগকে † জনসাধারণের নিকট নিতান্ত উপহাসের পাত্ররূপে দাঁড় করাইবার জন্যই এই আখ্যায়িকার অবতারণা করা হইয়াছে। আমাদের কিন্তু একটা কথা মনে হয় যে, সম্ভবত বীরসিংহের পরাজয়ে সাতশতী ব্রাহ্মণেরা কোন-না-কোন বিশেষভাবে আদিশূরকে সাহায্য করিয়াছিলেন; সেই ভিত্তির উপরেই ঐ উপহাস-উক্তি গ্রথিত হইয়াছে। নচেৎ যে কনৌজরাজের লক্ষ লক্ষ সৈন্য সর্ব্বদাই যুদ্ধার্থে সুসজ্জিত থাকিত, তাঁহাকে কি না করায়ত্ত করিবার জন্য যুদ্ধে অনভিজ্ঞ বৌদ্ধভাবে প্রবণ "অহিংসায় রত" নিরীহ ৭০০ ব্রাহ্মণকে বৃষারোহণে প্রেরণ! আখ্যায়িকার ভিতর এতটুকু সত্য থাকিলে অথবা ইহার বিস্তৃত প্রচার থাকিলে প্রেমবিলাস সে সম্বন্ধে অন্তত একটুও উল্লেখ করিতেন—কিন্তু এবিষয়ে একটী কথাও উল্লেখ করেন নাই।

বল্লাল কর্ত্তৃক সাতশতী সৃষ্টি।

এড়ু মিশ্র বলেন—বল্লাল সেন রাজা হইলে ব্রাহ্মণগণকে স্বীয় রাজধানীতে আনিয়া কিছু দান করিবার অভিপ্রায় প্রকাশ করিলেন। যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণগণ দান লইতে অসম্মত হইলেন। বল্লাল তখন চণ্ডীর আরাধনা করিয়া ব্রাহ্মণ করিবার অধিকার লাভ করিলেন এবং সপ্তশত ব্রাহ্মণ সৃষ্টি করিলেন ‡। এই আখ্যায়িকা হইতে আমাদের মনে হয়, কেবল সাতশতীদের অ-যাজ্ঞিকতা ও অশ্রেষ্ঠতা প্রতিপন্ন হইতেছে। আরও অনুমান হয় যে, সারস্বত বা সাতশতী ব্রাহ্মণদের মধ্যে অনেকেই বল্লালের দান গ্রহণ করিয়াছিলেন। সাতশতীগণের সঙ্গে যখন "পুরা"কালীন রাজা অক্রূরের যোগ কুলগ্রন্থে উক্ত হইয়াছে, তখন বল্লাল কর্ত্তৃক তাহাদের নূতন সৃষ্টি সম্ভব বোধ হয় না।

* বঙ্গেতে ভূদেব যত যজ্ঞাদি না ছিল জ্ঞাত
কারণ তাহার এই মাত্র।
বৌদ্ধেরা বুদ্ধিতে দড় কহে অহিংসাই বড়
ক্রিয়া-ক্রিয়ায় ইনি কন্যাযাত্র॥ ২
মুলো পঞ্চানন বচন—সং নিং ৩২৭ পৃঃ

† সাতশতী দ্বিজ যারা আগে শূদ্রজাতিধারা
যেহেতু ব্রাহ্মণ্যে ছিল বাম।
সারাবলীকারিকা (মুলো পঞ্চানন)—সং নিং ২৪৮ পৃঃ

‡ কালে ভূরিতিথে গতে সমভবদ্বল্লালসেনো নৃপঃ সংপ্রত্যর্পণ-দিৎসয়া দ্বিজগণাংস্তানানয়ৎ স্বাস্তিকং। দানাদানপরাংমুখাঃ ক্ষিতি-পতেস্তে ব্রাহ্মণা যাজ্ঞিকাস্তদ্বিজ্ঞায় চুকোপ ভূপতিরসৌ বল্লালসেনঃ সুধীঃ॥ চণ্ডীমেব সমাররাধ সুচিরং ভূরিপ্রয়াসাদিভিঃ প্রত্যক্ষাংজনি সা নিশার্দ্ধসময়ে দুর্গা নিসর্গোজ্জ্বলা॥ রাজানং তমুবাচ বাঞ্ছিতবরং যাচস্ব দাস্যাম্যহং সম্প্রত্যুত্তরতারতং দ্বিজগণান্ নির্ম্মাতুমিচ্ছাম্যহং। তুষ্টা সা পরমেশ্বরী নৃপমুবাচেদং ... ... মহান্ কিন্তু ত্বং প্রহরদ্বয়ং কুরু বরং বিপ্রং ময়া জ্ঞাপিতং॥ দত্ত্বেমন্তু বরং নৃপায় সহসৈবান্তর্হিতা পার্ব্বতী রাজা সপ্তশতদ্বিজানতিগুণানাম্ভাজ্ঞয়া নির্ম্মমে। তান্নির্ম্মায় নৃপঃ প্রসন্নহৃদয়ো দানানি তেভ্যো দদৌ জাতঃ কৃৎস্নগতশ্চ কার্ত্তিক-মনাঃ শৌর্য্যপ্রতাপোজ্জ্বলঃ॥
এড়ু মিশ্রের কারিকা ব্রা০ কা০ ৭৯—৮০ পৃঃ।

উড়িষ্যায় ইংরাজশাসন।

(রায়মহাশয় শ্রীসতীন্দ্রনারায়ণ রায় বি-এল)

সর্ব্ব প্রথমে ইংরাজগণ উড়িষ্যায় বাণিজ্যব্যপদেশে আসিয়াছিলেন। কটক জেলার অন্তর্গত হরিহরপুর, বালেশ্বর ও পিপলীতে তাঁহাদিগের কুঠী ছিল। ১৬৩৫ খৃষ্টাব্দে ইংরাজগণ পিপলীবন্দরে কুঠী স্থাপন করেন, এবং ১৬৪২ খৃষ্টাব্দে বালেশ্বর সহরে তাঁহারা ব্যবসার কেন্দ্র খুলিয়াছিলেন। বালেশ্বর এক সময় ইউরোপীয়-দিগের বাণিজ্যের প্রধান স্থান ছিল। দীনেমার, ওলন্দাজ, ফরাসী ও ইংরাজ এই চারিটী প্রধান জাতির কুঠীর ভগ্নাবশেষ আজিও বালেশ্বরে দেখা যায়। সে সময় কুঠী-য়ালগণ প্রত্যেক কুঠীতেই সামান্য পরিমাণে সৈন্য রাখিতেন। বালেশ্বর ও পিপলী বন্দর হইতে বহু পরি-মাণে মসলিন নামক সূক্ষ্ম বস্ত্র রপ্তানি হইত। কেহ কেহ বলেন, কটক জেলার তন্তুবায়গণ যে সূক্ষ্ম বস্ত্র প্রস্তুত করিত, তাহাই বালেশ্বর ও পিপলীর ইউরোপীয় কুঠী-য়ালগণ অল্প মূল্যে ক্রয় করিয়া পাশ্চাত্যদেশে বহুমূল্যে বিক্রয় করিতেন। উড়িষ্যার দক্ষিণে গঞ্জাম নামক স্থানে ইংরাজদের আর একটী ব্যবসায় কেন্দ্র ছিল। সেই কেন্দ্র হইতে অতি সুন্দর সূক্ষ্ম বস্ত্র ইউরোপে রপ্তানি হইত। তাহাকে ইউরোপীয়গণ 'জগন্নাথ' নামে অভি-হিত করিতেন। উড়িষ্যার তন্তুবায়গণ বর্ত্তমান কালে

সূক্ষ্ম বস্ত্র প্রস্তুত করিতে পারে না বলিলেই হয়। দুই এক স্থানে এখনও যে সামান্য পরিমাণে সূক্ষ্ম বস্ত্র প্রস্তুত হয় তাহাও বিলাতী বস্ত্রের প্রতিযোগিতায় ক্রমশ উঠিয়া যাইতেছে। কালক্রমে বালেশ্বর ও পিপলীর নদীর মুখ বন্ধ হইয়া এই দুইটী স্থানই ব্যবসার অনুপযোগী হইয়া পড়ে। বালেশ্বরে কুঠী স্থাপনের পর হুগলিতে ইংরাজগণ যে কুঠী স্থাপন করেন, সেই কুঠীর উন্নতির সহিত বালেশ্বর ও পিপলীর কুঠী ক্রমশঃ হতশ্রী হইয়া পড়ে।

১৭৫৭ খৃষ্টাব্দে ক্লাইব পলাশীর যুদ্ধ জয় করিয়া মোগল সম্রাটের নিকট হইতে বঙ্গ, বিহার ও উড়িষ্যার দেওয়ানী প্রাপ্ত হন। সে সময়ে উড়িষ্যা দেশ মারহাট্টাদিগের শাসনাধীন ছিল। মেদিনীপুর ও হুগলির কিয়দংশে উৎকলীয় ভাষার প্রচলন ছিল বলিয়াই এই প্রদেশকে মোগলগণ উড়িষ্যা বলিয়া অভিহিত করিতেন। ক্লাইভ দেওয়ানী সূত্রে এই অংশই পাইয়াছিলেন। সে সময় সুবর্ণরেখা নদী মোগল ও মারহাট্টা-শাসনাধীন উড়িষ্যার সীমা বলিয়া গণ্য হইত। লর্ড কর্ণওয়ালিশের সময় উত্তর বালেশ্বরের দুই-একটী পরগণার ও সমগ্র মেদিনীপুর জেলার চিরস্থায়ী রূপে রাজস্ব বন্দোবস্ত হইয়াছিল।

পূর্ব্বে বলিয়াছি, মারহাট্টাগণ গঞ্জামের লুণ্ঠন করিতেন বলিয়াই, লর্ড ওয়েলেস্‌লি তাঁহাদিগকে উড়িষ্যা হইতে বিতাড়িত করিবার জন্য একটী অভিযান পাঠাইয়াছিলেন। এই অভিযান গঞ্জাম হইতে অগ্রসর হইয়া পুরী ও কটক দখল করিয়াছিল। মারহাট্টাগণ বৃটিশ বাহিনীর গতি রোধ করিবার জন্য কোন চেষ্টা করেন নাই। পুরীর নিকট তাঁহাদিগের সহিত ইংরাজসৈন্যের সামান্য সংঘর্ষ হইয়াছিল। সেই সংঘর্ষকে যুদ্ধ বলা যাইতে পারে না। ইংরাজগণ মনে করিয়াছিলেন, মারহাট্টাগণ কটকের দুর্গে আশ্রয় লইয়া তাঁহাদিগের সহিত যুদ্ধ করিবেন। এইরূপ করিলে ইংরাজদিগকে বিশেষ বেগ পাইতে হইত। কারণ সে সময় যেরূপ কামান ও গোলাগুলি যুদ্ধে ব্যবহৃত হইত, তদ্দ্বারা একটী সুরক্ষিত দুর্গ অবরোধ করা বহু ক্লেশসাধ্য ছিল; কিন্তু মারহাট্টাগণ কটকে যুদ্ধ না করিয়া নাগপুরাভিমুখে পলায়ন করেন। উড়িষ্যা দেশ দখল করিতে ইংরেজদিগের মাত্র ৩০,০৫০ পাউণ্ড ব্যয় হইয়াছিল; এবং সর্ব্ব সমেত পঞ্চাশ জন সৈনিক হত হইয়াছিল। এদেশের অধিবাসিগণ মারহাট্টাদিগের অত্যাচারে নির্যাতিত হইয়া এরূপ বিরক্ত ও বিদ্বেষ-ভাবাপন্ন হইয়াছিল যে, তাহারা মারহাট্টাদিগকে কোনও রূপ সাহায্য করে নাই বা বিজয়ী ইংরাজের গতিরোধ করিতে কোন প্রয়াস পায় নাই। পলাশীর যুদ্ধ যেরূপ বিনায়াসে ক্লাইব জয় করিয়াছিলেন, তাহা অপেক্ষাও অনায়াসে ইংরাজগণ উড়িষ্যা বিজয় করিলেন। পলাশীর যুদ্ধের পর কেবল মুর্শিদাবাদ সহরের অধিবাসিগণ দলবদ্ধ হইয়া ইংরাজের প্রতিকূলাচরণ করিলেই ক্লাইবের সামান্য সেনা ফুৎকারে উড়িয়া যাইত। এরূপ না করাই বাঙ্গালীগণের দুরপনেয় কলঙ্কস্বরূপ হইয়া রহিয়াছে। নবাব সিরাজদ্দৌলা অত্যাচারী ও ইন্দ্রিয়পরতন্ত্র ছিলেন বলিয়াই বাঙ্গালীগণ ইংরাজের গতিরোধ করেন নাই, এরূপ অনুমান যুক্তিযুক্ত নহে। সিরাজদ্দৌলার পূর্ব্ববর্ত্তী নবাব আলিবর্দ্দীখাঁ একজন বিচক্ষণ প্রজাপালক শাসনকর্ত্তা ছিলেন। সিরাজদ্দৌলা দুই কিম্বা আড়াই বৎসর মাত্র বঙ্গের সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। এই অল্প সময়ের মধ্যে তিনি এমন কিছু করেন নাই যে, তদ্দ্বারা তিনি বঙ্গের সমগ্র প্রজামণ্ডলীর বিরক্তিভাজন হইয়াছিলেন। সেনাপতির বিশ্বাসঘাতকতায় সিরাজদ্দৌলা পলাসীর যুদ্ধে পরাজিত হইয়াছিলেন। কিন্তু বাংলার নরনারী স্বধর্ম্ম, স্বদেশ ও স্বাতন্ত্র্য রক্ষার জন্য হস্তোত্তলন করিলেন না কেন? ইহার একমাত্র উত্তর এই যে, বহু পূর্ব্ব হইতে বাংলাদেশের সমস্ত লোকই শাসনকার্য্যে সম্পূর্ণ উদাসীন ছিলেন। স্বাধীনতার লেশমাত্র ধারণাও তাঁহাদের হৃদয়ে ছিল না। গ্রাম ও নিজ নিজ পরিবারের মধ্যেই তাঁহাদিগের দৃষ্টি আবদ্ধ ছিল। রাজায় রাজায় যুদ্ধ হইলে প্রজাগণ বিজেতাকে রাজসম্মান প্রদান করিতে কিছুমাত্র দ্বিধাবোধ করিত না। ইহাকে দাসমনোবৃত্তি বলা যাইতে পারে। উড়িষ্যার প্রজাগণ ইংরাজের গতিরোধ করেন নাই সত্য, কিন্তু দেশ-কাল-পাত্র ও অবস্থাভেদে তাঁহাদিগকে বাঙ্গালীর মত গুরুতর অপরাধী বলা যাইতে পারে না। মারহাট্টাদিগের অত্যাচারে উড়িষ্যাবাসীর দুর্দ্দশার চরম হইয়াছিল। তাঁহারা দেশের সর্ব্বস্ব লুণ্ঠন করিয়া দেশবাসীকে পশুভাবাপন্ন করিয়াছিলেন। লোকে প্রাণের দায়ে পুত্র-কলত্রকে বিক্রয় করিতে কিছুমাত্র দ্বিধাবোধ করিত না। ১৭৯৪ খৃষ্টাব্দে দাসব্যবসায়িগণ উড়িষ্যা হইতে ক্রীতদাস সংগ্রহ করিয়া সুদূর সেণ্টহেলেনা দ্বীপ পর্য্যন্ত পাঠাইত। জীবনের সুখ-সম্পত্তির আদান-প্রদান ও ব্যবসা-বাণিজ্য দেশ হইতে লোপ পাইয়াছিল। নিরন্ন প্রজাকুল গভীর অশান্তি ও মর্ম্মবেদনায় দিনাতিপাত করিতেছিল। এইরূপ অবস্থায় কোন লোকই বিজেতার গতিরোধ করিবার কল্পনাও করিতে পারে না।

ইংরাজবিজয়ের সর্ব্বপ্রধান ফল—দেশে শান্তি ও সুশাসনের প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল। উড়িষ্যার ভাগ্যে এরূপ শাসন ও শান্তি বহুদিন ঘটে নাই। ইংরাজগণ

ফৌজদারী বিভাগের সৃষ্টি করিয়া দুষ্টের দমন করিতে লাগিলেন। তস্কর ও ক্ষমতাপন্ন কিল্লাদারদিগের অত্যাচার হইতে প্রজাকুলকে সতত‍ই রক্ষা করিতে লাগিলেন। অত্যাচার ও অবিচারের হাত হইতে পরিত্রাণ পাইয়া অতি অল্প সময়ের মধ্যেই প্রজাকুল ইংরাজশাসনের অনুরক্ত হইয়া পড়িল। যাঁহারা মহারাষ্ট্রশাসনের অত্যাচার-অবিচার দেখিয়াছেন, তাঁহারা সহজেই ইংরাজশাসনকে রাম-রাজত্ব বলিলেন।

ইংরাজশাসনের মত সুশৃঙ্খল ও সুনিয়ন্ত্রিত শাসন এদেশে বহুদিন ছিল না। বিদেশী বিজেতার পক্ষে যতদুর প্রজামণ্ডলীর সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের ব্যবস্থা করা যাইতে পারে, তাহা তাঁহারা করিয়াছেন। তবে একথা মুক্তকণ্ঠে বলা যাইতে পারে যে, অত্যাচার ও অবিচার সত্ত্বেও দেশীয় রাজাদিগের শাসন প্রজাগণের পক্ষে অপেক্ষাকৃত মঙ্গলজনক ছিল। ইংরাজশাসন-যন্ত্রের সহিত দেশীয় শাসন-যন্ত্রের তুলনা করিলে সকল বিষয়েই ইংরাজশাসনপদ্ধতির শ্রেষ্ঠতা প্রতিপন্ন হইবে। তবে কি কারণে ইংরাজ-শাসন দেশীয় শাসনপদ্ধতির অপেক্ষা মঙ্গলজনক নহে, এই প্রশ্ন সহজেই উঠিতে পারে। অনুধাবন করিলে আমরা দেখিতে পাইব যে, ইংরাজশাসনের দোষগুণ যাহাই হউক না কেন, কেবল শাসন-যন্ত্রচালনায় দেশের অতি সামান্যই ক্ষতিবৃদ্ধি হইতেছে। এদেশে ইংরাজ আগমনের সঙ্গে বিদেশীয় সভ্যতা ও বিজাতীয় ভাবের প্রচারে আমাদের যেরূপ গুরুতর অনিষ্ট হইতেছে, শুধু বিদেশীয় শাসনপ্রণালী দ্বারা তাহার শতাংশের একাংশও হইতেছে না। দেশীয় রীতি-নীতি, আচার-ব্যবহার, উপাসনা ও ধর্ম্মভাব প্রভৃতিতে বিদেশীয় ভাব যে বিপ্লব ঘটাইয়াছে, সেই বিপ্লবের ফলে আমাদের মনোভাব বিপর্য্যস্ত হইয়া পড়িয়াছে। আমাদের দেশে আজকাল দুই শ্রেণীর লোক দেখিতে পাওয়া যায়, তন্মধ্যে ইংরাজী শিক্ষিতগণ আজ-কাল প্রায় সকল বিষয়েই প্রাধান্য লাভ করিয়াছেন। তাঁহারা সমাজের শীর্ষস্থানীয়। সকলেই তাঁহাদের অনুকরণ করিতেছে। কিন্তু অসার অনুকরণে তাঁহাদিগের মনোভাব এরূপ কিম্ভুত-কিমাকার হইয়া দাঁড়াইয়াছে যে, জাতীয়তার স্রোত হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া তাঁহারা বহুদূরে সরিয়া পড়িয়াছেন। বিজাতীয় সভ্যতা—বিজাতীয় ভাব যতদিন প্রবল রহিবে, ততদিন জাতীয়তার মুলভিত্তি প্রতিষ্ঠিত হইতে পারিবে না। ইংরাজশাসনের ফলে ভারতবর্ষের সর্ব্বত্র যেরূপ বিজাতীয় ভাব ও বিজাতীয় সভ্যতার প্রচলন হইয়াছে, উড়িষ্যায়ও সেইরূপ হইয়াছে; বরং বর্ত্তমান সময়ে অন্য প্রদেশের অনুপাতে এদেশে বিজাতীয় সভ্যতা এখনও ভাবরাজ্যে ততদুর আবিলতা ও আবর্জ্জনা আনে নাই। বিজাতীয় সভ্যতা ও বিজাতীয় ভাব ভারতবর্ষের প্রধান শত্রু। হিন্দু বা মুসলমান রাজাদিগের কুশাসন অবিচার ও অরাজকতায় ভারতীয় জাতীয়তার যে অনিষ্ট হয় নাই, কেবল বিদেশীয় ভাব ও বিজাতীয় সভ্যতার প্রচলনে তাহার অনেকগুণ বেশী অনিষ্ট হইয়াছে। প্রত্যেক জাতিরই কতকগুলি বৈশিষ্ট্য আছে, তাহার তিরোধানে দেশব্যাপী অন্ধকার ও বিশৃঙ্খলতা ঘটিয়া থাকে। ধর্ম্মমূলক ভারতীয় সভ্যতার বিদেশীয় ভাব যে বিপ্লব ঘটাইয়াছে, তাহার অবসান না হইলে, দেশে জাতীয়তার ভিত্তি কখনও দৃঢ় হইবে না।

ভারত গবর্ণমেণ্টের বার্ষিক আয়-ব্যয়ের হিসাব দেখিলে সহজেই বুঝা যাইবে যে, ভারতশাসনের উদ্বৃত্ত আয় প্রত্যক্ষভাবে ইংলণ্ডের রাজকোষে যায় না। প্রায় প্রতিবর্ষই যেরূপ আয় হইয়া থাকে, তাহার অনুপাতে কোন কোন বৎসর সামান্যই উদ্বৃত্ত থাকে। অবশ্য উচ্চপদস্থ ইংরাজকর্ম্মচারী ও ইংরাজ সৈনিকগণ তাঁহাদিগের পারিশ্রমিক পাইয়া থাকেন ও কার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করিলে, আইন অনুসারে পেন্‌সন্ বা অবসরবৃত্তি ভোগ করেন। এইরূপ পারিশ্রমিক ও বৃত্তি উচ্চহারে হইলেও তাহা কোনক্রমে অন্যায়মূলক নহে। দেশে শান্তিস্থাপন করিয়া এবং ফৌজদারী ও দেওয়ানী বিভাগ খুলিয়া ইংরাজশাসকগণ দেশের যে মহোপকার সাধন করিয়াছেন, তাহার তুলনায় তাঁহাদিগের পারিশ্রমিক যথেষ্ট নহে। গভর্ণমেণ্টের আয়-ব্যয়ের হিসাব দেখিলে সত্যই মনে হয় যে, ইংরাজগণ প্রকৃতপক্ষে ধর্ম্মার্থেই দেশ শাসন করিতেছেন; এবং এদেশ ছাড়িয়া চলিয়া গেলে তাঁহাদিগের বিশেষ কোন ক্ষতিবৃদ্ধি নাই। কেবল শাসনকার্য্যের আয়-ব্যয় পরীক্ষা করিলে রাজনৈতিক আন্দোলন একান্ত অসার বলিয়া মনে হইবে। কিন্তু ভারতবর্ষকে অধীনে রাখিয়া ইংলণ্ডের যে কি লাভ হইতেছে তাহা বুঝিতে হইলে আমদানী-রপ্তানীর হিসাব পরীক্ষা করিতে হইবে।

ব্যবসায় দ্বারা ইংলণ্ডের পরোক্ষভাবে যেরূপ লাভ হইতেছে তাহার সীমা পরিসীমা নাই। বিলাতের কলকারখানার মালিক ও মজুরগণ পরোক্ষভাবে ভারতবর্ষের অর্থেই পুষ্ট হইতেছে। যে অর্থবলে বলীয়ান্ হইয়া ইংলণ্ড পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দেশ হইয়াছে, তাহার মূলে যে ভারতবিজয় ও ভারতশাসন তাহাতে অনুমাত্র সন্দেহ নাই। অর্থাগমের আশায় ইংরাজগণ এদেশে আসিয়াছিলেন। দেশ শাসন করিবার অভিসন্ধি সে সময় তাঁহাদিগের ছিল না। পরে ইংরাজ বণিকগণ দেখিলেন, রাজনৈতিক প্রাধান্যলাভ না করিলে স্বচ্ছন্দে ব্যবসায় করা যায় না। রাজনৈতিক বিপ্লবে ও শাসনকর্ত্তার খোষখেয়ালে তাঁহা-

দিগকে যেরূপ বিড়ম্বনা সহ্য করিতে হইত তদ্দ্বারা এই ধারণা বদ্ধমূল হইয়া দাঁড়াইল। মোগলসাম্রাজ্যের অবসানে মহারাষ্ট্রীয়দিগের আত্মকলহ এবং জাতীয় অনৈক্য ও দৌর্ব্বল্য দেখিয়া তাঁহারা শনৈঃ শনৈঃ ভারতবিজয় করিলেন। কিন্তু যে মূল নীতি লইয়া তাঁহারা এদেশে আসিয়াছিলেন, তাহার কোন পরিবর্ত্তন করিলেন না। ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানীর রাজত্বকালে ব্যবসা ও শাসন একসঙ্গে চলিতে লাগিল। শাসন অপেক্ষা ব্যবসাতেই কোম্পানী সিদ্ধহস্ত ছিলেন এবং শাসনকার্য্যকে ব্যবসায়ের অন্তর্গত বলিয়া মনে করিতেন। পরে মহারাণী ভিক্টোরিয়ার রাজত্বকালে রাজ্যভার কোম্পানীর হস্ত হইতে অপসারিত হইল এবং কালক্রমে কোম্পানীর অস্তিত্ব পর্য্যন্ত লোপ পাইল। ভারতবর্ষের শাসনকার্য্য যখন ইংলণ্ড প্রত্যক্ষভাবে গ্রহণ করেন, তখন ইংলণ্ডের বণিককুল রাজনৈতিক ক্ষেত্রে যথেষ্ট প্রতিষ্ঠা ও শক্তি লাভ করিয়াছিলেন। আজকাল তাঁহারাই সর্ব্বেসর্ব্বা। তাঁহাদিগের নিকট অন্য কেহই মস্তক উত্তোলন করিতে পারেন না। ইংলণ্ডের মহাসভায় শ্রমিকদিগের একটি দল আছে সত্য, কিন্তু তাঁহাদের প্রতিপত্তি ও মর্য্যাদা এখনও এরূপ হয় নাই যে, বণিকদিগকে পরাস্ত করিয়া তাঁহাদিগের নিজমত কোন গুরুতর বিষয়ে চালাইতে পারেন। এদেশের শাসনযন্ত্রের পশ্চাতে ইংলণ্ডের বণিককুল রহিয়াছেন। তাঁহাদিগের বিরুদ্ধাচরণ করা এদেশের রাজপ্রতিনিধি বা বিলাতের 'সেক্রেটরী অফ ষ্টেটের' পক্ষে কখনও সম্ভবপর নহে। বণিককুলের শাসনে ও প্রতিযোগিতায় এদেশের ব্যবসাবাণিজ্য লোপ পাইতে বসিয়াছে। এদেশের ব্যবসাবাণিজ্যের সংরক্ষণ ও পুষ্টিসাধন করিবার জন্য কোন আইন বিধিবদ্ধ করিবার চেষ্টা করিলে ইংলণ্ডের বণিককুল তাহার তীব্র প্রতিবাদ করিয়া যাহাতে এরূপ প্রয়াস ব্যর্থ হয় তাহার জন্য যৎপরোনাস্তি চেষ্টা করিয়া থাকেন। বণিককুলের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিবার মত শক্তি ইংলণ্ডে কোন রাজনৈতিকদলের নাই। এরূপ অবস্থায় ভারতবর্ষ বা তাহার কোন প্রদেশের ব্যবসাবাণিজ্যের উন্নতিসাধন করা ভারতগভর্ণমেণ্টের পক্ষে বিশেষ কঠিন ব্যাপার হইয়া উঠে। ইংলণ্ডের বণিকগণ পরোক্ষভাবে দেশশাসন করিতেছেন বলিয়াই এদেশে ব্যবসাবাণিজ্যের অবস্থা এরূপ শোচনীয় হইয়াছে। ইহাতে যেন কেহ মনে না করেন যে, প্রজাপুঞ্জের চেষ্টা ও যত্ন সত্ত্বেও দেশের আর্থিক অবস্থা এইরূপ শোচনীয় হইয়া পড়িয়াছে; কিংবা তাঁহারা কোন দোষে দোষী নহেন। নিরপেক্ষভাবে বলিতে গেলে বলিতেই হইবে যে, ভারতবর্ষীয়গণও সংঘবদ্ধভাবে ইউরোপীয় বাণিজ্যের অবাধ গতি প্রতিরোধ করিতে চেষ্টা করেন নাই; এবং শাসকসম্প্রদায়ও দেশের আর্থিক অবস্থার উন্নতিসাধন করিতে যথেষ্ট চেষ্টা করেন নাই। যে কারণে এইরূপ ঘটিয়াছে তাহা পূর্ব্বে বলিয়াছি। ইংরাজশাসনসময়ে ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রদেশের ন্যায় উড়িষ্যাদেশেও দেশীয় শ্রমশিল্প ও ব্যবসাবাণিজ্যের অনেক অবনতি হইয়াছে।

ইংরাজ-শাসনসময়ে যেরূপ দেশব্যাপী শান্তি বিরাজ করিতেছে, সেরূপ শান্তি দেশীয় রাজাদিগের শাসনসময়ে কোন দিন ছিল কি না সন্দেহ। অপরাধীর দণ্ডবিধান করিবার জন্য ফৌজদারী বিভাগ খোলা রহিয়াছে; বিষয়-সম্পত্তি লইয়া কলহবিবাদ উপস্থিত হইলে দেওয়ানী বিভাগ তাহার মীমাংসা করিয়া দিতেছেন। এইরূপ নিরবচ্ছিন্ন শান্তিতে যে দেশের মহোপকার সাধিত হইয়াছে, তাহা সহজেই বুঝিতে পারা যায়। কিন্তু অপর দিকে এই নিরবচ্ছিন্ন শান্তির বিরুদ্ধেও অনেক কথা বলিবার আছে। অশান্তি ও অরাজকতায় দেশবাসিগণও সতর্ক যুদ্ধব্যবসায়ী হইয়া পড়িয়াছিলেন। যে উৎকণ্ঠায় তাঁহাদিগকে জীবনযাপন করিতে হইত, তাহার ফলস্বরূপ তাঁহাদের হৃদয়ে সৈনিকসুলভ গুণনিচয় পরিপুষ্ট হইয়াছিল। কিন্তু আজ শান্তির সুশীতল ছায়ায় কোমলতা ও ভীরুতা তাঁহাদের বংশধরগণের হৃদয় অধিকার করিয়া বসিয়াছে। আত্মনির্ভর ও স্বাবলম্বন আর সেরূপ দেখা যায় না। দেশের একপ্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত সজীবতার—প্রাণের সাড়া পাওয়া যায় না। একদল সশস্ত্র ডাকাতের গতিরোধ করিবার ক্ষমতা দেশবাসীর নাই। সুশাসন ও সুগভীর শান্তির এরূপ বিষময় ফল কেন ফলিল? ইংরাজ আমলে দেশ এরূপ নির্বীর্য্য হইয়া পড়িল কেন? এ প্রশ্নের মীমাংসা করিবার অধিক অবসর আমাদের নাই। অল্প কথায় বলিতে গেলে বলা যায় যে, যে শাসনশৃঙ্খলা ইংরাজগণ এদেশে স্থাপন করিয়াছেন, তাহাতে এদেশবাসিগণের কোন কৃতিত্ব নাই। শাসনযন্ত্রের নিম্নাঙ্গের অবয়বস্বরূপ এদেশবাসিগণকে ইংরাজগণ নিযুক্ত করিয়াছেন সত্য, কিন্তু মূল নীতি উদ্ভাবন, শাসনপরিচালন বা সুশৃঙ্খলা স্থাপনের মূলমন্ত্র ইংরাজের নিজস্ব। ইংরাজগণের পরিচালনা, পরামর্শ ও তীক্ষ্ণ পর্য্যবেক্ষণ ব্যতিরেকে শাসনকার্য্য এরূপ শৃঙ্খলার সহিত কোনক্রমে চলিতে পারিত কি না বলা যায় না। এই শাসনপদ্ধতি উদ্ভাবনের কৃতিত্ব সম্পূর্ণ তাঁহাদের;—এদেশবাসীর নয়। যে সকল বিরুদ্ধ শক্তির সমন্বয় বা পরাভব সাধন করিয়া তাঁহারা সুশাসন প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন, তাহা এদেশবাসিগণ কোন দিন করিতে সমর্থ হইতেন কি না সন্দেহ। অপরের সুকৃতির ফলভোগ করিয়া কেহই বলবান ও

সুস্থকায় হইতে পারে না। নৈতিক জগতেও এই নিয়ম প্রাকৃতিক নিয়মের মত সত্য ও অলঙ্ঘনীয়। ইংরাজের সুকৃতির ফলভোগ করিতে অসমর্থ হইয়াই দেশবাসিগণ নির্বীর্য্য হইয়া পড়িয়াছেন। ইংরাজদিগের আগমনের পূর্ব্বে যদি দেশবাসিগণ মস্তিষ্ক চালনা করিয়া ইংরাজের মত দেশে সুশাসন প্রতিষ্ঠা করিতেন, তাহা হইলে তাঁহারা প্রকৃত পক্ষে সুশাসনের ফলভোগী হইয়া ইংরাজদিগের মতই শৌর্য্যবীর্য্যশালী ও প্রতাপান্বিত হইতে পারিতেন।

অন্নসমস্যা ও কৃষি।

"আগে অন্নবস্ত্র, তার পর স্বরাজ। কৃষিকাজই দেশের প্রকৃত কাজ—চাষকে আর চাষার কাজ বলে ঘৃণা করলে চল্‌বে না—ফিরে কর চাষ আর ফিরে ধর চরকা—এখন এই হচ্ছে আমার মন্ত্র।"

—আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র।

(শ্রীনির্ম্মলচন্দ্র বড়াল বি-এল)

বাঙ্গালীর চাকরীর নেশা আজও ছুট্‌লো না—দলে দলে শিক্ষিত বা অর্দ্ধশিক্ষিত বাঙ্গালী আবেদন-পত্র নিয়ে দ্বারে দ্বারে ফিরচেন—

"কে নিবি গো কিনে আমায়
কে নিবি গো কিনে"

কিন্তু কেহই কিন্‌তে চায় না—চাকরীর সংখ্যা অল্প, আবেদনকারীর সংখ্যা অগণ্য; ফলে বাঙ্গালীর অন্নসমস্যা গুরুতর হয়ে উঠছে। শিক্ষিতসম্প্রদায়ের জন্য যে সকল অর্থোপার্জ্জনের পথ আছে সেগুলিও একরূপ রুদ্ধ হয়ে এসেছে—মক্কেল অপেক্ষা উকীলের সংখ্যা বেশী, ডাক্তার কবিরাজের যদি বা আবশ্যক থাকে তো পল্লী-গ্রামে কেহই ব্যবসায় চালাইতে সম্মত হন না—সকলেই সহরে বসিয়া ভাগ্যপরীক্ষা করিতে চান—ফলে অনেককেই নিরাশ হতে হয়। ব্যবসায়-ক্ষেত্রেও অনেক-স্থলে বাঙ্গালীর সততা ও একতা দেখা যায় না, সে জন্য অধিকাংশ যৌথ কারবারই টেঁকে না। এ সকল কারণে মধ্যবিত্ত বাঙ্গালীর মধ্যে অন্নসমস্যা বড়ই জটিল হয়ে উঠছে। এখন উপায় কি?

অনেকেই আজকাল কাগজে কলমে বলতে আরম্ভ করেছেন—কৃষিই বাংলার অন্নসমস্যা-মীমাংসার অন্যতর উপায়; কিন্তু বড়ই দুঃখের বিষয়, অনুসন্ধানের ফলে জানা যায় যে, যাঁহারা এইরূপ পরামর্শ দেন, তাঁহারা অধি-কাংশই চাকরীগতপ্রাণ—কৃষিকার্য্যে সাক্ষাৎভাবে কেহই লিপ্ত নন। এ বিষয়ে ইংরাজি প্রবাদবাক্য 'Example is better than precept' বা পরামর্শ অপেক্ষা দৃষ্টান্তের মূল্য অনেক বেশী, এই কথাটি আমাদের মনে পড়ে। যাঁরা কৃষিবিষয়ে দেশে বা বিদেশে শিক্ষালাভ করেছেন তাঁরা যদি প্রত্যেকে চাকরীর অনুসন্ধান না করে একক ভাবে বা যৌথভাবে এক-একটি আদর্শ কৃষিক্ষেত্র প্রস্তুত করেন এবং তাহা হইতে ভরণপোষণের উপযোগী যথেষ্ট আয় (Decent income) হচ্ছে দেখাতে পারেন, তাহলে দেশের যে কি মহৎ উপকার হয়, তা'বলে শেষ করা যায় না। তাহলে দেশের শিক্ষিতসম্প্রদায়ও কৃষিকে আর হেয়চক্ষে দেখবেন না এবং তাঁদের সদ্দৃষ্টান্ত অনুসরণ করবার লোকেরও অভাব হবে না। এ দেশে কৃষির উন্নতি শিক্ষিত-সম্প্রদায়ের হস্তে—তাঁরা যদি এ বিষয়ে মনোযোগী না হন তাহলে কৃষির উন্নতির আশা সুদূরপরাহত।

আমাদের দেশের লোকের এমনই বুদ্ধিবিপর্য্যয় যে, তাঁরা কৃষির মত শান্তিপ্রদ, স্বাস্থ্যপ্রদ, স্বাধীন সংকর্ম্মকে অবজ্ঞার চক্ষে দেখেন; আর কুবাক্য, অপমান ও চোখরাঙ্গানি সহ্য করে দাসত্ব করাকেই জীবনের প্রধান অবলম্বন মনে করেন—দাসভাব এমনই আমাদের মেরু-মজ্জাগত হয়ে গেছে!

কৃষির প্রতি এই মিথ্যা অবজ্ঞা অপসারিত করতে হবে—বাংলাদেশকে পুনর্ব্বার সুজলা সুফলা শস্যশ্যামলা করে তুল্‌তে হবে। জগতে কোন কাজই হেয় নয়—আলস্যে বসে ভিক্ষালব্ধ অন্ন ভোজন করাই যে সব চেয়ে লজ্জার বিষয়, এ কথা আমাদের স্মরণ রাখতে হবে—সমস্ত লোকাপবাদ লোকলজ্জা তুচ্ছ করে কর্ম্মের বিস্তীর্ণ পথে চলতে হবে—এতেই শান্তি, এতেই তৃপ্তি, এতেই আনন্দ। উন্নত প্রণালীতে যাতে চাষ করা যেতে পারে, অল্প জমিতে অধিক পরিমাণ শস্য উৎপন্ন করা যেতে পারে—জীবনযাত্রা যাতে সরল, সহজ ও বিলাসিতা প্রভৃতি বাহুল্য-বর্জ্জিত হয়, তজ্জন্য বিশেষ চেষ্টা করতে হবে। দেশের ধনবৃদ্ধির জন্য কৃষির উন্নতি ও তজ্জাত দ্রব্যাদি নিয়ে বাণিজ্যশিল্পের উন্নতির জন্য বিশেষভাবে সচেষ্ট হতে হবে। আমাদের সদাশয় বড়লাট লর্ড আরউইনও এ বিষয়ে বিশেষ সহানুভূতি-সম্পন্ন—দেশের কর্ম্মহীন শিক্ষিতসম্প্রদায়ের কৃষিকার্য্য গ্রহণ করবার এই তো উপযুক্ত অবসর।

মহাত্মা গান্ধী যে সহরবাসীকে পল্লীতে ফিরবার জন্য উপদেশ দিচ্ছেন, এসবর তার গভীর সার্থকতা আছে। পল্লীর উন্নতিসাধন করতেই হবে—কৃষিকার্য্যের সুব্যবস্থা করতেই হবে—সহরের ভোগসুখ ও বিলাসিতা বর্জ্জন

করতেই হবে—প্রত্যেক বিষয়েই স্বরাট্ হতে হবে—নান্যঃ পন্থা।

আজ এই দারুণ অন্ন-সমস্যার দিনে তেজস্বী স্বামী বিবেকানন্দের একটি বাণী দেশবাসীর প্রণিধানযোগ্য বিবেচনা করে সকলের সম্মুখে উপস্থিত করলাম :—

"তোরা কি করচিস্? এত বিদ্যা শিখে পরের দোরে ভিখারীর মত "চাকরী দাও, চাকরী দাও" বলে চেঁচাচ্ছিস্। জুতো খেয়ে খেয়ে দাসত্ব করে করে তোরা কি আর মানুষ আছিস্? তোদের মূল্য এক কাণাকড়িও নয়। এমন সুজলা সুফলা দেশ, যেখানে প্রকৃতি অন্য সকল দেশের চেয়ে কোটিগুণ ধনধান্য প্রসব করচেন, সেখানে দেহধারণ করে তোদের পেটে অন্ন নেই—পিঠে কাপড় নেই! যে দেশের ধন-ধান্য পৃথিবীর অপর সকল দেশে Civiligation (সভ্যতা) বিস্তার করেছে, সেই অন্নপূর্ণার দেশে তোদের এমন দুর্দ্দশা? তোরা আবার তোদের বেদ-বেদান্তের বড়াই করিস্। যে জাত সামান্য অন্নবস্ত্রের সংস্থান করতে পারে না—পরের মুখাপেক্ষী হয়ে জীবন ধারণ করে, সে জাতের আবার বড়াই! ধর্ম্ম-কর্ম্ম এখন গঙ্গায় ভাসিয়ে দিয়ে আগে জীবন-সংগ্রামে অগ্রসর হ'। ভারতে কত জিনিষ জন্মায়। বিদেশী লোক সেই Raw matirial (পণ্যদ্রব্য) দিয়ে তার সাহায্যে সোনা ফলাচ্ছে। আর তোরা ভারবাহী গর্দ্দভের মত তাদের মাল টেনে মরছিস্। ভারতে যে সব পণ্য উৎপন্ন হয়, দেশবিদেশের লোক তাই নিয়ে তার উপর বুদ্ধি খরচ করে, নানা জিনিষ তৈয়ার করে বড় হয়ে গেল; আর তোরা তোদের বুদ্ধিটাকে সিন্দুকে পুরে রেখে ঘরের ধন পরকে বিলিয়ে "হা অন্ন" "হা অন্ন" করে বেড়াচ্ছিস্! ...... আর তোদের দেশের জাতের বড়াই করে' করে' তোদের অন্ন পর্য্যাপ্ত জুটছে না। একটা ছুঁচ গড়বার ক্ষমতা নাই—তোরা আবার ইংরেজদের criticise (দোষ-গুণবিচার) কর্ত্তে যাস্—আহাম্মক! ওদের পায়ে ধরে জীবন-সংগ্রামোপযোগী বিদ্যা-শিল্প-বিজ্ঞান, কর্ম্মতৎপরতা শিখগে। যখন উপযুক্ত হবি তখন তোদের আবার আদর হবে। ওরাও তখন তোদের কথা রাখবে। কোথাও কিছু নেই, কেবল Congress করে চেঁচামেচি করলে কি হবে?"

আগ্নেয় গিরির গুপ্তরহস্য।

(শ্রীপঞ্চানন রায়)

সে বহুশতাব্দী পূর্ব্বের কথা—আধুনিক বিজ্ঞানের তখনও জন্মই হয় নাই,—ইটালী দেশস্থ বিসুবিয়স্ মাথা নাড়া দিয়া উঠিয়াছিল এবং অবিরাম গিরিনিঃস্রাব বর্ষণ করিয়া সুবৃণা পম্পিয়াই নগরীকে সমাধিস্থ করিয়া ফেলিয়াছিল। শৈশবে ভয়চকিত অন্তরে ঐ নগরাধিবাসিদিগের দুর্দ্দশার শোচনীয় বর্ণনা পাঠ করিয়া ব্যথিত হইতাম। প্রাচীন সভ্য জগতে অতি অল্প-সংখ্যক লোকই উক্ত ভয়াবহ ব্যাপারের সংবাদ রাখিতেন; আর সম্প্রতি পৃথিবীর প্রান্ত-ভাগস্থিত হাওয়াই ও হোর্কাইডো দ্বীপের আগ্নেয় গিরিদ্বয়ের বিচিত্র অগ্নিবর্ষণের কথা সকলেই পাঠ করিয়া স্তম্ভিত ও বিস্মিত হইতেছে। ইহা বিজ্ঞানেরই বাহাদুরী। বিজ্ঞান মানুষকে জল, স্থল ও অন্তরীক্ষের প্রভুত্ব দান করিয়াছে, বহু দূর দেশের সংবাদ মুহূর্ত্ত মধ্যে আনয়ন করিয়া লোককে সাবধান হইবার যথেষ্ট অবকাশ দিতেছে, এবং আশা করা যায় অদূর-ভবিষ্যতে অন্যান্য বহু ব্যাপারের ন্যায় ভূগর্ভের বিচিত্র গুপ্ত রহস্যও প্রকাশ করিয়া বিজ্ঞান মনুষ্য-জীবনকে সম্পূর্ণ নিরাপদ করিয়া ফেলিবে।

পৃথিবীতে পর্ব্বতের অভাব নাই এবং উহাদের অস্তিত্ব কখনও যে বিলুপ্ত হইবে, তাহা বলা যায় না। পর্ব্বতসমূহ পৃথিবীকে ধারণ করিয়া আছে ইহাই ছিল প্রাচীন হিন্দুদিগের বিশ্বাস, তাই তাঁহারা পর্ব্বতের এক নাম রাখিয়াছিলেন ধরাধর। কিন্তু অগ্নিশর্ম্মা ব্রাহ্মণের ন্যায় উহাদের কোন্‌টী যে কখন মাথানাড়া দিয়া উঠিবেন, সে সম্বন্ধে কোন স্থিরতা নাই। অগ্নিশর্ম্মা ব্রাহ্মণের প্রার্থনা পূর্ণ করিলে তাঁহার রাগ দূর হইতে পারে, কিন্তু পর্ব্বতের রাগ দূর করিবে কে? শোনা যায়, বিন্ধ্য পর্ব্বত মাথা তুলিতে আরম্ভ করিলে পৌরাণিক ঋষি অগস্ত্য কৌশলে তাঁহার মাথা নোয়াইয়া দেন *; কিন্তু এযুগে অগস্ত্যের অভাব খুব বেশী, কাজেই রাগী পর্ব্বতগুলির পরিচয় এবং উহাদের রাগের পূর্ব্ব-লক্ষণগুলি জানিয়া সাবধান হওয়া ব্যতীত এযুগের

* এই পৌরাণিক ব্যাপারটী একটী সংগঠনকারী উদ্‌গীরণ বলিয়া মনে হয়। অগস্ত্য মুনির সম্ভবত এমন এক উচ্চতর বিজ্ঞান অধিগত ছিল, যাহা দ্বারা তিনি সেই উদ্গীরণকে সংযত করিতে পারিয়াছিলেন। আজ কয়েক বৎসর হইল বৈজ্ঞানিকগণ বিসুবিয়সেরও উদ্গীরণ নানা উপায়ে সংযত করিবার ব্যবস্থা করিয়াছেন।

লোকের আর অন্য উপায় আছে বলিয়া মনে হয় না। তপ্ত তপস্বীর মত অনেক আগ্নেয়গিরি এখনও পৃথিবীতে দণ্ডায়মান রহিয়াছে। উহাদের বাহিরের শান্তভাব দেখিয়া সাধারণে উহাদের অধিকাংশেরই সম্বন্ধে 'নির্ব্বাণপ্রাপ্ত' এই বিশেষণটী বসাইয়া দেয়; কিন্তু উহাদের অনেকেরই জীবনবৃত্তান্ত আলোচনা করিলে আমরা দেখিতে পাই যে, ঐ বিশেষণের বিশেষ কোন মূল্য নাই। মরিচাধরা একটী পুরাতন কামানকে যেমন অল্পায়াসেই কাজে লাগাইতে পারা যায়—তেমনই নির্ব্বাণপ্রাপ্ত আগ্নেয় গিরিগুলি অতি তুচ্ছ কারণেও সজীব হইয়া উঠিতে পারে।

পৃথিবীর আগ্নেয়-গিরিসঙ্কুল স্থানসমূহের মধ্যে জাপানকে শীর্ষস্থান দেওয়া যাইতে পারে। বহুল আগ্নেয়গিরির অবস্থান হেতু সেখানে ভূমিকম্প একরূপ দৈনিক ব্যাপার বলিলেও চলে। এই দ্বীপের অন্যতর আগ্নেয়গিরি বান্দেসান পর্ব্বতটীকেও এই প্রকার নির্জ্জীব, নির্ব্বাণপ্রাপ্ত, নিরীহ বলা হইত; কিন্তু ১৮৮৮ খৃষ্টাব্দের ১৫ই জুলাই তারিখে সে তাহার স্বরূপ প্রকাশ করিয়া ঐ সব উক্তির যে কোন মূল্যই নাই তাহা জানাইয়া দিয়াছিল।

জাপানের পরই পূর্ব্বগোলার্দ্ধের সুমাত্রা ও যবদ্বীপের মধ্যবর্ত্তী সুন্দাপ্রণালীস্থিত ক্রাকাতোয়ার নাম করা যাইতে পারে। বৈজ্ঞানিক মহলে ক্রাকাতোয়ার নাম নগণ্য বলিয়া বিবেচিত হইত। তাই কোন বৈজ্ঞানিকই ঐ দ্বীপটী পর্য্যবেক্ষণ করিবার নিমিত্ত কখনও শুভাগমন করেন নাই। অবশেষে ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দের ২৬শে আগষ্ট তারিখে সে যেন এরূপ অপমানজনক ব্যবহার সহ্য করিতে না পারিয়াই নিজের যথার্থ স্বরূপ প্রকাশ করিয়া ফেলিল। ইহার পর হইতে ক্রাকাতোয়াকে আগ্নেয়-পর্ব্বত-পরিষদের প্রধানতম আসনই প্রদত্ত হইয়াছে; কারণ ভূগর্ভস্থ দুইটী প্রকাণ্ড আগ্নেয় গিরিশ্রেণীর সংযোগস্থলে তাহার অবস্থান, তাই সে প্রচণ্ড আগ্নেয়-শক্তির আধার।

ইটালীদেশের বিসুবিয়াসের নাম ইতিহাসপ্রসিদ্ধ। ইউরোপের পর্ব্বতমহলে আইসল্যাণ্ডের "হেক্লা" এবং সিসিলির "এটনার" নাম আছে। স্কটল্যাণ্ডেও বহু আগ্নেয়গিরির ভগ্নাবশেষ দেখা যায়, কিন্তু উহাদের অনেককেই এখন নির্জ্জীব বলা হইয়া থাকে। উপরি-উক্ত বান্দেসান ও ক্রাকাতোয়ার স্বরূপ প্রকাশিত হওয়াতে নির্জ্জীব বা নির্ব্বাপিত বিশেষণ-দুইটীর বল অনেকটা খর্ব্ব হইয়া পড়িয়াছে।

আমাদের ভারতবর্ষে আপাততঃ কোন আগ্নেয় গিরির সন্ধান পাওয়া যায় না; এই সম্পর্কে বিন্ধ্যাচল পর্ব্বতের পৌরাণিক ব্যাপার ও জ্বালামুখীর গিরিগহ্বরে লেলিহান অগ্নিশিখা প্রভৃতির মূল অনুসন্ধেয়। সম্প্রতি ব্রহ্মদেশস্থ কোন পর্ব্বতের পাদদেশেও অগ্নির সন্ধান মিলিয়াছে বলিয়া কাগজে পড়া গেল। মুঙ্গেরে সীতাকুণ্ড প্রভৃতি স্থানে অসংখ্য উষ্ণপ্রস্রবণ দেখা যায়, আগ্নেয়গিরির লক্ষণসমূহ বিচার করিলে এই সমস্ত ব্যাপারগুলিকে একেবারে উড়াইয়া দেওয়া চলে না।

হাওয়াই দ্বীপটী আমেরিকার সন্নিকটে এবং হোক্কাইডো জাপানের সমীপবর্ত্তী। ইহাদের উভয়েরই ব্যাপার অভিনব। কারণ পূর্ব্বে কখনও উহাদের নাম শুনা গিয়াছে বলিয়া মনে হয় না।

এক্ষণে উক্ত পর্ব্বতসমূহের লক্ষণগুলির বিষয় আলোচনা করা যাক। আমাদের তর্কশাস্ত্র বলেন, "পর্ব্বতো বহ্নিমান ধূমাৎ"। ইহার শাস্ত্রীয় প্রয়োজন যাহাই হউক না কেন, কিন্তু আমাদের মনে হয় উক্ত বচনটী আগ্নেয়গিরি সম্বন্ধে বিশেষভাবে প্রয়োজ্য। যদি কোন পর্ব্বত হইতে ধূম বা বাষ্প নির্গত হইতে দেখা যায়, তবে তাহা যে আগ্নেয়গিরি-সে সম্বন্ধে সন্দেহের কোন কারণ নাই।

আগ্নেয়পর্ব্বতের দ্বিতীয় লক্ষণ—গিরিনিঃস্রাব; উহা দেখিতে কতকটা শিলাজতুর ন্যায় এবং প্রথমাবস্থায় কর্দ্দমাকার—কিন্তু পরে ক্রমশঃ কঠিন হইয়া যায়, অগ্ন্যুদগীরণ সময়ে উত্তপ্ত বায়ুনির্গমনের সঙ্গে সঙ্গে উহা পর্ব্বতবিবর হইতে বাহির হইয়া পড়ে।

উষ্ণজলের উৎসকে তৃতীয় লক্ষণ বলিয়া ধরা হয়; কারণ উষ্ণজলের অস্তিত্ব গিরিগর্ভে তপ্ত বাষ্পের অস্তিত্বের একটী হেতু। আমাদের দেশের সীতাকুণ্ড, চন্দ্রনাথ প্রভৃতি স্থানে উষ্ণপ্রস্রবণের অভাব নাই। বদরীকাশ্রমেও উষ্ণপ্রস্রবণের বিষয় শুনা যায়, সুতরাং এসকলের উপর একটু নজর রাখা ভাল। জাপানের বান্দেসান পর্ব্বতে উপরি-উক্ত তিনটী লক্ষণ দেখিয়াই ১৮৭৮ খৃষ্টাব্দে অধ্যাপক মিল্‌নে উহাকে জীবন্ত আগ্নেয়গিরির শ্রেণীভুক্ত করিয়া ফেলিয়াছিলেন।

এখন দেখা যাক্, কি কারণে আগ্নেয় পর্ব্বত-গুলি সহসা আত্মপ্রকাশ করিয়া বসে। আমাদের ধরিত্রী জননী যে এক সময় জগৎসবিতা সূর্য্যের অঙ্কগতা ছিলেন, ইহা এখন প্রায় সর্ব্বজনবিদিত। ব্রাহ্মণের নিত্য উপাস্য গায়ত্রী মন্ত্রে উহার স্পষ্ট উল্লেখ আছে; সুতরাং ইনিও যে এক সময়ে ঐ সূর্য্যসমপ্রভাই ছিলেন তাহা বেশ বুঝা যায়। ইহাঁর সেই বংশগত তেজ ছাইচাকা আগুণের মত এখনও ইহাঁর বিপুলাকার গর্ভকোষ-সকলের মধ্যে গলিতভাবে অবস্থান করিতেছে। ঐ ভয়ঙ্কর অগ্নিময় তরল পদার্থের সহিত সুশীতল জলেরও সংস্পর্শ ঘটিলে উহা বাষ্পে পরিণত হইয়া যায়। চঞ্চলতম পদার্থসমূহের মধ্যে উত্তপ্ত বায়ু হইতেছে অন্যতম—স্থির থাকা তাহার স্বভাবই নয়—ইচ্ছা তাহার বাহির হওয়া, সুতরাং কোন কোমল স্থান খুঁজিয়া পাইলেই সে বজ্রের ন্যায় শব্দে তাহাকে ফ.টাইয়া দিয়া বাহির হইয়া পড়ে। উদাহরণস্বরূপ Steam Enginএর Boilerএর কথা বলা যাইতে পারে। অধিক বায়ু সঞ্চিত হইলে যেরূপে Boiler ফাটিয়া যায়, ইহাও প্রায় সেইরূপেই ঘটিয়া থাকে। আগ্নেয় গিরির বিস্ফোরণের কারণ ইহাই।

আগ্নেয়গিরির ইতিহাসে দুই প্রকার উদ্গীরণের কথা শুনা যায়। একপ্রকার উদ্গীরণ ধীরে ধীরে পর্ব্বতটীকে সংগঠিত করে; অপেক্ষাকৃত নিরাপদ তরল গিরিনিস্রাবের দ্বারাই ঐ কার্য্যটী সম্পন্ন হয়। গিরিনিস্রাব পর্ব্বতগাত্রে লাগিবামাত্রই কঠিন হইয়া যায়; এইরূপে স্তরের পর স্তর নির্ম্মিত হইয়া যখন পর্ব্বতটী একটী নির্দ্দিষ্ট আকারে উচ্চ হইয়া উঠে, তখন ভিতরের শক্তি আর উহাকে ঠেলিয়া তুলিতে অক্ষম হইয়াই যেন গুহামুখটীকে আপনাপনি বন্ধ করিয়া দেয়। উদাহরণস্বরূপ তুষারস্তূপ ও চুনের জলের ঝুরির নির্ম্মাণকথা বলা যাইতে পারে। দিনের পর দিন তুষার সঞ্চিত হইয়া যেরূপে একটী বরফ স্তূপে পরিণত হয় এবং চুনের জল গড়াইয়া পড়িবার সঙ্গে সঙ্গে দিনের পর দিন ধরিয়া যেরূপ ঝুরি নির্ম্মাণ-কার্য্য চলিতে থাকে, এক্ষেত্রেও কতকটা সেইরূপ। অনন্তর বহু যুগ অতীত হইলে লোকে মনে করে পর্ব্বতটী নির্জ্জীব, কিন্তু ভিতরের আগুণ একেবারে নিভিয়া যায় না—উহা বহু যুগ ধরিয়া ধীরে ধীরে শক্তিসঞ্চার করিতে থাকে; তাহার পর কোন সুযোগ পাইলেই পর্ব্বতটীকে সমূলে ধ্বংস করিয়া দেয়। ইহা যেন প্রাকৃতিক ছেলেখেলা! কত শীঘ্র ভাঙ্গা যায় ইহা দেখিবার উদ্দেশ্যেই যেন বহু যুগ ধরিয়া তাহার এই গঠন কার্য্য চলিয়াছিল। এই ধ্বংস-বহুল বিস্ফোরণ-সমূহই দ্বিতীয় প্রকারের উদ্গীরণ।

যে সলিলের স্পর্শে এই উদ্গীরণ-ব্যাপার সংঘটিত হয় সেই সলিল আসে কিরূপে, ইহাই এখন দেখা যাক। ঐ জল আসে নানা কারণে—প্রথমতঃ ভূস্তরের পুনর্গঠন কালে হ্রদের জল গুহা মধ্যে প্রবিষ্ট হইলে, দ্বিতীয়তঃ সমুদ্রজলের সহিত সংঘর্ষ ঘটিলে। শেষোক্ত কারণেই ভূগর্ভস্থ অগ্নির সহিত ভারতমহাসাগর ও চীনসমুদ্রের আটচল্লিশ ঘণ্টাব্যাপী যুদ্ধ-কালে ক্রাকাতোয়ার বিস্ফোরণ হইয়াছিল।

এক্ষণে প্রশ্ন হইতে পারে যে, ঐ জল তো বাষ্পরূপে বিস্ফোরণ সঙ্ঘটন করে, কিন্তু ভিতরের অগ্নিময় তরল পদার্থটীর কি অবস্থা হয়? ইহার উত্তর এই যে, ঐ তরল পদার্থটীই উক্ত বাষ্পের সঙ্গে সঙ্গে গিরিনিস্রাব বা তপ্ত কর্দ্দম আকারে বহির্গত হইয়া বহু গ্রামকে সমাধিস্থ করিয়া ফেলে এবং বহু নদীকেও গ্রাস করিয়া লয়। দৃষ্টান্ত-স্বরূপ জাপানের আসামা-গিরিনিস্রাবের বিষয় বলা যাইতে পারে; উহা গুহামুখ হইতে নির্গত হইয়া দুইটী সাধারণ নদীকে শুষিয়া লইয়াছিল এবং তাহার পর তাহাদের আর কোন চিহ্নই পাওয়া যায় নাই।

অনন্তর বিস্ফোরণ ব্যাপারের একটু সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দিয়া আমরা এই প্রবন্ধের উপসংহার করিব। বিস্ফোরণ সময়ে গুহামুখ হইতে প্রথমতঃ ধূলিপূর্ণ বাষ্পরাশি বাহির হইতে থাকে। উহা এরূপ ভাবে গগনমণ্ডলকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলে যে, দূর হইতে উহাকে দুরারোহ পর্ব্বতপ্রাকারের ন্যায় বোধ হয়। উহার উপরিভাগে লেলিহান সর্পাকৃতি অগ্নিশিখাসমূহ ক্রীড়া করিয়া উহার ভীষণতাকে শতগুণ বর্দ্ধিত করিয়া তোলে। বজ্র-ধ্বনির তুল্য অবিরাম প্রচণ্ড শব্দের সঙ্গে সঙ্গে যখন ঐ ধূম পর্ব্বতমুখ হইতে বহির্গত হয়, তখন আরব্যোপন্যাসের সেই কলসী মধ্যস্থ দৈত্যের কথা আপনাপনিই মনে উদিত হয়। ভীষণ গর্জ্জন, অবিরাম শিলাধূলি ও কর্দ্দম বৃষ্টি এবং অগ্নির বিচিত্র খেলার নিকট পৃথিবীর সমূহ শক্তির সমবেত গোলা বর্ষণকেও অতি তুচ্ছ বলিয়া মনে হয় এবং প্রলয়কালের একটী অস্পষ্টচিত্র কল্পনালোকে উঁকি-ঝুঁকি মারিতে থাকে। এক কথায় ইহাকে 'খণ্ড প্রলয়' বলিতে পারা যায়। এই প্রলয় এবং উহার ভয়াবহ উপকরণগুলিই লোকসমাজকে জানাইয়া দেয় যে, কি দানবীয় মহাশক্তি ধরিত্রী দেবীর গর্ভে গোপনভাবে অবস্থান করিতেছে।

———

বিবাহ-মঙ্গল।

ইমনকল্যাণ—একতালা।

এ মিলন সুখের হোক্
এ মিলন মধুর হোক্
বিধির বিধানে মিলিল দুজনে
বিধির চরণে রো'ক্।
এ মিলনে খুসী আকাশের তারা
নীলাকাশ হতে দিক্ জ্যোতিধারা
কাননের পাখী ওষধি ও শাখী
প্রেমের বারতা বো'ক্।
এ মিলন সুখের হোক্
এ মিলন মধুর হোক্॥

এ মিলন অমল হোক্
এ মিলন অমর হোক্
এ মিলন প্রেমজ্যোতিতে
নিয়ত উজল রো'ক্।
এ মিলন ঝড়ে ঝঞ্ঝায়
যেন উজ্জ্বলতম ভায়
প্রেমরবি হতে পায়
উছল অমৃতালোক।
এ মিলন সুখের হোক্
এ মিলন মধুর হোক্॥

কথা, সুর ও স্বরলিপি—শ্রীনির্ম্মলচন্দ্র বড়াল বি-এল্।

২´ ৩ ০ ১ ২´
পা II { পা পা পা। পা পা পা। ধর্সা -া -া। -গাঃ -মঃ গা I গা গা গা।
এ মি ল ন সু খে র হো০ ০ ০ ০ ক্ এ মি ল ন

৩ ০ ১ ১ ॥ ২´
। রা গা রা। সা -া -া। (-া পা পা)} I -া -া -া I সা সা -রা।
ম ধু র হো ০ ০ ০ ক্ এ ০ ০ ০ বি ধি র্

৩ ০ ১ ২´ ৩
। রা রা গা। সা. রগা গা। গা গা গা I সগা গা গা। রা গা রা।
বি ধা নে মি লি০ ল দু জ নে বি ধি র চ র ণে

০ ১
।সা -া -া। -া পা পা II
রো ০ ০ ০ ক্ 'এ'

২´ ৩ ০ ১ ২´
II গা গা পা। পা পা ধা। পা র্সা র্সা। -া র্সা র্সা I র্সা র্রা র্রা।
এ মি ল নে খু সী আ কা শে র্ তা রা নী লা কা

৩ ০ ১ ২´ ৩
। -া র্রা র্রর্সা। র্গা র্রা র্গা। র্রা র্সা র্সা I না না না। -া না নধা।
শ হ তে০ দি ক্ জ্যো তি ধা রা কা ন নে র্ পা খী০

০ ১ ২´ ৩ ০
। ধা না ধা। ধা পা পা I রা গা গা। রা গা রা। সা -া -া।
ও ষ ধি ও শা খী প্রে মে র বা র তা বো ০ ০

১
। -া পা পা II
০ ক্ 'এ'

২´ ৩ ০ ১ ২´
{ সা I । সা সা সা । সা ন্‌রা রা । রা -া া । -া -া রা I রা রা গা ।
এ মি ল ন অ ম০ ল হো ০ ০ ০ ক্‌ এ মি ল ন

৩ ০ ১ ২´ ৩
। সা রগা গা । গা -া -া । -া -া } পা I পা পা পা । পা পা পা ।
অ ম০ র হো ০ ০ ০ ক্‌ এ মি ল ন প্রে ম জ্যো

০ ১ ২´ ৩ ০
। পা ধন্না -া । -া -গাঃ -মঃ I মগা গা গরা । মগা রা রা । সা -া -া ।
তি তে০ ০ ০ ০ ০ নি র্ম ল উ জ্জ ল স্রো ০ ০

১ ২´ ৩ ০ ১
। -া -া -া I গা গা পা । পা পা ধা । পধা -নর্সা র্সা । -া র্সা র্সা I
০ ০ ক্‌ এ মি ল ন ঝ ড়ে ঝ০ ০ন্‌ ঝা র যে ন

২´ ৩ ০ ১ ২´
I র্সনা -র্রা র্রা । র্রা র্রা র্গা । র্গা -া -া । -া -া -া I র্সা র্গা র্গা ।
উ০ ০ জ্জ ল ত ম ভায় ০ ০ ০ ০ ০ প্রে ম র

৩ ০ ১ ২´ ৩
। র্গা র্রা র্রা । র্সা -া -া । -া -া -া I মগা গা গা । রা গা রা ।
বি হ তে পায় ০ ০ ০ ০ ০ উ ছ ল অ মৃ তা

০ ১
। সা -া -া । -া -পা পা II II
লো ০ ০ ০ ক্‌ 'এ'

শ্রীরামানুজ স্বামী।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

(শ্রীকালীপ্রসন্ন বিশ্বাস)

নম্বী এই প্রকারে রামানুজকে বুঝাইতে লাগিলেন। কিন্তু রামানুজ নম্বীর অসাধারণ ব্রহ্মজ্ঞান ও ব্রহ্মনিষ্ঠতা দেখিয়া এতদূর মোহিত হইয়াছিলেন যে, তিনি কিছুতেই তাঁহার উদ্দেশ্য-পথ পরিত্যাগ করিতে স্বীকৃত হইলেন না। তিনি বলিলেন, "জাতিগত প্রতিবন্ধক থাকিলেও আপনার প্রতি আমার যে অচলা ভক্তি জন্মিয়াছে তাহা সর্ব্বদা অক্ষুণ্ণ থাকিবে। ইহা আমাকে অভীষ্ট পথ হইতে সহজে বিচ্যুত করিতে পারিবে না।" এই বলিয়া তিনি নম্বীর নিকট হইতে বিদায় লইলেন।

সমস্ত রাত্রি কি উপায়ে তাঁহার অভীষ্ট সিদ্ধ হইবে তদ্বিষয়ে চিন্তা করিতে লাগিলেন। পরদিন প্রাতে তিনি নম্বীর গৃহে গমন করিয়া তাঁহাকে স্বীয় ভবনে আহার করিবার জন্য নিমন্ত্রণ করিলেন। এই স্থলে বলা আবশ্যক যে দাক্ষিণাত্যে কোন ব্রাহ্মণ কখনও শূদ্রকে ভোজন করিবার জন্য নিমন্ত্রণ করেন না। এমন কি, তাঁহাদের বাটীতে বসিয়া কোন শূদ্রকে আহার করিতে দেন না। যাহা হউক নম্বী এই নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিলেন।

রামানুজ গৃহে প্রত্যাগমন করিয়া তাঁহার স্ত্রীকে নানাবিধ অন্নব্যঞ্জনাদি আহার্য্য দ্রব্য প্রস্তুত করিতে আদেশ করিলেন। তৎপরে শীঘ্র পূজাদি সমাপন করিয়া নম্বীর ভবনে গমন করিলেন। ইতিমধ্যে নম্বী অপর পথ দিয়া রামানুজের বাটীতে উপস্থিত হইলেন এবং তাঁহার স্ত্রীকে আহার্য্য দ্রব্যসকল প্রদান করিতে বলিলেন। রামানুজ-পত্নী তাহাই করিলেন। নম্বী অতি শীঘ্র ভোজন সমাপন

করিয়া মন্দিরে প্রত্যাগমন করিলেন। রামানুজপত্নী একটি কাষ্ঠখণ্ডের দ্বারা নম্বীর উচ্ছিষ্ট-পত্র ফেলিয়া দিয়া এবং উচ্ছিষ্ট স্থানে গোময় লেপন করিয়া, দ্বিতীয় বার স্নান করতঃ গৃহে আসিতেছেন, এমন সময় রামানুজ আসিয়া সকল কথা অবগত হইলেন।

যদিও নম্বী রামানুজকে শিষ্যত্বে গ্রহণ করিতে স্বীকার করেন নাই, কিন্তু রামানুজ ভাবিয়াছিলেন যে কোন প্রকারে তাঁহার উচ্ছিষ্ট ভক্ষণ করিয়া গৌণ শিষ্যরূপে পরিণত হইবেন। অনেকের বিশ্বাস যে কাহারও উচ্ছিষ্ট অন্ন ভক্ষণ করিলে উক্ত ব্যক্তির তেজের কিঞ্চিৎ লাঘব করা হয়। এই জন্য অনেক শূদ্র গুরুর উচ্ছিষ্ট অন্ন ভক্ষণ করা কর্ত্তব্য মনে করেন। আমাদের দেশেও এইরূপ প্রথা কোন কোন সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রচলিত আছে।

রামানুজ এবারে স্ত্রীকে প্রশ্ন করিলেন "তুমি কি জন্যই বা দ্বিতীয় বার স্নান করিলে, কেনই বা উচ্ছিষ্ট ত্র কাষ্ঠখণ্ডের দ্বারা ফেলিয়া দিলে এবং কেনই বা উচ্ছিষ্ট-ক্ষেত্রে গোময় লেপন করিলে?" রামানুজপত্নী বলিলেন, "নম্বী নীচজাতীয় শূদ্র; তাহার উচ্ছিষ্ট অতি অপবিত্র, সুতরাং আমি ঐরূপ কার্য্য করিয়াছি।" রামানুজ ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন—"নম্বীর উচ্ছিষ্ট অপবিত্র! রে হতভাগিনী, তুমি ঐ উচ্ছিষ্টের মূল্য জান না। আমি যাহাকে নিজের বাটীতে আহার করিবার জন্য নিমন্ত্রণ করিয়া আনিয়াছি, তিনি তোমার ভক্তির পাত্র হওয়া উচিত। তুমি ইহার মর্ম্ম কিছুই জান না। তুমি জান না, তুমি আমাকে কি অমৃত হইতে বঞ্চিত করিলে। নিশ্চয়ই তোমাকে এই-বার একদিন পিতৃভবনে গমন করিতে হইবে।"

এইরূপে স্ত্রীকে ভর্ৎসনা করিয়া রামানুজ নম্বীকে অন্বেষণ করিতে গমন করিলেন। তৎপরে নম্বীর নিকট পৌঁছিয়া করজোড়ে নিবেদন করিলেন, "আমার মনে কিছু আকাঙ্ক্ষা আছে। আপনি কি অনুগ্রহপূর্ব্বক বরদ-রাজকে জিজ্ঞাসা করিবেন, আমার সেই প্রার্থনা পূর্ণ হইবে কি না?"

কথিত আছে যে, পরদিবস যখন নম্বী বরদরাজের নিকট উপস্থিত হইলেন, বরদদেব তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"প্রিয় নম্বী, আমার অনুমান হইতেছে যে তুমি আমার নিকট কিছু প্রশ্ন করিতে ইচ্ছা করিয়াছ?" নম্বী বলিলেন, "হাঁ দেব, ইহা সত্য। রামানুজ আজ আমাকে আপনার নিকট জিজ্ঞাসা করিতে অনুরোধ করিয়াছেন যে, তাঁহার মনে যে অভিলাষ আছে তাহা পূর্ণ হইবে কি না? তিনি অত্যন্ত ভগ্নহৃদয় হইয়াছেন। এই প্রশ্নের উত্তরের উপর তাঁহার ভবিষ্যৎ নির্ভর করিতেছে।" বরদরাজ বলিলেন, "সত্যই এইরূপ? এই যুবক অতি ভাগ্যবান। তাঁহার পক্ষে কাহারও শিষ্যত্ব গ্রহণ করা কর্ম্মকাণ্ডের আবশ্যকীয় ক্রিয়া মাত্র। আমিও ঐরূপ সন্দীপন মুনির শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়াছিলাম। তাঁহার প্রশ্ন কি তিনি প্রকাশ করেন নাই বটে, তবে আমি তোমাকে ঐ সকল প্রশ্নের উত্তর বলিয়া দিতেছি শ্রবণ কর। এই কথা তুমি রামানুজকে গিয়া বলিবে। (১) আমিই সত্যস্বরূপ ব্রহ্ম। (২) আত্মা ও পরমাত্মার মধ্যে সূক্ষ্ম বিভিন্নতাই সত্যধর্ম্মপ্রতিপাদক। (৩) আমাতে আত্ম-সমর্পণ করাই মোক্ষপ্রাপ্তির একমাত্র উপায়। (৪) জীবনান্ত সময়ে আমাকে একান্ত মনে চিন্তা করারও আবশ্যক নাই। (৫) আমাতে আত্মনির্ভরকারী ব্যক্তি মৃত্যুর পর অনন্তকাল পর্য্যন্ত আমার নিকট অবস্থান করেন। (৬) প্রশ্নকারীর তাঁহার গুরু মহাপূর্ণের শিষ্যত্ব গ্রহণ করা কর্ত্তব্য।"

পরদিবস প্রাতে নম্বী এই সকল কথা রামানুজকে অবগত করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"এই সকল বিষয়ই কি তোমার প্রশ্নের উত্তর? আমি আশা করি তুমি ঠিক ঠিক উত্তর পাইয়াছ।" রামানুজ বলিলেন, "যখন স্বয়ং বরদ-রাজ এই সকল উত্তর দিয়াছেন, তখন কি তাহা আমার প্রশ্নের অনুরূপ না হইতে পারে?" নম্বী বলিলেন, "রামা-নুজ! তুমিই ধন্য। তোমার দ্বারাই ভগবানের কার্য্য সুসম্পন্ন হইবে।"

এদিকে একদিবস যমুনাচার্য্যের শিষ্যগণ মহাপূর্ণের নিকট উপস্থিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "হে প্রভো! আপনি কি বলিতে পারেন কোন্ মহাপুরুষ ভবিষ্যতে সত্যধর্ম্ম প্রচার করিবেন?" মহাপূর্ণ বলিলেন, "তোমরা কি গুরুদেবের মৃত্যুদিনের সেই আশ্চর্য্য ঘটনা ইহার মধ্যেই ভুলিয়া গিয়াছ? গুরুদেব মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত যাহাকে স্বস্থানে বরণ করিবার অভিলাষ করিয়াছিলেন সেই রামানুজ ভিন্ন আর কে তাঁহার পদাভিষিক্ত হইবার উপযুক্ত হইতে পারে?" শিষ্যগণ বলিলেন, "তবে আপনি কাঞ্চীনগরে গমন করিয়া আমাদের ভবিষ্যৎ গুরুদেবকে আনয়ন করুন।" মহাপূর্ণ বলিলেন, "তবে তাহাই হউক।"

ইত্যবসরে রামানুজ ও বরদরাজও কাঞ্চীপূর্ণের নিকট বিদায় গ্রহণ করিয়া শ্রীরঙ্গমাভিমুখে যাত্রা করিলেন। পথিমধ্যে তিনি বর্ত্তমান কিংগলীপেট জেলায় মদুরান্তকম নামক স্থানে তথাক পালক নামক দেবতার মন্দিরে প্রবেশ করিলেন। এই মন্দিরাভ্যন্তরে প্রবেশ করিবামাত্রই মহাপূর্ণের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইল। রামানুজ তখন মহাপূর্ণের পদতলে পতিত হইয়া তাঁহার পদদ্বয় আনন্দাশ্রুতে ধৌত করিলেন এবং তাঁহার নিকট কাঞ্চীশ্বরের প্রশ্নোত্তর কথা ব্যক্ত করিলেন। তৎপরে রামানুজ বলি-

লেন—"মহাভাগ, আমাকে শিষ্যরূপে গ্রহণ করিয়া আমার অজ্ঞানান্ধকার দূর করিয়া দিন।" মহাপূর্ণ বলিলেন, "এত ব্যস্ত হইবার আবশ্যক কি? কাঞ্চীতে প্রত্যাগমন করিয়া যে দেবতা আজ আমাদের উভয়কে একত্র করিয়াছেন তাঁহার সম্মুখে তোমাকে ভগবানের সেবায় নিযুক্ত করিব।" রামানুজ বলিলেন, "বিলম্বের কথা কি বলিতেছেন? আপনি জানেন, যখন আমি গুরুদেব যমুনাচার্য্যের নিকট শিক্ষার জন্য গিয়াছিলাম, তখন কি ঘটিয়াছিল। আমাদের এই ক্ষণভঙ্গুর দেহপিঞ্জরের মধ্যে বাস করা এতই স্থির নিশ্চিত কি, যে আমরা কাঞ্চী-প্রত্যাগমন কাল পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিতে পারি?" মহাপূর্ণ স্বগত বলিলেন, "কি প্রবল ধর্ম্মপিপাসা!"

তৎপরে মহাপূর্ণ রামানুজকে নিকটবর্তী এক বকুল-বৃক্ষের তলে লইয়া গিয়া তাঁহার কপোলদেশে বৈষ্ণবী রেখা তিলকাদি অঙ্কিত করিয়া দিয়া দেবসেবাব্রতে ব্রতী করাইলেন।

তৎপরে মহাপূর্ণ রামানুজকে তাঁহার দক্ষিণ দিকে বসাইয়া তাঁহার মস্তকে দক্ষিণ হস্ত এবং বক্ষস্থলে বাম হস্ত রাখিয়া তাঁহার প্রতি একবার দৃষ্টিনিক্ষেপ করিলেন এবং ভগবানের নাম গ্রহণপূর্ব্বক যমুনাচার্য্য-প্রদর্শিত নিয়ম অনুসারে বিশিষ্টাদ্বৈত মতে দীক্ষা প্রদান করিলেন। তৎপরে তিনি উচ্চৈঃস্বরে বলিলেন, "ত্রেতাযুগে পিতৃসত্য পালনার্থ ভগবান রামচন্দ্র পিতার অভিলাষ মত সিংহাসন গ্রহণ করিতে না পারায় যেমন ভরতের হস্তে রাজ্যভার ন্যস্ত করিয়া স্বীয় চিহ্নস্বরূপ পাদুকা রাখিয়া গিয়াছিলেন, আমাদের গুরুদেব যমুনাচার্য্যও তেমনই তোমাকে স্বহস্তে দীক্ষিত করিবার অবসর না পাইয়া আমাকে তোমার দীক্ষার জন্য প্রতিনিধি নিয়োগ করিয়া গিয়াছেন। এমতে তুমি প্রকৃতপক্ষে তাঁহারই নিকট হইতে দীক্ষা গ্রহণ করিলে—আমার নিকট হইতে নহে।"

রামানুজ বলিলেন, "প্রভু! আপনি কি আমাকে বলিয়া দিবেন, জীবনে কি উদ্দেশ্য সাধনা করা কর্ত্তব্য? কি উপায়েই বা ইহাতে সফলকাম হইতে পারা যায়? এবং কেই বা সেই উদ্দিষ্ট দেবতা?" মহাপূর্ণ বলিলেন, "ভগবান বরদরাজই সেই উদ্দিষ্ট দেবতা। আমি যে তোমাকে দ্বিসত্য মন্ত্রে দীক্ষিত করিলাম, সেই মন্ত্র সাধনার দ্বারাই উঁহাকে প্রাপ্ত হওয়া যায়, আর তিনিই আমাদের গন্তব্য স্থান। এক্ষণে মৎকর্ত্তৃক প্রদর্শিত পথ অবলম্বন করিয়া উক্ত গন্তব্যপথে অগ্রসর হও।"

পরদিবস প্রাতে উভয়ে কাঞ্চী অভিমুখে যাত্রা করিলেন। মহাপূর্ণ মন্দিরে প্রবেশ করিয়া কাঞ্চীপূর্ণের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন এবং বরদরাজের পূজা করিলেন।

অতঃপর রামানুজ মহাপূর্ণকে স্বীয় আলয়ে বাস করিবার জন্য অনুরোধ করিলেন। মহাপূর্ণ ইহাতে সম্মত হইলেন। রামানুজের ন্যায় একজন ব্রাহ্মণের পক্ষে ইহা বড় সামান্য সাহসের কার্য্য নহে। দাক্ষিণাত্যে ব্রাহ্মণগণ মহাপূর্ণের স্বজাতীয় ব্যক্তিগণকে বাড়ীতে আসিতে দেওয়া দূরে থাকুক, গ্রামের মধ্যেও আসিতে দেয় না। কোন শূদ্র তাহাদিগের বাড়ীতে বসিয়া আহার করিতেও পায় না। ব্রাহ্মণেরা আহার করিবার সময় যদি কোন শূদ্র তথায় উপস্থিত হয়, তাহা হইলে তাহাকে তৎক্ষণাৎ বাটী হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দেওয়া হয় এবং ঐ অন্ন ফেলিয়া দেওয়া হয়। যাহা হউক, মহাপূর্ণ রামানুজের বাড়ীতে থাকিয়া তিন মাস কাল তাঁহাকে ধর্ম্মশিক্ষা প্রদান করিলেন। কিছু দিন পরে রামানুজের স্ত্রীও মহাপূর্ণ কর্ত্তৃক বৈষ্ণবধর্ম্মে দীক্ষিত হইলেন। তৎপরে স্বামী ও স্ত্রী উভয়ে মিলিত হইয়া মহাপূর্ণের পাদোদক সেবন করিলেন।

কিছুদিন পরে একজন বৈষ্ণব সাধু রামানুজের সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিলেন। রামানুজ দেখিলেন যে, সে ব্যক্তি ক্ষুৎপিপাসায় অতিশয় কাতর এবং এতাদৃশ দুর্ব্বল যে তাহার অধিকক্ষণ দাঁড়াইবার ক্ষমতা নাই। রামানুজ তাঁহার স্ত্রীকে ডাকিয়া বলিলেন—"দেখ, এই বৈষ্ণব অনাহারে অতিশয় দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছে। শীঘ্র ইহাকে কিছু খাদ্যদ্রব্য প্রদান কর।" রামানুজপত্নী উত্তর করিলেন—"এখনও রন্ধন হয় নাই।" রামানুজ বলিলেন, "তবে কল্যকার অন্নের যাহা কিছু অবশিষ্ট আছে, তাহাই শীঘ্র আনিয়া দাও।" পত্নী বলিলেন "তাহা হইতেও কিছু দিবার নাই।" রামানুজ তাঁহার স্ত্রীকে ভালরূপই জানিতেন; এজন্য তিনি তাঁহাকে কার্য্যান্তরে প্রেরণ করিয়া রন্ধনশালায় প্রবেশপূর্ব্বক দেখিলেন যে, তথায় পূর্ব্বদিনের প্রচুর অন্নব্যঞ্জনাদি রহিয়াছে। তাঁহার স্ত্রী ফিরিয়া আসিবামাত্র তিনি ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন—"এই তুমি দ্বিতীয়বার ভগবানের ভক্তের প্রতি অনাদর করিলে। এই বৈষ্ণবকে ক্ষুধায় মূর্চ্ছিতের ন্যায় দেখিয়াও তাহাকে এক মুষ্টি অন্নদানেও অস্বীকৃত হইলে এবং আমার নিকট মিথ্যা কথা বলিলে। আমি কি কঠিনহৃদয় নারীকে আমার সহধর্ম্মিণীরূপে প্রাপ্ত হইয়াছি! সাবধান, পুনরায় এরূপ করিও না।"

এই ঘটনার কিছুদিন পরে একদিন রামানুজপত্নী মহাপূর্ণের পত্নীর সহিত কোন কূপ হইতে একত্র জল তুলিবার সময় মহাপূর্ণপত্নীর কলসস্থ জলবিন্দু রামানুজ-পত্নীর গাত্রে পতিত হয়। ইহাতে তিনি ক্রুদ্ধ হইয়া মহাপূর্ণপত্নীকে নীচজাতি বলিয়া গালি দেন। ইহাতে উভয়ের মধ্যে কলহ উপস্থিত হয়। এই কথা মহাপূর্ণের

কর্ণে পৌঁছিলে তিনি তাঁহার স্ত্রীকে যৎপরোনাস্তি ভর্ৎসনা করেন এবং রামানুজ একথা জানিবার পূর্ব্বে তাঁহার স্ত্রীকে লইয়া শ্রীরঙ্গমে চলিয়া যান। রামানুজ গৃহে প্রত্যাগমনের পর সকল বৃত্তান্ত অবগত হইয়া সাশ্রু নয়নে তাঁহার স্ত্রীকে বলিলেন—"তোমার পাপতার পূর্ণ হইয়াছে। প্রথমতঃ তুমি আমাকে মহাপূর্ণের প্রসাদগ্রহণ হইতে বঞ্চিত করিয়াছ, দ্বিতীয়তঃ ক্ষুধার্ত্ত শ্রীবৈষ্ণবকে অন্নদানে অস্বীকৃত হইয়াছ; এক্ষণে তুমি আমার গুরুদেবকে গৃহ হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিয়া আমাকে পাপে মগ্ন করিয়াছ। তুমি জান না যে আমার গুরুদেব—আমার স্ত্রী, আমার নিজজীবন, এমন কি আমার ইহ ও পরজন্মের সকল কাম্যবস্তু অপেক্ষা অধিক মূল্যবান। সত্য, আমার ন্যায় দরিদ্র ব্যক্তির পক্ষে তোমার মত স্ত্রী অতি ভয়ঙ্করী। তুমি আমার ধর্ম্মপথের সহায়তা না করিয়া আমার প্রাণ ও আত্মা উভয়কেই নষ্ট করিতে বসিয়াছ। তোমাকে আমি বারবার সাবধান করিয়া দিয়াছি। এক্ষণে তোমাকে পিত্রালয়ে যাইতে হইবে। তোমার যাহা কিছু লইতে ইচ্ছা হয়, তাহা লইয়া প্রস্তুত হও।" এই কথা শুনিয়া রামানুজপত্নী ভয়ে শঙ্কিত হইয়া কম্পিতকলেবরে জড়পদার্থের ন্যায় দণ্ডায়মানা রহিলেন। রামানুজ সহজে ক্রোধের বশীভূত হইতেন না, তিনিও শান্তভাব ধারণ করিলেন; কিন্তু তাঁহার স্ত্রীকে স্থানান্তরিত করিবার ইচ্ছা তাঁহার মন হইতে তিরোহিত হইল না।

একদিন রামানুজ বরদরাজের মন্দিরে দেবসেবায় নিযুক্ত আছেন, এমন সময় একজন দরিদ্র ব্রাহ্মণ আসিয়া তাঁহাকে বলিলেন যে, তিনি ক্ষুৎপিপাসায় অতিশয় কাতর হইয়াছেন; এজন্য তাঁহার নিকট কিঞ্চিৎ অন্নভিক্ষা করিতেছেন। রামানুজ বলিলেন, "আমি এখানে দেবকার্য্যে নিযুক্ত আছি; আমার বাড়ী যাইবার অবসর নাই। আপনি অনুগ্রহপূর্ব্বক আমার বাটীতে গমন করিয়া আমার স্ত্রীর নিকট আমার নাম করিয়া উপস্থিত হউন, তিনি আপনাকে পরিতোষের সহিত আহার করাইবেন।" এই কথা শুনিয়া ব্রাহ্মণ রামানুজপত্নীর নিকট যাইয়া অন্ন প্রার্থনা করিলেন। কটুভাষিণী রামানুজপত্নী ব্রাহ্মণকে তাঁহার দারিদ্র্য উপলক্ষ করিয়া নানাপ্রকার কটুবাক্যে তিরস্কারপূর্ব্বক ফিরাইয়া দিলেন। ব্রাহ্মণ এইরূপে অপমানিত ও মর্ম্মাহত হইয়া রামানুজের নিকট প্রত্যাগমনপূর্ব্বক তাঁহাকে সকল কথা অবগত করাইয়া বলিলেন—"আপনি কি আমাকে এইরূপে অপমান করাইবার জন্যই আপনার স্ত্রীর নিকট প্রেরণ করিয়াছিলেন?" ইহাতে রামানুজ অতিশয় ব্যথিত হইয়া সেই দিনই তাঁহার স্ত্রীকে পিত্রালয়ে পাঠাইতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। তৎপরে একখানি পত্র ও নানাবিধ বস্ত্রাদি উপঢৌকন দিয়া ব্রাহ্মণকে বলিলেন যে, আপনি আমার স্ত্রীর নিকট যাইয়া বলুন যে তাঁহার ভ্রাতার বিবাহ সন্নিকট, সেজন্য আপনি তাঁহার পিত্রালয় হইতে তাঁহাকে লইতে আসিয়াছেন। ব্রাহ্মণ সেই সকল উপঢৌকনাদি সহ পত্রখানি লইয়া রামানুজপত্নীকে বলিলেন যে, তিনি প্রথমে ছলনা করিয়া তাঁহার আতিথ্য গ্রহণ করিতে আসিয়াছিলেন মাত্র। প্রকৃতপক্ষে তিনি তাঁহার পিত্রালয় হইতে তাঁহাকে লইতে আসিয়াছেন। তৎপরে সেই পত্র এবং দ্রব্যাদি তাঁহাকে প্রদান করিলেন। রামানুজপত্নী পত্রখানি পাঠ করিয়া এবং নানাবিধ মূল্যবান বস্ত্র এবং উপঢৌকনাদি দেখিয়া অতিশয় সন্তুষ্ট হইলেন এবং ব্রাহ্মণকে বলিলেন যে, তাঁহাকে অভুক্ত অবস্থায় ফিরাইয়া দিয়া তিনি অতি কুকর্ম্মই করিয়াছেন। এই বলিয়া তাঁহাকে নানাবিধ খাদ্যসামগ্রী দ্বারা পরিতোষের সহিত আহার করাইলেন এবং নিজ পিতা মাতা, ভ্রাতা ও আত্মীয়স্বজনের সম্বন্ধে নানা কথা জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। ব্রাহ্মণও রামানুজ কর্ত্তৃক উপদিষ্ট হইয়া সেই সকলের যথাযথ উত্তর দিয়া রামানুজপত্নীর বিশ্বাসভাজন হইলেন। ইত্যবসরে রামানুজ গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন। তিনি আসিবামাত্র তাঁহার পত্নী তাঁহাকে আনন্দের সহিত সকল কথা অবগত করাইয়া পিত্রালয়ে যাইবার অনুমতি প্রার্থনা করিলেন। রামানুজ বলিলেন, "হে সুভগে, তোমার ভ্রাতার বিবাহ উপলক্ষে আমাদের উভয়েরই তথায় উপস্থিত থাকা কর্ত্তব্য; তবে আমার কিছু কার্য্য আছে, সেজন্য তুমি এই ব্রাহ্মণের সহিত গমন কর, আমি নির্দ্দিষ্ট দিনের পূর্ব্বেই তথায় উপস্থিত হইব।" তৎপরে রামানুজপত্নী তাঁহার পিতৃদত্ত বসনভূষণ, দানসামগ্রী ও দাসদাসী সমভিব্যাহারে ব্রাহ্মণের সহিত পিত্রালয়ে গমন করিলেন। সে-ই তাঁহার জন্মের মত পতিগৃহত্যাগ; ইহার পর রামানুজ তাঁহাকে চিরতরে অন্তরাল করিলেন।

এই ঘটনার পর রামানুজ সন্ন্যাসধর্ম্ম গ্রহণ করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। তৎপরে অনন্তসরোবরে অবগাহন করিয়া বরদরাজের নিকট উপস্থিত হইয়া বলিলেন, প্রভু, আমার সংসারের সকল সুখ পরিতৃপ্ত হইয়াছে; এক্ষণে আমাকে সন্ন্যাসধর্ম্মে দীক্ষিত করিয়া চিরদিন আপনার চরণসেবা করিবার উপযুক্ত করুন। তৎপরে তিনি নবীকর্ত্তৃক সন্ন্যাসধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়া রামানুজমুনি নাম গ্রহণ করিলেন।

ঠোঙ্গাপ্রস্তুত।

আমার গৃহে প্রতি সপ্তাহে বিস্তর খবরের কাগজ সংগৃহীত হয়। সেইগুলি হইতে আমি যেগুলি কাটিয়া রাখা আবশ্যক মনে করি, তাহা কাটিয়া লইয়া অবশিষ্ট অংশ স্তূপাকার করিয়া রাখিয়া দিই। অবশেষে চাকরেরা পুরাতন কাগজওয়ালা ডাকিয়া আনিলে তাহাকে ঐ কাগজগুলি বিক্রয় করিয়া দিই এবং চাকরেরা সেই পয়সা ভাগাভাগি করিয়া লইয়া 'পানসুপারি' কিনিবার ব্যবস্থা করে। পূর্ব্বে সাধারণত একসের কাগজ (Statesman প্রভৃতি ইংরেজী কাগজ) চারি আনায় বিক্রয় হইত এবং অন্য বাংলা প্রভৃতি কাগজ দুই আনায় সের বিক্রয় হইত। যুদ্ধের সময় ইংরেজী কাগজের দর আট আনা পর্য্যন্ত উঠিয়াছিল। কিন্তু সে দিন এক কাগজওয়ালা দর বলিল ছয় পয়সায় সের। আমি তো অবাক হইয়া গেলাম। অবশেষে আমি Salvation Armyর কাগজের আড়তে দর জানিতে পাঠাইলাম। সেখানে জানা গেল, অনেক ইংরাজ তাহাদিগকে কাগজ পাঠাইয়া দেন এবং তাহারা সাধারণত মুসলমান ঠোঙ্গাওয়ালাদিগকে কাগজ বিক্রয় করে। ইহা শুনিয়া আমার মনে আসিল যে, হিন্দু বিধবা প্রভৃতি মহিলারা যদি ঠোঙ্গা প্রস্তুত করেন, তবে তাঁহাদের বিশেষ লাভ হইতে পারে। শুনিয়াছি ইহাতে শতকরা একশত টাকা বা cent per cent লাভ হয়। আমি যথাসাধ্য কাগজ যোগাইবার এবং ঠোঙ্গা প্রস্তুত হইলে দোকানদারদের মধ্যে উহা বিক্রয় করিবার ব্যবস্থার চেষ্টা করিতে পারি। কোন পাঠক বা পাঠিকা যদি এ বিষয়ের ভার গ্রহণ করেন, তবে আমার সাধ্যমত আমি তাঁহাকে সাহায্য করিতে প্রস্তুত আছি। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, ইহাতে আমাদের জাতির ও দেশের বিশেষ মঙ্গল সাধিত হইবে।

৫। ১ বি, বারাণসী ঘোষের
সেকেণ্ড লেন,
(রাজেন্দ্রমল্লিকের ষ্ট্রীট হইতে)
সিংহীবাজার, জোড়াসাঁকো
কলিকাতা।

শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

গ্রন্থ-পরিচয়।

(শ্রীক্ষেমেন্দ্রনাথ ঠাকুর বি-এস্-সি)

সাধক কমলাকান্ত—শ্রীঅতুলচন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রণীত। মূল্য ৩৲ টাকা। প্রাপ্তিস্থান—শ্রীঅম্বিকাচরণ নাথ বি-এল, রিপণ লাইব্রেরী—ঢাকা।

গ্রন্থটী পড়িয়া আমরা অতিশয় আনন্দিত হইলাম। গ্রন্থকারের 'রামপ্রসাদ' সম্বন্ধে আমরা যে মত প্রকাশ করিয়াছি, এই গ্রন্থ সম্বন্ধেও আমাদের সেই মত অব্যাহত আছে। গ্রন্থকার যে সাধকের জীবনীর উপকরণ সংগ্রহের জন্য রীতিমত খাটিয়াছেন, তাহা পত্রে পত্রে দেদীপ্যমান। কমলাকান্তের অনেকগুলি সঙ্গীত এই গ্রন্থে সংগৃহীত হইয়াছে। গ্রন্থকারের চেষ্টা ও উদ্যম কেবল প্রশংসনীয় নহে—ভবিষ্যজীবনী-লেখকগণের অনুকরণীয়। এত পরিশ্রম করিয়া জীবনী লেখা এই দেশে আর কেহ করিয়াছেন কি না জানি না; আমরা গ্রন্থকারের লেখনী হইতে এইরূপ আরও গ্রন্থের আশা করি। গ্রন্থের ভাষা স্বচ্ছ ও প্রাঞ্জল। ইহাতে অনেকগুলি দুষ্প্রাপ্য মূল্যবান চিত্রও আছে। কাগজ ও ছাপা ও বাঁধাই সুন্দর।

গ্রহবিপ্র ইতিহাস—শ্রীরাধাবল্লভ স্মৃতি-ব্যাকরণ-জ্যোতিস্তীর্থ সঙ্কলিত। মূল্য ১৲ টাকা। ৯৬/১ শ্যামবাজার ষ্ট্রীটস্থ 'বেদাঙ্গচতুষ্পাঠী'-গ্রন্থকার-ভবন হইতে শ্রীদিগিন্দ্রনাথ পাঠক কর্ত্তৃক প্রকাশিত। গ্রন্থকার অতি নিপুণভাবে গ্রহবিপ্রগণের ইতিহাস পুরাণাদি শাস্ত্র সাহায্যে আলোচনা করিয়াছেন। সমাজতত্ত্বান্বেষী পাঠকগণের নিকট ইহা উপাদেয় বোধ হইবে। আমরা ব্রাহ্মণ্যাভিমানী অন্য শ্রেণীস্থ ব্রাহ্মণগণকে এই গ্রন্থটী পাঠ করিতে বিশেষভাবে অনুরোধ করি। আমরাও গ্রন্থকারের সহিত একতানে গ্রহবিপ্রগণের সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি কামনা করি।

শ্রীশ্রীযোগিরাজ গম্ভীরনাথ-প্রসঙ্গ—ময়মনসিংহ আনন্দমোহন কলেজের দর্শনাধ্যাপক শ্রীঅক্ষয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় এম্-এ প্রণীত। প্রকাশক শ্রীমণীন্দ্রচন্দ্র মুখোপাধ্যায় বি-এ—হেডমাষ্টার ফেণী হাইস্কুল। মূল্য লেখা নাই।

এই গ্রন্থে জনসাধারণ যাহাতে মহাপুরুষ গম্ভীরনাথকে ঠিক করিয়া বুঝিতে পারে, গ্রন্থকার সেই বিষয়ে বিশেষ চেষ্টা করিয়াছেন। তাঁহার চেষ্টা যে সফলতা লাভ করিয়াছে, তাহা গ্রন্থটী পাঠ করিলেই বেশ বুঝা যায়। গ্রন্থকার এই গ্রন্থে গম্ভীরনাথের সকল দিক ভক্তচক্ষে কিরূপ প্রতিভাত হয় তাহা বেশ খুলিয়া দেখাইতে পারিয়াছেন। আনুষঙ্গিকরূপে তিনি কিছু-কিছু দার্শনিক আলোচনাও করিয়াছেন। এই আলোচনার স্থলবিশেষে আমাদের মতভেদ থাকিলেও মোটের উপর গ্রন্থটী যে বেশ সুখপাঠ্য ও কৌতূহলোদ্দীপক হইয়াছে তাহা স্বীকার করিতেই হইবে।

'রাম-রাজত্ব' ও 'টাকার মাহাত্ম্য'—শ্রীহেমেন্দ্রবিজয় সেন বি-এ প্রণীত। শ্রীপরমেশকুমার রায় ২০/বি দুর্গাচরণ মিত্রের ষ্ট্রীট, কলিকাতা হইতে প্রকাশিত। উভয় পুস্তিকাই কতিপয় গদ্য ও পদ্যের

সমষ্টি। ১৪-১৫ পাতার চটী বই। প্রত্যেকটী পুস্তিকার মূল্য ৵০ আনা।

ঈশ্বরের স্বরূপতত্ত্ব ও প্রার্থনা—শ্রীরামচন্দ্র দত্ত কর্ত্তৃক প্রণীত ও প্রকাশিত। গ্রন্থ পাইবার ঠিকানা—১০৫ বেলগাছিয়া রোড, কলিকাতা; অথবা জেলা খুলনা, পোঃ আঃ ছয়ঘরিয়ার অন্তর্গত আম্রতলা গ্রাম—গ্রন্থকারের নিকট। মূল্য ১৲ টাকা।

এই লেখক সরল ভাষায় নিপুণ ভাবে প্রার্থনার বিষয় ও আনুষঙ্গিকরূপে ঈশ্বরের স্বরূপতত্ত্ব আলোচনা করিয়াছেন। ইহাতে কতকগুলি প্রার্থনাও সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। প্রার্থনাগুলি হৃদয়স্পর্শী ও মনোরম। আমরা গ্রন্থকারের নিকট এই জাতীয় আরও গ্রন্থের আশা করি।

আত্মোন্নতি—শ্রীভুবনমোহন দাস এম-এ প্রণীত। প্রকাশক বি কে দাস ১০/এ শ্রীনাথ দাসের লেন, কলিকাতা। মূল্য ॥০ আনা।

৫২ পৃষ্ঠার এই ক্ষুদ্র পুস্তিকাখানিতে গ্রন্থকার নিপুণতার সহিত সুখ, দুঃখ, জ্ঞান, কর্ম্ম ও ভক্তি সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন; দুই-এক স্থানে আমাদের মত-পার্থক্য থাকিলেও অধিকাংশ মতের সহিত আমাদের বিন্দুমাত্র অমিল নাই। ভগবান যখন আমাদের অন্তরেই রহিয়াছেন, তখন আর উপাসনার আবশ্যক কি? এই প্রশ্নের শাস্ত্রকারগণ প্রদত্ত যে সুন্দর উত্তরটি গ্রন্থকার স্বীয় গ্রন্থে উদ্ধৃত করিয়াছেন, উহা উদ্ধৃত করিয়া দিবার প্রলোভন আমরাও সংবরণ করিতে পারিলাম না। উত্তরটি হইল—"ঘৃত দুগ্ধের মধ্যে থাকিয়া গাভীর দেহেই বর্ত্তমান থাকে, তথাপি তাহাতে তাহাদের শরীর পুষ্ট হয় না; কিন্তু ঐ দুগ্ধই যখন তাহাদের শরীর হইতে নিঃসৃত হইয়া পরে উপায়বিশেষ দ্বারা ঘৃতাকারে পরিণত হয়, তখন তাহাই আবার গাভীর ঔষধরূপে উপকার করিয়া থাকে, তদ্রূপ পরমেশ্বর সমস্ত দেহীর দেহে বিদ্যমান থাকিলেও উপাসনারূপ উপায় ব্যতিরেকে মনুষ্যের হিত-সাধক হন না।" ছাপা ও কাগজ ভাল।

পুত্রের প্রতি উপদেশ—শ্রীশিবাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য প্রণীত। কলিকাতা হাইকোর্টের উকীল শ্রীশ্যামাদাস ভট্টাচার্য্য সম্পাদিত। প্রাপ্তিস্থান ৫নং রামকান্ত মিস্ত্রীর লেন (মির্জ্জাপুর ষ্ট্রীটের নিকট) বহুবাজার পোঃ অঃ—কলিকাতা।

পুস্তিকাটী আমাদের অতি উপাদেয় লাগিল। আজকালকার দিনে যখন অধিকাংশ পিতাকেই আপন আপন কার্য্যে এত অধিক ব্যাপৃত থাকিতে হয় যে, তাঁহারা ইচ্ছা থাকিলেও স্বীয় পুত্রের প্রতি লক্ষ্য রাখিতে পারেন না, তখন তাঁহারা যদি স্ব স্ব পুত্রের হস্তে এই পুস্তিকার এক-এক খণ্ড প্রদান করেন তবে তাঁহারা পিতার উপদেশের অভাবেও প্রকৃত সৎপথ নির্ব্বাচনে ক্লেশ পাইবে না। পুস্তকের ভাষা সুন্দর—ছাপা ও কাগজও উত্তম। আমরা আশা করি, প্রত্যেক পিতা তাঁহার পুত্রকে এই পুস্তিকার এক-এক খণ্ড উপহার দিবেন।

Sorrows of Akhtar—খাঁ সাহেব আবদুল বালি M. A. S. B প্রণীত। নিউম্যান, থ্যাকার স্পিঙ্ক এবং ৩নং আলিমুদ্দীন ষ্ট্রীটে গ্রন্থকারের নিকট প্রাপ্তব্য। মূল্য ॥০ আনা।

অযোধ্যার শেষ নবাব বাজিদ্ আলি সাহেবের জীবনের দুঃখময় কাহিনী গ্রন্থকার অতি করুণ তানে ইংরাজীতে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। এই কাহিনী আদ্যন্ত শোকপূর্ণ। পাঠ করিতে করিতে ভাগ্যহীন নবাবের প্রতি সহানুভূতিতে চিত্ত উদ্বেলিত হইয়া উঠে।

প্রাচীন চিত্র—শ্রীরামসহায় বেদান্তশাস্ত্রী প্রণীত। ৩০নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট হইতে শ্রীযোগীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় কর্ত্তৃক প্রকাশিত। মূল্য ॥৵০ আনা।

বেদান্তশাস্ত্রী মহাশয় সাহিত্যজগতে সুপরিচিত। এই গ্রন্থে শকুন্তলা, কাদম্বরী ও উত্তররামচরিতের কয়েকটী চরিত্র সমালোচনা আছে। সমালোচনাগুলি বর্ণনামূলক। যাঁহারা ঐ সকল সংস্কৃত কাব্য পাঠ করেন নাই, তাঁহারাও ইহার কাব্যরসপূর্ণ সমালোচনাগুলি উপভোগ করিতে পারিবেন। আমরা গ্রন্থকারের নিকটে এইরূপ আরও অধিক চিত্র-রচনা আশা করি।

পদপরিচয় বা parts of speech—শ্রীহিমাংশুপ্রকাশ রায় প্রণীত। ২১১নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট হইতে শ্রীবিমলাংশুপ্রকাশ রায় দ্বারা প্রকাশিত। মূল্য চারি আনা।

গ্রন্থোল্লিখিত প্রথায় সরসভাবে ব্যাকরণশিক্ষাদান আমাদের দেশে বোধ হয় প্রথম হিমাংশু বাবুই দেখাইলেন; কিন্তু প্রথম হইলেও ইহা সম্পূর্ণ সাফল্য লাভ করিবে বলিয়া আমাদের বিশ্বাস। শিক্ষক মহাশয়গণ যদি এই প্রথায় শিক্ষাদান করেন, তাহা হইলে বোধ হয় ইংরাজী ব্যাকরণের বিভীষিকা সম্পূর্ণ অদৃশ্য হইবে।

রত্নদ্বীপ—উপরিউক্ত গ্রন্থকার প্রণীত। সুপ্রসিদ্ধ ইংরাজ গ্রন্থকার Stevensonএর Treasure Island অবলম্বনে ঘরোয়া ভাষায় গল্পটি বলিয়াছেন। ঘরোয়া ভাষায় গল্পটি লিখিত হওয়ায় পশ্চিম বঙ্গের বালকগণ ইহা রীতিমত উপভোগ করিবে সন্দেহ নাই। গ্রন্থকারের বলিবার ভঙ্গীটি সুন্দর। মূল্য দশ আনা।

সংবাদ।

পুণ্যাহ—গত ১৭ই শ্রাবণ বৃহস্পতিবার কৃষ্ণা পঞ্চমী তিথিতে কালীগ্রাম পরগণার শুভ পুণ্যাহ কর্ম্ম পতিসর সদর কাছারীতে সুসম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। এতদুপলক্ষে আদি ব্রাহ্মসমাজের পণ্ডিত শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র সাংখ্য-বেদান্ততীর্থ মহাশয় আহূত হইয়া কলিকাতা হইতে তথায় গমন করিয়াছিলেন। উক্ত দিবস পূর্ব্বাহ্ণ বেলা ১০॥ ঘটিকায় প্রচুর বাদ্যোদ্যম ও ঘন ঘন বন্দুকের শব্দ দ্বারা পুণ্যাহের শুভসূচনা দিকে দিকে বিঘোষিত হইল। অতঃপর পত্রপুষ্প ও প্রতিকৃতি দ্বারা সুসজ্জিত সভাগৃহ ধীরে ধীরে উপস্থিত আমলা-কর্ম্মচারী ও প্রজাপুঞ্জে পূর্ণ হইলে বেলা একাদশ ঘটিকায় বেদান্ততীর্থ মহাশয় বেদীগ্রহণ করিলেন। তাঁহার দক্ষিণ ভাগে অন্য একটী উচ্চতর বেদীতে পূজ্যপাদ মহর্ষিদেব ও তাঁহার পূজনীয় পুত্রগণের প্রতিকৃতিগুলি পুষ্পমালায় ভূষিত হইয়া শোভা পাইতেছিল। অতঃপর যথারীতি ব্রহ্মোপাসনা সমাধাপূর্ব্বক আচার্য্য মহাশয় উপস্থিত প্রজা-পুঞ্জকে উদ্দেশ করিয়া সরল ভাষায় রাজভক্তি বিষয়ে একটী নাতিদীর্ঘ সুন্দর উপদেশ প্রদান করিলেন; তখন ষ্টেটের কর্ম্মাধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ রায় চৌধুরী মহাশয়ের নেতৃত্বে পুণ্যাহের প্রচলিত অনুষ্ঠান আরম্ভ হইল। গাঁতিদার, জোতদার প্রভৃতি বড় বড় প্রজারা একে একে আসিয়া ম্যানেজার মহাশয়ের হাতে পুণ্যাহের নিমিত্ত পূর্ব্বসংগৃহীত কাগজে মোড়া টাকাগুলি দিতে লাগিল এবং দুইজন হিসাব-নবিস সিন্দুররঞ্জিত মুদ্রাঙ্কিত নূতন খাতায় উহা যুগপৎ লিখিতে লাগিলেন। লেখা হইয়া গেলে কাগজের মোড়কগুলি আলিপনা দেওয়া একটী নূতন কলসীতে রাখা হইতে লাগিল। সঙ্গে সঙ্গে কপালে চন্দন, গলায় পুষ্পমালা ও পরিধেয়ে অলক্তক লাগাইয়া এবং পানসুপারী ও বাতাসা উপহার দিয়া প্রচলিত প্রাচীন পদ্ধতিতে প্রজাবর্গের অভিনন্দন চলিতে লাগিল। এইরূপে বেলা প্রায় ৩ ঘটিকার সময় পুণ্যাহের প্রকৃত অনুষ্ঠান সমাপ্ত হইল। অতঃপর বেলা ৪ ঘটিকার সময় কাছারী বাড়ীর বহিরঙ্গণে ও নদীতীরে সমবেত প্রজাপুঞ্জ, অতিথি, অভ্যাগত ও রবাহুতের জন্য 'দধি-চিঁড়া'র একটী সুমহৎ ভোজের আয়োজন হইল। বহুদূরব্যাপী স্থানের মাঝে মাঝে এক একখানি তক্তা-পোষের উপর স্তূপীকৃত চিপিটক ও দধিভাণ্ড দেখিলে বিস্মিত হইতে হয়; এই উপলক্ষে প্রায় তিন হাজার লোককে পরিতোষপূর্ব্বক আহার করান হইল। এই ভোজের ব্যাপার সম্পন্ন হইতে সন্ধ্যা হইয়া গেল। কাজেই সময়াভাবে অসমর্থ দরিদ্রদিগকে বস্ত্র ও অর্থদান ব্যাপারটী আগামী কল্যের জন্য স্থগিত রাখিয়া পরিশ্রান্ত জনগণ আজিকার মত বিশ্রামের আয়োজন করিল। গ্রাম্য ঢুলিদের পুণ্যাহের শেষ বাজনা বাজাইবার আগ্রহে, ধানের ক্ষেতের পাশ দিয়া শ্রেণী বাঁধিয়া গৃহাভিমুখী প্রজাপুঞ্জের কোলাহলে এবং 'নাগর'-নদীর উচ্ছল জলকল্লোলে পল্লীর নিঃশব্দ সান্ধ্যাকাশ মুখর হইয়া উঠিল—এ বৎসরের মত পুণ্যাহের পবিত্র অনুষ্ঠান সমাপ্ত হইল।

তত্ত্ববোধিনী-পত্রিকা—এই সুপ্রাচীন পত্রিকা-খানি যে বর্ত্তমানে সর্ব্বসম্প্রদায়ের ও সর্ব্বসাধারণ পাঠকেরই মনোরঞ্জন ও প্রীতি উৎপাদন করিতেছে তাহার কিছু কিছু নিদর্শন আমরা গত সংখ্যায় প্রকাশ করিয়াছি। এবারে গত আষাঢ়-সংখ্যায় প্রকাশিত 'প্রাচ্যসঙ্গীতের বাণী' ও 'নীরব ভগ্নীসম্প্রদায়' সম্বন্ধে সুপ্রসিদ্ধ প্রবীণ সাহিত্যিক রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত দীননাথ সান্যাল মহাশয়ের এবং ঢাকা হইতে প্রকাশিত উনবিংশ বর্ষের প্রাচীন সাপ্তাহিক 'শিক্ষাসমাচারের' অভিমত পাঠকগণের অবগতির নিমিত্ত সাদরে উদ্ধৃত করিলাম; এবং বরিশাল হইতে প্রকাশিত ৪৬ বৎসরের প্রাচীন সাপ্তাহিক "কাশীপুর-হিতৈষী" তত্ত্ব-বোধিনী সম্বন্ধে যে উচ্চ ধারণা পোষণ করেন তাহাও প্রকাশ করিলাম।

"প্রীতিভাজনেষু—আষাঢ়ের তত্ত্ববোধিনীতে শ্রীমতী বাণী দেবীর "প্রাচ্য সঙ্গীতের বাণী" পড়িয়া বড়ই সুখী হইলাম। দেবীর পরিচয় আমি জানি না। জানিতে ইচ্ছা করি। প্রাচ্য সঙ্গীতের প্রাণ ও মর্ম্মকথা তিনি ঠিক ধরিয়াছেন এবং তাহা ঐ প্রবন্ধে প্রাঞ্জলরূপে প্রকাশিত হইয়াছে। এইজন্য আপনার হাত দিয়া তাঁহাকে আমার ধন্যবাদ পাঠাইলাম। ইতি—

আপনার রাখী-ভ্রাতা—শ্রীদীননাথ সান্যাল।

কৃষ্ণনগর, ২৩।৭।২৬"

"লব্ধপ্রতিষ্ঠ লেখক, বহু উচ্চভাবাত্মক উৎকৃষ্ট গ্রন্থের রচয়িতা শ্রীযুক্ত ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের সম্পাদক-তায় "তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা" বর্ত্তমান সময়ে প্রশংসনীয় রূপে পরিচালিত হইতেছে। পত্রিকাখানি মাসে মাসে নিয়মিতরূপে প্রকাশিত হইতেছে, আষাঢ়-সংখ্যা আমা-দের হস্তগত হইয়াছে। বার্ষিক মূল্য ৩৲ টাকা, ৫৫নং আপার চিৎপুর রোড কলিকাতা, আদিব্রাহ্মসমাজ যন্ত্রে এই পত্রিকা মুদ্রিত হয়। পত্রিকার মূল্য আদিব্রাহ্মসমা-জের কর্ম্মাধ্যক্ষের নিকট পাঠাইতে হয়।

"তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা বহুকালাবধি বঙ্গের শিক্ষিত সমাজে বহু প্রয়োজনীয় তত্ত্বকথা প্রচার করিয়া আপন নামের সার্থকতা সাধন করিয়া আসিতেছেন। এক

সময়ে ইহার এমন গৌরবের দিনও ছিল যে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ইহার আশ্রয়দাতা এবং অমর লেখক অক্ষয়কুমার দত্ত ইহার সম্পাদক ছিলেন।

"আলোচ্য সংখ্যার প্রথম প্রবন্ধ সম্পাদক স্বয়ং লিখিয়াছেন,—"ধর্ম্মে সাম্প্রদায়িকতা ও দ্বন্দ্ববিবাদ।" ধর্ম্মবিষয়ে সাম্প্রদায়িক ভেদ-বিরোধ বিদূরিত করিবার অভিপ্রায়ে রাজা রামমোহন ব্রহ্মজ্ঞান প্রচারে ব্রতী হইয়াছিলেন; ব্রহ্মমন্ত্রের দুইটি অঙ্গ, ভগবৎ প্রীতি ও তাঁহার প্রিয়কার্য্য সাধন, ইহাই প্রবন্ধের মূলকথা। ধর্ম্মের বহিরাবরণ পরিত্যাগ করিয়া বিশুদ্ধ ব্রহ্মজ্ঞাননিষ্ঠ হইতে হইবে, ইহাতেই ব্যক্তির এবং সমাজের কল্যাণ,—অতি উচ্চ উদার সসার কথা। কিন্তু কার্য্যতঃ এই অবস্থা লাভ কিরূপে হইতে পারে তাহার পন্থা নির্দ্দেশ আবশ্যক, সে বিষয়ে প্রবন্ধে কোন আলোচনা নাই। "উড়িষ্যায় পাঠান মোগল ও মারহাট্টা-শাসন" পাঠযোগ্য সুপ্রবন্ধ। "নীরব ভগ্নী সম্প্রদায়" সম্পাদকের লেখনী-নিঃসৃত। পিয়ার্সন মেগেজিন অবলম্বনে প্রবন্ধটি লিখিত হইয়াছে। একান্ত ঈশ্বরানুরাগী ধর্ম্মপিপাসু সম্প্রদায়-বিশেষের জীবনে নীরবতা সাধনের যে কাহিনী বিবৃত হইয়াছে তাহা বড় মনোরম। আমরা প্রবন্ধটি উদ্ধৃত করিয়া আমাদের পাঠকবর্গকে পড়িবার সুযোগ প্রদান করিলাম। "প্রাচ্য সঙ্গীতের বাণী", "জ্যোতিরিন্দ্রনাথ" উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ। "সাংখ্যে ঈশ্বরবাদ" ক্রমশঃ প্রকাশিত হইতেছে। সাংখ্যেরা নিরীশ্বরবাদী, লেখক এই মত নিরসনের চেষ্টা করিতেছেন।"

শিক্ষাসমাচার—১২ই শ্রাবণ, ১৩৩৩

"বর্ত্তমান পৌষ মাসের তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা আমরা পাইয়াছি। বঙ্গের সুবিখ্যাত লেখক কলিকাতার ঠাকুর-বংশধরগণ স্বয়ং ইহার লেখক ও পরিচালক। পূর্ব্বকালের তত্ত্ববোধিনীর লেখা কেবল ব্রাহ্মধর্ম্ম সম্বন্ধীয় আলোচনায় চলিত, বর্ত্তমান কালে নানবিধ উৎকৃষ্ট উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ উহাতে মুদ্রিত হইয়া থাকে। আমরা এই পুরাতন-কালীয় পত্রিকার নবোদ্যম দেখিয়া প্রীতি লাভ করিতেছি; আশা করি, অনেকেই এই পত্রিকাখানির গ্রাহক হইবেন।"

কাশীপুরনিবাসী—২৮শে পৌষ, ১৩২৯

গার্হস্থ্য-সংবাদ।

সপিণ্ডীকরণৈকোদ্দিষ্ট-শ্রাদ্ধ—বিগত ২৯শে শ্রাবণ রবিবার প্রাতঃকাল ৯ ঘটিকায় অমাবস্যা তিথিতে ৺তারিণীচরণ গুপ্ত মহাশয়ের সপিণ্ডীকরণ ও মাসিকৈকোদ্দিষ্ট শ্রাদ্ধ তদীয় সুযোগ্য পুত্র শ্রীসুশীলকুমার গুপ্ত মহাশয় কর্ত্তৃক মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ-প্রবর্ত্তিত একেশ্বরবাদ-সম্মত বিশুদ্ধ পদ্ধতি অনুসারে তাঁহার কলিকাতাস্থ বাসাবাটীতে সুসম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। উক্ত দিবস যথাসময়ে পুষ্পমালা ও গন্ধধূপাদির পবিত্র সৌরভে সভাস্থলটী পূর্ণ হইলে প্রথমে একপ্রস্থ দানসামগ্রী ও ভোজ্যাদি উৎসর্গীকৃত হইল। অতঃপর আদিব্রাহ্মসমাজের পণ্ডিত শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র সাংখ্য-বেদান্ততীর্থ মহাশয় বেদীগ্রহণপূর্ব্বক শ্রাদ্ধাধিকারী ও সমবেত ভদ্রজনগণকে উদ্বোধিত করিলেন। তাঁহার সেই নাতিদীর্ঘ সরস ও ভাবময় উদ্বোধনে শ্রাদ্ধের কর্ত্তব্যতা ও উপযোগিতা প্রভৃতি সম্বন্ধে অনেক গুলি চিন্তাযোগ্য কথা ছিল। অনন্তর যথারীতি শ্রাদ্ধকার্য্য অনুষ্ঠিত হইল। ৺তারিণী বাবুর পুত্রবধূ শ্রীমতী মনোরমা দেবী কয়েকটী সঙ্গীত করিয়া সভাস্থলের পবিত্রতা বর্দ্ধিত করিয়াছিলেন। হিন্দু ও ব্রাহ্মসমাজের কয়েকজন প্রতিষ্ঠাপন্ন নরনারীর সমাগমে সভাস্থলের গাম্ভীর্য্য বৃদ্ধি পাইয়াছিল। সর্ব্বশেষে একটী বিশিষ্ট ভোজের আয়োজন হইয়াছিল।

শোক-সংবাদ।

বিগত ১২ই শ্রাবণ বুধবার আমাদের শ্রদ্ধাস্পদ উপাচার্য্য শ্রীযুক্ত চিন্তামণি চট্টোপাধ্যায় মহাশয় তাঁহার জ্যেষ্ঠা কন্যা লীলাদেবীকে অকালে হারাইয়াছেন। ইঁহার স্বামী একজন সুশিক্ষিত যুবক; তিনি এম্-বি এবং ডি-পি-এইচ। গত ১৯শে শ্রাবণ বুধবার চিন্তামণি বাবু পুনশ্চ আর একটী আঘাত পাইয়াছেন; তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্রী শ্রীমতী কমলা দেবী ঐ দিনে তাঁহার স্বামীকে হারাইয়াছেন। বিশেষ সম্ভ্রান্ত বংশে ইঁহাদের বিবাহ হইয়াছিল। নিতান্ত অল্প বয়সেই এইরূপ দুর্ঘটনা ঘটিল। পরম পিতা তাঁহার সুশীতল ক্রোড়ে পরলোকগত আত্মাদুইটীকে স্থানদান করুন এবং শোকার্ত্ত আত্মীয়স্বজনের অন্তরে শান্তিধারা বর্ষণ করুন।

৺দেবেন্দ্রনাথ মল্লিক।—ভবানীপুরের প্রসিদ্ধ চিকিৎসক ডাক্তার রাজেন্দ্রনাথ মল্লিক শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ C. I. E. ও শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথকে রাখিয়া পরলোক গমন করেন। রাজেন্দ্রবাবু মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের স্থাপিত ভবানীপুর ব্রহ্মবিদ্যালয়ের একজন ছাত্র ছিলেন। দেবেন্দ্রনাথ ভবানীপুর ব্রাহ্মসমাজের একজন পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। তাঁহার ভগবানের উপর একান্ত নির্ভর ছিল। বিগত ৬ই শ্রাবণ বৃহস্পতিবার ৪৪ বৎসর বয়সে আত্মীয়স্বজনকে শোকসাগরে ভাসাইয়া দেবেন্দ্রনাথ দিব্যধামে চলিয়া গিয়াছেন। ভগবান তাঁহার আত্মাকে আপন ক্রোড়ে রক্ষা করিয়া তাঁহার আত্মীয়-স্বজনের অন্তরে সান্ত্বনা দান করুন।

Reg. No. C. 412.

৯৯৭ সংখ্যা ১৮৪৮ শক

তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা

"ব্রহ্ম বা একমিদমগ্র আসীন্নান্যৎ কিঞ্চনাসীত্তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রন্নিরবয়বমেকমেবাদ্বিতীয়ম্ সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয়ং সর্ব্ববিৎ সর্ব্বশক্তিমদ্ধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্যসাধনঞ্চ তদুপাসনমেব"।

সম্পাদক—শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৫৫ নং অপার চিৎপুর রোড্ কলিকাতা, আদিব্রাহ্মসমাজ যন্ত্রে শ্রীরণগোপাল চক্রবর্ত্তী দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত।
সাল ১৩৩৩। খৃঃ ১৯২৬। সম্বৎ ১৯৮৩। কলিগতাব্দ ৫০২৭। ভাদ্র।

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার বার্ষিক মূল্য ৩৲ টাকা ডাকমাশুল ৷৵০ আনা। এই সংখ্যার মূল্য ।০ আনা। } আদিব্রাহ্মসমাজের কর্ম্মাধ্যক্ষের নামে পাঠাইতে হইবে।

শু

গ্রাহকগণের প্রতি

বিনীত নিবেদন।

তত্ত্ববোধিনীর ন্যায় একটী উন্নত আদর্শনিষ্ঠ মাসিকপত্রের পরিচালন যে কিরূপ কঠিন, তাহা কাহারও অবিদিত নাই। বিশেষতঃ গত কয়েক বৎসর যাবৎ চিত্র, সঙ্গীত ও স্বরলিপি প্রকাশ দ্বারা পত্রিকার যে উন্নতিবিধানের চেষ্টা চলিতেছে, এই দুর্মূল্যতার দিনে উহা আমাদের পক্ষে বড়ই গুরুভার হইয়া পড়িয়াছে। সম্মুখে শারদীয় অবকাশ। ইহার পূর্ব্বে আমাদিগকে পত্রিকার কাগজ প্রভৃতির দরুণ অনেকগুলি বাজার দেনা শোধ করিতে হইবে। এসময়ে গ্রাহকগণ স্বীয় দেয় মধ্যে অনুগ্রহপূর্ব্বক সাহায্যস্বরূপেও কিছু পাঠাইয়া দিলে আমাদের বিশেষ উপকার করা হয়। ধর্ম্মপ্রাণ ও বিবেচক ব্যক্তিকে অধিক লেখা বাহুল্য। ইতি—

বিনীত
শ্রীসুরেশচন্দ্র সাংখ্য-বেদান্ততীর্থ।
কর্ম্মাধ্যক্ষ।

৫৫নং আপার চিৎপুর রোড
আদিব্রাহ্মসমাজ
তাং—৮ই আশ্বিন, ১৩৩৩।

একমেবাদ্বিতীয়ং
একবিংশ কল্প
চতুর্থ ভাগ
ভাদ্র, ব্রাহ্মসম্বৎ ৯৭।
৯৯৭ সংখ্যা
১৮৪৮ শক

তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা

"ব্রহ্ম বা একমিদমগ্র আসীন্নান্যৎ কিঞ্চনাসীত্তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রন্নিরবয়বমেকমেবাদ্বিতীয়ম্ সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয়ং সর্ব্ববিৎ সর্ব্বশক্তিমদ্ধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্যসাধনঞ্চ তদুপাসনমেব"।

সম্পাদক—শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর

কলিগতাব্দ ৫০২৭। সম্বৎ ১৯৮৩। খৃঃ ১৯২৬। শক ১৮৪৮। সাল ১৩৩৩।

বন্ধু আমার।

(শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর)

১৪। প্রাপ্তিতে শান্তি।

বন্ধু হে! তোমাকে আজ একটা আশ্চর্য্য কথা বলিতে চাই—না বলিলে আমার প্রাণ হাঁপাইয়া মরিবে। পূর্ব্বে শুনিয়াছিলাম, তোমায় নাকি ভালবাসিলে তুমি তাহার যাহা-কিছু সমস্তই কাড়িয়া লও। কিন্তু কৈ—আমি তো পরীক্ষায় দেখিতেছি, সে কথা যাহার কাছে সত্য, তাহার কাছে সত্য, কিন্তু আমার কাছে তো সত্য বলিয়া মনে হইতেছে না। এই দেখ, আমি সেই কথা শুনিয়া আমার যাহা কিছু আছে সমস্ত, আমার সংসার, আমার প্রাণপ্রিয় পরিজন, আমার নিজের জীবন, সকলেরই আশা পরিত্যাগ করিয়া কি জানি কেন, তোমাকে ভাল বাসিলাম। কিন্তু তোমার নিকট হে বন্ধু! সকলই বিপরীত—লোকে সাধারণত অগ্নির জ্বলনে দগ্ধ হইয়া শুকাইয়া যায়; কিন্তু তোমাকে ভালবাসিয়া যখন প্রেমের আগুনে জ্বলিতে থাকি, জ্বলিবার সঙ্গে সঙ্গে তোমার শান্তিজলের ছিটা পাইয়া মুহূর্ত্তের মধ্যে পরিপুষ্ট হইয়া উঠি। তোমাকে না দেখিয়া যখন নিতান্তই মরণ প্রার্থনা করি, তখন তুমি ক্ষণেকের জন্যও আসিয়া প্রাণের ভিতর জীবনের ধারা ঢালিয়া দাও। তোমাকে না দেখিয়া জীবন যখন উত্তপ্ত শূন্য মরুভূমির ন্যায় বোধ হয়, তখন তুমি তোমার প্রেমধারা বর্ষণ করিয়া জীবনকে সিক্ত করিয়া শতবিধ শস্যে শ্যামল ক্ষেত্র এবং শতবিধ পুষ্পের সুগন্ধে সুরভিত করিয়া তোল। স্ত্রী পুত্র বিত্ত সংসার সমস্তই যখন তোমা বিহনে প্রতি পদে অসহ্য ভার বলিয়া মনে হয়, তখন জানি না, কি আশ্চর্য্য শক্তিতে আমার হৃদয়ে অপূর্ব্ব বলবিধান করিয়া সেই মহাভারকেও খুবই লঘু ও মধুময় করিয়া দাও। আমি দেখিতেছি, তোমাকে ভালবাসিলে সকলকেই ভালবাসিতে ইচ্ছা হয়—সকলকেই নিজের পরিজন বলিয়া মনে করিতে পারি। এতদিন ধরিয়া যাহা কিছু শিখিয়াছিলাম যে, ভালবাসিলে কেবল ব্যথাই পাওয়া যায়, আজ তোমাকে ভালবাসিয়া আমার সে সমস্ত পূর্ব্বশিক্ষা ভুল বলিয়া পরিত্যাগ করিতে হইতেছে—এখন দেখিতেছি, তোমায় ভালবাসিলে সকল ব্যথাই দূর হয়, দুঃখের আগুনে জল পড়ে, সংসার মরীচিকা হইবার পরিবর্ত্তে সত্য ও সুখের সংসার হইয়া দাঁড়ায়; তোমাকে বন্ধু বলিয়া পাইলে জগৎসংসারকেই বন্ধু বলিয়া মনে হয়; পূর্ব্বে পরকে আপনার করিবার জন্য কাঁদিতাম, এখন আপনাকে পর করিবার জন্য কাঁদি; এখন সকলের ভিতরেই তোমাকে পাইয়া আমার আকুল প্রাণ শান্ত হইয়াছে। বন্ধুগো—তুমিই আমার সব।

১৫। প্রেমভিক্ষা।

বন্ধু আমার! বন্ধু আমার! আজ তুমি

আমায় তোমার আলিঙ্গনে বদ্ধ করিবার জন্য আসিয়াছ? দাও—দাও—তোমার ঐ দুই বাহু বাড়াইয়া দাও—তোমার ঐ প্রশস্ত বক্ষে আমি ঝাঁপাইয়া পড়ি। আজ আমার কি সৌভাগ্য! বন্ধুগো! আমার আর কথা বাহির হইতেছে না। তোমার ঐ প্রেমে ভরা হৃদয়খানি খুলিয়া দাও, আমি তাহারই মাঝে নীরবে নিঃশব্দে গিয়া বসিয়া থাকি। আজ আমার নিকট চাঁদ হাসিতেছে; আজ আমার নিকট সমস্ত গ্রহতারা হাসিতেছে। আজ চারিদিক হইতে ফুলের সুবাস আসিয়া আমার চিত্তকে মাতাইয়া তুলিতেছে। না—না—ইহাই আমার ভাল—ইহাই আমার ভাল—আমি আর সংসারের কাজ করিতে পারিব না। না—বন্ধু—না—আমাকে ফিরাইয়া দিও না—আমাকে তোমারই পাশে জন্ম-জন্ম বসিতে দাও—তাহাতেই আমার সুখ, তাহাতেই আমার শান্তি। তোমার ঐ মধুময় দৃষ্টিতে আমার প্রতি কি অগাধ ভালবাসা প্রকাশ পাইতেছে—সে ভালবাসার প্রতিদানে আমি কতটুকুই বা দিতে পারি! সেটুকুই বা পারি, সেইটুকুই দিতে দাও; তোমার প্রেম উপভোগ করিয়া এবং তোমাকে আমার সর্ব্বস্ব সমর্পণ করিয়া আমাকে প্রেমসাগরে অনুক্ষণ ডুবিয়া থাকিতে দাও। লোকে বলে—প্রেম যদি পাইতে চাও, তবে প্রেম চাহিও না। এ কথা আমি মানিতে পারি না। আমি তোমার প্রেমের ভিখারী—ভিক্ষাপাত্র লইয়া আমি বন্ধুর নিকট আসিয়াছি দেখিবার জন্য, বন্ধু ভিক্ষাপাত্র পূর্ণ করেন কি না। এ কি হইল—তুমি আমাকে আজ যে প্রেম দিলে, তাহাতে ভিক্ষাপাত্র পূর্ণ হইয়া যে উছলিয়া উঠিল! আজ আমার জীবন মধুময় হইয়া উঠিল। মনে হইতেছে, এই মধুময় জীবন যেন নিজেই উচ্ছ্বসিত হইয়া শতস্রোতে বাহির হইয়া চলিয়াছে—সমস্ত জগতকে যেন নিজের মধুধারায় স্নিগ্ধ করিতে চাহিতেছে। তাহারই মধ্যে আমি যেন নীরব দর্শক হইয়া গভীর আকুলতার মাঝেও নিরাকুল হইয়া বসিয়া আছি। বুঝিয়াছি, জানিয়াছি, নিজের সুখদুঃখের উপর, নিজের জীবনের উপর আমার নিজের কোন অধিকার নাই। নিজেকে নিজের বলিয়া যতদিন জ্ঞান ছিল, ততদিন সুখদুঃখের তরঙ্গদোলায় সর্ব্বদাই দুলিতাম। এখন আমি আপনাকে তোমার কাছে বিকাইয়া দিয়া বড় আনন্দে আছি—কোন রকম ঢেউ আর লাগে না—শত দুঃখের মধ্যেও সুখ, শত নিরাশার ভিতরেও কেবলই আশা, শত নিরানন্দের ভিতরে একই আনন্দ জাগিয়া আছে।

১৬। তুমি আর আমি।

বন্ধু হে! আসিয়াছ যখন আমার কাছে, তখন আমার দিকে একবার ফিরিয়া দেখ; একবার আমার মুখের দিকে তাকাইয়া হাসিয়া চাও। তুমি হাস, আর আমি হাসি। তোমাকে ভাল বাসিয়া আমার যে কি হইয়াছে তাহা তুমি যদি না বুঝিয়া থাক, তবে আমার তোমাকে বুঝাইবার ক্ষমতা নাই। তোমাকে এইটুকু বলিতে পারি, তোমাকে ভাল বাসিয়া আমি যাহা ছিলাম তাহা আর নাই, যাহা ছিলাম না, তাহাই এখন হইয়াছি—এক কথায় আমি সম্পূর্ণ উল্টাইয়া গিয়াছি। আমি কর্ম্ম—কর্ম্ম—কর্ম্ম করিয়া ছুটিয়া বেড়াইতাম, কর্ম্মেতেই একমাত্র শান্তি পাইতাম; আর এখন?—এখন ঐ শ্মশানের উপরে কোন্ অজানা সন্ন্যাসীর প্রতিষ্ঠিত মঠে বসিয়াই যেন মহা শান্তি পাই। সন্ন্যাসী দুইশত বৎসরের প্রাচীন জরাজীর্ণ দুইটী বটবৃক্ষের মধ্যস্থলে অবস্থিত মঠে খড়কুটা আনিয়া মাথা গুঁজিবার মত একটুখানি স্থান করিয়া লইয়াছেন। সেটুকুও আছে কি নাই। তাহার চারি পার্শ্বে তোমারই হাতের স্পর্শ পাইবার জন্য দুইচারিটী গাছ বসাইয়াছেন—আর বাকী শুধু ধূ—ধূ—করিতেছে মাঠ, আর মাথার উপরে অনন্ত আকাশ। বন্ধু! এখন আমার মনে হয়—এই রকম নির্জ্জন স্থানই তো তোমার নির্জ্জন সঙ্গলাভের উপযুক্ত স্থান। মনে হয়—দিন রাত—দিন রাত এইপ্রকার নির্জ্জন স্থানে বসিয়া বসিয়া তোমারই সঙ্গে খেলা করি; তোমার চন্দ্রসূর্য্যের, তোমার গ্রহনক্ষত্রের আনন্দগীত শুনিতে থাকি; পাতার মধ্যে ফুলের অন্তরালে তোমারই লুকানো মুখ দেখিয়া ফেলি, আর হাসিয়া কুটিকুটি হই। এখন কর্ম্মেতেই প্রাণের মধ্যে অশান্তি হুহু করিয়া জ্বলিয়া উঠে, আর অকর্ম্মেই প্রাণের মধ্যে গভীর শান্তি লাভ করি। এই সমস্ত কথা বন্ধু আজ তোমায় বলিতেছি—তুমি হয়তো আমার এই সমস্ত ছেলেমানুষি দেখিয়া কত-না হাসি-

তেছ! কিন্তু বন্ধু! তুমি হাস আর নাই হাস, আমি তো আর আমার প্রাণের যত কিছু কথা—ভাল মন্দ ছোট বড় সমস্ত তোমাকে না বলিয়া থাকিতে পারি না। পূর্ব্বে তোমাকে সমস্ত কথা বলিতে পারিতাম না, অনেক কথা বলিতে লজ্জা আসিত, মনে বাধিয়া যাইত; কিন্তু এখন আর না—তোমার কাছে লজ্জাসরম দূরে ফেলিয়া দিয়াছি—আমার আমিকে আজ তোমার সম্মুখে সম্পূর্ণ মুক্তভাবে দাঁড় করাইয়াছি—তুমি আমার অন্তস্তলের গভীরতম প্রদেশ পর্য্যন্ত দেখ, আর বন্ধু হে! আমি তোমার বুকের মধ্যে ঢুকিয়া যাই। এইটুকু লজ্জাসরম রাখিয়াছিলাম বলিয়া আমি জানি তুমি মধ্যে মধ্যে বিরক্তি দেখাইতে। আজ অবধি তোমার আমার মাঝে কোনই বাধা রহিল না—তুমিও আর আমার উপর বিরক্ত হইতে পারিবে না। আজ আমার সমস্ত পিপাসা দূর হইল; আজ আমার মরমে নিত্য নব নব সঙ্গীত ধ্বনিত হইতেছে। আজ হে বন্ধু! হে বন্ধু! তুমি—আর—আমি!

কোন্ বারে কোন্ পঞ্চব্রাহ্মণ আসেন?

(শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর)

দশম সপ্তম শতাব্দীর শেষে কৌশিকাদিগোত্রীয় ব্রাহ্মণ আসেন?

আমরা দেখি যে, কোন কোন কুলগ্রন্থে উক্ত হইয়াছে যে, আদিশূরপত্নী চন্দ্রমুখীর চান্দ্রায়ণ ব্রত সম্পাদনের জন্য পাঁচ গোত্রের পাঁচ ব্রাহ্মণ সমানীত হইয়াছিলেন—সর্ব্বপ্রথমে কোন্ "এক" স্বর্ণকৌশিক ব্রাহ্মণ আসিয়াছিলেন; তৎপরে রজতকৌশিক ব্রাহ্মণ সমাহূত হইয়াছিলেন এবং তৎপরে কৌণ্ডিন্য-কৌশিক, ঘৃতকৌশিক এবং কৌশিক আসিয়াছিলেন (১)। উপরোক্ত নামগুলি কোন লোকের নাম নহে, ঐ গুলি গোত্রের নাম (২)। মাত্র চান্দ্রায়ণ ব্রত সম্পাদনের জন্য এরূপ একে একে পাঁচ গোত্রের পাঁচ ব্রাহ্মণ আসা সম্ভব মনে হয় না। আদিশূরের সময়ে ক্ষিতীশ বা ভট্টনারায়ণপ্রমুখ যে পাঁচ পাঁচজন ব্রাহ্মণ আসিয়াছিলেন, তাঁহাদের নাম কুলগ্রন্থে উল্লিখিত দেখা যায়; কিন্তু স্বর্ণ-কৌশিক প্রভৃতি পঞ্চগোত্রীয় ব্রাহ্মণের আগমন এত সুদূর অতীতে সংঘটিত হইয়াছিল যে, তাহা দুএকটী কুলগ্রন্থ ব্যতীত অন্য কোন কুলগ্রন্থেই উল্লিখিত দেখি না। যে কুলগ্রন্থেও বা ইহার উল্লেখ আছে, তাহাতেও ঐ পঞ্চব্রাহ্মণের নাম উল্লিখিত দেখি না। অনুমান হয়, কুলগ্রন্থ রচনার সময়ে ঐ পঞ্চব্রাহ্মণের নামগুলি বিস্মৃতিসাগরে সম্পূর্ণ বিলীন হইয়া গিয়াছিল। প্রেমবিলাস প্রকৃতপক্ষে কুলগ্রন্থ নহে, তথাপি গ্রন্থকারের এই সকল পুরাতত্ত্বসম্বন্ধে অনেক অনুসন্ধান ছিল দেখা যায়। একমাত্র প্রেমবিলাস গ্রন্থে ঐ পঞ্চব্রাহ্মণের নাম উল্লিখিত আছে। প্রেমবিলাস বলেন যে, ঐ পঞ্চব্রাহ্মণকে বিদেশ হইতে ডাকা হয় নাই। আদিশূরের রাজ্যেই যেসকল বৈদিক ব্রাহ্মণ ছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ কুলীন দেখিয়া পাঁচটী কৌশিক গোত্রের পাঁচটী ব্রাহ্মণকে ডাকা হইয়াছিল—স্বর্ণকৌশিক গোত্রের ধর্ম্মনারায়ণ, রজতকৌশিকের শিবশঙ্কর, কৌণ্ডিন্যকৌশিকের জনার্দ্দন, ঘৃতকৌশিকের ভুবনেশ্বর এবং কৌশিকের কালিদাস (৩)। কেবল ডাকানো নহে, প্রেমবিলাসের মতে আদিশূর তাঁহাদের দ্বারা একেবারে পুত্রেষ্টি যজ্ঞ করাইলেন, কিন্তু তাহাতে কোনও ফল না হওয়ায় পত্নী চন্দ্রমুখীর পরামর্শে বৈদিক ক্রিয়াকলাপে অভিজ্ঞ ব্রাহ্মণ আনাইবার জন্য লোক পাঠান। এই প্রেম-বিলাসেই আবার দেখি যে, ক্ষিতীশ প্রভৃতি যে পঞ্চব্রাহ্মণ "পুত্রেষ্টিযজ্ঞের" নিমিত্ত আনীত হইয়াছিলেন, তাঁহারাই চন্দ্রমুখীকে চান্দ্রায়ণ ব্রতের দ্বারা সর্ব্বাগ্রে পরিশুদ্ধ করিয়া লইবার পর সপত্নীক রাজার দ্বারা যজ্ঞ সম্পাদন করিলেন (৪)। এই সকল আলোচনা করিয়া দেখি যে, প্রেমবিলাস

---

(১) নাম্না চন্দ্রমুখী * * পত্নী * * আদিশূরস্য চ চান্দ্রায়ণাচারিণী।
তত্রাদাবাগতঃ কশ্চিদ্ব্রাহ্মণঃ স্বর্ণকৌশিকঃ।
ততঃ সমাহূতস্তত্র বিপ্রো রজতকৌশিকঃ।
কৌণ্ডিন্যকৌশিকঃ পশ্চাৎ ঘৃতকৌশিককৌশিকৌ।
এতে পঞ্চ সমায়াতাঃ পঞ্চগোত্রধরাস্তরাঃ।
গৌ° ব্রা° ধৃত বারেন্দ্রকুলপঞ্জিকা ব্রা° কা° ৮৯পৃঃ
স্ব° মো° ৩৩৬-৩৭পৃঃ।

(২) স° নি° ৩২১পৃঃ

(৩) প্রে° বি° ২৫ম বিলাস—২৬১পৃঃ ২য় খণ্ড।

(৪) প্রে° বি° ২৪ম বিলাস—২৬২ পৃঃ ২য় খণ্ড।

লোকগুলির নাম প্রভৃতি ঠিকঠাক বলিলেও ঘটনাগুলি উদোর বোঝা বুদোর ঘাড়ে চাপাইয়া সুন্দর একটী পুরাণ রচনা করিয়াছেন। আমাদের অনুমান হয় যে, সম্বত সপ্তম শতাব্দীর শেষে শূদ্রক রাজার সময়ে সম্ভবত পুত্রেষ্টিযাগ উপলক্ষেই স্বর্ণকৌশিক প্রভৃতি পঞ্চ গোত্রের পঞ্চ ব্রাহ্মণ আসিয়াছিলেন। তাই না আদিশূর তাঁহার সভাস্থ ব্রাহ্মণদিগকে সেই পুত্রেষ্টিযজ্ঞ-সম্পাদক সারস্বত ব্রাহ্মণদিগেরই বংশধররূপে সম্বোধন করিয়া তাঁহারও পুত্রেষ্টি যজ্ঞ সম্পাদনের জন্য অনুরোধ করিয়াছিলেন। আদিশূরের সময়েও পুত্রেষ্টিযজ্ঞ ও তৎসঙ্গে চান্দ্রায়ণ ব্রত অনুষ্ঠিত হওয়ায় কোন কোন কুলগ্রন্থকার গোলমাল করিয়া ঐ সারস্বত ব্রাহ্মণদিগের আগমন আদিশূরের সময়ে সংঘটিত বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এই পঞ্চগোত্রীয় ব্রাহ্মণদের আগমন এতই সুদূর অতীতে হইয়াছিল যে, অনেক কুলগ্রন্থের মতে ইহাঁদের বংশধরেরা উত্তরকালে আদিশূরানীত পঞ্চব্রাহ্মণের বংশধরদিগের সহিত মিশিয়া গিয়াছিল (৫)।

ক্ষিতীশপ্রমুখ পঞ্চব্রাহ্মণ কবে আসেন?

আমরা উপরে দেখিয়া আসিয়াছি যে, সম্বত দশম শতাব্দীর মাঝামাঝি (৯০৯-৯৫৪ সম্বতের মধ্যে) একদল পঞ্চব্রাহ্মণ আসিয়াছিলেন বলিয়া কুলগ্রন্থে উল্লিখিত আছে (৬)। আমাদের অনুমান হয়, ক্ষিতীশপ্রমুখ পঞ্চব্রাহ্মণই সেই পঞ্চব্রাহ্মণ। মহেশ তাঁহার কুলপঞ্জিকায় ভট্টনারায়ণ প্রভৃতির আগমনের কথা উল্লেখ করিয়া স্পষ্ট বলিয়াছেন যে, তাঁহাদের পিতারাও অর্থাৎ ক্ষিতীশ প্রভৃতি পঞ্চব্রাহ্মণও পূর্ব্বে গৌড়দেশে আসিয়াছিলেন (৭)। সারাবলী গ্রন্থে সুলোপঞ্চাননধৃত কুলার্ণববচনে আছে ৮৫৪ (৯৫৪?) বৎসরে ক্ষিতীশপ্রমুখ পঞ্চ ব্রাহ্মণ আসিয়াছিলেন, এবং তাঁহাদের পুত্র ভট্টনারায়ণপ্রমুখ পঞ্চব্রাহ্মণ আদিশূরের পুত্রেষ্টি যজ্ঞ করিবার জন্য আসিয়াছিলেন (৮)। এই বচনে "বেদবাণাঙ্কিমে" অর্থাৎ ৮৫৪ বৎসর উল্লিখিত হইয়াছে, কিন্তু "বেদবাণগ্রহে" কিম্বা ৯৫৪ বৎসরবাচক শব্দ থাকিলেই সকল দিকে সুসঙ্গতি হয়। সম্বন্ধনির্ণয়কার বলেন যে, দেবীবরের মতে ক্ষিতীশ প্রমুখ পঞ্চব্রাহ্মণ আসিয়াছিলেন (৯); কিন্তু ধ্রুবানন্দাদির মতে, দেবীবরের কারিকাতেও যখন আমরা ভট্টনারায়ণ প্রভৃতিরও আগমন উল্লিখিত দেখি (১০), তখন আমাদের এই অনুমান অন্যায় হইবে না যে, ক্ষিতীশপ্রমুখ এবং ভট্টনারায়ণপ্রমুখ উভয় দলই গৌড়ে আসিয়াছিলেন, কিন্তু বিভিন্ন সময়ে। আমাদের বিশ্বাস যে, সম্বত দশম শতাব্দীর মাঝামাঝি যখন আদিশূর চন্দ্রমুখীকে বিবাহ করিবার পর গৌড়রাজ্য জয় করিয়া অভিষিক্ত হইবার, সুতরাং রাজসূয়সদৃশ কোন এক বিরাট যজ্ঞানুষ্ঠানের ব্যবস্থা করিলেন (১১), সেই সময়ে ক্ষিতীশপ্রমুখ পঞ্চব্রাহ্মণ আসিয়াছিলেন। বিপ্রকুলকল্পলতার কারিকায় ৯৯৯ সম্বতে অভিষেকের উল্লেখ আছে। আমাদের কিন্তু অনুমান হয় যে, সম্বত দশম শতাব্দীর মাঝামাঝি ঐ ঘটনা হইয়াছিল। ৯৯৯ সম্বতে যে পুত্রেষ্টি যজ্ঞ হইয়াছিল, তাহা সুলো পঞ্চানন খুব স্পষ্টরূপেই বলিয়াছেন; এবং আমরাও দেখি যে, জনশ্রুতি

(৫) স° নি° ৩২১ পৃঃ

(৬) আদিশূরের কালনির্ণয়সম্বন্ধীয় আলোচনায় আমরা যে যে স্থলে যে সময় ধরিয়াছি, সেই সেই স্থলে সেই সেই সময় ধরিয়াই উপরোক্ত কালের উল্লেখ করিলাম।

(৭) অমীষাং পিতরঃ পূর্ব্বাঃ পুরা গৌড়ং সমাগতাঃ।
পিতুর্ব্বরপ্রসাদেন তেঽপি গৌড়ং সমাযযুঃ॥
মহেশের কুলপঞ্জিকা—স° নি° ৫০৬পৃঃ

(৮) বেদবাণাঙ্কিমে শাকে বিপ্রাঃ পঞ্চ সমাগতাঃ।
ক্ষিতীশস্তিথিমেধশ্চ বীতরাগঃ সুধানিধিঃ॥ ১
সৌভরিশ্চাপি ধর্ম্মাত্মা পঞ্চদাসৈঃ সমন্বিতাঃ।
এতেষাং সূনবো যে তু তেষু পঞ্চ সুকীর্ত্তিতাঃ॥ ২
ভট্টনারায়ণো দক্ষশ্ছান্দড়ো হর্ষ এব চ।
চত্বারো বেদগর্ভেণ পঞ্চ বিখ্যাতকোবিদাঃ॥ ৩
বেদজ্ঞা যজ্ঞনিপুণাঃ প্রেষিতা গৌড়রাজকে।
পুত্রেষ্টিকরণার্থায় পুত্রদারৈঃ সমন্বিতাঃ॥
* * * *
আদিশূরেণ তে সর্ব্বে পূজিতাশ্চ যথাবিধি।
পিতুর্ব্বরপ্রসাদাত্তু তে চ গৌড়ং সমাযযুঃ॥
সারাবলীধৃত কুলার্ণবের বচন—স° নি° ৫০৭পৃঃ

(৯) শ্রীক্ষিতীশস্তিথিমেধা বীতরাগঃ সুধানিধিঃ।
সৌভরিঃ পঞ্চ ধর্ম্মাত্মা আগতো গৌড়মণ্ডলে॥
কুলরমা—স° নি° ২৮৪পৃঃ

(১০) শাণ্ডিল্যগোত্রসম্ভূতঃ ভট্টনারায়ণঃ কৃতী।
দেবীবর—ব° মো° ২০১

(১১) (ক) বেদবহ্নিকণিমানাব্দে শাকে সদ্গুণসাগরঃ।
গৌড়রাজাধিরাজঃ সন্নভিষিক্তো মহীপতিঃ॥
বি° কু°—ব° মো° ৩১৮পৃঃ

(খ) রা° ব্রা° ৭ পৃঃ পাদটীকা—"প্রবাদ আছে মহারাজ আদিশূর রাজসূয় যজ্ঞ সম্পাদনার্থ ইতিপূর্ব্বে (শেষ বারে পঞ্চ ব্রাহ্মণ আনিবার পূর্ব্বে) কান্যকুব্জ হইতে ব্রাহ্মণ আনয়ন করিয়াছিলেন।

অনুসারে পুত্রেষ্টির পরেই তাঁহার পুত্র জন্মিয়াছিল। আদিশূরের কালনির্ণয়ের আলোচনায় আমরা এ বিষয়ে সবিস্তার আলোচনা করিয়াছি। যে সকল কুলগ্রন্থে ক্ষিতীশ প্রভৃতির আগমন উল্লিখিত দেখি, তাহাদের অনেকগুলিতেই ভট্টনারায়ণ প্রভৃতিরও, যে সূত্রেই হৌক না কেন, আগমনের কথা উল্লিখিত দেখি। সুতরাং উভয় দলেরই পঞ্চব্রাহ্মণের আগমন, কিন্তু বিভিন্ন সময়ে, ধরা অসঙ্গত হইবে বলিয়া মনে করি না। বিশেষত, ভট্টনারায়ণাদিকে পাঠাইবার জন্য আদিশূরের পত্র এবং বীরসিংহের প্রত্যুত্তর বলিয়া যাহা প্রসিদ্ধ আছে, তাহাতে দেখা যায় যে, উক্ত পত্রে "পুনরপি" অর্থাৎ "আবারও" ব্রাহ্মণ পাঠাইবার কথা এবং উক্ত প্রত্যুত্তরে "পূর্ব্বসখ্যের" কথা উল্লিখিত আছে (১২)।

ভট্টনারায়ণপ্রমুখ পঞ্চব্রাহ্মণের বঙ্গে আগমন।

আদিশূরের পুত্রেষ্টিযজ্ঞে ক্ষিতীশ প্রভৃতি পঞ্চ ব্রাহ্মণের আগমন কোন কোন কুলগ্রন্থে উল্লিখিত থাকিলেও অনেকগুলি কুলগ্রন্থেই ভট্টনারায়ণপ্রভৃতি পঞ্চব্রাহ্মণেরই আগমন উল্লিখিত হইয়াছে দেখা যায়, এবং ইহার সমর্থক জনশ্রুতিও প্রবলতর দৃষ্ট হয়। ইতিপূর্ব্বে আমরা যে আলোচনা করিয়া আসিয়াছি, তাহাতে আমাদের সিদ্ধান্ত অনেকবার ইঙ্গিত করিয়া আসিয়াছি যে, ৯৯৯ সম্বতে আদিশূর কর্ত্তৃক পুত্রেষ্টিযজ্ঞ উপলক্ষেই ভট্টনারায়ণপ্রভৃতি পঞ্চব্রাহ্মণ আনীত হন। আমাদের ন্যায় সম্বন্ধনির্ণয়কার ৺লালমোহন বিদ্যানিধি মহাশয় (১৩) এবং বল্লালমোহ মুদ্গর প্রণেতা ৺উমেশচন্দ্র গুপ্ত বিদ্যারত্ন মহাশয়ও (১৪) বিভিন্ন পন্থা অবলম্বনে ঐ একই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন দেখি। আমরা অবশ্য এমন কথা বলি না যে, আমাদের সিদ্ধান্ত গণিতসিদ্ধান্তের ন্যায় নির্ভুল। আর একটী কথা ইতিপূর্ব্বেই উপরে বলিয়া আসিয়াছি যে, যে সকল কুলগ্রন্থে ক্ষিতীশপ্রমুখ পঞ্চব্রাহ্মণের আগমন সমর্থিত হইয়াছে, তাহাদের অধিকাংশেই ভট্টনারায়ণ প্রভৃতিরও আগমন উল্লিখিত হইয়াছে দেখা যায়। যে সকল কুলগ্রন্থকার ক্ষিতীশ প্রভৃতির পর ভট্টনারায়ণ প্রভৃতিরও আসিবার কথা বলিয়াছেন, তাঁহাদের উক্তি সম্বন্ধে আমাদের এই একটী প্রশ্ন উঠে যে, কুলগ্রন্থে দেখা যায় যে, ক্ষিতীশ প্রভৃতি পঞ্চব্রাহ্মণের ৫৬টী পুত্র জন্মিয়াছিল (১৫), কিন্তু তাঁহাদিগকে গ্রাম দিবার কথা বা তাঁহাদিগের নামে কোন "গাঁই" হইবার কথা উঠে না কেন? ভট্টনারায়ণের পুত্রগণেরই নামে "গাঁই" হয় কেন? ইহাতেই খুব দৃঢ় অনুমান হয় যে, ক্ষিতীশ প্রভৃতি পুত্রেষ্টিযজ্ঞের সময় আসেন নাই, ভট্টনারায়ণ প্রভৃতিই আসিয়াছিলেন। যাঁহাদের মতে ক্ষিতীশ প্রভৃতি পুত্রেষ্টিযজ্ঞে আসিয়াছিলেন, তাঁহারা আরও বলেন যে, তাঁহারা স্বদেশে ফিরিয়া গিয়া জ্ঞাতিগণ কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হওয়ায় স্ব স্ব পুত্র ভট্টনারায়ণ প্রভৃতিকে সঙ্গে করিয়া গৌড়ে ফিরিয়া আসেন (১৬)। কিন্তু কুলগ্রন্থে দেখা যায় যে, সে সময়ে শ্রীহর্ষের বয়স ৯০ বৎসর এবং ভট্টনারায়ণের বয়স ৮০ বৎসর (১৭)। ইঁহারা যদি মেধাতিথি ও ক্ষিতীশের পুত্র হন, তবে তাঁহাদের বয়স অন্তত ১১০ ও ১০০ বৎসরের কাছাকাছি হওয়া উচিত। কিন্তু সে বয়সে গৌড় হইতে তাঁহাদের পক্ষে কান্যকুব্জ ফিরিয়া গিয়া পুনরায় এদেশে প্রত্যাবর্ত্তন সাধারণত সম্ভবপর বলিয়া মনে হয় না। কিন্তু যদি ৯৫৪ সম্বতে ক্ষিতীশ ও মেধাতিথির গৌড়ে আগমন, এবং যজ্ঞান্তে স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তনও ধরা যায়, তবে তাহা অসঙ্গত হইবার পরিবর্ত্তে সুসঙ্গতই হয়। এইরূপ ধরিলে, ইতিপূর্ব্বে আদিশূর ও বীরসিংহের পরস্পরের মধ্যে যে পত্রব্যবহারের উল্লেখ করিয়াছি, তাহারও সহিত সুসঙ্গতি রক্ষিত হয়।

(১২) আদিশূরের পত্র—নৃপতিস্বকৃতিসারঃ স্বীয়বংশাবতারঃ প্রবলবলবিচারো বীরসিংহোঽতিধীরঃ। মম বয়সখিতান্তে ভূমিদেবান্ সত্বত্যান্ পুনরপি মম গৌড়ে প্রাপয় ত্বং নিতান্তং॥

বীরসিংহের প্রত্যুত্তর—মহারাজরাজাদিশূরো মহাত্মা স্বয়া বীরসিংহস্য মেহত্যাদিসখ্যাং। তবাজ্ঞানুসারাদ্ধি প্রস্থাপয়ামি দ্বিজান্ পঞ্চগোত্রান্ সদারাদিভৃত্যান্॥ রা॰ ব্রা॰ ৭পৃঃ

(১৩) সম্বন্ধনির্ণয়ে কান্যকুব্জাগত ব্রাহ্মণপঞ্চ অধ্যায় দেখ—২১৩পৃঃ

(১৪) ব॰ মো॰ ৩৩৭পৃঃ

(১৫) প্রে॰ বি॰ ২৪ম বিলাস—২৬২ পৃঃ

(১৬) গাঙ্গেয়সদৃশো বৃদ্ধঃ শ্রীহর্ষো হর্ষবর্দ্ধনঃ। ৫
অশীতিবর্ষদেশীয়ো ভট্টনারায়ণো মুনিঃ। ৬
মহেশধৃত কুলপঞ্জিকার বচন—মুলোপঞ্চাননের গোষ্ঠিকথা—স॰ নি॰ ৫৫৫-৫৫৬পৃঃ

ভট্ট বলে শিশু শুন নাম হর্ষ, হাসে পুনঃ
বয়স শতের দশ কম। ৪
আমি ছোট কিংবা বড়, দেখে মন কর দড়
প্রায় অশীতি বয়স মম। ৫
ভাটের কাহিনী—স॰ সি॰ ৫৫৪ পৃঃ

নবজীবন।

(অধ্যাপক শ্রীউপেন্দ্রনাথ বল, এম-এ)

আমরা সংসারে একলা নই—অনন্ত জীবনের সঙ্গে বাঁধা। আমার নিশ্বাস-প্রশ্বাস অনন্ত জীবনসাগরে আঘাত করছে। আমার হস্ত-পদ সঞ্চালনে অনন্ত তরঙ্গের উৎপত্তি হচ্ছে। আমি যে কোন কাজ করি তাহার হিসাব অনন্ত ইতিহাসের পাতায় লেখা হচ্ছে। আমার চিন্তা, আমার জ্ঞান কিছুই বিচ্ছিন্ন ভাবে ঘটতে পারে না; সব এক সূত্রে বাঁধা। আমি যদি ভাবি, আমি আছি সংসারে নিজের সুখ-সাধনে,—আমি অর্থোপার্জ্জন করব এবং নিজের লালসার তৃপ্তি করব, কামনা বাসনা চরিতার্থ করব, অপরের কথা একেবারেই আমার মনকে কোনরূপ আন্দোলিত করবে না; সংসারে সবাই নিজের স্বার্থসিদ্ধির জন্য ঘুরে বেড়াচ্ছে, আমি কেন তাহা করব না?—সেটা কি ঠিক? কথাটা একবার তলিয়ে দেখা ভাল। সত্যই কি সংসারে সকলে স্বার্থের পশ্চাতে দৌড়চ্ছে? পিতা খাটছেন সংসারের জন্য—পুত্র-কন্যা সুখে থাকবে বলে; মার চিন্তা সন্তানের সুখ কি করে হয়; তিনি স্বামীর প্রেমে পাগল; তাঁর জীবন সন্তানের জন্য উৎসর্গীকৃত। ত্যাগের চিত্রে সংসার সুন্দর। ইহার বিপরীত কোন ভাব দেখলে আমরা বলি উহা অস্বাভাবিক; আর যখন ত্যাগ শুধু আপনার আত্মীয়গণের জন্য না হয়ে সংসারের সকলের জন্য ব্যাপ্ত হয়ে পড়ে, তখন বলি উহা ঐশ্বরিক। মানুষ যখন এই অবস্থায় গিয়ে পড়ে, তার প্রেম যখন সকলের দুঃখে উদ্বেলিত হয়ে ওঠে, তখন তার জীবন সীমা ছাড়িয়ে অসীমের মধ্যে গিয়ে পড়েছে, মৃত্যুর অন্ধকার পার হয়ে জীবনের আলোকে গিয়েছে। পরের জন্য কিছু করতে পারলে সে সুখী হয়। পর তার পর নয়। সব আপনার।

আমরা যে আপন-পর ভাবি, এর কি কোন মূল্য আছে? ভেদজ্ঞান যতদিন থাকবে ততদিন আমার দিব্য জ্ঞান লাভ হবে না। ততদিন আমি আমার দেহের তৃপ্তিসাধনে ব্যস্ত থাকায়, আমি মৃত্যুর ভয়ে ভীত হব, ইন্দ্রিয় আমাকে ক্রীতদাস করে রাখবে। আমাকে দেহের অতীত না করতে পারলে যত ত্রুটী যত অপরাধ আমাকে ঘিরে থাকবে। সংসারে যারা কৃপণ—অর্থলোভ যাদের প্রবল, তারা অর্থ সঞ্চয় করবার জন্য ব্যস্ত। অর্থের যে মোহিনী রূপ তাহা তাহাকে ব্যাকুল করে; অর্থকে সে নিজে সম্ভোগ করে না, অপরকেও সম্ভোগ করতে দেয় না। মৃত্যুর পর তাহা যক্ষের টাকা হয়ে থাকে; ইহা আমাদের সাধারণের ধারণা। যক্ষ অপরকে সর্ব্বনাশের পথে নিয়ে যায়। আর যার অর্থ জীবসেবা ও দেবসেবায় ব্যয়িত হয়, তার পুণ্য মানুষকে ধর্ম্মের পথে নিয়ে যায়। ভারতের কত মন্দির, কত জলাশয়, কত পান্থশালা, কত ধর্ম্মশালা আজ পুণ্যাত্মাদের স্মৃতি রক্ষা করছে। শুধু তাই নয়, তাঁদের স্মৃতি অপরকে ধর্ম্মভাবে উদ্বুদ্ধ করে তুলছে। তীর্থস্থানে গিয়ে সাধুগণের প্রতিষ্ঠিত মন্দির-পার্শ্বে বসে ভগবদারাধনা করে মানুষ যখন তৃপ্ত হয়, তখন তার সাধনার মধ্যে মন্দির-প্রতিষ্ঠাতার পূত জীবনের প্রভাব এসে পড়ে। যে দেশে এইরূপ পুণ্য প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা বেশী, সে দেশের কত গৌরব। ভারতের প্রাচীন ঋষিগণের পুণ্য কাহিনী যখন আজ-কালকার লোক স্মরণ করে, তাদের জীবনে নূতন ভাব জাগরিত না হয়ে যায় না। যুগের পর যুগ ভগবান আপনাকে প্রতিষ্ঠিত করছেন, এক জীবনের ধারা অপর জীবনে গিয়ে পড়ছে, এক চিন্তার তরঙ্গ অপর প্রাণকে আঘাত করছে, একের সাধনা অপরকে শুদ্ধ করছে। এই ঘাত-প্রতিঘাতে আমাদের জীবন বিকশিত হচ্ছে। ইহাকেই বলি ভগবানের লীলা।

মানুষ যখন আত্মপর ভেদবুদ্ধি-হারা হয়ে আপনাকে সর্ব্বত্র দেখে, তখন সে আত্মজ্ঞান লাভ করে। তখন সে ত্যাগ করতে ভয় পায় না। ত্যাগেই আনন্দ, ত্যাগেই স্বর্গ। দধীচি মুনি দেবগণের রক্ষার জন্য আপনার অস্থিদান করলেন। আপনার শরীরের সমস্ত শক্তি দেবতাগণের রক্ষার জন্য বজ্ররূপে পরিণত হল। যখনই মানুষের মধ্যে দেবত্ববিনাশের সম্ভাবনা হয়, তখনই দধীচির আত্মা এসে মানুষের মধ্যে বজ্র হয়ে প্রকাশিত হয়। শত শত লোক দেশরক্ষার জন্য অকাতরে

জীবন দান করছেন। শত শত নরনারী পরের সেবায় জীবন উৎসর্গ করেন। সেখানে কি স্বর্গীয় আনন্দ! আত্মত্যাগ করে তাঁরা আত্মাকে লাভ করেন। ক্ষুদ্র জীবনকে তুচ্ছ করে ভূমা মহৎ জীবনের সৃষ্টি করেন। যাঁরা আপনাকে পরের জন্য করেছেন তাঁদের মৃত্যু নাই; মৃত্যুতে তাঁরা নবজীবন লাভ করেন।

যো মাং পশ্যতি সর্ব্বত্র সর্ব্বঞ্চ ময়ি পশ্যতি।
তস্যাহং ন প্রণশ্যামি স চ মে ন প্রণশ্যতি॥

"যিনি আমাকে সর্বত্র দেখেন এবং আমাতে জীব মাত্রকে দেখেন, আমি তাঁহার অদৃশ্য হই না; তিনিও আমার অদৃশ্য হন না।"

ভগবানকে দেখবেন সর্ব্বত্র সর্ব্বজীবে, আর সর্ব্বজীবকে দেখবেন ভগবানে, এই জ্ঞান লাভ করলে ভগবান তাঁকে পরিত্যাগ করেন না, তিনিও ভগবানকে ভুলতে পারেন না। ভগবানকে সর্ব্বত্র অনুভব করতে পারলে প্রকৃত যোগলাভ হয়। সেই যোগ হইতে আর বিচ্যুতি নাই।

আত্মৌপম্যেন সর্ব্বত্র সমং পশ্যতি যোঽর্জ্জুন।
সুখং বা যদি বা দুঃখং স যোগী পরমো মতঃ॥

"হে অর্জ্জুন, যিনি সর্ব্বজীবে সুখ বা দুঃখ আপনার সঙ্গে তুলনায় সমান দেখেন, আমার মতে সেই যোগী শ্রেষ্ঠ।"

আমার যাতে দুঃখ, অপরের তাতে দুঃখ, আমার যাতে সুখ অপরের তাতে সুখ, এই ধারণা বদ্ধমূল হলে পরস্পরের প্রতি হিংসা, ঈর্ষা ও দ্বেষ লোপ পায়। যিশুর জীবনের শিক্ষা—Do unto others as you would be done by. নিজে যেরূপ ব্যবহার পেতে চাও, অপরের প্রতি সেই ব্যবহার কর। এ সব কথা আমাদের কাছে নূতন নয়। বলতে গেলে মানুষের সমাজগঠনের সময় থেকেই এই কথার সৃষ্টি হয়েছে। মানুষ যখন সমাজ গঠন করেছে, তখন সে চেয়েছে সমান ব্যবহার, পরস্পরের প্রতি সমান জ্ঞান। অথচ এই শিক্ষার আবশ্যকতা এখনও কমেনি, এখনও মৈত্রী ও সাম্যের অভাব কম নয়। যত দিন যাচ্ছে ততই যেন সমাজের দুর্গতি হচ্ছে, ততই পরস্পরের প্রতি প্রেম ও ভালবাসার অভাব বেড়ে যাচ্ছে। একদিকে চলছে জীবন-সংগ্রাম। অর্থের অনটনে মানুষ পিষে যাচ্ছে। সারাদিন খেটেও শরীর রক্ষা করতে পারছে না। আর এক দিকে চলছে ধনীর অর্থ সঞ্চয়। তার অর্থই সর্ব্বস্ব। এই যুগে আবার খৃষ্ট-প্রচারিত ত্যাগ আবশ্যক হয়েছে। গুডফ্রাইডের দিন খৃষ্ট-সমাজের একটী পবিত্র দিন। কথিত আছে, এই দিনে খৃষ্ট মানুষের কাছে তাঁর নবজীবন প্রকাশ করেছিলেন। তাঁর প্রেমের ধর্ম্মকে তুচ্ছ করে স্বার্থপর অন্ধ মানুষ তাঁকে বলি দিয়েছিল। মনে করেছিল, এই লোকটিকে লোকচক্ষুর অন্তরাল করতে পারলেই তাদের সুবিধা হবে; ব্যবসায়ীর ব্যবসায়ে ক্ষতি হবে না, ধনীর অর্থলিপ্সায় কোন বাধা পড়বে না; ইন্দ্রিয়পরতন্ত্র সুখে কালযাপন করবে। সে আশা বৃথা। তবু যিশু বিনা প্রতিবাদে প্রাণদান করলেন, তাঁর একমাত্র কথা "প্রভু ইহাদিগকে ক্ষমা কর, কারণ এরা কি করছে তা এরা জানে না।" তাঁর এই ক্ষমার কথা প্রাণের মধ্যে বাণের মত বিঁধে যায়। এই প্রেম—এমন কোন কঠিন প্রাণ নাই যাকে আঘাত করে না। তাই তাঁর ক্রুশে বিদ্ধ হবার দিন তিনেক পরে যখন জনসাধারণ ঐ কঠিন আঘাতের বেদনা কিছু সামলিয়ে নিল, তখন তাদের অন্তরে যিশুর প্রেম-ভাব নবতর মূর্ত্তিতে প্রকাশিত হল। প্রকাণ্ড প্রস্তর অপসারিত হল। কেহই বাধা দিতে পারল না। কোথায় গেল শত্রুর দল। সকলে অবাক হয়ে যিশুগতপ্রাণ হল। যিশু প্রাণ দেওয়ায় তাঁর প্রাণ আজ জগতে ছড়িয়ে পড়েছে। এখন আর যিশুর বিনাশ নাই। এখন আর কেহ অস্বীকার করবে না যে, যিশু তাঁর পিতার সঙ্গে এক ভাবে সম্বদ্ধ। যিশুর আহ্বান তাই আজ সকলকে ধর্ম্মভাবে উদ্বুদ্ধ করেছে। যিশু যে নবজীবন পেয়েছিলেন, ত্যাগের ফলে আত্মবলিদানের ফলে সেই বার্ত্তা আজ কত নর-নারীকে ঘরের বাহিরে টেনে আনছে। ঐ তাঁরা দুঃখীর সেবা করছেন, আর্ত্তের সেবা করছেন, রোগীর শুশ্রূষা করছেন। মৃত্যুকে তাঁদের ভয় নাই। তাঁরা যাচ্ছেন অজ্ঞাত প্রদেশে, গভীর অরণ্যের মধ্যে, সীমান্তপ্রদেশে অপরিচিত লোকের মাঝে। যিশুর জীবন এসে তাঁদের জীবনে আকার পেয়েছে।

আজকের দিনে বিশেষ করে মনে পড়ছে স্বর্গীয়া পণ্ডিতা রমাবাইয়ের কথা। ভারতের নারী, তাঁরা অবলা বলে পরিচিত। তিনি কি না দেড় হাজার অসহায় বালক বালিকাকে আশ্রয় দিয়ে তাদের মনুষ্যত্ব উদ্বোধনের জন্য জীবনদান করলেন। পুণার অনতিদূরে কেদগাঁও। সেইখানে দেবী রমাবাইয়ের আশ্রম। সে যে আমাদের পক্ষে পুণ্য ক্ষেত্র। একজন মহিলা সংসারের সমস্ত সুখে জলাঞ্জলি দিয়ে ভগবদুদ্দেশ্যে নরসেবা করে জীবন উৎসর্গ করলেন। ইহা অপেক্ষা পবিত্র দৃশ্য আর কোথায় দেখব? তাঁর মনে যিশুর আদর্শে নবজীবনের সঞ্চার হয়েছিল।

আপনার তরে আসি নাই কেহ
প্রত্যেকে আমরা পরের তরে,

ইহা কবির কল্পনা নয়। যিশুর ভাবে উদ্বুদ্ধপ্রাণ রমাবাই যা করে গেছেন, সেইরকম অনেকে করেছেন। আজ জগতের ত্যাগী মহাপুরুষগণ সু-উচ্চ আসন থেকে তারস্বরে বলছেন—

স্বার্থ হতে জাগ, দৈন্য হ'তে জাগ, সব জড়তা হ'তে জাগ, জাগরে সতেজ উন্নত শোভাতে!

বাহির কর তব পথের মাঝে, বরণ কর মোরে তোমার কাজে।

নিবিড় আবরণ কর বিমোচন, মুক্ত কর সব তুচ্ছ শোচন,

ধৌত কর মম মুগ্ধ লোচন, তোমার উজ্জ্বল শুভ্র রোচন নবীন নির্ম্মল বিভাতে।

দধীচি এবং যিশু, সক্রেটিস এবং বুদ্ধ সকল মহাজন আত্মবলিদান করে যে নবজীবন লাভ করেছিলেন, তার প্রভাব আজ সব মানুষের জীবনে এসে কাজ করছে। তাঁরা সব ডাকছেন আমাদিগকে ক্ষুদ্রতা ছেড়ে ভূমার মধ্যে গিয়ে পড়তে। আমরা কি তা আজ অনুভব করব না? আমরা কি সামান্য লয়ে সন্তুষ্ট থাকব? প্রাণ ত সামান্য চায় না, প্রাণ চায় অনন্ত প্রাণের সঙ্গে মিলে যেতে। তাই আজ আমরা প্রার্থনা করি, যেন আমাদের দিব্য দৃষ্টি খু'লে যায়, যেন আর সামান্যের পশ্চাতে না দৌড়ই; সমস্ত মোহ মায়া কাটিয়ে ঝাঁপ যেন দিই অনন্ত জীবনসমুদ্রে।

উড়িষ্যায় বাঙ্গালীর উপনিবেশ।

(রায়মহাশয় শ্রীসতীন্দ্রনারায়ণ রায় বি-এল)

উড়িষ্যায় বহু বাঙ্গালীর বাস। প্রায় চারিশত বৎসর পূর্ব্বেও বাঙ্গালীগণ উড়িষ্যায় বাস করিতেন। কি কারণে তাঁহারা এদেশে আসিয়াছিলেন তাহা যতদূর সম্ভব নির্ণয় করিতে চেষ্টা করিব। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু যে সময় পুরীতে বাস করিতেন, সে সময় বহু বাঙ্গালী যাত্রী প্রতিবৎসর শ্রীজগন্নাথদেবের রথযাত্রা দর্শন করিতে আসিতেন। তাঁহারাই স্থানে স্থানে উপনিবেশ স্থাপন করেন। কটক ও পুরী জেলার অনেক গ্রামে বাঙ্গালীপল্লী আছে। তাঁহাদের পূর্ব্বপুরুষগণ বর্দ্ধমানজেলা হইতে আসিয়াছিলেন বলিয়া প্রবাদ আছে। সে সময়ে কোন কোন পাঠানশাসনকর্ত্তা হিন্দুধর্ম্মবিদ্বেষী ও ঘোর অত্যাচারী ছিলেন। পাঠানের অত্যাচার হইতে রক্ষা পাইবার জন্য সর্ব্বপ্রথমে বাঙ্গালীগণ উড়িষ্যায় উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিলেন বলিয়া মনে হয়। ঔপনিবেশিকদিগের মধ্যে সর্ব্বপ্রকার জাতি দেখা যায়। কায়স্থ, তিলি, তাম্বুলি, নাপিত, সুবর্ণবণিক ও অন্যান্য নবশাখজাতি বহু পূর্ব্ব হইতে উড়িষ্যার অভ্যন্তরে জমিজমা লইয়া পুরুষানুক্রমে বাস করিতেছেন। ব্রাহ্মণ ও বৈদ্যের সংখ্যা নিতান্ত মুষ্টিমেয়। যে সকল কায়স্থ বা অন্যান্য জাতি উড়িষ্যায় বসবাস করিতেছেন, তাঁহাদের গুরু বা পুরোহিত তাঁহাদিগের সহিত আসেন নাই। ক্রিয়াকর্ম্ম উপলক্ষে তাঁহাদের বংশধরগণ আজিও সুদূর উড়িষ্যাবাসী শিষ্যের গৃহে পদার্পণ করিয়া থাকেন।

পূর্ব্বে উড়িষ্যায় সর্ব্বপ্রকার খাদ্যদ্রব্য অতিশয় সুলভ ছিল। মাত্র কুড়ি বৎসর পূর্ব্বেও কটকসহরে টাকায় কুড়ি সের চাউল ও দুই সের বিশুদ্ধ ঘৃত পাওয়া যাইত। তাহার পূর্ব্বে সর্ব্বপ্রকার খাদ্যদ্রব্য এরূপ সুলভ ছিল যে, এখন তাহা স্বপ্ন বলিয়া মনে হয়। এইরূপে সুলভে জীবনযাত্রা-নির্ব্বাহ যে দেশে সম্ভবপর ছিল, সে দেশে বাস করিলে স্বধর্ম্মানুরক্তির জন্য কোনও অত্যাচার সহ্য করিতে হইত না। কটক ও পুরী জেলার অধিকাংশ বাঙ্গালী বৈষ্ণবমতাবলম্বী। মহাপ্রভুর আবির্ভাবের সহিত বঙ্গদেশের অন্তরের অন্তর হইতে শ্রীক্ষেত্রের দিকে যে অপূর্ব্ব ভক্তির স্রোত বহিয়াছিল, সেই স্রোতে ভাসিয়া সর্ব্বপ্রথমে বাঙ্গালী ঔপনিবেশিক উড়িষ্যায় আসিয়াছিলেন। ইহা বঙ্গদেশের পক্ষে গৌরবের বিষয়।

বিহার ও উত্তরপশ্চিম প্রদেশে রেলওয়ে খুলিবার পর যে সকল বাঙ্গালী সেখানে ঘরবাড়ী নির্ম্মাণ করিয়া চিরস্থায়ীরূপে বসবাস করিতেছেন তাঁহাদের ভাষা ও

আচার-ব্যবহারে কোনও বৈলক্ষণ্য দেখা যায় না ; কারণ সর্ব্বদাই বঙ্গদেশের সহিত তাঁহাদের আদান-প্রদান রহিয়াছে। তাঁহাদের প্রায় সকলেরই অবস্থা সচ্ছল। বড় বড় কর্ম্মোপলক্ষে তাঁহাদের পূর্ব্বপুরুষগণ প্রবাসে গিয়াছিলেন এবং তাঁহাদের বংশধরগণ আজিও সম্ভ্রম ও প্রতিপত্তির সহিত বিদেশে জীবনযাপন করিতেছেন। প্রবাসের মাটির সহিত মিশিয়া জমিজমা লইয়া তদ্দেশীয়দিগের মতই জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিবার সুবিধা বা অসুবিধা তাঁহাদের ঘটে নাই। উৎকলপ্রবাসী বাঙ্গালীর মধ্যে দুই চারজন মাত্র আজিও মাথা উঁচু করিয়া আছেন, কিন্তু তাঁহাদের মধ্যে অধিকাংশ লোকই সাধারণ গৃহস্থের ন্যায় কায়ক্লেশে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিয়া থাকেন। রেলওয়ে খুলিবার পূর্ব্বে বঙ্গদেশের সহিত তাঁহাদিগের সামাজিক আদান-প্রদান ছিল না বলিলেও হয়। এরূপ অবস্থায় মূল সমাজ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়াও তাঁহারা নিজেদের আচার-ব্যবহার রীতি-নীতি যে এখনও বজায় রাখিতে পারিয়াছেন তাহাই আশ্চর্য্যের বিষয়। তাঁহাদের ভাষা ও রীতিনীতি সামান্য পরিবর্ত্তিত হইলেও তাহার সহিত এদেশীয় সামাজিক রীতিনীতির কোনও সাদৃশ্য নাই। ভাষা হিসাবে প্রায় সকলেই বাঙ্গালাভাষী ; তবে দুই-এক স্থানে নাপিত, তিলি ও সুবর্ণবণিক প্রভৃতি কতকগুলি বাঙ্গালী ঔপনিবেশিক মাতৃভাষা ভুলিয়া গিয়াছে। উড়িষ্যায় যে সকল বাঙ্গালী বসবাস করিতেছেন, তাঁহাদের সহিত বঙ্গবাসিগণ ক্রমশঃ বিবাহসূত্রে আবদ্ধ হইলে পর রীতিনীতির যে সামান্য বৈলক্ষণ্য ঘটিয়াছে তাহাও লোপ পাইয়া যাইবে। পূর্ব্ববঙ্গ ও পশ্চিমবঙ্গের মধ্যে রীতিনীতি বা ভাষাগত যে পার্থক্য আছে, তাহার অনুপাতে পশ্চিমবঙ্গের সহিত উড়িষ্যাবাসী বাঙ্গালীদিগের অতি সামান্য পার্থক্যই দেখা যায়।

বালেশ্বর সহরে অনেক তাম্বুলি বাস করেন। বালেশ্বর তাম্বুলি জাতির প্রধান কেন্দ্র। তাঁহারা সকলেই বাঙ্গালাভাষী এবং ক্রিয়াকর্ম্ম আচারব্যবহারে তাঁহাদিগের সহিত বঙ্গদেশীয় তাম্বুলিদিগের বিশেষ কোন পার্থক্য নাই। তাঁহাদের পূর্ব্বপুরুষগণ ব্যবসা ব্যপদেশে এদেশে আসিয়াছিলেন। তাঁহাদিগের আদিম বাস বর্দ্ধমান জেলায় ছিল। মোগলশাসনকালে তাঁহাদিগের পূর্ব্বপুরুষ বালেশ্বরে আসিয়াছিলেন। আজকাল বঙ্গদেশে ব্যবসাবাণিজ্যের যেরূপ অবনতি হইয়াছে তাহা দেখিলে বঙ্গবাসিগণ কোনও দিন ব্যবসাবাণিজ্যের প্রতি আস্থাবান ছিলেন বলিয়া মনে হয় না। সর্ব্বপ্রথমে দুইটি তাম্বুলি পরিবার বালেশ্বরে আসিয়াছিলেন। তাঁহাদিগের বংশধরগণ প্রায় সহরটির অধিকাংশ দখল করিয়া বসিয়াছেন। বালেশ্বর সে সময়ে একটি প্রধান বন্দর ছিল। তাম্বুলিগণ তাঁহাদের নিজেদের জাহাজে মাল আমদানী ও রপ্তানি করিয়া বিশেষ অর্থশালী হইয়াছিলেন। তাঁহারা যেরূপ দক্ষতা ও কর্ম্মকুশলতার সহিত ব্যবসা চালাইতেন তাহা সমগ্র ভারতবাসীর অনুকরণীয়। তাঁহাদের দেশীয় অর্ণবপোত সমুদ্রবক্ষ ভেদ করিয়া মাদ্রাজ, লঙ্কা এবং পশ্চিম উপকূলের বহুস্থানে যাইত। বিদেশে আসিয়া তাঁহারা পরিশ্রম, সততা এবং অধ্যবসায়ের দ্বারা যে এরূপ বিস্তৃত কারবার গঠন করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন, ইহা তাঁহাদিগের কম কৃতিত্বের পরিচয় নহে। ইংরাজশাসনের প্রারম্ভেও বালেশ্বরের তাম্বুলিগণ তাঁহাদিগের পৈত্রিক ব্যবসা সম্পূর্ণ বজায় রাখিয়াছিলেন। সে সময় বালেশ্বরে পরিষ্কৃত লবণ প্রস্তুত হইত এবং সেই লবণ রপ্তানির অন্যতম পণ্য ছিল। লিভারপুল লবণ অপেক্ষা ঐ লবণ কোনও ক্রমে কম পরিষ্কৃত ছিল না। পৈথানের সহিত সমুদ্রের জল জ্বাল দিয়া লবণ প্রস্তুত হইত। অতি সহজ উপায়ে এইরূপ লবণ প্রস্তুত করিবার সুন্দর প্রণালী অন্য কোনও প্রদেশে প্রচলিত ছিল কি না সন্দেহ। আজকাল অবাধ বাণিজ্যের ফলে লিভারপুল লবণ এদেশে যথেষ্ট আসিতেছে। কিন্তু সে সময় পরিষ্কৃত লবণের চাহিদা যথেষ্ট ছিল এবং বালেশ্বরের নিকটস্থ সমুদ্রোপকূলে যে লবণ প্রস্তুত হইত তাহা অন্যান্য স্থানে উচ্চমূল্যে বিক্রয় হইত। এই লবণের কারবারে বালেশ্বরের তাম্বুলি ব্যবসায়ীগণ বিশেষ লাভবান হইয়াছিলেন।

বর্ত্তমান সময়ে সমুদ্রের জল মারিয়া এইরূপ লবণ প্রস্তুত করিলে লাভবান হইবার কিরূপ সম্ভাবনা, কিছুদিন পূর্ব্বে সে বিষয়ের অনুসন্ধান করিয়াছিলাম। পূর্ব্ব প্রণালী অবলম্বন করিয়া এখনও পরিষ্কৃত লবণ প্রস্তুত করা যাইতে পারে। কিন্তু তাহাতে যেরূপ অর্থব্যয় হইবে তাহার হিসাব করিলে ক্ষতি ভিন্ন লাভ হইবার সম্ভাবনা নাই। সে সময়ে সমুদ্রের বিস্তীর্ণ বেলাভূমি অযত্নসম্ভূত বেণাজাতীয় উদ্ভিদে সমাচ্ছন্ন থাকিত। কাষ্ঠের পরিবর্ত্তে বেনার জ্বাল দিয়া লবণ প্রস্তুত হইত বলিয়া সস্তা দরে লবণ বিক্রয় করা যাইতে পারিত। এখন সমুদ্রের কূলে এরূপ উদ্ভিদ আর জন্মায় না। আবহাওয়ার পরিবর্ত্তন, বারিপাতের স্বল্পতা বা অন্য কোনও প্রাকৃতিক কারণে এরূপ হইয়া থাকিবে। বালেশ্বরের তাম্বুলিগণ যত দিন ব্যবসাবাণিজ্যে মনোনিবেশ করিয়াছিলেন, তত দিন জমিদারী ক্রয় করেন নাই। পরে ব্যবসায়ে অবনতির সহিত তাঁহারা সঞ্চিত অর্থে জমিদারী ক্রয় করিয়া প্রায় সকলেই ছোটবড় জমিদার হইয়াছেন। রাজা শ্যামানন্দ দে ও তাঁহার পুত্র মহারাজা বৈকুণ্ঠনাথ দে বাহাদুর বালেশ্বরের তাম্বুলিসমাজের অগ্রগণ্য ও নেতাস্বরূপ ছিলেন। বালেশ্বরের তাম্বুলিসমাজের পূর্ব্বশ্রী আর নাই, তবে এখনও তাম্বুলিগণ

বালেশ্বর সহরের প্রবাসী বাঙ্গালীদিগের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ।

একটি কায়স্থপরিবার মোগলদিগের রাজত্বকালে এদেশে আসিয়া বালেশ্বর জেলায় বসবাস করেন। বালির সন্নিকটস্থ উত্তরপাড়া নামকস্থানে তাঁহাদিগের আদিবাস ছিল। তাঁহাদিগের পূর্ব্বপুরুষ মোগলসরকারে চাকলা-কানঙ্গোইর কার্য্য করিতেন। সে সময়ে তাঁহারা পুত্র-পৌত্রাদিক্রমে চাকলা-কানঙ্গোইর পদ উত্তরাধিকারসূত্রে ভোগ করিতেন। বর্ত্তমান কালের জেলার কলেক্টার অপেক্ষা চাকলা-কানঙ্গোইগণ অধিক ক্ষমতাশালী ছিলেন। তাঁহারা দণ্ডমুণ্ডের কর্ত্তা ছিলেন। তাঁহাদিগের অনুজ্ঞার বাধা প্রদান করিবার শক্তি কাহারও ছিল না। মোগলগণ তাঁহাদিগকে 'রায়মহাশয়' উপাধি দিয়াছিলেন। মোগলশাসনের অবসানে মারহাট্টা ও ইংরাজদিগের আমলেও এই পরিবারের যথেষ্ট প্রতিপত্তি ছিল এবং কানঙ্গোই বা রাজস্বগ্রহীতার পদ তাঁহাদের মধ্যেই নিবদ্ধ ছিল। ইংরাজরাজত্বে কানঙ্গোইর পদ উঠিয়া যাইবার পর তাঁহারা জমিদার বলিয়া গণ্য হইতেছেন। সে সময়ের সামাজিক রীতি অনুসারে তাঁহারা কন্যাগণের বিবাহ দিয়া জামাতাকে গৃহে রাখিতেন এবং কুলীন জামাতাদিগকে যথেষ্ট জমিজমা দিয়া তাঁহাদিগের বাসস্থান নির্দ্দেশ করিয়া দিতেন। বালেশ্বর জেলায় অনেক কুলীন কায়স্থই এইরূপে বিবাহসূত্রে আবদ্ধ হইয়া এদেশে আসিয়াছিলেন। তাঁহাদিগের বংশধরগণ আজিও এই জেলায় বাস করিতেছেন।

ইংরাজশাসনের প্রারম্ভে রাজস্ব বাকীর নিলাম কলিকাতায় 'বোর্ড অব্ রেভিণিউ'এ হইত এবং নিলামী ইস্তাহার ইংরাজী ও বাঙ্গালা ভাষায় প্রকাশিত হইত। উড়িষ্যার জমিদারগণ সে সময়ে সূর্য্যাস্ত আইনের মর্ম্ম সবিশেষ অবগত ছিলেন না। অনেক স্থলে রাজস্ব বাকী পড়িয়াছে কি না তাঁহারা জানিতেও পারিতেন না। এই কারণেই বড় বড় জমিদারী বিক্রয় হইয়া যাইতে লাগিল এবং কলিকাতার ধনিগণ উড়িষ্যার বড় বড় তালুক খরিদ করিতে লাগিলেন। পরে রাজস্ব আইন সংশোধিত হয় এবং কলিকাতায় নিলামী ইস্তাহার জারীর কুপ্রথা রহিত হয়। এই বিসদৃশ রাজস্ব আইনের অবিধেয় প্রয়োগে উড়িষ্যার অধিকাংশ জমিদারী বঙ্গবাসীর হস্তে চলিয়া গিয়াছে। দুঃখের বিষয়, তাঁহারা সকলেই প্রবাসী। তাঁহাদিগের মধ্যে অতি অল্পসংখ্যক জমিদারই তাঁহাদের প্রজার প্রকৃত অবস্থা অবগত আছেন। নায়েব গোমস্তা প্রভৃতির দ্বারা তাঁহারা জমিদারী চালাইয়া থাকেন এবং প্রজার সুখ-দুঃখ বা উড়িষ্যাবাসী বাঙ্গালীর কথা তাঁহারা কিছুই জানেন না। এরূপ অবস্থায় উড়িষ্যাবাসী বাঙ্গালীগণ বাঙ্গালী জমিদারের প্রজাস্বরূপ বসবাস করিয়াও তাঁহাদিগের অভাব-অভিযোগের কথা জমিদার সমীপে সুবিধামত জানাইতে পারেন না। বঙ্গের বড় বড় জমিদারগণ যদি উড়িষ্যাপ্রবাসী বাঙ্গালীর সুখ-দুঃখের কথা জানিয়া তাঁহাদের দিকে সহানুভূতির দৃষ্টি দান করিতেন, তাহা হইলেও তাঁহাদের অনেক উপকার হইত। অস্থায়ী বন্দোবস্তের প্রভাবে রাজস্ব যেরূপ বর্দ্ধিত হইতেছে, তাহাতে উড়িষ্যার জমিদারী ক্রয় করা অনেকস্থলে বিড়ম্বনা মাত্র হইবে। এরূপ অবস্থায় ভবিষ্যতে বাঙ্গালী জমিদারের সংখ্যা ক্রমেই কমিয়া যাইবে। বড় বড় জমিদারী ক্রমশঃ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে বিভক্ত হইয়া আবার এতদ্দেশবাসীর হস্তেই ফিরিয়া যাইতেছে। উড়িষ্যাপ্রবাসী বাঙ্গালীর অবস্থা সচ্ছল নহে। তাঁহাদের মধ্যে এমন খুব কমলোকই আছেন যাঁহারা বঙ্গবাসী জমিদারদিগের সম্পত্তি ক্রয় করিতে পারেন। এরূপ অবস্থায় বাঙ্গালীদিগের প্রতিপত্তি ক্রমশঃ লোপ পাইতে বসিয়াছে।

বর্দ্ধিষ্ণু জাতির পক্ষে প্রসারণের স্থান আবশ্যক। পূর্ব্বে বঙ্গ বিহার উড়িষ্যা ও ছোটনাগপুর বাংলার ছোটলাটের অধীনে ছিল। বাঙ্গালার কৃতবিদ্য ছাত্রগণ চাকরী পাইয়া এই সমস্ত স্থানে ঘুরিয়া বেড়াইতেন। অস্বাস্থ্যকর, মেলেরিয়াক্লিষ্ট জেলাসমূহে তাঁহাদিগকে পর্য্যায়ক্রমে বদলি হইতে হইত না। ছোটনাগপুরের খনিসমূহের পরিচালনায়ও অনেক বাঙ্গালী নিযুক্ত হইতেন। বাংলাদেশের সহিত ছোটনাগপুর একশাসনাধীন ছিল বলিয়াই অনেক বাঙ্গালী ধনী ছোটনাগপুরের কয়লা এবং লৌহের খনির মালিক হইয়াছিলেন। বঙ্গভঙ্গের সময়েও পূর্ব্ব ও পশ্চিম বঙ্গের সংপ্রসারণ স্থানের অভাব ছিল না। বঙ্গভঙ্গ রহিত হইবার সঙ্গে সঙ্গে আসাম বিহার ও ছোটনাগপুর বঙ্গদেশে হইতে বিচ্ছিন্ন হইল এবং বঙ্গদেশের বাহিরে বাঙ্গালীর আর স্থান রহিল না। বিহার ও উড়িষ্যা প্রদেশে যে সকল বাঙ্গালী চিরস্থায়ীরূপে বাস করিতেছেন তাঁহাদের পক্ষে সরকারী চাকরী পাওয়াও দুর্ঘট হইয়াছে। উড়িষ্যা ও বিহার প্রদেশের অধিবাসিগণ বাঙ্গালীর প্রাধান্য মানিয়া লইতে ইচ্ছুক নহেন। বর্ত্তমান সভ্যতার আলোক ক্রমে ক্রমে সর্ব্বত্রই বিকীর্ণ হইতেছে। শিক্ষার প্রচারের সহিত বিহার-উড়িষ্যা প্রদেশের অধিবাসীগণ সরকারের নিকট হইতে তাঁহাদিগের পাওনা গণ্ডা বুঝিয়া লইতে শিখিয়াছেন। এতকাল তাঁহারা বাঙ্গালীদিগের প্রাধান্য মানিয়া লইয়াছিলেন। এখন বাঙ্গালীবিদ্বেষ তাঁহাদের অন্তরে জাগ্রত হইয়াছে। এরূপ অবস্থায় প্রবাসী বাঙ্গালীদিগের পক্ষে সরকারী চাকরী পাওয়া সুকঠিন। ওকালতী ব্যবসায়ে

অনেক বাঙ্গালী বিহার-উড়িষ্যায় আসিয়াছেন। এখন দিন দিন এদেশীয় উকীলদিগের সংখ্যা বাড়িতেছে; সুতরাং সাধারণ-রকমের বাঙ্গালী উকীলের এদেশে আর স্থান নাই বলিলেও হয়। এরূপ অবস্থায় প্রবাসী বাঙ্গালীর ইতিকর্ত্তব্য কি তাহা নির্দ্ধারণ করা সুকঠিন। মাড়োয়ারীগণ সুদূর রাজপুতানা হইতে আসিয়া ব্যবসা-বাণিজ্য করিয়া উড়িষ্যা হইতে অপরিসীম অর্থ লইয়া যাইতেছেন। প্রবাসী বাঙ্গালীগণ চাকরী বা ওকালতীর মোহ ছাড়িয়া ব্যবসা-বাণিজ্যে মনোনিবেশ করিলে তাঁহাদের দুর্দ্দশার অবসান হইবে। বঙ্গের ভিতরে এবং বঙ্গের বাহিরে সমগ্র বাঙ্গালী জাতির পক্ষে একই সমস্যার মীমাংসা করিতে হইবে। জীবনসংগ্রামে পশ্চাৎ-পদ না হইয়া বিক্রম ও শৌর্য্যের সহিত কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইতে হইবে। গতানুগতিকের পন্থা ছাড়িয়া মস্তিষ্ক চালনা দ্বারা অর্থাগমের নূতন নূতন উপায় উদ্ভাবন করিতে হইবে। মাড়োয়ারীর পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া আত্মনির্ভর, স্বাবলম্বন ও সঙ্ঘবদ্ধ হইবার শক্তি সঞ্চয় করিতে হইবে। তাহা হইলে প্রবাসী বাঙ্গালীর দুঃখ ও দৈন্য—দুর্দ্দশা ও দুর্গতির তিরোধান হইবে। সুষুপ্তির মোহ ছাড়িয়া কর্ম্মশক্তিকে সবল ও চঞ্চল করিতে হইবে। প্রতিভার ক্ষণপ্রভালোকে আমাদের আস্থা স্থাপন না করিয়া অধ্যবসায় ও অক্লান্ত পরিশ্রমকে বরণ করিয়া লইতে হইবে। মুষ্টিমেয় প্রবাসীবাঙ্গালী সঙ্ঘবদ্ধ হইলে এখনও অসাধ্য সাধন করিতে পারে। সহানুভূতি উদারতা দয়া প্রভৃতি উচ্চাঙ্গের গুণনিচয় যাহাতে সমাজে পরিস্ফুট হইতে পারে তাহার দিকে সকলকেই লক্ষ্য রাখিতে হইবে। স্বার্থপরতার সংকীর্ণ গণ্ডীতে থাকিয়া কূপমণ্ডূকাত করিলে কোনও সমাজের কল্যাণ-সাধন হইতে পারে না। বর্ত্তমান বিরুদ্ধ পারিপার্শ্বিক ঘটনাবলীর সহিত সামঞ্জস্য করিয়া চলিতে না পারিলে প্রবাসী বাঙ্গালীর উদ্ধারের উপায় নাই। জীবনসংগ্রামে পরাস্ত হইয়া ক্রমশঃ পশ্চাৎপদ হওয়া অপেক্ষা সর্ব্বস্বপণ করিয়া জাতি ও সমাজের কল্যাণসাধন করিবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করা গৌরবের বিষয়। 'মন্ত্রের সাধন বা শরীরপতন' এই মহা-বাক্যকে আমাদের জীবনসর্ব্বস্ব করিতে হইবে।

সমাজ, রাষ্ট্র ও সাহিত্যে নবগঠনের যুগ আসিয়াছে। পুরাতনকে বিসর্জ্জন দিয়া নূতনকে গড়িয়া তুলিতে হইবে। অক্লান্তকর্ম্মী নবযুগের পুরোহিত আবশ্যক। প্রবাসী বাঙ্গালীগণ যদি চরিত্রবল, প্রতিভা ও সততার দ্বারা সেই স্থান অধিকার করিতে পারেন, তাহা হইলে তাঁহাদিগের জীবন সার্থক হইবে এবং উড়িষ্যায় বাঙ্গালীদিগের প্রভাবও অক্ষুণ্ণ রহিবে। আশার বিষয়, স্বর্গীয় রায় রাধানাথ রায় বাহাদুর উৎকলসাহিত্যে নবভাব ও নবপ্রেরণা দান করিয়া অক্ষয় কীর্ত্তি অর্জ্জন করিয়াছেন। বঙ্গ-সাহিত্যে মাইকেল মধুসূদনের যে স্থান, উৎকল-সাহিত্যে রাধানাথ রায়েরও সেই স্থান। উভয়েই নবযুগের পুরোহিত। উভয়েই নবযুগের পদ্য ও কাব্যের প্রতিষ্ঠাতা। রাধানাথ রায়ের স্মৃতি উৎকলবাসীর কৃতজ্ঞ হৃদয়ে চিরকালই সমাদৃত হইবে। একজন প্রবাসী বাঙ্গালী উৎকলসাহিত্যের প্রাণদান করিয়াছেন। নবভাবে ভাবিত হইয়া নব উন্মাদনায় প্রবাসী বাঙ্গালীগণ তাঁহার পদাঙ্ক অনুসরণ করুন। উৎকলবাসীর সুখ-দুঃখে তাঁহাদিগের হৃদয় স্পন্দিত হউক। তাঁহাদিগের দুঃখদৈন্য দূর করিতে তাঁহারা দৃঢ়সংকল্প হইয়া কর্ম্মে প্রবৃত্ত হউন। তাঁহাদের স্বার্থত্যাগে বাঙ্গালীর নাম গৌরবান্বিত হইবে।

গান।

(শ্রীপঞ্চানন রায়)

দেশ—একতালা।

(আমার) বেদন-ভরা আঁখির কোণে
অশ্রু যদিই ঝরে।
(তখন) তুমিই এসে মুছিয়ে দেবে
তোমার আপন করে॥
আসবে পথে শতেক বাধা—কাঁপবে হিয়া গুরু,
তাই বলে কি যাত্রা আমার আজ হবে না সুরু?
পথের সাথী হারিয়ে যাবে, হয়তো আমায় কাঁদতে হবে
ভরসা দিতে কেউ না রবে, বিজন বনের ধারে—
(তখন) তুমিই আমার সঙ্গে যাবে সুগম সুপথ ধরে॥
ক্লান্তি এসে অলসবেশে হরবে আমার মন,
হয়তো ভীতি করবে আমায় পথেই অচেতন।
তাই বলে কি অসাড় প্রাণে রইব বসে আপন মনে?
পারব না তা—ছুটবো আমি আকুল আবেগ ভরে—
দেখবো তুমি দাও কি না দাও আসতে তোমার ঘরে॥

এমিয়েলের জার্নাল।

(শ্রীহিমাংশুপ্রকাশ রায় কর্ত্তৃক অনূদিত)

কোন অতলস্পর্শ গহ্বর মস্তিষ্কপ্রদেশে ঘূর্ণনের সৃষ্টি করিয়া আমাদিগকে যেরূপ তদভ্যন্তরাভিমুখে আকর্ষণ করে, তদ্রূপ প্রত্যেক অহিতকর রিপুর দ্বারাই আমরা তৎপ্রতি সবলে আকৃষ্ট হইয়া থাকি। চিত্তের দুর্ব্বলতাই মস্তিষ্কের দুর্ব্বলতার কারণ; এবং রুদ্র রিপু গহ্বর ইহার স্বাভাবিক ভীষণতা সত্ত্বেও পরম আশ্রয়স্বরূপে আমাদি-গকে তৎপ্রতি প্রলুব্ধ করে। মনুষ্যের কি ভয়ঙ্কর বিপদ-

সম্ভূল অবস্থাই না—কেন না, আমাদিগের হৃদয়মধ্যেই এই অনতিক্রমণীয় গহ্বর বিদ্যমান। এই সর্বগ্রাসী গহ্বর আমাদিগের সুগভীর প্রদেশে বিরাজিত রহিয়া নারকীয় বিষধর সর্পের ন্যায় সুবিপুল করাল মুখ ব্যাদান-পূর্ব্বক আমাদিগকে গ্রাস করিবার উপক্রম করিতেছে। আমাদিগের আত্মশক্তির স্বাধীনতা এই গহ্বরের উপরি-ভাগে ভাসমান থাকায় এই করাল গহ্বর উহাকে গ্রাস করিয়া অতলতলে লইয়া যাইবার জন্য সর্ব্বক্ষণ সচেষ্ট রহিয়াছে। বিবেক নামক আমাদের কেন্দ্রীভূত আন্তরিক শক্তিনিচয়ের সংহিই আমাদিগের একমাত্র রক্ষা-কবচ। এই বিবেকের অগ্নিশিখা ক্ষুদ্র হইলেও অনির্ব্বাপ্য; ইহারই জ্যোতি কর্ত্তব্য, ইহারই উত্তাপ প্রেম। এই ক্ষুদ্র অগ্নিশিখাই আমাদের জীবনের ধ্রুব নক্ষত্র। ক্ষুব্ধ উত্তাল সমুদ্রতরঙ্গে আন্দোলিত জীবনতরণীর ইহাই একমাত্র কর্ণধার। সংসারসমুদ্রের মহা প্রবল শক্তি ও অজ্ঞানান্ধকার সম্ভূত কলুষ কুম্ভীর-হাঙ্গর-মকরাদি জলজন্তুর এবং ঝঞ্ঝা-ঝটিকা প্রভৃতির আক্রমণ হইতে রক্ষা করিতে এই বিবেক-বহ্নিশিখাই কেবল মাত্র সক্ষম। পবিত্র কারুণিক পরম পিতা যিনি, তাঁহারই উপর যে অটল বিশ্বাস, সেই বিশ্বাসই স্বর্গীয় নিষ্কলঙ্ক শুভ্র জ্যোতি-রশ্মি। সেই জ্যোতি হইতেই এই বিবেকাগ্নি প্রজ্বলিত।

ভয়চকিত আদিম জাতিসমূহের মধ্যে যে প্রগাঢ় ও ভীতিপূর্ণ কম্প বর্ত্তমান তাহা কত গভীর ভাবেই না আমার চিত্তকে অধীর করে। সেই আদিম সন্ত্রাসরাশি হইতেই জগতের বিভিন্ন জাতির ভিন্ন ভিন্ন সৃষ্টিতত্ত্ব ও দেবশাস্ত্রের উদ্ভব। আমি আমার দ্বন্দ্বহীন চিত্তে পূর্ণরূপে অনুভব করিতেছি যে, বিভিন্ন ধর্ম্ম-ইতিহাস এক অপরিবর্ত্তনীয় ভূমা চিন্তারই নিদর্শন—ব্রহ্মাণ্ডের মূলে বিশ্বপতি-বিষয়ক চিন্তা। আমার অন্তরের গভীরতম অনুভূতির মধ্যে সকল সৃষ্টিতত্ত্বের মহা অনৈক্যের মধ্যে এক অত্যাশ্চর্য্য বিরাট ঐক্য বর্ত্তমান। সর্ব্বলোকে সর্ব্বকালে সর্ব্বস্থানে প্রত্যেক সৃষ্ট পদার্থ যে মহান উদ্দেশ্য জ্ঞাপন করে, অনন্ত সঙ্গীতের সুরসংযোগে যে ঐক্যতান সঙ্গীত রচনা করে, আমি এই নিখিলব্যাপী অনৈক্যের মধ্য দিয়া সেই ঐক্যতানই শ্রবণ করি। পাতাল-তলের নরকপুরীর অন্ধকারের বিভিন্ন স্তরগুলিকে অতিক্রম করিয়া আমি যেন ঊর্দ্ধে শুভ্র জ্যোতির্লোকে আরোহণ করিতেছি। ভীষণ নরক উত্তীর্ণ হইয়া স্বর্গপ্রাপ্তিতেই আমার গতির পরিসমাপ্তি। প্রেতলোক, মর্ত্তালোক, স্বর্গলোক—এই ত্রিলোকই আমাদের অভ্যন্তরে। মনুষ্যই সেই প্রকাণ্ড ত্রিলোকব্যাপী গভীর গহ্বর।

জিনেভা—২৩শে মে, ১৮৫১।

অ্যালপস্ পর্ব্বতে উপস্থিত হইলে আমি শিশুত্ব প্রাপ্ত হই—শিশুসুলভচপলতা ও নবীনতা আমার চিত্তে উদয় হয়। বয়সের গুরুভার, কর্ম্মক্ষেত্রের বিধি-ব্যবস্থা, জীবনের ক্লেশকর ও পরিহাসযোগ্য সতর্কতা দূরে পরিহার-পূর্ব্বক আমি পরমানন্দের পূর্ণ জোয়ার স্রোতে ঝম্প প্রদান করি; এবং ভবিষ্যৎ চিন্তারহিত হইয়া উপস্থিত আমোদ-ক্রীড়ায় মত্ত হই। চিন্তাশূন্য লঘুচিত্ততার মধ্যে আমার দৈনিক শৃঙ্খলাবদ্ধ অভ্যস্ত কর্ম্মাবলী আমি এরূপ আশ্চর্য্য ভাবে বিস্মৃত হই যে, আমি যে একজন নগরের কর্ম্মী অথবা অধ্যাপক অথবা পণ্ডিত এ সমস্ত কিছুই অনুভব করিতে পারি না—আমার অতীত আমার নিকট স্বপ্ন বলিয়া প্রতীত হয়। এ যেন বিস্মৃতি-সাগরে অবগাহন।

যখন আমি প্রত্যক্ষ করি যে কত অনায়াসে আমি আমার অতীত জীবন বিস্মৃত হইয়া সদ্যজাত নির্ম্মলচিত্ত শিশুর অবস্থায় উপনীত হই, তখন মনে হয় যে অতি সামান্য অসুস্থতা আমার ক্ষণভঙ্গুর স্মৃতিশক্তিকে বিনষ্ট করিয়া আমার অতীত সত্তার বিলোপ করিতে পারে। জীবন এমনই আমার নিকট স্বপ্নতুল্য প্রতীত হয় যে, আমি মুমূর্ষু ব্যক্তির অবস্থায় আপনাকে অতি সহজেই স্থাপন করিতে পারি, যে মুমূর্ষু ব্যক্তির নেত্রসম্মুখে দৃশ্যমান জগত এবং বস্তুনিচয়ের বিনষ্টাদ ধীরে ধীরে নাস্তিতে লোপ পায়। তরল পদার্থের ন্যায়, বাষ্পের ন্যায়, মেঘের ন্যায় আমি বিভিন্নরূপী—আমি কেবলই রূপ হইতে রূপান্তরে অতি সহজেই গমনাগমন করিয়া থাকি। সমুদ্র-তরঙ্গের উত্থান-পতনের ন্যায় আমার চিত্ত মধ্যে কত কি ভাবলহরীর উদয় ও বিলীন হয়। যখন আমি বলি কেবলই রূপান্তরিত হইতেছি, সেই রূপান্তর আমার জীবনের যাহা কিছু উপরিভাগে রহিয়াছে তাহারই রূপান্তর—ভিতরের অন্য আমির নহে। কারণ আমি অনুভব করি আমার আত্মার যাহা কিছু—আমার গভীরতম প্রেম, আমার অনন্ত উন্নতির আশা, এ সমুদায় কোন রূপের ঘূর্ণীপাকের মধ্যে গিয়া বিপর্য্যস্ত হইয়া পড়ে না। সীমাবদ্ধ পদার্থই কেবল মরণশীল এবং তাহারাই রূপান্তরিত হয়। মৃত্যুশয্যায় মানবমাত্রই ইহা অন্তরের অন্তরে অনুভব করিয়া থাকেন। আমি সারা জীবন ধরিয়া ইহা অনুভব করিয়া আসিতেছি; এবং এই নিরবচ্ছিন্ন অনুভূতিতেই অন্যান্য ব্যক্তির সঙ্গে আমার পার্থক্য। প্রেম ব্যতীত, চিন্তা ব্যতীত, স্বাধীনতা ব্যতীত প্রায় অন্য সমস্ত বস্তু সম্বন্ধেই আমি উদাসীন; এবং যে সমুদায় পদার্থ অধিকাংশ লোকের মনকে সবলে আকৃষ্ট করে, আমার চিত্তে তাহারা কেবলমাত্র কৌতূহলের উদ্রেক করে। ইহার তাৎপর্য্য কি?—ইহা কি আমার নির্লিপ্ততা বা আসক্তি-হীনতা বা দুর্ব্বলতা বা প্রাজ্ঞতা?

জিনেভা—জুলাই, ১৮৬৪।

সর্ব্বনাশের বিরুদ্ধে সংগ্রাম।

(শ্রীক্ষেমেন্দ্রনাথ ঠাকুর বি. এস্-সি)

১। দেশের হাওয়া।

আমরা দেখিয়া আনন্দিত হইলাম যে গত বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠ মাসে প্রকাশিত "রঙ্গালয় ও দেশোন্নতি"-শীর্ষক প্রবন্ধে আমরা বঙ্গীয়সমাজের আসন্ন সর্ব্বনাশের সোপান নৃত্যের বিরুদ্ধে দেশের চিন্তাশীল মনীষিগণের ও বাংলার যুবকগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিবার যে চেষ্টা করিয়াছি তাহা ব্যর্থ হয় নাই। সঞ্জীবনী তো ইহার প্রতিরোধের জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিতেছেন। সম্প্রতি তত্ত্বকৌমুদীর সুপ্রবীণ সম্পাদক মহাশয়ও এই বিপদের গুরুত্ব বুঝিয়া উক্ত প্রবন্ধটী উদ্ধৃত করিয়া আমাদিগকে উৎসাহিত করায় আমাদের কর্ত্তব্যভার অনেকটা লঘু হইয়া পড়িয়াছে সন্দেহ নাই। ঢাকা হইতে প্রকাশিত ঢাকাপ্রকাশের সুযোগ্য সম্পাদক মহাশয়ও সম্প্রতি ধর্ম্মের আবরণে অনুষ্ঠিত এইরূপ নৃত্য-আয়োজনের সুতীব্র প্রতিবাদ করিয়া সমগ্র দেশহিতৈষী ব্যক্তির ধন্যবাদের পাত্র হইয়াছেন। বরিশালের পটুয়াখালিতে স্থানীয় শিক্ষিত ব্যক্তিগণের ও ছাত্রবৃন্দের বিশেষ আপত্তির ফলে ধর্ম্মের ছদ্মবেশে নৃত্য-আয়োজনের চেষ্টা বিফল হয়। ইহাঁদের সৎসাহস বিশেষরূপে প্রশংসনীয়। আশা করি অন্যান্য স্থানের শিক্ষিত যুবকসম্প্রদায়ও ইহাঁদের সৎপ্রচেষ্টার অনুকরণ করিবেন।

এই সকল দেখিয়া স্পষ্টই বোঝা যায় যে, দেশের হাওয়া কোন্ দিকে বহিতেছে। স্পষ্ট বোঝা যায় যে, কতকগুলি তথাকথিত নেতা দুর্নীতির পঙ্কিল পথ নৃত্যাদিকে উন্নতির পথ বলিয়া সহস্র চীৎকার করিলেও বাংলাদেশ তাহা স্বীকার করে না। এই মুষ্টিমেয় নেতৃগণের কলকোলাহলে সুনীতির সুগম্ভীর স্বর কিয়ৎকালের জন্য ডুবিয়া যাইলেও তাহা থামিয়া যায় নাই। এবং আমরা বেশ অনুভব করিতেছি যে দুর্নীতির কোলাহলকে স্তব্ধ করিয়া পুনরায় সেই স্বর উচ্চ হইতে উচ্চগ্রামে উঠিতেছে। যে সকল সম্পাদক ও যুবকবৃন্দ এখনও দেশের এই সুমঙ্গল ধ্বনিতে যোগ দান করেন নাই, তাঁহাদিগকে আমাদের সানুনয় অনুরোধ এই যে, দেশকে ধ্বংস হইতে রক্ষা করিবার জন্যই তাঁহারা অবিলম্বে ইহাতে যোগদান করুন। দেশ নীরবে তাঁহাদের মুখের দিকে দেখিতেছে। যে পাপের ফলে প্রাচীন গ্রীস, রোম আদি ইতিহাসপ্রসিদ্ধ সুবিখ্যাত রাজ্যসমূহ ধরাপৃষ্ঠ হইতে মুছিয়া গিয়াছে, আমাদের প্রিয় জন্মভূমিকে বাঁচাইবার জন্যই অবিলম্বে সেই পাপের বিরুদ্ধে সংবাদপত্রে, সভায়, সমিতিতে—এক কথায় সর্ব্বত্রই সংগ্রামে অবতীর্ণ হউন। এই মুহূর্ত্ত হইতেই সকল সংবাদপত্রের সম্পাদকগণ স্বীয় পাঠকদিগকে এই বিপদের বিষয়ে বিশেষরূপে সাবধান করিয়া দিন, ইহার ভীষণ পরিণাম বুঝাইয়া দিন। গ্রাহকহানির ভয়ে অথবা মুষ্টিমেয় লোকের অপ্রিয় হইবার ভয়ে দেশের সর্ব্বনাশকে প্রশ্রয় দিলে, যে জন্মভূমি স্বর্গ হইতেও গরীয়সী তাঁহার প্রতি কৃতঘ্নতাই প্রকাশ পাইবে।

২। রঙ্গালয় ও অন্নসমস্যা।

অনেকে আমাদের নিকট অনুযোগ করিয়াছেন যে "রঙ্গালয় ও দেশোন্নতি" প্রবন্ধে আমরা রঙ্গালয় যে দেশের অন্নসমস্যার সমাধান করে সে দিকটা লক্ষ্য করি নাই। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে আমরা বিশ্বাস করি না যে রঙ্গালয় দেশের অন্নসমস্যার কিঞ্চিন্মাত্রও সমাধান করে এবং সেই জন্যই আমরা ঐ বিষয়ে নীরব ছিলাম।

রঙ্গালয় কি সত্যই দেশের অন্নসমস্যার সমাধান করে, না, ঐ সমস্যা আরও বৃদ্ধি করে? ইহা সত্য যে, রঙ্গালয়ের ফলে দুইচারজনের—যথা অধিকারী, গ্রন্থকর্ত্তা, অভিনেতৃবর্গ প্রভৃতির—অন্নসমস্যার কিঞ্চিৎ সমাধান হয়; কিন্তু ইহাও কি ঠিক্ নহে যে, সেই সঙ্গেই আরও সহস্র সহস্র দেশবাসীর—যাহারা দর্শকরূপে উপস্থিত থাকে তাহাদের অন্নসমস্যা বৃদ্ধিই পায়? বাংলা রঙ্গালয়ের দর্শকগণের সাংসারিক অবস্থার অনুসন্ধান করিলে অধিকাংশ স্থলেই কি দেখা যায় না যে, তাহারা হয় পঁচিশ টাকার কেরাণী বাবু অথবা অধ্যয়নার্থী ছাত্র? সেই ছাত্রের পিতা হয় তো প্রাণপণ করিয়া পুত্রের ব্যয় নির্ব্বাহ করিতেছেন—এদিকে কিন্তু পুত্ররত্ন হয় তো নিয়মিত রঙ্গালয় গমনাদির দ্বারা পিতার কষ্টোপার্জ্জিত সেই অর্থের সদ্ব্যয় করিতেছে! যদি সহস্র দেশবাসীর হাহাকার সত্বেও দুই চারি জনের ধনবৃদ্ধিকেই দেশের অন্নসমস্যার সমাধান বলা যায় তাহা হইলে অবশ্যই মানিতে হইবে যে রঙ্গালয় অন্নসমস্যার সমাধান করে। ধনবৃদ্ধিই বা হয় কি প্রকারে? রঙ্গালয়ের দ্বারা বাহির হইতে কোন টাকা ঘরে আসিতেছে না; দেশবাসীর একজনের টাকা অপর জনে প্রকারান্তরে লুণ্ঠন করিয়া লইতেছে মাত্র। রঙ্গালয়ের দ্বারা দেশের অন্নসমস্যার সমাধান হয় বলিলে ইহাও স্বীকার করিতে হইবে যে, মদ্যাদি নেশার দ্রব্য বিক্রয় রঙ্গালয় অপেক্ষাও শীঘ্র অন্নসমস্যার সমাধান করিতে পারে, কারণ মদ্যবিক্রয়ের ফলে মাতাল যদিও দিন দিন দরিদ্র হইয়া পড়ে কিন্তু মদ্যবিক্রেতা তো ক্রমশই ধনী হইতে আরও ধনী হইতে থাকে। ইহাতেই বেশ বোঝা যায় যে রঙ্গালয়ের সমর্থকগণের এই যুক্তিটি কিরূপ সারগর্ভ!! শুধু তাহাই নহে—আমাদের বিশ্বাস

যে, সাধারণত রঙ্গালয়ের অধিকারীর যেরূপ ব্যবসায়-বুদ্ধি দেখা যায়—সেরূপ সংগঠনী শক্তি দেখা যায়, তাহাতে তিনি ইচ্ছা করিলে দেশের হিতকর অন্য যে কোন ব্যবসায়েই সফল হইতে পারিতেন। ফলে তাঁহার নিজের অন্নসমস্যা সমাধানের সঙ্গে সঙ্গেই দেশেরও অশেষ মঙ্গল হইতে পারিত। তাহা না করায় তিনি স্বীয় প্রতিভার অপব্যয় ও দেশের বিশেষ অনিষ্ট করিতেছেন বলা যাইতে পারে বোধ হয়। তদ্রূপ, যে সকল প্রতিভাশালী অভিনেতৃবর্গ রঙ্গালয়ে আপনার প্রতিভার অপব্যয় করেন—তাঁহারা যেরূপ যত্নের সহিত অভিনয়-বিদ্যা শিক্ষা করেন, সেইরূপ যত্নের সহিত অন্য যে কোন বিদ্যা শিক্ষা করিলে নিশ্চয়ই স্বদেশের জ্ঞানভাণ্ডার কিয়ৎপরিমাণেও বিস্তৃত করিতে পারিতেন এবং তাঁহারা অনুরূপ চেষ্টা ও পরিশ্রম করিলে, প্রতিভার সদ্ব্যয় করিলে নিশ্চয়ই দেশের মঙ্গলজনক অন্য উপায়েও অর্থ উপার্জ্জন করিতে পারিতেন।

৩। রঙ্গালয় ও বিপথগামিনীগণের উন্নয়ন।

অনেকে ইহাও বলেন যে রঙ্গালয় স্থাপন বিপথ-গামিনীগণের উন্নতিসাধনের উপায়—বিপথগামিনীগণের উন্নয়ন কি ভাল কাজ নহে?

বিপথগামিনীগণের উন্নয়ন ভালকাজগুলির অন্যতম, সন্দেহ নাই। কিন্তু রঙ্গালয় স্থাপনের ফলে কি সত্যই বিপথগামিনীগণের উন্নতি হইয়াছে? উন্নতির লক্ষণ কি? যদি দেখি পথভ্রষ্টাগণ পাপকার্য্য পরিত্যাগ করিয়া দেশের হিতকর কার্য্যে আত্মনিয়োগ করিতেছে, তাহা হইলে তাহাদের উন্নতি হইতেছে স্বীকার করিতেই হইবে, কিন্তু যদি দেখি যে, পাপকার্য্য পরিত্যাগ না করিয়াই বিপথ-গামিনীগণ দেশের হিতকর কার্য্যে যোগদান করিতেছে, তাহা হইলে প্রশ্ন আসে যে, দেশের হিত করাই তাহাদের প্রকৃত উদ্দেশ্য অথবা স্বীয় উপার্জ্জনের পন্থা বিস্তার করাই স্বীয় উদ্দেশ্য? কারণ যাহার এরূপ সামান্য মনের বল নাই যে, দেশের ধ্বংসের কারণ যে পাপ তাহা পরিত্যাগ করে, সে যে দেশের হিতকর কার্য্যে আত্ম-নিয়োগ করিবার উপযোগী মনের শক্তি সংগ্রহ করিতে পারিবে তাহা বিশ্বাস হয় না। সুতরাং স্বভাবতই সন্দেহ হয় যে, দেশের হিত করা বাহ্য উদ্দেশ্য হইলেও হয় তো উহার অভ্যন্তরে অন্য গূঢ় উদ্দেশ্য লুকাইয়া আছে।

যাঁহারা বলেন রঙ্গালয় স্থাপনের ফলে পথবিচ্যুতাগণ ভদ্রসমাজের সহিত মিশিবার কারণে উন্নতি করিবার সুযোগ পায় তাঁহারা ভ্রান্ত। প্রথমতঃ ভদ্রসমাজ সময়ে সময়ে অভিনয় দেখিলেও অভিনেত্রীগণকে সাধারণতঃ ঘৃণার চক্ষেই দেখিয়া থাকেন। ইহা ন্যায় কি অন্যায়, সে বিচার আমরা করিতেছি না—কিন্তু যাহা ঘটিয়া থাকে আমরা তাহাই বলিতেছি মাত্র। আর যাঁহারা অভি-নেত্রীগণকে "জাতে উঠাইবার" জন্য উদারভাবে মেলা-মেশা করিতে থাকেন, সেরূপ স্থলে দুই একটি ভিন্ন সকল ক্ষেত্রে প্রায়ই অভিনেত্রীগণের উন্নতির পরিবর্ত্তে সেই সকল উদারভাবভাবীগণেরই পতন হইতে দেখা যায়।

যদি পথভ্রষ্টাগণকে উন্নতির পথে উঠানই প্রকৃত উদ্দেশ্য হয়, তবে কি রঙ্গালয়ের ন্যায় পিচ্ছিল পথ—যে পথে প্রতি পদে পদস্খলনের সম্ভাবনা—সে পথ ভিন্ন কি অন্য পথ নাই? যে অর্থে সুবৃহৎ রঙ্গালয় স্থাপন করা হয় সেই অর্থেই তাহাদের জীবিকানির্ব্বাহের জন্য ও জ্ঞান শিক্ষার জন্য বিবিধ জ্ঞানকরী ও কার্য্যকরী বিদ্যার বিদ্যা-লয় স্থাপন করা হউক না কেন? যে সকল "উদার"মনা রঙ্গমঞ্চে ইহাদের সহিত মিশিতে কুণ্ঠাবোধ করেন না, তাঁহারাই এই সকল বিদ্যালয় পরিচালনা করুন না কেন? তাহা না করিয়া, তাহাদিগকে ভদ্রসমাজ মধ্যে লালসার ইন্ধন যোগাইবার সুযোগ দিলেই কি তাহাদের উন্নতি সাধনের ব্যবস্থা করা হইল বলিতে হইবে? ইহাতে তাহাদের উন্নতি যত না হউক, ভদ্রসমাজের যে পতনের সম্ভাবনা আছে তাহাতে সন্দেহ নাই।

ঢাকায় ব্রাহ্মবিবাহ।

গত ২৮শে শ্রাবণ ঢাকানগরে আদিব্রাহ্মসমাজের প্রচারিত মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ-প্রবর্ত্তিত একেশ্বরবাদসম্মত হিন্দুপদ্ধতি অনুসারে একটী বিবাহ সুসম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। বহুকাল পরে ঢাকায় এপ্রকার বিবাহ আবার এই হইল এবং পাত্র ও পাত্রী, উভয় পক্ষই সম্ভ্রান্তবংশীয় বলিয়া আমরা এই বিবাহ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য মনে করি।

রাজা রামমোহন রায় এবং মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ, উভয়েরই এই অভিপ্রায় ছিল যে, হিন্দুধর্ম্ম ও হিন্দু-সমাজের সঙ্গে সম্বন্ধ অবিচ্ছিন্ন রাখিয়া একেশ্বরবাদমূলক ধর্ম্ম এবং তৎসম্পৃক্ত অনুষ্ঠান প্রচার করেন। বেদ-উপনিষদের সাধনতত্ত্বকে তাঁহারা উভয়েই নিজ নিজ জীবনে ফুটাইয়া তুলিয়া হিন্দুসমাজের সম্মুখে উপস্থিত করিয়াছিলেন। এবিষয়ে তাঁহাদের মনোগত ভাব মহর্ষি-দেব তাঁহার একটী বক্তৃতায় সুন্দর ব্যক্ত করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন—"হিন্দুপ্রথা, হিন্দুরীতি, ব্রাহ্মধর্ম্মের দ্বারা পরিশুদ্ধ করিতে হইবে। হিন্দুসমাজের মধ্যে অবিচ্ছিন্ন থাকিয়া যাহাতে হিন্দুরীতিনীতি ব্রাহ্মধর্ম্মের অনুযায়ী হয়, তাহার চেষ্টা করিতে হইবে। * * * ব্রাহ্মেরা যে ব্রাহ্মধর্ম্মকে আপনাদের শিরোভূষণ করিয়া পবিত্র হইয়াছেন, তাহা সকল হিন্দুসমাজে ওতপ্রোত করিয়া তাহার অশেষ কল্যাণসাধনে প্রাণপণে যত্ন করুন।

মহাত্মা রামমোহন রায় কি অভিপ্রায়ে এই ভারতবর্ষে এই ব্রাহ্মসমাজ সংস্থাপন করেন? এই ব্রাহ্মধর্ম্ম হিন্দুদিগের মধ্যে প্রচার করিবার জন্য, কি চীনদিগের জন্য? একমেবাদ্বিতীয়ং ঈশ্বরের উপাসনা যাহাতে হিন্দুসমাজে প্রচারিত হয়, তিনি এই উদ্দেশ্যে এই ব্রাহ্মসমাজ স্থাপন করিলেন এবং বিদ্যাবাগীশ ও ন্যায়রত্ন মহাশয়দিগকে আচার্য্যের কর্ম্মে নিয়োগ করিলেন।" প্রকৃতই, কোন সমাজকে বৃথা চূর্ণবিচূর্ণ না করিয়া নূতনভাবে গড়িয়া তোলাই ধর্ম্মসম্বন্ধীয় উদারতার অন্যতর পরিচয়। ধর্ম্মের বহির্বিকাশ হয় ধর্ম্মসংপৃক্ত অনুষ্ঠানে। সুতরাং সামাজিক অনুষ্ঠানগুলিকেও সেই ভাবে সংগঠিত করিলেই ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় উদারতার প্রকৃত মর্য্যাদা রক্ষিত হয়। এই মূলমন্ত্রকে ভিত্তি করিয়াই বেদ-উপনিষদাদি শাস্ত্রগ্রন্থ হইতেই ব্রাহ্মধর্ম্মপ্রচারক গ্রন্থ এবং শাস্ত্রবিহিত বিধি অনুসরণ করিয়াই একেশ্বরবাদসম্মত আকারে সামাজিক অনুষ্ঠানগুলি সম্বদ্ধ হইয়াছে। আদিব্রাহ্মসমাজ যে ভাবে ব্রাহ্মধর্ম্ম ও তদবলম্বিত অনুষ্ঠান প্রচার করিতে চাহেন, তাহা যে ধীরে ধীরে হিন্দুসাধারণের হৃদয় আকর্ষণ করিতেছে, আজ কয়েক বৎসর ধরিয়া আমরা তাহার পরিচয় পাইতেছি। আমরা শুনিতে পাই, এখন নানা কারণে ব্রাহ্মদিগের মধ্যে অনেকে রেজেষ্ট্রী করিয়া আইনগত বিবাহ করিতে প্রস্তুত নন। এই কারণে আজ কয়েক বৎসরের মধ্যে অনেকে আদিসমাজের হিন্দুপদ্ধতি অনুসারে বিবাহাদি অনুষ্ঠান করিয়াছেন।

গত ২৮শে শ্রাবণ ঢাকায় এই প্রকার একটী বিবাহ হইয়া গিয়াছে। এই বিবাহের পাত্র শ্রীমান সুধীরচন্দ্র ঘোষ সৌকালীন-গোত্রীয় এবং ঢাকার "পূর্ব্ববঙ্গ ব্রাহ্মসমাজের" সহিত ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ ও তথাকার অনাথ-আশ্রমের প্রতিষ্ঠাতা রায়সাহেব শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের পুত্র ও বিশ্ববিদ্যালয়ের এম-এ উপাধিধারী। পাত্রী শ্রীমতী পদ্মিনী দেবী গোতমগোত্রীয়া এবং কুমিল্লার মুন্সেফ শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রকুমার বসু মহাশয়ের কন্যা। পাত্রী বিশ্ববিদ্যালয়ের বি-এ পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হইতেছেন। ইনি সম্প্রতি সংস্কৃত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া ঢাকা সারস্বত সমাজ হইতে "সরস্বতী" উপাধি লাভ করিয়াছেন। ইনি সঙ্গীতেও সুশিক্ষিত হইয়াছেন।

সতীশ বাবুর জ্যেষ্ঠ জামাতা, সুবিখ্যাত ইঙ্গ-বঙ্গ অভিধানপ্রণেতা কৃতীপুরুষ শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র গুহ মহাশয়েরই মধ্যবর্ত্তিতায় এই বিবাহ সংঘটিত হইল। বর ও কন্যা, উভয় পক্ষ হইতেই আদি ব্রাহ্মসমাজের আচার্য্য শ্রীযুক্ত ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের নিকট আহ্বান আসিল। উপাচার্য্য শ্রীযুক্ত চিন্তামণি চট্টোপাধ্যায় এবং পণ্ডিতপ্রবর শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র সাংখ্য-বেদান্ততীর্থ মহাশয় ক্ষিতীন্দ্র বাবুর সহচর হইয়া ঢাকায় গিয়াছিলেন। ক্ষিতীন্দ্র বাবু আচার্য্যের কার্য্য এবং বেদান্ততীর্থ মহাশয় পৌরোহিত্য করিয়াছিলেন।

পাত্রীর পিতা বিক্রমপুরনিবাসী রক্ষণশীল হিন্দু। তাঁহার মহা চিন্তা হইয়াছিল যে, আদিসমাজের পদ্ধতি অনুসারে বিবাহ হইলে তাঁহার রক্ষণশীল বন্ধুবান্ধব আত্মীয়স্বজন বিবাহকে বৈধ বলিয়া স্বীকার করিবেন কি না এবং তাঁহাকে সমাজের মধ্যে গ্রহণ করিবেন কি না। এ বিষয়ে ক্ষিতীন্দ্র বাবুর সহিত কয়েকটী বন্ধু সহ তাঁহার সবিস্তার আলোচনার পর তাঁহারা এই পদ্ধতির বৈধতা ও হিন্দুভাব বুঝিয়া আহ্লাদের সহিত এই পদ্ধতি অনুসারে বিবাহ অনুমোদন করিলেন। এমন কি, যতীন্দ্রবাবুর অশীতিকল্প বৃদ্ধ পিতামাতাও ক্ষিতীন্দ্রবাবুর সহিত আলোচনার পর সানন্দে অনুমোদন করিলেন। পূর্ব্ববঙ্গের বিবাহের একটী বিশেষত্ব এই যে, বিবাহসভায় আসিয়া বরের চতুর্দ্দিকে "সাত পাক" ঘুরিতে হয়। যতীনবাবু ও তাঁহার বন্ধুবর্গ আলোচনার সময় আদিসমাজের পদ্ধতির গূঢ় মর্ম্ম বুঝিতে না পারিয়া এবিষয়ে আমাদের আপত্তি আছে কি না জিজ্ঞাসা করিলেন। ক্ষিতীন্দ্রবাবু যখন বলিলেন "আপত্তি নাই", তখন দেখা গেল যে, তাঁহাদের প্রাণের ভিতর হইতে একটা গুরুতর পাষাণভার নামিয়া গেল। আদিসমাজের পদ্ধতির গূঢ়মর্ম্ম পূজ্যপাদ ৺দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর এক সাম্বৎসরিক উৎসববক্তৃতায় সুন্দররূপে প্রকাশ করিয়াছেন—"ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রকৃত মন্তব্য কথা এই যে, যে জাতির যেরূপ জাতীয় প্রথা, যে কুলের যেরূপ কৌলিক প্রথা, তাহা সেইরূপই থাকুক; তাহার প্রতি হস্তক্ষেপ করিবার কোন প্রয়োজন নাই; কেবল সেই সকল প্রচলিত অনুষ্ঠানের মধ্য হইতে পরিমিত দেবতাগণের উপাসনা সমূলে উঠিয়া গিয়া তাহার স্থলে বিশুদ্ধ ব্রহ্মোপাসনা অধিরূঢ় হউক, তাহা হইলেই ব্রহ্মোপাসক ভক্তজনগণের বিশুদ্ধ ধর্ম্মব্রত অব্যাহত থাকিবে"। ক্ষিতীন্দ্রবাবু বর ও কন্যা উভয় পক্ষকেই সুন্দররূপে বুঝাইয়া দিলেন যে, হিন্দুবিবাহেরও সকল জাতিরই বিবাহের ন্যায়, দুইটী প্রধান অঙ্গ—সম্প্রদান ও পাণিগ্রহণ। এই দুইটী অঙ্গই যথাযথ মন্ত্রসহ পদ্ধতিতে রক্ষিত হইয়াছে। সপ্তপদীগমন হিন্দুবিবাহের পরিপূরক—তাহাও যথাযথ পদ্ধতিতে রক্ষিত হইয়াছে। এই কারণে, এই বিবাহপদ্ধতি প্রবর্ত্তনের সময়ে কাশী, নবদ্বীপ, ভাটপাড়া প্রভৃতি বিভিন্ন স্থানের পণ্ডিতদিগের অভিমত চাওয়া হইলে তাঁহারা একবাক্যে ইহার বৈধতা স্বীকার করিয়াছেন। তাঁহারা যজ্ঞানুষ্ঠান সম্বন্ধে বলিয়াছেন যে, উহা বিবাহের বৈধতাসাধক নহে, মাত্র মঙ্গলসাধক। এই কারণেই, মোক্ষমূলর, সুপ্রসিদ্ধ ভারতীয়

প্রথম ব্যারিষ্টার জ্ঞানেন্দ্রমোহন ঠাকুর, স্বনামধন্য গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় প্রভৃতি যাঁহারা এই অনুষ্ঠানপদ্ধতির গূঢ় মর্ম্ম আলোচনা করিয়াছেন, তাঁহারাই ইহার বৈধতা ও সুতরাং হিন্দুপ্রাণতা স্বীকার করিয়াছেন।

বর যথাসময়ে কন্যাগৃহে উপস্থিত হইলে, দেশের প্রথা অনুসারে বিবাহ অনুষ্ঠানের পূর্ব্বেই স্ত্রীআচার সম্পন্ন হইয়া গেল এবং বর ও কন্যা বিবাহসভায় আসিয়া দাঁড়াইলেন। দেশের প্রথা অনুসারে বিবাহবেদীতে দণ্ডায়মান বরকে প্রদক্ষিণ করিয়া কন্যা "সাতপাক" ঘুরিলেন। অনন্তর যথাপদ্ধতি বরার্চনার পর ব্রহ্মোপাসনা হইয়া বিবাহকার্য্য সুসম্পন্ন হইল। সমগ্র বিবাহপদ্ধতিটী মুদ্রিত হইয়া বিতরিত হইয়াছিল, তাহাতে উপস্থিত নিমন্ত্রিতদিগের আদিসমাজের পদ্ধতির মর্ম্মগ্রহ করিবার বড়ই সুবিধা হইয়াছিল। তাঁহারা এই অনুষ্ঠানের গাম্ভীর্য্যে ও মাধুর্য্যে মুগ্ধ হইয়া গিয়াছিলেন।

পরদিবস বর ও বধূ বরভবনে উপস্থিত হইলে ক্ষিতীন্দ্র বাবু যথারীতি উদীচ্য কর্ম্ম সমাধা করিলেন।

বিবাহসভায় বিক্রমপুরের অনেকগুলি ব্রাহ্মণপণ্ডিত ও যতীনবাবুর রক্ষণশীল বন্ধুবান্ধব এবং স্থানীয় নববিধান সমাজের ও সাধারণ সমাজের অনেকগুলি সভ্য সমাগত হইয়াছিলেন। বৈদিক মন্ত্রসমূহের উচ্চারণ এবং সেগুলির অর্থ ব্যক্ত করা তাঁহাদের বড়ই মনোগ্রাহী হইয়াছিল। তাঁহাদের অনেকে নিজের গার্হস্থ্য অনুষ্ঠানে এই প্রণালী প্রবর্ত্তন করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন।

উভয় দিনেই অনুষ্ঠান অন্তে প্রীতিভোজের বিশেষ আয়োজন হইয়াছিল। উভয় পক্ষের আদর-আপ্যায়নে কোন প্রকার ত্রুটী ছিল না।

এই বিবাহ উপলক্ষে বরের পিতা রায় সাহেব শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র ঘোষ মহাশয় এবং কন্যার পিতা শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রকুমার বসু আমাদের সম্বন্ধে আদর যত্ন যে প্রকার করিয়াছেন, তাহার জন্য তাঁহাদিগের উভয়কেই আমরা আমাদের আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জানাইতেছি। শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র গুহ মহাশয়কেও আমাদের সর্ব্বদা খোঁজখবর লইবার জন্য বিশেষভাবে কৃতজ্ঞতা জানাইতেছি। আমাদের এই আন্তরিক প্রার্থনা যে, আমাদের বন্ধুবান্ধব ও আত্মীয় স্বজনের সকল অনুষ্ঠানে সর্ব্বাগ্রে ভগবানের আসন সুপ্রতিষ্ঠিত হোক।

সমালোচনা।

ত্রিশূল—সম্পাদক পণ্ডিত শ্রীযুক্ত ভোলানাথ বিদ্যাব্রতী। পরিচালক—পণ্ডিত শ্রীযুক্ত অনন্তদেব তর্কমল্ল। পরিদর্শক—শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য। ২৬৬নং গরুড়েশ্বর, বেদোদ্বোধিনী সভা, বেনারস সিটি হইতে প্রকাশিত মাসিক পত্র। ইহা বর্ত্তমানে সপ্তদশ বর্ষে চলিতেছে। ইহা হইতেই বুঝিতে পারা যাইবে যে এইরূপ মাসিকের প্রয়োজন এখনও আছে। ইহার প্রবন্ধগুলি চিন্তার উপাদান দেয়। বর্ত্তমান সংখ্যায় (শ্রাবণ ১৩৩৩) আমরা ইহার একটী বিশেষত্ব লক্ষ্য করিলাম যে, সহযোগীও এবার কালের গতির সহিত উদারভাবে চলিতে সংকল্প করিয়াছেন। উদাহরণ স্বরূপে বর্ত্তমান সংখ্যার সম্পাদকীয় মন্তব্যগুলির উল্লেখ করা যায়। সকল স্থানে সহযোগীর সহিত আমাদের মতের মিল না থাকিলেও প্রবন্ধগুলি যে সুপাঠ্য তাহাতে সন্দেহ নাই। এই উচ্ছৃঙ্খলতার হুজুগের যুগে এই পত্রের বহুল প্রচার বাঞ্ছনীয়।

শক্তি—বর্দ্ধমান হইতে প্রকাশিত সাপ্তাহিক। সম্পাদক—শ্রীবলাই দেবশর্ম্মা। বার্ষিক মূল্য সডাক ২৲; প্রতি সংখ্যা এক আনা।

আমরা এই নবীন সাপ্তাহিকের দেশনেতৃবর্গের চিত্রশোভিত জন্মাষ্টমী-সংখ্যা দেখিয়া অতিশয় প্রীত হইলাম। এই সংখ্যায় 'শৃঙ্খলমোচন'-শীর্ষক নাট্যপ্রবন্ধ আমরা পাঠকবর্গকে পাঠ করিতে বলি। সম্প্রতি ইহা দ্বিতীয় বর্ষে পদার্পণ করিয়াছে, তদুপলক্ষে আমরা ইহাকে আমাদের সাদর সম্ভাষণ জানাইতেছি। অল্পদিন মাত্র এই সাপ্তাহিকটি প্রকাশিত হইতেছে, কিন্তু তাহা হইলেও ইহার নির্ভীক ভাব প্রথম অবধিই আমাদের বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে। আমরা লক্ষ্য করিয়া আসিতেছি যে, যে কোন অন্যায় বা অত্যাচার—তাহা যত "নামজাদা" বা "বড়" লোকের দ্বারা অনুষ্ঠিত হউক না কেন—যখনই শক্তির দৃষ্টিতে আসিয়াছে, তৎক্ষণাৎ এই পত্রিকা তাহার বিরুদ্ধে সবল প্রতিবাদ করিয়াছে। "নামজাদা" বা "বড়" লোকের ভয় কখনই শক্তিকে আপন কর্ত্তব্য হইতে বিচ্যুত করিতে পারে নাই। বর্ত্তমানে আমাদের দেশে এইরূপ নির্ভীক পত্রিকার বিশেষ প্রয়োজন আছে—যাহা "বড়লোকের" বা "নামজাদা" লোকের ভয়ে সত্য কথা প্রকাশ করিতে ভয় পাইবে না—যাহা ধনীর অঙ্গুলীহেলনে চালিত হইবে না—যাহা দরিদ্রের মর্ম্মবাণী বুঝিবে ও প্রকাশ করিবে। এই আমরা নির্ভীক সহযোগীর দীর্ঘজীবন ও বহুল প্রচার কামনা করি।

(শ্রীক্ষেমেন্দ্রনাথ ঠাকুর)

বিজ্ঞাপনে ও চিত্রে স্বৈরাচার।

(শ্রীনারায়ণ ভারতী)

জাতীয় দৌর্ব্বল্য ও দৈন্য যখন চরমে গিয়া দাঁড়ায় তখন তাহা বিবিধ দুর্নৈতিক মায়ামূর্ত্তি গ্রহণ করিয়া লোকসমক্ষে প্রকট হইতে থাকে। দুঃখ-পীড়িত এবং আত্মবিস্মৃত বাঙ্গালী জাতির দুর্ব্বল মনস্তত্ত্ব যেমন এক শ্রেণীর উপন্যাস ও কাব্যনাটকাদির মধ্য দিয়া আপাতরম্য স্বপ্ন মূর্ত্তিতে দীপ্যমান হইতেছে; তেমনি 'আর্টের' পতাকাবাহী এক শ্রেণীর মাসিকপত্র-ব্যবসায়ী স্ব স্ব পত্রিকার প্রচারাধিক্য লক্ষ্য বশতঃ রিরংসা-সন্দীপক চিত্র ছাপাইয়া জনসাধারণের মনে অসং আকাঙ্ক্ষার অগ্নিদাহ সৃষ্টিপূর্ব্বক জাতীয় প্রকৃতিতে দার্ব্বল্যের বিষবাষ্প সঞ্চার দ্বারা আর এক অভিনব উপায়ে জাতিকে বিনাশের পুষ্পিত পথে আকর্ষণ করিতেছেন। কলিকাতার দুই-একখানি মাসিকপত্রের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে সহজেই বুঝিতে পারা যায় যে বাঙ্গালীজাতি স্বেচ্ছায় ধ্বংসের পথে নামিয়া চলিয়াছে। বর্ত্তমান যুগের ঐ সাময়িক পত্রিকাগুলির সহিত বঙ্কিম-যুগের "সাধারণী" "বঙ্গদর্শন" ও "বান্ধব" প্রভৃতির তারতম্য বিচার করিলে প্রতীয়মান হয় যে, সেই যুগের সাময়িকগুলি চাহিয়াছিল, স্বজাতিকে সত্য ও শক্তির দীক্ষা দিতে; আর, আধুনিক দুই-একখানি ব্যতীত অধিকাংশ সাময়িকেরই যেন উদ্দেশ্য,—স্বজাতিকে দৌর্ব্বল্যের মধুমিশ্রিত বিষ-প্রদানে নির্জ্জীবতার পঙ্ককুণ্ডে নিমজ্জিত করিয়া রাখা! বিশেষতঃ কলিকাতার কয়েকখানি মাসিকপত্রের তো একমাত্র ব্রতই হইয়া উঠিয়াছে,—লোচন-সংরোচক নারী-চিত্রের দ্বারা, প্রেম-গুঞ্জনাশ্লিষ্ট গল্পের দ্বারা পাঠকপাঠিকাগণের মনে লালসাবন্যা প্রবহমান করা! ইহারা হয়তো অধিক মাত্রায় সেই আর্টের ভক্ত যাহার মন্ত্র—Art for Art's sake—তাই সেই মূল মন্ত্রানুসারে ইহারা বৈধাবৈধনির্ব্বিশেষে যে কোন পন্থায় আর্ট সৃষ্টি করিয়া লোকের প্রাণে তথাকথিত আনন্দ দিতে উৎসুক!

আবার শুধু গল্প নয়, শুধু চিত্র নয়,—তৎসহ কাম-বৃত্তি-বর্দ্ধক বলিয়া মোদকজাতীয় ঔষধের চিত্রিত কুৎসিত বিজ্ঞাপনও অধিকাংশ সাময়িকের অঙ্গ অলঙ্কৃত করিয়া তাহার পাঠকদিগকে অর্থ ও কীর্ত্তি-নাশার পথে নিত্য-নিয়ত আহ্বান করিতেছে! রতি-রসাত্মক গল্প, রিরংসা-মূলক চারুচিত্র, ও অশ্লীল বিজ্ঞাপন-প্রকাশ যেন আজ-কালকার মাসিকপত্রগুলির অপরিহার্য্য অঙ্গ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। অর্থলাভের আশায় দুর্নীতির অগাধ গহ্বরে যাহারা দেশবাসীকে টানিয়া লইয়া যায় তাহারা যে জাতির কত বড় শত্রু তাহা ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। দেশের এমনি অধঃপতন ঘটিয়াছে যে, "আর্টের" খাতিরে পূর্ব্ববর্ণিত অশ্লীল চিত্র ও গল্পগুজবের পক্ষ সমর্থন করিতে লোকের অভাব হয় না। শুনিলাম, বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিধারী এক ব্যক্তি সেদিন এক সহরের টাউনহলে আর্টের দোহাই দিয়া এক "বাইনাচ" দেওয়াইয়া ছিলেন! ধিক্—ধিক্!

সাময়িক পত্রিকার কথা ছাড়িয়া দিলে আর এক দিকে দৃষ্টিপাত করিলেও স্তম্ভিত হইতে হয়;—উহা নব-বর্ষের পঞ্জিকা। পঞ্জিকাগুলি দেশের খ্যাতনামা পণ্ডিত-বৃন্দের নামের ছাপ লইয়া প্রতিবৎসর বাহির হয় এবং লক্ষ লক্ষ নরনারীর গৃহে নিত্য ব্যবহার্য্যরূপে গৃহীত হইয়া থাকে। দুঃখের কথা কাহাকে বলিব,—উহাতেও ঐ প্রকার বিজ্ঞাপনের ছড়াছড়ি! বিচক্ষণ কবিরাজ মহাশয়েরা স্ব স্ব উপাস্য দেবতার নাম ও মূর্ত্তির সহিত নানাবিধ তৈল প্রভৃতির অশ্লীল নীতিবিগর্হিত বিজ্ঞাপন সংযোগ করিয়া খুব বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিতেছেন কি? হিন্দু ব্যতীত অন্য ধর্ম্মাবলম্বীগণ স্ব স্ব উপাস্য দেবতার মূর্ত্তির সহিত ঐ শ্রেণীর অশ্লীল বিজ্ঞাপন জুড়িয়া ছাপিতে সঙ্কোচ ও পাপ বোধ করেন। উহাতে সত্যই দেবমর্য্যাদা লাঘব হইয়া বালকবালিকাগণের সম্মুখে এক ভয়াবহ নরকদ্বার উদ্ঘাটিত হইতেছে কিনা দেশের সুধী ও মনস্বী ব্যক্তিগণ তাহা বিচার করিয়া দেখিবেন। স্বীকার করি, কবিরাজী চিকিৎসাপুস্তকে হয়তো ঐ জাতীয় এবং ঐ নামীয় ঔষধ থাকিতে পারে;—কিন্তু তাহা কি বিকৃত অশ্লীল চিত্র ও বিজ্ঞাপন সহ ছাপাইয়া সাধারণ্যে এবং বালকবালিকাগণও যাহা সর্ব্বদা নাড়াচাড়া করে সেই পঞ্জিকাতেও প্রচার করা যুক্তিসিদ্ধ? অনেক ধর্ম্ম-ব্যবসায়ীও দুপয়সা লোকসান হইবে বুঝিয়া ঐ শ্রেণীর বিজ্ঞাপন স্বীয় পত্রিকা হইতে দূরীভূত করিতে পারেন না! বিনীতভাবে আমরা প্রস্তাব করিতে চাই, দেবতার নাম দিয়া, দেবতার ছবি দিয়া কোন-রূপ বিজ্ঞাপন, পঞ্জিকায় বা পত্রিকাদিতে যেন মুদ্রিত না হয়। বিজ্ঞাপনদাতা ও বিজ্ঞাপনগ্রহীতা উভয়েরই এ দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে চাহি। বলা বাহুল্য যাঁহারা দেশের ও সমাজের কল্যাণপ্রার্থী, তাঁহাদের নিকট আমাদের এই প্রস্তাবটী অতিশয় অন্যায় বলিয়া মনে হইবে না। বড়ই দুঃখের কথা, কোথায় সাহিত্য বা ধর্ম্মবিষয়ক পত্রের পরিচালকগণ এই শ্রেণীর বিজ্ঞাপনের বিরুদ্ধে দুকথা কঠোরভাবে প্রকাশ করিবেন,—তাহার পরিবর্ত্তে তাঁহারা স্বয়ংই বিজ্ঞাপনদাতাগণের প্রদত্ত অর্থের প্রতি লোভবশতঃ স্বকীয় ধর্ম্ম ও দেশকল্যাণকে জলাঞ্জলি দিতে দুঃখ ও লজ্জাবোধ করেন না। পত্রিকার

মধ্যে উপন্যাসের বিজ্ঞাপনসমন্বিত যে সব কুৎসিৎ চিত্র ছাপা হয় উহাও লজ্জাজনক। সাহিত্য ও পত্রিকা মানুষের নিত্য সহচর। গৌণভাবেও তাহার মধ্য দিয়া দুর্নীতি বিস্তার শুধু যে নিন্দার্হ এবং অশ্রদ্ধের তাহা নয়, উহা কলঙ্কের ও দুর্নামের কথা। পত্রিকাপ্রচারকগণের এই অশ্লীল চিত্রবিস্তার-প্রয়াস তাঁহাদের মেরুদণ্ডস্বরূপ গ্রাহকগণ মনঃসংযোগ করিলে সহজে উপশমিত হইতে পারে। এই জন্য সংবাদপত্রে বারম্বার আলোচনা হইলে এবিষয়ে সুফল দর্শিবার সম্ভাবনা আছে।

ক্যাণ্ডি-ভ্রমণ।

(অধ্যাপক ডাক্তার শ্রীযতীন্দ্রকুমার মজুমদার এম-এ পি-এইচ. ডি)

ক্যাণ্ডি (Kandy) সিংহল-দ্বীপের একটী বিখ্যাত স্থান। ইহা সিংহল-গভর্ণমেণ্টের গ্রীষ্মাবাস। পৃথিবীর নানাস্থান হইতে পর্য্যটকেরা সিংহলে আসিলেই ক্যাণ্ডি সহরটী একবার পরিদর্শন করেন—মনোরম দৃশ্যের জন্যই ইহার এত নাম। অত্যুচ্চ পাহাড়ের উপর ক্যাণ্ডি অবস্থিত। সমুদ্রের সমতল হইতে ইহার উচ্চতা ১৭০২ ফিট্। কলম্বো হইতে ক্যাণ্ডি ৭৪॥ মাইল দূরে, ট্রেণে যাইতে ৪।৪॥ ঘণ্টা লাগে। এই রেলওয়েটি সিংহল-গভর্ণমেণ্টের।

ক্যাণ্ডি-যাত্রীর মধ্যে আমরা তিনজন ভারতবাসী ছিলাম। কলম্বো ফোর্ট ষ্টেশন হইতে আমরা ক্যাণ্ডির ট্রেণে উঠিলাম। যদিও কলম্বো একটী খুব বড় বন্দর, কিন্তু ইহার এই প্রধান রেলওয়ে ষ্টেশনটী তেমন কিছু বড় নয়, বরং ছোটই বলিতে হইবে। ট্রেণে বিশেষ কিছু ভিড় ছিল না, আমরা একটী কামরায় উঠিয়া বেশ আরাম করিয়া বসিলাম। আমাদের কামরাতে আমরা তিনজন ভারতবাসী ও একজন ফরাসী পর্য্যটক ছিলেন। বেলা প্রায় ২॥টার সময় আমাদের ট্রেণ ছাড়িয়া দিল। আমরা কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া এই সুদূর দেশের চারিদিকের দৃশ্য দেখিতে লাগিলাম। দেখিতে পাইলাম চারিদিকেই সমতল ভূমি, আমাদের বাংলা দেশের ন্যায় চারিদিকেই গাছপালার খুব সমাবেশ এবং মাঠে মাঠে চারিদিকেই জল। বর্ষাকালে আমাদের বাংলা দেশের যেরূপ দৃশ্য হয়, ইহাও কতকটা সেইরূপ; সুতরাং জন্মভূমির সহিত এই সাদৃশ্য দেখিয়া আমাদের মনে বিশেষ আনন্দ হইতে লাগিল। চারিদিকের গাছপালাগুলির সতেজ শ্যামল সৌন্দর্য্য দেখিয়া মনে হইতে লাগিল যে, এই দেশের জমি নিশ্চয়ই খুব উর্ব্বরা; এবং বাস্তবিকই তাহাই, কারণ শুনিলাম যে, এমন কি অষ্ট্রেলিয়া হইতে যে সকল পর্য্যটক সিংহলে আসিয়াছিলেন, তাঁহারাও নাকি একবাক্যে স্বীকার করিয়া গিয়াছেন যে সিংহলের জমি অষ্ট্রেলিয়ার জমি অপেক্ষাও অধিক উর্ব্বরা। কিন্তু একটী জিনিস যাহা আমাদের বাংলা দেশে চারিদিকেই দেখিতে পাওয়া যায়, অর্থাৎ ধানের ক্ষেত, তাহা তো কোথাও দৃষ্টিগোচর হইল না; বোধ হয় এখানে ধানের চাষ অধিক হয় না।

আমাদের ট্রেণ দ্রুতবেগে ছুটিতে লাগিল, আর আমরাও চারিদিকের শ্যামল সরস দৃশ্য দেখিয়া নয়ন-মন তৃপ্ত করিতে লাগিলাম। অনেক দূর আসার পরও যখন কোনও পাহাড় আমাদের নয়নপথে পড়িল না, তখন মনে একটু হতাশার উদয় হইতে লাগিল; মনে হইতে লাগিল যে, আমরা যে শুনিয়াছিলাম ক্যাণ্ডি সহরটী খুব উচ্চ পাহাড়ের উপর অবস্থিত সে কথা কি তাহা হইলে সত্য নয়? মনে এইরূপ আন্দোলন হইতেছে এমন সময় আমাদের ট্রেণ একটী বড় ষ্টেশনে আসিয়া অনেকক্ষণ থামিয়া রহিল। ইহার কারণ আমরা বুঝিতে না পারিয়া জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম যে, আমরা ক্যাণ্ডির মাঝপথে আসিয়াছি এবং এই স্থান হইতে পাহাড়ের উচ্চ পথ আরম্ভ হইবে বলিয়া আর একখানি এঞ্জিন গাড়ীর পিছনে যুড়িয়া চলিবে, সেই জন্য একটু দেরী হইতেছে। এই কথা জানিয়া আমাদের মনে বড় আনন্দ হইল, ভাবিলাম—যাক, আমাদের মনোবাঞ্ছা বোধ হয় এইবার পূর্ণ হইবে। অল্পক্ষণের মধ্যেই ট্রেণ ছাড়িয়া দিল এবং আমরা বুঝিতে পারিলাম যে পাহাড়ের উচ্চ পথ আরম্ভ হইয়াছে, কারণ ট্রেণটা বেশ আস্তে আস্তে চলিতেছে। আমরা মহা কৌতূহলপরবশ হইয়া বাহিরের দিকে তাকাইয়া রহিলাম। অল্পক্ষণের ভিতরেই বড় বড় পাহাড় আমাদের নয়নপথে পড়িতে লাগিল এবং আমাদের ট্রেণ এই সব পাহাড়পথের ভিতর দিয়া আঁকিয়া বাঁকিয়া ধীরে ধীরে উঠিতে লাগিল।

ট্রেণ ক্রমেই যত পাহাড়ের উপর উঠিতে লাগিল ততই চারিদিকের মনোরম দৃশ্য আমাদের নয়নগোচর হইতে লাগিল; কিন্তু একটা দুর্ভাগ্যের বিষয় এই ছিল যে চারিদিকেই খুব বৃষ্টিপাত হওয়াতে ও রৌদ্রের চিহ্নমাত্র না থাকাতে প্রকৃতির এমন সৌন্দর্য্য অনেকটা ম্লান হইয়া গিয়াছিল। যদিও তখন নভেম্বর মাস, তথাপি ঐ সময় এখানে বর্ষাকাল—তাই এত বৃষ্টি! চতুর্দ্দিকে উচ্চ উচ্চ পাহাড়ের গাত্র কাটিয়া কাটিয়া রেলের লাইন চলিয়া গিয়াছে এবং মধ্যে মধ্যে বড় বড় সুড়ঙ্গও রহিয়াছে। এই পাহাড়গুলির উপরে এক এক স্থানের দৃশ্য এত মনোরম যে স্বচক্ষে না দেখিলে বর্ণনা করা যায় না।

এই সকল মনোরম দৃশ্য দেখিয়া আমাদের মন একেবারে গভীর আনন্দে পূর্ণ হইয়া যাইতেছিল। আমাদের গাড়ীতে যে ফরাসী ভদ্রলোকটী ছিলেন, তাঁহাকে এ বিষয়ে জিজ্ঞাসা করাতে তিনিও স্বীকার করিলেন যে, ইহা এক অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য এবং পৃথিবীর আর কোথাও ইহা অপেক্ষা অধিক মনোরম দৃশ্য বোধ হয় থাকিতে পারে না। চারিদিকেই অতি উচ্চ উচ্চ পাহাড়, পাহাড়গুলির গা কাটিয়া সব ধানের ক্ষেত বিরাজমান (এই প্রথম ধানের ক্ষেত এদেশে দেখিলাম), দূরে দূরে পাহাড়গুলির গায়ে গায়ে সব মেঘ জমিয়া রহিয়াছে এবং তারপর একটী নূতন দৃশ্য—যাহা আমাদের ভারতবর্ষে বোধ হয় দেখা যায় না—এই পাহাড়গুলির মাথা হইতে নীচে অবধি কলা ও নারিকেল গাছে পূর্ণ, ইহাতে পাহাড়গুলির সৌন্দর্য্যকে অতি অপূর্ব্ব করিয়া তুলিয়াছে। পাহাড়গুলির উপরে ষ্টেশন বড় নাই, কারণ এখানে লোকের বসতিই নাই। কেবল মাঝে মাঝে ও অনেক দূরে দূরে এক-একটা ছোট ষ্টেশন এবং তার আশে পাশে ২.৪ ঘর লোকের বসতি। ট্রেণ যতই ক্যাণ্ডি অভিমুখে অগ্রসর হইতে লাগিল, আমাদের মনও ততই উৎসুক হইয়া উঠিতে লাগিল—কতক্ষণে ক্যাণ্ডিতে পৌছিয়া সহরটা একবার পরিদর্শন করিব।

তখন সন্ধ্যা প্রায় সাতটা, আমাদের ট্রেণ ক্যাণ্ডি ষ্টেশনে আসিয়া থামিল। মুষলধারে বৃষ্টি হইতেছিল আর বেশ অন্ধকারও হইয়া গিয়াছিল, কাজেই সেই দিন সহর দেখার আশা একেবারেই ছাড়িতে হইল; তখন কেবল এই ভাবনা হইতে লাগিল যে, এই বিদেশে কিরূপে নিরাপদে একটী আশ্রয়ে গিয়া উঠিব? ক্যাণ্ডি ষ্টেশনে ট্রেণ পৌছিতেই ভিন্ন ভিন্ন হোটেলের তকমাধারী সব লোক আমাদের আসিয়া ধরিতে লাগিল তাহাদের হোটেলে গিয়া থাকিবার জন্য। ক্যাণ্ডিতে Queen's Hotelই সর্ব্বাপেক্ষা বড় ও ভাল এবং এখানে থাকার খরচাও সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। এই হোটেলটী ইউরোপীয়দিগের দ্বারা পরিচালিত এবং ইহার অবস্থিতি (position) অতি মনোরম—সুবিখ্যাত ক্যাণ্ডি লেকের উপরেই। আমরা যে হোটেলের লোককে ঠিক করিলাম সে আমাদের জিনিষপত্রগুলি সহ আমাদিগকে তাহার হোটেলের গাড়ীতে চড়াইয়া গাড়ী ছুটাইয়া দিল। অন্ধকারের ভিতর দিয়া উৎসুকনেত্রে আমরা চারিদিকে চাহিতে লাগিলাম—যদি কিছু দেখিতে পাওয়া যায় এই আশায়, কিন্তু অন্ধকারের গভীরতা হেতু সে আশায় নিরাশ হইতে হইল। অল্পক্ষণের ভিতরেই আমরা হোটেলে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। আমরা যে হোটেলে আসিয়া উঠিলাম তাহার নাম King's Hotel। এই হোটেলের বাড়ীটা আমাদের এখানকার পশ্চিমের বাঙ্গলার ধরণের, ত্রিতল গৃহ—মোটের উপর মন্দ নয়; সকল ঘরেই ইলেকট্রীকের আলো আছে। আমরা যখন গিয়াছিলাম তখন মরসুম (season) নহে বলিয়া হোটেলের লোকের মোটেই ভীড় ছিল না। কারণ হস্তপ্রক্ষালনাদি সমাপনান্তে, অল্প বিশ্রামে পথের ক্লান্তি দূর করিয়া সন্ধ্যার ভোজন শেষ করা গেল এবং সকাল সকাল শুইতে যাওয়া গেল।

নূতন সহর দেখিবার ঔৎসুক্যে আমাদের ঘুম খুব সকালেই ভাঙ্গিয়া গেল। প্রাতঃকৃত্য ও আহারাদি সমাপনান্তে একটী ফিটন্ গাড়ী ভাড়া করিয়া আমরা সহর পরিদর্শনার্থে বাহির হইলাম। এখানে ফিটন্, ট্যাক্সি ও রিক্স যথেষ্ট ভাড়া পাওয়া যায়, এবং প্রত্যেক হোটেলেরই নিজেদের ফিটন ও ট্যাক্সি আছে—চাহিলেই ভাড়া পাওয়া যায়। পূর্ব্বদিন রাত্রে খুব বৃষ্টি হইয়া যাওয়ায় সকাল বেলাটা বেশ পরিষ্কার হইয়া গেল এবং বেশ রৌদ্রও উঠিল। ক্যাণ্ডিতে দর্শনোপযোগী স্থান এই গুলি—Temple of the Tooth, Kandy lake ও Peradeniyaর Botanical Garden. Temple of the Tooth ও Kandy lakeটী সহরেরই ভিতর, কিন্তু Botanical Gardenটী সহর হইতে ৭। ৮ মাইল দূরে; তবে যাইবার কোনও অসুবিধা নাই, বেশ পাকা রাস্তা আছে।

আমাদের গাড়ী বাজারের ভিতর দিয়া ঘুরিয়া Temple of the Toothএ আসিয়া হাজির হইল। ইহা হইতেছে একটী বহু প্রাচীন বৌদ্ধ মন্দির এবং ইহার নাম সুবিখ্যাত। বাহির হইতে দেখিতে মন্দিরটী এমন কিছুই চিত্তাকর্ষক নহে, তবে একটী বহু প্রাচীন কীর্ত্তি বলিয়াই সকলের দেখিবার জিনিষ। মন্দির-গাত্রে কোথাও কোথাও দুই তিন হাজার বৎসর পূর্ব্বের কারুকার্য্য এখনও খচিত রহিয়াছে, তবে অধিকাংশ স্থলেই পূর্ব্বে যেরূপ কারুকার্য্য ছিল তাহারই অনুকরণে নূতন করা হইয়াছে। যাঁহারা পুরাতন শিল্পের বিষয় জানিতে চাহেন, তাঁহাদের নিকট এই মন্দির একটী বিশেষ দর্শনীয় পদার্থ। মন্দিরটী বিশেষ কিছু বড় নহে। একজন গাইড্ আমাদিগকে মন্দিরটী ভাল করিয়া ঘুরাইয়া দেখাইল ও অনেক ঐতিহাসিক জিনিস বুঝাইয়া দিল, কিন্তু আমরা উক্ত বিষয়ে অনভিজ্ঞ ও বিশেষ অনুসন্ধিৎসু না হওয়ায় আর সে বিষয়ে অধিক আলোচনা করিলাম না। মন্দিরের ভিতরে বুদ্ধের প্রতিমূর্ত্তি ও প্রতিকৃতি দেখিলাম। শুনিলাম, প্রতিবৎসর এই মন্দির হইতে একবার করিয়া একটা খুব বড় মিছিল বাহির হয় এবং সহরের চারিদিকে ঘুরিয়া আসে। সেই সময়ে এই মন্দিরে এক মহোৎসব হয়। এই মন্দিরে একটী লাইব্রেরী আছে। ইহাতে বৌদ্ধধর্ম

সংক্রান্ত অনেক বই, পুঁথি প্রভৃতির সংগ্রহ আছে। একজন বৌদ্ধ পুরোহিত ইহার তত্ত্বাবধান করেন। লাইব্রেরীর ঘরটী দ্বিতলের উপর এবং ইহার চতুর্দ্দিকে বারান্দা আছে। এখান হইতে সহরের অনেকটা বেশ দেখিতে পাওয়া যায়। এই স্থানটী অতি মনোরম,—সহরের কোলাহলের বাহিরে অতি নির্জ্জন 'ক্যাণ্ডি লেকের পার্শ্বেই। লাইব্রেরীটী বিশেষ বড় না হইলেও বই অনেক আছে, বৌদ্ধধর্ম্ম-বিষয়ক বহু ইংরাজী পুস্তকও দেখিলাম। পুঁথিগুলি সব সিংহলী ভাষায় লিখিত, সুতরাং আমাদের বুঝিবার কোনও উপায় ছিল না। বৌদ্ধধর্ম্ম বিষয়ে বিশেষ অনুসন্ধিৎসু না হওয়ায় আমরা অধিকক্ষণ সেখানে অতিবাহিত করিলাম না। পুরোহিত মহাশয়ের সহিত কথাবার্ত্তায় বুঝিলাম তিনি বেশ ইংরাজী জানেন এবং অতি উদার মতের লোক। পুরোহিত মহাশয় তাঁহাদের Visitors' book এ আমাদের নাম প্রভৃতি সহি করিতে অনুরোধ করিলেন। তাহাতে দেখিলাম যে Prince of Wales এরও নাম সহি রহিয়াছে। Prince of Wales যখন ভারত পরিদর্শনে আসেন, তখন তিনিও ক্যাণ্ডির এই বৌদ্ধ মন্দির দর্শন করেন। পুরোহিত মহাশয়ের জন্য কিছু দক্ষিণা রাখিয়া আমরা গাড়ীতে গিয়া উঠিলাম।

আমাদের গাড়ী এইবার 'ক্যাণ্ডি লেকের' ধার দিয়া চলিতে লাগিল। এই হ্রদটী অতি চমৎকার এবং এই স্থানের দৃশ্যটীও অতি মনোরম। চারিদিকেই পাহাড় এবং সেই সব পাহাড়ের উপর লোকেদের বাড়ী, হোটেল, পার্ক প্রভৃতি অবস্থিত। সহরের মধ্যে এই স্থানটীই সর্ব্বাপেক্ষা উত্তম ও মনোরম এবং এই স্থানেই ইউরোপীয়েরা বাস করেন। হ্রদটী বেশ বড় এবং ইহার জল দর্পণের ন্যায় স্বচ্ছ ও ঝক্‌ঝকে। আমাদের গাড়ী এই হ্রদের ধার দিয়া আঁকা বাঁকা পথ ধরিয়া চলিতে লাগিল।

অল্পক্ষণের ভিতর আমাদের গাড়ী Botanical Garden এর পথে আসিয়া পড়িল। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, ক্যাণ্ডি সহর হইতে Botanical Garden প্রায় ৭।৮ মাইল, সুতরাং সেখানে পৌঁছিতে প্রায় এক ঘণ্টা লাগিল। পথে এমন কিছু চক্ষে পড়িল না যাহা বিশেষ বর্ণনার যোগ্য। রাস্তার দুই ধারে ছোট ছোট বস্তি আর কুঁড়েঘর—যেরূপ আমাদের দেশের পল্লীগ্রামের পথে সচরাচর দেখা যায়। শৈশবে শুনিতাম—'সোনার লঙ্কা', কিন্তু আজ লোকগুলির অবস্থা দেখিয়া বিপরীত ধারণাই হইল; আমাদের দেশের গরীব লোকেদের অপেক্ষা ইহাদের অবস্থা কোনও অংশে ভাল নয়। আমাদিগকে নূতন লোক দেখিয়া অনেকেই হাঁ করিয়া তাকাইয়া দেখিতে লাগিল। সুদীর্ঘ পথ অতিক্রম করিয়া আমাদের গাড়ী অবশেষে Botanical Garden এর দ্বারে আসিয়া হাজির হইল। ইহার সহিত একটী agricultural school ও একটী agricultural experimental station আছে। আমরা বাগানে প্রবেশ করিতেই একজন গাইড্ আসিয়া আমাদিগকে বাগানের ভিতর লইয়া চলল এবং নানা রকমের গাছ দেখাইয়া বুঝাইয়া দিতে লাগিল; কিন্তু উদ্ভিদ-বিজ্ঞানে একেবারেই অনভিজ্ঞ হওয়ায় তাহাতে আমাদের বিশেষ কিছু আগ্রহ জন্মাইতেছিল না। তবে উদ্ভিদ-বিজ্ঞানে অনভিজ্ঞ হইলেও এ কথা বলিতে পারি যে, এই বাগানটীতে গাছগাছড়ার খুব সমাবেশ আছে এবং এইজন্য ইহার নামও সুবিখ্যাত। বাগানটীর এক এক স্থানের দৃশ্য অতি মনোরম—বিশেষতঃ ইহার একদিকের প্রান্তটীর দৃশ্য। বাগানটীর এই প্রান্তে বড় বড় পাহাড় এবং সেই সব পাহাড়ের গাত্র রবার ও চায়ের চাষে ভরা। চায়ের ক্ষেতগুলি দেখিতে অতি মনোরম, ছোট ছোট গাছগুলি পাহাড়ের গায়ে এমন সুন্দর সারি দিয়া জন্মাইয়াছে যে দেখিলে চোখ জুড়ায়। রবার গাছগুলি খুব লম্বা লম্বা ও সোজা। সেইদিনই বেলা ২॥টার গাড়ীতে কলম্বোতে ফিরিতে হইবে বলিয়া সত্বর দেখার কার্য্য সমাধা করিয়া হোটেল অভিমুখে যাত্রা করা গেল।

বেলা প্রায় দ্বিপ্রহরের সময় আমরা আমাদের হোটেলে আসিয়া পৌঁছিলাম। আড়াইটার ট্রেন ধরিতে হইবে বলিয়া আমরা শীঘ্র শীঘ্র মধ্যাহ্ন ভোজন শেষ করিয়া ও হোটেলের সব দেনাপাওনা চুকাইয়া দিয়া ষ্টেশন অভিমুখে রওনা হইলাম। ট্রেণে বিশেষ কিছু ভিড় ছিল না, আমরা একটী কামরাতে উঠিয়া আরামে বসিয়া পথের ক্লান্তি দূর করিতে লাগিলাম। যথাসময়ে ট্রেণ ছাড়িয়া দিল, পথে আবার মুষলধারে বৃষ্টি আরম্ভ হইল। গাড়ীতে চুপচাপ বসিয়া বসিয়া কেবল ক্যাণ্ডির স্মৃতিই মনে জাগিতে লাগিল। ট্রেণ কলম্বো অভিমুখে ছুটিতে লাগিল, ক্রমে পাহাড়ের পথ অতিক্রম করিয়া আমরা সমতল ভূমিতে আসিয়া পড়িলাম। সন্ধ্যা প্রায় ৭টার সময় ট্রেণ কলম্বোতে আসিয়া পৌঁছিল এবং আমরা তাড়াতাড়ি ট্রেণ হইতে নামিয়া জিনিষপত্রগুলি লইয়া ভারতবর্ষে ফিরিবার ট্রেণে উঠিয়া পড়িলাম। অল্পক্ষণের মধ্যেই ট্রেণ ছাড়িয়া দিল। তখন সন্ধ্যা হইয়া গিয়াছে, চারিদিক অন্ধকারে ঘিরিয়া ফেলিয়াছে, ষ্টেশনে লোকের কোলাহলের মধ্য হইতে হুস্ হুস্ করিয়া ট্রেণ ছাড়িয়া দিল এবং অন্ধকার ভেদ করিয়া সন্ সন্ করিয়া ছুটিতে লাগিল। ভারতবর্ষে ফিরিবার জন্য মনটা আনন্দে ভরপুর থাকিলেও সেই সব পুরাতন স্মৃতি মধ্যে মধ্যে জাগিয়া উঠিয়া মনটাকে যেন একটা বিষাদের ছায়াতে ঘিরিয়া ফেলিতেছিল।

সংবাদ।

বিশ্বরাষ্ট্রসঙ্ঘের শান্তিশাখার আমন্ত্রণ।

আমরা দেখিয়া আনন্দিত হইলাম যে জেনেভা-(Geneva) স্থিত বিশ্বরাষ্ট্রসঙ্ঘের (League of Nations) শান্তিবিধায়িনী (For the World's supreme peace) শাখা, আমাদের শ্রদ্ধাস্পদ আচার্য্য শ্রীযুক্ত ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়কে সাদর আমন্ত্রণ করিয়াছেন। এই সঙ্ঘের উদ্দেশ্য ব্রাহ্মসমাজের উদ্দেশ্যের সহিত প্রায় অভিন্ন। সুখের বিষয় এই যে, সঙ্ঘ এতদিনে বুঝিয়াছেন যে বিশ্বে প্রকৃত শান্তি আনিতে হইলে ধর্ম্ম ভিন্ন দ্বিতীয় উপায় নাই এবং সেই ধর্ম্মও সকল প্রকার সাম্প্রদায়িকতা-বর্জ্জিত হওয়া চাই; ইহা বুঝিয়াই সঙ্ঘ উক্ত কার্য্যের জন্য এই শাখা স্থাপন করিয়াছেন। ব্রাহ্মসমাজ আজ প্রায় শতাব্দী ব্যাপিয়া যে কাজ নীরবে করিয়া আসিতেছেন, এইবার তাহা সঙ্ঘের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে দেখিয়া আশা হয় যে, সঙ্ঘ যদি কর্ম্ম-কোলাহলে এই লক্ষ্য হারাইয়া না ফেলেন ত' বিশ্বে প্রকৃত শান্তি আসিবার সূত্রপাত হইবে।

শোক-সংবাদ।

কবিরাজ ৺যামিনীভূষণ সেন—'কলিকাতা অষ্টাঙ্গ আয়ুর্ব্বেদ-বিদ্যালয়ের' প্রতিষ্ঠাতা খ্যাতনামা কবিরাজ যামিনীভূষণ সেন এম-এ, এম-বি মহাশয় গত ২৩শে শ্রাবণ বুধবার পরলোক গমন করিয়াছেন। প্রাচীন আয়ুর্ব্বেদ-শাস্ত্রকে যুগোপযোগী ও উন্নত করিবার জন্য যাঁহারা যত্নশীল, কবিরাজ মহাশয় তাঁহাদের অন্যতম ছিলেন। তাঁহার ন্যায় শাস্ত্রানুরাগী ও স্বদেশভক্ত অতি অল্পই দেখা যায়। তিনি রাজকীয় সংস্কৃত কলেজে নিম্নশ্রেণী হইতে এম-এ পর্য্যন্ত অধ্যয়ন করিয়া কৃতিত্বের সহিত উত্তীর্ণ হন এবং আজীবন উক্ত বিদ্যালয়ের প্রতি অনুরাগ পোষণ করিতেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের তিনি একজন সভ্য ছিলেন। সাধারণ সভাসমিতিতেও তাঁহাকে যোগদান করিতে দেখা যাইত। পাশ্চাত্য চিকিৎসাশাস্ত্রের এম-বি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলেও তিনি তাঁহার জাতীয়ব্যবসায় কবিরাজীকেই অবলম্বন করিয়া স্বধর্ম্ম ও স্বদেশানুরাগেরই পরিচয় দিয়া গিয়াছেন। কিন্তু তাই বলিয়া তিনি অনুদার ছিলেন না। অষ্টাঙ্গ আয়ুর্ব্বেদ-বিদ্যালয়ে সর্ব্বজাতীয় ছাত্রের প্রবেশাধিকার তাহার একটী অন্যতম নিদর্শন। মৃত্যুকালে ইঁহার বয়ঃক্রম মাত্র ৪৫ বৎসর হইয়াছিল। ইঁহার মত একজন গুণবান ব্যক্তির এরূপ অকালবিয়োগ দেশের দুর্ভাগ্য সূচনা করিতেছে। আমরা ইঁহার শোকসন্তপ্ত পুত্র ও পরিজনদিগকে আমাদের আন্তরিক সমবেদনা জানাইতেছি। ভগবান ইঁহাদের শোকে সান্ত্বনা দান করুন।

৺হেমাঙ্গিনী দাশ। সুপ্রসিদ্ধ ডাক্তার শ্রীসুন্দরী মোহন দাশ মহাশয়ের পত্নী হেমাঙ্গিনী দাশ গত ২রা ভাদ্র বৃহস্পতিবার প্রাতঃকাল ৭-১৫ মিনিটের সময় পরলোকগত হইয়াছেন। ইনি কিছু দিন হইতে বেরীবেরী রোগে ভুগিতেছিলেন। উক্ত দিবস হঠাৎ হৃদ্‌যন্ত্রের ক্রিয়া রুদ্ধ হওয়ায় মৃত্যু ঘটে। ইনি সাধারণের কার্য্যে ও সভাসমিতিতে যোগ দিতে কখনও আলস্য প্রকাশ করিতেন না। ইঁহার দানশীলতা ও উন্নতহৃদয়ের বহু পরিচয় পাওয়া যায়। আমরা ইঁহার শোকার্ত্ত স্বামী-পুত্র-পরিজনদিগকে আমাদের আন্তরিক সমবেদনা জানাইতেছি। ভগবান ইঁহার লোকান্তরিত আত্মার সদ্গতি বিধান করুন।

জাগো হিন্দুস্থান।

খাম্বাজ—পটতাল।

গান—শ্রীক্ষেমেন্দ্রনাথ ঠাকুর বি-এস্-সি। স্বরসম্বাদ—শ্রীবাণীদেবী।

নবীন ভারত! গাহ নবীন সুরে
"জাগো জাগো হিন্দুস্থান।
মহা জাগরণ আজি তব দ্বারে
জাগো আজি হিন্দুস্থান॥"
মুছাও, অশ্রুধারা দুঃখজ্বালা
ঘুচাও এ ক্রন্দন-গান।
বিবুধ-নিষেবিত সজ্জন-সেবিত
সুরনর-বন্দিত পুরাণ এ ভারত
জাগো রে জাগো আবার॥

বিশ্ববাসী গাহে আজি
তোমারি নাম।
গাও একতানে একপ্রাণে
"জাগো হিন্দুস্থান॥"
জাগো জাগো হিন্দুস্থান।
গাহ "জয় জয় হিন্দুস্থান"॥
হোক্ ভারতের যশোগান।
গাও "জাগো হিন্দুস্থান॥"

গানটি বাদ্যযন্ত্রের সঙ্গে গীত হইবে। ইহা বেহালা এস্রাজ সেতার শরদ প্রভৃতি যে কোন যন্ত্রে বাজানো যাইতে পারে। ইহা বিভিন্ন যন্ত্রে বিভিন্ন সপ্তকে—নিম্ন সপ্তকে (খাদে), মধ্য সপ্তকে ও উচ্চ সপ্তকে (তারায়)—বাজাইতে হইবে। যদি এস্রাজে নিম্ন সপ্তকের বা খাদের গা অর্থাৎ গ্া বাজাইতে অসুবিধা হয়, তবে গ্া এর স্থলে প্া অর্থাৎ খাদের পা বাজাইলেই চলিবে। সেতারে যিনি বাজাইবেন, তিনি যেখানে "-া" কার চিহ্ন দেখিবেন সেখানে প্রত্যেক "-া" কার চিহ্নের জন্য একটি করিয়া ঝঙ্কার বাজাইবেন। ঋ=কোমল রা, জ্ঞা=কোমল গা, হ্মা=কড়ি মা, দা=কোমল ধা, ণা=কোমল না। হসন্ত=খাদের চিহ্ন, রেফ=তারার চিহ্ন।

১ ২ ৩ ৪ ৫
{ | মা মা -া মা | পা -া পা পা | মপা ধা ধা ধা | পা ধা ণা র্সা | র্রর্সা না র্সা -া |
ন বী • ন ভা • র ত গা• • হ ন বী ন সু • রে• • • •

৬ ৭ ৮ ৯ ১০
| ণধা পা ধা -া | ণা র্রা র্সা -া | ণা -া -া -া | ধা -া -া -া | পা -া -া পা |
•• • • • জা • গো • জা • • • গো • • • হি • • ন্দু

১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫
| মা -া ৩ ৪ | ১ ২ ৩ ৪ | ণা -া -া -া | র্সা -া -া -া | র্গা -া -া র্পা |
স্থা ন্ জা • • • গো • • • হি • • ন্দু

১৬ ১৭ ১৮ ১৯ ২০
| র্মা -া ৩ ৪ | র্সা -া -া পা | ধা -া -া -া | পা -া -া ধা | মা -া ৩ ৪ |
স্থা ন্ জা • • • গো • • • হি • • ন্দু স্থা ন্

২১ ২২ ২৩ ২৪ ২৫
। মা মা -া মা। পা -া পা পা। মপা ধা ধা ধা। পা ধা ণা র্সা। র্রসা না র্সা -া।
ন বী ০ ন ভা ০ র ত গা০ ০ হ ন বী ন সু ০ রে ০ ০ ০ ০

২৬ ২৭ ২৮ ২৯ ৩০ ॥
[৩ ৪]
। ণধা পা ধা -া। ধা -া -া ণা। র্সা -া -া -া। পা -া -া পা। মা -া মা মা।
০০ ০ ০ ০ জা ০ ০ ০ গো ০ ০ ০ হি ০ ০ ন্দু স্থা ন্ ম হা

৩১ ৩২ ৩৩ ৩৪ ৩৫
। মা -া -া র্মা। র্মা -া র্মা -া। র্মা -া র্মা র্গা। র্রা র্গা র্মা র্পা। র্মা -া -া -া।
জা ০ ০ গ র ০ ণ ০ আ ০ জি ০ ত ব ঘা ০ রে ০ ০ ০

৩৬ ৩৭ ৩৮ ৩৯ ৪০
। ধা -া ণা -া। র্সা -া -া -া। র্সা -া র্সা -া। ণা -া র্রা -া। র্সা -া -া -া।
জা ০ ০ ০ গো ০ ০ ০ আ ০ জি ০ জা ০ ০ ০ গো ০ ০ ০

৪১ ৪২ ৪৩
। ণা -া ধা -া। পা -া -া গা। মা ২ ৩ ৪ }
আ ০ জি ০ হি ০ ০ ন্দু স্থান্

৪৪ ৪৫ ৪৬ ৪৭ ৪৮
। ণা ধা -া -া। ণা ধা ণা র্জ্জা। র্রা -া -া -া। র্সা র্রা র্মা র্জ্জর্রা। র্সা -া -া -া।
ঘু চা ০ ও অ ০ শ্র ধা রা ০ ০ ০ দু ঃ খ আ০ না ০ ০ ০

৪৯ ৫০ ৫১ ৫২ ৫৩
। ণা ধা ণা র্জ্জা। র্রা ২ ৩ ৪। র্সা র্রা র্মা র্জ্জর্রা। র্সা ২ ৩ ৪। র্গা র্গা -া র্গা।
ঘু চা ও এ

৫৪ ৫৫ ৫৬ ৫৭ ৫৮
। র্গা র্মর্গা র্রা র্গা। র্মা -া -া -া। -া -া -া -া। র্মা র্মা র্পা র্মা। র্গা -া র্মা র্গা।
ক্র ০ ন্দ ন গা ০ ০ ০ ০ ০ ০ ন্ বি বু ধ নি বে ০ বি ত

৫৯ ৬০ ৬১ ৬২ ৬৩

। র্রা -া র্জ্ঞা র্রা । র্সা -া র্রা র্সা । র্সা র্সা র্রা র্সা । ণা -া র্সা ণা । ধা ধা ণা ধা ।
স • জ্জ ন সে • বি ত সু র ন র ব • ন্দি ত পু রা ণ প্র
•

---

৬৪ ৬৫ ৬৬ ৬৭ ৬৮

। পা -া ধা পা । পা -া ধা পা । মা -া পা গা । মা -া -া -া । মা -া পা -া ।
ভা • র ত জা • গো রে জা • গো আ বা • • র্ বি • শ্ব •

---

৬৯ ৭০ ৭১ ৭২ ৭৩

। ধা -া ণা -া । র্সা -া র্রা -া । র্সা -া র্রা -া । র্গা -া -া -া । -া -া র্রা র্সা ।
বা • সী • গা • হে • আ • জি • তো • • • • • মা ত্রি

---

৭৪ ৭৫ ৭৬ ৭৭ ৭৮

। -া -া -া -া । র্মা -া া -া । -া -া র্সা -া । {র্সা র্রা র্সা । র্মা র্জ্ঞা র্রা ।
• • • • না • • • • ম্ গা ও এ • ক তা • নে

---

৭৯ ৮০ ৮১ ৮২ ৮৩

। র্সা র্রা র্সা । র্মা র্জ্ঞা র্রা । ণা ধা পা । ধা ণা -া ।} র্মা -া -া র্মা ।
এ • ক প্রা • ণে জা গো হি ন্দু স্থা ন্ জা • • গো

---

৮৪ ৮৫ ৮৬ ৮৭ ৮৮

। র্মা -া র্জ্ঞা -া । র্রা -া র্সা -া । ণা -া -া -া । র্মা -া -া র্মা । র্মা র্মা র্জ্ঞা র্জ্ঞা ।
জা • গো • হি • ন্দু • স্থা • • ন্ গা • • হ জ য় জ য়

---

৮৯ ৯০

। র্রা -া -া র্সা । ণা -া মা -া । র্মা -া -া র্মা । র্মা -া র্জ্ঞা -া । র্রা -া -া র্সা ।
হি • • ন্দু স্থা ন্ হো ক্ ভা • • র তে • র • ব • • শো

---

৯১ ৯২ ৯৩ ৯৪

। ণা -া ণা -া । মা -া -া -া । পা -া -া -া । ধা -া -া ধা । ণা -া -া -া II II
গা ন্ গা ও জা • • • গো • • • হি • • ন্দু স্থা • • ন্

জাগো হিন্দুস্থান।

খাম্বাজ—পটতাল।

গান—শ্রীক্ষেমেন্দ্রনাথ ঠাকুর বি, এস্ সি।   স্বরসম্বাদ—শ্রীবাণীদেবী।

সমগ্র স্বরসম্বাদটি

কেবল

এস্রাজ ও অনুরূপ যন্ত্রের জন্য।

১ ২ ৩ ৪ ৫

। র্মা -া -া -া । র্রা -া -া -া । র্মা -া -া -া । র্গা র্মা র্গা র্মা । র্মা -া র্মা -া ।
। র্সা । ণা । র্সা । র্সা মা গা মা । র্মা -া র্মা -া ।
। ধা । পা । ধা । পা সা সা । র্রসা না র্সা -া ।
। মা । । মা । । মমা মা মা -া ।
ন বী ০ ন ভা ০ র ত গা ০ হ ন বী ম স্থু ০ রে০ ০ ০ ০

---

৬ ৭ ৮ ৯ ১০

। ণধা পা ধা -া । গা ণ্‌া মা ক্ষা । পা -া -া -া । মা -া -া -া । গা -া -া গা ।
। পমা রা ঋা -া । গা ণ্‌া ধ্‌া ধ্‌া । ণ্‌া । সা । ণ্‌া সা রা সা ।
০০ ০ ০ ০ জা ০ গো ০ জা ০ ০ ০ গো ০ ০ ০ হি ০ ০ ন্দু

---

১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫

[র্সা সা । র্সা র্সা র্সা সা]

। মা -া ৩ ৪ । ১ ২ ৩ ৪ । গাঃ মঃ পা গা । ধাঃ ণঃ র্সা ধা । র্গা -া -া -া ।
। ধ্‌া । । সাঃ রঃ গা সা । মাঃ পঃ ধা মা । গা ।
। পা ।
স্থা ন্ জা ০ ০ ০ গো ০ ০ ০ হি ০ ০ ন্দু

---

১৬ ১৭ ১৮ ১৯ ২০

। র্মা ২ ৩ ৪ । ণা -া -া -া । ধাঃ ণঃ র্সা ধা । ণা -া পা -া । ধা ২ ৩ ৪ ।
। মধা ণনা র্সর্ঋা র্রর্গা । পা । মাঃ পঃ ধা মা । পা -া গা -া । মজ্ঞা রসা রজ্ঞা গমা ।
। মধা ণনা ধণা নর্সা । সা । সা । রা -া সা -া । সা ।
স্থা ন্ জা ০ ০ ০ গো ০ ০ ০ হি ০ ০ ন্দু স্থা ন্

২১ ২২ ২৩ ২৪ ২৫

| ধা -া -া -া | ণা -া -া -া | ধা -া -া -া | র্সা ধা ণা ধা | ধা -া -া -া |

| সা | ঋা | সা | পা মা পা মা | মা -া ঃ গঃ মা |

| ধ্া | ণ্া | ধ্া | সা সা ঋা সা | ধ্া -া -া -া |

ন বী ॰ ন ভা ॰ র ত গা ॰ হ ন বী ন সু ॰ রে ॰ ॰ ॰

২৬ ২৭ ২৮ ২৯ ৩০ ॥

| পধা পমা মা -া | ধাঃ ণঃ র্সা র্ঋা | র্সা -া -া -া | পা -া -া -া | ধা -া ৩ ৪ |

| গমা রন্া সা -া | মাঃ পঃ ধা ণা | ধা | গা সা ঋা সা | মা |

॰ ॰ ॰ ॰ ॰ ॰ আ ॰ ॰ ॰ গো ॰ ॰ ॰ হি ॰ ॰ ন্দু স্থা ন্ গ হা

৩১ ৩২ ৩৩ ৩৪ ৩৫

| র্মা র্সা ধা র্সা | র্মা র্গা র্মা র্পা | র্মা র্গা র্মা র্পা | র্মা র্পা র্মা র্সা | ধা -া -া -া |

| মা ধা র্সা ধা | মা গা মা পা | মা গা মা পা | মা পা ধা ণা | |

আ ॰ ॰ গ র ॰ ণ ॰ আ ॰ জি ॰ ত ব ঘা ॰ রে ॰ ॰ ॰

৩৬ ৩৭ ৩৮ ৩৯ ৪০

| স্মা -া পা -া | ধা -া -া -া | মা -া ধা -া | পা -া দা -া | মা -া ধা -া |

আ ॰ ॰ ॰ গো ॰ ॰ ॰ আ ॰ জি ॰ আ ॰ ॰ ॰ গো ॰ ॰ ॰

৪১ ৪২ ৪৩ ৪৪ ৪৫

| পা -া গা -া | পা -া -া গা | মা সা ঋা গা } | গা র্মা -া -া | র্মা র্গা র্মা র্পা |

আ ॰ জি ॰ হি ॰ ॰ ন্দু স্থান্ ~ } ঋা ধা | র্ঋা র্ধা র্ঋা র্জ্ঞা |

ণ্া মা | মা গা মা পা |

সু ছা ॰ ও অ ॰ ক্ষ ধা

৪৬ ৪৭ ৪৮ ৪৯ ৫০

। র্মা -া -া -া । জ্ঞা র্রা র্মা জ্ঞর্রা । জ্ঞা -া -া -া । র্মা র্গা র্মা র্পা । র্মা ২ ৩ ৪ ।
। র্রা । র্সা না র্রা র্সনা । র্সা । র্রা র্ধা র্রা জ্ঞা । র্রা ।
মা জ্ঞা রা মা জ্ঞরা জ্ঞা মা গা মা পা মা
রা • • • দু ঃ খ আ• লা • • •

---

৫১ ৫২ ৫৩ ৫৪ ৫৫

। জ্ঞা র্রা র্মা জ্ঞর্রা । র্সা ২ ৩ ৪ । র্পা র্গা -া র্সা । গা পা গা সা । মা ধা -া র্সা ।
। র্সা ণা র্রা র্সণা । ধা । । । ।
জ্ঞা রা মা জ্ঞরা সা
ঘু চা ও এ ক্র • ন্দ ন গা • • •

---

৫৬ ৫৭ ৫৮ ৫৯ ৬০

। সা মা ধ্ সা । মা ধা পা মা । গা -া মা গা । রা মা জ্ঞা রা । সা ধা রা সা ।
। ধা মা । । । । ।
• • • ন্ বি বু ধ নি ষে • বি ত স • জ্জ ন সে • বি ত

---

৬১ ৬২ ৬৩ ৬৪ ৬৫

। মা সা রা সা । ণা রা সা ণা । ধা মা ণা ধা । পা সা ধা পা । সা গা ধা পা ।
সু র ন র ব • ন্দি ত পু রা ণ এ ভা • র ত জা • গ রে

---

৬৬ ৬৭ ৬৮ ৬৯

। মা সা পা গা । মা র্সা র্মা র্সা । র্পর্মর্গা র্মা র্মর্গর্রা র্গা । র্পর্মর্গা র্মা র্গর্রর্ধা র্রা ।
। । মা -া র্মা -া । । ।
জা • গ আ বা • • রু বি • শ • বা • সী •

৭০ ৭১ ৭২ ৭৩
। র্রসনা র্সা র্গর্রর্ধা র্রা। র্রসনা র্সা র্গর্রর্ধা র্রা। র্গা -া -া -া। -া -া র্রা র্সা।
। । । র্সা । রা সা।
। । । ণা । ।
গা • • • হে• • • আ• • • জি• • • তো • • • • • মা ব্রি

---

৭৪ ৭৫ ৭৬ ৭৭ ৭৮
। -া -া -া -া। র্সা -া -া -া। -া -া র্সা -া। র্সা র্রা র্সা। র্মা র্জ্ঞা র্রা।
। । ধা । । । ।
। । মা । । । ।
। । সা । সা -া। । ।
• • • • না • • • • ম্ গা ও এ • ক তা • নে

---

৭৯ ৮০ ৮১ ৮২ ৮৩
। র্সা র্রা র্সা। র্মা র্জ্ঞা র্রা। র্রা র্জ্ঞা র্মা। র্মা ণা -া। র্মা -া -া র্মা।
র্ণা র্সা র্রা। র্জ্ঞা র্রা ।
ণা র্সা ণা। ধা ণা ।
এ • ক প্রা • ণে জা গো হি ন্দু স্থা ন্ জা • • গো

---

৮৪ ৮৫ ৮৬ ৮৭ ৮৮
। র্মা -া র্জ্ঞা -া। র্রা -া র্সা -া। ণা -া মপধণা -া। {জ্ঞা মা -া ধা। র্সা র্জ্ঞা র্মা ধা।
জা • গো • হি • ন্দু • স্থা • • • • • ন্ গা • • হ জ য় জ য়
ভা • • ৱ তে • র •

---

৮৯ ৯০ক ৯০খ ৯১ ৯২
। ণাঃ মঃ ণা র্সা। র্রা -া মপধণা -া} । র্রা -া ণা -া। মা -া -া -া। পা -া -া -া।
। । ণা } । ণা । । ।
হি • • ন্দু স্থা ন্ হো ক্
ব • • শো গা ন্ গা ও জা • • • গো • • •

---

৯৩ ৯৪
। ধা -া -া ধা। ণা র্রা র্মা ণা II II
। । ণা মা রা ণা II II
হি • • ন্দু স্থা • • ন্

খাম্বাজ—পটতাল।

গান—শ্রীক্ষেমেন্দ্রনাথ ঠাকুর বি-এস্‌সি। স্বরসম্বাদ—শ্রীবাণীদেবী।

এই সমগ্র স্বরসম্বাদটি

কেবল

সেতার ও অনুরূপ যন্ত্রের জন্য।

১ ২ ৩ ৪ ৫
| ধ্া সা সা সা | র্া ণ্া ণ্া ণ্া | ম্া ধ্া ধ্া ধ্া | সা সা ণ্া ধ্া | রসা ন্া সা -া |
| ম্া | ণ্্া | স্া | ণ্া ধ্া প্া ম্া | ণধ্া দ্া ধ্া -া |
ন বী • ন ভা • র ত গা • হ ন বী ন সু • রে • •

৬ ৭ ৮ ৯ ১০
| সমা ণ্া গ্া -া | গা ণ্া মা মা | পা পা পা পা | মা মা মা মা | গা -া -া গা |
| গম্া ণ্্া ধ্্া -া | গা ণ্া ধ্া ধ্া | ণ্া ণ্া ণ্া ণ্া | সা সা সা সা | ণ্া সা রা সা |
• • • • • জা • গো • জা • • • গো • • • হি • • ন্দু

১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫
[সা সা । সা সা সা সা]
| মা -া ৩ ৪ | ১ ২ ৩ ৪ | গ্াঃ ম্ঃ প্া গ্া | ধ্াঃ ণ্ঃ সা ধ্া | ণ্া সা ণ্া সা |
| ধ্া -া | | স্াঃ র্ঃ গ্া স্া | ম্াঃ প্ঃ ধ্া ম্া | প্া প্া প্া প্া |
স্থা ন্ জা • • • গো • • • হি • • ন্দু

১৬ ১৭ ১৮ ১৯ ২০
ধধ্া ণন্া সধা রগা		ধ্াঃ ণ্ঃ সা ধ্া	প্া -া প্া -া	ধ্া ধ্া ণ্া ন্া
মধ্া ণন্া ধণ্া ন্সা		ম্াঃ প্ঃ ধ্া ম্া	র্া -া গ্া -া	ম্া ম্া প্া দ্া
	স্াঃ র্ঃ গ্া স্া	স্াঃ	ণ্্া -া স্া -া	স্া
স্থা ন্ জা • • • গো • • • হি • • ন্দু স্থা ন্

২১ ২২ ২৩ ২৪ ২৫

। মা সা রা সা । পা ধা ণা গা । মা -া মা মা । র্সনা র্সনা র্রা র্সা । ধপা মা গা -া ।
। । । । । মগা রা সা -া ।
। । । । । ধ্প্া প্া প্া -া ।
। । । মা -া ম্া ম্া । গ্া ম্া ণ্া স্া । র্া প্া স্া -া ।
ন বী • ন ভা • র ত গা • হ ন বী ন স্থ • রে• • • •

---

২৬ ২৭ ২৮ ২৯

। পধা ণনা র্সর্ঋা র্ঋগা । । । ।
। সসা ণ্া ধ্া -া । ম্াঃ প্ঃ ধ্া ণ্া । ধ্া ধ্া ধ্া ধ্া । গ্া সঋা রজ্ঞা গা ।
। গ্ম্া ণ্া স্া -া । ধ্াঃ ণ্ঃ সা রা । সা সা সা সা । প্া সা ।
•• • • • জা • • • গো • • • হি •• •• ন্দু

---

৩০ ৩১ ৩২ ৩৩

। মা ২ ৩ ৪ । র্মা র্সা ধা র্সা । র্মা র্গা র্মা র্পা । র্মা র্গা র্মা র্পা ।
। ধ্া । মা ধা র্সা ধা । মা গা মা পা । মা গা মা পা ।
স্থা ন্ ম হা জা • • গ র • ণ • আ • জি •

---

৩৪ ৩৫ ৩৬ ৩৭ ৩৮

। র্মা র্পা র্মা র্সা । ধা -া -া -া । জ্ঞা ধ্া রা ণ্া । সা ধ্া সা ধ্া । সা ধ্া মা ধ্া ।
। মা র্সা ধা ণা ।
ত ব দ্বা • রে • • • জা • • • গো • • • আ • জি •

---

৩৯ ৪০ ৪১ ৪২ ৪৩

। রা ণ্া রা ম্া । ধ্া সা ধ্া সা । ণ্া রা ণ্া সা । গা সা ণ্া সা । ধ্া গা মা পা । }
জা • • • গো • • • আ • জি • হি • • ন্দু স্থান্

---

৪৪ ৪৫ ৪৬ ৪৭ ৪৮

II ১ ২ মা সা । ১ ২ ৩ ৪ । ১ ২ ৩ ৪ । ১ ২ ৩ ৪ । ১ ২ ৩ ৪ ।
II ধ্া স্া । । । । ।
মু ছা • ও অ • শ্রু ধা রা • • • দুঃ খ জ্বা লা • • •

৪৯ ৫০ ৫১ ৫২ ৫৩

। র্মা র্গা র্মা র্পা । র্মা ২ ৩ ৪ । র্জ্ঞা র্রা র্মা র্জ্ঞর্রা । র্সা ২ ৩ ৪ । র্সা ণা পা গা ।

। র্রা র্ঋা র্রা র্জ্ঞা । র্রা । র্সা ণা র্রা র্সণা । ধা । ।

। মা গা মা পা । মা । জ্ঞা রা মা জ্ঞরা । সা । ।

ঘু চা ও এ

---

৫৪ ৫৫ ৫৬ ৫৭ ৫৮

। পর্সা ণধা পগা রসা । মা -া -া -া । মা -া -া -া । ম্া ম্া ণ্া ণ্া । ণ্া ণ্া ণ্া ণ্া ।

। । ধ্া সা । মা ধা র্সা ধা । । ।

ক্র ৹ ৹৹ ন্দ৹ ন৹ গা ৹ ৹ ৹ ৹ ৹ ৹ ন্ বি বু ধ নি সে ৹ বি ত

---

৫৯ ৬০ ৬১ ৬২ ৬৩

। ণ্া ণ্া ণ্া ণ্া । সা সা সা সা । ম্া ম্া ম্া ম্া । ণ্া ণ্া ণ্া ণ্া । সা সা সা সা ।

স ৹ জ্জ ন সে ৹ বি ত সু র গ ণ ব ৹ ন্দি ত পু রা ণ এ

---

৬৪ ৬৫ ৬৬ ৬৭ ৬৮

। স্া স্া স্া স্া । স্া স্া স্া স্া । সা সা সা সা । ম্া ম্া ম্া ম্া । ধা ধা পা পা ।

। । । । । মা মা গা গা ।

। । । । । সা সা সা সা ।

ভা ৹ র ত জা ৹ গ রে জা ৹ গ আ বা ৹ ৹ র্ বি ৹ শ ৹

---

৬৯ ৭০ ৭১ ৭২

। ধা ধা ণা ণা । ধা ধা ণা ণা । ধা ধা ণা ণা । স্া -া -া -া ।

। মা মা মা মা । মা মা মা মা । মা মা মা মা । গা

। সা সা রা রা । সা সা রা রা । সা সা রা রা । সা

বা ৹ সী ৹ গা ৹ হে ৹ আ ৹ জি ৹ তো ৹ ৹ ৹

Tattwabodhini Patrika

Reg. No. C. 432.

একবিংশ কল্প
চতুর্থ ভাগ
আশ্বিন, ব্রাহ্মসম্বৎ ৯৭।

৯৯৮ সংখ্যা

১৮৪৮ শক

তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা

"ব্রহ্ম বা একমিদমগ্র আসীন্নান্যৎ কিঞ্চনাসীত্তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রন্নিরবয়বমেকমেবাদ্বিতীয়ম্ সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয়ং সর্ব্ববিৎ সর্ব্বশক্তিমদ্ধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্যসাধনঞ্চ তদুপাসনমেব"।

সম্পাদক—শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর

সাল ১৩৩৩। খৃঃ ১৯২৬। সম্বৎ ১৯৮৩। কলিগতাব্দ ৫০২৭। আশ্বিন।

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার বার্ষিক মূল্য ৩ টাকা
ডাকমাশুল ৵০ আনা। এই সংখ্যার মূল্য ।০ আনা। } আদিব্রাহ্মসমাজের কর্ম্মাধ্যক্ষের নামে পাঠাইতে হইবে।

তত্ত্ববোধিনীর নিয়মাবলী।

গ্রাহক।

১। তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার বর্ষ বৈশাখ হইতে আরম্ভ হয়। বৎসরের যে কোন সময় গ্রাহক হইলেও সেই বর্ষের প্রথম হইতেই পত্রিকা লইতে হইবে।

২। অগ্রিম বার্ষিক মূল্য সডাক ৩৷৹ আনা। অসমর্থ, মহিলা ও ছাত্রদের জন্য ২৷৹।

৩। অনিবার্য্য কারণ ব্যতীত পত্রিকা প্রতি মাসের প্রথম সপ্তাহের মধ্যেই প্রকাশিত হয়।

৪। তিন আনার ডাকটিকিট, নাম ও ঠিকানাযুক্ত খাম পাঠাইলে একখণ্ড পত্রিকা নমুনা স্বরূপ পাঠান হয়। হাতে হাতে নমুনা দেওয়া হয় না।

৫। গ্রাহকগণ অনুরোধ করিয়া পত্র লিখিলে ভি-পিতে পত্রিকা পাঠান হয়। অতিরিক্ত খরচ প্রায় ।৹ চারি আনা লাগে।

৬। ঠিকানা পরিবর্ত্তন করিতে হইলে পূর্ব্ব মাসের ২২শে তারিখের মধ্যে জানাইতে হইবে।

৭। বার্ষিক মূল্য অগ্রিম দেয়।

৮। যিনি পাঁচ জন গ্রাহক সংগ্রহ করিয়া দিবেন তিনি একবৎসর বিনা মূল্যে পত্রিকা পাইবেন।

প্রবন্ধ।

৯। তত্ত্ববোধিনীতে ধর্ম্ম, ইতিহাস, বিজ্ঞান, কৃষি, শিল্প, জীবনী, সমাজ-সমস্যা, সাহিত্য, ভ্রমণ, ব্যবসায়-বাণিজ্য প্রভৃতি সর্ব্বপ্রকার কল্যাণকর ও উন্নতিবিষয়ক প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়।

১০। লেখক যতই নবীন হউন, রচনা প্রকাশোপযোগী হইলেই সাদরে গ্রহণ করা হয়। নবীন লেখকগণের নিকট হইতে আমরা প্রধানতঃ সরল ভাষায় লিখিত বিজ্ঞান (রসায়ন-বিজ্ঞান, পদার্থ-বিজ্ঞান, প্রাণি-বিজ্ঞান ইত্যাদি বিজ্ঞানের সর্ব্ববিধ বিভাগ) এবং অর্থনীতি, শিল্প, বাণিজ্য, সমাজতত্ত্ব ও ভ্রমণসম্বন্ধীয় প্রবন্ধ পাইবার আশা করি।

১১। রচনার সঙ্গেই উপযুক্ত ষ্ট্যাম্প ও নামধাম-যুক্ত খাম দেওয়া থাকিলে রচনা (প্রবন্ধ বা কবিতা) মনোনীত হওয়ার সংবাদ অথবা অমনোনীত হইলে পাণ্ডুলিপি ফেরত দেওয়া যায়। তবে ডাকের গোলযোগে হারাইলে আমরা দায়ী হইব না।

১২। রচনাদি সম্পাদকের নামে পাঠাইতে হইবে।

বিজ্ঞাপন।

১৩। বিজ্ঞাপনদাতাগণ মনে রাখিবেন যে এই পত্রিকা ৮৪ বৎসর চলিতেছে, অথচ ইহার বিজ্ঞাপনের হার সর্ব্বাপেক্ষা সুলভ; এবং এই পত্রিকার এক পৃষ্ঠা অন্য পত্রিকার দুই পৃষ্ঠার সমান।

সাধারণ	১ পৃষ্ঠা	....	১০৲	প্রতিমাসে।
„	½ „	....	৬৲	„
„	⅓ „	....	৪৲	„
„	¼ „	....	২৲	„

কভারের	১ম	পৃষ্ঠার	নিম্নভাগে	......	১০৲
„	২য়	„		......	১৫৲
„	„	„	অর্দ্ধেক	......	৮৲
„	৩য়	„		......	১২৲
„	„	„	অর্দ্ধেক	......	৭৲
„	৪র্থ	„		......	২০৲
„	„	„	অর্দ্ধেক	......	১০৲

১৪। বিজ্ঞাপনের মূল্য অগ্রিম দেয়। যে মাসে মূল্য না পাওয়া যাইবে সে মাসে বিজ্ঞাপন বন্ধ করিয়া দেওয়া হইবে।

১৫। এককালে এক বৎসরের বন্দোবস্ত করিয়া ৬ মাসের মূল্য অগ্রিম দিলে শতকরা ২৫৲ টাকা, ৬ মাসের বন্দোবস্ত করিয়া ৪ মাসের মূল্য দিলে শতকরা ১২৲ টাকা এবং ৩ মাসের বন্দোবস্তে ২ মাসের অগ্রিম দিলে শতকরা ৬৲ টাকা কমিশন দেওয়া হয়।

১৬। পুরাতন বিজ্ঞাপন সম্বন্ধে পূর্ব্ব নিয়ম বলবৎ রহিল।

১৭। এজেণ্ট হইলে টাকায় ।৹ আনা কমিশন পাইবেন।

১৮। মূল্যাদি কার্য্যাধ্যক্ষের নামে এবং বিনিময় ও সমালোচনার পুস্তকাদি সম্পাদকের নামে পাঠাইতে হইবে।

আদিব্রাহ্মসমাজ
৫৫, আপার চিৎপুর রোড
কলিকাতা।

কার্য্যাধ্যক্ষ—
শ্রীসুরেশচন্দ্র সাংখ্যবেদান্ততীর্থ।

একবিংশ কল্প
চতুর্থ ভাগ
আশ্বিন, ব্রাহ্মসম্বৎ ৯৭।
৯১৮ সংখ্যা　　　　১৮৪৮ শক

তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা

"ব্রহ্ম বা একমিদমগ্র আসীন্নান্যৎ কিঞ্চনাসীত্তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রন্নিরবয়বমেকমেবাদ্বিতীয়ম্ সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয়ং সর্ব্ববিৎ সর্ব্বশক্তিমদ্ধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্যসাধনঞ্চ তদুপাসনমেব"।

সম্পাদক—শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর

কলিগতাব্দ ৫০২৭। সম্বৎ ১৯৮৩। খৃঃ ১৯২৬। শক ১৮৪৮। সাল ১৩৩৩।

বন্ধু আমার।

(শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর)

বিচ্ছেদের ভয়ে।

বন্ধু হে! তোমাকে ভালবাসিয়া আমি বড়ই সুখে আছি, বড়ই আনন্দে আছি। কিন্তু অত সুখে আছি বলিয়াই হৌক, বা যে কারণেই হৌক, আমার প্রাণটা সমস্তক্ষণই দুরু দুরু কাঁপে—জানি না কেন, সর্ব্বদাই যেন ভয় হয় যে, কেহ বুঝি তোমা হইতে আমাকে দূরে সরাইয়া ফেলিবে। এই যে জ্যোৎস্নারাতে সমস্ত ধরণী হাসিতেছে, এই যে মলয় বাতাস প্রাণের উপর ঘুমের আবেশ আনিয়া দিতেছে, এই যে পাখীরা গভীর রাত্রে সহসা কি জানি কেন অস্ফুট ধ্বনিতে ডাকিয়া উঠিতেছে, আর, তোমার হাতে হাত দিয়া আমি সেই ধ্বনির মধ্যে অসীমের কি এক সুর শুনিয়া আনন্দে যে বিহ্বল হইতেছি—মনে হইতেছে, আমি যেন তোমার নিকট হইতে নিকটতম হইয়া পড়িয়াছি—ভয় হয়, কে যেন তোমার আর আমার মাঝে বিচ্ছেদের আগুন জ্বালাইবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিতেছে, মরণের বাতাস আনিয়া আমাদের এত প্রেম এত ভালবাসা ছিন্নভিন্ন করিবার উদ্যোগ করিতেছে। দেখো বন্ধু! দেখো—যদি কখনও মরণ আমাকে তোমা হইতে দূরে সরাইয়া রাখিতে চায়, দেখো, তুমি তখন তোমার ঐ করুণ দৃষ্টিতে আমার দিকে চাহিয়া আমাকে তোমার কাছে ডাকিয়া লইও; তোমার সবল হাত আমার দিকে বিস্তারিত করিয়া দিও এবং আমাকে মরণের হাত হইতে তুলিয়া ধরিও। মরণ যবে আমায় ঘিরিয়া ফেলিবে, তখন বন্ধু হে! তোমার এই বন্ধুকে জীবন দিয়া বন্ধুতার পরিচয় দিও। আমায় তুমি সাহস দাও—আমার প্রাণের এই কাঁপুনি দূর হউক।

দুই সখা।

বন্ধু আমার! আমি যখন কর্ম্মক্ষেত্রের দারুণ পরিশ্রমের পর গৃহে ফিরিয়া আসি, তখন তোমায় দেখিবার জন্য প্রাণটা বড়ই ব্যাকুল হইয়া উঠে। কর্ম্মক্ষেত্রে গিয়া যখন কর্ম্মের মধ্যে ডুবিয়া থাকি, তখন অনেক সময়েই তোমাকে মনে আনিতে পারি না। কেবল মধ্যে মধ্যে তোমার প্রসন্ন মুখের হাসি প্রাণের মধ্যে জাগিয়া উঠিয়া কঠোর পরিশ্রমের ভিতরেও শান্তি আনয়ন করে, আর শরীরে ও মনে নববলের সঞ্চার করে। কিন্তু গৃহে ফিরিয়া আসিলে আর এক মুহূর্ত্তও তোমাকে ছাড়িয়া আমার প্রাণ তিষ্ঠিতে চায় না। তখন তুমি এক মুহূর্ত্তেরও জন্য চক্ষের আড়ালে থাকিলে প্রাণের মধ্যে ব্যাকুলতার হাহুতাশের ঝড় বহিয়া যায়। তখন ইচ্ছা হয়, সমস্তক্ষণ তোমার হাতে হাত দিয়া, তোমার বুকে মাথা রাখিয়া প্রেমিকযুগল সাজিয়া বসিয়া থাকি, আর ঐ মহাশূন্যের প্রতি প্রেমভরা দৃষ্টিতে সমস্তক্ষণ চাহিয়া থাকি—দেখি—কত বিহগ-বিহগী আনন্দমনে কলতান করিতে করিতে হাল্কা

বাতাসের উপর ভর করিয়া উড়িয়া চলিয়াছে; দেখি, কত কীটপতঙ্গ পদতলে ধরণীতে তৃণ হইতে তৃণান্তরে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে; দেখি, কত বিচিত্র বর্ণের প্রজাপতি ফুল হইতে ফুলে পরাগে মাখামাখি হইয়া আমাদের গায়ের উপর বসিতেছে। কোথাও যদি কোন পাখী ডাকিয়া উঠে, মনে হয়, তোমারই মধুর ডাক শুনিয়া বুঝি সে সাড়া দিতেছে। বন্ধু! এইটুকু আমার প্রতি দয়া কর, গৃহে ফিরিলে যেন তোমার নিত্য দর্শন পাই—এক মুহূর্ত্তও আমার চক্ষের আড়ালে থাকিও না। আমরা দুইজনে একসঙ্গে বসিয়া পরস্পর পরস্পরের মন হরণ করিবার খেলা খেলিব—দেখিব, কে হারে আর কে-ই বা জয়লাভ করে। অপর কাহাকেও শুনাইবার জন্য আমার কথা আর রাখি নাই—আমি বলিব, তুমি শুনিবে; তুমি বলিবে, আমি শুনিব। আমার কথা, আমি জানি, একমাত্র তোমারই ভাল লাগিবে। অন্য লোকে আমার কথা শুনিয়া দুই মুহূর্ত্তের জন্য ভাল বলিবে বা নিন্দা করিবে বা উপহাস করিবে,—আমার তাহাতে কিছুমাত্র আসিয়া যায় না। তুমি যদি আমার কথা, আমার কার্য্য ভাল বল, তাহা হইলেই বন্ধু! আমার—কি বলিব তোমায়—আমার সকলই সার্থক, আমার অনন্ত জীবন সার্থক। এইটুকু আমার মনে শক্তি দাও—যেন, তোমার নিকটে আমার লজ্জাসরম কিছুই না থাকে; এমন কোনই কাজ না করি, যাহা তোমার নিকটে বলিতে গিয়া দুই মুহূর্ত্ত থমকিয়া দাঁড়াইতে হয়। তুমি আমাকে এইটুকু আশ্বাস দিয়া বল যে, তুমি আমার তনমনধন সকলই স্নেহহস্তে গ্রহণ করিয়াছ। বল একবার হৃদয়বন্ধু! এবং আমাকেও প্রাণ খুলিয়া বলিতে দাও—তুমি আমার, আমি তোমার—তুমি আমার, আমি তোমার।

শান্তিপ্রার্থনা।

বন্ধু! যেখানেই যাই, যে অবস্থায় থাকি, তোমারই প্রসন্নমুখের হাসি সর্ব্বদাই প্রাণের ভিতর জাগিয়ে থাকে। আহারে-বিহারে তোমারই মুখ জাগিয়া উঠে। আমার চক্ষু হইতে তুমি নিদ্রা কাড়িয়া লইয়াছ। দিনরাত—দিনরাত—তোমাকে ছাড়িয়া আমি এক মুহূর্ত্তও থাকিতে পারি না। তোমার আদেশে দিবসে যখন কর্ম্মের ঘূর্ণার মধ্যে পড়িয়া হাবুডুবু খাই, তখন তোমার ঐ মুখ, তোমার ঐ নয়ন সমস্তক্ষণ আমার সম্মুখে দাঁড়াইয়া আমাকে উৎসাহিত করে; নিমেষের মধ্যে আমার শ্রান্তি ক্লান্তি কোথায় অন্তর্হিত হইয়া যায়। নিরাশা নিরানন্দ প্রভৃতি সপ্তরথী আমাকে যখন ঘিরিয়া ফেলে এবং আমাকে যাঁতায় পিষিয়া ফেলিবার চেষ্টা করে, তখন তো দেখি, তুমি নিজেই কোথা হইতে আসিয়া আমার পার্শ্বে দাঁড়াইয়াছ। তখন দেখি, তোমার এক এক হুঙ্কারে সেই সমস্ত মহাবল শত্রুরাও সহসা কোথায় অদৃশ্য হইয়া যায়। তখন তোমার উৎসাহবাণীতে উৎসাহিত হইয়া আমি সবলে শত্রুপক্ষের পরাজয়সাধনে সক্ষম হই। বন্ধু! তোমারই আদেশে আমি দিবসে কর্ম্মক্ষেত্রে যাই, কর্ম্ম করিতে করিতে শতবিধ প্রকারে কর্দ্দমাক্ত হই। তোমাকে সে বিষয়ে কতই বলি, কতই অনুযোগ করি; কিন্তু তুমি তো সে সকল প্রাণের মধ্যে গ্রহণ করিতেই চাও না। যাই হৌক, তোমারই আদেশে যখন কর্ম্মে নামিয়া কর্দ্দমাক্ত হইয়া গৃহে ফিরিয়া আসি, তখন দেখো, হে-বন্ধু! আমাকে অপরিচিতের ন্যায় গৃহদ্বার হইতে সরাইয়া দিও না; তখন তোমার পূর্ণ কলস হইতে একটুখানি শান্তিজল দিয়া আমাকে শ্রান্তিক্লান্তি এবং সর্ব্বাঙ্গ হইতে কর্দ্দমধারা দূর করিবার অবসর প্রদান করিও। আমার এই প্রতিজ্ঞা—তুমি আমাকে শতবার বিদূরিত করিলেও আমি তোমার ঐ চরণ ধরিয়া পড়িয়া থাকিব। বিদূরিত করিবার কথা বলিতেছি কেন? তুমি কি তোমার এই সর্ব্বস্বহারাণো বন্ধুকে ক্ষণেকের জন্যও তোমার চক্ষের অন্তরালে রাখিতে পার? আমার ভালবাসায় আর তোমার ভালবাসায়,—আমরা দুইজনে যে সম্পূর্ণ এক হইয়া গিয়াছি—মাঝে তো আর কোনই ব্যবধান নাই! সংসারে অনেক কাল তোমার কার্য্যই করিতেছি ভাবিয়া অনেক বৃথা কার্য্যেই ঘুরিয়া মরিয়াছি। সেই কার্য্যসূত্রে, বালক-বালিকারা যেমন সিন্ধুসৈকতের উপর হইতে ঝিনুক শামুক কুড়াইয়া আনন্দে অধীর হইয়া উঠে, সেইরূপ আমিও আনন্দে অধীর মনে রাশি রাশি ইটপাথর সংগ্রহ করিয়া রাখিয়া আসিয়াছি। সংসারে যাহার ইচ্ছা, সেই সমস্ত

ইটপাথর লইয়া খেলা করুক ; আমার আর সে খেলা করিবার সময় নাই। এখন আমার যাহা কিছু খেলা, তাহা তোমারই সঙ্গে। তুমি হইতেছ শান্তিসমুদ্র। আমি অবাক হইয়া যাই—চারিদিক হইতেই তো অশান্তির ধ্বনি তোমার কানে গিয়া প্রতিমুহুর্ত্তেই পৌঁছিতেছে ; তাহার মধ্যে তুমি কি প্রকারে তোমার সুগম্ভীর শান্তি রক্ষা কর ? বন্ধু ! আমাকে তোমার ঐ শান্তির একবিন্দু দাও, আমার হৃদয় হইতে সমস্ত অশান্তি দূর হৌক, আমার চিত্ত শান্ত হউক।

বিরহের ফলে।

বন্ধু ! মুহূর্ত্তের জন্য তোমাকে হারাইয়া, তোমাকে দেখিতে না পাইয়া জীবনে যে কি অশান্তি ভোগ করিয়াছি, তাহা তুমি যদি অন্তরে অনুভব না করিয়া থাক, তবে তোমাকে তাহা কি প্রকারে জানাইব, তাহা জানি না। এসো—বন্ধু—তুমি আসিয়াছ—আমার সকল অশান্তি বিদূরিত হইয়াছে। একবার তুমি তোমার প্রাণভরা গাঢ় আলিঙ্গন আমাকে দাও, আর সুখের সাগরে আমাকে ডুবাইয়া দাও। চন্দ্রসূর্য্য গ্রহনক্ষত্র, সকলেরই সুখের মধ্যে আমি যেন ডুবিতে পারি ; বাতাস করুণ সুরে তোমার যে নামগান করে, তাহারও মধ্যে যেন আমি ডুবিতে পারি। আহার-বিহার শয়নজাগরণ, সকলের ভিতর তোমাকে নিকটে পাইয়া যেন নিরাবিল সুখের মধ্যে ডুবিয়া যাই। আমি আর আপনার ভিতরে আপনি লুকাইয়া থাকিতে চাহি না। আমি চাই—তোমার ভিতরের ভিতরে মিশিয়া যাইতে। আমি চাই—আমার ভিতরের ভিতরে তোমাকে লুকাইয়া রাখিতে। তোমাকে হারাইয়া কত স্থানেই যে ঘুরিলাম, কোথাও তো সুখ পাইলাম না, শান্তি পাইলাম না—প্রাণের মধ্যে জ্বালাযন্ত্রণা বাড়িতেই লাগিল। আজ শেষে তোমাকে পাইয়া, তবে আমার সেই অশান্তি, প্রাণের উদ্বেগ দূর হইল ; প্রাণের মধ্যে নবজীবনের সঞ্চার হইল, নববসন্তের বাতাস বহিল। তোমাকে মুহূর্ত্তের জন্য হারাইয়া একরকম ভালই হইয়াছে—তুমি আমার কি প্রকার বন্ধু, তাহা আমি চিনিতে পারিয়াছি। তোমার জন্য আমার প্রাণের ভালবাসার গভীরতা বুঝিয়াছি। আমার জন্যও তোমার গভীর ভালবাসা বুঝিতে পারিয়াছি। আগে ভাবিতাম, তোমার কত—কত বন্ধু আছে ; আমি তোমার উপেক্ষার বস্তু—আমি দূরে সরিয়া গেলে, কোন্ অকূলে ভাসিয়া গেলে তোমার বড় কিছু আসিয়া যায় না। এখন বুঝিয়াছি, আমি ভুল বুঝিয়াছিলাম ; এখন দেখিতেছি, তুমি যেখানেই থাক, যে কর্ম্মযজ্ঞেরই অনুষ্ঠান কর, তোমার প্রাণটা আমার দিকেই পড়িয়া থাকে। আমি যখন দুঃখের অন্ধকারে ডুবিয়া যাই, তখন সহসা কোথা হইতে তোমার মুখের জ্যোতি আমার প্রাণে আসিয়া পড়ে, আর সমস্ত অন্ধকার ছিন্নবিচ্ছিন্ন হইয়া যায়। আর আমি সুখের আশা করি না—সুখ দাও, ভালই ; না দাও, তাহাও ভাল। আমি কেবল চাই এখন তোমাকে লইয়া দুই দণ্ড নির্জ্জনে বসিতে, নির্জ্জনে ঘুরিতে, নির্জ্জনে বিনা ভাষায় মুখোমুখি চাহিয়া আলাপ করিতে। কত জন্ম ধরিয়া জানি না, ভালবাসা মনে করিয়া মায়া-মরীচিকার পশ্চাতে পশ্চাতে ছুটিয়া বেড়াইয়াছি। আজ আমার সে ভুল ভাঙ্গিয়া গিয়াছে—আজ আমি তোমার সত্য ভালবাসা পাইয়াছি ; আর মনে হয়, আমিও তোমাকে আমার ক্ষুদ্র হৃদয়ের হইলেও সত্য ভালবাসা অন্তত এতটুকু দিতে পারিয়াছি। আজ তোমার শরণ লইবার অধিকার লাভ করিয়াছি ; আজ আমি অকূলের কূলের সন্ধান পাইয়াছি। আজ আমি সর্ব্বত্র তোমারই সুরভি নিশ্বাস অনুভব করিতেছি, সর্ব্বত্র তোমারই মধুর বাণী শ্রবণ করিতেছি।

কর্ম্মক্ষেত্রের সঙ্গী।

বন্ধু ! কর্ম্মক্ষেত্রে যাইতে হইবে। তোমার আদেশ ! তুমিও যাইবে কর্ম্মক্ষেত্রে। বড় কষ্ট—বড় কষ্ট—হৃদয় অশান্তিতে ভরিয়া যাইতেছে। কর্ম্ম করিবার সময় তোমাকে যে অনেক সময় মনে পড়ে না—সেইটাই আমার বড় কষ্ট ; যখনই মনে পড়ে, তোমার কথা ভুলিয়া গিয়াছি, তখন মনটা ভয়ে ত্রাসে কম্পিত হইয়া উঠে, দুঃখে ঘৃণায় ও লজ্জায় হৃদয় ম্রিয়মাণ হইয়া উঠে। না—বন্ধু—না—তোমাকে মুহূর্ত্তেরও জন্য বিদায় দিতে পারিব না। আমারই সঙ্গে তুমি চল ; আমি যেখানে কর্ম্ম

করিব, তুমিও সেইখানে আমার চোখে-চোখে থাকিয়া কর্ম্মক্ষেত্র খুলিয়া দিও, আর তোমার সেই ক্ষেত্রে আমিও কর্ম্ম করিব—কি করিতে হইবে না-হইবে তাহা আমাকে তুমি দেখাইয়া দিও। সংসারের জ্বালাযন্ত্রণায় আমার প্রাণ তো ইতিপূর্ব্বে খালি হইয়া গিয়াছিল। তোমার কাছে আসিয়াছিলাম—তোমার প্রেমসুধায় সেই প্রাণ ভরিয়া লইবার জন্য। এখন যদি আমায় তোমাকে বিদায় দিতে হয়, তবে তো সেই খালি প্রাণ বিষাদে পুড়িয়া খাক হইয়া যাইবে। প্রাণের ভিতর হইতে কাতর সুরের যে গান বাহির হইবে, বন্ধু! তোমার কি তাহাই এত ভাল এত মিষ্ট লাগে? তাই কি তুমি বিদায়ের কথা বলিয়া আমার প্রাণের সমস্ত আনন্দ মুহূর্ত্তের মধ্যে মিলাইয়া দিতে চাও? সমস্ত সংসার ঘুরিয়া দেখিয়াছি—বৃথা ঘুরিয়া মরিয়াছি—হে আমার প্রাণের বন্ধু!—যাহার হাতে আমার সমস্ত প্রাণটা নিঃসঙ্কোচে দিয়া নিশ্চিন্ত হইতে পারি, এমন বন্ধু তো দেখিলাম না। সহসা তোমার সঙ্গে কি শুভ মুহূর্ত্তে দেখা হইল, আর আমার প্রাণের সমস্ত জ্বালা যেন মুহূর্ত্তের মধ্যে জুড়াইয়া গেল! মুহূর্ত্তের মধ্যেই বুঝিলাম, তুমি আমাকে ধরিবার জন্য কত না যত্ন ও চেষ্টা পাইয়াছ, কত স্থানে কত প্রত্যাখ্যানই না সহ্য করিয়াছ, কিন্তু ধরিবার আশা কখনও পরিত্যাগ কর নাই; আমিও যেন তোমাকেই কত দেশদেশান্তরে কত যুগযুগান্তর ধরিয়া খুঁজিতেছিলাম; কতবার তোমাকে পাইয়াছি-পাইয়াছি মনে হইলেও পাই নাই। শেষে যে দিন সংসারের কাঁটার আঘাতে দেহ মন ক্ষতবিক্ষত হইয়া গেল, তোমার চরণে দাঁড়াইবার জন্য প্রাণটা যখন ফুকারিয়া কাঁদিয়া উঠিল, তখনই দেখি, তুমি আমার গায়ের কাছে দাঁড়াইয়া আছ; তখনই বুঝিলাম, আমিও যেমন তোমার প্রেমে ধরা পড়িয়াছি, তুমিও তেমনি আমার প্রেমে ধরা পড়িয়াছ। আমি তো অকূল সাগরে এই শীর্ণ দেহের জীর্ণ তরী ভাসাইয়া দিয়াছি—তোমাকেই সেই জীর্ণতরীর কর্ণধার করিয়া বেশ নির্ভয় হইয়া আছি। আর আমার কাছে তুমি বিদায় চাহিও না, আমিও যেন এক মুহূর্ত্ত তোমাকে ছাড়িয়া না থাকি। সংসারের কাণ্ডকারখানা দেখিয়া প্রাণের ভিতর সর্ব্বদাই ভয় হয়, পাছে ছাড়াছাড়ি হইলে পরস্পরের মধ্যে ব্যবধানটা ক্রমেই বাড়িয়া যায়। এখন বন্ধু! সংসার হইতে আমি মুছিয়া গেলেও কাহারও প্রাণেই আর ব্যথা লাগিবে না—তাহারা আমাকে ভুলিয়া গিয়াছে; যাহারা ভুলিয়া যায় নাই, তাহারাও কালক্রমে ভুলিয়া যাইবে। নববসন্তের নূতন বাতাস যখন তাহাদের গায়ে আবার লাগিবে, তখন তাহারা আবার হাসিবে, আবার তাহারা নূতন নূতন গান গাহিতে থাকিবে। হয়তো মধ্যে মধ্যে তাহাদের সেই আনন্দের মধ্যে আমার কথা বিষন্নছায়ার মত আসিয়া দাঁড়াইবে এবং তাহারা তৎক্ষণাৎ মন হইতে তাহা ঝাড়িয়া ফেলিবার চেষ্টা করিবে। কিন্তু—তুমি—বন্ধু—তুমি—বহুকাল তোমাকে আমি ভুলিয়া থাকিলেও তুমি আমার চিরন্তন বন্ধু! আমার সুখ, আমার দুঃখ—এ সমস্তই যেন তুমি তোমার বলিয়াই অনুভব কর। বন্ধু! তুমি আমার নিত্যসাথী—তুমি আমার চিরসঙ্গী।

আশ্বাস বাণী।

বন্ধু! আজি তুমি আমার প্রাণের কথা শুনিয়াছ। আজ তুমি আমায় কি মধুর আশ্বাসবাণী শুনাইলে যে, তুমি আমাকে আর চক্ষের আড়াল হইতে দিবে না! আজ আমার মহা আনন্দ। আজ মলয় বাতাস কত গাহিতেছে গান। আজ চারিদিক হইতে শত সুরভি ফুলের সুবাস আমার ভরিয়া দিতেছে প্রাণ। সমস্ত জীবন ভরিয়া যৌবনের পুলক উঠিছে জাগিয়া। বন্ধু! তুমি এই ঘনচ্ছায় বৃক্ষতলে, এই সুরভিত বীথিকায় আমাকে একবার গাঢ় আলিঙ্গন দাও। তোমার সেই আলিঙ্গন আমার অন্তরে চিরমুদ্রিত হইয়া থাকিবে। তোমার সেই নিশ্বাস আমার অনন্ত জীবনের পাথেয় হইবে। চাঁদের জ্যোৎস্না যখন ধরাপৃষ্ঠ ধবলিত করিবে, তখন আমি সেই জ্যোৎস্নার ভিতরে ডুবিয়া থাকিব, আর আমার মুখের উপর তোমার সেই নিষ্কলঙ্ক মুখের জ্যোৎস্না অনুভব করিব। তটিনী-সৈকতে বসিয়া যখন দেখিব, সে কুলুকুলু ধ্বনিতে কি গান গাহিয়া কোন্ সাগরপানে বহিয়া চলিয়াছে, তখন সেই ধ্বনির ভিতরে তোমারই অতি মৃদুলমধুর বাণী শুনিতে থাকিব। প্রাণে যখন বড়ই অশান্তি আসিবে, তখন তোমার ঐ গাঢ় আলিঙ্গনের স্মৃতি

প্রাণের মাঝে শান্তিধারা বর্ষণ করিবে। বন্ধু! আমি যখন আমার এই দুইটী ক্ষুদ্র বাহু বাড়াইয়া তোমাকে কাতর হৃদয়ে আহ্বান করিব, তখন যেন অন্য কোথাও থাকিও না; তখন তুমিও তোমার ঐ দুই বরাভয়প্রদ বাহু দ্বারা আমাকে জড়াইয়া ধরিয়া আমাকে ভয়ত্রাস হইতে মুক্ত করিও। আমার প্রেম যখন তোমার দিকে ছুটিয়া যাইবে, তখন আমার সেই প্রেমকে ব্যর্থ করিও না; তোমারও প্রেমের ধারা নামাইয়া আমাকে কুসুম-কোমল বজ্রকঠিন বাঁধনে বাঁধিয়া ফেলিও।

আজ আমার কাছে সকলই সুন্দর, সকলই মধুময়। আমার ভাগ্যে তোমার যে বিরহ ঘটিয়াছিল, তাহাও আজ আমার মধুর মনে হইতেছে—সেই বিরহেরই ফলে আজ তোমার সঙ্গে আমার মিলন লাভ ঘটিয়াছে। আজ বন্ধু! আমি যেমন তোমাকে আমার কাছে পাইয়া আনন্দে কি যে হইতেছি তাহা বলিতে পারি না, তেমনি তুমিও ঠিক করিয়া বল দিকিন, তুমিও আমাকে সম্পূর্ণভাবে পাইয়া মহা আনন্দে আনন্দিত হইতেছ কি না? তোমার ও আমার মধ্যে আজ যে প্রেমের বন্ধন পড়িল, সে বন্ধনের আর শেষ নাই। মনে হইতেছে, যেন কত অনাদিকাল পূর্ব্বে তোমার সঙ্গে আমার এই বন্ধন ছিল—তাহাই যেন আজ নবীন ভাবে আমার প্রাণে মুকুলিত হইয়া উঠিল।

আজ আমাদের এই মিলনের সাক্ষী তোমারই এই চন্দ্র, তোমারই এই গ্রহতারকা। আমাদের এই মিলনের কাহিনী আজ দিকে দিকে ঘোষণা করিবার জন্য তোমারই এই মলয়বায়ু ছুটিয়া চলিয়াছে এবং তাহারই আনন্দে আজ এই কাননের নানা স্থান হইতে কোকিলেরাও কুহুতান তুলিয়াছে; ঝিঁঝি পোকারা এক অপূর্ব্ব বাঁশীর সঙ্গত বসাইয়া দিয়াছে। আজিকার এই মিলনে আমার এত আনন্দ হইতেছে যে, আমার উহাকে সম্পূর্ণ সত্য বলিয়া বিশ্বাস করিতে ভয় হইতেছে। মাঝে মাঝে থমকিয়া দাঁড়াইয়া ভাবি—বুঝি বা ইহা স্বপ্ন—আমার মনেরই বা ভ্রম! না—না—তাহা ভাবিবার আর অবসর নাই—তোমার ঐ আলিঙ্গনের স্মৃতি তখনই আসিয়া প্রাণে সবল আঘাত করে, আর আমার সমস্ত ভুল ভাঙ্গিয়া যায়, বিষাদ দূরে পলায়ন করে। বন্ধু! আর আমি নিজের ভাবনা ভাবিব না—আমার যাহা আবশ্যক, তাহা তোমাকে বলিব মাত্র। তুমি আমার যাহা ভাল বুঝিবে, তাহাই দিও। আমার দেহমন সমস্তই তোমারই হস্তে সমর্পণ করিলাম। তুমি আমাকে যে দিকে চলিতে, যে কার্য্য করিতে আদেশ করিবে, আমি সেই পথে চলিব, সেই কাজই করিব। আমি পূর্ব্বপুরুষদিগের নিকট শুনিয়া আসিয়াছি যে, তোমার উপর জীবনের ভার দিলে নাকি নিশ্চিন্ত হওয়া যায়, শান্তি পাওয়া যায়; তুমিই নাকি তাহার সমস্ত সংসারভার বহন কর। বন্ধু! আমি ঐ শান্তি পাইবার জন্য, ঐ নিশ্চিন্ত হইবার জন্য একনিষ্ঠ হৃদয়ে তোমারই শরণ লইলাম—তুমিই আমার সংসারের যোগক্ষেম বহন করিয়া আমাকে শান্তি দাও—তোমার বুকে মাথা দিয়া এই সুবিমল নিশীথে এই সুরভিত স্থানে প্রশান্ত হৃদয়ে একটুখানি ঘুমাইতে দাও। "তেষাং অনন্যযুক্তানাং যোগক্ষেমং বহাম্যহং" তোমারই এই সবল মধুর বাণী আমার নিকট সম্পূর্ণ সফল হোক।

ওঁ ব্রহ্মার্পণমস্তু।

ভট্টনারায়ণ প্রভৃতির বঙ্গে আগমনের কারণ।

(শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর)

আমাদের সিদ্ধান্ত আমরা ইতিপূর্ব্বেই বলিয়া আসিয়াছি যে, ভট্টনারায়ণপ্রমুখ পঞ্চব্রাহ্মণ ৯৯৯ সম্বতে বঙ্গদেশে শুভ পদার্পণ করিয়াছিলেন। তাঁহাদের আগমনকাল লইয়াও যেমন নানা মতভেদ দেখা যায়, সেইরূপ তাঁহাদের আগমনের কারণ লইয়াও মতভেদ আছে।

১০। বাজপেয় যজ্ঞ?

পণ্ডিতপ্রবর শ্রীযুক্ত দুর্গাদাস লাহিড়ি মহাশয় তাঁহার "ভারতবর্ষ" গ্রন্থে বলেন যে, দুর্গামঙ্গলের মতে অনাবৃষ্টিনিবারণকল্পে 'বাজপেয়' যজ্ঞ সম্পাদনার্থ পঞ্চব্রাহ্মণ আনীত হন (১)। আমরা কিন্তু সাহিত্যপরিষৎ হইতে প্রকাশিত দুর্গামঙ্গল গ্রন্থে এবিষয়ে কোন কথাই দেখিতে পাই নাই। মৃত্যু-

(১) পৃথিবীর ইতিহাস—ভারতবর্ষ ৭ম খণ্ড—২৪৫পৃঃ পাদটীক।

গুয় শর্ম্মার রাজাবলী গ্রন্থেও এই কারণই উল্লিখিত হইয়াছে (১)। রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণের আদিবংশ লেখক ও কুলশাস্ত্রে সুপণ্ডিত ৺শ্রীনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় তাঁহার পুস্তিকাতে বলেন যে "জনশ্রুতি এই যে, 'আদিশূরনামে বঙ্গদেশে রাজা ছিল। অনাবৃষ্টিহেতু পঞ্চব্রাহ্মণ আনিল'।" (২) কিন্তু আমরা কোনও বিশ্বাসযোগ্য কুলগ্রন্থে এই কারণের উল্লেখ দেখি না। আর যদি বা সেরূপ কোন ঘটনা ঘটিয়াও থাকে, তাহাও আদিশূরের সময়ে হইয়াছিল বলিয়া আমাদের বিশ্বাস হয় না। জনশ্রুতিমূলক উপরোক্ত কারিকাতেও কোন্ পঞ্চব্রাহ্মণ আসিয়াছিলেন, তাহার কোন সন্ধান পাওয়া যায় না। সম্ভবতঃ আদিশূরের পিতৃপিতামহ কাহারও কর্ত্তৃক অনাবৃষ্টিনিবারণকল্পে কোন যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হইয়াছিল এবং সেই কারণে কোনও পঞ্চব্রাহ্মণ আনীত হইয়াছিলেন। সম্ভবতঃ সেই কথাই উক্ত কারিকাতে ধ্বনিত হইয়াছে।

২১। প্রাসাদে গৃধ্রপতন?

ক্ষিতীশবংশাবলীচরিতং গ্রন্থে উক্ত হইয়াছে যে, "আদিশূরের প্রাসাদের উপর এক গৃধ্র পড়িয়াছিল। রাজা ভাবী অমঙ্গল আশঙ্কা করিয়া স্বদেশের পণ্ডিতদিগকে এক সভায় আহ্বান করিয়া অমঙ্গলশান্তির উপায় জিজ্ঞাসা করিলেন। পণ্ডিতেরা সেই গৃধ্রকে ধরিয়া তাহারই মাংসে হোম করাই একমাত্র উপায় নির্দ্ধারণ করিলেন। তখন রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন—সেই গৃধ্রকে ধরিবার উপায় কি? সভাস্থ পণ্ডিতগণ সকলেই নিরুত্তর। সভাস্থ এক ব্রাহ্মণ অনতিপূর্ব্বেই কান্যকুব্জ হইতে ফিরিয়া আসিয়াছিলেন। তিনিই সভার নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া নিবেদন করিলেন—"মহারাজ, আমি তীর্থযাত্রা উপলক্ষে কান্যকুব্জ গিয়াছিলাম। সেখানেও রাজবাটীতে এক গৃধ্র পড়িয়াছিল। কান্যকুব্জরাজ ভট্টনারায়ণ প্রভৃতি ব্রাহ্মণদিগকে আনাইয়া তাঁহাদের দ্বারা সেই গৃধ্রকে মন্ত্রবলে ধরাইয়া তাহারই মাংসে হোম করাইয়াছিলেন, ইহা আমি প্রত্যক্ষ করিয়াছি। আপনিও সেই ভট্টপ্রভৃতি ব্রাহ্মণদিগকে আনাইয়া সেই কার্য্য করান।" ইহা শুনিয়া আদিশূর সেই ব্রাহ্মণের সঙ্গে দূত পাঠাইয়া ভট্টনারায়ণ, দক্ষ, শ্রীহর্ষ, ছান্দড় ও বেদগর্ভ নামক সাগ্নিক পঞ্চব্রাহ্মণকে সপত্নীক ও যজ্ঞোপকরণসহ এদেশে আনাইয়া পূর্ব্বাবধি রচিত স্থানে বহুমানপুরঃসর বাস করাইয়াছিলেন (৩)।

২২। আখ্যায়িকাসম্বন্ধে মন্তব্য।

এই আখ্যায়িকা হইতে দেখা যায় যে, ভারতের দেশ হইতে দেশান্তরে ব্রাহ্মণাদির অবাধ যাতায়াত বন্ধ ছিল না। গৃহের উপরে গৃধ্রপতন এখনকার মত তখনও গুরুতর অমঙ্গলের কারণ বলিয়া বিবেচিত হইত দেখা যায়। এই আখ্যায়িকাতেই তো দেখা যায় যে, কান্যকুব্জরাজসম্বন্ধেও গৃধ্রপতনের এক আখ্যায়িকা সংযুক্ত করা হইয়াছে। আবার ১০০১ শকে বা ১১৩৬ সম্বতে আর একদল পঞ্চগোত্রের পঞ্চব্রাহ্মণ আনয়নের কারণস্বরূপে সম্ভবত বঙ্গদেশের বা বারেন্দ্রভূমির কোন এক অংশের অধিপতি শ্যামল বর্ম্মার সঙ্গে গৃধ্রপতনের এইরূপ একটী আখ্যায়িকা সংযুক্ত করা হইয়াছে (৪)। ইতিপূর্ব্বে আমরা ইঙ্গিত করিয়া আসিয়াছি যে, সম্বত দশম শতাব্দীর মাঝামাঝি আদিশূর সম্ভবতঃ রাজসূয়সদৃশ কোন যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়া থাকিবেন। আমাদের অনুমান হয় যে, গৃধ্রপতন জন্য যদি বা কোন যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে, তবে তাহা ঐ বৃহত্তর যজ্ঞানুষ্ঠান উপলক্ষে আনীত পঞ্চব্রাহ্মণের দ্বারা উহার পূর্ব্বেই গৃধ্রপতনজন্য যজ্ঞকার্য্য শেষ করা হইয়াছিল। আমাদের কিন্তু মনে হয় যে গৃধ্র-

(২) রা০ ব্রা০ পৃঃ ৭

(৩) ক্ষিতীশবংশাবলীচরিতং — পৃঃ ১-২

(৪) * * * গৌড়েশ্বরঃ শ্যামলবর্ম্মসংজ্ঞঃ ॥ * * *
ততঃ কদাচিন্নিজসৌধভাগে প্রপাতিগৃধ্রাদতিবিগ্নমানসঃ।
স কারয়ামাস বিবিধপ্রকারৈঃ শান্তিং সুবিদ্বৈপ্রবরৈর্গৌড়সংস্থৈঃ ॥
তথৈবশান্ত্যা ন হি শান্তিরাসীদুপপ্লবা ঘোরতরা বভূবুঃ।
দৃষ্ট্বা তদাতঙ্কিতহৃৎ প্রিয়য়াচক্ষিবান্ সর্ব্বমসত্যাকষ্টঃ ॥
সোবাচ রাজ্ঞে পিতৃসন্নিধানাৎ ক্ষিপ্রং দ্বিজং সাগ্নিকমানয় ত্বং।
যতো ন শান্তির্হ্যবান্নরগ্নিবিদ্বৈঃ কৃতা সৈব ভবেৎ প্রশস্তা ॥
ততঃ স রাজা হিতবীক্ষমাণো গত্বা তয়া তৎ শ্বশুরে নিবেদ্য।
সংবৎসরং তৎপিতৃতুষ্টিহেতোঃ নিবাসয়ামাস দ্বিজং হি লিপ্সুঃ ॥
তস্য ব্রতস্থাপনোৎসবায় বিধিং বিধিজ্ঞঃ পরিমার্জনায়।
আদেশয়ামাস সভামভিজ্ঞং সুবিপ্রপূজ্যং শ্রুতিপাঠশীলং ॥
* * যশোধরং শৌনকগোত্রসম্ভবং ॥
* * * *
শাকেন্দুনে শূন্যাবিধৌ শকাব্দে বৈশাখমাসস্য সিতে দশম্যাং।
প্রহর্ষিতস্তেন নৃপেণ সার্দ্ধং যশোধরঃ শৌনকগোত্রসম্ভবঃ ॥
পাঠান্তর—যশোধরঃ কুন্তকদেশমাগতঃ। স০ নি০ ২৩৩ পৃঃ
সামন্ত চূড়ামণি মুখনির্গত তাম্রশাসনস্থ শ্লোক— স০ নি০ ৫০ পৃঃ

পতনের জন্য কোন যজ্ঞই অনুষ্ঠিত হয় নাই। সম্ভবত কান্যকুব্জরাজ ঐরূপ একটা যজ্ঞ করিয়াছিলেন; তাঁহার সঙ্গে সমকক্ষতা দেখাইবার জনাই ঐরূপ একটা যজ্ঞানুষ্ঠান আদিশূরের স্কন্ধে চাপাইয়া দেওয়া হইল; আবার পরে তাঁহার সঙ্গেও সমকক্ষতা দেখাইবার জন্য অন্যতর রাজা শ্যামলবর্ম্মার পারিষদগণ তাঁহারও স্কন্ধে ঐরূপ একটা যজ্ঞানুষ্ঠান চাপাইতে বিরত হইলেন না। আমাদের এরূপ অনুমান করিবার কারণ এই যে, কোনও প্রামাণিক কুলগ্রন্থে আমরা এই আখ্যায়িকা উল্লিখিত দেখি না।

১০। ভগবৎপ্রীতি ?

দুই একটী কুলগ্রন্থে দেখি যে, ভগবৎপ্রীতি সাধনের ইচ্ছায় আদিশূর একবার যজ্ঞ অনুষ্ঠানের ইচ্ছা প্রকাশ করিলে তাঁহার সভাস্থ পণ্ডিতেরা তৎসাধনে অক্ষমতা প্রকাশ করিলেন। তখন আদিশূর শ্বশুর বীরসিংহের নিকট হইতে পঞ্চব্রাহ্মণ আনাইয়া লয়েন (৫)। এই ঘটনা যদি সত্যই ঘটিয়া থাকে, তবে তাহাও সম্ভবত সম্ভত দশম শতাব্দীর মাঝামাঝি অনুষ্ঠিত কোন বিরাট যজ্ঞানুষ্ঠানের সমসময়েই ঘটিয়া থাকিবে—সে সময়ে আদিশূর গৌড় জয় করিয়া একটু নিশ্চিন্ত হইয়াছিলেন; অথবা কান্যকুব্জজয়ে যাত্রা করিবার অব্যবহিত পূর্ব্বে ভগবানের প্রীতিসাধনের জন্য ছোটখাটো যজ্ঞ করিয়াছিলেন, এবং গৌড়জয়ের পর রাজসূয়সদৃশ এক বিরাট যজ্ঞ করিয়াছিলেন। যাই হোক্, মোটের উপর মনে হয় যে, এই ঘটনা যদি প্রকৃত হয়, তবে তাহা দশম শতাব্দীর মাঝামাঝি ক্ষিতীশ প্রভৃতির দ্বারাই সংসাধিত হইয়াছিল। "ঠাকুর পরিবারের সংক্ষিপ্ত বিবরণ" পুস্তিকায় আছে যে, প্রজাগণের মধ্যে অধর্ম্মের (সম্ভবত বৌদ্ধধর্ম্মের) প্রসার নিবারণকল্পে যজ্ঞানুষ্ঠানের জন্য বীরসিংহের নিকট হইতে বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ আনাইয়াছিলেন (৬)। ইহাও উপরোক্ত প্রবাদের প্রকারান্তর বলিয়াই মনে হয়।

১৪। চান্দ্রায়ণ ব্রতের জন্য ?

বারেন্দ্রকুলাচার্য্যদের মতে আদিশূরপত্নী চন্দ্রমুখী একবার চান্দ্রায়ণ ব্রত অনুষ্ঠানে কৃতসংকল্প হন; সেই ব্রত সম্পাদনের উপযুক্ত ব্রাহ্মণ সমস্ত গৌড়রাজ্যে না পাওয়ায় আদিশূর কান্যকুব্জদেশ হইতে পাঁচ গোত্রের পাঁচ ব্রাহ্মণ আনান। কিন্তু ইঁহাদের মতে পূর্ব্বোক্ত কৌশিক প্রভৃতি গোত্রের পঞ্চব্রাহ্মণ আসিয়াছিলেন। আমাদের মতে, মাত্র এই পাপক্ষয়সাধক চান্দ্রায়ণব্রত সম্পাদনের জন্য ঘনঘটার সহিত অন্য রাজ্য হইতে পঞ্চব্রাহ্মণ চাহিয়া পাঠানো সম্ভব বলিয়া মনে হয় না। আমরা ইতিপূর্ব্বে দেখিয়া আসিয়াছি যে, কুলগ্রন্থে উক্ত আছে যে, এই পঞ্চব্রাহ্মণ একসঙ্গে একযোগে আসেন নাই; কিন্তু আজ একজন, কিছুকাল বাদে আর একজন, আরও কিছুকাল বাদে আর দুইজন, এই ভাবে ক্রমে ক্রমে আসিয়াছিলেন। সুতরাং মনে হয় না

---

(৫) এতৈঃ সহ মহীপাল একদা স নিজালয়ে।
উপবিষ্টো দ্বিজান্ প্রষ্টুং ধর্ম্মশাস্ত্রপরায়ণঃ ॥ ৩
কেন যজ্ঞেন ভগবৎপ্রীতির্ভবতি নিশ্চিতং।
তৎ সর্ব্বং শ্রোতুমিচ্ছামি কথয়ধ্বং দ্বিজোত্তমাঃ ॥ ৪
ইতি শ্রুত্বা দ্বিজাঃ সর্ব্বে খর্বীকৃতকলেবরাঃ।
কথয়ন্তি নৃপাগ্রে তু সর্ব্বে নির্বৃত্তমানসাঃ ॥ ৫
কেন কেন বিধানেন যজ্ঞো বা ক্রিয়তে বুধৈঃ।
বয়ং সর্ব্বে ন জানীমো বিধানং কীদৃশং ক্রতোঃ ॥ ৬
ইতি তেষাং বচঃ শ্রুত্বা চিন্তাযুক্তেন মহীপতিঃ।
কিং করোমি ক্ব গচ্ছামি বিললাপ পুনঃ পুনঃ ॥ ৭
কর্ত্তব্যো মতমালোচ্য সচিবানাং সুহৃজ্জনৈঃ।
প্রেষয়ামাস দদাঃ স দূতান্ শ্বশুরমাধিবৌ ॥ ৮

কায়স্থকুলদীপিকা—স০ দি০ ১২৪-২৫

(৬) That monarch, witnessing the triumph of vice among his subjects, resolved to perform a sacrifice for the purpose of checking the progress of wickedness and averting its evil consequences. He accordingly made up his mind to engage the Saptasati Brahmins as priests in the celebration of the sacrifice. But Gunaram Bhatta, an officer of this court, addressing Adisura, said: Monarch! If those who hold the plough, kill fish and chew parched rice be Brahmins who are then Sudras. Considering the truth of the above remark, the pious king had ample cause to be distracted. In this dilemma he asked the Bhatto, where could good Brahmins be had? In Kanouj, replied the letter. * * * Adisura gladly agreed to apply. * * * Vira sinha was then the reigning prince of Kanauj. He readily acceded to the request of the king of Bengal and sent him five Brahmans, nemed Bhatta haragon se,

Tagore family pp. 3-4

যে, চান্দ্রায়ণ ব্রতের জন্য ইঁহাদিগকে বিশেষভাবে আনা হইয়াছিল। প্রেমবিলাস গ্রন্থেও স্পষ্ট উল্লিখিত দেখি যে, আদিশূর স্বরাজ্যের বৈদিক কুলীন কৌশিকাদিগোত্রীয় পঞ্চব্রাহ্মণের দ্বারা পুত্রেষ্টিযজ্ঞ করাইয়া কোনও ফল না পাওয়াতেই অবশেষে তিনি বীরসিংহের নিকট পঞ্চব্রাহ্মণ চাহিয়া পাঠাইলেন, এবং ক্ষিতীশপ্রমুখ পঞ্চব্রাহ্মণ আসিয়া প্রথমে চন্দ্রমুখীকে চান্দ্রায়ণ ব্রতের দ্বারা পরিশুদ্ধ করিয়া লইয়া পরে পুত্রেষ্টিযজ্ঞ সম্পাদন করেন (৭)। এই পুত্রেষ্টি যে ক্ষিতীশপ্রমুখ পঞ্চব্রাহ্মণ নহে, ভট্টনারায়ণ প্রভৃতি পঞ্চব্রাহ্মণের দ্বারাই হওয়া সম্ভব, তাহা আমরা ইতিপূর্ব্বেই ইঙ্গিত করিয়া আসিয়াছি।

২৫। পুত্রেষ্টিযজ্ঞের জন্য ?

পুত্রেষ্টিযজ্ঞের জন্য যে পঞ্চব্রাহ্মণ আনীত হইয়াছিলেন, এসম্বন্ধে জনশ্রুতিও প্রবল, এবং অনেক কুলগ্রন্থে তাহার সমর্থন পাওয়া যায়। কুলতত্ত্বার্ণবে আছে যে, পুরাকালে, সম্ভবত আদিশূরের পূর্ব্বপুরুষ শালবান বঙ্গাধিপতি হইবার পূর্ব্বে রাজা শূদ্রক কর্ত্তৃক যে সকল সারস্বত ব্রাহ্মণ বঙ্গে সংস্থাপিত হইয়াছিলেন, আদিশূর তাঁহাদিগকে পুত্রেষ্টিযজ্ঞ করিবার অভিপ্রায় জানাইলে তাঁহারা সে বিষয়ে নিজেদের অক্ষমতা জানাইলেন; আদিশূর অগত্যা বীরসিংহের নিকট পঞ্চব্রাহ্মণ চাহিয়া পাঠাইলেন (৮)। প্রেমবিলাস গ্রন্থে এই কথাই সমর্থিত দেখি (৯)। মুলোপঞ্চাননও বলেন যে পঞ্চব্রাহ্মণ কর্ত্তৃক পুত্রেষ্টিযজ্ঞের ফলেই আদিশূরের পুত্রকন্যা জন্মে (১০)। অন্য কোন কুলগ্রন্থে কন্যা হইবার কথা উল্লিখিত দেখি নাই। ধ্রুবানন্দ মিশ্র এবং হরিমিশ্রও এড়ু মিশ্রের কারিকা অনুসরণ করিয়া পুত্রেষ্টির জন্য পঞ্চব্রাহ্মণের বঙ্গে আগমন সমর্থন করেন (১১)। রাঘবরয়কৃত বৈদ্যকুলপঞ্জিকায় আছে—"ভূসুর নায়ক পুত্র আদি নৃপতির মুনিপঞ্চকের যজ্ঞে জন্ম যাঁর স্থির॥" (১২) কুলার্ণব ও কুলপঞ্জিকায় আছে—পুত্রেষ্টিযজ্ঞের জন্য পুত্রদারসমন্বিত পঞ্চব্রাহ্মণ আদিশূর কর্ত্তৃক যথাবিধি পূজিত হইয়াছিলেন (১৩)। আবার কুলরমাতে উক্ত হইয়াছে যে, আদিশূর কর্ত্তৃক শ্রীহর্ষপ্রমুখ ব্রাহ্মণগণের সহিত ভট্টনারায়ণ আদিশূর কর্ত্তৃক যজ্ঞার্থে আনীত হন (১৪)। এই সমস্ত মিলাইয়া আলোচনা করিয়া দেখিলে স্পষ্ট বুঝা যায় যে, পুত্রেষ্টিযজ্ঞের জন্যই ভট্টনারায়ণপ্রমুখ পঞ্চব্রাহ্মণ আদিশূর কর্ত্তৃক ৯৯৯ সম্বতে বঙ্গদেশে সমানীত হইয়াছিলেন।

সুদিন-দুর্দ্দিন।

(শ্রীহুমায়ুন কবির)

যখন প্রভাত রবি হাসে নীলাকাশে,
যখন শরৎশশী স্বচ্ছ তৃপ্ত হাসে
ভরি দেয় ধরা; জীবনে যখন মম
সুখবন্যা শ্রাবণের বারিবন্যা সম
কূলে কূলে ডেকে যায়; যখন জীবন
আলোক-পুলকময় হিরণ-স্বপন,
শুধু হাসি, শুধু গান, শুধু আলাপন—
তোমারে তখন নাথ করিনি স্মরণ।

তার পরে যবে আসে অন্ধরাত্রিপ্রায়
জীবনে বিষাদতম; ঢেকে আসে হায়
সৌভাগ্যগৌরব-রবি—দীর্ণ পুষ্পমত
ঝরে যায় জীবনের সুখ শত শত,
তখন তোমারে প্রভু, হে বিভু আমার!
সমস্ত জীবন দিয়া ডাকি বারবার।

---

(৭) প্রে০ বি০ ২৪ম বিলাস ২৬২ পৃঃ ২য় স্তম্ভ—
পঞ্চ ঋষি রাজা আর রাণীরে আনিল।
যজ্ঞের আগে চান্দ্রায়ণ ব্রত করাইল॥
রাজা রাজমহিষী করি ব্রত চান্দ্রায়ণ।
নিষ্পাপ হইয়া কৈল যজ্ঞ আরম্ভণ॥

(৮) কু০ ত০ ১০ ও ১৭ শ্লোক—পূর্ব্বে পাদটীকায় উদ্ধৃত

(৯) প্রে০ বি০ ২৬১ পৃঃ

(১০) পাঁচ গোত্রে পাঁচ ঋষি দারাপত্যে আসি বসি
আদিশূরে করে আশীর্ব্বাদ।
সেই আশীর্ব্বাদের ফলে পুত্রকন্যা জন্মে কালে
দেবাসুরের ভাঙ্গে বিবাদ॥ ১
মুলোপঞ্চানন বচন—স০ নি০ ৩২৬-৩২৭

(১১) রাজা বলে পুত্রেষ্টির কর অনুষ্ঠান।
* * *
পুত্রেষ্টির কথা শুনে সবে মৌনী রয়॥
*
কান্যকুব্জ মহাঋষি আসে বঙ্গে পঞ্চ।
ধ্রুবানন্দ—স০ নি০ ৩২৯-৩৩০ পৃঃ

(১২) স০ নি০ ৩৩১

(১৩) পুত্রেষ্টি-করণার্থায় পুত্রদারৈঃ সমন্বিতাঃ।
আদিশূরেণ তে সর্ব্বে পূজিতাশ্চ যথাবিধি॥ ৩
স০ নি০ ৫০৭

উপদেশ ও উপদেশক।

(শ্রীরমানাথ পালিত)

ধর্ম্মমণ্ডলীতে কি প্রকার উপদেশ দেওয়া উচিত? ধর্ম্মমণ্ডলীতে আমাদের উপদেশকগণের কি ভাবে উপদেশ দেওয়া উচিত, ইহাই হইল প্রশ্ন। বনমালা যেমন প্রস্ফুটিত কুসুমের মাধুরী আহরণ করিয়া পথিকের হৃদয়ে আনন্দ ঢালিয়া দেয়, উপদেশকগণ তদ্রূপ গাম্ভীর্য্য ও নম্রতার ভূষণে ভূষিত হইয়া যখন ধর্ম্মমণ্ডলীতে প্রীতির মন্দাকিনী ধারা প্রবাহিত করিয়া দেন তখন প্রকৃতই ধর্ম্মমণ্ডলী আশ্চর্য্য মাধুরীবিমণ্ডিত হয়। উপদেশক ঈশ্বরের দূতস্বরূপ হইয়া তাঁহার বাণী নিকটে আনয়ন করেন। ভগবানের অমৃতময়ী বাণী মণ্ডলীর সভ্যগণের নিকট তিনি প্রচার করেন। পরমাত্মার প্রেরণায় অনুপ্রাণিত হইয়া তাঁহারা মানবের সংসারক্লিষ্ট প্রাণে আধ্যাত্মিকতার সঞ্জীবনী-সুধা ঢালিয়া দেন। প্রবৃত্তিচালিত মানবহৃদয় যেন ভগবানের প্রতি আকৃষ্ট হয়, ইহাই তাঁহাদের লক্ষ্য হওয়া সর্ব্বতোভাবে বিধেয়। খৃষ্ট যখন কোন জনসঙ্ঘের সম্মুখে উপদেশ দিতেন, তখন তিনি ভগবৎপ্রেমের কথা বলিতেন; হৃদয়ে ভগবানের প্রতি প্রেম, বিশ্বাস ও ভক্তির উদ্রেক করিতে বিশেষ প্রয়াস পাইতেন। মণ্ডলীতে উপদেশকগণেরও কি এই ভাবে উপদেশ দেওয়া উচিত নহে? উপদেশকের কার্য্য যে বিশেষ দায়িত্বপূর্ণ একথা বোধ হয় কেহই অস্বীকার করিবেন না। অভিমানশূন্য ত্যাগী পুরুষেরাই প্রকৃতপক্ষে উপদেশকের কার্য্য করিবার যোগ্য। ভোগী অর্ব্বাচীন অভিমানী যাঁহারা, তাঁহারা উপদেশকের কার্য্য করিবার অনুপযুক্ত। ঈদৃশ উপদেষ্টা দ্বারা ধর্ম্মসমাজ ও মণ্ডলীর প্রভূত অমঙ্গলই সাধিত হয়।

আমাদের দেশের লোক কিছু অধিক পরিমাণে ভাব-প্রবণ; তাই ভোগী ও বিলাসী লোকের দ্বারা কোন দিনই আমাদের দেশে ধর্ম্মপ্রচার হয় নাই। উপদেশকের কার্য্য করিতে হইলে, ত্যাগী সন্ন্যাসী হইতে হইবে। উপদেশের বিষয়গুলি দেশীয় ও জাতীয় ছাঁচে ঢালিয়া লইতে হইবে। এই সংসার-মরুভূর মধ্য দিয়া যাইতে যাইতে উপদেশক জীবনে যাহা কিছু অভিজ্ঞতা লাভ করিবেন মণ্ডলীর নিকট সেইগুলি পরিস্ফুট করিতে হইবে।

আমাদের দেশে দেখিতে পাওয়া যায় যে, ধর্ম্মোপদেশ দিবার পূর্ব্বে ধর্ম্মোপদেষ্টা ত্যাগী সন্ন্যাসী হইয়া ভগবদ্‌জ্ঞান লাভের জন্য সর্ব্বাগ্রে নিজে প্রস্তুত হন। ভগবদ্‌জ্ঞানের মন্দাকিনী ধারা উপদেষ্টার হৃদয়ে প্রবাহিত না হইলে তিনি কি উপদেশ দিবেন জানি না। খৃষ্টের শিষ্যগণ যতদিন না ভগবদ্‌জ্ঞানের অমৃতপ্রসাদ পাইয়াছিলেন, ততদিন তাঁহারা কখনও ধর্ম্মোপদেশ দিতে প্রবৃত্ত হন নাই। ভোগের ভিতর দিয়া কখনও ভগবদ্-জ্ঞানলাভ হয় না। তাই খৃষ্টের ন্যায় শ্রেষ্ঠ ধর্ম্মপ্রচারক এক ধনী লোককে বলিয়াছিলেন যে, যদি তুমি ভগবদ্‌জ্ঞান লাভ করিতে অভিলাষী হও, তাহা হইলে তোমার ভোগের সামগ্রীগুলি বিসর্জ্জন দিয়া আমার অনুগামী হও। বর্ত্তমানে এদেশের অধিকাংশ ধর্ম্মমণ্ডলীর প্রচারকগণ সাধারণতঃ ভোগের মধ্যেই লালিতপালিত হন বলিয়া ভগবদ্-জ্ঞান ত দূরের কথা, কোন জ্ঞানই লাভ করিতে পারেন না। তাই তাঁহাদের উপদেশ সংসারক্লিষ্ট অবসাদখিন্ন প্রাণে আধ্যাত্মিকতার অমৃতরস ঢালিয়া দিতে সমর্থ হয় না।

আমাদের অন্তরে সেই বিরাটপুরুষ জগৎস্রষ্টাকে হৃদয়ঙ্গম করিবার আকাঙ্ক্ষা স্বতই জাগিয়া উঠে। তাঁহাকে জানিবার এই আকাঙ্ক্ষা কিরূপে পরিতৃপ্ত হইতে পারে, তজ্জন্য আমাদের প্রাণ কাঁদিয়া উঠে। কাহারও বা হৃদয় কি যেন এক অব্যক্ত অশান্তির তরঙ্গে উদ্বেলিত হইয়া উঠে; তাঁহার মনে হয়, সে যেন কোন্ ঘনতমসাচ্ছন্ন প্রকোষ্ঠে চিরনিবদ্ধ রহিয়াছে।

যাঁহারা উপাসনালয়ে ভজনা করিতে আসেন, তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই হয় ত আদর্শ জীবনযাপন করিতে অভিলাষী হইয়া আসেন। ভগবানের অনন্ত প্রেমের অমৃতময়ী বাণী হৃদয়ঙ্গম করিতে উৎসুক হইয়া আসেন। অনেকের হৃদয় হয় ত ভীতি ও সন্দেহে দোলায়মান, তাই তাঁহাদের বিষাদখিন্ন মুখ দেখিয়া মনে হয়, যেন তাঁহারা একটি গুরুভার সর্ব্বদা হৃদয়ে বহন করিতেছেন। অনেকে হয় ত শোকে ও দুঃখে মগ্ন; যে উপদেশে তাঁহাদের মৃতকল্প প্রাণে শান্তি ও সান্ত্বনার বারি সিঞ্চিত হইতে পারে, এমন উপদেশ শুনিবার জন্যই তাঁহারা ভজনালয়ে আসেন।

যে সকল প্রচারক ভগবদ্-জ্ঞানের সুধা আকণ্ঠ পান করিয়াছেন, তাঁহাদের উপদেশেই ঈদৃশ মানবের হৃদয় ভগবৎপ্রেমে আকৃষ্ট হইয়া—তাঁহাকে হৃদয়ের অধীশ্বর জানিয়া চিত্তপ্রসাদ লাভ করে।

মণ্ডলীর প্রচারকগণ ভগবদ্-জ্ঞানে ও প্রেমে অধ্যুষিত না থাকিলে ঐসকল পিপাসিত প্রাণের আধ্যাত্মিক তৃষা কি করিয়া নিবারণ করিবেন জানি না। দুঃখের বিষয়, অধিকাংশ ধর্ম্মমণ্ডলীর বৃত্তিভোগী প্রচারকগণ সংসারের মোহিনী মায়ায় এমনি আবদ্ধ যে, তাঁহারা ভজনালয়ে আসিয়া উপদেশ দিবার ব্যপদেশে অযথা কতকগুলি অসংলগ্ন বাঁধি কথার অবতারণা করিয়া আবার সংসার-রঙ্গভূমে অভিনয় করিতে চলিয়া যান। ঈদৃশ প্রচারকের কার্য্য বিড়ম্বনা মাত্র। তাঁহারা মণ্ডলীর

আধ্যাত্মিক সৌষ্ঠব-বর্দ্ধক। প্রচারক ধর্ম্ম-তত্ত্ব বুঝাইতে ভজনালয়ে আসেন; কিন্তু তাঁহার উপদেশ শুনিয়া যদি আমার পাপদগ্ধ হৃদয় শান্তি না পায়, তাহা হইলে তাদৃশ প্রচারক উপকারক না হইয়া অপকারকই হইয়া থাকেন। তিনি যদি ঈশ্বরের প্রতি প্রীতি ও তাঁহার প্রিয় কার্য্য সাধনে মণ্ডলীর লোকের প্রাণ উদ্বুদ্ধ করিতে অসমর্থ হন, তাহা হইলে তাঁহার উপদেশ ব্যর্থ হইল বলিতে হইবে।

প্রচারকের উপদেশের নিষ্ফলতার কারণ কি? কারণ এই যে, ভোগের তাড়নার বিক্ষুব্ধ বলিয়া প্রচারক উপদেশ দিবার সময় কোন নির্দ্দিষ্ট লক্ষ্য রাখিতে পারেন না। যে বিষয়ে দুইটী কথা বলিতে তাঁহার মনে খেয়ালের তরঙ্গ উঠে, যুক্তি বা অযুক্তি বিচার না করিয়া তিনি তদ্বিষয়ে উপদেশ দিতে প্রবৃত্ত হন। কোন বিষয় চিন্তা না করিয়া তিনি ভজনালয়ে আসিয়া উপদেশ দিতে আরম্ভ করেন। যেন উপদেশমন্দিরটি তাঁহার বক্তৃতা অভ্যাসের স্থান; সেখানে তিনি যাহা ইচ্ছা তাহাই বলিবেন। উপদেশ যাহাতে সুফল উৎপন্ন করে, তদ্বিষয়ে তাঁহার লক্ষ্য রাখা অত্যাবশ্যক; এবং ইহা কার্য্যে পরিণত করিতে হইলে মণ্ডলীর সভ্যগণের চরিত্র, অবস্থা ও অভাব সম্বন্ধে তাঁহার বিশেষরূপে জ্ঞান থাকা দরকার। মণ্ডলীর কি কি প্রয়োজন বা কি কি প্রয়োজন নয়, তৎপ্রতি লক্ষ্য রাখিয়া উপদেশ দিতে হইবে।

উপদেশের প্রণালী সম্বন্ধে দুই একটি কথা বলিব। বাইবেলে উক্ত হইয়াছে যে, খৃষ্ট একসময় শিষ্যদিগকে বলিয়াছিলেন, "যখন লোকে তোমাদের নিকট শিক্ষার জন্য আসিবে, তখন তোমরা কিরূপে কি বলিবে তদ্বিষয়ে চিন্তিত হইও না—কেন না, তোমরা উপদেষ্টা নও; কিন্তু যিনি তোমাদের অন্তরে সর্ব্বদা বিরাজমান সেই ভগবানই উপদেষ্টা"। উপদেশ দিবার পূর্ব্বে মণ্ডলীর প্রচারকের কর্ত্তব্য, যেন তিনি ধ্যানমগ্ন চিত্তে প্রেরণার জন্য ভগবৎসকাশে আত্মনিবেদন করেন। দুঃখের বিষয়, অনেক প্রচারকই তাঁহাদের চিত্তবৃত্তিগুলিকে সংযত করিতে সমর্থ নন—আত্মনিবেদন করিবেন কি প্রকারে? ধ্যান ব্যতীত ভগবানের সহিত যোগসম্পাদন অসম্ভব। এই যোগই ভগবদ্‌জ্ঞানের স্বরূপতত্ত্ব বুঝাইয়া দেয়। যেদিন প্রচারকগণ ভগবদ্‌জ্ঞানের সম্যক্ পরিচয় পাইয়া নিরভিমানী, ত্যাগী ও সন্ন্যাসী হইয়া ধর্ম্মমণ্ডলীতে স্ব স্ব উপদেশে ধর্ম্মজীবনের পরীক্ষিত সত্যের ভাবগঙ্গা প্রবাহিত করিয়া মণ্ডলীর সভ্যগণের প্রবৃত্তিচালিত বিলাসবিভ্রান্তপ্রাণে শান্তিসুধা ঢালিয়া দিতে পারিবেন, সেই দিন আমরা ধন্য হইব, মণ্ডলী ধন্য হইবে।

বাসগৃহ।

(শ্রীরাধারমণ বন্দ্যোপাধ্যায়)

প্রাণী মাত্রেরই বাসগৃহ আছে। উহা নির্ম্মাণ করিবার ইচ্ছা এবং ক্ষমতা ভগবৎপ্রদত্ত; প্রত্যেক জীব-জন্তুই তাহাদের প্রয়োজনমত বাসগৃহ প্রস্তুত করিয়া থাকে।

মনুষ্যেরও বাসগৃহ আছে;—ভিন্ন ভিন্ন দেশের লোকের বাসগৃহ ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের। দেশের আবহাওয়া, ঘর করিবার উপকরণ ও আবশ্যকীয় বস্তু অনুসারে উহা পৃথক পৃথক রূপে নির্ম্মিত হইয়া থাকে; গ্রীণলণ্ড দেশে প্রচণ্ড শীত, অন্যবিধ উপকরণের অভাবে তথাকার লোকেরা বরফের দেওয়াল ও খিলান করিয়া ঘর করে; দার্জিলিং সহরে কাঠ-পাথর দ্বারাই বেশীর ভাগ ঘর তৈয়ারী হইয়া থাকে; কিন্তু প্রত্যেক দেশেই গৃহাদি নির্ম্মাণ কার্য্যে অভিজ্ঞ (specialist) লোক পাওয়া যায় এবং তাহারা যে গৃহাদি নির্ম্মাণ করে তাহাতে একটু বিশেষত্বও থাকে।

আমরা আজ দুইশত বৎসর পূর্ব্বেকার বঙ্গদেশের পল্লীর গৃহনির্ম্মাণ-পদ্ধতির কথা বলিতেছি; প্রায় প্রতি পল্লীতেই বেশীর ভাগ মাটীর দেওয়াল এবং খড়ের ছাউনি চাল বাঁধিয়া ঘর করা হইত; যে যে স্থানে মাটীর দেওয়াল থাকিত না, সেখানে বাঁশ বা কাঠের বেড়া দেওয়া হইত। গ্রামের মধ্যে যাঁহার অবস্থা বিশেষ ভাল, তিনিই কেবল ইটের গাঁথনী কোঠা ঘর করিতেন। সকলেই ঘর করিবার সময় বিবেচনা করিত কোন্ 'দোয়ারী' ঘর করিব? তখনকার লোকে—বিশেষতঃ পল্লীবাসীরা দক্ষিণদ্বারী ঘর করিতেন; এবং যাঁহার অবস্থা ভাল তিনি প্রথমে আবশ্যকমত ঘর দক্ষিণদ্বারী করিয়া বাকীগুলি পূর্ব্বদ্বারী বা পশ্চিমদ্বারী করিতেন—পারতপক্ষে কেহই উত্তরদ্বারী করিতেন না। একটী প্রবাদ আছে—

দক্ষিণদ্বারী ঘরের রাজা
পূর্ব্বদ্বারী তাহার প্রজা।
পশ্চিমদ্বারীর সদাই তাপ
উত্তরদ্বারীর খাজানা মাপ।

খুব গরীব লোক, যাঁহাদের খাজানা দিবার ক্ষমতা ছিল না, তাঁহারাই বোধ হয় উত্তরদ্বারী ঘর করিতেন।

বৎসরের মধ্যে দুইটী অয়ন হয়, উত্তরায়ন এবং দক্ষিণায়ন। উত্তরায়ন ১লা মাঘ হইতে আরম্ভ হয় এবং ১লা শ্রাবণ হইতে দক্ষিণায়ন। উত্তরায়নের মধ্যাংশে অল্পদিনের জন্য বক্রভাবে রৌদ্র 'উত্তর দোয়ারী' ঘরের মধ্যে পাওয়া যায়, কিন্তু বৎসরের বেশীর ভাগ সময়ই পাওয়া যায় না; আর শীতকালে উত্তরদোয়ারী ঘরে অতিশয় ঠাণ্ডা হাওয়া লাগে ও সূর্য্যালোকের অভাবে ঘর অস্বাস্থ্যকর হয়। সেজন্য জানা যাইতেছে যে,

যাহারা একেবারেই অসমর্থ তাহারাই কেবল উত্তর-দোয়ারী ঘরে থাকে; এই প্রথা বহুদিন হইতে চলিয়া আসিতেছে। দিগনির্ণয় যন্ত্র আবিষ্কার হওয়ার পূর্ব্বে ভট্টাচার্য্য দ্বারা সূর্য্য দেখিয়া ঘরের দোয়ারের দিগনির্ণয় হইত। ইহাতে বাড়ীর ভদ্রাসনের বা জমীর আয়তনের সহিত রাস্তাঘাটের সামঞ্জস্য রক্ষা হইত না।

যাঁহারা চকবন্দী বাড়ী করিতেন, তাঁহারা আবার দক্ষিণদ্বারী সদর দরজা রাখিতেন না। কারণ তৎকালে প্রবাদ বা জনশ্রুতি ছিল যে, যমরাজার বাড়ী দক্ষিণ দিকে এবং তাঁহার দরজাও নাকি দক্ষিণদোয়ারী। সম্ভবতঃ দক্ষিণ দিকে দরজা রাখিলে পাছে অনবরত দক্ষিণ দিকে নজর পড়ে ও যমের পেয়াদা শীঘ্র বাড়ীতে প্রবেশ করিতে পারে, সেজন্য দক্ষিণদ্বারী সদর দরজা করা হইত না।

কেহ যখন নূতন বাড়ী করিবার কল্পনা করিতেন, তখন তিনি এই প্রবাদ বচনের উপর নির্ভর করিয়া করিতেন,

উত্তরে মেলা, দক্ষিণে খোলা— *
পূর্ব্বে হাঁস, পশ্চিমে বাঁশ।

ইহার অর্থ বাড়ীর উত্তরে মেলা অর্থাৎ অনেক রকম গাছের চারা লাগান হইত অর্থাৎ বাগ-বাগিচা করা হইত। দক্ষিণ দিকে সদর দরজা না রাখিলেও, দক্ষিণ দিকে খোলা জায়গা রাখা হইত, কোনও গাছপালা লাগাইয়া অন্ধকার করা হইত না। পূর্ব্বে হাঁস অর্থাৎ পূর্ব্বদিকে পুকুর রাখা হইত, তাহাতে হাঁস চরিত; এবং পশ্চিম দিকে বাঁশঝাড় লাগান হইত, যাহাতে পশ্চিমের ঝড় হইতে গৃহ রক্ষা পায়।

এসব তো গেল ঘরতৈয়ারীর বহিরঙ্গ-বিচার—এখন অন্তরঙ্গ কথা কিছু বলা যাক। প্রায়ই লোকে ঘরের মেঝের অনেক উচ্চে ছোট ছোট 'ঘুলঘুলি' অর্থাৎ খুব ছোট ছোট জানালা রাখিত এবং একটা মাত্র তিন চারি হাত লম্বা দরজা থাকিত; বেশী জানালা দরজা রাখিত না, পাছে চোর বা ডাকাত বাহির হইতে দেখিতে পায়। বাক্স থাকিলেও লোকে মেঝেতে বা দেওয়ালে টাকাকড়ি পুতিঁয়া রাখিত, আগুন লাগিলে পুড়িয়া না যায় বা ডাকাত পড়িলে বাক্স ভাঙ্গিয়া কিছু না পায়। গৃহকর্ত্তা ঘরের বারান্দায় শুইয়া থাকিতেন। কি শীত কি গ্রীষ্ম তাঁহার বারান্দায় থাকিবার নিয়ম; কারণ ঘরের মধ্যে থাকিলে বিষম বিপদ, যদি ডাকাতে শিকল বন্ধ করিয়া আগুন ধরাইয়া দেয়, তবে যে প্রাণ যাইবে! সুতরাং এক কথায় গৃহ করিয়াও বিশেষ সুখ ছিল না—ইহা যেন কতকটা বাবুই পাখীর অবস্থা, যেমন—

"ঘর থাকিতে বাবুই ভেজে"

ক্রমেই মানুষ সভ্য হইয়াছে। কালক্রমে অভিজ্ঞেরা (specialist) ঠিক করিলেন যে, যদি পাশের দিকে ছোট একটী দরজা রাখা যায় এবং তাহার বাহির দিকে শিকল না থাকে, তবে ঘরের ভিতর থাকা যায়; কারণ বড় দরজাটীতে শিকল লাগাইলেও পাশের দরজা বন্ধ করিবার ভয় থাকে না। ক্রমে উন্নতি হইল "মাঠ গুদাম" করা হইল, আগুনে পুড়িবার ভয় গেল; ক্রমে ক্রমে কাঠের খুঁটি বেতের বাঁধন রংদার হইতে লাগিল।

* পাঠান্তর—উত্তরে বেড়ে দক্ষিণে ছেড়ে অর্থাৎ উত্তরদিকে প্রাচীরের দ্বারা ঘেরা হইত।

অভয়।

(শ্রীনির্ম্মলচন্দ্র বড়াল বি-এল্)

ভৈরবী—একতালা।

তুমি আমাদের থাক্‌তে সহায়
করব না ভয়—করব না ভয়।
ঝড়ের রাত্তি সে-ও পোহায়
করব না ভয়—করব না ভয়।
ঘনাক না ঘোর আঁধার রাতি
থাক্‌তে মোদের সাথের সাথী
কে নেভাবে প্রাণের বাতি
অমর ভাতি জ্যোতির্ম্ময়।
ব্যথার প্রদীপ সে-ও আলো দেয়
করব না ভয়—করব না ভয়॥
ভবার্ণবের ভেলা তুমি
করব না ভয়—করব না ভয়
অন্ধকারের ধ্রুবতারা
করব না ভয়—করব না ভয়।
অভয় মনে হাস্য মুখে
চলব সকল দুঃখে সুখে
তোমার নামটি লয়ে বুকে
গেয়ে যাব প্রেমেরই জয়
পড়ব শেষে পায়ে এসে
করব না ভয়—করব না ভয়॥

রাজর্ষি এব্রাহিম বল্‌খী সম্বন্ধে কয়েকটী গল্প।

(মৌলবী জমিরুদ্দীন বিদ্যাবিনোদ কাব্যনিধি)

(১)

আফগানস্থানের অন্তর্গত 'বল্‌খ নামে' সুপ্রসিদ্ধ নগর আছে। প্রায় বারশত বৎসর পূর্ব্বে তথায় এব্রাহিম নামে নরপতি ছিলেন। তিনি বৈরাগ্য অবলম্বন করিয়া

জনপূজ্য হইয়া উঠিয়াছিলেন। তাঁহার বৈরাগ্যের উৎপত্তি সম্বন্ধে অনেক গল্প প্রচলিত আছে—আমরা তন্মধ্যে কয়েকটী প্রকাশিত করিলাম।

একদা রাজা কতকগুলি পাত্রমিত্র ও সৈন্য সমভিব্যাহারে মৃগয়া উদ্দেশ্যে কোন গভীর বনে প্রবেশ করিলেন। পাত্রমিত্র ও সেনাসামন্তগণ দিকে দিকে মৃগয়ালিপ্ত হইল। রাজা অনেক দূরে একটি হরিণ দেখিয়া, সবেগে তাহার দিকে অশ্বচালনা করিলেন। সুচতুর হরিণ, ঘোটকের পদধ্বনি শুনিয়া চকিত হইয়া ঊর্দ্ধশ্বাসে পলায়ন করিতে লাগিল। রাজার অশ্বও হরিণের পশ্চাৎ পশ্চাৎ দৌড়িতে লাগিল, কিন্তু কোনগতিকে হরিণের সমীপস্থ হইতে পারিল না।

অনন্তর বনে বনে প্রায় দুই ক্রোশ পথ অতিবেগে দৌড়াইয়া হরিণ কিছু ক্লান্ত হইয়া স্থিরভাবে দাঁড়াইল এবং অশ্বারোহী রাজার প্রতি চাহিয়া বলিল, "মহারাজ! ঈশ্বর কি জীবসংহার নিমিত্তই তোমায় সৃজন করিয়াছেন? তুমি জীবশ্রেষ্ঠ মনুষ্য হইয়া আমার ন্যায় ক্ষুদ্র জীবের বধোপায় অবলম্বন করিতেছ? ধিক্ তোমার মনুষ্যত্বে! যাহার মনে মায়া-মমতা, দয়া-ধর্ম্মের কিছুমাত্র লেশ নাই, সে আবার মনুষ্য!" এই বলিয়া হরিণ অন্যত্র চলিয়া গেল। রাজা কিছু স্থির করিতে পারিলেন না, কিন্তু তাহার কথাগুলি রাজার হৃদয়ে দৃঢ়ভাবে বদ্ধমূল হইল। তিনি তদ্দণ্ডেই সংসারধর্ম্ম পরিত্যাগ ও সন্ন্যাসধর্ম্ম পরিগ্রহ করিয়া কাননে কাননে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন।

(২)

রাজা এব্রাহিম মৃগয়া হইতে প্রত্যাগত হইয়া, বিশ্রামলাভার্থে শয়নমন্দিরে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, নিতান্ত কুরূপা মলিনবসনা ও বিকটদশনা এক দাসী শয্যায় শয়ন করিয়া গাঢ় নিদ্রায় অভিভূত রহিয়াছে। সামান্য দাসীর রাজ-শয্যায় শয়ন! দেখিয়া রাজা ক্রোধরক্ত লোচনে, কঠোর কশা হস্তে লইয়া ক্রমান্বয়ে চল্লিশবার সবলে প্রহার করিলেন। দাসী কশাঘাতে সচেতনা হইয়া হাসিতে হাসিতে ধীরে ধীরে অন্যত্র যাইতে লাগিল। কোপজনিত তীব্র আঘাতে দাসী বিন্দুমাত্র অশ্রুপাত করিল না, আহত স্থানে একবারও হাত দিল না, কিছুমাত্র তাহার ভয়লক্ষণও দেখা গেল না; বরং উহার বিপরীতে হাসিতে হাসিতে প্রস্থান করিতেছে দেখিয়া তখনই রাজা বিস্ময়াপন্ন হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"দাসি! আমি তোরে এত বলে কশাঘাত করিয়াছি যে, আহত স্থান স্ফীত হইয়াছে ও কোন কোন স্থান কাটিয়া বিন্দু বিন্দু রক্ত পড়িতেছে। এ অবস্থায় কাতর না হইয়া, তোর হাসিবার কারণ কি, শীঘ্র বল?" দাসী করযোড়ে বলিল—"রাজন্! আমি আপনার বিছানায় অল্প সময় ঘুমাইয়া চল্লিশ কশাঘাত দণ্ডভোগ করিলাম, আর যিনি দিনরাত্রি এই বিছানায় ভোজন, শয়ন উপবেশন ইত্যাদি নানাপ্রকার সুখ-ভোগ করেন, তাঁহার প্রভু তাঁহাকে কতই না কশাঘাত করিবেন, এই মনে হওয়ায় আমার ব্যথাকে ব্যথা বোধ হয় নাই।" দাসী এই বলিয়া নিস্তব্ধ হইলে, রাজা তন্মুহূর্ত্তেই রাজ্যের সহিত রাজকার্য্য পরিত্যাগ করিয়া তপস্বিবেশ ধারণপূর্ব্বক বনাভিমুখে প্রস্থান করিলেন।

(৩)

রাজা এব্রাহিম একদা আড়ম্বরের সহিত মৎস্যবিনাশে নদীতীরে গমন করিয়াছিলেন। তাঁহার সঙ্গীয়া নানা উপায়ে মৎস্য ধরিতেছিল। তিনি নদীতীরে ভ্রমণ করিতে করিতে সহসা দেখিতে পাইলেন, বয়োবৃদ্ধ তেজঃপুঞ্জ এক মহর্ষি উপাসনা হেতু নদীজলে হস্তপদ প্রক্ষালণ করিতেছেন। মহর্ষির বদনমণ্ডল অরুণকিরণের ন্যায় জ্যোতির্ম্ময়; শুভ্র শ্মশ্রু নাভিস্থল পর্য্যন্ত লম্বিত। তাঁহার ভাবভঙ্গী ও শরীরকান্তি দেখিয়া রাজার অন্তঃকরণ ভক্তিরসে উচ্ছ্বলিত ও আপ্লুত হইয়া উঠিল। তিনি নাতিবিলম্বে মহর্ষির পদতলে পতিত হইলেন। এতদ্দর্শনে মহর্ষি সসম্ভ্রমে তাঁহাকে উঠাইয়া বাৎসল্য ভাবে আলিঙ্গন ও সম্ভাষণ করিয়া বলিলেন, "বৎস! আমাকে দেখিয়া বিস্মিত হইও না; আমার নাম খেজর। ঈশ্বর তোমার শিক্ষাবিধান নিমিত্ত আমাকে এখানে পাঠাইয়াছেন। দেখ বৎস! সংসার অনিত্য; ইহার স্থায়িত্ব নাই; কেন না, যে কোন সময়ে ইহা পরিত্যাগ করিয়া অন্তকপুরের অতিথি হইতে হইবে। ইহার অস্থায়ী মমতা ও কুহকজালে বন্দী হইয়া অনন্তজীবন ক্ষয় করা কোনমতেই যুক্তিযুক্ত নহে। আমার উপদেশ শুন; রাজ্য পরিত্যাগ কর, সংসারধর্ম্ম হইতে অবসর গ্রহণ কর এবং যে সংসারের অস্তিত্ব কখনও ক্ষয় হইবার নহে, তাহার দিকে মনোনিবেশ কর। দেখ বৎস! ঈশ্বর স্বীয় জ্যোতিকণা দ্বারা মানুষের আত্মা গঠিত করিয়াছেন। প্রথমে উহা ঈশ্বরের আদেশক্রমে গুপ্তভাবে অবস্থিত ছিল; তৎপরে তিনি আপন কারুকার্য্য ও শিল্পনৈপুণ্য দেখাইবার নিমিত্ত উহাকে মনুষ্যের দেহাগারে সযত্নে প্রোথিত করিয়া সংসারে পাঠাইয়াছেন। বিবেচনা করিয়া দেখিতে গেলে জীবাত্মা দেহরাজ্যের সম্রাট, অপরাপর অবয়ব তদীয় আদেশে পরিচালিত। অতএব সাংসারিক বিষয়বাসনা, সুখসম্ভোগ, আচার-ব্যবহার ইত্যাদি হইতে বিরত হইয়া জীবাত্মাকে চেনা, সৃষ্টিকর্ত্তা পরমেশ্বরের প্রতি ভক্তিযোগসহকারে মনোনিবেশ করা, কি রাজা, কি ধনবান সকলেরই ভয় হইতে নির্ভয়ে থাকা এবং পিতা-মাতা,

কি স্ত্রী-পুত্র-কন্যা, কি আত্মীয়স্বজন-বন্ধুবান্ধব সকলেরই স্নেহ-মমতায় বিসর্জ্জন দেওয়া একান্ত কর্ত্তব্য। আমি কি খাইয়া জীবন ধারণ করিব, দারাকলত্র আত্মীয় প্রভৃতি কি উপায়ে প্রতিপালিত হইবে, সেজন্য নিরন্তর চিন্তাকুল থাকা বিধেয় নয়। কুটীর মধ্যে একাকী বাস করিয়া ধীর মনে অবিচলিত ও অপ্রতিহত ভক্তিভাবে ঈশ্বরের উপাসনা করা কর্ত্তব্য। রাজ্য বা রাজগৌরবের প্রতি মনসংযোগ করিয়া অহঙ্কৃত ও ধৃষ্ট হওয়া ভাল নয়। যাহারা কেবল ধনোপার্জ্জনে ব্যতিব্যস্ত থাকে এবং ভুলিয়াও ঈশ্বরের নাম মুখে আনে না, তাহারা এক প্রকার নররূপী পশু। কেন না, ন্যায়ান্যায় বিবেচনাশূন্য পশুরাই উদর পূর্ণ করিবার জন্য যাহার-তাহার শস্য নষ্ট করিয়া থাকে। আরও শুন, আমি তোমাকে যে বিষয়ের উপদেশ দিতেছি, তাহাতে নিবিষ্ট হইবার প্রধান উপায় ও সহায় কেবলমাত্র সাহস। সাহসকে সহায় এবং উহার উপর সম্পূর্ণ নির্ভর না করিলে কেবল এ বিষয় কেন, কোন কর্ম্মই সম্পাদিত হয় না। সাহসহীন লোকের অনেকবিধ কৌশল শিক্ষা থাকিলেও সে সকল কার্য্যকালে কোনও কার্য্যে পরিণত হয় না, এবং সে জনসমাজে নিতান্ত ঘৃণ্য বলিয়া মনে হয়। আর যাঁহারা সাহস সহকারে আমাদের অধিকৃত ধনরাশি দীনহীন অনাথগণকে দান করিয়া নিয়ত ঈশ্বরচর্চ্চায় রত থাকেন, তাঁহারা পৃথিবী হইতে নিষ্পাপ ও নির্ভর হইয়া যান।

কিন্তু সাধারণতঃ এবিষয়ে এখনকার লোকের আস্থা আদৌ নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। তাহাদের অন্তঃকরণ কামক্রোধলোভাদি রিপুচয়ের মায়াপাশে সর্ব্বক্ষণ সমাচ্ছন্ন থাকায় তাহাতে ঈশ্বরের গূঢ় রহস্যকুসুম প্রস্ফুটিত হইতে পায় না। মনে নিয়ত অশেষবিধ বিষয়চিন্তার আবির্ভাব হইলে, ঈশ্বরের জ্যোতিঃ তন্মধ্যে ঘৃণাবশতঃ প্রবেশ করে না। কাজেই তাহারা সংসার ভিন্ন ঈশ্বরকে পায় না। আর যাহারা ঈশ্বরপ্রাপ্তি ও সংসারপ্রাপ্তি উভয়ই কামনা করে, তাহাদেরও ঈশ্বরপ্রাপ্তি ঘটিয়া উঠে না। কারণ একাধারে দুগ্ধ ও পঙ্ক নিক্ষিপ্ত হইলে দুগ্ধের পবিত্রতাহেতু পঙ্ক পবিত্র হয় না, বরং পঙ্ক সংস্পর্শে দুগ্ধই নষ্ট হয়। সুবাসিত গোলাপজল-পরিপূর্ণ কূপ মধ্যে কুকুরে ঝাঁপ দিলে তৎক্ষণাৎ ঐ জল অব্যবহার্য্য হইয়া পড়ে।

পৃথিবী মায়ারূপিনী, মুহুর্মুহুঃ নানাবিধ ভাব পরিগ্রহ করিয়া আবালবৃদ্ধ সকলকেই আপন বশীভূত করিবার চেষ্টা করে। অজ্ঞ লোকেরা পৃথিবীর কুহক ও ছলনা বুঝিতে না পারিয়া ইহার বশ্যতা স্বীকার করিয়া স্ব স্ব পরকালের পথ একেবারে কণ্টকাকীর্ণ করিয়া তুলে। যাঁহারা প্রকৃত তত্ত্ববিদ্, তাঁহারা কখনও কুহকিনী পৃথিবীর মায়াপাশে বদ্ধ হন না বরং ইহা পরিত্যাগ করিবার জন্য লোকদিগকে শতবার পরামর্শ দেন। বীরকুলশ্রেষ্ঠ পুরুষপূজনীয় আলি (কঃ ওঃ)* এই সংসারকে তুচ্ছ জ্ঞান করিয়া জগতের প্রাধান্য লাভ করতঃ অমর হইয়া অমরপুরে গমন করিয়াছেন। আর মায়ারূপী পৃথিবীর বশ্যতাপন্ন এবং সাধ্যাতীত সম্পদ লোভপরবশ হইয়া দামাস্কসের (দামেস্কের) রাজা পাপাত্মা এজিদ অসঙ্গত কারণে অনাহারে কারবালার মরুভূমিতে নবীবংশ ধ্বংস করিয়া সকল শ্রেণীর লোকেরই একেবারে ঘৃণাস্পদ এবং পরকালে বিশেষ যাতনাময় নরকে পাপভোগের যোগ্য হইয়া মানবলীলা সম্বরণ করিয়াছে। কালে কালে সেই মহাপাপীর দুর্নাম, অপযশঃ ও নিন্দা ঘোষিত হইয়া আসিতেছে। অন্যত্র বিষয়রক্ষা, ধনরক্ষা ও মানরক্ষার্থে লোকে বিবাদপরবশ হইয়া পরস্পর ঘোরতর যুদ্ধে পরিব্যাপ্ত হয় এবং ঈশ্বরের সৃষ্টির বিনাশসাধন করিয়া যুদ্ধস্থল নরশোণিতে রঞ্জিত করে। পৃথিবীর লোকেরা লোভহেতু না করিতে পারে এমন কুকর্ম্মই নাই। সুতরাং পৃথিবী পাপময়ী ও পাপপঙ্কিলা হইয়া আপন সন্তানগণের মর্ম্মে অলক্ষ্যে কুঠারাঘাত করে।

এই সমস্ত ব্যাপার দেখিয়া শুনিয়া পৃথিবীর অস্থায়ী মমতায় মোহিত হওয়া ও তদ্গতপ্রাণ হওয়া একান্ত গর্হিত কার্য্য। কালে এই পৃথিবীই যে শত্রু হইয়া দাঁড়াইবে, তাহা কেহই পূর্ব্বে স্থির করিতে পারে না। অতএব মৃত্যুর পূর্ব্বেই শব মধ্যে পরিগণিত হওয়া উচিত। যেমন মৃত্যু হইলে মনুষ্যের ধন, রত্ন, বিষয়-আশয়, মান-সম্ভ্রম, খ্যাতিপ্রতিপত্তি কিছুই সঙ্গে যায় না, তেমনি জীবিত থাকিতে থাকিতে ঐ সকলকে ত্যাগ করিতে পারিলে যথার্থ তত্ত্ববিদ্ মধ্যে পরিগণিত হইবার একান্ত ভরসা করা যায়। ঈশ্বরের নাম এমন অমৃতময় যে যাঁহারা ভক্তিসহযোগে যথারীতি উহা অভ্যাস করেন, তাঁহাদের মরণকে মরণ বোধ হয় না; তাঁহাদের নিকট জীবন-মরণ একই কথা। ঈশ্বরের নামই তাঁহাদের কর্ম্মফলের মৃতসঞ্জীবনী। মরিলেও লোকে তাঁহাদের নামোচ্চারণ করিয়া এবং মাহাত্ম্য, সাধনপ্রণালী ও ক্রিয়াকলাপাদির পরিচয় দিয়া তাঁহাদিগকে অমর করিয়া দেয়। এইজন্য তাঁহারা মৃতদের মধ্যে পরিগণিত নহেন। পুরুষপ্রধান হজরত মহম্মদ (দঃ) বলিয়াছেন—"যাঁহারা ঈশ্বর-পথের পথিক ও সর্ব্বান্তঃকরণে তাঁহাকে স্মরণ করেন তাঁহারাই অমর; অতএব বৎস! তোমার শিক্ষার নিমিত্ত যাহা উপদেশ দিলাম, মনে স্মরণ রাখিবে।" এই বলিয়া তাপসপ্রবর খেজর অন্তর্হিত হইলে রাজা এব্রাহিম তদ্দণ্ডেই

* কঃ ওঃ—'করম উল্লাহে উয়াজ হঃ' অর্থাৎ পরমপাতা পরমেশ্বর তাঁহার প্রতি (করম) কৃপা করুন।

সন্ন্যাসধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া কাননপথে প্রস্থান করিলেন।

(৪)

একদা নিশাকালে মহামতি নরপতি এব্রাহিম কারুকার্য্য-খচিত ত্রিতল প্রাসাদে সানন্দে সুষুপ্তিসুখ অনুভব করিতেছিলেন;—এমন সময়ে ছাদের উপরে কোন মনুষ্যের দ্রুত পদসঞ্চালন শব্দ শুনিয়া জাগরিত ও চকিত হইয়া দীপালোকে দেখিলেন, এক ব্যক্তি যেন কোন অপহৃত বস্তুর অন্বেষণ করিতেছে। রাজা তৎক্ষণাৎ তাহার ছাদের উপর উঠিবার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে সে বলিল, "অদ্য সন্ধ্যার সময় আমার একটী উট কোন্‌দিকে নিরুদ্দেশ হইয়া গিয়াছে, আমি তাহার সন্ধান করিতে এখানে আসিয়াছি।" রাজা তাহার কথায় হাস্য সম্বরণ করিতে অসমর্থ হইয়া বলিলেন—"নির্ব্বোধ! উট কি ছাদে উঠিতে পারে? না ছাদের উপর তাহার সন্ধান হয়?" এই কথা শুনিবামাত্র সে রাজাকে ব্যঙ্গ করিয়া গম্ভীরস্বরে বলিল, "ঈশ্বর কি সিংহাসনে আরোহণ করেন? না তথায় তাঁহার সন্ধান পাওয়া যায়?" তাহার এই উপদেশসম্বলিত ব্যঙ্গ বাক্যের ভাব গ্রহণ করিয়া রাজা তৎক্ষণাৎ সাংসারিক ব্যবহার পরিহার পূর্ব্বক বনাভিমুখে প্রস্থান করিলেন।

আগ্নেয়গিরির আত্মপ্রকাশ।

(শ্রীপঞ্চানন রায়)

প্রাচীন কোষ-গ্রন্থাদিতে পর্ব্বতের "অচল" নামটী দেখিতে পাওয়া যায়। উক্ত নামটী যে যোগ্য পাত্রেই অর্পিত হইয়াছে সে বিষয়ে কোন সন্দেহই নাই; কিন্তু ঐ শান্তশিষ্ট অচলদেবটী যখন সময়ে সময়ে চরম চাঞ্চল্য প্রকাশ করিয়া বিশ্বকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলেন তখন আশুতোষ মহেশ্বর ও বিশ্ববিনাশক ধূর্জ্জটীকে স্মরণ করিয়া আমাদিগকে ঐ অসীম বৈপরীত্যের আশু সমাধান করিয়া লইতে হয়।

শুনা যায় পুরাকালে পক্ষধারী পর্ব্বতগণ অচলরূপ অপবাদটা আপনাদের স্কন্ধ হইতে ঝাড়িয়া ফেলিয়াছিলেন; কিন্তু গোত্রভিদ্‌ দেবরাজের কৃপায় পক্ষহীন হওয়াতে ঘাড়ের বোঝা দ্বিগুণ বাড়িয়া গিয়াছিল; তাই সেই অপমানটার প্রতিশোধমানসেই হউক অথবা একঘেঁয়ে জীবনের পরিবর্ত্তনকল্পেই হউক, উহাদিগকে যে সময়ে সময়ে বিশ্বগ্রাসী রুদ্রদেবের প্রচণ্ড লীলাভিনয় করিতে হয় উহাতে আশ্চর্য্যের কিছুই নাই; কিন্তু ঐ অভিনয়ের কোন নির্দ্দিষ্ট সময় না থাকাতে, উহা যে সময়ে সময়ে মানবের পক্ষে ভীষণ হইয়া উঠে ইহাই চিন্তার বিষয়।

ভয়াবহ নিস্তব্ধতা ভীষণতম উপপ্লবের পূর্ব্বাভাস। ভয়ঙ্কর ঝঞ্ঝা উৎপন্ন করিবার পূর্ব্বে বিশ্বপ্রকৃতি আশ্চর্য্যরকম স্তব্ধ হইয়া যায়। টোকিও বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূতত্ত্ব ও খনিজ-বিদ্যার অধ্যাপক জন মিলনে ১৮৮৮ খৃষ্টাব্দে জাপানের ছদ্মবেশী আগ্নেয়গিরি বান্দেসানকে পর্য্যবেক্ষণ করিতে গিয়া তাহার প্রশান্তগম্ভীর ভাব অবলোকন করিলেন। সজীব আগ্নেয়গিরির কোন লক্ষণই উহাতে পরিস্ফুট ছিল না। দূর যুগেও উহার সামান্যতম উৎপাতেরও কোন নিদর্শন বা জনপ্রবাদ পাওয়া যায় নাই। যুগযুগান্ত ধরিয়া আকাশচুম্বী প্রশান্ত শৃঙ্গধারী গিরিবর নিস্তব্ধভাবে দণ্ডায়মান।

দিগন্তবিস্তৃত শস্যক্ষেত্রসমূহ অসীম শান্তির পরিচয় দিতেছে। মৃগশিশুগণ সানন্দে বিচরণ করিয়া রাজ্যটীকে আনন্দময় করিয়া তুলিয়াছে। একটী উষ্ণ প্রস্রবণ অসংখ্য রোগক্লিষ্ট মানবকে রোগমুক্ত করিয়া পর্ব্বতের অনন্ত মহিমা ঘোষণা করিতেছে। অধ্যাপকবর প্রস্রবণটীকে আগ্নেয়গিরির একটী লক্ষণ বলিয়া মনে করিলেন। ক্রমে ক্রমে আরও দুইটী প্রধান লক্ষণ—পুঞ্জীভূত গিরিস্রাব ও আগ্নেয়গিরি-গুহায়ুগ্ম আবিষ্কৃত হইয়া ইহাকে প্রকৃত আগ্নেয়গিরি বলিয়া প্রমাণ করিয়া দিল।

১৮৮৮ খৃষ্টাব্দের ১৫ই জুলাই, হেমময় সৌরকিরণ তৃণগুচ্ছে প্রতিফলিত হইয়া রাজ্যটীকে স্বর্ণময় করিয়া তুলিয়াছে। সানন্দে কৃষকগণ নিজ নিজ কর্ম্ম সমাপন করিতেছে। সহসা সহস্র বজ্রধ্বনির ন্যায় ভীষণ শব্দে বান্দেসানের শিখর বিচ্যুত হইয়া পড়িল। গাঢ় ধূমে গগনমণ্ডল সমাচ্ছন্ন হইয়া গেল। অবিরাম কর্দ্দম ও শিলাখণ্ড বর্ষিত হইয়া পর্ব্বতের চতুর্দ্দিক সম্পূর্ণরূপে আবৃত করিয়া ফেলিল।

বৈজ্ঞানিকগণের গবেষণা মতে ঐ কর্দ্দম ও শিলাখণ্ডসমূহকে নির্দ্দিষ্ট আকারে রূপান্তরিত করিয়া পর পর সাজাইয়া রাখিলে, ঐ খণ্ডসমূহ দ্বারা পৃথিবীকে পাঁচবার পরিবেষ্টিত করিতে পারা যাইত। ঐ দ্রব্যসমূহকে ১৫০০০ টন হিসাবে প্রত্যেক বাষ্পীয় পোতে বোঝাই করিলে ঐ পোতশ্রেণী দ্বারা লণ্ডন হইতে উত্তমাশা অন্তরীপ পর্য্যন্ত বিস্তৃত জলময় ভূভাগটীকে সমাচ্ছন্ন করিতে পারা যাইত।

উক্ত প্রস্তর ও কর্দ্দমের সংমিশ্রণে উৎপন্ন একটী নদী ঘণ্টায় আটচল্লিশ মাইল বেগে প্রবাহিত হইয়া বহু গ্রামকে শত শত ফুট নিম্নে সমাহিত করিয়া ফেলিল। শস্যশ্যামল ক্ষেত্ররাজি নিমেষে নগ্ন ধূসর প্রান্তরে পরিণত হইল। প্রবল বায়ু চতুর্দ্দিকে ধ্বংসের রাজ্য বিস্তার করিয়া প্রবাহিত হইতে লাগিল। জনসংঘ বিধ্বস্ত ও শস্যসমূহ মৃত্তিকালিপ্ত হইয়া বিনষ্টপ্রায় হইল। একটী পার্ব্বত্য-

নির্ঝরের জলরাশি হঠাৎ বাধাপ্রাপ্ত হইয়া নিকটবর্ত্তী শুষ্ক ভূখণ্ডকে একটী নূতন হ্রদে পরিণত করিয়া ফেলিল। শত শত মণ ভারী পর্ব্বতখণ্ডসমূহ ভীষণ বেগে বিক্ষিপ্ত হইয়া চতুষ্পার্শ্বস্থ আট দশ মাইল বিস্তৃত ভূভাগকে সমাচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল।

বান্দেসান পর্ব্বতটী একটী জনবিরল প্রদেশে অবস্থিত ছিল বলিয়া হতাহতের সংখ্যা অপেক্ষাকৃত কম হইল। উক্ত স্থানের সমূহ গ্রামের অধিবাসী মাত্র ৪০১ জন মনুষ্য এই বিস্ফোরণে প্রাণত্যাগ করিয়াছিল। পত্রসম্ভার-বঞ্চিত বিটপীশ্রেণী শ্রীহীন ভাবে দণ্ডায়মান। তাপদগ্ধ অগণ্য বন্যজন্তুর মৃতদেহে নদীনালা সমাচ্ছন্ন। সর্ব্বত্রই প্রেত-পুরীর বিভীষিকাময় দৃশ্য বিরাজ করিতে লাগিল।

উদ্গীরণ আরম্ভ হইবার তিন দিন পরে অধ্যাপক মিল্নে সদলবলে উপস্থিত হইলেন। বাষ্পময় পিচ্ছিল পথসমূহ অতিক্রম করিয়া তিনি পর্ব্বতটীকে নানাদিক হইতে পর্য্যবেক্ষণ করিয়া জানিতে পারিলেন যে উহার বিশাল শৃঙ্গদেশটী বিচ্ছিন্ন হইয়া গিয়াছে এবং পাতাল-স্পর্শী গুহামুখ হইতে অবিরাম ধূম নির্গত হইতেছে।

১৭৮৩ খৃষ্টাব্দে আসামা-বিস্ফোরণের পর জাপানরাজ্যে এতাদৃশ ভয়ঙ্কর বিস্ফোরণ আর কখনও সংঘটিত হয় নাই। ভুজগকুণ্ডলীর ন্যায় শুষ্ক গিরিনিঃস্রাব আসামা পর্ব্বতগাত্রে বেষ্টিত থাকিয়া এখনও সেই অতীত ব্যাপারের সাক্ষ্য দিতেছে—অতলস্পর্শী গুহামুখ হইতে বিষাক্ত ধূম এখনও অবিরাম নির্গত হইতেছে। অধ্যাপক মিল্নের নেতৃত্বা-ধীনে প্রেরিত অভিযান উক্ত গুহামুখের গভীরতার পরিমাণ করিতে গিয়া অসহ্য উত্তাপে সমুদয় যন্ত্রপাতি বিনষ্ট হওয়াতে বিফলমনোরথ হন।

উপরোক্ত আসামা ও বান্দেসান পর্ব্বতদ্বয়ের বিস্ফোরণ উল্লেখযোগ্য হইলেও উঁহাদের কোনটিকেই ভীষণতম উদ্গীরণ বলা যায় না। ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দের ২৬শে আগষ্ট তারিখে সংঘটিত ক্রাকাতোয়া-বিস্ফোরণের নিকট উহারা কিছুই নহে। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, বিস্ফোরণ আরম্ভ হইবার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত ক্রাকাতোয়া সাধারণের নিকট অজ্ঞাত ছিল। কোন বৈজ্ঞানিকই কখনও উহাকে পর্য্যবেক্ষণ-যোগ্য বলিয়া মনে করেন নাই। যাহা হউক এই ক্রাকা-তোয়া-বিস্ফোরণটীই পৃথিবীর ইতিহাসে সর্ব্বাপেক্ষা ভীষণতম বিস্ফোরণ বলিয়া গণ্য হয়।

ক্রাকাতোয়া জাভা ও সুমাত্রা দ্বীপের মধ্যবর্ত্তী সুন্দা প্রণালীর একটী ক্ষুদ্র দ্বীপ। জাভাদ্বীপটী বহু আগ্নেয়গিরি-অধ্যুষিত। উহাদের কোন কোনটী বারহাজার ফুট উচ্চ ও অবিরাম উদ্গীরণরত। এই পর্ব্বতসমূহের নিকটবর্ত্তী তিন হাজার ফুট উচ্চ ক্রাকাতোয়া কখনও উল্লেখযোগ্য বলিয়া বিবেচিত হয় নাই। কোন বৈজ্ঞানিক যত্নসহকারে পর্য্যবেক্ষণ করিলে উহাতে নানা বিষয় আবিষ্কার করিতে পারিতেন।

আধুনিক বৈজ্ঞানিক গবেষণায় প্রকাশিত হইয়াছে যে, দূর যুগে ক্রাকাতোয়া সুমাত্রা ও জাভাদ্বীপকে আবে-ষ্টন করিয়া দণ্ডায়মান ছিল। অনন্তর কোন ভয়া-বহ বিস্ফোরণে উহার সমুদয় অঙ্গপ্রত্যঙ্গ বিধ্বস্ত হইয়া যাওয়াতে উহা নগণ্য হইয়া পড়িয়াছিল, কিন্তু উহার বিশাল গহ্বর তখনও শক্তিসঞ্চয়ে রত ছিল। এই সুবিপুল গহ্বরটী কেবল ক্রাকাতোয়া দ্বীপেই সীমাবদ্ধ ছিল না, সুন্দাপ্রণালীর আরও বহু দ্বীপকে উহা অঙ্কগত করিয়া লইয়াছিল।

বৈজ্ঞানিকদের সকল অগ্রাহ্যকে তুচ্ছ করিয়া ক্রাকা-তোয়া ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দের ২০শে মে নিছক বাষ্প নির্গমন-রূপে আত্মপ্রকাশ করিতে আরম্ভ করিল। দিনের পর দিন ধরিয়া বিশাল গহ্বরের এক-একটী কোষ উন্মুক্ত হইতে লাগিল। ২৪শে জুন তারিখে ভূতলস্থ দুইটী বিশাল গুহামুখ উন্মুক্ত হইয়া সমুদ্রবারিকে প্রবেশের সুবিধা করিয়া দিল। অনন্তর গজ-কচ্ছপের বিস্ময়কর যুদ্ধের ন্যায় তপ্ত বায়ু ও অগ্নিশিখার অদ্ভুত রণোদ্যম চলিতে লাগিল।

২৬শে আগষ্ট বিস্ফোরণ সর্ব্বাপেক্ষা ভীষণ আকার ধারণ করে। মৃত্তিকাতলস্থ বিস্ফোরণসমূহ সমুদ্রবারিকে প্রত্যাহত করিয়া বারিধিবক্ষকে ভীষণ তরঙ্গসঙ্কুল করিয়া ফেলিল। গাঢ় ধূমে আকাশ আচ্ছন্ন হইয়া গেল। সারা রাত্রি ধরিয়া বিদ্যুল্লহরী উহার উপর নানাপ্রকার ক্রীড়া-ভঙ্গি প্রদর্শন করিতে লাগিল। অবিশ্রান্ত প্রস্তর ও কর্দ্দমবৃষ্টি সুন্দা প্রণালীকে অসম্ভবরূপে পঙ্কিল করিয়া তুলিল, প্রবল জলোচ্ছ্বাসে সুমাত্রা ও জাভা দ্বীপের বহু বন্দর বিধ্বস্ত হইয়া গেল। প্রায় ৩৭ হাজার মানব অকালে প্রাণ হারাইল। এক-একটী তরঙ্গের উচ্চতা ১৩৫ ফুট পর্য্যন্ত হইয়াছিল। একটী রণতরী জলোচ্ছ্বাসে সুন্দা প্রণালী হইতে একক্রোশ দূরবর্ত্তী ৩০ ফুট উচ্চ উপত্যকার উপর উত্তোলিত হইয়াছিল। বজ্রগম্ভীরধ্বনি-সমূহ উদ্ভূত হইয়া আকাশ পরিপ্লাবিত করিয়া ফেলিল। ৪০০০ মাইল দূরবর্ত্তী স্থানসমূহ হইতেও উক্ত শব্দ শুনিতে পাওয়া গিয়াছিল। কোন কোন স্থলে আসন্ন বিপদা-শঙ্কায় রণতরী ও শান্তিরক্ষকসমূহ প্রস্তুত রাখিতে হইয়াছিল। উৎক্ষিপ্ত ধূলিকণাসমূহ প্রায় বৎসরাধিক কাল গগনে ভাসমান ছিল।

এই বিস্ফোরণের পর হইতে ক্রাকাতোয়া ১৫০ ফ্যাদম (fathom) গভীর জলে অবস্থান করিতেছে। দুইটী নূতন দ্বীপ মস্তকোত্তলন করিয়া দণ্ডায়মান রহিয়াছে। ইতিহাসপ্রসিদ্ধ কোন উদ্গীরণেই এইরূপ বিপর্য্যয় সাধিত হয় নাই।

ব্রহ্মসঙ্গীত-স্বরলিপি।

ভৈরবী—তেওরা।

অরূপেরি রূপ হেরে এই ফেরে না আঁখি
মনে লাগে সারাজীবন তাকায়েই থাকি।
কি যে শুভ্র সুনীল আকাশ
কি যে গন্ধ-মধুর বাতাস
কি বিচিত্র ফুলের বিকাশ
লক্ষবরণ পাখী।
মনে লাগে এম্নিতরই থাকি চাহিয়া
আর, চেয়ে চেয়েই যুগযুগান্ত যাউক বাহিয়া।
আকাশ-ভরা দৃষ্টি তাঁহার
দুলাক যত গীতি হিয়ার
আনন্দে গাই শোনাই তাঁরে
ঐ চোখে চোখ রাখি॥

কথা, সুর ও স্বরলিপি—শ্রীনির্ম্মলচন্দ্র বড়াল বি-এল।

১´ ২ ৩ ১´ ২
[জ্ঞা মা]
II { মা মা -া। মা -পা। জ্ঞমা -পদা I দপা -মজ্ঞা রা। জ্ঞা -া ॥
অ রূ • পে • রি • •• রূ • •প হে রে •

৩ ১´ ২ ৩ ১´ ২
। মজ্ঞা -া I ঋা সা -ঋা। সঋা -জ্ঞমা। জ্ঞঋা সণ্‌া I সা -া -া। -া -া।
এ ই ফে রে • না• •• আঁ• •• খি • • • •

৩ ১´ ২ ৩ ১´ ২
।-া -া } I ণ্‌া সা -দা। দা -া। ণা -া I পা পা -া। দপা -মজ্ঞা।
• • ম নে • লা • গে • সা রা • জী• ••

৩ ১´ ২ ৩ ১´ ২
। রা -া I জ্ঞা পা -া। মপা -দণা। ণদা -পমা I মা -া -া। -া -া।
ব ন্‌ তা কা • য়ে• •ই থা• •• কি • • • •

৩
। -মা -পা II
• •

১´ ২ ৩ ১´ ২ ৩
II পা -া মা। দা -া। দা -ণা I ণা র্সা -া। দণা -র্সঋা। র্সা -া I
কি •যে শু • ভ্র • সু নী ল আ• •• কা শ্‌

১´ ২ ৩ ১´ ২ ৩
I র্সা -র্জ্ঞা র্জ্ঞা। র্জ্ঞা -া। র্জ্ঞা -া I র্মা র্জ্ঞর্ঋা -র্সণা। ণর্সা -র্জ্ঞর্ঋা। র্সা -া I
কি • যে গ ন্ ধ • ম ধু• •র বা• •• তা স্

১´ ২ ৩ ১´ ২ ৩
I সা -পা পা। পা -া। পা -দা I র্সা র্সণা -দণা। দা -া। পা -া I
কি • বি চি • ত্র • ফু লে• •র বি • কা শ্

১´ ২ ৩ ১´ ২ ৩
I মপা -দণা ণা। দা -া। দপা মা I ঋা মা -া। -া -া। -মা -পা II
ল• •• ক ব • র• ণ পা খী • • • • •

১´ ২ ৩ ১´ ২ ৩
II মা সা -া। সা -া। সা -ঋা I জ্ঞা -মা মা। মা -া। মা -া I
ম নে • লা • গে • এ ম্ নি ত • র ই

১´ ২ ৩ ১´ ২ ৩
I সা জ্ঞা -া। সজ্ঞা -মদা। -ঋাঃ জ্ঞঃ I মা -া -া। -া -া। মা -া I
থা কি • চা• •• • হি য়া • • • • আ র্

১´ ২ ৩ ১´ ২ ৩
I জ্ঞা জ্ঞা -ার। জ্ঞা -া। রজ্ঞা -মা I জ্ঞা -া ঋা। সা -া। দ্‌া -ণ্‌া I
চে য়ে • চে • য়ে• ই যু গ্ যু গা ন্ ত •

১´ ২ ৩ ১´ ২ ৩
I সা সা -ঋা। সঋা -জ্ঞমা। -ঋাঃ ণ্‌ঃ I সা -া -া। -া -া। -া -া II
যা উ ক্ বা• •• • হি য়া • • • • • •

১´ ২ ৩ ১´ ২ ৩
II মা দা -া। ণা -দা। দা -ণা I ণা -র্সা র্সা। দণা -র্সঋা। র্সা -া I
আ কা শ ভ • রা • দৃ ষ্ টি তাঁ• •• হা র্

১´ ২ ৩ ১´ ২
I র্জ্ঞা র্জ্ঞা -র্রা। র্জ্ঞাঃ -র্রঃ। র্জ্ঞা -ার্ I র্জ্ঞা র্জ্ঞা -র্ঋর্সা। ণর্সা -র্জ্ঞর্ঋা।
ছ লা ক্ ব • ভ • গী তি •• হি• ••

৩ ১´ ২ ৩ ১´ ২
। র্সা -া I সা সা -পা। পা -া। পা -দা I র্সা র্সণা -দণা। দা -া।
য়া র্ আ ন ন্ দে • গা ই শো না• •ই তাঁ •

৩ ১´ ২ ৩ ১´ ২
। পা -া I মপা -দণা ণা। দা -া। দপা -মা I ঋা মা -া। -া -া।
য়ে • ঐ• •• চো খে • চো• খ্ রা খি • • •

৩
-মা -পা II
• •

—•—

শিক্ষকতা সম্বন্ধে যৎকিঞ্চিৎ।

(কবিগুণাকর শ্রীআশুতোষ মুখোপাধ্যায় বি-এ)

আজকালকার দিনে অধিকাংশ গ্রাজুয়েটই স্কুলের শিক্ষক—আর তাঁদের সংখ্যাও অনেক বেশী। সুতরাং তাঁরা যে সমস্ত জীবনভোর ill-fed, ill-clad ও discontented সে বিষয়ে প্রকৃষ্ট প্রমাণ অনাবশ্যক। অথচ এই সকল শিক্ষকদেরই হাতে ভবিষ্যৎ বংশধরদিগের শুভাশুভ নির্ভর করছে। স্কুলের ছেলেরাই আমাদের দেশের আশা-ভরসা। তাদের চরিত্রগঠন, তাদের মানুষ করে তোলার ভার শিক্ষকদেরই উপর পনেরো আনা ন্যস্ত। এমত ক্ষেত্রে তাঁরা যদি দুবেলা দুমুঠো পেটভরে' খেতে না পান—তাঁদের পোষ্যবর্গকে ভাল করে খাওয়াতে পরাতে না পারেন—একটুকু সুখে স্বচ্ছন্দে থাকবার সুবিধা না পান এবং সেইজন্য সদাসর্ব্বদাই অসন্তুষ্ট ও খুঁৎখুঁৎ করতে থাকেন, তাহলে তাঁরা নিজেদের কর্ত্তব্যসাধনে যে কতদূর সক্ষম হন সে সম্বন্ধে খুবই সংশয় আছে। সুতরাং অন্ততঃ শিক্ষার খাতিরে—যাতে সুশিক্ষার ব্যতিক্রম না হয় তারই জন্য, শিক্ষাবিভাগের কর্ত্তৃপক্ষগণের ও সরকার বাহাদুরের দেখা উচিত যাতে প্রত্যেক শিক্ষকের আর্থিক অবস্থা অপেক্ষাকৃত স্বচ্ছল হয়—যাতে প্রত্যেক শিক্ষক বেশ সুখশান্তি ও স্বস্তিতে থেকে নিজের কর্ত্তব্য যথারীতি সম্পাদন করতে পারেন এবং ভবিষ্যৎ বংশধরদিগকে দেশের সুসন্তান করে' গড়ে তুলে পরমেশ্বরের আশীর্ব্বাদ অর্জ্জন করে যেতে পারেন। এই ব্যাপার নিয়ে অনেকদিন থেকেই অনেক রকমের আলোচনা-আন্দোলন চলছে কিন্তু এ যাবৎ ত তেমন কিছু ফল পাওয়া যায় নি, আর শেষে যে কোথাকার জল কোথায় গিয়ে মরবে, তা এখন কেউ কিছু বলতে পারে না।

আচ্ছা, না হয় স্বীকার করা গেল (আর সেটা সম্পূর্ণ সত্য) যে, বর্ত্তমানকালে গ্রাজুয়েট স্কুল শিক্ষকদের—তথা সমস্ত শিক্ষকেরই অবস্থা বড়ই সঙ্গীন। তাঁরা পেটভরে খেতে পরতে পান না, স্ত্রী-পুত্র-পরিবারবর্গকে পেটভরে খাওয়াতে পরাতে পারেন না, নিজেকে বা পোষ্যদিগকে সুখে স্বচ্ছন্দে রাখতে পারেন না, আর সেই জন্য সদাসর্ব্বদা মনোদুঃখে থাকেন—সুতরাং তাঁরা যথারীতি আপনাদের কর্ত্তব্য সাধন করতে পারেন না, অথবা কতকটা ইচ্ছা করে করেন না। কিন্তু তাই বলে নীতির দিক দিয়ে দেখতে গেলে সেটা করা কি তাঁদের উচিত? যখন কোন লোক—তিনি গ্রাজুয়েট হউন বা নাই হউন, শিক্ষকতার পদ স্বেচ্ছায় বরণ করে' লন (তবে এখনকার দিনে অনেকস্থলেই শিক্ষকতা means to an end হয়ে পড়েছে—অর্থাৎ law পড়তে হবে—কিম্বা অন্য কিছু করতে হবে—কিছু টাকার দরকার; সুতরাং কিছুদিন শিক্ষকতা করে মাসিক যা' কিছু পাওয়া যায়—"লাভ গৃহমাগতম্"—তাতে অনেক বিষয়ে অনেকটা সুবিধা হতে পারে এই ভেবে অনেকেই শিক্ষকতা গ্রহণ করেন)—তা অল্প দিনের জন্যই হোক বা বেশী দিনের জন্যই হোক—তখন তাঁর বেশ করে বোঝা উচিত যে শিক্ষকতা একটা পবিত্র কর্ম্ম—ইহার দায়িত্ব অনেক; আর ঐ দায়িত্ব যথারীতি রক্ষা করতে না পারলে নিজেও প্রত্যবায়ভাগী হন আর সেই সঙ্গে সঙ্গে যে সমস্ত ছেলের ভার তাঁর উপর দেওয়া হয় তাদের—শুধু নিজেদের নয়, তাদের বাপমাদের পর্য্যন্ত—বিশেষ অনিষ্ট করা হয়। আর যাঁরা চিরদিন শিক্ষকতা করে আসছেন, তাঁদের পক্ষে ঐ জিনিষটা আরও সুষ্ঠু ভাবে হৃদয়ঙ্গম করা উচিত। যখন তাঁরা যে কারণেই হোক—শিক্ষকতাকেই জীবনের একমাত্র ব্রত বলে গ্রহণ করেছেন, তখন হাজার অসুবিধা সত্ত্বেও তাঁদের সেই কর্ত্তব্যকর্ম্ম ভাল করে সম্পাদন করা বিধেয়। এস্থলে তাঁদের মনে করতে হবে যে তাঁদের পক্ষে শিক্ষকতা করাই ঈশ্বরের অভিপ্রেত—সুতরাং সর্ব্ববিষয়েই তাঁদের সংযমী হতে হবে—যে সমস্ত ভাল ভাল বিষয়ে ছাত্রদের যে যে উপদেশ দেন সেই সেই উপদেশ সর্ব্বপ্রথমে নিজেকে পালন করতে হবে, ছাত্রদের মানুষ করে তোলবার আগে নিজেকে মানুষ করে তুলতে হবে—নতুবা তাঁর শিক্ষায়, তাঁর উপদেশে কোন ফলই ফলবে না। "Example is better than precept"—এই নীতিবাক্য তাঁদের নিজের জীবনে অক্ষরে অক্ষরে মেনে চলতে হবে। এ সম্বন্ধে আমাদের একটী সুন্দর গল্প মনে পড়ল—গল্পটী এই।

"যখন হজরৎ মহম্মদ মদিনায় তাঁর নবপ্রবর্ত্তিত ইসলাম ধর্ম্ম প্রচার করতে ব্যস্ত ছিলেন, তখন ঐ স্থানে একঘর অতি দরিদ্র বৃদ্ধ দম্পতি বাস করত। তাঁদের একটীমাত্র ছোট ছেলে ছাড়া আর কেউ ছিল না। বুড়া বয়সের—সুতরাং অতি স্নেহের এই একমাত্র সন্তানের নানা আদর-আব্দার—বালকসুলভ নানারকম অত্যাচার তাঁরা হাসিমুখে ও নীরবে সহ্য করতেন। ছেলেটী যখন যা চাইত হাজার বাধাবিঘ্ন ও অসুবিধা সত্ত্বেও বুড়ো-বুড়ীকে বিনা আপত্তিতে তৎক্ষণাৎ তা সরবরাহ করতে হতো। ছেলে যত বড় হতে লাগল, ততই তার আদর-আব্দারের মাত্রা বাড়তে লাগল। একে ত বুড়োবুড়ীর সংসারে খুবই অভাব অনটন—তার উপর ছেলের নিত্যই নূতন জিনিষের ফরমাস—তার বড় বেশী ঝোঁক ছিল সন্দেশ খাবার, এজন্য সে বুড়োবুড়ীকে বড়ই ব্যতিব্যস্ত করে তুলল। আর তারা ছেলের সন্দেশ কেনবার পয়সা জোটাতে পারে না—অথচ

ছেলেরও সন্দেশ না হ'লে চলে না। বুড়োবুড়ী বিশেষ ফাঁপরে পড়ল। শেষে অনেক ভেবে চিন্তে ঠিক করল যে বুড়ো একদিন তাঁর আদুরে ছেলেটীকে পয়গম্বর হজরত মহম্মদের নিকট নিয়ে যাবে। তিনি নাকি সকল লোকের প্রার্থনা পূরণ করেন—যে যা চায়, তিনি তাকে তৎক্ষণাৎ তাই দেন। লোকের নানা রকম রোগ—তা যতই কঠিন হউক না কেন—তাঁর একবারমাত্র চোখের চাহনিতেই আরাম হয়ে যায়, সুতরাং ঐ ছেলেটীর সন্দেশ খাওয়ার রোগও বোধ হয় তিনি সারিয়ে দিতে পারবেন।

"এই মনে করে, বুড়ো একদিন ছেলেটীকে সঙ্গে করে নিয়ে হজরত মহম্মদের কাছে গিয়ে হাজির হল। পয়গম্বর তখন তাঁর শিষ্যমণ্ডলীকে উপদেশ দিতে ব্যস্ত ছিলেন। তিনি বুড়োর মুখ থেকে ছেলেটীর সন্দেশ খাবার কাহিনী বেশ ভাল করে শুনে খানিকক্ষণ ছেলেটীর পানে তাকিয়ে রইলেন, তারপর তাকে আর একমাস পরে তাঁর কাছে পুনরায় নিয়ে আসতে তার বাবাকে আদেশ করলেন। বুড়ো সেদিনকার মত ছেলেটীকে নিয়ে বাড়ী ফিরল। তার পর একমাস কেটে যাবার পর বুড়ো পুনরায় একদিন ছেলেটীকে নিয়ে পয়গম্বরের সভায় দেখা দিল। এবার তিনি ছেলেটীকে তার বাবার দুরবস্থার বিষয়—অত্যধিক সন্দেশ খাবার কুফল ইত্যাদি বেশ ভালকরে বুঝিয়ে ও নানা উপদেশ দিয়ে তাকে সন্দেশ খেতে বারণ করলেন ও শেষে উভয়কে বিদায় দিলেন। বাবা তার ছেলেটীকে নিয়ে বাড়ী ফিরে এলো এবং আশ্চর্য্য হ'য়ে দেখতে পেলো যে, সেদিন থেকে তার ছেলের সন্দেশ খাওয়ার রোগ সম্পূর্ণ সেরে গেছে। এখন পয়গম্বরের উপর বুড়ো-বুড়ী উভয়েরই কি অগাধ বিশ্বাসই না হলো। বুড়ো সেই থেকে পয়গম্বরের শিষ্যসভায় আসা-যাওয়া করতে লাগল। একদিন সে কথাপ্রসঙ্গে তাঁকে জিজ্ঞাসা করল—'আপনি প্রথম দিন ছেলেটীর সন্দেশ খাওয়ার রোগ সারিয়ে না দিয়ে একমাস পরে দিলেন কেন?' পয়গম্বর উত্তর করলেন, "আমিও তোমার ছেলের এখানে আসবার আগে তারই মত খুব সন্দেশ খেতে ভালবাসতুম,—সন্দেশ না হ'লে আমার চলত না; কিন্তু যখন শুনলুম যে তুমি তোমার ছেলেটীর সন্দেশ খাওয়ার রোগ আমাকে দিয়ে সারিয়ে নিতে এসেছ তখন বুঝলুম যে, নিজে ওবিষয়ে সংযমী না হ'লে তোমার ছেলেকে ওবিষয়ে সংযমী হ'তে বললে কোন ফলই হবে না। তাই প্রথম দিন তোমার ছেলেটীকে ঘরে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে বলে' আমি নিজে একটু একটু করে সন্দেশ খাওয়ার লোভ ত্যাগ করতে লাগলুম—শেষে এক মাসের মধ্যে ঐ বিষয়ে আমি সম্পূর্ণরূপে সংযমী হ'তে শিখলুম। তারপর তোমার ছেলেকেও সন্দেশ খাওয়া সম্বন্ধে সংযমী করে তুললুম। সুতরাং এটা নিশ্চয়ই জেনো যে, কোন বিষয়ে নিজে সংযমী না হয়ে সেই বিষয়ে পরকে সংযমী হতে শিক্ষা দেওয়া উচিত নয়, আর তা' দিলে সে শিক্ষা কোন কাজেরই হয় না।" পয়গম্বরের মুখ-নিঃসৃত কথাগুলি শুনে বুড়োর চোখ খুলে গেল।"

ঐ সুন্দর গল্পটা মনে রেখে প্রত্যেক শিক্ষকেরই শিক্ষকতা করা উচিত। কেহ যদি তা না পারেন তাহলে তিনি যেন অপরের শিক্ষার ভার গ্রহণ না করেন। প্রত্যেক শিক্ষকেরই জানা উচিত যে, প্রাচীন ভারতে শিক্ষার ভার সংযমের অবতার আর্য্য ঋষিদের হস্তে অর্পিত ছিল, আর সেই জন্যই তখনকার দিনে শিক্ষা সম্পূর্ণ ও সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হত। এখন যে তা হওয়া সম্ভবপর নয়, সে কথা আমি কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারি না। তবে আন্তরিক ইচ্ছা চাই—প্রকৃত সাধনা চাই। বর্ত্তমান যুগে মহামতি গোখলের দৃষ্টান্ত প্রত্যেক শিক্ষকেরই অনুকরণযোগ্য। তিনি মাসিক পঁচাত্তর টাকা মূল্যের শিক্ষকতাকেই হাস্য-মুখে আজীবন বরণ করে নিয়েছিলেন। আর তাও বলি, শিক্ষকদের দুরবস্থাসম্বন্ধে শিক্ষাবিভাগের কর্ত্তৃপক্ষ-গণের ও ছেলের বাপ-মাদের এরূপ দৃষ্টি রাখা কর্ত্তব্য, যাতে তাঁরা বেশ একটু সুখে স্বচ্ছন্দে দিনপাত করতে পারেন।

সঙ্গীত-রত্নাকর।

যদিও 'শীর্ষক' পাঠে বুঝা যায়—প্রবন্ধটী কোন সঙ্গীতগ্রন্থ বিষয়ক, তথাপি, নিঃসন্দেহ বোধের ও চিত্তাকর্ষণের নিমিত্ত 'সঙ্গীত-রত্নাকর' গ্রন্থের যৎ-কিঞ্চিৎ পরিচয়প্রদান আবশ্যক বোধ করিলাম।

বর্ত্তমান কালে, সংস্কৃত ভাষায় লিখিত যতগুলি সঙ্গীত-গ্রন্থ পাওয়া যায় তন্মধ্যে এই সঙ্গীত রত্নাকর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ও সর্ব্বাংশে উৎকৃষ্ট। পাঠ করিলেই বুঝা যায়, এই গ্রন্থ অন্যূন সপ্তশত বৎসর পূর্ব্বে জন্মলাভ করিয়া সঙ্গীতকলাকে অত্যধিক উন্নতির পথে অগ্রসর করিয়াছিল। এই গ্রন্থ এদেশের সর্ব্বাদিম নহে। ইহার পূর্ব্বেও এদেশে শত শত সঙ্গীতগ্রন্থের প্রচার ছিল। শার্ঙ্গদেব সেই সকল গ্রন্থের সার সংকলনপূর্ব্বক এই উৎকৃষ্ট গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। তিনি প্রথমাধ্যায়ের প্রথমেই বলিয়াছেন, আমি ভরত, * * * মতঙ্গ প্রভৃতির মত-পয়োনিধি নির্ম্মন্থন করিয়া এই সঙ্গীতরত্নাকর

প্রস্তুত করিলাম। (প্রথমাধ্যায়ের ১৪ হইতে ২০ শ্লোক পর্য্যন্ত দ্রষ্টব্য।)

সঙ্গীত মানবস্বভাবের অনুগামী, সুতরাং বলা যাইতে পারে—যে সময়ে মানবের সৃষ্টি, সেই সময়েই সঙ্গীতের অঙ্কুরোৎপত্তি; তবে তদ্বিষয়ক বিদ্যা, শিল্প বা কৌশল ক্রমে পর পর কালে প্রচারিত হইয়া আসিতেছে। যে সময়ে এদেশে বেদের আবির্ভাব হয়, সেই সময়েই এদেশে সঙ্গীতেরও অল্পাধিক পরিমাণে বিস্তৃতি ঘটে। সেইজন্য মূল সঙ্গীতশাস্ত্রের অপর নাম গান্ধর্ববেদ এবং তাহা সামবেদের উপবেদ নামে খ্যাত। রত্নাকর-রচয়িতা শার্ঙ্গদেবও বলিয়াছেন—

"সামবেদাদিদং গীতং সংজগ্রাহ পিতামহঃ।"

পিতামহ ব্রহ্মা সামবেদ হইতে গীতবিদ্যা সংগ্রহ করিয়াছিলেন। ব্রহ্মা গীতশাস্ত্রের প্রথম প্রণেতা—এ কথার অর্থে অন্য কোন কিছু পাওয়া যাউক বা না যাউক, প্রাচীনতাপক্ষ পাওয়ার বাধা নাই। "সঙ্গীত-রত্নাকর" নামটী অন্বর্থ, অর্থাৎ সত্যসত্যই ইহা সঙ্গীতরত্নের সমুদ্র। কেন না, বিদ্যমান সময়ে যতগুলি সঙ্গীত গ্রন্থ পাওয়া যায়, এই রত্নাকর ব্যতীত আর সকলগুলিই প্রকরণ অর্থাৎ কোন এক অংশ লইয়া বিরচিত, কেবল একমাত্র এই রত্নাকরই সঙ্গীতের শাস্ত্র বা সম্পূর্ণ গ্রন্থ। গান, বাদ্য ও নৃত্য, এই ত্রৈর্ধ্যত্রিক বিষয়ে যে কিছু জ্ঞাতব্য, যে কিছু শিক্ষিতব্য, সমস্তই ইহাতে অল্পাধিক পরিমাণে বিবৃত হইতে দেখা যায়। সুতরাং ইহা সঙ্গীতপ্রিয় লোকের অতীব প্রিয় ও আদরের বস্তু এবং সেই কারণে আমরাও ইহার আলোচনায় প্রবৃত্ত।

এই গ্রন্থে সঙ্গীতসংক্রান্ত কোন্ কোন্ বস্তু বর্ণিত আছে, তাহা জানাইবার নিমিত্ত একটী বিষয়-সূচী অর্থাৎ বর্ণিতব্য পদার্থের তালিকা প্রদান করিলাম; দেখিবেন, সঙ্গীত-রত্নাকর সঙ্গীতের সম্পূর্ণ শাস্ত্র কি না।

প্রথমাধ্যায়ের নাম স্বরাধ্যায়। স্বরাধ্যায়ে প্রথমে শরীরতত্ত্ব, পরে নাদোৎপত্তি, নাদের স্থান, শ্রুতিবিবরণ (শ্রুতি=শোরৎ)। শুদ্ধস্বর, বিকৃত স্বর, স্বরের কুল-জাত্যাদি বর্ণনা, সে সকলের ব্যবহার-প্রকার, শোরতের জাতি, গ্রামকল্পনা, মূর্চ্ছনা (মীড়), তান, শুদ্ধতান, কূটতান ও সে সকলের সংখ্যা, প্রস্তার (স্বর সাজাইবার নিয়ম), খণ্ডমেরু, নষ্টোদ্দিষ্ট (এ দুই বস্তুও স্বর সান্দর্ভিত করার প্রণালীবিশেষ—যাহাকে স্বরলিপি বলে, তাহারই নিয়মাদি।) কাকলীপ্রয়োগের ও অন্তরাপ্রয়োগের নিয়মাদি, বর্ণলক্ষণ, ৬৩ প্রকার অলঙ্কার, ১৩প্রকার স্বরজাতির লক্ষণ, গ্রহস্বর ও অংশস্বর প্রভৃতি, কপাল ও কম্বল প্রভৃতি (ইহাও গানের জাতি-বিশেষ) বর্ণিত হইয়াছে।

দ্বিতীয় অধ্যায়ের নাম রাগবিবেক। এই অধ্যায়ে গ্রামরাগ, রাগ, উপরাগ, ভাষা, বিভাষা, অন্তরভাষা, রাগের অঙ্গ, ভাষাঙ্গ, উপাঙ্গ ও ক্রিয়াঙ্গ অভিহিত হইয়াছে।

তৃতীয় অধ্যায়ের নাম প্রকীর্ণক। এই অধ্যায়ে বাগ্গেয়কারের ও গন্ধর্বের লক্ষণ, (কলাবৎ ও নায়কাদির লক্ষণ), গায়ক, গায়কী, তাহাদের গুণ ও দোষ, শরীর ও শরীরের গুণ দোষ, নানাপ্রকার গমক, ছায়া, আলাপ ও বৃন্দাদির লক্ষণ কথিত হইয়াছে।

চতুর্থ প্রবন্ধাধ্যায়। এ অধ্যায়ে ধাতু, ধাতুর অঙ্গ ও জাতি, শুদ্ধমূড় ও ছায়া লগভেদে প্রবন্ধের ত্রৈবিধ্য, আলিপ্রণালী, ও গীতের গুণদোষাদি বলা হইয়াছে।

পঞ্চম তালাধ্যায়। এ অধ্যায়ে মার্গ ও দেশী ভেদে তালের দ্বৈবিধ্য, মার্গতালের ক্রম, দেশী-তালের ক্রম, পাত, গতি, কলা, গুরু-লঘু প্রভৃতির পরিমাণ, তাহার এককলত্বাদির প্রভেদ, পাদবিভাগের ব্যবস্থা, মাত্রা, তালনিপাতনের বিধান, অঙ্গুলি-নিয়ম, যুগল প্রভৃতি, পরিবর্ত্তনবিধি, লয়, যতি, গীত, ও গীতাঙ্গ। তদ্ভিন্ন দেশী তালের লক্ষণাদি নির্দ্ধারিত হইয়াছে।

ষষ্ঠ বাদ্যাধ্যায়। এই অধ্যায়ে নানাপ্রকার বাদ্য, বাদনপ্রকার ও ছন্দঃপ্রভৃতি অভিহিত হইয়াছে।

সপ্তম নৃত্যাধ্যায়। নৃত্যাধ্যায়ে নানাপ্রকার নৃত্য, শৃঙ্গার বীর করুণ প্রভৃতি নানাপ্রকার রস, সঞ্চারী ব্যভিচারী প্রভৃতি ভাব ও বিভাব প্রভৃতি বর্ণিত হইয়াছে।

যাহা সঙ্গীত-রত্নাকরের প্রধান প্রতিপাদ্য তাহা সংক্ষেপে বর্ণিত হইল। এক্ষণে রত্নাকরের প্রথমে

যে শরীরতত্ত্ব বর্ণিত হইয়াছে তাহা পরিত্যাগ করিয়া তৎপরবর্ত্তী নাদোৎপত্তি প্রকরণ সম্বন্ধে আমরা কিঞ্চিৎ পরিচয় প্রদান করিব।

রত্নাকরলেখক শার্ঙ্গদেব শরীরসংস্থানের জ্ঞানকেও গানোপযোগী মনে করেন। তিনি বলিয়াছেন,—

গীতং নাদাত্মকং বাদ্যং নাদব্যক্ত্যা প্রশস্যতে।
তদ্দ্বয়ানুগতং নৃত্যং নাদাধীনমতস্ত্রয়ম্॥
নাদেন ব্যজ্যতে বর্ণঃ পদং বর্ণাৎ পদাদ্বচঃ।
বচসো ব্যবহারোঽয়ং নাদাধীনমতো জগৎ॥
আহতোঽনাহতশ্চেতি দ্বিধা নাদো নিগদ্যতে।
সোঽয়ং প্রকাশতে পিণ্ডে তস্মাৎ পিণ্ডোঽভিধীয়তে॥

যাহাই হউক, শরীরের সহিত ধ্বনিবিশেষের সম্বন্ধ থাকিলেও উহার জ্ঞানের সহিত গানের যে কোনরূপ উপযোগিতা আছে, তাহা আমাদের বোধে স্পষ্টতঃ উপলব্ধ হয় না। সেই কারণে আমরা শরীরপ্রকরণ পরিত্যাগ করিয়া নাদোৎপত্তি প্রকরণেরই পরিচয় দিতেছি।

নাদ ব্রহ্ম।

গ্রন্থকার প্রথমতঃ নাদে ব্রহ্মধর্ম্মের আরোপ করিয়া উপাসনা করিতেছেন—

আমি সকল ভূতের চৈতন্য, জগদাকারে বিবর্ত্তিত, এরূপ আনন্দ ও অদ্বিতীয় নাদ-ব্রহ্মের উপাসনা করি। ১।

চিন্তাবিশেষের অর্থাৎ ধ্যানবিশেষের নাম উপাসনা। উপাসনাকাণ্ডীয় শাস্ত্রে উপাসনার অনেক প্রভেদ বর্ণিত আছে। তন্মধ্যে এক প্রকার উপাসনা—কোন এক পদার্থে অন্য এক মহিমান্বিত পদার্থের গুণ বা ধর্ম্ম (মহিমা) আরোপ করিয়া তদভেদে চিন্তা করা। এ প্রকার উপাসনা প্রতীকোপাসনা নামে প্রসিদ্ধ। রত্নাকরপ্রণেতা শার্ঙ্গদেব উক্ত পদ্ধতিক্রমে নাদে ব্রহ্মধর্ম্মের আরোপ করিয়া "নাদই ব্রহ্ম" এইরূপে উপাসনা করিলেন। শার্ঙ্গদেব দেখিলেন, চৈতন্য যেমন সর্ব্বপ্রকাশক, তেমনি নাদও পরিস্ফুট হইয়া সর্ব্ববস্তুর প্রকাশক হয়; সুতরাং নাদে চৈতন্যধর্ম্মের আরোপ অসিদ্ধ হইবার নহে। চৈতন্যে ও ব্রহ্মে শব্দভেদ ব্যতীত বস্তুভেদ নাই। ব্রহ্ম জগদাকারে বিবর্ত্তিত, নাদও শ্রুতি-স্বরাদি সমুদায় শব্দপ্রপঞ্চাকারে বিবর্ত্তিত। তদনুসারে নাদে ব্রহ্মের বিবর্ত্তন ধর্ম্মের আরোপ সুসঙ্গত বৈ অসঙ্গত নহে। ব্রহ্ম মূল আনন্দ ও জগৎপ্রপঞ্চের অদ্বিতীয় কারণ। নাদও গীতাদিজনিত আনন্দের মূল ও সমুদায় বাক্‌প্রপঞ্চের অদ্বিতীয় কারণ। অতএব নাদে আনন্দধর্ম্মের ও অদ্বয়তার আরোপও সুসঙ্গত।

শার্ঙ্গদেবের অভিপ্রায়—নাদ ব্রহ্ম না হইলেও ব্রহ্মশক্তি বটে। অতএব নাদই ব্রহ্মোপাসনায় ঘনিষ্ঠ প্রতীক বা নিকট অবলম্বন।

নাদোপাসনায় ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব, সকল দেবতাই উপাসিত হন। কেন না, তাঁহারা তদাত্মক অর্থাৎ ব্রহ্মভূত। ২।

নাদোপাসনায় ব্রহ্মোপাসনা সিদ্ধ হয়। সুতরাং তদ্দ্বারা তদভিন্ন ব্রহ্মাদি-দেববৃন্দের উপাসনাও সম্পন্ন হয়।

উপাসনান্তে, যে প্রক্রিয়ায় বা যে প্রকারে শরীরে শারীরনাদের উৎপত্তি বা আবির্ভাব হয়, গ্রন্থকার তাহা নিম্নলিখিত বাক্যে বলিতেছেন।

আত্মার বিবক্ষা অর্থাৎ কিছু বলিবার ইচ্ছা হইলেই মন নিজে প্রচলিত হইয়া দেহস্থ বহ্নিকে (তাপকে বা তাড়িতকে) প্রেরণ করে। সেই তাপ বা বহ্নি শরীরবায়ুকে (মতান্তরে স্নায়ুবিশেষকে) পরিচালিত করে। প্রোক্ত বায়ু ব্রহ্মগ্রন্থি হইতে (ব্রহ্মগ্রন্থি অর্থে নাভিকন্দ, মতান্তরে মূলাধার বা লিঙ্গমূল) ক্রমিক ঊর্দ্ধপথে গমন করতঃ নাভিস্থানে, হৃদয়ে, কণ্ঠে, মূর্দ্ধপ্রদেশে ও মুখবিবরে ধ্বনি বা শব্দ জন্মায়। এই শব্দসামান্যের নাম নাদ। ৩।৪।

বলা হইল যে, নাদের আবির্ভাব বা উৎপত্তিস্থান নাভি, হৃদয়, কণ্ঠ, মূর্দ্ধা ও আস্য। বর্ণিত পঞ্চ স্থানের নাদ একরূপ না হওয়ায় তত্তৎস্থানীয় নাদের বিশেষ বিশেষ নাম বা সংজ্ঞা আছে। সে সকল সংজ্ঞা এই—

পঞ্চস্থানস্থিত নাদ যথাক্রমে অতিসূক্ষ্ম, সূক্ষ্ম, পুষ্ট, অপুষ্ট ও কৃত্রিম, এই নামপঞ্চক ধারণ করে। ৫।

নাভিসমুৎপন্ন নাদ অতি সূক্ষ্ম অর্থাৎ অব্যবহার্য্য বা শ্রবণেন্দ্রিয়ের অগোচর। হৃদয়ে সূক্ষ্ম অর্থাৎ অপেক্ষাকৃত স্থূল। কণ্ঠনাদ পুষ্ট, মূর্দ্ধন্যনাদ অপুষ্ট অর্থাৎ কিছু অস্পষ্ট। আস্যাবির্ভূত নাদ কৃত্রিম অর্থাৎ ইহাই পদ-পদার্থবোধক 'বাক্য'নামধেয়।

শরীরসমুত্থ শব্দের বা ধ্বনির নাদ নামটী যৌগিক অর্থাৎ শব্দদ্বয় যোগে উৎপন্ন। যথা—

ন—অক্ষর প্রাণবোধক এবং দ—অক্ষর অগ্নি-বোধক। যেহেতু ন ও দ যোগে অর্থাৎ দেহস্থ প্রাণবায়ু ও বহ্নি (তাপ) উভয়ের যোগে (সংঘর্ষে) অভিব্যক্ত হয় সেই হেতু উহা নাদ শব্দে অভিহিত হয়। ৬।

নাদ নাভ্যাদি স্থানপঞ্চকে উৎপন্ন বা অভিব্যক্ত হইলেও হৃদয়, কণ্ঠ ও মূর্দ্ধা এই তিন স্থানের নাদ গীতোপযোগী, অন্য দুই স্থানের নাদ গানব্যবহারের অনুপযোগী। উক্ত স্থানত্রয়স্থ নাদের ক্রমানুযায়ী সংজ্ঞা মন্দ্র, মধ্য ও তার। হৃদয়স্থ নাদ মন্দ্র, কণ্ঠ নাদ মধ্য এবং মূর্দ্ধণ্য নাদ তার। এই নাদত্রয় পর পর দ্বিগুণ উচ্চারণপ্রযত্নে (জোরে) জন্মলাভ করে। সেজন্য উহারা পর পর দ্বিগুণ উচ্চ। ৭।

বিশদ কথা এই যে, নাভিস্থানীয় ও আস্য-স্থানীয় নাদ গীতশাস্ত্রীয় নিয়মের অন্তর্গত নহে। অবশিষ্ট ত্রিবিধ নাদ লইয়াই গান-ব্যবহার নিষ্পন্ন হয়। অপর কথা এই যে, মন্দ্রস্থানস্থ ষড়্জাদি ভেদবিশিষ্ট (স রি গ ম প ধ নি, এই সপ্ত প্রভেদ) নাদ অপেক্ষা মধ্যস্থানস্থিত ষড়্জাদি সপ্তভেদের নাদ উচ্চতায় দ্বিগুণ এবং মধ্যস্থানস্থিত নাদ অপেক্ষা তারস্থানীয় নাদ উচ্চতায় দ্বিগুণ। উচ্চারণপ্রযত্ন দ্বিগুণ বলিয়া উচ্চার্য্য নাদও দ্বিগুণ। ঐ দ্বৈগুণ্য আরোহকালে অনুভূত হইয়া থাকে; অর্থাৎ মন্দ্র স্থানের স হইতে ক্রমে নি পর্য্যন্ত আরোহণ করিয়া মধ্যস্থানের স-এ আরোহণকালে যেরূপ আয়াসজনক প্রযত্ন প্রকটিত হয়, তুলনায় তাহা প্রথম উচ্চার্য্য-মান স অপেক্ষা দ্বিগুণ। ঐরূপ মধ্যস্থানীয় স অপেক্ষা তারস্থানীয় স দ্বিগুণ। রি প্রভৃতি পক্ষেও ঐরূপ বুঝিতে হইবে।

যেমন একই নাদ ষড়্জাদি সপ্তভাগে বিভক্ত, তেমনি উহা তদপেক্ষাও সূক্ষ্মবিভাগ দ্বাবিংশতি ভাগে বিভক্ত। সেই দ্বাবিংশতি ভাগের এক এক ভাগকে শ্রুতি আখ্যা প্রদান করা হয়। শ্রুতির ভাষানাম শোরৎ।

"স্থায়ী বা আস্থায়ী"

(রায় বাহাদুর শ্রীদীননাথ সান্যাল)

বাঙ্গালা দেশের গায়কদিগের মধ্যে 'আস্থায়ী' বলিয়া যে কথাটী প্রচলিত আছে, বস্তুতঃ উহা হওয়া উচিত 'স্থায়ী'। বহুকাল হইতে হিন্দুস্থানী গায়কেরাই গানের ওস্তাদ ছিলেন এবং এখনও আছেন। তাঁহাদের উচ্চারণ দোষে 'স্থায়ী'—'আস্থায়ী' হই-য়াছে, যেমন 'স্নান'—'আস্নান'। একবার গয়ায় একটী মঠধারীর মুখে 'আস্কন্দ' পুরাণ শুনিয়া আমার প্রথমে ধাঁধা লাগিয়াছিল। পরে বুঝিলাম যে, 'স্কন্দ' তাঁহার মুখে 'আস্কন্দ' হইয়াছে। এ দোষ যে আমাদের দেশে একেবারেই নাই, তাহা নয়। 'আক'-ফলা, 'আস্ক'-ফলা—এগুলি 'স্ক'-ফলা, 'স্ক'-ফলার অপভ্রংশ। এই যে বাঙ্গালীর ছেলেরা বলে—'ইস্কুলে' যাব, কিন্তু তাহারা যায় 'স্কুলে'। এইরূপে সঙ্গীতের প্রথমাঙ্গ, যাহা সংস্কৃতে 'ধ্রুব' বলিয়া বিখ্যাত তাহাই 'স্থায়ী'। কিন্তু হিন্দুস্থানী ওস্তাদের মুখে তাহা আস্থায়ী হইয়া যাওয়ায় বাঙ্গালী গায়কগণ আজও সেই 'আস্থায়ী' ব্যবহার করিতে-ছেন। এমন কি 'প্রকৃতিবাদ', 'বিশ্বকোষ' প্রভৃতি অভিধানকারেরাও বিনা বিচারে গায়কদের ঐ 'আস্থায়ী' গ্রহণ করিয়াছেন। দুই বৎসর পূর্ব্বে আমি "মানসী"তে এই প্রসঙ্গ তুলিয়াছিলাম, তাহার পর হইতেই দেখিলাম শ্রীমতী মোহিনী সেনগুপ্তা—যিনি প্রায় সকল মাসিক-পত্রিকাতেই স্বরলিপি প্রকাশ করিয়া থাকেন, কেবলমাত্র তিনিই 'আস্থায়ী' ত্যাগ করিয়া 'স্থায়ী' গ্রহণ করিয়াছেন। বড় বড় গায়কের কাছে এখনও এ প্রসঙ্গ পৌঁছায় নাই। তাঁহারা এখনও 'আস্থায়ী' চালাইতেছেন।*

পত্রাবলী।

(১)

ওঁ পিতা নোঽসি।

"আনন্দ-মিশন"
পোঃ কৃষ্ণনগর—নদীয়া।
১০।৫।৩৩

বিনয়-নমস্কারপূর্ব্বক সবিনয় নিবেদন,—

আপনার সম্পাদিত "তত্ত্ববোধিনী-পত্রিকা" সম্বন্ধে

---

* এ বিষয়ে সঙ্গীতজ্ঞদিগের মধ্যে আলোচনা প্রার্থনীয়।

সময়ে আমার দৃষ্টিপথবর্ত্তী হয় এবং উহার রচনাবলী পাঠ করিয়া প্রীত হই। সাম্প্রদায়িকতার বিসর্পক্ষত ঐ পত্রিকাকে জর্জ্জরীভূত করিতে পারে নাই, ইহাই আমার অশেষ আনন্দের কারণ। ভেদবুদ্ধির বিষাক্ত কজ্জলে 'তত্ত্ববোধিনী'র বিচার-দৃষ্টি খর্ব্বতা প্রাপ্ত হয় নাই, ইহাও আমাকে আনন্দ দিয়াছে।

"তত্ত্ববোধিনী"র প্রথম সম্পাদক বোধ হয় স্বর্গীয় অক্ষয়কুমার দত্তই ছিলেন; তাঁহার সেবিত 'তত্ত্ববোধিনী'ও আমার দেখা আছে। একাল পর্য্যন্ত যে যে মহারথী ঐ পত্রিকার কর্ণধার হইয়াছেন, তাঁহাদের সকলেরই সেবা-পরিচয়ের তথ্য এক-আধটু জানি। গত কয়েক বৎসর হইতে আপনিই "তত্ত্ববোধিনী"র প্রধান কাণ্ডারী। বলা বাহুল্য, আপনার শ্রদ্ধাপূর্ণ সেবাপ্রবৃত্তিতে বঙ্গভারতী সন্তুষ্টা হইয়া আপনার হৃদয়ে শক্তিসঞ্চারপূর্ব্বক বিবিধ পুস্তকরচনা ও পত্রিকাসম্পাদনে প্রচুর ক্ষমতা প্রদান করিয়াছেন; সাময়িকপত্র-সম্পাদক-যূথ মধ্যে আপনার বৈশিষ্ট্য অস্বীকার্য্য নহে।

ইতিপূর্ব্বেই বলিয়াছি, "তত্ত্ববোধিনী" যে সাম্প্রদায়িকতার জঘন্য দৌর্ব্বল্যে কল্পিত নহে, এজন্য আমি আনন্দিত। অধুনা সাময়িক বা সাপ্তাহিক পত্রিকাদির অধিকাংশই কোনও একটি দলবিশেষের জয়ঢক্কা মাত্র। অপরের গ্লানি এবং কুৎসা প্রচার করিবার দুঃখজনক কু-প্রবৃত্তির অন্ধ কৈঙ্কর্য্য (দাসত্ব) বহু সাময়িক বা সাপ্তাহিকের উপজীব্য ও উচ্চাকাঙ্ক্ষা! আপনি 'তত্ত্ববোধিনী'র পুরোভাগে একমাত্র ব্রহ্মকেই প্রতিষ্ঠিত রাখিয়াছেন,—কোনও দলের নেতাকে নহে—ইহা বড়ই আনন্দের কথা। ব্রহ্মই তত্ত্বস্বরূপ। "তত্ত্বং চিন্ময় সত্তং চিত্তে" ইহাই ব্রহ্মজ্ঞগণের মর্ম্মবাণী। আপনার কাগজখানিকে সেই ব্রহ্মরসানন্দের অক্ষয় প্রস্রবণরূপে দেখিয়া কে না আনন্দিত হইবেন? সংসারের সকল রস ব্রহ্মের রসাভাসে রসযুক্ত হইয়াছে,—কিন্তু মানুষ অনেক সময়ে তাহা বুঝিতে পারে না, আর বুঝে না বলিয়াই খণ্ড-রস-মূর্ত্তিকে একান্ত ভাবে সর্ব্বময় ভাবিতে গিয়া এবং তাহাকে আপনার আয়ত্তে আনিতে গিয়া কতই না বিরোধ-বিপ্লবের সূচনা করে! সেই নিত্যানন্দ জগদীশ্বর কখনই তো খণ্ড নহেন; আর খণ্ড নহেন বলিয়াই অনন্ত শান্তিসুখের অক্ষয় মধু-পাত্র তাঁহাতেই নিহিত আছে। "তত্ত্ববোধিনী"র সম্পাদকীয় প্রবন্ধগুলি—যাহা ঐ পত্রিকার প্রথমেই বাহির হয়—সেই নিত্যানন্দের শাশ্বত বার্ত্তা বহন করে বলিয়াই রসগ্রাহী ব্যক্তিগণকে পরম হর্ষাশ্রুতে পরিপ্লুত করিয়া দেয়। বিষয়-কালকূট-দষ্ট উদ্ভ্রান্ত-যৌবনকালে নাকি ভগবৎ-বিষয়ক কথায় অনেকের রুচি হয় না। কিন্তু আপনার লিখিবার কৌশলে ঋষিগণের ধ্যেয় ব্রহ্মরহস্য, রসাল ও মাধুর্য্যপূর্ণ হইয়া সকলেরই হৃদয় আকর্ষণে সমর্থ হইয়াছে। আপনার হৃদয়ে প্রগাঢ় সাহিত্যপ্রীতি সঞ্চিত থাকায় এবং তত্ত্বে ও সাহিত্যে মিশাইয়া 'ভিয়ান' করিতে পারায় কঠিনকে সহজ করিয়াছেন এবং দূরকে নিকট করিতে পারিয়াছেন।

এদেশে প্রৌঢ় ও বার্দ্ধক্যদশায় বহু সুশিক্ষিত ব্যক্তিও ভোগের বলীবর্দ্দ-রূপে কালযাপন করেন এবং সুদুর্ল্লভ মনুষ্যত্বের অপব্যবহার করিতে কিছুমাত্র সঙ্কুচিত নহেন। এরূপ ক্ষেত্রে আপনি যেরূপ আন্তরিকতা ও নিষ্ঠার সহিত পত্রিকাখানিকে শ্রদ্ধাযুক্ত মনে পরিচর্য্যা ও সেবায় স্নিগ্ধ করিয়া তুলিতেছেন, একমাত্র সাহিত্য-আরাধনাই জীবন-ব্রত-রূপে গ্রহণ করিয়াছেন, তাহাতে আপনাকে ধন্যবাদ না করিয়া থাকা যায় না। আপনার এই ব্রত উদ্‌যাপিত হউক, ইহাই প্রার্থনা করি।

বিনীত

শ্রীনারায়ণ ভারতী।

(২)

কৃষ্ণনগর।

২৩।৮।২৬

প্রীতিভাজনেষু—

আপনার ২২।৮ তারিখের পত্রখানি পেয়ে বড়ই সুখী হলাম। শ্রীমতী বাণীদেবী আপনার কন্যা শুনিয়া আরও আহ্লাদিত হইলাম। শ্রীমতীকে আমার আশীর্ব্বাদ জানাইবেন।

* * * *

"তত্ত্ববোধিনী" আসিলেই না পড়িয়া ফেলিয়া রাখি না এবং অন্যকেও পড়িতে দিই।

পত্রের সঙ্গে যে "বন্ধনী"টী আপনি পাঠিয়েছেন, তার ফাঁদ বড় হইলে মস্তকেও বাঁধিতাম জানিবেন। পরম আদরে আপনার প্রদত্ত রাখী-বন্ধনী গ্রহণ ও হস্তে ধারণ করিলাম। সাহিত্যের সূক্ষ্ম সূত্রে কি সুবিমল ও সুন্দর আমাদের এই বন্ধুত্বের বন্ধন ঘটিয়াছে। ইহা নিশ্চয়ই অক্ষয়-বন্ধন।

আপনার রাখীভ্রাতা

শ্রীদীননাথ।

(৩)

কুমিল্লা।

২৭।৮।২৬

শ্রদ্ধাস্পদেষু,

প্রিয় আচার্য্য মহাশয়—

আপনার ২১।৮ তারিখের আশীষ ও প্রীতিপূর্ণ পত্র-

খানা পাইয়া অতীব আনন্দিত হইলাম। ভগবানের কৃপায় ও আপনাদের আশীর্ব্বাদে মেয়ের বিবাহ নির্ব্বিঘ্নে সম্পন্ন হওয়ায় মনে একটী বেশ শান্তি ও আনন্দ অনুভব করিতেছি। বিবাহের দুই বৎসর পূর্ব্ব হইতে এই সম্বন্ধের প্রস্তাব চলিতেছিল; কিন্তু নানাপ্রকার বাধা-বিঘ্নের জন্য এবং আমাদের মতের মিল না হওয়ায় বিবাহ হইতে পারে নাই। বিবাহের পূর্ব্বে কত ভয়-ভাবনা ছিল; আত্মীয়-স্বজন বন্ধু-বান্ধব বিবাহ আইনসঙ্গত হইবে না, সমাজচ্যুতি ইত্যাদি কত প্রকার ভয়প্রদর্শন করিয়াছেন। কত দুর্ভাবনা, উদ্বেগ ও আশঙ্কা লইয়া কার্য্য আরম্ভ করিয়াছিলাম। কিন্তু যেই কার্য্য সমাধা হইল অমনি ভগবানের করুণায় সমস্ত মেঘ ও অন্ধকার কোথায় চলিয়া গেল; বাহিরের ও ভিতরের আকাশ দুইই পরিষ্কার হইয়া গেল। আমি হিন্দুসমাজে থাকিয়া নিজের বিশ্বাস অনুযায়ী অপৌত্তলিক একেশ্বরবাদ-সম্মত হিন্দুমতে যে সুপাত্রে মেয়েকে অর্পণ করিতে পারিয়াছি, ইহাতে প্রাণে অত্যন্ত শান্তি পাইতেছি। আপনাদের সাহায্য ও সাহস না পাইলে আমি এ কার্য্য সম্পন্ন করিতে পারিতাম না। আজ হৃদয় ভরিয়া কৃতজ্ঞার সহিত আপনাদিগকে আমার ধন্যবাদ জানাইতেছি।

আপনাদের সহিত যে একটী ধর্ম্মের যোগ সংস্থাপন হইল তাহা চিরদিন থাকিবে। আমি আশা করি যে এই বন্ধন রক্ষা করিতে সর্ব্বদা আপনার সদুপদেশ ও সাহায্য পাইব। আপনাদের সমাজের সভ্য হওয়ার যদি আমার উপযুক্ততা থাকে তাহা হইলে আমাকে সভ্যশ্রেণীতে গ্রহণ করিলে সুখী হইব। আমি তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার গ্রাহক হইতে প্রস্তুত আছি; আপনি আপনাদের কর্ম্মচারীকে পত্রিকা আমার নামে ভিঃ পিঃ ডাকে পাঠাইতে বলিবেন।

আপনি যে কয়েকখণ্ড অমূল্য পুস্তক উপহার পাঠাইয়াছেন, তাহা পাইয়াছি। এই পুস্তক পাঠে আমার অনেক উপকার হইবে। আপনাকে এই পুস্তকের জন্য আমার আন্তরিক ধন্যবাদ জানাইতেছি। * * *

আমাদের নিজের কুলপুরোহিত বিক্রমপুর বাসাইল পণ্ডিতসমাজের লোক। তিনি এই বিবাহে উপস্থিত ছিলেন এবং বিবাহ হিন্দু শাস্ত্রসম্মত ও বৈধ বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন।

আশা করি আপনার সর্ব্বাঙ্গীন কুশল। আপনি আমার শ্রদ্ধা ও প্রীতিপূর্ণ নমস্কার গ্রহণ করিবেন। ইতি

বিনীত

শ্রীযতীন্দ্রকুমার বসু।

গ্রন্থ-পরিচয়।

ছান্দোগ্যোপনিষৎ (দ্বিতীয়ার্দ্ধ)—শ্রীযুক্ত মহেশ চন্দ্র বেদান্তরত্ন বি-টি ও শ্রীযুক্ত সীতানাথ তত্ত্বভূষণ কর্ত্তৃক ব্যাখ্যাত এবং সম্পাদিত। ডবল ক্রাউন আকারে ২৭২+২২ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। স্বর্ণমণ্ডিত বাঁধাই সুন্দর, ছাপা ভাল; কাগজ মধ্যম। মূল্য ১৷৷০ টাকা মাত্র।

বিগত চৈত্রসংখ্যা-পত্রিকায় ইহার প্রথমার্দ্ধের পরিচয়-প্রসঙ্গে আমরা ছান্দোগ্যের এই বর্ত্তমান সংস্করণের বৈশিষ্ট্যের কথা আলোচনা করিয়াছি—এখানে আর তাহার পুনরুক্তি করিতে চাহি না। এই দ্বিতীয়ার্দ্ধে পঞ্চম হইতে অষ্টম পর্য্যন্ত শেষ চারি অধ্যায় প্রকাশিত হইয়াছে। অধ্যায়গুলি প্রধানত 'সংবাদ' অর্থাৎ পরস্পর-কথোপকথনমূলক কতকগুলি আখ্যায়িকায় পূর্ণ। এই আখ্যায়িকাগুলিতে ব্রহ্মবিদ্যার তৃতীয় স্তর অর্থাৎ প্রধানত নির্গুণ ব্রহ্মোপাসনাই বিবৃত হইয়াছে। পঞ্চম অধ্যায়ে সর্ব্বশুদ্ধ চব্বিশটী খণ্ড আছে। ইহাতে অন্যান্য অবান্তর বিষয়ের সহিত 'শ্বেতকেতু-প্রবাহণ-সংবাদে' ঔপনিষদ পরলোকতত্ত্বের বিস্তৃত পরিচয় পাওয়া যায়। ষষ্ঠ অধ্যায়ে 'আরুণি-শ্বেতকেতু-সংবাদে' প্রথমতঃ একবিজ্ঞানে সর্ব্ববিজ্ঞান প্রতিপাদন করিয়া শেষে বিবিধ লৌকিক দৃষ্টান্তের সাহায্যে 'তত্ত্বমসি' এই ঔপনিষদ মহাবাক্যের ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। সপ্তম অধ্যায়ে 'নারদ-সনৎকুমার-সংবাদে' ঋগ্বেদাদি-'নাম' হইতে আরম্ভ করিয়া ঋষি সনৎকুমার ক্রমোচ্চ সোপানপরম্পরা অতিক্রম পূর্ব্বক পরমতত্ত্ব ভূমাতে উত্থিত হইয়াছেন। অষ্টম অধ্যায়ে 'প্রজাপতি-ইন্দ্র-বিরোচন-সংবাদে' দেহাত্মভ্রম ও স্বপ্নসুষুপ্ত্যাদি অবস্থার তত্ত্ব নিরূপিত হইয়াছে।

বেদান্তরত্ন মহাশয়ের 'মন্তব্য'গুলি যে বাঙ্গালা ভাষায় একান্ত অভিনব ও বিশেষ পাণ্ডিত্যপূর্ণ হইয়াছে, তাহা আমরা প্রথমার্দ্ধের সমালোচন-কালেই স্বীকার করিয়াছি। ব্যাকরণবিষয়ক সূক্ষ্ম বিচারপ্রসঙ্গে তাঁহার ভাষাতত্ত্বমূলক গবেষণাগুলি সুন্দর। ব্যাখ্যাত অংশের সদৃশ শব্দ, ভাব ও আখ্যায়িকার সংগ্রহ বেদান্তরত্ন মহাশয়ের অনুসন্ধিৎসা ও অধ্যয়নের প্রগাঢ়তার নিদর্শন।

তত্ত্বভূষণ মহাশয়ের দ্বাদশ পৃষ্ঠাব্যাপী উপনিষদুক্ত সাধনপ্রণালীর আলোচনায় বেশ মৌলিকতা ও চিন্তাশীলতার পরিচয় পাওয়া গেল। উপনিষদের সাধনা প্রধানতঃ জ্ঞানসাধনা, তথাপি বৃহদারণ্যক হইতে তিনি প্রেমসাধনারও যে নিদর্শন সংগ্রহ করিয়াছেন তাহা পূর্ব্বে জানা থাকিলেও ব্যাখ্যাগুণে অভিনব বোধ হইল। সুদূর আরণ্যকযুগের এই গ্রন্থখানির সহিত পাঠকদের পরিচয়-সাধনে সম্পাদক 'মুখবন্ধে' যে প্রণালী অবলম্বন করিয়া-

ছেন, তাহা সুন্দর; তবে আলোচনা এত সংক্ষিপ্ত না হইয়া আরও দীর্ঘতর হইলে ভাল হইত।

সু. চ. বে.

আর্ট ও সাহিত্য—সুলেখক শ্রীযুত ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের লিখিত "আর্ট ও সাহিত্য"-শীর্ষক পুস্তকখানি সাদরে গ্রহণ করিলাম, পাঠ করিয়া পবিত্রগন্ধপূর্ণ গৃহে সহসা প্রবেশ করিয়া যেরূপ আরাম ও আনন্দ পাওয়া যায় তদনুরূপ একটু পবিত্র আমোদ পাইলাম। তিনি দেখাইয়াছেন যে আমাদের জাতীয় সাহিত্য-ছাঁচের কোনও চর্চা বা আদর নাই। তাহা সত্য! এমন কি, উপন্যাস-সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্রও অনেক স্থলে বিদেশী-ছাঁচে তাঁহার উপন্যাসগুলি তৈরী করিয়াছেন। জাতীয় সমাজের উন্নতিকল্পে জাতীয় ভাষা ও ভাবের অভিব্যক্তি একান্ত আবশ্যক। তৎপরে তিনি দেখাইয়াছেন যে উপন্যাস ও অন্যান্য সাহিত্য একটী আর্টের অভিব্যক্তি, যে আর্ট এক গবেষণাপূর্ণ আর্ট—যে আর্টের ভিতরে জাতীয় ভাব ও ভাষার পূর্ণ বিকাশ হওয়া চাই এবং তাহার ভিত্তি "সত্য" অর্থাৎ স্বয়ং ভগবান। ভগবানকে বাদ দিয়া আর্ট চলে না—ভগবানহীন আর্ট আর্ট নয়; যে আর্ট সমাজ নীতি ও জাতীয় ভাব-সংরক্ষক, তাহাই প্রকৃত আর্ট। আর্টের ভিতরে "সত্যং শিবং সুন্দরং" এই ভাব প্রতিফলিত করিতে হইবে।

মোটের উপর এই পুস্তকখানিতে দেশের শিল্পশিক্ষার বিশেষ সহায়তা লাভ হইবে এবং সুধীমাত্রেরই আদরের হইবে। ঠাকুরপরিবার এদেশের আদর্শস্থানীয়, তাঁহারা ধনে মানে ও চরিত্রে এবং শিক্ষায় দেশের মধ্যে যুগান্তর আনয়ন করিয়াছেন। সুতরাং তাঁহাদের সুচিন্তিত বিষয়ে লোকের মন আকৃষ্ট হইবে। সকলেরই ইহা পাঠ করা একান্ত উচিত। পুস্তকখানি ১৮৪ পৃষ্ঠায় মুদ্রিত, লিখা ও কাগজ পরিষ্কার, উত্তম বাইণ্ডিং, প্রাপ্তিস্থান আদিব্রাহ্ম-সমাজ-কার্য্যালয়, কলিকাতা। মূল্য এক টাকা মাত্র।

কাশীপুর-নিবাসী—২৬শে বৈশাখ, ১৩৩০।

SRI BHAGABAT KATHA—By Kshitindra Nath Tagore Published By Hari Sankar Mukerjie From 5-1 B, Baranashi Ghose Second Lane, Calcutta. Price Eight Annas.

There is little doubt that a healthy education must not only include physical and intellectual training but must also help the development of the spiritual side of man. But somehow or other this fact is generally neglected in the education of our children and the result has been manifest in the daily-growing tide of atheism and irreligiosily in our society. To check this our march towards a godless state it is necessary that the yet plastic mind-stuff of the child be impressed with the elements of religion, the idea of God.

The problem of a suitable text book for the child has been well met by Sj. Kshitindra Nath Tagore (the grandson of Maharshi Devendra Nath) and the little volume under review eminently fulfils the purpose for which it was written. It is complete in seven lessons which lucidly explain in simple Bengali the reasons which compel our belief in the existence of God and this attributes. One great merit of the book is that it is written from a purely nonsectarian standpoint, and is just the book suitable for adoption as a text book in schools for boys and girls in Bengal.

The book will prove profitable reading to grown up people as well, helping the mystic, agnostic or the atheist to systematise, reason out or overhaul his faith in God or unfaith as the case may be.

Forward 19-9-26.

ওপারে—লেখকের নাম উল্লেখ নাই। ইহা একখানি আধ্যাত্মিকতত্ত্ববিষয়ক গ্রন্থ। গ্রন্থকার ভূমিকায় লিখিয়াছেন:—"কোন সুদূর পল্লীগ্রামে এক ব্যক্তির সহিত আমার সাক্ষাৎ হয়। তিনি "পরলোকযাত্রী" বলিয়া নিজের পরিচয় দেন। কিছু ঘনিষ্ঠতা হইবার পর তিনি আমার নিকট তাঁহার "পরলোকযাত্রার" কথা বর্ণনা করিতে লাগিলেন। কি প্রকারে তিনি অর্দ্ধ-অজ্ঞান অবস্থায় নিজের শরীরকে ইহলোকে ফেলিয়া রাখিয়া লোকলোকান্তরে ঘুরিয়া আসিয়াছিলেন, আগাগোড়া সমস্তই বর্ণনা করিলেন। আমি মন্ত্রমুগ্ধ হইয়া শুনিতে লাগিলাম। তিনি চলিয়া গেলে আমি সদ্য সদ্য সেই বর্ণনাগুলি যথাসম্ভব তাঁহারই ভাষায় লিখিয়া ফেলিলাম। গ্রন্থের সত্যমিথ্যা যাহা কিছু তাহা তাঁহারই।" ওপারের যাত্রী তাঁহার পরলোককাহিনীতে জটিল দার্শনিক তত্ত্বগুলিকে যেরূপ সরল ও সহজভাবে বর্ণনা করিয়াছেন, তাহা পাঠ করিলে চমৎকৃত হইতে হয়। উপনিষদের

সহিত গ্রন্থোল্লিখিত অনেক কথারই মিল আছে। তবে একটী প্রধান অমিল এই যে, উপনিষদে চন্দ্রলোকের পর ব্রহ্মলোক অবস্থিত বলিয়া লিখিত আছে; কিন্তু "ওপারের" যাত্রী বলেন, সূর্য্যলোকের পর ব্রহ্মলোক। তারপর বৈজ্ঞানিকদের যুক্তি লইয়া সত্যনির্দ্ধারণ করিতে গেলে চন্দ্রলোককে জীবনিবাসের অযোগ্য বলিয়া স্বীকার করিতে হয়। কিন্তু পরলোকযাত্রী চন্দ্রলোককে জীবনিবাস বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। তবে সুপ্রসিদ্ধ ফরাসী জ্যোতির্ব্বেত্তা ফ্লামরিঁর মঙ্গলগ্রহ অপেক্ষা চন্দ্রলোকই জীবের বাসস্থানের পক্ষে অধিকতর সম্ভাপর বলিয়া অনুমান করিয়াছেন। সেই হিসাবে পরলোকযাত্রীর কথাগুলি বৈজ্ঞানিকের কষ্টিপাথরেও টিকিবে বলিয়া আমাদের মনে করা অসমীচীন নহে। এই গ্রন্থখানির ভাষা ও লিপিকুশলতা এমনই চিত্তাকর্ষক যে, একবার পড়িতে আরম্ভ করিলে শেষ না করিয়া উঠা যায় না। আমরা জনসাধারণকে পুস্তকখানি একবার পাঠ করিতে অনুরোধ করি। কলিকাতা, আদিব্রাহ্মসমাজ কার্য্যালয়ে প্রাপ্তব্য। দাম ৵৹ আনা। ঢাকাপ্রকাশ—১৭ই পৌষ, ১০২৮।

সংবাদ।

অধ্যক্ষসভা।—বিগত ৯ই আশ্বিন রবিবার পূর্ব্বাহ্ন ৯ম ঘটিকায় আদিব্রাহ্মসমাজের দ্বিতল-গৃহে অধ্যক্ষসভার একটী বিশেষ অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। অবসরপ্রাপ্ত মুন্সেফ ও ভবানীপুর ব্রাহ্মসমাজের কর্ণধার শ্রীযুক্ত শিতিকণ্ঠ মল্লিক মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। আগামী কার্ত্তিকসংখ্যায় আমরা এই সভার বিস্তৃত বিবরণ প্রকাশ করিব।

শোক-সংবাদ।

৺ধর্ম্মদাস বসু—অবসরপ্রাপ্ত সিভিলসার্জ্জন কর্ণেল ধর্ম্মদাস বসু মহাশয় গত ৪ঠা আশ্বিন মঙ্গলবার পরলোকগত হইয়াছেন। মৃত্যুকালে ইঁহার বয়ঃক্রম অশীতিবর্ষ হইয়াছিল। এই স্বনামধন্য গুণবান পুরুষ আপন চরিত্রোৎকর্ষে সর্ব্বসাধারণের শ্রদ্ধার ও প্রীতির পাত্র ছিলেন। আমরা ইঁহার শোকসন্তপ্ত পুত্রপরিজনদিকে আমাদের আন্তরিক সমবেদনা জানাইতেছি। ভগবান ইঁহার লোকান্তরিত আত্মার সুগতি বিধান করুন। এই সূত্রে আমরা তাঁহার প্রতি একটী বিষয়ে কৃতজ্ঞতা জানাইতেছি। ইনি কলেরার ঔষধরূপে ইন্দ্রযবের গুঁড়া ব্যবহার করিতেন। উহা ব্যবহার করিয়া আমরা বিশেষ ফল পাইয়াছি।

দানপ্রাপ্তি।

আমরা কৃতজ্ঞতার সহিত প্রাপ্তিস্বীকার করিতেছি যে, আদিব্রাহ্মসমাজের অনুরক্ত ও হিতৈষী সভ্য শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ মহাশয় সমাজের হিতার্থে এককালীন ২৫৲ টাকা দান করিয়াছেন।

ঢাকানিবাসী রায় সাহেব শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র ঘোষ মহাশয় গত শ্রাবণমাসে তাঁহার পুত্র শ্রীমান সুধীরচন্দ্রের বিবাহোপলক্ষে এককালীন ১০৲ টাকা দান করিয়াছেন।

কুমিল্লাপ্রবাসী শ্রীযতীন্দ্রকুমার বসু মহাশয় গত শ্রাবণ মাসে তাঁহার কন্যা শ্রীমতী পদ্মিনী দেবীর বিবাহোপলক্ষে এককালীন ৫৲ টাকা দান করিয়াছেন।

ভ্রমস্বীকার।

আমরা বিশেষ দুঃখের সহিত স্বীকার করিতেছি যে, গত ভাদ্র-সংখ্যা পত্রিকায় 'শোক-সংবাদে' 'কবিরাজ ৺যামিনীভূষণ রায়' স্থলে ভ্রমক্রমে 'কবিরাজ ৺যামিনীভূষণ সেন' লিখিত হইয়াছে।

Tattwabodhini Patrika | Reg. No. C. 492

একবিংশ কল্প
চতুর্থ ভাগ
কার্ত্তিক, ব্রাহ্মসম্বৎ ৯৭।

৯৯৯ সংখ্যা | ১৮৪৮ শক

তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা

"ব্রহ্ম বা একমিদমগ্র আসীন্নান্যৎ কিঞ্চনাসীত্তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রন্নিরবয়বমেকমেবাদ্বিতীয়ম্ সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয়ং সর্ব্ববিৎ সর্ব্বশক্তিমদ্ধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্যসাধনঞ্চ তদুপাসনমেব"।

সম্পাদক—
শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও ডাক্তার শ্রীবনওয়ারিলাল চৌধুরী ডি, এস্‌সি
সহঃ সম্পাদক—শ্রীক্ষেমেন্দ্রনাথ ঠাকুর বি, এস-সি।

৫৫ নং অপার চিৎপুর রোড্ কলিকাতা, আদিব্রাহ্মসমাজ যন্ত্রে শ্রীরণগোপাল চক্রবর্ত্তী দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত।
সাল ১৩৩৩। খৃঃ ১৯২৬। সম্বৎ ১৯৮৩। কলিগতাব্দ ৫০২৭। কার্ত্তিক।

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার বার্ষিক মূল্য ৩৲ টাকা
ডাকমাশুল ৵০ আনা। এই সংখ্যার মূল্য ।০ আনা।
আদিব্রাহ্মসমাজের কর্ম্মাধ্যক্ষের নামে পাঠাইতে হইবে।

একমেবাদ্বিতীয়ং

একবিংশ কল্প
চতুর্থ ভাগ
কার্ত্তিক, ব্রাহ্মসম্বৎ ৯৭।

৯৯৯ সংখ্যা ১৮৪৮ শক

তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা

"ব্রহ্ম বা একমিদমগ্র আসীন্নান্যৎ কিঞ্চনাসীত্তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রন্নিরবয়বমেকমেবাদ্বিতীয়ং সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয়ং সর্ব্ববিৎ সর্ব্বশক্তিমদ্ধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্যসাধনঞ্চ তদুপাসনমেব"।

সম্পাদক—
শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও ডাক্তার শ্রীবনওয়ারিলাল চৌধুরী ডি, এস্‌সি
সহঃ সম্পাদক—শ্রীক্ষেমেন্দ্রনাথ ঠাকুর বি, এস-সি
কলিগতাব্দ ৫০২৭। সম্বৎ ১৯৮৩। খৃঃ ১৯২৬। শক ১৮৪৮। সাল ১৩৩৩।

অঞ্জলি।

(শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর)

৭৬ অঞ্জলি। রুদ্র দেবতা।

১। হে ভগবান পরমপুরুষ! তুমিই আমাদের পূজার একমাত্র পাত্র। আমরা একমাত্র তোমাকেই ভজনা করি। সর্ব্বত্র আমরা তোমারই জয়ধ্বনি করি। সুপ্ত আত্মা তোমাকে লাভ করিতে পারে না। আমাদের আত্মাকে তোমার প্রতি সর্ব্বদাই জাগ্রত রাখ। তোমাকে ছাড়িয়া অন্য কোন দেবতাকে যেন আমরা স্তুতিবাদে ভুলাইতে অগ্রসর না হই।

২। হে সকল ঐশ্বর্য্যের একমাত্র আকর! তুমি আমাদিগকে সংসারযাত্রা নির্ব্বাহের উপযুক্ত গো অশ্ব প্রভৃতি পশু প্রদান কর। তুমি আমাদের গৃহ ধনধান্যে পূর্ণ কর। তুমি আমাদিগকে যে ধনরত্নের এবং যে জ্ঞানধর্ম্মের উত্তরাধিকারী করিয়াছ, আমরা যেন নিজেদের দোষে সে সকলের অপব্যবহার না করি, সে সকল যথাযুক্তরূপে রক্ষা করি। তুমিই আমাদের জ্ঞানদাতা গুরু। তুমিই আমাদের চিরপুরাতন গৃহদেবতা। তুমিই আমাদের চিরন্তন সখা ও সুহৃৎ। তুমি আমাদের কাতর প্রাণের প্রার্থনাসকল সফল কর। আমাদের হৃদয় হইতে তোমারই নামে জয়ধ্বনি উত্থিত হউক।

৩। তুমি প্রজ্ঞানঘন। তুমি সমস্ত সংসারধর্ম্মের প্রবর্ত্তক। তুমিই সর্ব্বত্র দেদীপ্যমান পরমেশ্বর। বিশ্বজগতে যত কিছু ঐশ্বর্য্য আছে, সে সকলের আকর তুমিই। তোমার প্রতি যাহাদের আস্থা নাই, সেই সকল অশ্রদ্ধাবান ও সংশয়াত্মা ব্যক্তি তোমারই মঙ্গলবিধানে বিনাশ প্রাপ্ত হয়। আমরা তোমাকে চাই—তুমি আমাদের এই প্রার্থনা ব্যর্থ করিও না'। আমাদিগকে তুমি আপনাকে দিয়া আমাদের প্রার্থনা পূর্ণ কর।

৪। তুমি আমাদের নেতা, তুমি আমাদের রাজা। আমরা তোমারই প্রজা। আমাদের প্রতি তুমি প্রসন্ন হও। গো, অশ্ব ও ধনধান্য প্রচুর পরিমাণে দিয়া আমাদিগকে দারিদ্র্য হইতে বিমুক্ত কর। আমাদিগকে শক্তি দাও, যাহাতে পরস্বাপহারী চৌর দস্যু প্রভৃতিকে যথাযথ দণ্ড প্রদান করিয়া সুপথে আনিতে পারি। আমাদিগকে বল দাও, যাহাতে আমরা আমাদের উপার্জ্জিত ধন শত্রুহস্ত হইতে রক্ষা করিয়া সন্তানসন্ততিকে যথোপযুক্তরূপে লালনপালন করিতে পারি।

৫। হে রক্ষকদিগের রক্ষক! তুমি আমাদিগকে অন্নবস্ত্রের অভাব হইতে মুক্ত কর। তুমি আমাদিগকে সুমিষ্ট জলের অভাব হইতে মুক্ত কর। আমাদিগকে স্বাস্থ্য প্রদান কর, যাহাতে আমরা তোমার অপার মহিমাচিন্তনে সমর্থ হই। তুমি আমাদের অন্তরে সুমতি প্রদান কর, যাহাতে আমরা জ্ঞানে ধর্ম্মে উন্নতি লাভ করি এবং ধনরত্নের

অধিকারী হইয়া তোমার আদেশে জগতের মঙ্গল সাধনে তাহা প্রয়োগ করি।

৬। হে দেবদেব! আশীর্ব্বাদ কর, আমাদের বংশের প্রত্যেকেই যেন সাধুগণের রক্ষণে যত্নবান হয়। তোমার প্রিয়কার্য্য জানিয়া আমাদের সন্তানেরা যেন বংশানুক্রমে সৎপথে চলিতে থাকে। তাহারা যেন তোমার উপাসনাকেই জীবনের মন্ত্ররূপে ধারণ করে এবং শতসহস্র দুঃখ বিপদ অতিক্রম করিয়া সংসারধর্ম্ম পালন করে।

৭। যে দেশে, যে জাতিতে অধর্ম্মের প্রাদুর্ভাব ঘটে এবং ধর্ম্মের গ্লানি উপস্থিত হয়, হে রাজরাজ! তুমি সেই দেশে ও সেই জাতির মধ্যে তোমার রুদ্র মূর্ত্তিতে প্রকাশিত হও এবং সংহার-অগ্নিতে অধর্ম্মের আবর্জ্জনা ভস্মীভূত করিয়া নবতর ভাব ও নবতর শক্তি প্রেরণ করিয়া ধর্ম্মকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত কর। অধর্ম্মের কারণেই বশিষ্ঠ তোমাকে সহায় লাভ করিয়া প্রবলপরাক্রান্ত বিশ্বামিত্রকেও পরাজিত করিতে পারিয়াছিলেন।

৮। অধর্ম্মের কারণেই তোমার মঙ্গল বিধানে কৌরবেরা বিনাশপ্রাপ্ত হইয়াছিল। অধর্ম্মের কারণেই তোমার মঙ্গলবিধানে তোমার প্রিয় এই পুণ্যভূমিও পরাধীনতার শৃঙ্খল ধারণ করিতে বাধ্য হইয়াছে।

৯। এখন আমরা অসহায় হইয়া পড়িয়াছি। আমাদের বিরুদ্ধে শত শত অস্ত্র সজ্জিত হইয়া আছে। দাসত্ব হইতে মুক্তিলাভের আমরা কোনও উপায় দেখি না। তুমি তোমার মঙ্গলচক্রের দ্বারা সেই সকল অস্ত্র বিখণ্ডিত করিয়া দাও এবং আমাদিগকে উন্নতির পথে স্বাধীনতার পথে পরিচালিত কর।

১০। হে ভগবান! তুমি আমাদের প্রিয় সমাজকে তোমার স্নেহপ্রেমে নিত্যকাল রক্ষা করিয়া আসিয়াছ। জননীর ন্যায় তুমি আমাদের পিতৃপিতামহগণকে কত না যত্নে লালনপালন করিয়াছিলে। আমাদিগকেও তুমি বর্ম্মদুর্গ হইয়া ঘিরিয়া আছ। আজন্ম তুমি আমাদিগকে বিপদে আপদে দুঃখে শোকে রক্ষা করিয়া আসিতেছ। তোমাকে নমস্কার।

১১। তুমি সর্ব্বশক্তিমান। তুমিই মহৈশ্বর্য্যবান। আমরা তোমার বিজয়পতাকা স্কন্ধে বহন করিয়া তোমার এই ধর্ম্মক্ষেত্রে আমরা উপস্থিত হইয়াছি। আমরা তোমারই যশোগান করিতেছি। যত দেবমনুষ্য তাহা অবাক হইয়া শুনিবার জন্য এখানে উপস্থিত। তুমি মঙ্গলস্বরূপ। তুমি সকলের মঙ্গলবিধান কর। তুমি আমাদিগকে আয়ু বল ও ধন দাও, যাহাতে আমরা সংসারে সুখে বিচরণ করিতে পারি। তুমি আমাদের বংশকে তোমার প্রতি শ্রদ্ধাবান সন্তানসন্ততি দ্বারা সমুজ্জ্বল কর। আমরা তোমাকে নমস্কার করি।

১৭ অঞ্জলি। রুদ্র দেবতা।

১। হে পাপহরণ! আমরা যেন তোমার আদেশের বিরুদ্ধে না চলি। তোমার রুদ্রমূর্ত্তি যেন আমাদিগকে দেখিতে না হয়। তোমার ভয়ে প্রকৃতি যথানিয়মে কার্য্য করিয়া চলিতেছে। তোমারই ভয়ে মৃত্যুও সঞ্চরণ করিতেছে। তুমি অমৃতপুরুষ। আমরা তোমার সন্তান। আমাদিগের অন্তরে বল দাও, যাহাতে আমরা মৃত্যুকে অতিক্রম করিতে পারি।

২। তুমি সর্ব্বশক্তিমান। তুমি প্রজ্ঞানঘন। আমরাও যেন শক্তিতে, জ্ঞানেতে ও প্রেমেতে উন্নত হইয়া তোমার চরণস্পর্শের অধিকার লাভ করি। তুমি আমাদের অন্তরে বল প্রদান কর, যাহাতে আমরা রিপুগণকে জয় করিয়া তোমার এই বিশ্বভুবনকে সমলঙ্কৃত করিতে পারি। তুমি আমাদের মস্তকে আশীর্ব্বাদ দাও, যাহাতে আমরা দেহে মনে সবল হইয়া তোমার সঙ্গে নিত্য যোগযুক্ত হই।

৩। তুমি আমাদিগকে সকল ক্ষেত্রে বিজয়বিধান কর। আমরা যেন দৃঢ় পদে অগ্রসর হইয়া শত্রুদিগের পরাজয় সাধন করিতে পারি। তুমি দেদীপ্যমান পরমেশ্বর। আমাদিগকে দিকে দিকে তোমারই মহদ্‌যশ ঘোষণা করিবার শক্তিসামর্থ্য প্রদান কর। তুমি তোমার অপ্রতিহত বলে বিশ্বভুবন ধারণ করিয়া আছ। তুমি আমাদের সেনাপতি। তুমি আমাদের কাম্যবস্তুসকল বিধান কর। তুমি সুখকর ও কল্যাণকর। তুমি আমাদের সুখ ও মঙ্গল বিধান কর।

৪। এই মহান আকাশ তোমার সিংহাসন। যাহারা অন্তরে তোমার প্রতি অশ্রদ্ধা ও সংশয়

পোষণ করে, তাহারা তোমারই মঙ্গল বিধানে শীঘ্র শীঘ্র বিনাশ প্রাপ্ত হয়। তাহারা আমাদের উপর বিজয়লাভ করিবে কিপ্রকারে?

৫। তোমার ভয়ে মেঘ বারিবর্ষণ করিতেছে। তোমার ভয়ে বায়ু সঞ্চলিত হইতেছে। তোমার অনিমেষ নয়ন আমাদের স্বপ্নে ও জাগরণে নিয়তই মঙ্গলবিধানে নিরত রহিয়াছে। তুমি শ্রেষ্ঠ হইতেও শ্রেষ্ঠ। তুমি রক্ষকদিগেরও রক্ষক।

৬। বশিষ্ঠ-বিশ্বামিত্রসংগ্রামে তুমি ভক্তিমান ও শ্রদ্ধাবান বশিষ্ঠকে বিজয় প্রদান করিয়াছিলে এবং উদ্ধত ও গর্ব্বিত বিশ্বামিত্রকে পরাজয় প্রদান করিয়া তাঁহার গর্ব্ব চূর্ণ করিয়াছিলে। পাণ্ডব-কৌরবযুদ্ধে তুমি ধর্ম্মপরায়ণ পাণ্ডবদিগেরই সহায় হইয়াছিলে। অধার্ম্মিক ও দুর্নীতিপরায়ণ কৌরবেরা তোমার বজ্রদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছিল। আমরা তোমার আশ্রয়ে দাঁড়াইয়াছি। শত বিরোধবিপ্লবের মধ্যেও তুমি আমাদিগকে রক্ষা করিয়া আসিতেছ। যাহারা তোমা হইতে দূরে থাকিতে চায়, তোমার রুদ্রমূর্ত্তি সেই সকল গর্বোদ্ধত ও দুর্বলের প্রতি অত্যাচারী মানবের মধ্যে কি ভীষণ ভাবেই না প্রকাশিত হয়!

৭। আমরা তোমার গুণগান করি। আমাদের যাহা কিছু, সকলই তোমার চরণে সমর্পণ করিয়াছি। অশ্রদ্ধা, অসাধুতা, সংশয় ও অধর্ম্ম হইতে আমরা সর্ব্বদাই দূরে থাকিতে চেষ্টা করি। তোমারই প্রদর্শিত পথে আমরা সর্ব্বদাই বিচরণ করিতে চাই। তুমি আমাদের সহায় হও। আমাদের দেশে মেঘ যথা-সময়ে বারি বর্ষণ করুক এবং মাতা পৃথিবী ভূরি শস্য উৎপাদন করিয়া আমাদের প্রাণ রক্ষা করুন।

৮। তোমার শক্তি কেহই পরিমাণ করিতে পারে না, এবং কেহই তাহাকে প্রতিহত করিতে পারে না। তুমি জ্ঞানস্বরূপ। তোমারই জ্ঞানের কণামাত্র লাভ করিয়া দেবমনুষ্য সকলেই জ্ঞানের পথে অগ্রসর হইতেছে। আজ পর্য্যন্ত কেহই সে জ্ঞানের অন্ত পায় নাই। আমাদিগকে তোমার শক্তি, জ্ঞান ও প্রেম বিশ্বজগতে ঘোষণা করিবার উপযুক্ত করিয়া লও।

৯। আজ আমরা হৃদয়ের যে প্রীতিকুসুম তোমার চরণে নিবেদন করিতেছি, তাহা তুমি প্রেমসিক্ত করিয়া গ্রহণ কর। আমাদিগকে আশীর্ব্বাদ দাও, আমাদের মঙ্গল ইচ্ছাসকল যেন সফল হয়।

১০। আমাদিগের চতুর্দ্দিকে বিপদের ঘন অন্ধকার আমাদিগকে ঘিরিয়া রাখিয়াছে; তোমার মঙ্গলজ্যোতি তাহা বিদূরিত করিয়া দিক। আমাদের অন্তরে দুঃখশোক যে কৃষ্ণবর্ণ ছায়া ফেলিয়াছে, তোমার জ্ঞানজ্যোতি তাহা দূর করিয়া অন্তরকে আলোকিত করিয়া তুলুক।

১১। হে মহান পরমেশ্বর! তুমি আমাদের যশ ও কীর্ত্তি দিগন্তবিস্তৃত কর এবং চিরস্থায়ী কর। তুমি আমাদিগকে শক্তিসামর্থ্য প্রদান কর, যাহাতে আমরা শত্রুদের কলকৌশল ছিন্ন ভিন্ন করিয়া সংসারে বিজয়ীর বেশে বিচরণ করিতে পারি। তুমি আমাদের মধ্যে বিজ্ঞান ও প্রজ্ঞান প্রেরণ কর, যাহাতে আমরা প্রকৃতিতে তোমার আশ্চর্য্য স্বাভাবিকী জ্ঞানবলক্রিয়া উপলব্ধি করিতে পারি, এবং আত্মাতে তোমার প্রকৃত স্বরূপ প্রত্যক্ষ করিতে পারি। আমাদিগের যোগক্ষেম তুমিই বহন কর। আমাদের অন্নজলের কষ্ট বিদূরিত কর। আমাদিগকে সুখসমৃদ্ধি প্রদান কর। আমাদের বংশে যে সকল পুত্রকন্যা জন্মগ্রহণ করিবে, তোমার প্রতি তাহাদের ভক্তিশ্রদ্ধা যেন অটুট থাকে।

বঙ্গে পঞ্চব্রাহ্মণের আগমনবিষয়ক আরও কয়েকটি কথা।

(শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর)।

১৬। কবে আসেন?

মুলো পঞ্চানন বলেন যে ৯৯৯ সম্বতের মাঘ মাসে শুক্লপক্ষের পুষ্যানক্ষত্রে ভট্টনারায়ণপ্রমুখ পঞ্চব্রাহ্মণ পুত্রেষ্টি যজ্ঞ উপলক্ষে রাজা আদিশূরের আহ্বানে বঙ্গদেশে আগমন করেন (১)। কিন্তু ভট্টগ্রন্থে আছে, ৯৯৪ শকে ভট্টনারায়ণপ্রমুখ পঞ্চ ব্রাহ্মণ আসিয়াছিলেন (২)। আমরা কিন্তু ইতিপূর্ব্বে

(১) স° নি° ৩২৬—৩২৭পৃঃ।
(২) ব্রা° কা° ৭৭পৃঃ এবং Tagore Family পৃঃ ৪।

আলোচনা করিয়া দেখিয়া আসিয়াছি যে, এই সিদ্ধান্তের মূল বলিয়া শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় যে উক্তি উদ্ধৃত করিয়াছেন, তাহার পাঠ বিশুদ্ধ নহে। "ঠাকুর পরিবারের সংক্ষিপ্ত বিবরণ"-লেখক তো এ বিষয়ে কোনও প্রমাণই দেন নাই, যদিও তিনি ভাটের কথার উপরেই নির্ভর করিয়া বলিয়াছেন যে, ৯৯৪ শকের (অর্থাৎ ১০৭২ খৃষ্টাব্দের বা ১১২৯ সম্বতের) কার্ত্তিক মাসে শুক্ল নবমী তিথিতে বৃহস্পতিবার ভট্টনারায়ণপ্রমুখ পঞ্চ ব্রাহ্মণ আসিয়াছিলেন। ৯৯৯ সম্বত হইতে ১১২৯ সম্বতের ব্যবধান হইল ১৩০ বৎসর—প্রায় ৪ পুরুষের ব্যবধান। আদিশূর হইতে চারি পুরুষ পরে আমরা প্রদ্যুম্নশূর ও বরেন্দ্রশূরের আবির্ভাব দেখি (৩)। গৌড়ে ব্রাহ্মণ গ্রন্থে "কুলাচার্য্যগ্রন্থ এবং প্রাচীন কুলাচার্য্যদিগের কথা" অনুসরণ করিয়া ইহাই সমর্থিত হইয়াছে (৪) দেখি। কোন কোন কুলগ্রন্থে, বিশেষত বারেন্দ্রকুলশাস্ত্রে, আদিশূর হইতে চারি পুরুষ পরে না ধরিয়া তৃতীয় পুরুষে প্রদ্যুম্ন ও বরেন্দ্রের আবির্ভাব ধরা হয় (৫)। বিপ্রকুলকল্পলতায় প্রদ্যুম্ন ও বরেন্দ্র আদিশূরের জামাতা নিভুজ সেনের পুত্র বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছেন (৬)। "বরেন্দ্রকুলশাস্ত্রগ্রন্থে এ বিষয়ে আরও একটী জনশ্রুতি প্রচলিত আছে। আদিশূরের পর ভূশূর এবং তৎপরে বরেন্দ্রশূর ও প্রদ্যুম্নশূর নামে দুই ভ্রাতা রাজা হন। তাঁহাদের সময়ে বিপ্লব সংঘটিত হইয়া বরেন্দ্র এক দেশে ও প্রদ্যুম্ন অন্য দেশে রাজ্য স্থাপন করায় কান্যকুব্জাগত ব্রাহ্মণগণ তাঁহাদিগের অনুসরণ করিয়াছিলেন। বরেন্দ্রের নামানুসারে বরেন্দ্রদেশ ও প্রদ্যুম্নের রাজ্য রাঢ়দেশ নামে খ্যাত। বাসস্থানের নামানুসারে কালক্রমে ব্রাহ্মণগণ রাঢ়ী ও বারেন্দ্র নাম প্রাপ্ত হইয়াছেন। ইহা জনশ্রুতি মাত্র" (৭)। কিন্তু কুলতত্ত্বার্ণবে আছে যে, ভূশূর যখন ধর্ম্মপালকর্ত্তৃক তাড়িত হইয়া রাঢ়দেশে চলিয়া আসেন, সেই সময়ে তাঁহারই সঙ্গে ক্ষিতীশ প্রভৃতি পঞ্চ ব্রাহ্মণের ২৩ পুত্রের মধ্যে (আমরা কিন্তু দেখিয়াছি ৫৬ পুত্র) ভট্টনারায়ণ প্রভৃতি পাঁচ ব্রাহ্মণই রাঢ়দেশে চলিয়া আসেন এবং পরে তাঁহাদেরই বংশধরেরা রাঢ়ী আখ্যা প্রাপ্ত হন (৮)। এই সকল আলোচনা করিয়া এইটুকু বুঝিতেছি যে, আদিশূরের মৃত্যুর পর ধর্ম্মপাল কর্ত্তৃক ভূশূরের পরাজয়ের ফলেই হৌক বা জ্ঞাতিবিরোধের কারণেই হৌক, ছোটখাট একটা বিপ্লব সংঘটিত হইয়াছিল। অনুমান হয়, সেই বিপ্লবের সময়ে ভট্টনারায়ণ প্রভৃতি পঞ্চ ব্রাহ্মণের বংশধরদিগের ভিতরেও জ্ঞাতিবিরোধ প্রজ্বলিত হইয়া উঠিয়াছিল। কাজেই, সেই সকল বংশধরদিগের মধ্যে যিনি যে দেশে সুবিধা মনে করিয়াছিলেন, তিনি সেই দেশেই উপনিবেশ করিয়াছিলেন। সেই অবধি রাঢ়ী ও বারেন্দ্রের মধ্যে একটা বিভেদরেখা ভালরূপ দাঁড়াইয়া গেল। ভট্টগ্রন্থে সম্ভবত বংশধরদিগের এই উপনিবেশকার্য্যটী তাঁহাদের পূর্ব্বপুরুষ পঞ্চব্রাহ্মণের উপর দিয়াই উক্ত হইয়াছে।

৯। কোথা হইতে আসেন?

এখন দেখা যাক যে, ভট্টনারায়ণপ্রমুখ পঞ্চ ব্রাহ্মণ কোন্ দেশ হইতে—কান্যকুব্জ দেশের কোন্ অংশ হইতে আসিয়াছিলেন? কান্যকুব্জ যে কিরূপ সুসমৃদ্ধ ও সুবিস্তৃত রাজ্য ছিল, তাহা আমরা ইতিপূর্ব্বে বলিয়া আসিয়াছি। বাচস্পতি মিশ্রের কুলরাম গ্রন্থে আছে যে, "কোলাঞ্চ হইতে ব্রাহ্মণগণ গৌড়ে মিলিত হইয়াছিলেন" (৯)। হরিমিশ্রও ঐ কথা সমর্থন করেন (১০)। কারিকা পড়িলে মনে হয়, কান্যকুব্জের কোন এক অংশ সাধারণত কোলাঞ্চ নামে প্রসিদ্ধ ছিল, এবং সেই অংশের প্রধান গ্রামের নাম ছিল সম্ভবত কোলাঞ্চ। সেই কোলাঞ্চ ও তাহার নিকটবর্ত্তী কয়েকটী গ্রামে ভট্টনারায়ণপ্রমুখ ব্রাহ্মণেরা পিতৃপিতামহক্রমে

---

(৩) বং মো০ ৩২০পৃঃ।
(৪) বং মো০ ৩২১পৃঃ।
(৫) বং মো০ ৩২১পৃঃ।
(৬) বং মো০ ৩২২পৃঃ।
(৭) বং মো০ ৩২১পৃঃ—ঐতিহাসিক চিত্র ৮০পৃঃ।

(৮) কান্যকুব্জাৎ স্থাপিতা যে হ্যাদিশূরেণ ভূসুরাঃ।
ত্রয়োবিংশতি পুত্রাঃ স্যুস্তেষাং বেদবিশারদাঃ॥ ৮৭
* * *
তপোবিদ্যাগুণৈঃ সর্ব্বে পিতৃতুল্যা দ্বিজোত্তমাঃ।
ভট্টনারায়ণো দক্ষশ্ছান্দড়ো হর্ষসংজ্ঞকঃ॥ ৯৩
বেদগর্ভো দ্বিজশ্চৈতে সহ ভূশূরভূভৃতা।
পূর্ব্ববাসন্ত সন্ত্যজ্য রাঢ়দেশমুপাগতাঃ॥ ৯৪
* * *
রাঢ়দেশে কৃতে বাসে তে দ্বিজাঃ পঞ্চসংখ্যকাঃ।
রাঢ়ীয়া ইতি বিখ্যাতা দেশনামানুসারতঃ॥ ৯৬ কু, ত০

(৯) ব্রা০ কা০ ৮২পৃঃ। (১০) ব্রা০ কা০ ১০১পৃঃ।

বাস করিতেন। সর্ব্বানন্দমিশ্রের কুলতত্ত্বার্ণব গ্রন্থেও ঐ কথাই উক্ত হইয়াছে (১১)। প্রেমবিলাস বলেন, ক্ষিতীশ (সুতরাং তাঁহার পুত্র ভট্টনারায়ণও বটে) কাহারও মতে জম্বুচট্ট গ্রাম হইতে এবং কাহারও মতে ডিল্লিচট্টর গ্রাম হইতে আসেন (১২)। বীতরাগ (সুতরাং তাঁহার পুত্র দক্ষও বটে) আসল কোলাঞ্চ গ্রাম হইতে আসেন। ইঁহাদিগকে সকলে কোলাঞ্চগ্রামবাসী বলিয়া জানে। সুধানিধি (সুতরাং তাঁহার পুত্র ছান্দড়ও বটে) তাড়িত বা তাড়ি দেশ হইতে, মেধাতিথি (সুতরাং তাঁহার পুত্র শ্রীহর্ষও বটে) ঔড়ম্বর গ্রাম হইতে এবং সৌভরি (সুতরাং তাঁহার পুত্র বেদগর্ভও বটে) মন্ত্রগ্রাম হইতে আসেন। কায়স্থকুলদীপিকাতে আছে যে, পঞ্চব্রাহ্মণের অনুচরেরাও আপনাদিগকে "কোলাঞ্চ হইতে আগত" বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন (১৩)। এদিকে ধ্রুবানন্দ মিশ্র বলেন যে, আদিশূরের দূত বৈজয়ন্তদেশ বা কাশীতে কান্যকুব্জরাজের নিকট পত্র লইয়া যায় (১৪)। এই সকল আলোচনা করিয়া অনুমান হয় যে, কান্যকুব্জরাজ্যের অন্তর্গত বৈজয়ন্ত বা কাশীদেশেরই এক অংশে কোলাঞ্চ প্রভৃতি পঞ্চগ্রাম অবস্থিত ছিল। উপরোক্ত পঞ্চগ্রামই কোলাঞ্চ গণ্ডগ্রামেরই অন্তর্ভুক্ত ছিল এবং সাধারণতঃ কোলাঞ্চ নামেই চলিয়া যাইত বলিয়া অনুমান হয় (১৫)।

১৮। তাঁহাদের অনুচর কে?

পঞ্চব্রাহ্মণের সঙ্গে পাঁচজন অনুচর তাঁহাদের দেহরক্ষীরূপে আসিয়াছিলেন (১৬)—ভট্টনারায়ণের সঙ্গে সৌকালীন গোত্রীয় মকরন্দ ঘোষ, শ্রীহর্ষের সহিত কাশ্যপগোত্রীয় বিরাট গুহ, দক্ষের সহিত গৌতমগোত্রীয় দশরথ বসু, ছান্দড়ের সহিত মৌদ্গল্যগোত্রীয় পুরুষোত্তম দত্ত এবং বেদগর্ভের সহিত বিশ্বামিত্রগোত্রীয় কালিদাস মিত্র আসিয়াছিলেন (১৭)। কুলতত্ত্বার্ণব এই অনুচরগণকে ব্রাহ্মণের ঔরসে ও ক্ষত্রিয়াণীর গর্ভে জাত বলিবার জন্য বিশেষ যত্ন লইয়াছেন দেখা যায় (১৮)। কেবল তাহাই নহে, উহাদিগকে "রাজন্যধর্ম্মী" ও বলা হইয়াছে (১৯)। প্রেমবিলাসে (২০) পঞ্চ ব্রাহ্মণের সঙ্গে পঞ্চ ভৃত্য আসিয়াছিলেন বলিয়া উক্ত হইয়াছে—ক্ষিতীশের সঙ্গে মকরন্দ ঘোষ, বীতরাগের সঙ্গে দশরথ বসু, সুধানিধির সঙ্গে পুরুষোত্তম দত্ত, মেধাতিথির সঙ্গে বিরাট গুহ এবং সৌভরির সঙ্গে কালিদাস মিত্র। কায়স্থকুলদীপিকায় আছে যে, ভট্টনারায়ণ প্রভৃতি পঞ্চব্রাহ্মণ যথাক্রমে পূর্ব্বোক্তমত দাস বা পরিচারক সঙ্গে লইয়া আসিয়াছিলেন। সারাবলী গ্রন্থে মূলো পঞ্চাননধৃত কুলার্ণববচনে আছে যে, ক্ষিতীশ প্রভৃতিরই সঙ্গে উপরোক্ত দাস বা পরিচারকগণ আসিয়াছিলেন। কায়স্থকুলদীপিকাতেও সঙ্গীগণ আপনাদিগকে পরিচারকরূপে অভিহিত করিয়াছেন দেখা যায় (২১)। আমরা এগুলি দেখাইলাম এই জন্য যে, কুলতত্ত্বার্ণবের উক্তি অনুযায়ী পঞ্চব্রাহ্মণের পঞ্চ সঙ্গীকে সঙ্কর জাতি বলিয়া স্বীকার করিতে পারি না। একটী বিশেষ কথা এই দেখি যে, কুলগ্রন্থের মধ্যে, ক্ষিতীশ প্রভৃতি আসেন বা ভট্টনারায়ণ প্রভৃতি আসেন, তাঁহারা কখন্ আসেন, এসকল বিষয়ে নানা মতভেদ থাকিলেও কোন্ গোত্রীয় ব্রাহ্মণের সঙ্গে কোন্ গোত্রীয় কে সঙ্গে আসিয়াছিলেন, সে বিষয়ে এতটুকু মতভেদ দেখা যায় না।

১৯। কোন্ বেশে আসেন?

বাচস্পতি মিশ্র তাঁহার কুলরামে বলেন যে, পঞ্চব্রাহ্মণ বর্ম্মপরিহিত দেহে অসি, বাণ, তূণীর, কোদণ্ড ধারণ করিয়া অশ্বারোহণে আসিয়াছিলেন (২৩)। পার্ব্বতীশঙ্কর রায়চৌধুরী তাঁহার

(১১) কু০ ত০ ৫৪ শ্লোক, ব্রা০ কা০ ১০২ পৃঃ।
(১২) প্রে০ বি০ ২৬২ পৃঃ।
(১৩) কোলাঞ্চাৎ পঞ্চ শূদ্রা বয়মপি নৃপতে কিঙ্করা ভূসুরাণাং।
কা০ কু০—স০ নি০ ১০৩পৃঃ।
(১৪) পত্র লয়ে দূত যায় বৈজয়ন্ত (কাশী) দেশ।
ধ্রুবানন্দ—স০ নি০ ৩৩০।
(১৫) আযাতা বিপ্রবর্য্যাঃ শুচিতরহৃদয় পঞ্চকোলাঞ্চদেশাৎ।
বাচস্পতি মিশ্র—ব্রা০ কা০ ১০৫পৃঃ।
(১৬) কু০ ত০ ৫৩ শ্লোক।

(১৭) কায়স্থকুলদীপিকা—স০ নি০ ১৯।
(১৮) কু০ ত০ ৫৩শ্লোক। (১৯) কু০ ত০ ৮৩ শ্লোক।
(২০) প্রে০ বি০ ২৪শ বিলাস, ২৬২পৃঃ।
(২১) ক্ষিতীশস্তিথিমেধশ্চ বীতরাগঃ সুধানিধিঃ। ১
সৌভরিশ্চাপি ধর্ম্মাত্মা পঞ্চদাসৈঃ সমন্বিতাঃ।
সারাবলী—স০ নি০ ৫০৭।
(২২) কা০ কু০—স০ নি০ ১১৩পৃঃ।
(২৩) আরুহ্য পঞ্চতুরগান্ অসিবাণতূণকোদণ্ডরম্যকবচাদিশরীরবেশাঃ। কু০ রা০—ব্রা০ কা০ ৮১-৮২পৃঃ।

আদিশূর ও বল্লালসেন গ্রন্থে বলেন যে এইরূপ প্রবাদ আছে যে, "ব্রাহ্মণপঞ্চক বর্ম্ম, চর্ম্ম ও ধনুর্বাণধারী যোদ্ধ্বেশে ভূষিত হইয়া অশ্বারোহণে রাজদ্বারে উপস্থিত হন" (২৪)। ক্ষিতীশবংশাবলী চরিতং গ্রন্থে আছে যে, পঞ্চব্রাহ্মণ পরদিন চর্ম্ম-পাদুকা ধারণ করিয়া সূচীবিদ্ধ বস্ত্রে আবৃত দেহে চর্বিত তাম্বূলরসে অধরোষ্ঠ রঞ্জিত করিয়া রাজার সঙ্গে দেখা করিতে গিয়াছিলেন (২৫)। বাচস্পতি মিশ্রের কুলরামোক্ত উক্তি কুলতত্ত্বার্ণব সম্পূর্ণই সমর্থন করিয়াছেন (২৬)। প্রেমবিলাস বলেন যে, যোদ্ধ্বেশে পঞ্চব্রাহ্মণ আসেন (২৭)। এই সকল আলোচনা করিয়া মনে হয় যে, সে সময়ে প্রত্যেক রাজ্যের মধ্যে শান্তি প্রতিষ্ঠিত থাকিলেও রাজ্য হইতে রাজ্যান্তরে যাইবার পথঘাট নিতান্ত নিরাপদ ছিল না।

(২৪) ব্রা° কা° ১০৫—১০৬পৃঃ।
(২৫) ক্ষি° ব° ২পৃঃ।
(২৬) কু° ত° ৫৪শ্লোক।
(২৭) প্রে° বি° ২৬২পৃঃ।

এমিয়েলের জার্নাল।

(শ্রীহিমাংশুপ্রকাশ রায়-কৃত অনুবাদ)

নারী প্রেম চায়; এবং চায়, প্রেম যেন অহেতুকী হয়—যেন রূপ-লাবণ্য, মধুর প্রকৃতি, ভদ্রবংশ, প্রখরা প্রজ্ঞা এসকলের কোন একটিকেও প্রেম অবলম্বন না করে; যেন আপনাদের সম্পূর্ণ নারীসত্তাই প্রেমের মূলে কারণরূপে বর্ত্তমান থাকে। তাহারা মনে করে, বিশ্লেষণ মাত্রেরই অর্থ তাহাদের পূর্ণ ব্যক্তিত্বকে পরিমাণ-দণ্ডের অধীন করিয়া তাহাদের মহিমাকে খর্ব্ব করিয়া দেওয়া। ইহা তাহারা কোন মতেই চায় না। ইহাদের অন্তরের এই যে প্রেরণা ইহা অভ্রান্ত। বিচারশক্তি দ্বারা হৃদয়বৃত্তির কারণ নির্দ্দেশ করিলেই আমরা উহা হইতে পৃথক হইয়া পড়ি। যদি হৃদয়বৃত্তির উত্তেজনা সহ্য করাই নারীজীবনের বিশেষত্ব হয়, তাহা হইলে প্রেম অনন্তকালই চিত্তসম্মোহনের বস্তু হইয়াই থাকুক—তাহাকে বিচার করিবার প্রয়োজন কি? রহস্য দূরীভূত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই প্রেমের মোহিনী শক্তি বিলুপ্ত হয়। প্রেমের যে মাধুর্য্য তাহার প্রধান সম্বল ইহার অসীমতা, ইহার অলৌকিকতা, ইহার অনির্দ্দেশ্যত—সেই মাধুর্য্য সংরক্ষণার্থ আমাদের নিকট প্রেম চিরকালই দুর্জ্ঞেয় এবং বিশ্লেষণের অতীত হইয়া রহিবে। অধিকাংশ মানবই বোধগম্য পদার্থের প্রতি অবজ্ঞা প্রকাশ করিয়া থাকে এবং অনধিগম্য বিষয়ের সম্মুখে নতশির হইয়া রহে। পুরুষের অলীক জ্ঞান গর্ব্বকে নিতান্তই অজ্ঞানসমাচ্ছন্ন বলিয়া তিরস্কৃত করিবার শক্তিধারণ নারীর প্রেমের শ্রেষ্ঠতম বিজয়গৌরব। তাই নারী যখন হৃদয়াভ্যন্তরে প্রেমের উদ্রেক করে তখনই সে বিশেষভাবে দৃপ্ত বিজয়ের উল্লাস সম্ভোগ করে। আমি স্বীকার করি, নারীর উল্লাসের প্রকৃত ভিত্তি আছে, তথাপি আমার নিকট প্রতিভাত হয় যে প্রকৃত প্রেম শান্তি ও আলোকের আধার, ধর্ম্ম ও বিকাশের হেতু—তাহার মধ্যে অহঙ্কার প্রভৃতি হীনবৃত্তির স্থান নাই। মহদন্তঃকরণ মহত্তের জন্যই লালায়িত। অনন্তের দৃষ্টির উপর ভাসমান আত্মার নিকট সর্ব্বপ্রকার হীন চাতুরী ঘৃণ্য চপলতা মাত্র।

জিনেভা—১৭ই মার্চ্চ, ১৮৬৮।

অম্বুবাচী।

(শ্রীচিন্তামণি চট্টোপাধ্যায়)

'অম্বুবাচী' বলিতে সাধারণতঃ লোকের ধারণা এই যে, এই সময়ে তিন দিন ধরিয়া পৃথিবী অশুচি থাকে। এই কারণে অধ্যয়ন ও বীজবপন নিষিদ্ধ এবং সর্পভয় নিবারণ জন্য দুগ্ধপান বিহিত। কৃত্যতত্ত্বে উক্ত হইয়াছে, "তত্রাধ্যয়নং বীজবপনং ন কার্য্যং। সর্পভয়োপশমনায় দুগ্ধং পেয়ং।"

অম্বুবাচী—প্রাবৃটের (monsoonএর) সূচক। কৃষিপ্রাণ ও কৃষিপ্রধান ভারতে প্রাবৃটের প্রতীক্ষাগণনা মরণ-বাঁচন কাঠি। মিটিরিয়োলজিকেল বিভাগের সমূহ আয়োজন এই উদ্দেশে প্রয়োগ হইয়া থাকে। আর পুরাকালে রুদ্রযামল নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন:—

"প্রাবৃট্‌কালে সমায়াতে রৌদ্র-ঋক্ষগতে রবৌ।
নাড়ীবেধ সমাযোগে জলযোগং বদাম্যহম্॥"

"সূর্য্য, আর্দ্রানক্ষত্রে গমন করিলে বর্ষা উপস্থিত হইবে। সেই সময়ে নাড়ীবেধ হইলে আমি তোমাকে জলযোগ অর্থাৎ বর্ষাকালের যোগ বলিব।"

অম্বুবাচীর স্থিতিস্থান নির্দ্দেশ করিতে গিয়া শাস্ত্রকার বলিতেছেন—

যদার্দ্রর্ক্ষং সমাদায় ভানোর্ম্মন্মথগামিতা।
পুনস্তৎস্তেনমাদায় যজনং ত্রিদিনং ত্যজেৎ ॥
কাম্যনৈমিত্তিকঞ্চৈব যাত্রাং মন্ত্রক্রিয়াস্তথা।
ঋতুমত্যাং ন কুর্ব্বীত পূর্ব্বসঙ্কল্পিতাদৃতে ॥
ন কুর্য্যাৎ খননং ভূমেঃ সূচ্যগ্রেণাপি শঙ্করি।
বীজানাং বপনং চৈব চতুর্বিংশতিযামকং ॥
প্রমাদাৎ বপনং কৃত্বা গাবস্তত্র প্রচারয়েৎ।
কৃচ্ছ্রং কুর্য্যাৎ তৎক্ষণাচ্চ পননাত্তিলকাঞ্চনং ॥
ইতি মৎস্যসূক্তে মহাতন্ত্রে ৫৮ পটলঃ।

এইখানে একটু জ্যোতিষ বুঝা আবশ্যক। বারটি মাসে সর্ব্বশুদ্ধ বারটি রাশি আছে। এক একটি রাশিতে সূর্য্য এক এক মাস ব্যাপিয়া অবস্থান করেন; অর্থাৎ বৈশাখ মাসে মেষরাশিতে, জ্যৈষ্ঠ মাসে বৃষরাশিতে, আষাঢ়ে মিথুনরাশিতে, শ্রাবণে কর্কটরাশিতে ইত্যাদি। প্রতি মাসের যেমন এক একটি রাশি আছে, এবং প্রতি বৎসরের যেমন সর্ব্বশুদ্ধ বারটি রাশি আছে, তেমনি আবার প্রতি বৎসরে সর্ব্বশুদ্ধ ২৭টি নক্ষত্র আছে। ইহাদের নাম অশ্বিনী, ভরণী, কৃত্তিকা, রোহিণী, মৃগশিরা, আর্দ্রা, পুনর্ব্বসু ইত্যাদি। এই ২৭কে ১২ দিয়া ভাগ করিলেই সওয়া দুই হয় এবং প্রতি মাসে উক্ত সওয়া দুই নক্ষত্রের ভোগ হয়। তাহা হইলে বুঝিতে হইবে বৈশাখ মাসে যথাক্রমে অশ্বিনী ১, ভরণী ১, ও কৃত্তিকা নক্ষত্রের সিকি অংশ পড়ে; সূর্য্য তাহা অতিক্রম করিয়া চলিয়া যায়। জ্যৈষ্ঠ মাসে কৃত্তিকা নক্ষত্রের বাকী বার আনা অংশ, রোহিণী ১ ও মৃগশিরার অর্দ্ধ অংশ পড়ে, এবং আষাঢ়ে মৃগশিরার বাকী অর্দ্ধেক, আর্দ্রা সম্পূর্ণ ও পুনর্ব্বসুর বার আনা অংশ পড়ে। তাহা হইলেই বৈশাখ মাসের মধ্যে সওয়া দুইটি নক্ষত্র পড়ে। জ্যৈষ্ঠে ও আষাঢ়ে ক্রমান্বয়ে তাহাই। এইরূপে ১২ মাসে সূর্য্য ২৭টি নক্ষত্র অতিক্রম করেন; আবার পর বৎসরে বৈশাখ মাসের প্রথমে অশ্বিনী নক্ষত্রের সঞ্চার হয়। একটি মাসের মধ্যে অর্থাৎ গড়ে ৩০ দিনের মধ্যে সওয়া দুই পরিমাণ নক্ষত্রের স্থিতিকাল হইলে প্রতি নক্ষত্রের স্থিতিকাল মাসের মধ্যে মোটামুটি ১৩ দিন হয়। অন্য কথায় বৈশাখ মাসে অশ্বিনী নক্ষত্র ১৩ দিন, ভরণী ১৩ দিন এবং কৃত্তিকা তিন দিনের কিছু বেশী অধিকার করিয়া থাকে। এইরূপে এক এক মাস পরিসমাপ্ত হয়। আষাঢ় মাসে "মন্মথগামিত্বা" অর্থাৎ মিথুন রাশিতে সূর্য্যের গমন হয়। প্রথম কয়েকদিন অর্থাৎ প্রায় ৬॥ দিন পরে মৃগশিরার অন্ত হয় এবং তাহার পরেই আর্দ্রা (আর্দ্রা+ঋক্ষ, নক্ষত্র) আর্দ্রর্ক্ষং নক্ষত্রের সঞ্চার হয়। ঐ সঞ্চার সময় হইতে অম্বুবাচীর সূচনা। (প্রায়) তিন দিন ও বিংশতি দণ্ড উহার স্থিতিকাল। এসম্বন্ধে শব্দকল্পদ্রুমে একস্থানে "তিন দিন" এবং অপর স্থানে "তিন দিন বিশ দণ্ড" আছে। প্রকৃত প্রস্তাবে রবি আর্দ্রা নক্ষত্রে প্রবেশ করিলেই অম্বুবাচীর প্রবৃত্তি হয়। এদেশের প্রচলিত বচনে আছে, "কিসের বার, কিসের তিথি সাতই আষাঢ় অম্বুবাচী। অর্থাৎ মৃগশিরা নক্ষত্র শেষ করিয়া রবি আর্দ্রা নক্ষত্রে প্রবেশ করিতে আষাঢ় মাসের ৭ই আসিয়া পৌছে। কোন কোন বৎসর জ্যৈষ্ঠ মাসের সংক্রান্তি দিবসের পূর্ব্বার্দ্ধ পরার্দ্ধ সংক্রমণাদি জন্য এই তারিখ এক দিনের তফাৎ হয়। যেমন বর্ত্তমান বৎসরের জ্যৈষ্ঠ সংক্রান্তি দিবা পূর্ব্বার্দ্ধে হওয়ায় এক দিনের তফাৎ হইয়া অম্বুবাচী উপরোক্ত বচন অনুসারে ৭ই না হইয়া ৬ই হইয়াছে।

এখন অম্বুবাচীর স্থিতিকাল, আর্দ্রানক্ষত্রের প্রথম পাদ অর্থাৎ সমস্ত মিথুনরাশির ৩ অংশ ২০ কলা বা আষাঢ় মাসের ⅑ ভাগ। এই মিথুন রাশির ৩ অংশ ২০ কলা বা আষাঢ়ের ⅑ ভাগ দিন হিসাবে (in term of days) ঠিক কয়দিন হইবে তাহা নির্ভর করে, আষাঢ়ের মোট দিন সংখ্যার উপর। এখন আষাঢ় কোনও বৎসর ৩১ দিনে, কোনও বৎসর ৩২ দিনে হয়। কাজেই দিন হিসাবে অম্বুবাচী স্থিতিকাল প্রতি বৎসরই যে ঠিক এক থাকিবে তাহা হইতে পারে না। আষাঢ়ের সমস্ত দিনসংখ্যাকে ৯ দিয়া ভাগ করিলে সেই ভাগফল অম্বুবাচী স্থিতিকাল হয়। আবার পূর্ব্বমাসের সংক্রান্তি সংক্রমণ হিসাবে অম্বুবাচী প্রবৃত্তির সময় (point of time) সরিয়া যায়। কাজেই প্রাতে অম্বুবাচী প্রবৃত্তি হইলে দিনগণনার স্থিতি যাহা হইবে, রাত্রে হইলে দিনগণনায় বেশী দেখাইবে। কাজেই "তিন দিন" বা "তিন দিন বিংশ দণ্ড" ইহা মোটামুটী বলা হইল দেখা যাইতেছে। যেমন আষাঢ় ৩১ বা ৩২ দিনে হইলে আষাঢ়ের ⅑ ভাগ যথাক্রমে তিন দিন ২৬ দণ্ড ৪০ পল বা ৩ দিন ৩৩ দণ্ড ২০ পল হইবে।

এই সময়ে ভূমিসম্বন্ধীয় কোন কার্য্যই কেহ করিবে না; এমন কি, বীজবপনাদি যদি কেহ করেন, তাহাও গরুর দ্বারা খাওয়াইয়া দিবেন—নিজে ঐ শস্য ব্যবহার করিবেন না—ইহাই শাস্ত্রের বিধান।

ঐ সময়ের বীজবপনের শস্য চণ্ডালপাক কেন ইহা জিজ্ঞাস্য হইতে পারে। প্রাবৃটের পূর্ব্বে চাষকার্য্য সম্পূর্ণ না করিলে প্রথম বারিধারা বিফলে যাইতে পারে। আর প্রাবৃটের প্রারম্ভে শস্য বপন নানা কারণে অসঙ্গত। শস্যধ্বংশকারী কীটের প্রাদুর্ভাব ও প্রথম বারিপাতের প্রকোপে সেই সকল কীটের বাহিরে আসিবার কারণে বীজের হানি প্রভৃতি অনিষ্ট হওয়ারই অধিক সম্ভাবনা।

আর্দ্রা নক্ষত্রের সঞ্চারে প্রাবৃটের আগমনসূচক অম্বুবাচীর আবির্ভাব কৃষিপ্রাণ ভারতের যে একটি বিশেষ স্বাভাবিক পর্ব্ব তাহা ভুলিলে চলিবে কেন? বৈদিক সাহিত্যের ভিতরে অনেক স্থলে আছে যে পৃথিবী ক্ষেত্র, আকাশ হইতে উহাতে বৃষ্টিচ্ছলে বীজ পতন হয়, তাহারই ফলে ধরণী শস্যশালিনী হইয়া উঠেন। অম্বুবাচী শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ এই যে, "অম্বু বাচয়তি সূচয়তি" ইহা প্রথম বারিপাত সূচনা করে বা আনয়ন করে। অম্বুবাচীতে প্রতিবর্ষে মুষলধারে বৃষ্টি পড়িবেই, ইহা এক প্রকার সুনিশ্চিত। কচিৎ ইহার বৈলক্ষণ্য হইয়া থাকে। জ্যোতিষের গণনানুসারে আর্দ্রা নক্ষত্রে যোগ এদেশে বারি আনয়ন করিবেই করিবে। পৃথিবী এই আর্দ্রা নক্ষত্রের যোগ অপেক্ষা করে। ইহা হইতে রূপকচ্ছলে বলা হইয়াছে যে, পৃথিবী এসময়ে জলধারার প্রতীক্ষা করিতে থাকেন। পৌরাণিক-কাহিনীচ্ছলে বলা হইয়াছে যে, এই তিন দিন ধরিয়া পৃথিবীকে সামান্য পরিমাণেও খনন করিবে না, ইহাকে কোনরূপ আঘাত দিবে না, ফল শস্য রোপণ করিবে না বা পৃথিবীকে দগ্ধ করিবে না। পূর্ব্ব আরব্ধ কার্য্য ভিন্ন অন্য কার্য্যের অনুষ্ঠান করিবে না।

যতিনোব্রতিনশ্চৈব বিধবা যে দ্বিজাস্তথা।
অম্বুবাচী দিনে চৈব পাকং কৃত্বা ন ভক্ষয়েৎ॥
স্বপাকং পরপাকং বা অম্বুবাচী দিনে তথা।
ভক্ষণং নৈব কর্ত্তব্যং চাণ্ডালান্নসমং স্মৃতং॥

ইতি সম্বৎসরপ্রদীপে বিষ্ণুরহস্যং।

অম্বুবাচী দিনে যতী ব্রতী বিধবা ও ব্রাহ্মণ নিজে বা পরের হস্তে পাক করিয়া আহার করিবে না। কারণ এ সময়ের পক্ক অন্ন চণ্ডালান্নের সমান হয় বলিয়া তাহাদের ধারণা। এইরূপে হিন্দুসমাজের ভিতরে একটি বিজ্ঞান-প্রসূত অনুষ্ঠান প্রবর্ত্তিত হইয়া পড়িয়াছে এবং এইরূপ বিধি ধর্ম্মের স্থান অধিকার করিয়া বসিয়াছে।

ভূমিকর্ষণ সম্বন্ধে নিষেধের অন্য কারণ থাকিতে পারে। আমাদের মনে হয়, অম্বুবাচীর পূর্ব্বেই জমি চষিয়া উহাকে বপনের বা রোপণের উপযুক্ত করিয়া রাখাই সেই কারণ। তাহা না হইলে কালবিলম্ব হেতু ও অম্বুবাচী সময়ে বৃষ্টির আধিক্য বশতঃ চাষের অসুবিধা ঘটিতে পারে। তাই কোন্ সময়ে হলকর্ষণের কার্য্য শেষ করিতে হইবে তাহারও ইঙ্গিত দেওয়া হইয়াছে এবং উহাও ধর্ম্মের অঙ্গীভূত হইয়া দাঁড়াইয়াছে। হিন্দু বিধবারা এই তিন দিন পক্ক দ্রব্য আহার করেন না, পূর্ব্ব হইতে চিঁড়া ও ফল সংগ্রহ করিয়া রাখেন এবং এই তিন দিন ধরিয়া তাহারের বৈচিত্র্যে তৃপ্তিবোধ করেন; তাঁহাদের আহার সম্বন্ধে একঘেঁয়ে ভাবও এই প্রকারে বিনষ্ট হইয়া যায়। বলা বাহুল্য, এই অম্বুবাচীই এদেশের গণনায় 'মন্‌সুন্' অর্থাৎ বারিপাতের বার্ত্তা ঘোষণা করিয়া দেয়। এই অম্বুবাচীর কল্পনায় রূপকত্ব ও কবিত্বের বেশ সমাবেশ আছে।

শব্দ-ব্রহ্ম।

(শ্রীবসন্তকুমার ভট্টাচার্য্য)

ইদং বা অগ্রে নৈব কিঞ্চিদাসীৎ—এ সকল পূর্ব্বে কিছুই ছিল না—না ছিল চন্দ্রমা না, ছিল তপন—না ছিল আকাশ, না ছিল তারা—আজ যারা এতই উজ্জ্বল-এতই মধুর এতই স্নিগ্ধ—আজ যাদের প্রকাশে সকলই প্রকাশ—যাদের আলোকে সকলই আলোকিত—যাদের মাধুর্য্যে সকলই মধুর—আজ যাদের নয়নে ঘুম, হৃদয়ে স্বপন বচনে বেদ, কণ্ঠে গান, পরাণে প্রেম, জীবনে নাটক, তারা কিছুই ছিল না, কেহই ছিল না। আলোক ছিল না, আঁধার ছিল না—পূর্ব্ব ছিল না, পশ্চিম ছিল না, ঊর্দ্ধ ছিল না, অধো ছিল না, দেশ ছিল না, দিক ছিল না। এই মহাশূন্যে কে তুমি মহাপূর্ণ আপন আসনে সমাসীন ছিলে! এই মহা আঁধারে কে তুমি চির জ্যোতির্ম্ময় আপন আলোকে উদ্ভাসিত ছিলে? কে তুমি? কে তুমি? বল না কে তুমি, একবার বল না কে তুমি? অনন্ত শয়নে অনন্ত আসনে কে তুমি মহান্ অনাদ্যনন্ত! হঠাৎ আসন টলিল, অনন্ত কাঁপিল, তরঙ্গ ছুটিল, শব্দ উঠিল "তপঃ তপঃ"। ছিল না কিছুই, আসিল একটা—মহা অভিনয়ের উঠিল প্রথম দৃশ্য। টলিল সিন্ধু, ফুটিল কমল; ছিল নিরাকার, জাগিল তাহা হইতে সাকার। নিরাকারে একটী আকার মহাশূন্যে একটী শব্দ—শব্দে ছাইল বিশ্ব গগন। আজ আমি সৃষ্টির সহস্র সহস্র বৎসর পরে, এই স্থানে দণ্ডায়মান হইয়া যে শব্দ উচ্চারণ করিতেছি,—এই শব্দ—আমার এই কণ্ঠোচ্চারিত শব্দ সেই আদি শব্দ বা অনাদি শব্দ হইতেই নামিয়া আসিয়াছে—সেই অনাদ্যনন্ত প্রথম শব্দই আজ এই মর্ত্ত্যজীবের কণ্ঠোচ্চারিত ক্ষুদ্র শব্দের প্রাণভূত। ঐ দেখ ক্ষুদ্র মানবশিশু! শব্দরূপে পরমব্রহ্মের নাম তোমার কোমলকণ্ঠে কেমন সুন্দর সমুচ্চারিত হইতেছে। যাঁহাকে ধ্রুব খুঁজিয়াছেন, প্রহ্লাদ ডাকিয়াছেন, পৃথু পূজিয়াছেন—অর্জ্জুন সাধিয়াছেন, সেই সাধনের ধন, পূজনের দেব, ভজনের ভগবান—আরাধনের আরাধ্য—আজ তোমার আমার কণ্ঠে দিবারাত্রি অতি সরল ও সহজ ভাবে উচ্চারিত হইতেছেন। সাবধান মানব! এই শব্দের

অপব্যবহার করিও না—অপমান করিও না। যেখানে সেখানে যাহা তাহা বলিও না। এই শব্দ সরস্বতীর বীণায়, শিবের তানপুরায়, নারদের ত্রিতন্ত্রীতারে, যমুনাপুলিনে কৃষ্ণের বাঁশরীতে ধ্বনিত হইত। এই শব্দে হিমালয় জাগে, তপোবন কাঁপে, আকাশ হাসে। এই শব্দ বিহঙ্গের কণ্ঠে, বনভূমির শ্যামলতায়, বনফুলের সুগন্ধে, বনলতার গ্রীবাভঙ্গে প্রকাশ পায়। এই শব্দ যখন শিশুর অধরে, তখন মাতৃহৃদয় টলে, মাতৃস্নেহ উছলে, মাতৃস্তন্য নির্ঝর-ধারায় ঝরে। এই শব্দ যখন পতিব্রতা সতীর কণ্ঠে, তখন মহাযোগী মহাদেব নাচেন, যুবরাজ রামচন্দ্র বনে বনে পাগলের ন্যায় ছুটেন, সাবিত্রীকোলে মৃত সত্যবান বাঁচেন, কণ্বের পবিত্র আশ্রমে রাজা দুষ্মন্ত আত্মবিক্রয় করেন। এই শব্দ যখন আচার্য্যের উপদেশে তখন সমগ্র মানবজাতি নতশিরে শোনে, সাধুর হৃদয়পদ্ম ফুটে, পাপীর চক্ষে জল পড়ে, আসক্তিবন্ধন টুটে, রাজা সিংহাসন ছাড়েন, রাজরাণী কৌপীন পরেন, রাজপুত্র আত্মবলিদানের জন্য শির অবনত করেন। এই শব্দই জনক যাজ্ঞবল্ক্য বশিষ্ঠের কণ্ঠে, পাপীর বন্ধু খ্রীষ্টের প্রাণদানে, কুরুক্ষেত্র সমরাঙ্গনে গীতা রূপে প্রস্ফুটিত হয়; এই শব্দ কপিলাবস্তুর প্রাণসর্ব্বস্ব গৌতমের কর্ম্মবাণীতে দ্বারে দ্বারে নির্ব্বাণ এবং গৌরাঙ্গের প্রেমবাণীতে ঘরে ঘরে প্রেম বিলাইয়াছিল।

আজ যদি জগতে শব্দ না থাকিত, আজ যদি আকাশ-তলে অমৃতবীণা না বাজিত, আজ যদি শিশু "মা" "মা" না বলিত, বন্ধু প্রাণ খুলিয়া বন্ধুকে মর্ম্মব্যথা না শুনাইত, হৃদয়ের জ্বালায় বিরহী দেশ মাতাইয়া বিচ্ছেদের গান না গাহিত—যদি সব মানব মূক হইত, তবে কল্পনা কর, এই অতুলনীয় সুন্দর বিশ্বসৃষ্টির কতই না দুর্দ্দশা হইত? শব্দ না থাকিলে, মানবের কণ্ঠে ভাষা না ফুটিলে আজ মানব মানবই হইতে পারিত না। ক্ষুধা তৃষ্ণা আসিত কিন্তু ক্ষুধার অন্ন তৃষ্ণার জল চাহিতে পারিত না—রোগের যাতনায় ছটফট করিত, কিন্তু হায়! সহস্র চেষ্টাতেও রোগযাতনা চিকিৎসককে বুঝাইতে পারিত না, রোগের ঔষধ মিলিত না। হৃদয়ে প্রেমপদ্ম বিকশিত হইত কিন্তু প্রাণ খুলিয়া প্রেমাস্পদকে তাহা কোন মতেই জানাইতে পারিত না। জীবনটা বোবার স্বপ্নের ন্যায় কতই যাতনাময় হইত। সুতরাং ভাবিয়া দেখ শব্দ বা ভাষা আমাদের কি স্বর্গীয় বন্ধু! কথা! তুমি কি অনুপম—তোমার বাড়ী এদেশে নয়—তুমি স্বর্গপুরে ব্রহ্মকণ্ঠে ছিলে—আমাদিগকে জুটাইয়া তুলিবার জন্য আমাদের ঘরে আসিয়াছ। তোমাকে আমরা নরনারী মিলিয়া বরণ করি। শব্দ তোমাকে আমাকে রোগে শোকে পাপে তাপে বাঁচাইয়া রাখিয়াছে। শব্দ তোমাকে আমাকে শয়নে স্বপনে বিশ্বস্রষ্টার মহান্ লক্ষ্যের দিকে অলক্ষিতে টানিয়া লইয়া যাইতেছে। শব্দ এই সৃষ্টিকে স্বর্গে তুলিবার চেষ্টা করিতেছে। শব্দরূপে অশব্দ ব্রহ্ম বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে সাড়া দিতেছেন—মৃতকে বাঁচাইয়া, ঘুমন্তকে জাগাইয়া, বধিরকে শুনাইয়া, অবিরত বলিতেছেন, "অহমস্মি" আমি আছি। এই "আমি আছি" রব কে না শুনিতে পায়? কাহার নিভৃত হৃদয়কুটীরে এই নিত্য নূতন বীণা না বাজে? এ জগতে কে এমন পাষাণ, এমন আত্মবোধরহিত, যে বিশ্বস্রষ্টার এই বজ্রগম্ভীর নিনাদ না শুনিতে চায়? তোমরা গগনমাঝে বিশ্ববিকম্পী বজ্রনিনাদে কি সেই মহান্ প্রভুর্ব্বৈ পুরুষের গম্ভীর নিনাদ শুনিতে পাও না? তোমরা প্রলয়ঙ্করী মহা ঝঞ্ঝাশব্দে কি সেই জীবন্ত মহাশক্তির হুঙ্কারধ্বনি অনুভব কর না? তোমরা মহাসিন্ধুর বিশ্বগ্রাসী পর্ব্বতোপম ভীষণ তরঙ্গভঙ্গে কি সেই ভবজলনিস্তারণের মহান রব কর্ণগোচর কর না? তেমনি কি তোমরা ভ্রমরগুঞ্জনে, বিহগকূজনে, সখার সম্ভাষণে সেই মধুময় দেবতার প্রেমভরা আহ্বান-রব কি শুনিতে পাও না? যিনি বলিয়াছিলেন, "যাহার কর্ণ আছে সে শুনুক" তিনি সত্য কথাই বলিয়াছিলেন। যাহার কর্ণ আছে সে শুনুক—মহাবিশ্বে আঁধার ঠেলিয়া আলোক ঢালিয়া অবিরত এক রব উঠিতেছে—'আমি আছি-আমি আছি-আমি আছি'! ভক্তযোগী এই রবের প্রত্যুত্তরে বলেন—'তুমি-আছ তুমি-আছ তুমি-আছ'! কি রূপ জানি না, কি নাম জানি না, কি ভাব বুঝি না—এমন আশ্চর্য্য, এমন চমৎকার, এমন অভূতপূর্ব্ব আর কি আছে? সর্ব্বে বেদা যৎ পদম্ আমনন্তি, তপাংসি সর্ব্বাণি চ যদ্বদন্তি, যদিচ্ছন্তো ব্রহ্মচর্য্যং চরন্তি—সেই তুমি এই শব্দরূপে, বাণীরূপে বিশ্বব্যাপী ওঁকার ধ্বনিতে বিশ্বকে ঢাকিয়া রাখিয়াছ। তোমাকে নমস্কার! তোমাকে নমস্কার!

সৃষ্টির প্রথমেই শব্দ—অশব্দ হইতে শব্দ—শূন্য হইতে শব্দ ছুটিল—ছুটিতে ছুটিতে জলস্থল ভেদিয়া, তরুলতা দোলাইয়া, পশুপক্ষী জাগাইয়া, নরনারীর হৃদয়ে আসিয়া মিশিল! নরনারি! তোমাদের প্রাণে জ্ঞানে, জাগরণে, স্বপনে ব্রহ্মনাম মিশিয়া গেল। তোমাদের সুখে দুঃখে শোকে আনন্দে—চক্ষের জলে হাসির তরঙ্গে শব্দ-ব্রহ্ম মিশিয়া গেল। তোমাদের হিরণ্ময় কোষে নিষ্কল ব্রহ্ম শব্দের আকারে ভাষারূপে, সন্ধি সমাস অলঙ্কাররূপে, বৃহতী অনুষ্টুপ ছন্দে, গদ্যে পদ্যে, রাগরাগিণীতে উজ্জ্বল-রূপে প্রকাশ পাইলেন। কেবল বেদে নহে, বেদান্তে নহে, পুরাণে নহে, কোরাণ-বাইবেলে নহে—কিন্তু প্রতি কথায় চক্ষের প্রত্যেক চাহনিতে, হৃদয়ের প্রত্যেক ভাবে—

সর্ব্বের প্রত্যেক তারে ব্রহ্ম ঝঙ্কার করিতেছেন। কখনও আদেশে, কখনও উপদেশে, কখনও স্নেহে, কখনও প্রেমে শব্দব্রহ্ম তোমাকে কত কথাই শুনাইতেছেন। এ বিশ্বে যত তান উঠিয়াছে, যত কথা ফুটিয়াছে, যত গান জমিয়াছে, যত চর্চ্চা বন্দনা হইয়াছে, যত পুস্তক লিখিত হইয়াছে সবই ব্রহ্মমূল হইতে উৎসারিত। তাঁহার একটী মুখ নহে সহস্র মুখ—অনন্তদেব অনন্তমুখে অবিশ্রান্ত অনন্ত শব্দ উচ্চারণ করিতেছেন। কি মধুর, কি প্রাণপ্রদ!

শব্দের কি আশ্চর্য্য শক্তি। ইহা পর্ব্বত পাথার মানে না—দেশ কাল মানে না। শব্দ অজেয় অমর। হিমালয়ের নিভৃত কন্দরে ধ্যানমগ্ন ঋষি নির্জ্জনে কি-শব্দ উচ্চারণ করিলেন—রুদ্ধ পর্ব্বত ভেদিয়া দিগন্ত কাঁপাইয়া দেশ কাল ঠেলিয়া সেই শব্দ—"তন্দুর্দর্শং গূঢ়মনুপ্রবিষ্টং গুহাহিতং গহ্বরেষ্ঠং পুরাণম্" শব্দ আজ আমাদের তোমাদের পুস্তকে লিখিত, গৃহে গৃহে উচ্চারিত ও সভায় সভায় পঠিত হইতেছে! ঋষি নিজ অস্থি পাষাণগর্ভে বিসর্জ্জন দিয়া কোন্ অচিন্ত্য দেশে চলিয়া গেলেন, কিন্তু তাঁহার উচ্চারিত শব্দ হিমালয় ছাড়িল না—ভারতও ছাড়িল না—শুকাইল না—ম্লান হইল না—বরং দিনে দিনে অজেয় বিক্রমশালী হইয়া উঠিতেছে! ধ্রুব চলিয়া গেলেন—তাঁহার সেই নিবেদনধ্বনি "স্বামিন্ কৃতার্থোঽস্মি বরং ন যাচে" তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে চলিয়া গেল না। প্রহ্লাদ বিদায় লইলেন—কিন্তু তাঁহার সেই প্রাণের কথা আমাদের নিকট হইতে আজিও বিদায় লইল না। মানব চলিয়া গেল—অভিনয় ফুরাইয়া গেল—শ্রোতারা স্বস্বস্থানে প্রস্থান করিলেন—আলোকমালা নিবিল—রঙ্গালয় ধূলিতে মিশাইল—কিন্তু অভিনেতাদিগের কণ্ঠরব চলিয়া গেল না—শ্রোতাদের হৃদয় ছাড়িল না—আলোকের সঙ্গে নিবিয়া গেল না। তাহা মহাকাশে মিশিয়া অজেয় ও অমর হইল। তাই আমরা বাল্মীকির শান্ততপোবনে জন্মদুঃখিনী সীতার করুণ ক্রন্দনধ্বনি আজিও শুনিতে পাই—তাই আমরা কুরুসভায় সতী লক্ষ্মী দ্রৌপদীর আকুল রোদনরব শুনিয়া আজিও দুরন্ত দুঃশাসনকে শাসন করিতে ছুটিয়া যাই। এই বিশ্বগগনে সমগ্র মানবমণ্ডলীর উচ্চারিত শব্দ চির দিনের মত ধৃত হইয়া রহিয়াছে। মানব যত ডাকিয়াছে—যত কাঁদিয়াছে—যত বেদনা জানাইয়াছে—যত প্রার্থনা করিয়াছে, যত আত্মপরিচয় দিয়াছে—সব ধরা আছে—সব বেঁচে আছে, সব জেগে আছে। কথা যদি ফুরাইত তবে মানবজাতি বাঁচিত কি লইয়া? রামায়ণ মহাভারত না থাকিলে আমরা শুনিতাম কি? গীতার শব্দ কুরুক্ষেত্রের অস্ত্রঝন্ঝনায়, গাণ্ডীবটঙ্কারের ভীষণ শব্দসাগরে বিলীন হইলে আমরা বাঁচিতাম কিরূপে? যে বিশ্বের একটু ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র কণিকাও মরে না—যে বিশ্বের একটী অণু-পরমাণুও উড়ে না—সে বিশ্ব তপোবনে নরনারীর কণ্ঠোচ্চারিত আনন্দ ও বিষাদ গাথা কি ফুরাইতে পারে?

মানবের কণ্ঠস্বর বিশ্বেশ্বর নিরন্তর আদর করিয়া শুনিতেছেন। ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান সমতাল রাখিয়া সেই জগদেকচন্দ্রের যশোগান করিতেছে। সভ্য অসভ্য, আর্য্য অনার্য্য, রক্তবর্ণ শ্বেতবর্ণ, হরিদ্রাবর্ণ ও কৃষ্ণবর্ণ মানবসন্তানগণ কেহ ব্রহ্মা, কেহ বিষ্ণু, কেহ মহাদেব, কেহ কৃষ্ণ, কেহ যীশু, কেহ চৈতন্য সাজিয়া এই মহা উপাসনামন্দিরে সংস্কৃত, হিব্রু, গ্রীক, লাটিন, ইংরাজী, ফরাসী, উর্দ্দু, পারসী প্রভৃতি কত ভাষায় সেই অবাঙ্মনসগোচরের স্তুতি গান করিতেছেন, নারদের ত্রিতন্ত্রী ঝঙ্কারে দায়ুদের বীণায় গঙ্গা-যমুনার ন্যায় সঙ্গত হইতেছে; শিবের স্তবে যোবের প্রার্থনা মিশিয়া যাইতেছে—সব শব্দ এক শব্দেরই প্রতিধ্বনি—সমস্ত বিশ্বমানবের প্রাণ হইতে একই শব্দ ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং—অনন্ত অক্ষরে গগনে গগনে লিখিত হইতেছে। বাল্মীকি বেদব্যাস, ভবভূতি কালিদাস—দেশ কাল না মানিয়া এক হইয়া যাইতেছেন। যে সব প্রিয়তম মানবসন্তান বিধির বিধানে ইহলোক হইতে পরলোকে মহাপ্রস্থান করিয়াছেন, সেই সব মানবের উদ্দেশে, সেই সব পিতা মাতা স্বামী সখা ও পুত্র-কন্যাগণের প্রতি কতই না আকুল আহ্বান ধ্বনি, কতই না মর্ম্মগাথা, কতই না প্রাণের কথা, ইহলোক হইতে পরলোকের দিকে, জ্ঞাত হইতে অপরিজ্ঞাতের অভিমুখে, সান্ত হইতে অনন্তের পথে নিরন্তর ছুটিতেছে। মহাকাশসিন্ধুর এপার হইতে ওপারে ওপার হইতে এপারে কত শব্দ, কত ধ্বনি কত রব নিরন্তর শ্রুত হইতেছে। যাহার কর্ণ আছে সে আজ শুনুক সহস্র সংবৎসরের যবনিকা ভেদ করিয়া ব্রহ্মর্ষি প্রদেশের মহা ঋষির কলকণ্ঠোচ্চারিত বেদসঙ্গীত আমাদের কর্ণে কর্ণে ঝঙ্কার করিয়া বলিতেছে "বেদাহমেতং পুরুষং মহান্তং আদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ"। যিনি এই বিশ্ব-শব্দের প্রবর্ত্তক, তিনি শুনিতে ভাল বাসেন বলিয়াই আরাধকের উচ্চারিত সমগ্র মন্ত্রমালা অক্ষয় অব্যয় হইয়া সেই জগদারাধ্যের মহাসিংহাসনতলে নিরন্তর ঘুরিয়া বেড়াইতেছে।

ডাক্তার এডওয়ার্ড বাইলস্ কাউয়েল।

(শ্রীপঞ্চানন রায়)

কলিকাতা রাজকীয় সংস্কৃত কলেজের সারস্বত সম্মিলনের এক অধিবেশনে স্বর্গীয় গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় সংস্কৃত কলেজের সহিত তাঁহার কি সম্বন্ধ তাহা বুঝাইতে গিয়া বলিয়াছিলেন যে, তাঁহারা প্রেসিডেন্সি কলেজে সংস্কৃত কলেজের তদানীন্তন অধ্যক্ষ কাউয়েল সাহেবের ইতিহাসের ছাত্র ছিলেন। গুরুদাস বাবুর ন্যায় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম যুগের বহু কৃতবিদ্য ছাত্রই উক্ত মনীষীর নিকট শিক্ষা লাভ করিয়া ধন্য হইয়াছিলেন। ই, বি, কাউয়েল সেকালে সংস্কৃতজ্ঞ মাত্রেরই নিকট 'ঘরোয়া' নাম ছিল। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম এম-এ উপাধিধারী নীলাম্বর বাবু, খ্যাতনামা আচার্য্য শিবনাথ শাস্ত্রী, সুপ্রসিদ্ধ সমালোচক চন্দ্রনাথ বসু প্রভৃতি বাঙালীর মুখোজ্জ্বলকারী বহু মহানুভব পুরুষই তাঁহাদের জীবন গঠনের জন্য উক্ত মনীষীর নিকট অনেক পরিমাণে ঋণী ছিলেন। সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষগণের চিত্রাবলী মধ্যে মহানুভব বিদ্যাসাগরের চিত্রের পরই কাউয়েল মহোদয়ের চিত্র বর্ত্তমান। জাতিতে ইংরাজ হইলেও প্রথম দৃষ্টিতে তাঁহাকে ভারতীয় ঋষিশ্রেণীর ব্যক্তি বলিয়াই মনে হয়। বিজাতীয় পরিচ্ছদের ভিতর দিয়াও ভারতীয় জনসুলভ একটী উচ্চ ভাব বিচ্ছুরিত হইয়া পড়িতেছে। শোনা যায়, ভট্ট মোক্ষমুলার কল্পনানেত্রে ভারতজননীর মুনিগণঅধ্যুষিত যে মহতী মুর্ত্তিটীর অনুধ্যান করিতেন, পাছে তাঁহার সে স্বপ্নের মোহ ভাঙ্গিয়া যায়, তাই তিনি কখনও ভারতে পদার্পণ করেন নাই। মহামতি কাউয়েল উক্ত মহাত্মারই প্রেরণানুপ্রাণিত মানসপুত্র—বাস্তবলোকে ভারতীয় গৌরবময় বৈদিক যুগের পুনঃপ্রতিষ্ঠাপ্রয়াসী মহাপুরুষ। যে সমস্ত মহাপুরুষ বৃটিশ সাম্রাজ্যের ভিত্তিস্তম্ভকে সুদৃঢ়রূপে ধরিয়া রাখিয়াছিলেন কাউয়েল সাহেব তাঁহাদেরই একজন ছিলেন।

১৮২৬ খ্রীষ্টাব্দের ২৩শে জানুয়ারী ইংলণ্ডের সাফোক বিভাগের অন্তর্গত ইপস্‌উইচ্ গ্রামের সেণ্ট্‌ক্লেমেণ্ট ষ্ট্রীটের গৃহে কাউয়েল সাহেবের জন্ম হয়। সুদৃশ্য পল্লীটির ঐ অংশে তৎকালে বহু ব্যবসায়ী পরিবার বাস করিতেন। কাউয়েলের পিতামহ আব্রাহাম কেরেসি কাউয়েল ইপস্‌উইকের পুরাতন পাঠশালার একটী ছাত্র। তিনি ধার্ম্মিক, কর্ম্মঠ ও পরোপকারী ছিলেন এবং অধ্যবসায়গুণে উক্ত পল্লীতে একটী বর্দ্ধনশীল ব্যবসায়ের পত্তন করেন। তাঁহার বৃহৎ পরিবারে অনেক পুত্রকন্যা জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। ১৮০০ খৃষ্টাব্দে তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র চার্লস্ জন্মগ্রহণ করেন। পরিণত বয়সে তিনি তাঁহার পিতার ব্যবসায়ে যোগদান করিয়াছিলেন। ১৮২৪ খৃষ্টাব্দে ইপস্‌উইক পল্লীর অপর একটী উন্নতিশীল ব্যবসায়ী পরিবারের কর্ত্তা "হিল হাউস্" নামক ভবনবাসী ন্যাথানিয়েল বাইল্‌স্ বাইল্‌সের জ্যেষ্ঠা কন্যা ম্যারিয়াণার সহিত তাঁহার বিবাহ হয়। এডওয়ার্ড বাইলস্ কাউয়েল উঁহাদেরই জ্যেষ্ঠপুত্র।

১৮৩৩ খৃষ্টাব্দে সপ্তম বর্ষ বয়ঃক্রমকালে ইপস্‌উইকের প্রাচীন গ্রামার স্কুলে কাউয়েল সাহেবের বিদ্যারম্ভ হয়। ঐ পুরাতন পাঠশালাটী এক সময়ে রাণী এলিজাবেথের পাঠশালা বলিয়া কথিত হইত এবং রাজা চতুর্থ এডওয়ার্ডের সময়েও যে উহার অস্তিত্ব ছিল সে বিষয়েও অনেক প্রমাণ পাওয়া যায়। এখানে কাউয়েল ইটন ল্যাটীন গ্রামার নামক পুস্তককে অবলম্বন করিয়া তাঁহার প্রথম শিক্ষা আরম্ভ করেন। প্রধানশিক্ষক রেভাঃ জে, সি, ইবডেন উন্নত চরিত্রের লোক ছিলেন, তাঁহার বিদ্যাবত্তাও কম ছিল না। তিনিই বাল্যবয়সে কাউয়েলের মনে কর্ম্মপ্রবণতা ও উদ্যমপ্রিয়তা জন্মাইয়া দেন। ইবডেনের ছাত্র বলিয়া কাউয়েল ভবিষ্যৎ জীবনে বিশেষ গৌরবানুভব করিতেন। প্রথম হইতেই কাউয়েল পরিশ্রমী ছাত্র বলিয়া গণ্য হন এবং সুশিক্ষা লাভ করিবার কৌশলটী অবগত হইতে পারেন। উজ্জ্বল স্মৃতিশক্তি ও বিদ্যানুরক্তিবশে তিনি অল্প সময়েই একটী ছাত্রবৃত্তি লাভে সমর্থ হন। পাঠস্পৃহা বলবতী হইলেও তিনি তৎকালীন বাল্যক্রীড়াগুলিকে অনাদর করেন নাই। অল্প বয়স হইতেই তাঁহার অসীম বিদ্যানুরাগ

প্রকাশ পাইতে আরম্ভ করিয়াছিল, এইজন্য এই বিদ্যালয়ে নয় বৎসর অধ্যয়ন করিয়া পাঠ সমাপ্ত করিলেও তাঁহার জ্ঞানপিপাসা চরিতার্থ হয় নাই। ভবিষ্যতে অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়ন সমাপ্ত করিয়া তিনি আপনার আকাঙ্ক্ষা অনেকটা নিবৃত্ত করিতে পারিয়াছিলেন বলিয়া মনে হয়।

বাল্যকালে যে কয়েকজনের প্রভাব কাউয়েলের চরিত্রগঠনের সহায়তা করিয়াছিল এবং তাঁহার চিত্তে সাহিত্যপ্রবণতা ও উচ্চ আশা আনিয়া দিয়াছিল তন্মধ্যে তাঁহার মাতাপিতাই প্রধান। কাউয়েলের পিতা একজন চিন্তাশীল শিক্ষিত ব্যক্তি ছিলেন। তিনি আধুনিক ইতিহাস ও দর্শনশাস্ত্র পড়িতে ভাল বাসিতেন এবং সামাজিকতা ও সাধারণ সভা সমিতিতে বক্তৃতা প্রদান বিষয়ে পারদর্শী ছিলেন। কাউয়েল নিজ জীবন গঠনের জন্য তাঁহার মাতার নিকট বহু পরিমাণে ঋণী। মাতা ও পুত্রের মধ্যে একটী যথার্থ প্রেম বিদ্যমান ছিল। তিনি তাঁহার মাতার নিকট হইতে পঠিত বিষয়ের সার সঙ্কলন অভ্যাসটী আয়ত্ত করেন। বাল্যকাল হইতেই তাঁহার মাতা অধ্যয়ন বিষয়ে যত্নশীল ছিলেন, বিশেষতঃ কবিতাপুস্তক তাঁহার নিকট একটী আকর্ষণের বস্তু ছিল। কাউয়েলের মাতৃস্বসা এলা তাঁহাকে অশ্বারোহণ-বিদ্যায় পটু করিয়া তুলিয়াছিলেন—ভবিষ্যতে ভারতবর্ষে তিনি ইহার প্রয়োজনীয়তা প্রাণে প্রাণে অনুভব করিয়াছিলেন। এলা ফরাসী সাহিত্যে অনুরাগিণী ছিলেন, তিনি কাউয়েলকে তাঁহার সহিত ফরাসী ইতিহাস ও কবিতাগ্রন্থ সমূহ পড়িতে উৎসাহিত করিতেন। মাতুল বার্ণাড বাইলস্‌ও কাউয়েলের জীবনে অনেকটা প্রভাব বিস্তার করেন। তিনি নীতিশাস্ত্রানুরাগী ছিলেন এবং এতদ্বিষয়ে অনেক পুস্তকাদি প্রণয়ন করেন। ভবিষ্যতে তিনি বিচারকের আসনও অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন। তাঁহার সমস্ত দিবাভাগ কার্য্যালয়ে অতিবাহিত হইত, এই জন্য তিনি অরুণোদয়ের বহু পূর্ব্বে উঠিয়া বিদ্যাভ্যাস করিতেন। তাঁহার এই অভ্যাসটী কাউয়েলের জীবনে বিশেষ ফলপ্রদ হইয়াছিল। কাউয়েল তাঁহাকেই অনেক সময় তাঁহার প্রাথমিক অধ্যয়ন বিষয়ে অগ্রগামী সহায়ক ও উৎসাহদাতা বলিয়া বর্ণনা করিতেন।

বয়স বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে কাউয়েলের অধ্যয়নস্পৃহা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। যে বয়সে মানুষ খেলাধূলাকেই প্রধান কার্য্য বলিয়া মনে করে, সেই অল্প বয়সেই তিনি আপনার জ্ঞানের খাদ্য যোগাইবার জন্য জলপানের পয়সাগুলি যত্নপূর্ব্বক সঞ্চয় করিয়া রাখিতেন এবং অবসরমত নানা নূতন পুস্তক কিনিয়া পাঠস্পৃহা চরিতার্থ করিতেন। এইরূপে বাল্যবয়সেই তিনি Walker's Corpus Poetorum Latinorum নামক সুবৃহৎ পুস্তকটী ক্রয় করিয়া ফেলেন। উক্ত পুস্তকটী এক্ষণে কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারের পুস্তকশ্রেণীমধ্যে বর্ত্তমান রহিয়াছে। এই সময় পুস্তকবিক্রেতার দোকানের আলমারিতে সজ্জীভূত Livy নামক সুবৃহৎ পুস্তকের কোন সংস্করণের খণ্ডগুলি তাঁহার ক্ষুধার্ত্ত দৃষ্টি আকর্ষণ করিত। কাউয়েলের এক ভ্রাতা কেবল স্কুলপাঠ্য পুস্তকই ক্রয় করিতেন, তিনি উক্ত বিষয়ের প্রতিবাদ করিয়া তাঁহাকে classic কিনিবার উপদেশ দিতেন।

ইপস্‌উইক্ গ্রামে একটী সুন্দর গ্রন্থাগার ছিল। বহু অমূল্য পুরাতন পুস্তকাবলীতে উক্ত গ্রন্থাগারটী পূর্ণ থাকিত। কাউয়েল আপনার বিশ্রামসময়ের অধিকাংশই উহাতে যাপন করিতেন। এখানে তিনি সার উইলিয়াম জোন্সের গ্রন্থাবলী দেখিতে পান। ঐ গ্রন্থাবলী মধ্যস্থিত আরবী ও পারসী কবিতাবিষয়ক ল্যাটীন পুস্তকটীই প্রথমে তাঁহার মনে ভারতবর্ষ ও প্রাচ্য দেশের প্রতি একটা যথার্থ আকর্ষণ আনিয়া দেয়, বিশেষতঃ Commentarii নামক পুস্তকটী ও 'শকুন্তলা'নামক পারসী কবিতার একটী অনুবাদ তাঁহাকে বিশেষভাবে আকৃষ্ট করিয়াছিল। ১৮৪১ খৃষ্টাব্দের গ্রীষ্মকালে তিনি ঐ পুস্তক দুইটী নিজগৃহে লইয়া গিয়া পড়িতে আরম্ভ করেন। উক্ত পুস্তক দুইটী যত্নসহকারে পাঠ করিবার পর তিনি সাহিত্যসভার সম্পাদক মিঃ লেভেটের সাহায্যে সার উইলিয়ম জোন্সের গ্রন্থাবলী মধ্যস্থিত পারসী ব্যাকরণটী খুঁজিয়া বাহির করিতে সমর্থ হন। অল্প সময়ের মধ্যেই অক্ষরগুলি আয়ত্ত করিয়া তিনি অভিধানের সাহায্যে উক্ত ব্যাকরণে প্রযুক্ত সুন্দর সুন্দর উদাহরণগুলি পড়িতে আরম্ভ করেন। ১৮৪১ খৃষ্টাব্দের অক্টোবর মাসের

এডিনবরা রিভিউ নামক পত্রিকায় লর্ড মেকলের ওয়ারেণ হেষ্টিংস বিষয়ক প্রসিদ্ধ রচনা প্রকাশিত হয়। কাউয়েল যত্নসহকারে উহা পাঠ করেন। কিন্তু এই সূত্রে ইহাই সবিশেষ উল্লেখযোগ্য যে ঐ সংখ্যায় মুদ্রিত নবপ্রকাশিত পুস্তকাবলীর বিজ্ঞাপন মধ্যে তিনি হোরেস্ হেমেন উইলসন্ প্রণীত সংস্কৃত ব্যাকরণের প্রথম সংস্করণের নাম দেখিতে পান। বড়দিনের পার্ব্বণীর পয়সাগুলি জমাইয়া অচিরকাল মধ্যে তিনি উহার একখণ্ড ক্রয় করেন। প্রথমতঃ সংস্কৃতভাষা অত্যন্ত কঠিন বোধ হওয়ায় তিনি ভবিষ্যতের আশায় উহা রাখিয়া দেন এবং পারসী শাহনামা ও হাফিজ পড়িতে থাকেন। তৎকালীন ইপস্‌উইকবাসী বোম্বাইয়ের অবসরপ্রাপ্ত কর্ণেল হক্‌লে তাঁহাকে এই বিষয়ে যথাসাধ্য সাহায্য করিতেন। তাঁহারা উভয়ে জুলেখা ও ইউসাফ পাঠ করেন।

১৮৪২ খৃষ্টাব্দের ৮ই মে কাউয়েলের পিতৃ-বিয়োগ হয়। জ্যেষ্ঠ পুত্র বলিয়া পিতার ব্যবসায়ে প্রবেশ তাঁহার পক্ষে অবশ্যম্ভাবী হইয়া উঠে। বিবেকানুরুদ্ধ হইয়া তিনি ব্যবসায়ে প্রবেশ করেন এবং একজন বিশ্বস্ত কেরাণীর সাহায্যে অল্পকালেই সমস্ত বিষয় বুঝিয়া লইতে সমর্থ হন। তাঁহার ভ্রাতা উপযুক্ত না হওয়া পর্য্যন্ত সাত বৎসর ধরিয়া তিনি সুচারুরূপে ব্যবসায় কার্য্যটী নির্ব্বাহ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। ব্যবসায়ক্ষেত্রে কর্ম্মবহুল দিনগুলি যাপন করিবার সময়েও তিনি গ্রীক্, ল্যাটীন, ফ্রেঞ্চ, ইটালীয়ান্ ও পারসী সাহিত্যের চর্চ্চা করিতেন। ইংরাজী উপন্যাস ও কবিতাপুস্তকসমূহও বাদ যাইত না। ব্যবসায় উপলক্ষে তাঁহাকে প্রায়ই লণ্ডন নগরীতে যাইতে হইত, সেখানে তাঁহার সহিত অধ্যাপক উইলসনের পরিচয় হয়। মহাত্মা উইলসন্ অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃতাধ্যাপক এবং ইণ্ডিয়াহাউসগ্রন্থাগারের অধ্যক্ষ ছিলেন। তিনি ইংরাজী ভাষায় সংস্কৃত ব্যাকরণপ্রণেতা ও প্রথম সংস্কৃত ইংরাজী কোষকার ছিলেন *। ইংলণ্ডে তখন তাঁহার ন্যায় সংস্কৃতাভিজ্ঞ পণ্ডিত কেহই ছিলেন না *। কাউয়েল ইঁহার নিকট যাতায়াত করিতেন, কিন্তু নিয়মিত ভাবে শিক্ষাগ্রহণ করিতে না পারায় মেজর হক্‌লের সহিত পারসী ভাষাটিই উত্তমরূপে পড়িতে থাকেন। এরূপ আগ্রহ ও যত্নের সহিত কাউয়েল অধ্যয়ন করিতেন যে অতি সুকঠিন পুস্তকও তাঁহার নিকট পরম আনন্দদায়ক বলিয়া মনে হইত। এই সময়কার তাঁহার কোন বন্ধুর প্রতি লিখিত একটী পত্রে জানা যায় যে, গ্রীক্ ঐতিহাসিক থুসিডাইডের সুকঠিন পুস্তকগুলিও তাঁহার নিকট উপন্যাসের ন্যায় মধুর লাগিত। ১৮৫১ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত তাঁহার সংস্কৃত শিক্ষা তাদৃশ অগ্রসর হয় নাই। যাহা হউক তাঁহার বিপুল অধ্যবসায় ও পরিশ্রম তাঁহাকে প্রায়ই ইণ্ডিয়া হাউসে উইল্‌সনের নিকট লইয়া যাইত। ইহাতে তিনি উপকৃত হইতেন বলিয়াই মনে হয়।

১৮৪৩ খ্রীষ্টাব্দে কাউয়েল প্রথম তাঁহার মাতৃ-স্বসা ও মাতুলের সহিত ইংলণ্ডের বাহিরে ভ্রমণ করিতে যান। ইহা তাঁহাদের সকলের পক্ষেই পরম তৃপ্তিকর হইয়াছিল। এই বৎসরই একসময় তিনি তাঁহার দুইটী বন্ধুর সহিত নিকটবর্ত্তী সুদৃশ্য ব্র্যামফোর্ড গ্রামে বেড়াইতে যান। সেখানে গিপিং নদীর উপরিস্থ একটী সেতুর উপর তিনি তাঁহার ভবিষ্যৎ পত্নীকে দেখিতে পান। ১৮৪৫ খৃষ্টাব্দে

---

* অবশ্য বঙ্গদেশবাসী পণ্ডিতগণের সাহায্যে (পণ্ডিত গিরীশ-চন্দ্র বিদ্যারত্নকৃত শব্দসার অভিধানের ১ম সংস্করণের বিজ্ঞাপন দেখুন) তিনি উক্ত অভিধানটী প্রণয়ন করেন।

* East India Comanyর অস্ত্রচিকিৎসকরূপে ইনি ভারতবর্ষে আগমন করেন। Lord Amherstএর শাসন সময়ে সুপ্রসিদ্ধ ডেভিড্ হেয়ার ও সুপণ্ডিত ৺জয়গোপাল তর্কালঙ্কারের সহকারিতায় ইনি কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের গোড়াপত্তন করেন (পূর্ণচন্দ্র উদ্ভটসাগরকৃত চাণক্য-শ্লোকের বিজ্ঞাপন দ্রষ্টব্য); লর্ড উইলিয়াম বেণ্টিঙ্ক যখন এদেশে শিক্ষাপ্রচারে ব্রতী হন, তখন ইনিই সংস্কৃতভাষার স্বপক্ষে মত দেন। সংস্কৃত কলেজের অত্যুজ্জ্বলরত্ন সুপ্রসিদ্ধ পণ্ডিত ৺প্রেমচাঁদ তর্কবাগীশ মহাশয় ইঁহারই যত্নে ১৮২৬ খৃষ্টাব্দে পাঠার্থীরূপে সংস্কৃত কলেজে প্রবেশ করিতে সমর্থ হন এবং ইনিই ১৮৩১ খৃষ্টাব্দে উক্ত পণ্ডিতমহাশয়কে অলঙ্কারাধ্যাপকের পদে প্রতিষ্ঠিত করেন। তখন "তর্কবাগীশ মহাশয় রাঢ়দেশবাসী, সুতরাং গঙ্গাতীরবাসী সদ্‌ব্রাহ্মণগণ ইঁহার নিকট পাঠ স্বীকার করিবেন না" বলিয়া কেহ কেহ আপত্তি করায় ইনি বলিয়াছিলেন যে, "আমি প্রেমচন্দ্রকে কন্যাদান করিতেছি না, তাঁহার গুণের পুরস্কার করিয়াছি; ঈর্ষ্যাকুল কয়েকজন অধ্যয়ন না করিলে বিদ্যালয়ের কোনও ক্ষতি হইবে না।" (রামাক্ষয় চট্টোপাধ্যায় লিখিত তর্কবাগীশজীবনী ২৮পৃষ্ঠা) ১৮৩২ খৃষ্টাব্দে কিছুকাল ইনি সংস্কৃত কলেজের সম্পাদকও হইয়াছিলেন। কোনও এক সময়ে সংস্কৃত কলেজ উঠিয়া যাইবার উপক্রম হইলে ইনি বিলাতে চেষ্টা করিয়া উহাকে রক্ষা করিতে সমর্থ হন। সেই সময় তর্কবাগীশ মহাশয় প্রভৃতির সহিত ইঁহার শ্লোকে পত্রব্যবহার হইয়াছিল। কলিকাতা ভিক্টোরিয়া স্মৃতিভবনের যে কক্ষে দ্বারকানাথ ঠাকুর প্রভৃতির চিত্র বর্ত্তমান তাহার পশ্চাতের কক্ষে ইঁহার একটী ক্ষুদ্র চিত্র আছে।

তাঁহার বিবাহের পাকাপাকি বন্দোবস্ত হইয়া যায়। এই সময়ে তিনি সংস্কৃত শিক্ষায় বিশেষ মনোযোগী হন এবং ভবিষ্যৎপত্নী এলিজাবেথকেও তাঁহার সঙ্গিনীরূপে গ্রহণ করেন। এলিজাবেথ গ্রীক্ ও ল্যাটীন ভাষা এবং অঙ্কশাস্ত্রে বিশেষ পারদর্শিনী ছিলেন। ১৮৪৭ খৃষ্টাব্দের ২৩শে অক্টোবর লণ্ডন ব্রেডষ্ট্রীটের মিলড্রেড্ গির্জ্জায় বিনা আড়ম্বরে তাঁহাদের বিবাহকার্য্য সমাধা হয়।

এই বৎসরই শীতকালে তিনি তাঁহার পত্নীর পিত্রালয় ব্রামফোর্ড গ্রামকেই তাঁহাদের বাসস্থানরূপে মনোনীত করেন। ১৮৫১ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত তাঁহারা ঐ বাড়ীতেই বাস করিয়াছিলেন। ব্রামফোর্ড ভবনে তিনি সংস্কৃত রামায়ণ ও মহাভারত পড়িতে আরম্ভ করেন। এই সময় তাঁহার পত্নী তাঁহাকে বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষা গ্রহণ করিতে অনুরোধ করায় তিনি শীঘ্রই অক্সফোর্ড যাইতে মনস্থ করেন।

তাঁহার পত্নী চতুরা এবং বাল্যকাল হইতেই পরিণত-বুদ্ধিশালিনী রমণী ছিলেন। স্ত্রীজাতির বিশিষ্টতা ও ব্যক্তিত্ব তাঁহাতে পূর্ণমাত্রায় বিদ্যমান ছিল। এই সর্ব্বগুণসম্পন্না পত্নীর সহায়তা লাভ করিয়াই কাউয়েল জীবনে বহু বিষয়ে কৃতকার্য্য হইতে সমর্থ হইয়াছিলেন। এবংবিধ পত্নীদ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়াই তিনি ১৮৫০ খৃষ্টাব্দের ১৩ই নভেম্বর অক্সফোর্ডে গমন করেন এবং পরদিনই সেখানকার বিদ্যাপীঠে প্রবেশানুমতি লাভ করেন। সত্বর আপনার দৈনিক কার্য্যতালিকা প্রস্তুত করিয়া তিনি প্রাণপণ পরিশ্রমে অধ্যয়ন করিতে আরম্ভ করিলেও প্রাচ্যদেশীয় ভাষাসমূহ কখনও তাঁহার নিকট অনাদর প্রাপ্ত হয় নাই। প্রায়ই তিনি অধ্যাপক উইলসনের বক্তৃতায় যোগদান করিতেন। মহাত্মা উইলসন একদিন তাঁহাকে ফ্রেড্রিক ম্যাক্সমূলরের * বক্তৃতা শুনিতে লইয়া যান। নিয়মিত ভাবে উইলসনের বক্তৃতায় যোগদান করা ব্যতীত সপ্তাহে একদিন করিয়া তিনি তাঁহার নিকট বিশেষ ভাবে সংস্কৃত অধ্যয়ন করিতেন। তৎকালে ইংলণ্ডে যে পরিমাণ সংস্কৃত শিক্ষা লাভ করিতে পারা যাইত যতদিন না তিনি সেই পরিমাণ শিক্ষা পূর্ণমাত্রায় লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, ততদিন তিনি উল্লিখিত ভাবে নিয়মিত কার্য্য করিতে থাকেন। ভবিষ্যতে ভারতীয় পণ্ডিতগণের সাহায্যে তাঁহার উক্তবিষয়ক জ্ঞানলাভের পূর্ণতা ঘটিয়াছিল এবং প্রাচ্য দর্শনশাস্ত্রে গভীর জ্ঞানলাভ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

সাংখ্যে ঈশ্বরবাদ।

(অধ্যাপক ৺অক্ষয়কুমার মজুমদার এম-এ লিখিত ইংরাজী নিবন্ধের অধ্যাপক শ্রীযতীন্দ্রকুমার মজুমদার এম-এ, পি-এইচ. ডি কৃত অনুবাদ)

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

সেশ্বর সাংখ্য সম্বন্ধে শাস্ত্রীয় প্রমাণ।

পতঞ্জলির যোগসূত্র এইবার দেখা যাউক। যোগসূত্রকে সকলেই সাংখ্যদর্শনের একটী অতি প্রয়োজনীয় পরিশিষ্ট বলিয়া স্বীকার করেন এবং ইহাকে একটী সাংখ্যদর্শনই বলা হইয়া থাকে। (মহাভারতের শান্তিপর্ব্বের ৩০৫, ৩০৭ অধ্যায়ে বশিষ্ঠ ঋষি এবং ৩১৬ অধ্যায়ে যাজ্ঞবল্ক্য ঋষি যাহা বলিয়াছেন তাহা দ্রষ্টব্য)। সুতরাং একথা বলা অনাবশ্যক যে সাংখ্যদর্শন ঠিক ভাবে বুঝিতে গেলে যোগদর্শনের সম্পূর্ণ জ্ঞান বিশেষ আবশ্যক। যোগসূত্রের ব্যাসভাষ্যটী কেবল যে যোগসূত্র বুঝিবার জন্য অত্যন্ত আবশ্যকীয় তাহা নহে, সমগ্র সাংখ্যদর্শন বুঝিতে গেলেও ইহা আবশ্যক; এবং কেহ কেহ বিবেচনা করেন যে যোগসূত্রের ইহাই সর্ব্বোৎকৃষ্ট ব্যাখ্যা। সাধারণতঃ পাতঞ্জল দর্শনকে সেশ্বর সাংখ্য ও কপিলসাংখ্যকে নিরীশ্বর সাংখ্য

---

* ম্যাক্সমূলার ভারতে ভট্ট মোক্ষমূলর নামে খ্যাত। জগদ্বিখ্যাত আচার্য্যগণের মধ্যে মোক্ষমূলরের নাম সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। জগতের প্রাচীনতম গ্রন্থ চতুর্ব্বেদের প্রতীচ্যে বিশেষ প্রচারের তিনিই প্রধান উদ্যোগী ছিলেন। জার্ম্মানদেশে জন্মগ্রহণ করিলেও ইংলণ্ডকেই তিনি প্রধান কর্ম্মভূমি বলিয়া গ্রহণ করেন এবং আমরণ সেইখানেই অবস্থান করিয়া নিজের জগদ্বিখ্যাত পাণ্ডিত্য প্রচার করিতে থাকেন। তাঁহার ব্রাহ্মণোচিত আকৃতি এবং সংস্কৃতানুরাগ ভারতবাসিগণকে এরূপ মুগ্ধ করিয়াছিল যে, সুপ্রসিদ্ধ স্যার রাধাকান্তদেবের পুত্রগণ তাঁহাদের পিতার শ্রাদ্ধের বিদায়স্বরূপ বহুমূল্য শাল ও রৌপ্যকলস তাঁহাকে প্রেরণ করেন। The sacred Books of the East নামক পঞ্চাশ খণ্ডে সম্পূর্ণ সুবৃহৎ গ্রন্থরাজি তিনি সম্পাদন করেন। অচিরকাল মধ্যে কাউয়েলের সহিত তাঁহার চিরস্থায়ী প্রগাঢ় সৌহৃদ্য জন্মিয়া যায়। ১৯০০ খৃষ্টাব্দে মোক্ষমূলরের মৃত্যু হয়। গার্টন কলেজে "কাউয়েলগিফ্ট" নামক কাউয়েল প্রদত্ত পুস্তকাবলী মধ্যে মোক্ষমূলর প্রণীত জাতকমালা নামক পুস্তকটী দৃষ্ট হয়, উহাতে "E. B Cowell from his very old friend F, Max Muller 25 nov 98" কথা কয়েকটী লিখিত আছে।

বলা হইয়া থাকে। কিন্তু কেন এরূপ পার্থক্য করা হইল তাহার কারণ বুঝা কঠিন, কারণ পূর্ব্বেই দেখাইয়াছি যে কপিলসাংখ্য নিরীশ্বর নহে, এবং মহাভারত হইতেও ইহা পাওয়া যায় যে সাংখ্য ও যোগদর্শনে কোনও পার্থক্য নাই—ইহারা একই উপদেশ দান করিতেছে। সম্ভবতঃ কারণ এই যে, এরূপ পার্থক্য বোধ হয় সাংখ্যপ্রবচনসূত্রের কতকগুলি সূত্রের ভ্রান্ত ব্যাখ্যা হইতেই উৎপন্ন হইয়াছে (আমরা পূর্ব্বে ইহার আলোচনা করিয়াছি); অথবা কপিলসাংখ্যে ঈশ্বরকে জীবের মুক্তির জন্য আবশ্যক বলিয়া ধরা হয় নাই, কারণ এখানে জীবের মোক্ষসাধনই প্রধান উদ্দেশ্য; কিন্তু যোগ-দর্শনে জীবের মুক্তির জন্য ঈশ্বরকে স্পষ্টই স্বীকার করা হইয়াছে। সুতরাং 'নিরীশ্বর সাংখ্য' অর্থে এই বুঝা উচিত যে, ইহা জীবের মুক্তির জন্য ঈশ্বরের আবশ্যকতা স্বীকার করে না, এবং 'সেশ্বর সাংখ্য' অর্থে যাহা এরূপ আবশ্যকতা স্বীকার করে। পাতঞ্জল দর্শনের বহু স্থানেই এরূপ আবশ্যকতার উপর জোর দেওয়া হইয়াছে, আমরা এখানে সেগুলি আলোচনা করিব।

(১) 'ঈশ্বরপ্রণিধানাৎ বা', অর্থাৎ "ভক্তিবিশেষ দ্বারা ঈশ্বরের উপাসনায় সমাধি ও তৎফললাভ আসন্নতম হয়"। (২) 'অথ প্রধান-পুরুষব্যতিরিক্তঃ কোঽয়মীশ্বরো নামেতি'? অর্থাৎ "প্রধান ও পুরুষ ব্যতিরিক্ত ঈশ্বর কে?" (৩) "ক্লেশকর্ম্মবিপাকাশয়ৈরপরামৃষ্টঃ পুরুষবিশেষ ঈশ্বরঃ", অর্থাৎ, "ক্লেশ, কর্ম্ম, বিপাক ও আশয় হইতে নিত্যমুক্ত পুরুষবিশেষকে ঈশ্বর বলে", এখানে 'পুরুষবিশেষ' এই কথাটী লক্ষ্য করিতে হইবে। ব্যাসদেব ইহার এইরূপ ব্যাখ্যা করিতেছেন—"কৈবল্যং প্রাপ্তাস্তর্হি সন্তি চ বহবঃ কেবলিনঃ, তেহি ত্রীণি বন্ধনানি ছিত্বা কৈবল্যং প্রাপ্তাঃ। ঈশ্বরস্য চ তৎসম্বন্ধো ন ভূতো ন ভাবী; যথা মুক্তস্য পূর্ব্বা বন্ধকোটিঃ প্রজ্ঞায়তে, নৈবমীশ্বরস্য। যথা বা প্রকৃতিলীনস্য উত্তরা বন্ধকোটিঃ সম্ভাব্যতে, নৈবমীশ্বরস্য; স তু সদৈব মুক্তঃ সদৈবেশ্বর ইতি"। অর্থাৎ (ঈশ্বরকে পুরুষবিশেষ বলিবার তাৎপর্য্য এই যে) কৈবল্যাবস্থাপ্রাপ্ত অনেক পুরুষ আছেন যাঁহারা ত্রিবিধ বন্ধন ছিন্ন করিয়া কৈবল্য প্রাপ্ত হইয়াছেন; কিন্তু ঈশ্বর তদ্রূপ নহেন, কারণ তাঁহার বন্ধনসম্বন্ধ কখনও হয় নাই, হইবেও না; মুক্তি বলিলেই পূর্ব্বে বন্ধন ছিল একথা বুঝিতে হইবে; কিন্তু এ সম্বন্ধে ঈশ্বরের সেরূপ সম্ভাবনা নাই, তাঁহার কখনও বন্ধন ছিল না। অধিকন্ত, প্রকৃতিলীন পুরুষেরও একপ্রকার দুঃখ-নির্ম্মুক্তাবস্থা হয়, কিন্তু তাহাদের পুনরায় বন্ধন ঘটিয়া থাকে; কিন্তু ঈশ্বরের পক্ষে সেরূপ সম্ভব নহে, তিনি নিত্যই মুক্ত এবং স্বপ্রতিষ্ঠ।" (৪) "তত্র নিরতিশয়ং সর্ব্বজ্ঞবীজং", অর্থাৎ "তাঁহাতে (ঈশ্বরেতে) সর্ব্বজ্ঞতার বীজ নিরতিশয়ত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে"। (৫) "পূর্ব্বেষামপি গুরুঃ কালেনানবচ্ছেদাৎ", অর্থাৎ "ঈশ্বর প্রাচীনদিগেরও উপদেষ্টা, কারণ কালশক্তি তাঁহাতে অপরিমিত"। (সমাধিপাদ, ২৩—২৭ সূঃ)। ঈশ্বরের কথা অন্যান্য সূত্রেও আছে, যথা ১ ও ৩২ (সাধনাপাদ), ৬ (বিভূতিপাদ); কিন্তু এখানে সেগুলির উল্লেখের আবশ্যকতা নাই। যে সূত্রগুলি উপরে উদ্ধৃত হইয়াছে তাহা হইতে স্পষ্টই দেখা যায় যে পাতঞ্জল দর্শন জীবের মুক্তির জন্য ঈশ্বরাস্তিত্ব ও তাঁহার আবশ্যকতা স্বীকার করিয়াছেন; ইহাও স্পষ্ট যে পাতঞ্জলদর্শনে দুই প্রকার পুরুষ স্বীকৃত হইয়াছে—পরমপুরুষ ও জীবপুরুষ। এই দুয়ের কি সম্বন্ধ তাহা আমরা পরে বিবেচনা করিব। কিন্তু এখানে একথা লক্ষ্য করিতে হইবে যে পাতঞ্জল এ কথা বলিতেছে না যে মানুষের মুক্তির জন্য ঈশ্বর একান্ত আবশ্যক, কেবল ভক্তিবিশেষ দ্বারা তাঁহার উপাসনা করিলে তাহাদের মুক্তিলাভ আসন্নতম হয়। এখানে 'বা' এই কথাটী লক্ষ্য করিতে হইবে। 'বা'-শব্দে বুঝাইতেছে যে মুক্তিলাভের আরও অন্য উপায়ও আছে যাহার মধ্যে ঈশ্বরের উপাসনা অন্যতম। এতৎসম্বন্ধে বিশেষভাবে সমাধিপাদের ২১ ও ২২ সূত্র দ্রষ্টব্য। সুতরাং এই সম্বন্ধে সাংখ্য ও পাতঞ্জলে বাস্তবিকপক্ষে বিশেষ কোনও পার্থক্য নাই।

মহাভারতের শান্তিপর্ব্বের ৩০১—৩১৮ অধ্যায়ে সাংখ্যদর্শনের একটী সুন্দর বিবরণ দেখা যায়। ৩০১ অধ্যায়ে সাংখ্যদর্শনের উচ্চ প্রশংসা আছে, এবং সাংখ্যজ্ঞানেরও খুব বিস্তৃত বর্ণনা আছে, এমন কি সাংখ্যজ্ঞানকে স্বয়ং ব্রহ্মই বলা হইয়াছে। আমি এখানে সেই শ্লোকগুলি উদ্ধৃত করিতেছি "সাংখ্যাঃ রাজন্মহাপ্রাজ্ঞাঃ গচ্ছন্তি পরমাং গতিং। জ্ঞানেনানেন কৌন্তেয় তুল্যং জ্ঞানং ন বিদ্যতে॥ অত্র তে সংশয়ো মা ভূৎ জ্ঞানং সাংখ্যং পরমং মতম্। অক্ষরং ধ্রুবমেবোক্তং পূর্ণং ব্রহ্ম সনাতনম্॥ অনাদি-মধ্য-নিধনং নির্দ্বন্দ্বং কর্ত্তৃশাশ্বতম্। কূটস্থঞ্চৈব নিত্যঞ্চ যদ্বদন্তি মনীষিণঃ॥ ...... অমূর্ত্তেস্তস্য কৌন্তেয় সাংখ্যং মূর্ত্তিরিতি শ্রুতিঃ। অভিজ্ঞানানি ভজ্ঞাহর্মতং হি ভরতর্ষভ॥ ..... জ্ঞানং মহদ্যদ্ধি মহৎসু রাজন্ বেদেষু সাংখ্যেষু তথৈব যোগে। যচ্চাপি দৃষ্টং বিবিধং পুরাণে সাংখ্যাগতং তন্নিখিলং নরেন্দ্র॥ যচ্চেতিহাসেষু মহৎসু দৃষ্টং যচ্চার্থশাস্ত্রে নৃপ শিষ্টজুষ্টে। জ্ঞানঞ্চ লোকে যদিহাস্তি কিঞ্চিৎ সাংখ্যাগতং তচ্চ মহন্মহাত্মন্"॥ অর্থাৎ "হে রাজন্, সাংখ্যেরা মহাপ্রাজ্ঞ।

এই জ্ঞান দ্বারা তাহারা পরমগতি লাভ করে। হে কৌন্তেয়! ইহার তুল্য আর কোনও জ্ঞান নাই। সাংখ্যে যে জ্ঞানের কথা আছে তাহাই শ্রেষ্ঠ, এ বিষয়ে তুমি নিঃসন্দেহ হও। সেই জ্ঞানকে অক্ষর, ধ্রুব, নিত্য ও পূর্ণব্রহ্ম বলা হইয়াছে। ইহার আদি মধ্য ও অন্ত নাই। ইহা সকল দ্বন্দ্বের অতীত এবং ইহা জগতের শাশ্বত কারণ। ইহা নিত্য ও পূর্ণ; ইহা একরূপ ও চিরস্থায়ী। জ্ঞানীরা এইরূপে ইহার প্রশংসা করিয়াছেন। হে কুন্তিপুত্র! শ্রুতি বলেন—সাংখ্য সেই অমূর্ত্তের মূর্ত্তিস্বরূপ। হে ভরতর্ষভ! এরূপ কথিত আছে যে সাংখ্যে যে জ্ঞানের কথা আছে, তাহা ব্রহ্মেরই উপদেশ। হে রাজন্! যে উচ্চ জ্ঞানের কথা ব্রহ্মজ্ঞানীদিগের সমীপে ও বেদে পাওয়া যায়, এবং যাহা অন্যান্য শাস্ত্রেও দেখা যায়, যাহা যোগে আছে এবং যাহা বিভিন্ন পুরাণে উক্ত হইয়াছে—এ সমস্তই সাংখ্যদর্শন হইতে গৃহীত হইয়াছে। যাহা কিছু জ্ঞানের কথা ইতিহাসে, অর্থশাস্ত্রে ও এই পৃথিবীতে আছে তাহার সমস্তই সাংখ্যের উচ্চজ্ঞান হইতে গৃহীত।"

উপরি-লিখিত শ্লোকগুলি হইতে একথা স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে যে সাংখ্যে ঈশ্বরের অস্তিত্ব অস্বীকৃত হওয়া দূরে থাকুক, ইহাতে যে জ্ঞানের কথা বর্ণিত হইয়াছে তাহাকে স্বয়ং ঈশ্বরের সহিত একীভূত করা হইয়াছে এবং ইহাকে ঈশ্বরের মূর্ত্তিস্বরূপই বলা হইয়াছে। এমন কি, বেদে যে ঈশ্বরজ্ঞানের কথা আছে তাহাও সাংখ্য হইতে গৃহীত বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। নিম্নলিখিত শ্লোকগুলিতে বশিষ্ঠ মুনি যাহা বলিয়াছেন তাহা দ্বারা উপরি-উক্ত মতটী অধিকতর সমর্থিত হইতেছে। শ্লোকগুলি এই—"পঞ্চবিংশতিমো বিষ্ণুর্নিস্তত্ত্বস্তত্ত্বসংজ্ঞিতঃ। তত্ত্বং সংশ্রয়নাদেতত্তত্ত্বমাহুর্মনীষিণঃ॥ যন্মর্ত্ত্যমসৃজদ্ব্যক্তং তত্তন্মূর্ত্ত্যধিতিষ্ঠতি। চতুর্বিংশতিমোঽব্যক্তো হ্যমূর্ত্তঃ পঞ্চবিংশকঃ॥ স এব হৃদি সর্ব্বাসু মূর্ত্তিষ্বাতিষ্ঠতেঽত্মবান্। কেবলশ্চেতনোনিত্যঃ সর্ব্বমূর্ত্তিরমূর্ত্তিমান্। সর্গপ্রলয়ধর্ম্মিণ্যা স সর্গপ্রলয়াত্মকঃ। গোচরে বর্ত্ততে নিত্যং নির্গুণং গুণসংজ্ঞিতম্॥ এবমেষো মহানাত্মা সর্গপ্রলয়কোবিদঃ। বিকুর্ব্বাণঃ প্রকৃতিমানভিমন্যত্যবুদ্ধিমান্॥" মভা, ৩০২অং, ৩৮—৪২শ্লোঃ)। অর্থাৎ, "যে চতুর্বিংশতি তত্ত্বের কথা বলা হইয়াছে তাহার অতিরিক্ত পঞ্চবিংশ তত্ত্ব হইতেছেন বিষ্ণু বা ঈশ্বর। সেই বিষ্ণু সমস্ত গুণ-বর্জ্জিত হওয়ায় কোনও তত্ত্ব নহেন, যদিও তিনি সকল তত্ত্বকে ব্যাপিয়া বর্ত্তমান বলিয়া সুধীরা তাঁহাকে একটী তত্ত্ব বলিয়াছেন। অব্যক্ত প্রকৃতি হইতেছে সকল মর্ত্ত্য ও প্রকাশবান্ বস্তুর কারণ এবং উহাদের শরীরেই ইহা বর্ত্তমান; কিন্তু পুরুষ নিরাকার। যদিও পুরুষ আত্মা, তথাপি তিনি সকলের অন্তরে ও সকল রূপেতেই বর্ত্তমান; তিনি যুক্ত, চেতন, নিত্য এবং যদিও স্বয়ং আকারবিহীন তথাপি তিনি সকল প্রকার আকারই পরিগ্রহ করেন। যে প্রকৃতি সকল সর্গ ও প্রলয়ের কারণ তাহার সহিত যুক্ত হইয়া পুরুষও সর্গ ও প্রলয়ের কর্ত্তৃত্বর রূপ ধারণ করেন। এবং এইরূপ সংযোগ হেতু তিনি নিত্য হইলেও কালেতে অবস্থিতি করেন, এবং যদিও তিনি বস্তুতঃ গুণবর্জ্জিত তথাপি গুণযুক্ত হয়েন। এই প্রকারে সেই পরমাত্মা অবিদ্যা হেতু নিজেকে সর্গ ও প্রলয়ের কর্ত্তা বলিয়া বিবেচনা করেন, এবং পরিবর্ত্তনীয় ও প্রকৃতিলীন হয়েন।" উপরি-উক্ত শ্লোকগুলিতে একথা স্পষ্টই স্বীকৃত হইয়াছে যে, পুরুষ—যাঁহাকে পঞ্চবিংশ তত্ত্ব বলা হইয়াছে—তিনি বস্তুতঃ বিষ্ণু বা ঈশ্বর, তিনি কোনও তত্ত্ব নহেন। তিনি কোনও বিশিষ্ট অন্তরে বা রূপে বর্ত্তমান নহেন, তিনি সকল অন্তরে ও রূপে বর্ত্তমান। তিনি সকল রূপই ধারণ করেন এবং সকল সর্গ ও প্রলয়েরও কর্ত্তৃত্ব গ্রহণ করেন। সুতরাং একথা বলা হইল যে, জীবসকল বিভিন্ন উপাধিধারী ও বিভিন্ন উপায়ে সীমাবদ্ধ বস্তুতে কার্য্যকারী ব্রহ্ম ব্যতীত আর কিছুই নহে। বশিষ্ঠ নিম্নলিখিত শ্লোকটীতে এই বাক্যটী একটী উপমা দ্বারা সুন্দর ভাবে বুঝাইয়াছেন। শ্লোকটী এই—"কোষকারো যথাত্মানং কীটঃ সমবরুন্ধতি। সূত্রতন্তুগুণৈর্নিত্যং তথায়মগুণো গুণৈঃ" (মভাঃ ৩০৩ অঃ, ৪শ্লোঃ), অর্থাৎ, "গুটীপোকা যেরূপ নিজ সূত্রের দ্বারা চতুর্দ্দিক হইতে নিজেকে বদ্ধ করে, সেইরূপ ঈশ্বরও গুণাতীত হইলেও নিজেকে চতুর্দ্দিক হইতে গুণের দ্বারা বদ্ধ করেন"।

বশিষ্ঠ মুনি নিম্নলিখিত শ্লোকগুলিতে যাহা বলিয়াছেন তাহাও বিবেচনা করিয়া দেখা যাউক্। এগুলিতে ঈশ্বরের অস্তিত্ব অধিকতর স্পষ্টভাবে স্বীকৃত হইয়াছে; সেগুলি এই—"যদায়মেব গুণানেতান্ প্রাকৃতানভিমন্যতে। তদা স গুণহানৈ্য তং পরমেবানুপশ্যতি" (৩০৫ অঃ, ৩০ শ্লোঃ), অর্থাৎ, "যখন জীব মনে করে যে ঐ সকল গুণ প্রকৃতির, কেবল তখনই সেগুলিকে জয় করিবার নিমিত্ত জীব ঈশ্বরকে দর্শন করে"। পুনশ্চ—"পঞ্চবিংশতিনিষ্ঠোঽয়ং যদা সম্যক্ প্রবর্ত্ততে। একত্বং দর্শনঞ্চাস্য নানাত্বঞ্চাপ্যদর্শনম্॥ তত্ত্বনিস্তত্ত্বয়োরেতৎ পৃথগেব নিদর্শনম্। পঞ্চবিংশতিসর্গন্তু তত্ত্বমাহুর্মনীষিণঃ॥ নিস্তত্ত্বং পঞ্চবিংশস্য পরমাহুর্নিদর্শনম্। সর্গস্য বর্গমাচারং তত্ত্বং তত্ত্বাৎ সনাতনম্" (৩৭, ৩৮ ও ৩৯ শ্লোঃ দেখ)। অর্থাৎ, "যখন কেহ পঞ্চবিংশতি তত্ত্বের আলোচনা করে, ও বুঝিতে আরম্ভ করে তখন সে বুঝিতে পারে যে, পুরুষের একত্ব শাস্ত্রের (সাংখ্যদর্শনের) সহিত সমঞ্জস এবং পুরুষের বহুত্ব এই শাস্ত্রের বিরুদ্ধ। এইগুলি

হইতেছে তত্ত্বসমূহের বিভিন্ন প্রকৃতি (বা ধর্ম্ম) এবং ইহাদের অতিরিক্ত যাহা; জ্ঞানীরা বলিয়াছেন যে এই তত্ত্বগুলি হইতেছে পঞ্চবিংশতি সর্গ, এবং যাহা সর্গ নহে অথবা যাহা সর্গের অতীত তাহা হইতেছে ষড়্বিংশ, অর্থাৎ ব্রহ্ম বা ঈশ্বর। পঞ্চবিংশতি সর্গকে তত্ত্ব বলা হয়, এবং যাহা ইহার অতীত তাহাই হইতেছে নিত্যেশ্বর"। এখানে একথা লক্ষ্য করিতে হইবে যে, এমন কি, পঞ্চবিংশতত্ত্ব অর্থাৎ জীবকেও একটী তত্ত্ব বলিয়া ধরা হয়, এবং পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে স্বভাবতঃ জীব ও ব্রহ্ম অভিন্ন। কিন্তু এই অসামঞ্জস্য বাস্তব নহে, কারণ জীব ত্রিগুণান্বিত ঈশ্বর, সুতরাং জীবকে দুইভাবে দেখা যায়—জীবরূপে তিনি একটী তত্ত্ব, কিন্তু উপাধিবর্জ্জিত বা উপাধির অতীতরূপে তিনি ব্রহ্মের সহিত অভিন্ন। ঈশ্বর ও জীবের অভিন্নত্ব নিম্নলিখিত সূত্রগুলিতে আরও স্পষ্টভাবে বলা হইয়াছে। যথা—"অয়মত্র ভবেদ্বন্ধুরনেন সহ যে ক্ষমম্। সাম্যমেকত্বমায়াতো যাদৃশস্তাদৃশস্ত্বহম্॥ তুল্যতামিহ পশ্যামি সদৃশোহহমনেন বৈ। অয়ং হি বিমলো ব্যক্তমহমীদৃশকস্তথা'' ॥ (মভা ৩০৭ অঃ, ২৬ ও ২৭ শ্লো)। অর্থাৎ, "কেবল পরমপুরুষই আমার বন্ধু। আমি তাঁহার সহিত বন্ধুত্ব করিতে পারি। আমার স্বভাব যাহাই হউক না কেন, এবং আমি যেই হই না কেন, আমি তাঁহার মত হইতে পারি এবং তাঁহার সহিত একও হইতে পারি। তাঁহার সহিত আমার সাদৃশ্য আমি দেখিতে পাইতেছি; বাস্তবিক আমি তাঁহারই মত। তিনি শুদ্ধ; ইহাও স্পষ্ট যে আমিও ঐরূপ।"

সাংখ্য সম্বন্ধে যাজ্ঞবল্ক্য ও জনকের কথোপকথনেও আমরা ঐ এক সিদ্ধান্তই দেখিতে পাই। যথা—"অব্যক্তরূপো ভগবান্ শতধা চ সহস্রধা। শতধা সহস্রধা চৈব তথা শতসহস্রধা। কোটিশশ্চ করোত্যেষ প্রত্যগাত্মানমাত্মনা।" (মভা, ৩১৪অঃ, ২শ্লোঃ), অর্থাৎ, "অব্যক্ত ঈশ্বর নিজেকে (অন্তরাত্মাকে) নিজের দ্বারা শত, সহস্র লক্ষ ও কোটিরূপে পরিণত করেন।'' পুনশ্চ—"যদানুপশ্যতেহত্যন্তমহন্যহনি কাশ্যপ। তদা স কেবলীভূতঃ ষড়্বিংশমনুপশ্যতি॥ অন্যশ্চ শাশ্বতোহব্যক্তস্তথান্যঃ পঞ্চবিংশকঃ। তস্য দ্বাবনুপশ্যেতাম্ তমেকমিতি সাধবঃ॥ তে নৈতন্নাভিনন্দন্তি পঞ্চবিংশকমচ্যুতম্। জন্মমৃত্যুভয়োদ্বেগাঃ সাংখ্যাশ্চ পরমৈষিণঃ॥'' (মভা, ৩১০অঃ, ৫৫—৫৭ শ্লোঃ)। অর্থাৎ, "হে কাশ্যপ, যদি কেহ সর্ব্বদা জীবের বিষয় ও পরমাত্মার সহিত ইহার সম্বন্ধের বিষয় চিন্তা করে, তাহা হইলে সে ত্রিবিধ দুঃখ হইতে নিজেকে মুক্ত করিতে পারে ও পরমাত্মাকে দেখিতে পায়। অল্পবুদ্ধি ব্যক্তিরা অব্যক্ত পরমপুরুষকে জীব হইতে ভিন্ন বলিয়া মনে করে। কিন্তু সুধীরা ঈশ্বর ও জীবকে অভিন্ন বলিয়াই দেখেন। পুনঃ পুনঃ জন্ম ও মৃত্যুর ভয়ে ভীত হইয়া সাংখ্যেরা ও যোগীরা ঈশ্বর ও জীবকে অভিন্ন বলিয়াই বিবেচনা করেন।"

মহাভারতের
নীতি-বাক্য।

(৺অনাথকৃষ্ণ দেব কর্ত্তৃক সংগৃহীত)

সভাপর্ব্ব।

বিদুর।—এই ভূমণ্ডলে প্রিয়ভাষী পাপাত্মা মনুষ্য অনেক আছে, কিন্তু অপ্রিয় অথচ হিতকর বাক্যের বক্তা ও শ্রোতা নিতান্ত দুর্লভ।

যে ধর্ম্মনিরত ব্যক্তি প্রিয় বা অপ্রিয়ের প্রতি দৃষ্টিপাত না করিয়া হিতকর অপ্রিয় বাক্য কহে সে-ই যথার্থ সহায়। (দ্যূতপর্ব্বাধ্যায়—২২২

বিদুর।—অন্যের মর্ম্মপীড়া দিবে না। কাহাকেও নিষ্ঠুর বাক্য কহিবে না। সমাগত ব্যক্তির সহিত অশ্রদ্ধাপূর্ব্বক ব্যবহার করিবে না। এবং যে কথা কহিলে অন্যে বিরক্ত হয় এবম্ভূত বাক্য প্রয়োগ করিবে না।

(ঐ—২২৯

বিদুর।—কাপুরুষেরাই শত্রুর শস্ত্রাঘাত সহ্য করে।

(ঐ

দ্রৌপদী।—পৃথ্বীতলে ধর্ম্মই সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ।

(ঐ—২৩২

দ্রৌপদী।—লোভ ধর্ম্মনাশের হেতু। (ঐ—২৫৮

ধৃতরাষ্ট্র।—যাঁহারা বৈরাচরণ জানেন না, দোষ পরিত্যাগ করিয়া কেবল গুণ দর্শন করেন এবং বিরোধে লিপ্ত নহেন, তাঁহারই উত্তম পুরুষ।

ধৃতরাষ্ট্র।—সাধুগণ বৈরাচরণ বিস্মরণপূর্ব্বক কেবল শত্রুকৃত সংকার্য্যেরই স্মরণ করিয়া পরোপকারানুরোধে প্রতীকারপরাঙ্মুখ থাকেন। (ঐ—২৬১

যুধিষ্ঠির।—লোকে দৈববশে শুভাশুভ ফল ভোগ করিয়া থাকে। (ঐ—২৬৮

বৈশম্পায়ন।—বিপৎকাল আসন্ন হইলে প্রায়ই বুদ্ধির ব্যতিক্রম ঘটিয়া থাকে। (ঐ

বিদুর।—নিশ্চয় জানিবে, অধর্ম্মাচরণ পূর্ব্বক কেহ জয়লাভ করিতে পারে না। (অনুদ্যূতপর্ব্বাধ্যায়—২৭৭

ধৃতরাষ্ট্র।—যেখানে বুদ্ধি সেইখানেই ক্ষমা।

(দ্যূতপর্ব্বাধ্যায়—২৬১

বনপর্ব্ব।

পৌরাণ।—যেমন বস্ত্র জল তিল ও ভূমি কুসুম-

সংসর্গে সুরভিত হইয়া উঠে, সেইরূপ সংসর্গজনিত গুণ অন্যকেও গুণবান করিতে পারে।

মূঢ়সমাগম কেবল মোহজালের আকর, নিত্য সাধুসমাগম কেবল ধর্ম্মের আবহ। অতএব প্রজ্ঞাশীল বৃদ্ধ সুশীল ও শমপরায়ণ সাধুগণের সহবাসই কর্ত্তব্য।

অসাধু ব্যক্তিকে দর্শন স্পর্শন এবং তাহার সহিত আলাপ ও সহবাস করিলেই ধর্ম্মভ্রষ্ট হইতে হয়।

(আরণ্যক পর্ব্বাধ্যায়—৩

শৌনক।—স্নেহ মানসিক দুঃখের মূল; জন্তুগণ স্নেহপরতন্ত্র হইয়া দুঃখপ্রাপ্ত হয়। স্নেহ কেবল দুঃখেরই মূল এমত নহে, উহা ভয় শোক হর্ষ এবং আয়াসেরও প্রবর্ত্তক।

স্নেহ হইতে মনের বিকৃতি ও বিষয়াসক্তি উৎপন্ন হয়।

কোঠরস্থিত অগ্নি যেমন বৃক্ষের সমুদায় অংশ ভস্মসাৎ করে সেইরূপ বিষয়াসক্তি অত্যল্প হইলেও সমুদায় ধর্ম্মার্থ ধ্বংস করিয়া থাকে।

অর্থসঞ্চয় দ্বারা মিত্রগণ হইতে স্নেহলাভ করিবার অভিলাষ করিবে না; এবং জ্ঞান দ্বারা স্বীয় স্নেহকে বিনিবর্ত্তিত করিবে।

জল যেমন পদ্মপত্রে সংসক্ত হইতে পারে না, সেইরূপ স্নেহও জ্ঞানবান কৃতাত্মা শাস্ত্রজ্ঞ যোগীতে আসক্ত হইতে পারে না। (ঐ—৮

যে মনুষ্য অর্থে একান্ত আসক্ত, সে অন্য কোন প্রকার শ্রেয়ই লাভ করিতে পারেনা। এই জন্য প্রাজ্ঞ ব্যক্তিরা সর্ব্বপ্রকার অর্থাগমকে লোভ মোহ কৃপণতা দর্প অভিমান ভয় ও উদ্বেগের মূলীভূত বলিয়া জানেন।

মূঢ় ব্যক্তিরাই অসন্তোষপরায়ণ হয়, পণ্ডিতগণ সতত সন্তুষ্ট থাকেন; পিপাসার অন্ত নাই, সন্তোষই পরম সুখ। (ঐ—৯

রূপ যৌবন রত্নসঞ্চয় ঐশ্বর্য্য এবং প্রিয়নিবাস সকলই অনিত্য। (ঐ

শৌনক।—যিনি ধর্ম্মকার্য্যে ব্যয় করিবার নিমিত্ত অর্থোপার্জ্জন করিতে চেষ্টা করেন, তাঁহার সে চেষ্টা না করাই শ্রেয়ঃ। পঙ্কলিপ্ত হইয়া পুনরায় তাহা প্রক্ষালন করা অপেক্ষা পঙ্ক স্পর্শ না করাই উচিত।

(আরণ্যক পর্ব্বাধ্যায়—১০

সকল বিষয়ে নিস্পৃহ হও। যদি ধর্ম্মোপার্জ্জনে অভিলাষ থাকে তাহা হইলে অর্থাকাংক্ষা পরিত্যাগ কর। (ঐ

যুধিষ্ঠির।—সাধুগণের গৃহে তৃণ ভূমি জল ও সুনৃত বাক্য এই চারি দ্রব্যের কোন কালেই অপ্রতুল থাকে না।

গৃহস্থ ব্যক্তি পীড়িত ব্যক্তিকে শয্যা, শ্রান্ত ব্যক্তিকে আসন, তৃষিত ব্যক্তিকে পানীয়, ক্ষুধিত ব্যক্তিকে ভোজন ও অভ্যাগত ব্যক্তিকে নয়ন ও মনপ্রিয় বচন এবং উত্থানপূর্ব্বক আসন প্রদান করিবেন; ইহাই সনাতন ধর্ম্ম।

(ঐ—১০

বৃথা পশুহিংসা করিবে না। (ঐ—১১

সায়ং ও প্রাতঃকালে কুক্কুর, চণ্ডাল এবং পক্ষীগণের উদ্দেশে ভূমিতে অন্নবপনরূপ বৈশ্বদেব নামক বলি প্রদান করিবে। (ঐ

শৌনক।—যেমন দুষ্ট অশ্ব সারথিকে কুপথে লইয়া যায়, তদ্রূপ ইন্দ্রিয়গণ ভ্রান্তচেতা মনুষ্যকে কুপথগামী করে। (ঐ

যুধিষ্ঠির।—যে ব্যক্তি অদৃষ্টপূর্ব্ব শ্রান্ত পথিককে অবিশ্রান্ত অন্ন দান করেন তিনিই মহৎ পুণ্যফল লাভ করেন।

(ঐ

শৌনক।—অভিমান সহকারে ধর্ম্মাচরণ করিবে না।

যজ্ঞ অধ্যয়ন দান তপ সত্য ক্ষমা দম এবং অলোভ এই অষ্টপ্রকার ধর্ম্মের পথ। (ঐ—১২

ধৃতরাষ্ট্র।—কুলটা স্ত্রীকে উত্তমরূপে সান্ত্বনা করিলেও সে স্বামীকে পরিত্যাগ করিয়া থাকে। (ঐ—২৩

দ্বারকানাথ ঠাকুরের বিষয়-সম্পত্তি।

(আচার্য্য শ্রীসতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী, এম-এ)

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের জীবনকাহিনীর সহিত সংসৃষ্ট বলিয়া এ বিবরটি আমাদের কৌতুহল উদ্দীপ্ত করে। এ জন্য ইহার আলোচনা করা যাইতেছে। পাঠক দেখিতে পাইবেন যে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ তাঁহার আত্মজীবনী লিপিবদ্ধ করিবার সময়ে সকল ঘটনা যথাযথভাবে স্মরণ করিতে পারেন নাই। ইহা কিছুই আশ্চর্য্য নহে। বহু বৎসর পুর্ব্বের ঘটনা বলিতে গিয়া সকলেরই কিছু কিছু ভুল হইয়া যায়। তদুপরি মনে রাখিতে হইবে যে ১৮ বৎসর বয়স হইতে আরম্ভ করিয়া ৩১।৩২ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত দেবেন্দ্রনাথের মন ধর্ম্ম লইয়া একেবারে উন্মত্ত ছিল; এই সময়ে তিনি বিষয়সম্পত্তির দিকে মন দিতে, তাহার কথা শুনিতে ও ভাবিতে, ভাল বাসিতেন না। পিতার মৃত্যুর কিছু কাল পরে যখন পিতার ব্যবসায়টির পতন হইল, তখনও তিনি 'যাক্, যাক্, যাক্' বলিয়া শীঘ্র শীঘ্র বিষয়ের জঞ্জাল হইতে মুক্ত হইতেই ব্যস্ত ছিলেন। মানুষ যাহাকে মন দিয়া ধরে না, তাহার সম্বন্ধে তাহার স্মৃতিও

অস্পষ্ট হইয়া যায়। এই জন্য বিষয়ের কথা উল্লেখ করিতে গিয়া স্থানে স্থানে মহর্ষির ভুল হইয়া গিয়াছে।

এই প্রবন্ধে কিশোরীচাঁদ মিত্র লিখিত Memoir of Dwarkanath Tagore নামক গ্রন্থকে সংক্ষেপে "Mem." বলিয়া, এবং প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় সম্পাদিত 'বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস' পুস্তকের ব্রাহ্মণকাণ্ডের ষষ্ঠ খণ্ডকে ('পিরালীব্রাহ্মণ বিবরণ') সংক্ষেপে "ব জা ই ব্রা, ৬" বলিয়া উল্লেখ করা হইবে। সমসাময়িক সংবাদপত্রাদির নাম পূর্ণভাবে উল্লিখিত হইবে। এই প্রবন্ধের referenceগুলি লিখিবার সময় সর্ব্বত্র আমি নিজে মূল দেখিয়া লিখিয়া লইয়াছি; অপর কোনও পুস্তকে বা পত্রিকায় 'উদ্ধৃত' কোনও উক্তি হইতে কিছুই গ্রহণ করি নাই। মহর্ষির আত্মজীবনীর উল্লেখ থাকিলে, তাহা ঐ গ্রন্থের প্রথম সংস্করণ বলিয়া বুঝিতে হইবে।

দ্বারকানাথের চাকরী, ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠা, ও দেবেন্দ্রনাথকে ব্যাঙ্কের কর্ম্মে নিয়োগ।

১৮২৩ খৃষ্টাব্দে দ্বারকানাথ ঠাকুর চব্বিশ পরগণার কলেক্টার ও নিমক মহালের অধ্যক্ষ (Salt Agent) Mr. Plowdenএর দেওয়ান নিযুক্ত হন। তাঁহার বুদ্ধিমত্তা, কার্য্যদক্ষতা ও সংসারের অভিজ্ঞতা দর্শনে, তাঁহার পাঠ্যাবস্থার দুই প্রধান সহায় ও তৎকালীন Commercial Bankএর পরিচালকমণ্ডলীর (Mackintosh & Co'র) দুই প্রধান পুরুষ J. G. Gordon এবং James Calder, স্বয়ং অগ্রসর হইয়া ১৮২৮ সালে তাঁহাকে আপনাদের (Mackintosh & Co'র) অংশীদার করিয়া লন। ইহাতে দ্বারকানাথ উক্ত Commercial Bankএরও একজন পরিচালক হইলেন। কিন্তু এই গৌরবময় দায়িত্ব ভবিষ্যতে তাঁহার অনেক আর্থিক ক্ষতির কারণ হইয়াছিল।

১৮২৯ সালে তাঁহার সরকারী চাকরীতে আরও পদোন্নতি হইল; তিনি Customs, Salt and Opium Boardএর দেওয়ান নিযুক্ত হইলেন। কিন্তু তিনি কয়েক মাসের অধিক এ চাকরী করেন নাই।

দ্বারকানাথ যে বৎসর ম্যাকিন্টশ কোম্পানীর অংশীদার হন, তার পর বৎসরই ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক স্থাপিত হয়। ইউনিয়ন ব্যাঙ্কের ইতিহাস বর্ণনা সূত্রে কিশোরীচাঁদ মিত্র বলিতেছেন, "মিঃ জে জি গর্ডন, জে কল্‌ডার, জন্ পামার, কর্নেল জেমস্ ইয়ং, এবং দ্বারকানাথ, এই পাঁচ জন এই ব্যাঙ্কের প্রবর্ত্তক ও প্রথম বোর্ড অব্ ডিরেক্টার্স্ ছিলেন। Exchange Hallএ ইহাঁদের প্রথম অধিবেশন হয়; তাহাতে ইহাঁরা উইলিয়ম্ কার্ সাহেবকে ব্যাঙ্কের সম্পাদক ও রমানাথ ঠাকুরকে ধনাধ্যক্ষ নিযুক্ত করিলেন।"

কিশোরীচাঁদ মিত্র মহাশয়ের এই উক্তি নির্ভুল বলিয়া মনে হয় না। তিনি Cook সাহেব রচিত একখানি পুস্তকের উপরে নির্ভর করিয়া এই কথা লিখিয়াছেন, তাহাতে সব কথা খুলিয়া লিখা হয় নাই। দ্বারকানাথের নিকট-আত্মীয়গণের কাছে অনুসন্ধান করিয়া জানা যায় যে যখন ১৮২৯ সালে Union Bank প্রথম স্থাপিত হয়, তখন প্রতিষ্ঠাতাদের মধ্যে দ্বারকানাথের নাম ছিল না। ১৮৩৫ সালে যখন ঐ Bank "reconstituted" হয়, তখন দ্বারকানাথ প্রকাশ্যভাবে উহার ডিরেক্টর হন। গভর্ণমেণ্টের দেওয়ান বলিয়া তিনি প্রথম প্রথম প্রকাশ্যভাবে ব্যাঙ্কে যোগ দিতে পারেন নাই, এবং সেই কারণে তাঁহার পক্ষ হইতে তাঁহার ভ্রাতা রমানাথকে আলিপুরের সেরেস্তাদারের আফিস হইতে ছাড়াইয়া আনিয়া ব্যাঙ্কের Treasurer নিযুক্ত করা হয়। প্রথম অনুষ্ঠাতৃবর্গের মধ্যে হরিমোহন ঠাকুর ছিলেন। কিন্তু প্রকাশ্যভাবে যোগ না দিলেও দ্বারকানাথ প্রথম হইতেই ব্যাঙ্কের প্রাণস্বরূপ ছিলেন।

"১৫ লক্ষ সিক্কা টাকা (কোম্পানীর ১৬ লক্ষ টাকার সমান) মূলধন লইয়া ১৮২৯ সালের ১৭ই আগষ্ট এই ব্যাঙ্কের কার্য্য আরম্ভ হয়।* ইহার অংশীদারদের মধ্যে সকল শ্রেণীর লোকই ছিলেন। যৌথ-কারবারের প্রণালীতে ইহার কাজ চলিত। তৎকালীন অর্দ্ধসরকারী বেঙ্গল ব্যাঙ্কের সনন্দ (charter) এমন সকল কঠিন সর্ত্তে আবদ্ধ ছিল যে ঐ ব্যাঙ্ক ব্যবসাবাণিজ্যের সাহায্যার্থ টাকা ধার দিতে পারিত না। এই কারণে বিশেষভাবে কৃষি ও বাণিজ্যের সাহায্যের জন্যই ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক স্থাপিত হয়। সে সময়ে কলিকাতায় বেঙ্গল ব্যাঙ্ক ছাড়া "কমার্শিয়াল ব্যাঙ্ক" ও "কলিকাতা ব্যাঙ্ক" নামে আর দুইটি ব্যাঙ্ক ছিল। এই দুই ব্যাঙ্কের পরিচালকগণ ইউনিয়ন ব্যাঙ্কের প্রবর্ত্তকগণের সহিত পরামর্শ করিয়া নূতন ব্যাঙ্কের কাজের সর্ব্বপ্রকার সুবিধা করিয়া দিবার ব্যবস্থা করিলেন। কমার্শিয়াল ব্যাঙ্কের কার্য্যক্ষেত্র কিঞ্চিৎ সঙ্কুচিত করা হইল, এবং কলিকাতা ব্যাঙ্ক একেবারে উঠাইয়া দেওয়া হইল।

১৮৩৩ সালে ম্যাকিন্টশ্ কোং (এবং তৎসহ কমার্শিয়াল্ ব্যাঙ্ক) ফেল হইল। তাহার অংশীদারগণের মধ্যে একমাত্র দ্বারকানাথেরই আর্থিক অবস্থা ভাল ছিল; তাঁহার উপরেই কমার্শিয়াল্ ব্যাঙ্কের সমুদয় দায় শোধের গুরু ভার পড়িয়া গেল।

* ১৮৪৭ খৃষ্টাব্দের "Bengal Directory" তে আছে যে Union Bank ১লা আগষ্ট ১৮২৯ তারিখে প্রতিষ্ঠিত হয়।

অল্প কালের মধ্যেই নবপ্রতিষ্ঠিত ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রধান সহায় হইয়া উঠিল, এবং দ্বারকানাথ এই ব্যাঙ্কের প্রধান পৃষ্ঠপোষক হইলেন। অনেকবার তিনি এই ব্যাঙ্ককে অকালমৃত্যু হইতে রক্ষা করেন। একবার একজন কর্ম্মচারী অনেক টাকা আত্মসাৎ করে; দ্বারকানাথ স্বয়ং ক্ষতিপূরণ করিয়া দিয়া দুর্নাম হইতে ব্যাঙ্ককে রক্ষা করেন।"—(Mem. 13, 14; সংক্ষিপ্ত ভাবানুবাদ)।

দেবেন্দ্রনাথ কতদিন এই ব্যাঙ্কে কার্য্য করিয়াছিলেন তাহা এখন নির্ণয় করা কঠিন। সতেরো বৎসর বয়সে তিনি পিতা কর্ত্তৃক এই ব্যাঙ্কের কার্য্যে নিযুক্ত হন। "দেবেন্দ্রনাথকে পাকা বৈষয়িক করিবার জন্য দ্বারকানাথ বিশেষ চেষ্টা করিয়াছিলেন। অল্প বয়স হইতেই ইউনিয়ন ব্যাঙ্কে তাঁহাকে প্রতিদিন কেরাণীর কাজ করিতে হইত, তহবিল মিলাইতে হইত, হিসাব রাখিতে হইত। হিসাবের কাজে তিনি এমনি পাকা হইয়া গিয়াছিলেন যে, বৃদ্ধ বয়সেও কানে শুনিয়াও তিনি সমস্ত হিসাব বুঝিতে পারিতেন;" (অজিতকুমার চক্রবর্ত্তী রচিত মহর্ষির জীবনী ৮২পৃঃ)।

কার ঠাকুর কোম্পানী, জমিদারী ও কারখানা।

১৮৩৪ সালের জুলাই মাসে দ্বারকানাথ আরও মুক্তভাবে স্বাধীন ব্যবসায়ে নিযুক্ত হইবার অভিপ্রায়ে তাঁহার গৌরব-জনক ও লাভজনক সরকারী চাকরীটি (Customs, Salt and Opium Boardএর দেওয়ানী) পরিত্যাগ করিলেন। বোর্ড তাঁহার কার্য্যকুশলতা ও অভিজ্ঞতার ভূয়সী প্রশংসা করিয়া তাঁহার পদত্যাগপত্র গ্রহণ করেন।

"সরকারী কাজ হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া দ্বারকানাথ অল্প দিনের মধ্যেই কার ঠাকুর কোম্পানী (Carr, Tagore & Co.)নামক হৌস্ স্থাপন করেন। দেশীয়দিগের মধ্যে তিনিই প্রথম কলিকাতা নগরীতে য়ুরোপীয় আদর্শে ব্যবসায়ের কুঠি প্রতিষ্ঠা করিলেন বলিয়া তৎকালীন বড়লাট লর্ড উইলিয়ম্ বেণ্টিঙ্ক বাহাদুর দ্বারকানাথকে বহু প্রশংসা ও সাধুবাদ করিয়া এক পত্র লিখেন। তিনি যে সর্ব্বাংশে এ প্রশংসার যোগ্য ছিলেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। তাঁহার পূর্ব্বে দেশীয় ধনী ব্যবসায়ীদিগের চরম আকাঙ্ক্ষা এই ছিল যে তাঁহারা য়ুরোপীয় হৌসের বেনিয়ান হইয়া টাকা যোগাইবেন, মুচ্ছুদ্দি হইয়া জিনিস যোগাইবেন এবং দস্তরীটুকু মাত্র লাভ করিবেন। স্বাধীনভাবে বাণিজ্য করা অথবা নিজ দায়িত্বে জাহাজ বোঝাই করিয়া বিলাতে মাল পাঠানো তখন তাঁহাদের কল্পনায় আসিত না।

দ্বারকানাথ, মিঃ উইলিয়ম্ কার, ও মিঃ উইলিয়ম্ প্রিন্সেপ এই তিনজন কার ঠাকুর কোম্পানীর প্রথম অংশীদার ছিলেন। পরে ভিন্ন ভিন্ন সময়ে মেজর্ হেণ্ডার্‌সন্, মিঃ প্লাউডেন্, ডাঃ ম্যাক্‌ফার্সন্, কাপ্তান টেলার্, বাবু দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও বাবু গিরীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে ইহার অংশীদার করিয়া লওয়া হয়। মিঃ ডি এম্ গর্ডন ও বাবু প্রসন্নকুমার ঠাকুর ইহার কর্ম্মচারী ছিলেন। ডি এম্ গর্ডন ইহার কর্ম্মেই নিযুক্ত হইলেন ও ক্রমশঃ ইহার অংশীদারের পদবীতে উন্নীত হইলেন। প্রসন্নকুমার ঠাকুর ক্রমে বাণিজ্যের সংশ্রব পরিত্যাগ করিয়া তৎকালীন সদর দেওয়ানী আদালতে ওকালতী করিতে আরম্ভ করিলেন এবং ক্রমে তাহা দ্বারা তিনি প্রভূত অর্থ উপার্জ্জন করেন।

কিন্তু দ্বারকানাথই কার ঠাকুর কোম্পানীর প্রাণস্বরূপ ছিলেন। ইহার কাজকর্ম্ম তিনিই পরিচালন করিতেন এবং টাকাও তিনিই যোগাইতেন। এই কারবারের আর্থিক ব্যাপারে তিনিই সর্ব্বময় কর্ত্তা ছিলেন; অন্য কোনও অংশীদারকে তিনি আর্থিক বিষয়ে কিছুমাত্র হস্তক্ষেপ করিতে দিতেন না। দ্বারকানাথের নিজের অর্থবল, ইউনিয়ন ব্যাঙ্কের সহিত তাঁহার যোগ এবং অন্যান্য ব্যাঙ্ক ও কুঠিতে তাঁহার আর্থিক সচ্ছলতা সম্বন্ধে অগাধ বিশ্বাস—এই সকলের ফলে, এই কারবারে যখন যত টাকার দরকার হউক না কেন, তিনি তৎক্ষণাৎ তাহা যোগাইতে পারিতেন।

এই কারবারের সংস্রবে দ্বারকানাথ শিলাইদহে এবং অন্যান্য স্থানে নীলের কুঠি স্থাপন করেন। তাঁহার পৈতৃক জমিদারী কুমারখালিতে এখন গভর্ণমেণ্টের একটি রেশমের কুঠি ছিল। গভর্ণমেণ্টের রেশমের একচেটিয়া ব্যবসায় রহিত হইলে দ্বারকানাথ কুমারখালির কুঠি ক্রয় করিয়া লন এবং কার ঠাকুর কোম্পানীর পক্ষ হইতে তাহা চালাইতে আরম্ভ করেন। এতদ্ব্যতীত তিনি রাণীগঞ্জে কয়লার খনি এবং রামনগরে একটি চিনির কারখানাও চালাইতেছিলেন।

দ্বারকানাথের পরিশ্রমশক্তি, বিচক্ষণতা ও মানুষের সহিত বুঝিয়া চলিবার সুবুদ্ধি অসাধারণ ছিল; তাঁহার অর্থবল এবং প্রতিপত্তিও অপরিমিত ছিল। এই জন্য অপ্রতিহত গতিতে কার ঠাকুর কোম্পানীর উন্নতি হইতে লাগিল। ক্রমে সকল লোকে এই হৌস্‌টিকেই তাৎকালীন বণিকসম্প্রদায়ের প্রতিনিধি বলিয়া গণনা করিতে লাগিল।

দ্বারকানাথের জমিদারী কার্য্যের সফলতাও তাঁহার ব্যবসায়ের ও কারখানার সফলতার অনুরূপ হইয়াছিল। তিনি কারবারে প্রবেশ করিবার পর কয়েক বৎসরের

মধ্যেই নিম্নলিখিত জমিদারীসকল ক্রয় করেন :—রাজসাহী জেলার কালীগ্রাম; পাবনা জেলার শাহাজাদপুর; রঙ্গপুর জেলার স্বরূপপুর; [হুগলীতে] মণ্ডলঘাট পরগণার তেরো আনা অংশ, দ্বারবাসিনী ও জগদীশপুর; যশোহরে মহম্মদশাহী; কটকে পরগড়া প্রভৃতি।"—

(Mem, 10, 12, 15, 16 ; সংক্ষিপ্ত ভাবানুবাদ)।

দ্বারকানাথের ট্রাষ্টডীড্।

পাঠক দেখিতে পাইতেছেন যে কমার্শিয়াল ব্যাঙ্ক ফেল হওয়াতে তাহার দেনা দ্বারকানাথের স্কন্ধে আসিয়া পড়িয়াছিল। যদিও এই ক্ষতি দ্বারকানাথের পক্ষে বিশেষ মারাত্মক ছিল না, এবং কার ঠাকুর কোম্পানীর প্রতিষ্ঠার সময়ে তিনি কলিকাতার একজন প্রধান ধনী ব্যক্তি ছিলেন, তথাপি এই অপ্রীতিকর অভিজ্ঞতা স্মরণ করিয়া তাঁহাকে সাবধান হইতে হইল যে, যদি কোন দিন ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক অথবা কার ঠাকুর কোম্পানী ফেল হয়, তবে আবার যেন ঐরূপ ঘটিয়া তাঁহার সর্ব্বস্ব না নষ্ট হয়। বিশেষতঃ কমার্শিয়াল ব্যাঙ্কের তুলনায় ইউনিয়ন ব্যাঙ্কের এবং কার ঠাকুর কোম্পানির মূলধনও অনেক অধিক ছিল, এবং তাহাতে দ্বারকানাথের আর্থিক দায়িত্বও অনেক অধিক ছিল। এই কারণেই তিনি ১৮৪০ সালের ২০ শে আগষ্ট তারিখে একটী Deed of Settlement সম্পাদন করিয়া নিজের] কতকগুলি সম্পত্তির উপরে ট্রষ্টী নিযুক্ত করিয়া তাহা রক্ষা করিবার ব্যবস্থা করেন। ইহাই দ্বারকানাথের ট্রষ্টডীড্'।

'বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস' পুস্তকে (ব. জা. ই. ব্রা. ৬। ৩২২-৩২৪, ফুটনোট) রামলোচন ঠাকুরের উইলের যে সম্পত্তিতালিকা প্রদত্ত আছে, এবং দ্বারকানাথ ঠাকুরের উইলের বর্ণনার ভিতরে এই Deed of Settlementএর অন্তর্ভুক্ত সম্পত্তিগুলির যে উল্লেখ আছে, এই উভয়ের তুলনা করিলে দেখা যায় যে দ্বারকানাথ নিজের ৮টি পরগণা (অর্থাৎ অধিকাংশ সম্পত্তি) এই ট্রাষ্টডীড্ ভুক্ত করিয়াছিলেন। দেবেন্দ্রনাথ আত্মজীবনীতে (১০ পৃঃ) এই সম্পত্তির সংখ্যা 'চারিটি' বলিয়া লিখিয়াছেন; তাহা ঠিক নহে।

ট্রষ্টডীড্ দ্বারা সম্পত্তি রক্ষা করিবার এই প্রয়াসের নানাবিধ কারণ ছিল। একটী কারণ এই যে, সেই সময়ে যৌথ কারবারের অংশীদারগণের মধ্যে আর্থিক দায়িত্ব ভাগ করিয়া দিবার জন্য, অথবা সমগ্র কারবারটীর আর্থিক দায়িত্ব সীমাবদ্ধ করিয়া দিবার জন্য, কোনও প্রকার আইন ("লিমিটেড্" কোম্পানীর আইন) প্রচলিত ছিল না। কোনও কারবার ফেল হইলে, লিকুইডেটরগণ নিজ খামখেয়ালীর বশবর্ত্তী হইয়া, যে অংশীদারকে যত অধিক ধনী বলিয়া মনে করিতেন, তাহার উপরে তত অধিক পরিমাণে ক্ষতিপূরণের ভার নিক্ষেপ করিতেন। এই কারণেই গিরীন্দ্রনাথ দেবেন্দ্রনাথকে বলিয়াছিলেন, (আত্মজীবনী ১২ পৃষ্ঠা), "সাহেবদের তো কোন বিষয় বিভব পৃথক সম্পত্তি নাই। যদি কখন বাণিজ্যের পতন হয়, তবে মহাজনেরা আমাদিগকেই আসিয়া ধরিবে, আমাদেরই বিষয় আটক পড়িবে, আমাদিগকেই সকল টাকা বুঝাইয়া দিতে হইবে। দেনার দায়ে আমাদেরই বিষয় বিক্রয় হইয়া যাইবে। লাভের সময় এখন তাহারা ভাগী, কিন্তু ক্ষতির দায়ে তাহাদের কোন ক্ষতি হইবে না। লাভ খাইয়া তাহারা চলিয়া যাইবে, ক্ষতি গণনা করিয়া কেবল আমরাই যথাসর্ব্বস্ব দিতে থাকিব।"

সেই যুগে বাণিজ্য এবং জমিদারী, এই দ্বিবিধ কার্য্যে লিপ্ত হওয়াতে, কলিকাতার বহু সম্ভ্রান্ত বংশের অতি দ্রুত উত্থান ও পতন সংঘটিত হইত। এই জন্য তৎকালীন ধনীদিগের মধ্যে এই প্রকার Deed of Settlement অথবা willএর দ্বারা পুত্রগণকে কেবল জীবন-স্বত্ব (life interest) এবং পৌত্রগণকে সম্পূর্ণ নিব্যূঢ় স্বত্ব (absolute proprietorship) প্রদান করা, একটি প্রথা দাঁড়াইয়া গিয়াছিল। কেবল দ্বারকানাথ ঠাকুর নহেন, রমানাথ ঠাকুর, গোপাললাল ঠাকুর, প্রসিদ্ধ ডাক্তার দ্বারকানাথ গুপ্ত (ডি গুপ্ত), প্রভৃতি অনেকেই এইরূপ করিয়াছিলেন। এই ব্যবস্থার দ্বারা বিষয়-সম্পত্তি অন্ততঃ দুই পুরুষের স্থিতিকাল পর্য্যন্ত রক্ষা পাইবে, এ বিষয়ে নিশ্চিন্ত হওয়া যাইত।

এই ব্যবস্থা হেতু, যখন গিরীন্দ্রনাথ ও নগেন্দ্রনাথের মৃত্যুর পর দেবেন্দ্রনাথ একা সমগ্র পরিবারের কর্ত্তা ও অভিভাবক হইলেন, তখনও, (তিনি কেবল জীবন-স্বত্ব-ভাগী বলিয়া) সম্পত্তির ভবিষ্যৎ ব্যবস্থা সম্বন্ধে তাঁহার কোন অধিকার জন্মিল না। বহুকাল পরে সমুদয় উত্তরাধিকারীগণ একত্র কোর্টের সাহায্যে দেবেন্দ্রনাথকে এই অধিকার দান করেন; তখন এই অধিকারের বলে দেবেন্দ্রনাথ স্বীয় উইলের দ্বারা সম্পত্তির ব্যবস্থা করিতে সমর্থ হন।

সাধারণতঃ পত্নীবিয়োগের পরে, অথবা যখন আর সন্তানাদি জন্মিয়া সম্পত্তির অংশীর সংখ্যা বৃদ্ধি হইবার সম্ভাবনা থাকিত না এমন সময়ে, এইরূপ Deed of Settlement সম্পাদন করা হইত। দ্বারকানাথের পত্নীবিয়োগের তারিখ এখন আর জানিতে পারা যাইতেছে না; কিন্তু খুব সম্ভবতঃ তিনি পত্নী-বিয়োগের পরেই এই Deed সম্পাদন করেন।

ট্রষ্টডীড্ সম্পাদনের যে সকল কারণ এখানে প্রদর্শিত হইল, তাহা ব্যতীত আর একটী ইঙ্গিত দেবেন্দ্রনাথের

আত্মজীবনীর (৭০ পৃঃ) এই উক্তিতে পাওয়া যায় :—"তাঁহার সুতীক্ষ্ণ বুদ্ধিতে তিনি [দ্বারকানাথ] বুঝিয়াছিলেন যে, ভবিষ্যতে এই সকল বৃহৎ কার্য্যের ভার আমাদের [পুত্রগণের] হাতে পড়িলে আমরা তাহা রক্ষা করিতে পারিব না।" দেবেন্দ্রনাথের এই উক্তি আত্মাবমাননাপ্রসূত বলিয়াই গ্রহণ করিতে হইবে। গিরীন্দ্রনাথ বিষয় সম্পত্তি পরিচালনে অতি সুদক্ষ ছিলেন। দেবেন্দ্রনাথ সেরূপ না হইলেও, পিতার এত অধিক অনাস্থাভাজন ছিলেন বলিয়া আমাদের মনে হয় না; কারণ, দেখা যায় যে দ্বারকানাথ নিজ উইলে দেবেন্দ্রনাথকে স্বীয় পরিত্যক্ত সম্পত্তির একজন এক্জিকিউটার নিযুক্ত করিয়াছিলেন।

দ্বারকানাথের মুক্তহস্ততা ও ব্যয়শীলতা।

ইউনিয়ন ব্যাঙ্কের জন্য দ্বারকানাথকে নানাভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হইত। ইহাকে রক্ষা করিতে গিয়া যে তাঁহাকে মধ্যে মধ্যে ক্ষতিপূরণ করিয়া দিতে হইত, তাহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। তদ্ব্যতীত দ্বারকানাথ আইনঘটিত বিধি-ব্যবস্থায় এবং ব্যবসায় পরিচালনে যেরূপ সতর্কতা ও বিচক্ষণতার পরিচয় প্রদান করিতেন, কেহ ব্যক্তিগত দুঃখ নিবেদন করিতে আসিলে তাহাকে অর্থ দান করিবার সময় সে সতর্কতা ও বিচক্ষণতা রক্ষা করিতে পারিতেন না। সহৃদয়তা ও প্রতিপত্তি রক্ষার আকাজ্ঞা, এই দুই মিলিয়া তাঁহাকে অতিরিক্ত মাত্রায় মুক্তহস্ত করিয়া তুলিয়াছিল। শুধু তাঁহার স্বদেশীয়গণই যে তাঁহার দান গ্রহণ করিতেন তাহা নহে। "অনেক সাহেব টাকা শোধ করিতে না পারিলে দ্বারকানাথের দয়াভিক্ষা করিতেন, এবং দ্বারকানাথ নিজে সেই দেনা শোধ দিতেন। ইহাতে যেমন আর্থিক ক্ষতি হইত, তেমনি প্রতিপত্তি লাভ হইত। সরকারী কর্ম্মচারী সকলেই এজন্য একপ্রকার তাঁহার বশীভূত হইয়া পড়িয়াছিলেন এবং সকলপ্রকার কার্য্যেই তাঁহার সাহায্য করিতেন।"

(ব. জা. ই. ব্রা. ৬।৩৩২)।

দ্বারকানাথের মুক্তহস্ততার কাহিনী প্রায় আরব্যোপন্যাসের মত। কৌতূহলী পাঠক 'বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস' পুস্তকের ব্রাহ্মণকাণ্ডের ৬।৩৩৪—৩৪৯ পৃষ্ঠা পাঠ করিবেন। ১৮৩৮ সালের ৩রা ফেব্রুয়ারী তারিখে (*Bengal Almanak*, 1847, 'Chronological Event' নামক অংশে এই তারিখ উল্লিখিত আছে) দ্বারকানাথ District charitable Societyতে এক লক্ষ টাকা দান করিয়াছিলেন; এই দানের পরিমাণ সে সময়ে সকলকে চমকিত করিয়াছিল। স্বীয় উইলেও তিনি এক লক্ষ টাকা দরিদ্রদিগের সাহায্যার্থ দান করিবার ব্যবস্থা করেন। এই বদান্যতা ব্যতীত তাঁহার পদোচিত সম্ভ্রমরক্ষা করিবার জন্যও তাঁহাকে ব্যয়শীল হইতে হইত। তাঁহার বেলগেছিয়ার ডিনার ভোজের ব্যয় ও বিলাতের ব্যয়ের কথাও সর্ব্বজনবিদিত।

আদিব্রাহ্মসমাজের অধ্যক্ষসভার কার্য্যবিবরণ।

৯ই আশ্বিন, ১৩৩৩ সাল।

গত ৯ই আশ্বিন, ইংরাজী ২৬ শে সেপ্টেম্বর রবিবার প্রাতঃকাল ৯ ঘটিকার সময় আদিব্রাহ্মসমাজ দ্বিতল-গৃহে গত ৩রা আশ্বিনের বিজ্ঞাপন অনুসারে অধ্যক্ষসভার এক বিশেষ অধিবেশন হইয়াছিল। নিম্নলিখিত সভ্যগণ উপস্থিত ছিলেন—

(১) শ্রীযুক্ত শিতিকণ্ঠ মল্লিক, (২) শ্রীযুক্ত চিন্তামণি চট্টোপাধ্যায়, (৩) শ্রীযুক্ত পাঁচুগোপাল মল্লিক, (৪) শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, (৫) শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র সাংখ্যবেদান্ততীর্থ, (৬) শ্রীযুক্ত নির্ম্মলচন্দ্র বড়াল এবং (৭) শ্রীযুক্ত ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর। পরে (৮) শ্রীযুক্ত ক্ষেমেন্দ্রনাথ ঠাকুর বি-এস্‌সি অধ্যক্ষরূপে পরিগৃহীত হইয়া অধিবেশনে উপস্থিত ছিলেন।

১। ক্ষিতীন্দ্র বাবুর প্রস্তাবনে সর্ব্বসম্মতিক্রমে শ্রীযুক্ত শিতিকণ্ঠ মল্লিক মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিলেন।

২। ক্ষিতীন্দ্র বাবুর প্রস্তাবনে, পাঁচুগোপাল বাবুর সমর্থনে এবং সর্ব্বসম্মতিক্রমে শ্রীযুক্ত ক্ষেমেন্দ্রনাথ ঠাকুর বি-এস্‌সি অধ্যক্ষসভার সভ্যরূপে পরিগৃহীত হইয়া সর্ব্বসম্মতিক্রমে এই অধিবেশনে যোগদান করিবার অধিকার লাভ করিলেন।

৩। অধ্যক্ষসভার অন্যতর সভ্য ও আদিসমাজের পরমহিতৈষী শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ এই অধিবেশনে উপস্থিত হইতে অসমর্থ হওয়ায় দুঃখপ্রকাশপূর্ব্বক এবং সমাজের আর্থিক অস্বচ্ছলতার জন্য গভীর সহানুভূতি প্রকাশের সঙ্গে ২৫৲ পঁচিশ টাকা পাঠাইয়া যে পত্র লিখিয়াছেন, তাহা পঠিত হইল।

স্থির হইল, তাঁহাকে সভার কৃতজ্ঞতা জানাইয়া ধন্যবাদপত্র প্রেরিত হোক।

৪। সুরেশ বাবুর প্রস্তাবনে, চিন্তামণি বাবুর সমর্থনে এবং সর্ব্বসম্মতিক্রমে শ্রীযুক্ত ক্ষেমেন্দ্রনাথ ঠাকুর আদিব্রাহ্মসমাজের সহযোগী সম্পাদক নিযুক্ত হইলেন।

৫। সভাপতি মহাশয়ের প্রস্তাবনে এবং খগেন্দ্র বাবুর সমর্থনে শ্রীযুক্ত ক্ষেমেন্দ্রনাথ ঠাকুর তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার সহকারী সম্পাদক নিযুক্ত হইলেন।

৬। সভাপতি মহাশয়ের প্রস্তাবনে এবং সর্ব্বসম্মতিক্রমে আদিসমাজের সভাপতি কে হইতে পারেন, তাঁহার নাম অধ্যক্ষসভার আগামী অধিবেশনে উপস্থিত করিবার ভার ক্ষিতীন্দ্র বাবুর উপর প্রদত্ত হইল।

৭। আদিব্রাহ্মসমাজের গৃহসংস্কার বিষয় আলোচিত হইল।

দুই তিন বার এই গৃহ ইঞ্জিনিয়র শ্রীযুক্ত বিশ্বেশ্বর মুখোপাধ্যায় মহাশয়কে দেখানো হইয়াছে। তাঁহার মতে মেরামত করা বিশেষ আবশ্যক। এ বৎসর হইতে ছাদ ফাটিয়া জল পড়িতে আরম্ভ হইয়াছে। অল্পকাল হইল, গানের বেদীর দক্ষিণ দিকের অংশ পড়িয়া যাইবার উপক্রম হইয়াছিল। সম্পাদক মহাশয় ঋণপ্রদান করিয়া প্রায় দুইশত টাকায় উহা মেরামত করাইয়াছিলেন। এখনকার নিতান্ত দরকারী মেরামতগুলিও করিতে গেলে প্রায় তিন চার হাজার টাকা লাগিবে। মহর্ষির ষ্টেট হইতে যে ২০০৲ দুই শত টাকার মাসিক বৃত্তির ব্যবস্থা আছে, তাহা মামুলী খরচের পক্ষেও যথেষ্ট নয়। মহর্ষির ষ্টেটের চেকদাখিলা ছাপানো প্রভৃতি যে সকল আয়ের পথ ছিল, সে সমস্ত কার্য্য বর্ত্তমানে অন্যত্র হওয়ায় পূর্ব্বের আয়ের পথগুলিও বন্ধ হইয়া গিয়াছে। সুতরাং চাঁদা সংগ্রহ ব্যতীত মেরামত কার্য্যে হস্তক্ষেপ করা সম্ভব নয়। এখন বিবেচ্য, কি উপায়ে এই চাঁদা সংগ্রহ হইতে পারে।

সভাপতি মহাশয়ের নির্দ্দেশক্রমে এবং সর্ব্বসম্মতিক্রমে স্থির হইল যে, বদান্য ব্যক্তি প্রভৃতির নিকটে আবেদন এবং অন্যান্য উপায়ে চাঁদা আদায়ের সাধ্যমত চেষ্টা করা হোক।

৮। আদি সমাজের আর্থিক উন্নতিসাধনের উপায় বিষয়ে আলোচনা হইল।

আর্থিক উন্নতি সাধনের বর্ত্তমানে সর্ব্বপ্রধান উপায় মহর্ষির ষ্টেট হইতে তাঁহার উইল অনুসারে প্রাপ্য মাসিক ২০০৲ টাকার বৃত্তি নিয়মিতরূপে পাওয়া। মহর্ষির উইল অনুসারে তাঁহার ষ্টেটের যে অংশ পূজ্যপাদ ৺দ্বিজেন্দ্রনাথ, ৺সত্যেন্দ্রনাথ এবং শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ পাইয়াছেন, সেই অংশ হইতেই আদিসমাজে মাসিক ২০০৲ টাকা বৃত্তি দিবার ব্যবস্থা আছে। তাঁহার উইলের executor ছিলেন ৺দ্বিপেন্দ্রনাথ ঠাকুর, শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। মহর্ষির পরলোকগমনের পর ৺দ্বিজেন্দ্রনাথ, ৺সত্যেন্দ্রনাথ এবং শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ, এই তিন জনের পক্ষ হইতে উহাঁদের তদানীন্তন সাধারণ কর্ম্মচারী শ্রীযুক্ত গোপালচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রতি মাসে টাকা দিয়া রসিদ গ্রহণ করিতেন। কয়েক বৎসর বাদে কিছুকাল যাবৎ ৺সত্যেন্দ্রনাথ এবং তাঁহার পরলোকগমনের পরে শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুরের কর্ম্মচারী উপরোক্ত তিন জনের পক্ষ হইতে টাকা দিয়া রসিদ গ্রহণ করিতেন। অবশেষে গত মাঘ মাস অবধি উক্ত বৃত্তি পাওয়া যায় নাই। গত ৩০ চৈত্র সুরেন্দ্র বাবুর সরকার পত্রের দ্বারা জানাইয়াছে যে, গত মাঘ মাস হইতে শ্রীযুক্ত রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর (রবীন্দ্র বাবুর ষ্টেট হইতে) উক্ত বৃত্তি দিবার ভার গ্রহণ করিয়াছেন। তদনুসারে রথীন্দ্র বাবুকে দুই খানি পত্র, তন্মধ্যে একখানি রেজেষ্ট্রী ডাকে লেখা হয়; দুঃখের বিষয় একখানিরও উত্তর পাওয়া যায় নাই। মিউনিসিপাল টেক্সের বিল যাহা আসিয়াছিল, তাহা রথীন্দ্র বাবুর বর্ত্তমান কর্ম্মচারী উক্ত গোপালচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের নিকট পাঠাইয়া দেওয়াতে তিনি তাহা শোধ করিয়া দিয়াছেন। এখন, উক্ত প্রাপ্য মাসিক বৃত্তি নিয়মিতরূপে পাইবার এবং মাঘ অবধি কার্ত্তিক পর্য্যন্ত বাকী পড়া ন্যূনাধিক ২০০০৲ দুই হাজার টাকা অবিলম্বে পাইবার ব্যবস্থা না করিলে সমাজের সকল কার্য্যই বন্ধ করিতে হয়। কারণ সমাজের অন্য আয়ের পথ প্রায় সমস্তই বন্ধ হইয়া গিয়াছে। সমাজের বর্ত্তমান কর্ম্মচারী প্রায় দশ বারো জন। উহাদের বেতন নিয়মিত দিবার কি ব্যবস্থা করা যায়? এতদিন পর্য্যন্ত সম্পাদক মহাশয় ঋণপ্রদান করিয়া কোন প্রকারে কাজ চালাইয়া আসিতেছিলেন। কিন্তু দীর্ঘকাল ধরিয়া তাহা সম্ভব নহে।

সভাপতি মহাশয়ের নির্দ্দেশক্রমে এবং সর্ব্বসম্মতিতে স্থির হইল যে, বৃত্তি বাবতে উপরোক্ত প্রাপ্য যাহাতে অবিলম্বে এবং পরে যাহাতে উক্ত মাসিক বৃত্তি নিয়মিতভাবে মাসে মাসে পাওয়া যায়, তাহার জন্য রবীন্দ্র বাবু প্রভৃতিকে সভাপতি মহাশয়ের স্বাক্ষরিত পত্রে বিশেষভাবে অনুরোধ করা হোক।

৯। তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার শ্রীবৃদ্ধিসাধনের উপায় আলোচিত হইল।

বর্ত্তমান বৎসরে পত্রিকা ৮৪ বৎসরে চলিতেছে। অনেকে বলেন, পত্রিকার আকার 'প্রবাসী' 'বঙ্গবাণী' প্রভৃতির আকারে পরিবর্ত্তিত করিলে ভাল হয় এবং ইহাতে বিজ্ঞাপন বেশী পাওয়াও সম্ভব। সর্ব্বসম্মতিক্রমে স্থির হইল, এবিষয় আগামী ফাল্গুন মাসের শেষে আলোচিত হইবে।

১০। যন্ত্রালয়ের শ্রীবৃদ্ধিসাধনের বিষয় আলোচিত হইল।

ইংরাজী, বাঙ্গালা ও দেবনাগরী অক্ষরাদির জন্য প্রায় দেড় হাজার টাকা সংগৃহীত হইলে যন্ত্রালয়কে কতকটা self supporting ভাবে চালাইবার ব্যবস্থা করা যাইতে পারে।

সভাপতি মহাশয়ের নির্দ্দেশ ক্রমে এবং সর্ব্বসম্মতি-ক্রমে স্থির হইল যে, এই টাকার জন্য শ্রীযুক্ত প্রফুল্লনাথ ঠাকুরের নিকট আবেদন করা হোক।

১১। সমাজের কোন অংশ ভাড়া দিবার প্রস্তাব আলোচিত হইল।

ভূতপূর্ব্ব সভাপতি ৺সার আশুতোষ চৌধুরী মহাশয় নিম্নতলের এক অংশ ভাড়া দিবার প্রস্তাব সর্ব্বপ্রথম উপস্থিত করেন। অবশেষে নানা কারণে উহা চাপা পড়িয়া যায়। সর্ব্বসম্মতিক্রমে স্থির হইল যে, ট্রষ্টডীডের অবিরুদ্ধ কার্য্যের জন্য নিম্নতলের কোন অংশ ভাড়া দেওয়া যাইতে পারে, এবং এই ভাড়া দেওয়া সম্বন্ধে যাহা উচিত বিবেচনা করেন, তাহাই করিবার জন্য সম্পাদক শ্রীযুক্ত ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুরের উপর সম্পূর্ণ ভার দেওয়া গেল।

১২। সাপ্তাহিক ও মাসিক উপাসনার শ্রীবৃদ্ধি-সাধনের উপায় আলোচিত হইল।

সর্ব্বসম্মতিক্রমে স্থির হইল, মাসিক উপাসনা কোন্ সময়ে হইলে উপাসকগণের সুবিধা হইবে ইত্যাদি বিষয় আলোচনা করিয়া উপযুক্ত ব্যবস্থা করিবার ভার সম্পাদকদ্বয়ের উপর ন্যস্ত হোক।

১৩। গীতারহস্য-বঙ্গানুবাদ মুদ্রণ ও বিক্রয় সম্বন্ধে আলোচনা হইল।

গত ১৯১৮ খৃষ্টাব্দে আদিসমাজের তদানীন্তন অন্যতম সভাপতি ৺সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়, লোকমান্য বালগঙ্গাধরতিলক এবং আদিসমাজের সম্পাদক শ্রীযুক্ত ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর, এই তিনজনের মধ্যে গীতারহস্য সম্বন্ধে যে চুক্তি স্থির হইয়াছিল, তাহা লোকমান্য তিলকের ১৯১৮। ২৮ ফেব্রুয়ারি এবং ২৩ মার্চ তারিখের দুই পত্রে উল্লিখিত হইয়াছে। ইহার সঙ্গে ১৯১৮। ১০ মার্চ তারিখের সম্পাদক মহাশয়ের লিখিত পত্রও দ্রষ্টব্য। চুক্তির প্রধান point গুলি নিম্নে লিখিত হইল—

(১) অনুবাদককে ২০০০৲ টাকা দেওয়া হইবে, তাহা হইতে নুতন অক্ষর প্রভৃতি কেনা হইবে।

(২) তিলক মহোদয় কাগজের সমস্ত দাম, ছাপাইবার ব্যয়, printing charges এবং বিজ্ঞাপনের খরচ দিবেন।

চুক্তি অনুসারে সমস্তই পাওয়া গিয়াছে ও যাইতেছে। কিন্তু এ পর্য্যন্ত মোটে ১৬০০ খণ্ডের কাছাকাছি বিক্রয় হইয়াছে, কিন্তু মুদ্রিত হইয়াছে ৭০০০ খণ্ড। লোকমান্য তিলক তাঁহার পত্রে ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিলেন যে, সমস্ত খরচ উঠিয়া গিয়া যাহা লাভ দাঁড়াইবে, তিনি তাহার অর্দ্ধেক সমাজে সঙ্গে সঙ্গেই দান করিবেন এবং অপর অর্দ্ধেকও তিনি সমাজে পরে দান করিবেন। সমাজে স্থানাভাবের জন্য মুদ্রিত ফর্ম্মাগুলির কোন অংশ নষ্ট হইতে পারে, এই আশঙ্কায় সম্পাদক মহাশয় নিজের দায়িত্বে এগুলি সমাজে রাখিতে অনিচ্ছা প্রকাশ করিতেছেন। সর্ব্বসম্মতিক্রমে স্থির হইল, লোকমান্য তিলক-মহোদয়ের পুত্রগণকে ফর্ম্মাগুলি সরাইয়া লইবার জন্য অথবা তাঁহাদের দায়িত্বে অন্য কোথাও রাখিবার জন্য লেখা হউক।

১৪। আদি ব্রাহ্মসমাজে ইলেট্রিক পাখার ব্যবস্থা বিষয়ে আলোচনা হইল।

আপাতত ১০খানা পাখা হইলেই চলিবে। আন্দাজ এক হাজার টাকা লাগিবে। সর্ব্বসম্মতিক্রমে স্থির হইল, ইহার জন্য চাঁদা সংগ্রহ করা হউক।

১৫। প্রেসম্যান শ্রীতিনকড়ি দের সাহায্যের জন্য আবেদন আলোচিত হইল।

তিনকড়ি ৪২।৪৩ বৎসর ধরিয়া একাদিক্রমে যন্ত্রালয়ের কার্য্য করিতেছে। তাহার কন্যার বিবাহ উপলক্ষে ঋণের জন্য কিছু সাহায্য চায়। স্থির হইল, সমাজের বর্ত্তমান আর্থিক অবস্থায় উহাকে সমাজ হইতে কোন সাহায্য দেওয়া সম্ভব হইবে না। উপস্থিত অধ্যক্ষগণ নিজেদের মধ্যে চাঁদা সংগ্রহ করিয়া উহাকে ২১৲ টাকা দিতে প্রতিশ্রুত হইলেন—চিন্তামণি বাবু ১০৲, ক্ষিতীন্দ্র বাবু ৫৲, পাঁচুগোপাল বাবু ১৲, সিতিকণ্ঠ বাবু ১৲, খগেন্দ্র বাবু ১৲, নির্ম্মলবাবু ১৲, সুরেশ বাবু ১৲ এবং ক্ষেমেন্দ্র বাবু ১৲।

১৬। গত মাঘোৎসব উপলক্ষে আদিসমাজের মেরামত বাবতে শ্রীযুক্ত বিশেশ্বর মুখোপাধ্যায়ের প্রদত্ত ১১৩৷৶৬ পাইয়ের বিল আলোচিত হইল। সর্ব্বসম্মতি-ক্রমে স্থির হইল, ইহা পরিশোধ করা হউক।

অবশেষে সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ প্রদান করিয়া সভা ভঙ্গ হইল।

শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর
সম্পাদক।
১৫ই কার্ত্তিক, ১৩৩৩।

শ্রীসিতিকণ্ঠ মল্লিক
সভাপতি।
২৮শে কার্ত্তিক ১৩৩৩।

শ্রীচিন্তামণি চট্টোপাধ্যায়।
শ্রীনির্ম্মলচন্দ্র বড়াল।

গ্রন্থপরিচয়।

(শ্রীক্ষেমেন্দ্রনাথ ঠাকুর বি. এস্-সি)

আর্থিক উন্নতি।—মাসিক পত্র। সম্পাদক শ্রীবিনয়কুমার সরকার। প্রাপ্তিস্থান—১০৭ মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

আমরা এই নবপ্রকাশিত সহযোগীকে বাংলার

মাসিকে এক নূতন পথপ্রবর্ত্তন করার সাদর অভিনন্দন জানাইতেছি। উপন্যাস বা গল্প না দিয়াও যে অধ্যাপক সরকার মহাশয় বাংলাদেশে এক নূতন ধরণের মাসিক চালাইতে চাহিতেছেন, ইহা তাঁহার দুঃসাহস বলিয়াই অনেকে মনে করেন। কিন্তু তাহা হইলেও আমাদের বিশ্বাস, তাঁহার এই "দুঃসাহস" অচিরেই সাফল্যমণ্ডিত হইবে। বিনয়কুমার বাঙ্গালীর চক্ষু নিজের ঘরের ধনভাণ্ডারের দিকে ফিরাইয়া বাংলার যে উপকার করিতেছেন তাহা দেশ সহজে ভুলিবে না। আমরা এই পত্রিকার দীর্ঘজীবন কামনা করি।

Sanskrit Collegiate School Magazine :—সংস্কৃত কলেজিয়েট স্কুল হইতে প্রকাশিত এই ষাণ্মাসিক পত্রিকাটি উক্ত বিদ্যালয়ের ছাত্রবর্গের দ্বারা পরিচালিত হইতেছে। এই ছাত্রবর্গের সকলেই সম্ভবতঃ ষোড়শ বা সপ্তদশ বর্ষের নিম্নে। কিন্তু তাহা হইলেও ইহারা যেরূপ নিপুণভাবে এই পত্রিকা পরিচালন করিতেছে, তাহাতে তাহাদের প্রশংসা না করিয়া থাকা যায় না। আমরাও বহু বৎসর ঐ বিদ্যালয়ে পড়িয়াছি। আজ কয়েক বৎসর বিদ্যালয় ত্যাগ করিলেও স্নেহবন্ধন ছিন্ন হয় নাই। আমরা আশা করি, উত্তরোত্তর ইহার শ্রী অধিকতর বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইবে।

নীলাচল—শ্রীচুণীলাল বসু রসায়নাচার্য্য সি আই ই, আই এস্ ও, এম্ বি, এফ সি এস্ প্রণীত এবং শ্রীজ্যোতিঃপ্রকাশ বসু এম্ বি, এফ্ সি এস্ কর্ত্তৃক ২৫নং মহেন্দ্র বসুর লেন কলিকাতা হইতে প্রকাশিত; মূল্য ১৲ এক টাকা।

গ্রন্থকার এই গ্রন্থে পুরী এবং আনুষঙ্গিকরূপে পুরীর নিকটবর্ত্তী দুই চারিটি স্থানের বিশেষতঃ পুরীর জগন্নাথ-মন্দিরে জগন্নাথের যে সকল উৎসবাদি হয় তাহা সুন্দরভাবে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বর্ণনা করিয়াছেন। গ্রন্থের শেষে রঘুনন্দনবিরচিত 'শ্রীপুরুষোত্তমক্ষেত্রতত্ত্ব' সংযোজিত হওয়ায় গ্রন্থটী আরও উপাদেয় হইয়াছে। কেবল একটী বিষয়ে আমরা রসায়নাচার্য্য মহাশয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করি, বিবরণটী ১৯০৩ সালে লিখিত, সুতরাং সর্ব্বত্র বর্ত্তমান অবস্থার সহিত নাও মিলিতে পারে। টীকা টিপ্পনী দ্বারা গ্রন্থটী বর্ত্তমান যুগের উপযোগী করিলে সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হইত। ছাপা ও বাঁধাই ভাল।

সমাজরেণু।—শ্রীমহেন্দ্রনাথ কর প্রণীত। প্রকাশক—শ্রীনিরঞ্জন বিজলী, গোকুলনগর গ্রাম, মেদিনীপুর। মূল্য আট আনা।

এই গ্রন্থটী কতকগুলি সুন্দর সামাজিক কবিতার সমষ্টি। ইহা অস্পৃশ্যতার বিরুদ্ধে সংগ্রামের ভেরী বলিলেও চলে। গ্রন্থকার সুস্পষ্টরূপে অস্পৃশ্যতার অস্বাভাবিক মূর্ত্তি হিন্দুসমাজের সম্মুখে ধরিয়াছেন। তবে ইহাতেও কি হিন্দুসমাজ জাগিবে? দুই একটি ভিন্ন সকল কবিতাই এত সুন্দর যে শেষ না করিয়া ছাড়া যায় না।

আর্য্যসমাজ কাহাকে বলে?—শ্রীরমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত।

গ্রন্থটী পাঠ করিলে আর্য্যসমাজের মত ও বিশ্বাস সম্বন্ধে বেশ একটু ধারণা জন্মে। স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতীর জীবনবৃত্তান্তটি স্বল্প কথায় লিপিবদ্ধ হইলেও রীতিমত কৌতূহলোদ্দীপক হইয়াছে। আর্য্যসমাজের মতের সহিত ব্রাহ্মসমাজের মত দুই একটা ভিন্ন অনেক অংশেই মিলিয়া যায়। এক সময়ে আর্য্যসমাজ ও ব্রাহ্মসমাজের পরস্পর মিলনের পর্য্যন্ত কথা উঠিয়াছিল—মতে এত মিল আছে। গ্রন্থের ছাপা ও কাগজ ভাল।

The Universal Religion (Part I)।—শ্রীঅমৃতলাল বসু প্রণীত। মূল্য দুই টাকা মাত্র। ৩২নং সরকার লেন হইতে গ্রন্থকার কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

গ্রন্থটী ইংরাজীতে লিখিত। গ্রন্থকার আধুনিক যুগের উপযোগী করিয়া সকল ধর্ম্মের এবং সমাজের সামঞ্জস্য করিতে চাহিয়াছেন। গ্রন্থকারের উদ্যম এবং দৃষ্টির উদারতা প্রশংসনীয়। আমরা আশা করি তাঁহার এই চেষ্টা সাফল্যলাভ করুক। এই উদ্দেশ্য লইয়াই ব্রাহ্মসমাজের জন্ম।

ভগবদ্গীতিমালা।—ধর্ম্মবিষয়ক সঙ্গীত-সংগ্রহ। সংগ্রাহক রায় শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ ঘোষ বাহাদুর এম্-এ, বি-এল্। প্রকাশক—শ্রীললিতমোহন ঘোষ। ২৩।১।৩নং গুরুপ্রসাদ চৌধুরী লেন, কলিকাতা।

গ্রন্থটী অনেকগুলি সঙ্গীতের সংগ্রহ। সংগ্রহটী সুনিপুণ হইয়াছে। সর্ব্বাপেক্ষা সুন্দর হইয়াছে সূচীপত্রে বিষয়নির্দ্দেশ। এইখানেই সংগ্রাহকের কৃতিত্ব প্রকাশ পাইয়াছে।

New English Reader Book IV,
New English Translation Book I.
New English Translation Primer

Published by Charu Chandra Guha, Patuatuly, Dacca. এবং 57/1, Raja Dinendra Street, Calcutta.

পুস্তকগুলি বিদ্যালয়ের উপযোগী করিয়া লিখিত। যে সকল বিষয় নির্ব্বাচিত হইয়াছে, তাহা বালকগণের পক্ষে সুবোধ্য হইবে বলিয়াই আমাদের বিশ্বাস।

শোক-সংবাদ।

৺নীলকান্ত মুখোপাধ্যায়।—বিগত ১১ই আশ্বিন বুধবার বেহালাব্রাহ্মসমাজের সম্পাদক রায়

সাহেব শ্রীযুক্ত নীলকান্ত মুখোপাধ্যায় মহাশয় তাঁহার ভবানীপুরের অভয় সরকার লেনস্থ বাসবাটীতে পরলোক গমন করিয়াছেন। ভগবান্ তাঁহার পরলোকগত আত্মাকে সুশীতল ক্রোড়ে স্থান দান করুন, এবং তাঁহার শোকার্ত্ত পুত্রগণের অন্তরে সান্ত্বনা-বারি বর্ষণ করুন।

ডাক্তার ৺ডি. এন. রায়।—স্বনামধন্য হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসক ডাক্তার ডি. এন. রায় বিগত ২১শে আশ্বিন শুক্রবার তাঁহার কলিকাতার বাসভবনে পরলোকগত হইয়াছেন। তিনি স্বীয় প্রতিভাবলে চিকিৎসকমহলে বিশেষ যশস্বী হইয়া উঠিয়াছিলেন। ইনি মহর্ষিদেবকে যথেষ্ট শ্রদ্ধাভক্তি করিতেন। মহর্ষিদেবের শেষজীবনে সামান্য অসুখের সংবাদ পাইলেই তখনই তিনি ছুটিয়া আসিতেন। ইনি শ্রদ্ধেয় দুর্গামোহন দাস মহাশয়ের এক কন্যাকে বিবাহ করেন। আমরা ইঁহার শোকার্ত্ত পরিজনদিগকে আমাদের আন্তরিক সমবেদনা জানাইতেছি। ভগবান ইঁহার লোকান্তরিত আত্মার সুগতি বিধান করুন।

৺দ্বিজেন্দ্রনাথ বসু।—স্বর্গীয় ঈশানচন্দ্র বসু মহাশয়ের একমাত্র পুত্র দ্বিজেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় গত ১৮ই কার্ত্তিক বৃহস্পতিবার মেদিনীপুরস্থ স্বীয় পল্লীভবনে পরলোকগমন করিয়াছেন। ঈশানচন্দ্র বসু মহাশয় প্রাচীন যুগের ব্রাহ্মগণের মধ্যে একজন খ্যাতনামা পুরুষ ছিলেন। ইঁহারই উদ্যোগে রাজা রামমোহন রায়ের গ্রন্থাবলী সংগৃহীত হইয়াছিল। ইনি আমৃত্যু ব্রাহ্মসমাজের সেবাকেই স্বীয় জীবনব্রতরূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন। ইঁহার পুত্র দ্বিজেন্দ্রনাথও চিরদিন ব্রাহ্মসমাজের অনুরাগী ছিলেন, এবং কিছুকাল আদিব্রাহ্মসমাজের কার্য্যাধ্যক্ষরূপে ইহার সেবা করিয়া গিয়াছেন। দ্বিজেন্দ্রনাথ ইদানীং পল্লীভবনেই বাস করিতেন। তিনি যে এত শীঘ্র আমাদিগকে ছাড়িয়া যাইবেন, তাহা আমরা ধারণা করিতে পারি নাই। তাঁহার এই অকাল মৃত্যুতে আমরা দুঃখিত। তদীয় পুত্র-পরিজনদিগের এই গভীর শোকে আমরা আন্তরিক সমবেদনা জানাইতেছি; ভগবান ইঁহার পরলোকগত আত্মার কল্যাণ করুন।

সংবাদ।

জন্মতিথি উৎসব—গত ৫ই কার্ত্তিক শুক্রবার প্রাতঃকাল ৭॥ ঘটিকায় ৯।এ সাউথ রোড ইটালীতে আমাদের পরম সুহৃদ্ প্রীতিভাজন শ্রীযুক্ত বনওয়ারিলাল চৌধুরী মহাশয়ের দৌহিত্র, শ্রদ্ধাস্পদ অধ্যাপক শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ নাগ চৌধুরী মহাশয়ের পুত্র কল্যাণীয় শ্রীমান্ যাদবানন্দের জন্মতিথি-উৎসব সুসম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। তদুপলক্ষে আদিব্রাহ্মসমাজের শ্রদ্ধাস্পদ আচার্য্য শ্রীযুক্ত ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় যথারীতি উপাসনা ও উপদেশাদি আনুষ্ঠানিক কার্য্য করিয়াছিলেন। ভগবান বালককে মঙ্গল ও উন্নতির পথে অগ্রসর করুন।

বেহালা ব্রাহ্মসমাজের সাম্বৎসরিক উৎসব—গত ৩০শে কার্ত্তিক মঙ্গলবার বেহালা ব্রাহ্মসমাজের ত্রিসপ্ততিতম সাম্বৎসরিক উৎসব যথারীতি সুসম্পন্ন হইয়াগিয়াছে। প্রাতঃকালীন উপাসনা ৭॥ ঘটিকায় আরম্ভ হইয়াছিল। উপাসকসংখ্যা অধিক না হইলেও প্রভাত ও পল্লীর স্বাভাবিক স্নিগ্ধতায় সমগ্র উপাসনাটী বেশ হৃদয়গ্রাহী হইয়াছিল। অপরাহ্ণ বেলা ৩ঘটিকার সময় ব্রাহ্মধর্ম্মের 'পারায়ণ' হইল। উৎসবের এই অঙ্গটী বেহালা ব্রাহ্মসমাজের একান্ত নিজস্ব ও অভিনব; ইহার অন্যত্র প্রচলন বাঞ্ছনীয়।

শীতের শান্ত সায়াহ্ণ যখন ছায়ানিবিড় হইয়া পল্লীর বুকে নামিয়া আসিল, তখন হইতেই সায়ং উপাসনায় যোগ দিবার জন্য লোকসমাগম আরম্ভ হইল। সন্ধ্যার পূর্ব্বেই ব্রাহ্মসমাজ ও চিন্তামণিবাবুর সুবিস্তীর্ণ গৃহপ্রাঙ্গণ সকল সমাজ ও সম্প্রদায়ের উপাসকমণ্ডলীতে পূর্ণ হইয়া গেল। সন্ধ্যাদীপের মঙ্গলালোকে সমাজগৃহটী এক অপূর্ব্ব শান্ত কোমল শ্রীতে মণ্ডিত হইয়া বড়ই সুন্দর দেখাইতেছিল। প্রাঙ্গণদ্বারে নহবৎ বসিয়াছে। প্রবেশপথ হইতে সোপানাবলী পর্য্যন্ত পত্ররচিত স্তম্ভের উপর বেলোয়ারী ঝাড় দুলিতেছে। সর্ব্বত্র লতায় পাতায় স্নিগ্ধ দীপালোকে ও ধূপধুনার পবিত্র গন্ধে বেশ একটী অভিনব উৎসবের ভাব জাগিয়া উঠিয়াছে। যথারীতি উপাসনাদি হইয়া গেল। সঙ্গীতের অংশ বিশেষ সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছিল। উপাসনান্তে সমাগত জনগণের জলযোগের সবিশেষ ব্যবস্থা করিয়া চিন্তামণি বাবু উৎসবের প্রচলিত পুরাতন অঙ্গটী যথারীতি বজায় রাখিয়াছিলেন। চিন্তামণিবাবু ও তাঁহার পুত্রগণের আতিথেয়তা সবিশেষ প্রশংসনীয়। বেহালার এই ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠিত হইবার অব্যবহিত পরে পূজ্যপাদ মহর্ষিদেব শ্রদ্ধাস্পদ বেচারাম বাবুকে একখানি চিঠিতে লিখিয়াছিলেন যে, :কালে বেহালার এই ব্রাহ্মসমাজ, ব্রাহ্মসমাজের 'কালীঘাট' হইয়া দাঁড়াইবে। আজ এইখানে সর্ব্ব সমাজ ও সম্প্রদায়ের মিলন দেখিয়া আমাদের অন্তরে বার বার কেবল সেই মহাপুরুষের অমোঘ বাণীই জাগ্রত হইয়া উঠিতেছিল।

হিতৈষণা গ্রন্থাবলী সম্বন্ধে অভিমত।

জ্ঞান ও ধর্ম্মের উন্নতি (মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের উপদেশ) —শ্রীযুক্ত ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্ত্তৃক লিখিত, ৫৫নং আপার চিৎপুর রোডস্থ আদিব্রাহ্ম-সমাজ-যন্ত্রে মুদ্রিত ও শ্রীরণগোপাল চক্রবর্ত্তী দ্বারা প্রকাশিত। মূল্য বার আনা মাত্র। ছাপা, কাগজ, বাঁধাই উৎকৃষ্ট।

নামেই পুস্তকের গৌরবের বিষয় সূচিত হইয়াছে। এই গ্রন্থনিবদ্ধ জ্ঞান ও ধর্ম্মের উপদেশগুলি নানা গভীর দার্শনিক তত্ত্বকথায় পূর্ণ। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের উপদেশ হয় তো অনেকেই পাঠ করিয়াছেন, মহর্ষি পার্থিব সংসারে থাকিয়াও সমস্ত সংসারকে তৃণের ন্যায় তুচ্ছ জ্ঞান করিতেন, তাহা অনেকেই অবগত আছেন। পাঠক! মহর্ষির শ্রীমুখ-নিঃসৃত তত্ত্বোপদেশ পাঠ করিয়া ব্রাহ্মধর্ম্ম-সাধনার পথ পরিষ্কৃত করিয়া লউন। জন্মভূমি—১৩১১ সাল, ভাদ্র।

আর্ট ও সাহিত্য—বঙ্গ-সাহিত্যের বিষম দুর্দ্দিন উপস্থিত। তাই, বঙ্গ-সাহিত্যে এখন নিত্যই দুর্গন্ধ আবর্জ্জনারই আতিশয্য ঘটিতেছে। রাশি রাশি অশ্লীল এবং রাবিশ রচনার ফলে বঙ্গ-সাহিত্য অমেধ্য এবং ক্লেদবহুল হইয়া উঠিতেছে। বঙ্গবাণী ক্রমেই অতিষ্ঠ হইয়া উঠিতেছেন।

"বঙ্গদর্শনে"র আমলে বঙ্গ-সাহিত্যের রাবিশ জঞ্জাল পরিষ্কারের উত্তম ব্যবস্থা ছিল। সূক্ষ্মদর্শী সমালোচক বঙ্কিম বাবুর সমালোচনা-সম্মার্জ্জনীর আঘাতে অনেক বিকৃতমনা লেখককেই প্রকৃতিস্থ হইতে হইত। ইদানীং আবার সেরূপ সম্মার্জ্জনই বিশেষ আবশ্যক হইয়াছে।

সুখের বিষয়, কিছুদিন পূর্ব্বে রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন সিংহ মহাশয় তাঁহার "সাহিত্যের স্বাস্থ্য-রক্ষা" নামক পুস্তকে সেইরূপ সম্মার্জ্জন-কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন; আবার সম্প্রতি সুধী লেখক শ্রীযুক্ত ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর বি-এ মহাশয়ও সেইরূপ কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। এই উদ্দেশে সম্প্রতি ইনি "আর্ট ও সাহিত্য" নামক একখানি পুস্তক লিখিয়াছেন।

"আর্টের" খাতিরেই অনেক লেখক কিরূপ জঘন্য চিত্র আঁকিয়া আজকাল সাহিত্য-সেবার স্পর্দ্ধা করিয়া থাকেন, ফলে বঙ্গসাহিত্যের ঘোরতর অনিষ্ট ঘটাইতেছেন, ঠাকুরমহাশয় "আর্ট ও সাহিত্য" পুস্তকে তাহাই দেখাইয়াছেন। "আর্ট ও সত্য", "আর্ট ও মঙ্গল" "আর্ট ও সৌন্দর্য্য" "আর্ট ও সাহিত্য" "আর্টের খাতিরে আর্ট" প্রভৃতি কয়েকটী অধ্যায়ে গ্রন্থকার মহাশয় "আর্টের" বিভিন্ন রূপের বিভিন্ন বিশ্লেষণ ভালরূপই করিয়াছেন। "আর্টের" দাবীতে যে সকল লেখক নির্লজ্জভাবে কামিনীর নগ্নরূপ দেখাইতেই ভালবাসেন বা দেশের কল্যাণকর বলিয়া বুঝেন, তাঁহারা এই গ্রন্থের এই সকল অধ্যায়ে আপনাদের ভ্রম বুঝিতে পারিবেন বলিয়াই আমরা আশা করি। যাঁহারা তাহা না পারিবেন, তাঁহারা অতি দুর্ভাগ্য বলিয়াই আমরা বুঝিব। তাঁহাদের কলম ধরা একবারে বন্ধ করাই উচিত। কুপ্রবৃত্তির উত্তেজনা করিয়া পাঠক-পাঠিকার কাম-বিলাস-কামনা যাঁহারা বাড়াইয়া দিতে চাহেন,—তাঁহারা বঙ্গসাহিত্যের এবং বঙ্গদেশের ঘোরতর শত্রু। ধিক্ তাঁহাদের রচনায়,—ধিক্ তাঁহাদের অর্থলোভে! শ্রীযুক্ত ঠাকুর মহাশয় এই শ্রেণীর লেখকের লেখায় গুরুতর কুফল যেমন সূক্ষ্ম সমালোচনায় সহিত দেখাইয়াছেন,—তেমনি সঙ্গে সঙ্গে তিনি যথেষ্ট শিষ্ট এবং বিনম্র ভাবেরও পরিচয় দিয়াছেন। ইহাতে তাঁহার উদ্দেশ্য উত্তমরূপে সিদ্ধ হইবার সম্ভাবনা—তিনি বঙ্কিমচন্দ্র এবং রবীন্দ্রনাথের ন্যায় লেখক-শার্দ্দূলগণের পুস্তকের আলোচনা করিতে—তাঁহাদের লেখার দোষ গুণ ধরিতেও সঙ্কুচিত হন নাই; বেশ নির্ভীক ভাবেই তিনি ইঁহাদের পুস্তকের আলোচনা করিয়াছেন। বঙ্কিমচন্দ্রের পুস্তকের অনেক ভাবই যে বিদেশী পুস্তক হইতে সংগৃহীত—তাহাও গ্রন্থকার নির্ভীক ভাবেই দেখাইয়াছেন, এবং কোন কোন স্থলে সে সন্দেহও যুক্তিসঙ্গত রূপেই করিয়াছেন। "চন্দ্রশেখরে"র প্রতাপ-শৈবলিনীর সন্তরণ-দৃশ্য বা "সীতারামের" শ্রীর বৃক্ষশাখায় দণ্ডায়মান অবস্থায় সমরদর্শন—প্রভৃতি দৃশ্যের মূল ছায়া আমরাও স্কটের উপন্যাসবিশেষে পড়িয়াছি। তবে বঙ্কিমচন্দ্র অসামান্য প্রতিভা বলে এই সব দৃশ্য রূপান্তরে আঁকিয়াছেন। যাই হউক, শ্রীযুক্ত ঠাকুর মহাশয়ের সহিত তাঁহার সকল মন্তব্যে এবং সমালোচনার সর্ব্বাংশে আমাদের মতসাম্য না থাকিলেও মুক্তকণ্ঠে বলিব, তাঁহার সাহিত্য-সমালোচনাসম্বলিত এই প্রয়োজনীয় পুস্তক সকল শ্রেণীর পাঠকেরই মনোনিবেশপূর্ব্বক পাঠ করা উচিত; পাঠ করিয়া আত্মরক্ষার জন্য কদাদর্শমূলক পুস্তক এবং পুস্তক-লেখকগণ হইতে দৃঢ়সংকল্পে সাবধান হওয়া উচিত। যাঁহারা কেবলমাত্র কুচিত্র আঁকিয়া বঙ্গ-ভারতীর অঙ্গ নিত্য কলুষিত করিতেছেন, তাঁহারাও সাবধান হউন।

এই পুস্তকের আর এক শোভন অঙ্গ—ইহার ভূমিকা। অবসরপ্রাপ্ত সিবিল সার্জ্জন—এবং মাইকেল মধুসূদনের কাব্যাবলীর অভিনব সংস্করণ সম্পাদক সুপ্রসিদ্ধ সাহিত্য-সেবী এবং সমালোচক রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত দীননাথ সান্ন্যাল বি-এ, এম-বি এই ভূমিকা লিখিয়াছেন। তিনি অল্পের ভিতর ইহাতে বঙ্গসাহিত্য সম্বন্ধে এমন কয়েকটী সারগর্ভ কথা লিখিয়াছেন—যাহা বঙ্গসাহিত্যানুরাগী মাত্রেরই অবশ্য পাঠ্য এবং সুপাঠ্য বলিয়া আমরা বিবেচনা করি। প্রাচীন বাঙ্গালা গদ্যসাহিত্য সম্বন্ধে তিনি বলিতেছেন—

"প্রাচীন বাঙ্গালায় গদ্য-সাহিত্য ছিল না;—ছিল কেবল কাব্যাকারে ধর্ম্মসাহিত্য। ইংরেজী শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে গদ্যসাহিত্যের সৃষ্টি হইল এবং বঙ্গসাহিত্যে গদ্যকাব্য (উপন্যাস) দেখা দিল। "আলালের ঘরে দুলাল" বাঙ্গালার প্রথম উপন্যাস হইলেও এখন যে ভাষায় যে ভাবে, যে ধরণে, যে উপকরণে এবং যে আদর্শে অধিকাংশ উপন্যাসরাজি রচিত হইতেছে, তাহার জন্মদাতা নব্যবঙ্গের সাহিত্যিকচূড়ামণি বঙ্কিমচন্দ্র। বঙ্কিমচন্দ্র তখন বিলাতী প্রভাবে প্রভাবিত। সুতরাং তিনি তাঁহার উপন্যাসের আদর্শ লইলেন পাশ্চাত্য দেশ হইতে। উপন্যাসের প্রধান উপাদানবস্তু নরনারীর প্রেম। তাই দেখিতে পাই, পাশ্চাত্য আদর্শের সঙ্গে পাশ্চাত্য উদ্দাম প্রেম-লীলাও বাঙ্গালার উপন্যাস-সাহিত্যে নানা ভাবে, নানা ছাঁদে প্রকটিত হইতে আরম্ভ করিল। সুদক্ষ শিল্পীর হাতে দেশী ছাঁচে ঢালা হইলেও, তাহার বিদেশী ভাব বিদেশী ছন্দ, বিদেশী গন্ধ এবং সর্ব্বোপরি প্রবৃত্তিমূলক প্রেমের তীব্র মাদকতা, মনোজ্ঞ ভাষায় ও মনোহর বর্ণনায় মণ্ডিত হইয়া বঙ্গের পাঠক-পাঠিকাদিগের মস্তিষ্কে বেশ

একটু গোলাপীগোছের উন্মাদনার সৃষ্টি করিল। প্রাচীন ভারতের সেই নিবৃত্তিমূলক ধর্ম্ম, নিবৃত্তিমূলক সমাজ, নিবৃত্তিমূলক আচার-অনুষ্ঠান বহুকালের স্তূপীকৃত আবর্জ্জনায় শ্রীভ্রষ্ট, লক্ষ্যভ্রষ্ট, আদর্শভ্রষ্ট ও জীবনীশক্তিহীন হইয়া পড়িয়াছিল। ভারতীয় আদর্শের প্রতিষ্ঠা করিয়া, লক্ষ্যের সন্ধান করিয়া সংস্কার করলে এবং আবর্জ্জনা বর্জ্জন করিয়া, তাহার স্থলে সত্য, জ্ঞান ও নিবৃত্তির আবাদ করিলে হয়তো সোনা ফলিতে পারিত। কিন্তু আমাদের দুর্ভাগ্যবশে তাহা হয় নাই। যাঁহারা ইংরাজিতে সুপণ্ডিত হইতে লাগিলেন, তাঁহাদের অধিকাংশই মুখ ফিরাইলেন পাশ্চাত্যের দিকে। তাঁহারা সকল বিষয়েই আদর্শ লইতে লাগিলেন বিলাতী। এমত স্থলে একা সাহিত্যই বা বাদ পড়িবে কেন? উপন্যাসও বিলাতী আদর্শে রচিত হইতে লাগিল এবং রোচক বলিয়া প্রবৃত্তির মুখে বঙ্গীয় পাঠক-পাঠিকাবর্গ গোগ্রাসে তাহা গ্রহণ ও গলাধঃকরণ করিয়া তৃপ্তিবোধ করিতে লাগিল।

"উপন্যাসের ঐ ধারা, যাহা বঙ্কিমচন্দ্র ধরাইয়া গেলেন এখন সেই ধারাই শতধারায়, সহস্রধারায় বিক্ষিপ্ত হইয়া বাঙ্গালা-সাহিত্য প্লাবিত করিয়া ফেলিতেছে। আজকাল এই যে, বঙ্গের কুলকন্যা ও কুলবধূগণ দেবসেবা, গৃহসেবা, শিশুসেবা, সমাজসেবা ইত্যাদি শতবিধ অবশ্য কর্ত্তব্য কর্ম্মের অবহেলা করিয়া, কামকলার নিত্যনূতন উপন্যাস-পাঠও তাঁহাদের নিত্যনূতন বিলাসকলার অঙ্গীভূত করিয়া লইলেন; এই যে স্কুল-কলেজের সুকুমারমতি ছেলেরা ঐ অপূর্ব্ব সাহিত্যের বিচিত্র প্রেমলীলার ঝাঁঝালো আদিরস ভরপুর হইয়া যৌবনকে যেন ডাকিয়া আনিতে চাহিতেছে;—আর এই যে ত্রিতাপক্লিষ্ট কেরাণীকুল ঐ সাহিত্যের নেশায় তাঁহাদের অবসন্ন মনকে কথঞ্চিৎ উত্তেজিত করিবার জন্য নব নব উপন্যাসকে তাঁহাদের অবসন্ন-সহচর করিয়া তুলিতেছেন;—ইহা যে মঙ্গলজনক নহে, ইংরাজী শিক্ষিতদের মধ্যেও এইরূপ একটা লোকমত ক্রমশই প্রবল হইয়া উঠিতেছে, এ কথা অস্বীকার করিবার যো নাই।"

"কাব্যকলায় আদিরস" সম্বন্ধে সূক্ষ্মদর্শী সান্যাল মহাশয় বলিতেছেন,—

"কাব্যকলায় আদিরস পরম উপাদেয় ও উপভোগ্য বলিয়া পরিগণিত। রস-শাস্ত্র উহাকে "বিষ্ণুদৈবত" বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। ইহাতেই ঐ রসের পবিত্রতা সূচিত। ঐ রসের নামান্তর "উজ্জ্বল রস"—ইহাতেই উহার উপভোগ্যত্ব সুব্যক্ত। উত্তম-প্রকৃতি নায়ক-নায়িকা অবলম্বনে ঐ রসের পরিস্ফুটন করাই বিধি এবং তাহাই শোভন। বঙ্গের একজন সুপ্রসিদ্ধ আলঙ্কারিক, পণ্ডিত জয়গোপাল গোস্বামী মহাশয় তাঁহার প্রণীত কাব্যদর্পণের ভূমিকায় বলিয়াছেন—"আদ্যরসের উল্লেখ করিতে হইলেই যে লেখনী ঘৃণাকর ও লজ্জাজনক বিষয়সকল উদ্গীর্ণ করিবে, ইহা কেবল ভ্রান্তিবিলসিত। যেরূপ ঋতুর মধ্যে বসন্ত ঋতু ঋতুরাজ বলিয়া আদরণীয়, নবরসের মধ্যে নিরাবিল আদ্যরসও সেইরূপ আদরণীয়।" কিন্তু বাঙ্গালার অধিকাংশ উপন্যাসেই এ আদর্শ রক্ষিত হয় নাই, হইতেছেও না। 'আর্ট'-বাদীরা কি বলিতে চাহেন যে, নিরাবিল ও পবিত্র দাম্পত্য প্রেমে কাব্য-শ্রী নাই বা হইতে পারে না? যত কাব্য-শ্রী ফুটিয়া উঠে কেবল গণিকা, ক্ষণিকা, পরকীয়া ও নরকীয়া প্রভৃতির প্রেমে? তাঁহারা কি জানেন না বা মানেন না যে, সামাজিক ধর্ম্ম প্রেমের উপর প্রতিষ্ঠিত এবং সতীত্বধর্ম্ম বা দাম্পত্যপ্রেমই সকল প্রকার প্রেমের মূলাধার। ইহাকে আশ্রয় করিয়াই স্নেহ, ভক্তি, প্রীতি প্রভৃতি প্রথমে গৃহে অঙ্কুরিত হয়; এবং ক্রমে আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব, স্ব সমাজ ও স্ব-দেশ আলিঙ্গন করিয়া, অবশেষে জগতে ব্যাপ্ত হইতে চায়। এই দাম্পত্যপ্রেমের উৎকর্ষেই সন্তানের উৎকর্ষ, গৃহের উৎকর্ষ; সুতরাং সমাজের উৎকর্ষের মূলও উহাই। এই প্রেম নষ্ট কর, দেখিবে, গৃহ থাকিবে না,—সব ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হইয়া যাইবে। গৃহ না থাকিলে, সমাজ কোথায় থাকে? কোন্ ইতিহাসাতীত যুগে, যে দিন মানুষ গৃহ বাঁধিয়া তাহাতে গৃহিণী-স্থাপনা করিয়াছিল, সেই দিন হইতেই অনুকূল ক্ষেত্র পাইয়া মানব-হৃদয়ের এই প্রেম-বীজ অঙ্কুরিত হয়। তার পর, যুগ-যুগান্তরের লালন-পালনে বদ্ধমূল ও বর্দ্ধিত হইয়া এবং শাখা-প্রশাখায় প্রসারিত হইয়া নানা ভাবে নানা আকারে উহা এখন সমাজ-ব্যাপ্ত হইয়া পড়িয়াছে। স্নেহ বল, ভক্তি বল, প্রীতি বল, মৈত্রী বল, সহৃদয়তা বল,—সকল সামাজিক ধর্ম্মের মূলই ঐ। গৃহে ইহার জন্ম, সমাজে ইহার ব্যাপ্তি, এবং পরিশেষে পরম প্রেমময়ের পাদমূলে ইহার পরিসমাপ্তি। যে বিশ্বপ্রেম প্রেমিকের চরম আদর্শ, গার্হস্থ্য ধর্ম্মেই তাহার দীক্ষা, সমাজধর্ম্মেই তাহার সাধনা এবং দেবত্ব-লাভেই তাহার স্থিতি। এই দাম্পত্যপ্রেমই মাতৃত্বকে মহিমামণ্ডিত করিয়া অতি দীনহীনের গৃহকেও স্বর্গতুল্য করিয়া থাকে। আর্ট-বাদীরা কি বলিতে চাহেন, এ হেন প্রেমে কাব্য-শ্রী নাই? কত সহস্র সহস্র বৎসর-ব্যাপী বিবর্ত্তে নরনারী-সম্বন্ধে যে একনিষ্ঠতা সুপ্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য সকল সভ্য-সমাজেই সুমহান অনুষ্ঠান প্রচলিত হইয়াছে, সেই একনিষ্ঠায় মঙ্গলের সহিত সৌন্দর্য্য না থাকিলে, তাহা কি কখনও মনুষ্যসমাজে আদরণীয় ও প্রশংসনীয় হইতে পারিত? প্রবৃত্তিমুখী হইয়া দেখিলে, হয়ত উহাতে তত সৌন্দর্য্য না থাকিতে পারে; কিন্তু নিবৃত্তি ও মঙ্গলমুখী হইয়া দেখিলে, উহাতে পরম মহিমামণ্ডিত সৌন্দর্য্য বিরাজমান, দেখা যায়।"

নবীন, অপরিণতবুদ্ধি এবং অদূরদর্শী লেখকগণের এই কয়েকটী উপদেশ-গর্ভ কথা সর্ব্বদাই স্মরণ রাখা অবশ্যকর্ত্তব্য।

ফল কথা, শ্রীযুক্ত ঠাকুর মহাশয়ের পুস্তক—"আর্ট ও সাহিত্য" নানা প্রকার কারণেই বহুজনপাঠ্য। কুসাহিত্যের পরিমার্জ্জন কল্পে এইরূপ পুস্তকের ইদানীং যত অধিক আবির্ভাব এবং আদর হইবে, ততই মঙ্গল। উত্তম ছাপা; উত্তম বাঁধাই। মূল্য এক টাকা। প্রাপ্তিস্থান,—৫৫নং অপার চিৎপুর রোড, আদিব্রাহ্মসমাজ কার্য্যালয়; কলিকাতা। হিতবাদী—৩ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩০।

বিজ্ঞাপন।

যন্ত্রালয়ের কর্ম্মচারীগণের অসুস্থতার কারণে পত্রিকাপ্রকাশে বিলম্ব হইয়াছে। আশা করি, গ্রাহক ও পাঠকবর্গ ক্রটী মার্জ্জনা করিবেন।

অগ্রহায়ণ, ব্রাহ্মসম্বৎ ৯৭।

১০০০ সংখ্যা ১৮৪৮ শক

তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা

"ব্রহ্ম বা একমিদমগ্র আসীন্নান্যৎ কিঞ্চনাসীত্তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রন্নিরবয়বমেকমেবাদ্বিতীয়ম্ সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয়ং সর্ব্ববিৎ সর্ব্বশক্তিমদ্ধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্যসাধনঞ্চ তদুপাসনমেব"।

সম্পাদক—

শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও ডাক্তার শ্রীবনওয়ারিলাল চৌধুরী ডি, এস্-সি

সহঃ সম্পাদক—শ্রীক্ষেমেন্দ্রনাথ ঠাকুর বি, এস-সি।

৫৫ নং অপার চিৎপুর রোড্ কলিকাতা, আদি ব্রাহ্মসমাজ যন্ত্রে শ্রীরণগোপাল চক্রবর্ত্তী দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

সাল ১৩৩৩। খৃঃ ১৯২৬। সম্বৎ ১৯৮৩। কলিগতাব্দ ৫০২৭। অগ্রহায়ণ।

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার বার্ষিক মূল্য ৩৲ টাকা
ডাকমাশুল ৶০ আনা। এই সংখ্যার মূল্য ।০ আনা। } আদিব্রাহ্মসমাজের কর্ম্মাধ্যক্ষের নামে পাঠাইতে হইবে।

একমেবাদ্বিতীয়ং

একবিংশ কল্প
চতুর্থ ভাগ

অগ্রহায়ণ, ব্রাহ্মসম্বৎ ৯৭।

১০০০ সংখ্যা — ১৮৪৮ শক

তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা

"ব্রহ্ম বা একমিদমগ্র আসীন্নান্যৎ কিঞ্চনাসীত্তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রন্নিরবয়বমেকমেবাদ্বিতীয়ম্ সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয়ং সর্ব্ববিৎ সর্ব্বশক্তিমদ্ধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্যসাধনঞ্চ তদুপাসনমেব"।

সম্পাদক—

শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও ডাক্তার শ্রীবনওয়ারিলাল চৌধুরী ডি, এস্‌সি

সহঃ সম্পাদক—শ্রীক্ষেমেন্দ্রনাথ ঠাকুর বি, এস-সি।

কলিগতাব্দ ৫০২৭। সম্বৎ ১৯৮৩। খৃঃ ১৯২৬। শক ১৮৪৮। সাল ১৩৩৩।

অঞ্জলি।

(শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর)

৭৮ অঞ্জলি—ধর্ম্মপ্রবর্ত্তক দেবতা।

১। তুমি ভূলোক ও দ্যুলোক ব্যাপ্ত করিয়া রহিয়াছ। তোমার শক্তির তুলনা কোথাও নাই। তুমি ভয়ানকেরও ভয়ানক। তোমারই বলে বলীয়ান হইয়া আমরা সহজেই শত্রুদিগের পরাজয় সাধন করি। ঘরপোড়া বৃষ যেমন রক্তবর্ণ সূর্য্যের রশ্মি দেখিলেও ভয়ে ব্যাকুলচিত্ত হইয়া পড়ে, পাপদগ্ধ ব্যক্তিরাও সেইরূপ তোমার বজ্রের জ্যোতি দেখিলেই ভয়াকুল ও কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হয়।

২। অন্তরীক্ষ তোমা দ্বারাই পরিপূর্ণ হইয়া আছে। তোমারই ভয়ে সূর্য্য উত্তাপ দিতেছে, তোমারই ভয়ে বায়ু সঞ্চলিত হইতেছে এবং তোমারই ভয়ে মেঘ বারিবর্ষণ করিতেছে। তোমার মহদ্ যশ ত্রিভুবনে সর্ব্বত্র কীর্ত্তিত হইতেছে।

৩। তুমি সকল দেবতার পরম দেবতা। তুমিই সূর্য্য-চন্দ্র-গ্রহ-নক্ষত্রসমূহকে স্ব স্ব কক্ষে যথানিয়মে পরিচালিত করিতেছ। তুমিই সকল ঐশ্বর্য্যের অধিপতি। আমাদের সকল অনুষ্ঠানেই যেন তোমাকেই সর্ব্বপ্রথম আসন প্রদান করি।

৪। হিমালয়ের কন্দরে যুগে যুগে ঋষি-মুনিরা তোমারই স্তুতিগান করিয়া আসিয়াছেন। তুমিই সকলের মধ্যে বীর্য্যরূপে অবস্থিতি করিতেছ। আমরা তোমার আদেশে কর্ম্মযজ্ঞে প্রবৃত্ত হইয়াছি। এই যজ্ঞ সমাপন করিবার উপযুক্ত ধন আমাদিগকে প্রদান কর এবং আমাদিগকে সফলকাম কর।

৫। তুমি অপাপবিদ্ধ। তোমার পবিত্র স্পর্শে সকলই পরিশুদ্ধ হইয়া যায়। তোমার আদেশে আমরা ধর্ম্মযুদ্ধে অবতীর্ণ হইয়াছি। যাহাতে অধর্ম্মকে দগ্ধ করিতে পারি, সেইজন্য তুমি আমাদিগকে তোমার বজ্র নিক্ষেপ করিবার মন্ত্র শিক্ষা দাও। আমাদের মন্ত্রশক্তি শত্রুগণের প্রত্যক্ষ হইলে তাহারা আমাদের পদানত হইবে।

৬। হে শুদ্ধ বুদ্ধ মুক্তস্বভাব! তুমি শোভন-কর্ম্মা। তুমি আমাদিগকে শুভবুদ্ধি প্রদান কর, যাহাতে আমরা তোমারই মত শুভ কর্ম্মসমূহের অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হই এবং অন্যায় ও অধর্ম্মের বিনাশ সাধন করিয়া জগতের মহাসভায় শ্রেষ্ঠ আসন অধিকার করিতে পারি। তুমি আমাদের অন্তরে জ্ঞান প্রেরণ কর, যাহাতে আমরা প্রকৃতির মধ্যে বিজ্ঞান উপলব্ধি করিয়া তাহাকে জগতের হিতের জন্য প্রয়োগ করিতে পারি, এবং আত্মাতে প্রজ্ঞান উপলব্ধি করিয়া তোমার সহিত নিত্য যোগযুক্ত থাকিতে পারি।

৭। হে ঐশ্বর্য্যবান পরমেশ্বর! আমাদিগকে প্রভূত ধনৈশ্বর্য্য প্রদান কর এবং অন্তরে দান

করিবার ইচ্ছা প্রদান কর, যাহাতে আমাদের বংশে বংশপরম্পরায় দাতার সংখ্যা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। তুমি আমাদের প্রাণের সকল আশা সকল ভরসা শ্রবণ কর। আমরা জানিয়া শুনিয়া যাহা কিছু পাপ করিয়াছি তাহা হরণ কর; না জানিয়া যে সকল অজ্ঞানকৃত পাপ করিয়াছি, তাহাও তুমি হরণ কর। আমাদিগকে সকল বিষয়ে সংযম সাধন শিক্ষা দাও। আমাদিগকে অহিংসা, সত্য প্রভৃতি তোমার অমোঘ অস্ত্র দ্বারা রিপুগণকে পরাস্ত করিবার উপায় শিক্ষা দাও।

৮। তুমি অনন্ত ঐশ্বর্য্যের অধিকারী। তোমার যশ কেহই হরণ করিতে পারে না। তোমার বল ও শক্তি অপ্রতিহত। তোমার স্বাভাবিক জ্ঞান ও বলের কার্য্য দেখিয়া আমরা স্তম্ভিত হইয়া পড়ি। তুমিই কর্ম্মযজ্ঞের প্রবর্ত্তক, তুমিই ধর্ম্মপ্রবর্ত্তক।

৭৯ অঞ্জলি—মহেশ্বর দেবতা।

১। প্রিয়জন যেমন প্রিয়জনের সহিত মিলিত হইবার জন্য ছুটিয়া যায়, সেইরূপ হে প্রেমস্বরূপ! তুমি আমাদের আহ্বান শুনিবামাত্র আমাদের প্রীতি-অর্ঘ্য গ্রহণের জন্য এখানে আসিয়াছ। তুমি মহৎ হইতেও মহত্তর। তোমারই শাসনে প্রকৃতির সকল কার্য্যই সংঘটিত হইতেছে। হে জ্যোতির্ম্ময়! তোমারই জ্ঞানজ্যোতি লাভ করিয়া আমরা দেবত্বের অভিমুখে চলিয়াছি।

২। দিকে দিকে নরনারীগণ তোমারই স্তুতিগান করিতেছে এবং তোমারই অন্বেষণে আকুলচিত্তে ঘুরিতেছে ফিরিতেছে। তুমি আমাদের পালক ও সংসারযজ্ঞের প্রবর্ত্তক। হে চিরন্তন সখা! তুমি আমাদিগকে বল দাও, বীর্য্য দাও, যাহাতে আমরা তোমার প্রবর্ত্তিত সংসারযজ্ঞে জীবনের শেষ পর্য্যন্ত ইন্ধন যোগাইতে পারি।

৩। তুমি মন হইতেও বেগবান পরম পুরুষ। আমরা ক্ষুদ্র কীট, তুমি অনাদি মহান। তুমি শুদ্ধ অপাপবিদ্ধ। তোমার প্রতি যাহারা অশ্রদ্ধাবান, তাহাদের নিকটে তুমি রুদ্রমূর্ত্তিতে প্রকাশিত হও। সংশয়াত্মাদিগের অন্তরের লৌহকবাট ভাঙ্গিয়া তুমি তোমার জ্ঞানে প্রেমে তাহা পূর্ণ কর।

৪। সূর্য্য যেরূপ ঊষাকে জাগাইয়া তুলে, দীপ্ত সূর্য্য তুমিও সেইরূপ আমাদিগের অন্তরে জাগরণ আনয়ন কর, এবং রিপুগণের হস্ত হইতে রক্ষার উপায়স্বরূপে আমাদিগকে শতবিধ কর্ম্মে প্রবৃত্ত কর। তোমার জ্যোতির সম্মুখে হৃদয়ের অন্ধকার দূরে পলায়ন করে। তোমার বজ্রাগ্নি দ্বারা আমাদের সকল পাপ সকল তাপ ভস্মীভূত হইয়া যাক্।

৫। হে রক্ষকের রক্ষক! সকল ভয়ের মধ্যে, সকল বিপদের মধ্যে তোমারই প্রেম বর্ম্মরূপে আমাদিগের প্রাণে সংলগ্ন থাকিয়া আমাদিগকে সর্ব্বদাই রক্ষা করিতেছে। তুমি আমাদিগের একমাত্র দুর্গ। তুমি আমাদিগকে তোমার অভয়-ক্রোড়ে রক্ষা কর এবং শত্রুগণের হিংসা ও আক্রমণ পরাহত কর। তোমার প্রেমধারায় আমাদিগকে অভিষিক্ত কর।

৬। তুমি মহেশ্বর। তুমি পুরুষ মহান। তোমারই শাসনে মেঘ বারি বর্ষণ করিতেছে। তোমারই শাসনে অত্যুচ্চ পর্ব্বত হইতে নির্ঝরিণী নিঃসৃত হইয়া ধরণীকে শস্যশ্যামল করিতেছে। তোমারই প্রেমের সুকোমল ধারা আমাদের কঠোর পাষাণ হৃদয়ও নিত্যই বিগলিত করিতেছে।

৮০ অঞ্জলি—শক্তিসাগর দেবতা।

১। আমরা যাহা কিছু সুখ সম্পদ সম্ভোগ করিতেছি, এ সকলই তোমারই দান। তুমি মহান। এই প্রকৃতি তোমারই অতুল ঐশ্বর্য্য তোমারই অমোঘ শক্তি ব্যক্ত করিতেছে। এই আকাশও তোমাকে পূর্ণরূপে ধারণ করিতে পারে না। আমরা তোমাকে ভজনা করি।

২। নদীর বন্যার মত তোমার শক্তি যখন আমাদের অন্তরে নামিয়া আসে, তখন যাহারা সেই শক্তি ধারণ করিবার জন্য পূর্ব্ব হইতে প্রস্তুত থাকে, তাহারাই উহা নিজ বক্ষে ধারণ করিয়া নিজেদের আত্মাকে জ্ঞানে ধর্ম্মে ও প্রীতিতে সমুন্নত করিয়া তোলে। ভক্তগণই জানে যে, তুমি, তাহাদের অন্তরে কিপ্রকার আশ্চর্য্য বল বিধান কর।

৩। হে পরম ঈশ্বর! এই ব্রহ্মচক্রে তোমারই উদ্দেশে দিবানিশি যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হইতেছে। আলস্য বশতঃ যে সকল দুর্ম্মতি কর্ম্মযজ্ঞের অনুষ্ঠানে বিরত

থাকে, তাহারা তোমারই মঙ্গল বিধানে ক্ষয়প্রাপ্ত হয়। আমাদের পরিবারে কেহ যেন কর্ম্মযজ্ঞের অনুষ্ঠানে বিরত না হয়। আমরা সকলেই যেন কৃতী হই এবং আমাদের বংশে কেহই যেন অন্নসংস্থানে বঞ্চিত না হয়। জগতসংসার তোমাতেই বিধৃত হইয়া স্থিতি করিতেছে। তুমি এক হইয়াও শত-সহস্র নামে জগতের সর্ব্বত্র বিঘোষিত হইতেছ। তোমারই জ্যোতি আমাদের অন্তরে জ্ঞান, ইচ্ছা ও প্রেমের আকারে প্রস্ফুরিত হইতেছে।

৪। হে মহেশ! তোমার ঐশ্বর্য্যের সীমা কে নির্দ্দেশ করিবে? তোমার মহিমা কীর্ত্তন করিতে গিয়া বাক্য প্রতিনিবৃত্ত হয়। আমরা তোমারই সন্তান। তোমার স্তুতিগানে প্রবৃত্ত হইয়া অজ্ঞান-প্রযুক্ত যদি আমরা কোনরূপে তোমাকে ছোট করি, তবে তুমি আমাদের সে অপরাধ ক্ষমা করিও। তুমি আমাদের পিতামাতা; তুমি আমা-দের সখা-সুহৃৎ। আমরা একমাত্র তোমারই চরণে হৃদয়ের প্রীতিভক্তি নিবেদন করিতেছি, তুমি তাহা জননীর স্নেহহস্তে গ্রহণ কর।

৫। হে বিষ্ণু! তোমার তেজ সমগ্র ব্রহ্মচক্র ব্যাপ্ত করিয়া রহিয়াছে। তুমি আমাদের পিতা-মাতা। আমরা তোমারই সন্তান। তুমি আমাদের শুভ ইচ্ছাসকল সফল কর। সুবিশাল এই আকা-শও তোমার সমগ্র তেজ ধারণ করিতে পারে না। এই ধরিত্রীও তোমার সমগ্র বীর্য্য ধারণে অক্ষম। অনন্ত উন্নতিশীল এই মানবাত্মাও তোমাকে ধারণা করিতে গিয়া প্রতিনিবৃত্ত হয় এবং তোমার চরণে মস্তক অবনত করে।

৬। হে রুদ্র! অশ্রদ্ধাবান ও সংশয়াত্মা-দিগের হৃদয়ের লৌহকবাট একমাত্র তোমারই বজ্র বিদীর্ণ করিতে পারে। সেই লৌহকবাট বিদীর্ণ হইলে তোমার প্রেম উচ্ছ্বসিত নদীর বন্যার মত ছুটিয়া আসিয়া তাহাদের হৃদয় ডুবাইয়া দিয়া শ্যামল করিয়া দেয়। তোমাকে আমরা নমস্কার করি।

আদিশূরের পুত্রেষ্টি যজ্ঞ সম্বন্ধে কয়েকটী কথা।

(শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর)

১০০। পঞ্চব্রাহ্মণ কোথায় আসেন?

পঞ্চব্রাহ্মণ কোথায় আসিয়া পুত্রেষ্টি যজ্ঞ করিয়াছিলেন, সে বিষয়ে আমরা বিস্তৃত আলো-চনা করা আবশ্যক মনে করি না। কিন্তু এ সম্বন্ধে যাহা কিছু তথ্যের সন্ধান পাইয়াছি, তাহা কৌতূহল-প্রদ বলিয়া এখানে সংক্ষেপে উল্লেখ করিতে ইচ্ছা করি। ক্ষিতীশবংশাবলীচরিতং গ্রন্থে আছে— রাজা আদিশূর পঞ্চব্রাহ্মণকে পূর্ব্বাবধি নির্দ্দিষ্ট স্থানে রাখিয়াছিলেন (১)। এই নির্দ্দিষ্ট স্থান যে কোথায়, তাহা এ পর্য্যন্ত নির্ভুলরূপে স্থিরীকৃত হয় নাই। বলা বাহুল্য যে, আদিশূর তাঁহার গৌড় রাজ্যের ভিতরেই কোন স্থান তাঁহাদের বাসের জন্য নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিয়াছিলেন। বারেন্দ্রকুলপঞ্জীতে আছে—পঞ্চব্রাহ্মণ কান্যকুব্জ হইতে "গঙ্গাবিধৌত মনোজ্ঞ গৌড়ে গমন করেন" (২)। বচনটীর মূল পড়িলেই বুঝা যায় যে, কারিকাকার এখানে গৌড় নগরের পরিবর্ত্তে গৌড় রাজ্যেরই উল্লেখ করিয়া-ছেন। জনশ্রুতি এই যে, রামপাল নগরীতেই পঞ্চব্রাহ্মণ সর্ব্বপ্রথম আসিয়া বিশ্রাম করেন (৩)। "রামপাল নগরী একসময়ে বুড়ীগঙ্গার নিকটবর্ত্তী ছিল। এখন যেমন বড়গঙ্গা গৌড় হইতে সুদূরে রাজমহলের পশ্চিম দিয়া প্রবাহিত, পদ্মা ও বুড়ী-গঙ্গাও তদ্রূপ কালমাহাত্ম্যে রামপাল হইতে দূরে সরিয়া পড়িয়াছে, কিন্তু পূর্ব্বে রামপাল নিশ্চয়ই পদ্মা (বড়গঙ্গা) বা বুড়ীগঙ্গার তীরবর্ত্তী ছিল" (৪)। সম্বন্ধনির্ণয়কারেরও মতে পঞ্চব্রাহ্মণ বিক্রমপুরের রাজধানী রামপাল নগরেই আসিয়াছিলেন (৫)। আদিশূরের সময়ে রামপাল যে তাঁহার রাজধানী ছিল, তাহা আমরা লঘুভারতে দেখিতে পাই (৬)।

---

(১) ক্ষি° ব° ২পৃঃ।

(২) ব° মো° ৩২০পৃঃ—

হুতবহশমভাসা ব্রাহ্মণাঃ কান্যকুব্জাৎ।
সুরসরিদবধৌতং যান্তি গৌড়ং মনোজ্ঞং॥ ঐ, চি, ৮৪পৃঃ

(৩) ব° মো° ৩২৮—২৯পৃঃ।

(৪) ব° মো° ৩৩০পৃঃ।

(৫) স নি° ১৫পৃঃ.

(৬) আস্তে যৎসন্নিধৌ কন্যো রামপালেতি বিশ্রুতা।

১০১। মল্লকাষ্ঠের আখ্যায়িকা।

যাঁহাদের মতে পঞ্চব্রাহ্মণ সর্ব্বপ্রথম রামপালে আসিয়াছিলেন, তাঁহারা নিজমত সমর্থনে একটী আখ্যায়িকা উল্লেখ করেন। ব্রাহ্মণেরা "চরণে চর্ম্মপাদুকা, সর্ব্বাঙ্গ সূচিবিদ্ধ বস্ত্রে আবৃত, এইরূপ বেশে তাম্বূল চর্ব্বণ করিতে করিতে রাজবাটীর দ্বারদেশে উপস্থিত হইয়া দ্বারবানকে কহিলেন, ত্বরায় রাজার নিকট আগমনসংবাদ দাও। * * রাজা অবিলম্বেই তাঁহাদিগের সম্বর্দ্ধনা করিবেন, ইহা স্থির করিয়া ব্রাহ্মণেরা তাঁহাকে আশীর্ব্বাদ করিবার নিমিত্ত জলগণ্ডূষহস্তে দণ্ডায়মান হইলেন। এদিকে রাজা তাঁহাদের বেশের বর্ণনা শুনিয়া তাঁহাদের সঙ্গে দেখা করিতে আসিলেন না। তখন ব্রাহ্মণেরা করস্থিত আশীর্ব্বাদবারি নিকটস্থ এক মল্লকাষ্ঠে নিক্ষেপ করিলেন। চিরশুষ্ক মল্লকাষ্ঠ সঞ্জীবিত, পল্লবিত ও ফলফুলে সুশোভিত হইয়া উঠিল। * * * বিক্রমপুরের লোকে বলেন, বল্লালসেনের বাটীর দক্ষিণে যে দীঘি আছে, তাহার উত্তর পাড়ে পাকা ঘাটের উপর ঐ বৃক্ষ অদ্যাপি সজীব আছে। বৃক্ষ অতি বৃহৎ, নাম গজারি বৃক্ষ। এতজ্জাতীয় বৃক্ষ বিক্রমপুরে আর কোথাও নাই" (৭)। বারেন্দ্রপঞ্জী এবং দেবীবরও এই আখ্যায়িকা সমর্থন করেন (৮)। বাচস্পতিমিশ্র তাঁহার কুলরামেও এই আখ্যায়িকা সম্পূর্ণ সমর্থন করেন (৯)। এই গজারি বৃক্ষ সম্বন্ধে "আদিশূর ও বল্লালসেন" রচয়িতা পার্ব্বতীশঙ্করবাবু বলেন—"বিক্রমপুরান্তর্গত মেঘনানদীর পূর্ব্ব উপকূলে রামপাল নামক স্থানে প্রায় দুই মাইল দীর্ঘ এক প্রকাণ্ড খাত বিদ্যমান আছে। এই সরোবরের নাম রামপাল দীঘি এবং এই নদী হইতে উক্ত স্থানের নাম রামপাল হইয়াছে। সরোবরের অনতিদূরে পরিখাবেষ্টিত কতিপয় পুরাতন অট্টালিকার ভগ্নাবশেষ দেখিতে পাওয়া যায়, তন্নিকটবর্ত্তী গ্রামসকলের অধিবাসীগণ এই ভগ্ন অট্টালিকা বল্লালের রাজপ্রাসাদ বলিয়া পরিচয় দেয়। পরিখার স্থানে স্থানে নষ্ট হইয়া গিয়াছে, কিন্তু বেষ্টিত ভূমিখণ্ডের বিস্তৃতি এবং বাহ্যাবয়ব দৃষ্টে স্পষ্ট প্রতীত হয় যে, এই স্থান এক অতি প্রবল পরাক্রান্ত ও ধনশালী রাজার রাজধানী ছিল। ভগ্নপ্রাসাদের পুরদ্বারে একটী প্রাচীন গজাড়ী বৃক্ষ বিদ্যমান আছে। সকলেই এই গজাড়ী বৃক্ষটীকে আদিশূরানীত পঞ্চ ব্রাহ্মণপ্রদত্ত আশীর্ব্বাদে জীবিত মল্লকাষ্ঠ বলিয়া নির্দ্দেশ করে" (১০)। এই আখ্যায়িকার ভিতর কোন্ ঐতিহাসিক সত্যের কতটুকু নিহিত আছে, তাহা বর্ত্তমানে বাহির করা অত্যন্ত দুরূহ। তবে এইটুকু মনে হয় যে, রামপালে পঞ্চব্রাহ্মণের আগমনসংক্রান্ত কোন একটা বিশেষ ঘটনা ঘটিয়াছিল। "রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণদিগের আদিবংশ" লেখক ৺শ্রীনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় বলেন যে, "পালবংশীয় রাজাদিগের রাজত্বকালে গৌড়ের রাজধানী বগুড়ার নিকটবর্ত্তী স্থানে ছিল, শূরবংশীয় রাজাদিগের রাজধানী দিনাজপুরের অন্তর্গত মালাদহের (মালদহ) নিকটবর্ত্তী স্থানে কালিন্দী নদী ও মহানন্দা সংযোগে অবস্থিত ছিল; বল্লালসেনের রাজধানী বিক্রমপুরে ছিল; এবং লক্ষ্মণসেনের রাজধানী নবদ্বীপে ছিল (১১)। ইহার সমর্থনে তিনি কোন প্রমাণ প্রদর্শন করেন নাই।

১০২। হোম কোথায় অনুষ্ঠিত হয়?

আমাদের অনুমান হয় যে, পঞ্চব্রাহ্মণ সর্ব্বপ্রথম রামপালে উপস্থিত হইলেও সেখানে কোন যজ্ঞ, অন্তত পুত্রেষ্টিযজ্ঞ সম্পাদন করেন নাই। পুত্রেষ্টিযজ্ঞ সম্ভবত গৌড়ের রাজধানী পৌণ্ড্রবর্দ্ধন নগরে অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। নগেনবাবু বলেন, "আদিশূর যে সময়ে গৌড়ের অধীশ্বর, পৌণ্ড্রবর্দ্ধন নগরে তৎকালে রাজধানী ছিল" (১২)। আদিশূর-

---

নগর্য্যাং পালিতা পূর্ব্বে আদিশূরস্য ভূপতেঃ।
ল° ভা° ২য় খণ্ড ১২৭—২৮পৃঃ, গৌ° ব্রা° ২৬২পৃঃ,
ব° যো° ৩২৮ পৃঃ।

(৭) ক্ষি° ব° ২—৩পৃঃ। ৺ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর কৃত বহুবিবাহ বিষয়ক প্রস্তাব—ব° যো° ৩৩০—৩৩১পৃঃ।

(৮) ইত্যুক্ত্বা তে দ্বিজাঃ সর্ব্বে ব্রহ্মধ্যানপরায়ণাঃ।
দ্বাপয়ামাহুরর্ঘ্যং তৎ শুষ্ককাষ্ঠস্য মস্তকে।
দুর্ব্বাতণ্ডুলপুষ্পাদিনির্ম্মিতং জলসংযুতং।
তদর্ঘ্যং মস্তকে ধৃত্বা শুষ্ককাষ্ঠক জীবিতং। বা° প°
অদ্রষ্টা জায়তে রাজ ইতি জাথা দ্বিজোত্তমৈঃ।
আশীর্ব্বাদার্থ নির্ম্মাল্যং মল্লকাষ্ঠোপরি ধৃতং।
তদা কাষ্ঠং সজীবং স্যাৎ ফলপল্লবসংযুতং।
দেবীবর—ব° যো° ৩৩১পৃঃ।

(৯) ব্রা° কা° ১০৬পৃঃ।

(১০) ব্রা° কা° ১৩৫পৃঃ।
(১১) রা° ব্রা° ৪পৃঃ।
(১২) ব্রা° কা° ১০৭—৯পৃঃ।

পুত্র ভূশূরের ধর্ম্মপাল কর্ত্তৃক পৌণ্ড্রবর্দ্ধন হইতে বিতাড়িত হইবার কথা কুলগ্রন্থে উল্লিখিত হইবার কারণে আমাদের অনুমান হয় যে, গৌড়জয়ের পর অবধি রাজকার্য্য পরিচালনার জন্য পৌণ্ড্রবর্দ্ধনই রাজধানী নির্দ্ধারিত হইয়াছিল, এবং রামপাল পৈতৃক রাজধানী ছিল। এই পৌণ্ড্রবর্দ্ধনের "এক ক্রোশ উত্তরপূর্ব্বে 'হোমদীঘী' বা 'হোমাংদীঘী'নামে এক প্রাচীন স্থান আছে, কেহ কেহ মনে করেন, এখানে আদিশূরানীত পঞ্চব্রাহ্মণ হোম করিতেন" (১৩)।

১০৩। পৌণ্ড্রবর্দ্ধন কোথায়?

পৌণ্ড্রবর্দ্ধন নগর কোথায় অবস্থিত ছিল, তদ্বিষয়ে নানা মতভেদ আছে। শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় এ বিষয়ে বিশেষ আলোচনা করিয়া বলেন—"গৌড়নামক বিস্তীর্ণ ভূভাগের রাজধানী পৌণ্ড্রবর্দ্ধন। কথাসরিৎসাগর পাঠে কতকটা বুঝা যায়, পৌণ্ড্রনগরী কিছু দূরে অবস্থিত ছিল। চীন-পরিব্রাজক হিউ-এন-সিয়াং এই নগরে আসিয়াছিলেন, অনেক নৌ-কার্য্যালয় দেখিয়াছিলেন। তিনি গঙ্গা উত্তীর্ণ হইয়া পৌণ্ড্রবর্দ্ধন রাজ্যে প্রবেশ করেন। * * * প্রসিদ্ধ মালদহ নগরের দুই ক্রোশের উত্তর পূর্ব্বে ও গৌড় নগর হইতে ৮ক্রোশ উত্তরে ফিরোজাবাদ নামে এক অতি প্রাচীন স্থান আছে। স্থানীয় লোকেরা এই স্থানকে 'পাঁড়োবা' বা 'পুঁড়োবা' (বড় পুঁড়ো) নামে অভিহিত করে। এই স্থানের এক ক্রোশ উত্তর-পশ্চিমে ও মালদহের আড়াই ক্রোশ উত্তরে 'বার-দোয়ারী পুঁড়োবার' ভগ্নাবশেষ বিদ্যমান। পাঁড়োবা অথবা পুঁড়োবা শব্দ পৌণ্ড্রবর্দ্ধন অথবা পুণ্ড্রবর্দ্ধন শব্দেরই অপভ্রংশ বলিয়া আমাদের বিশ্বাস। স্থানীয় লোকেরাও বলিয়া থাকেন যে, এখানে বহুকাল গৌড়ের রাজগণ আধিপত্য করিয়া গিয়াছেন। প্রাচীন হিন্দু কীর্ত্তির ধ্বংসাবশেষ, বহুতর ভাস্কর ও শিল্পসমাযুক্ত ভগ্ন মন্দিরাদির নিদর্শন, এবং বহুসংখ্যক কূপতড়াগাদির প্রাচীন গর্ত্ত এখানকার হিন্দুরাজত্বের অতীত কীর্ত্তি বিশেষরূপে ঘোষণা করিতেছে। এই ধ্বংসাবশেষ পুঁড়োবার 'বারদোয়ারী' হইতে দক্ষিণপশ্চিমে গঙ্গাতট পর্য্যন্ত প্রায় ১২ ক্রোশের অধিক স্থান জুড়িয়া আছে। * * * এই স্থান এখনকার গঙ্গাস্রোত হইতে প্রায় ৭।৮ ক্রোশ দূরে অবস্থিত। কিন্তু এখনকার নদীর অবস্থা যেরূপ দেখিতেছি, পূর্ব্বে এরূপ ছিল না। বর্ত্তমান মালদহ সহরের পরপারে যে কালিন্দী নদী বহিতেছে, এক সময়ে ভাগীরথী এই অঞ্চল দিয়া প্রবাহিত হইত। মালদহের দুই ক্রোশ পশ্চিমে ভাগীরথীপুর নামে একখানি গণ্ডগ্রাম রহিয়াছে। তাহারই কিছু দূরে ভাগীরথীনামে এক ক্ষুদ্র স্রোতস্বতী দক্ষিণাভিমুখে প্রবাহিত হইয়া বুড়াগঙ্গায় মিলিত হইয়াছে। অনেকের বিশ্বাস, পূর্ব্বকালে এই ভাগীরথী দিয়াই গঙ্গার মূলস্রোত বহিত ও মালদার পার্শ্বে প্রবাহিত মহানন্দার অদূরে কালিন্দীর সহিত মিলিত ছিল। সুতরাং বহুজনাকীর্ণ বিখ্যাত পৌণ্ড্র-বর্দ্ধন নগর গঙ্গার অনতিদূরে ও মহানন্দার তট হইতে বর্ত্তমান 'বারদোয়ারী' পর্য্যন্ত সুবিস্তৃত ছিল, তাহা অসম্ভব নহে (১৩)।

১০৪। যজ্ঞান্তে দক্ষিণাপ্রাপ্ত পঞ্চগ্রাম।

প্রসিদ্ধি আছে, আদিশূর যজ্ঞসমাপনান্তে দক্ষিণাস্বরূপে পঞ্চব্রাহ্মণকে পাঁচখানি গ্রাম প্রদান করেন (১৪)। সেই পাঁচখানি গ্রাম কি কি, এবং সেগুলি কোথায় অবস্থিত, তদ্বিষয়ে মতভেদ আছে। হরিমিশ্র প্রভৃতি কুলাচার্য্যের মতে পঞ্চব্রাহ্মণ গৌড়ে আসিলে গৌড়াধিপ পাদ্য অর্ঘ্য দিয়া তাঁহাদিগকে যথারীতি পূজা করিয়া বসবাসের জন্য পাঁচখানি "শাসন" গ্রাম দিয়াছিলেন (১৫)। সম্বন্ধ-নির্ণয়কার বলেন—ভট্টনারায়ণ পাইয়াছিলেন পঞ্চকোটি, দক্ষ পাইলেন কামকোটি, ছান্দড় পাইলেন হরিকোটি, শ্রীহর্ষ কঙ্কগ্রাম এবং বেদগর্ভ বটগ্রাম (১৬)। এই কয়টি গ্রাম যে আদিশূর বাছিয়া বাছিয়া ইঁহাকে উঁহাকে দিয়াছিলেন তাহা মনে হয় না। সম্ভবত আদিশূর যজ্ঞান্তে পঞ্চব্রাহ্মণকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন; পাঁচজনের নিকট শুনিয়া তাঁহাদের মধ্যে যিনি যে গ্রাম নির্ব্বাচন করিয়াছিলেন, তাঁহাকে সেই গ্রামই দেওয়া হইয়া-

(১৩) ব্রা০ কা০ ১০৩পৃঃ।

(১৪) Tagore Family পৃঃ ৬।

(১৫) ব্রা০ কা০ ১৩০পৃ।

(১৬) পঞ্চকোটিঃ কামকোটির্হরিকোটিস্তথৈব চ।
কঙ্কগ্রামো বটগ্রামস্তেষাং স্থানানি পঞ্চ চ। স০ নি০ ১১পৃঃ

ছিল (১৭)। ক্ষিতীশবংশাবলীচরিতং গ্রন্থে আছে, যজ্ঞান্তে আদিশূর পঞ্চব্রাহ্মণকে বহুসৌধশোভিত-পুরপঞ্চকে বাস করাইয়াছিলেন (১৮)। মনে হয়, এথানে ঐ দক্ষিণাস্বরূপে প্রদত্ত পঞ্চগ্রামই উদ্দিষ্ট হইয়াছে।

১০৫। পঞ্চগ্রামের অবস্থান।

নগেনবাবু বহু অনুসন্ধান করিয়া কামটি বা কামকোটি গ্রাম ব্যতীত অপর চারিটী গ্রামের অবস্থান যাহা নির্দ্দিষ্ট করিয়াছেন, তাহা নিম্নে উদ্ধৃত হইল (১৯)—

(ক) ব্রহ্মপুরী।—ব্রহ্মপুরীর বর্ত্তমান নাম ব্রহ্মপুর। ইহা মালদহ হইতে ৫ ক্রোশ দক্ষিণপশ্চিমে ও ভাগীরথীর ১ ক্রোশ পশ্চিমে অবস্থিত। (অক্ষা০ ২৪°৫৩´৫৫´´ উঃ ও দ্রাঘি' ৮৮°৮´৩৫´´ পূঃ)।

(খ) হরিকোটি।—হরিকোটির বর্ত্তমান নাম হরিপুর। ইহা ভাগীরথীপুরের অর্দ্ধক্রোশ উত্তরপশ্চিমে ও কালিন্দী নদীর দক্ষিণে বিদ্যমান (অক্ষা০ ২৫°৩´ উঃ ও দ্রাঘি' ৮৮°৬´৪৫´´ পূঃ)।

(গ) কঙ্কগ্রাম।—কঙ্কগ্রামের বর্ত্তমান নাম কাঁকড়ী। এখন মুর্শিদাবাদ জেলায় ও গঙ্গার দেড় ক্রোশ দক্ষিণে অবস্থিত (অক্ষাং ২৪° ৩৮´ ৪৫´´ উঃ ও দ্রাঘি' ৮৮° ২´ পূঃ)।

(ঘ) বটগ্রাম।—বটগ্রামের বর্ত্তমান নাম বটরিয়া বা বটোড়ি। মালদহ জেলায় গঙ্গার তটে অবস্থিত (অক্ষা' ২৪° ৪৬´ ৪৫´´ উঃ ও দ্রাঘি' ৮৮° ১৩´৫০´´ পূঃ)।

মুলো পঞ্চাননের গোষ্ঠীকথায় আমরা এ সম্বন্ধে পাই—হরিকোটি (মেদিনীপুর) কংসাবতী নদীর তীরবর্ত্তী; পঞ্চকোটির সীমা মল্ল, বরাহ, শিখর, সিংহ-ভীরভূম প্রভৃতি মালক্ষেত্রের (মালভূমের) নগর; কামকোটি হইল নিশ্চিত বীরভূম; কঙ্কগ্রাম হইল "বাণকুণ্ডা, গঙ্গা হইতে দূর"; এবং বটগ্রাম বর্দ্ধমানে (২০)।

এই চারি গ্রামেরও আর পূর্ব্বতন সমৃদ্ধির কিছুই নাই; সগুবাক নারিকেলাদিশোভিত (তাম্রশাসন বর্ণিত) ব্রাহ্মণ-শাসনগ্রামের এখনও কতক কতক নিদর্শন রহিয়াছে। যাঁহারা উড়িষ্যার ব্রাহ্মণ-শাসনগ্রামসমূহ দর্শন করিয়াছেন, তাঁহারা অনায়াসে উক্ত চতুর্গ্রামের প্রাচীন নিদর্শন কতকটা বুঝিতে পারিবেন। (২১)।

১০৬। যজ্ঞান্তে স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন?

একটী প্রবাদ আছে যে, পুত্রেষ্টি যজ্ঞ যাঁহারা করিয়াছিলেন, তাঁহারা যজ্ঞসমাপনান্তে স্বদেশে প্রত্যাগমন করিয়াছিলেন। সেখানে অনাদৃত হইয়া গৌড়ে ফিরিয়া আসেন। কুলতত্ত্বার্ণব বলেন যে, ক্ষিতীশ প্রভৃতি পঞ্চব্রাহ্মণ যজ্ঞসমাপনান্তে স্বদেশে ফিরিয়া গেলেন; কিন্তু বঙ্গদেশে যাওয়া এবং অজ্ঞাত জনের যাজকতার জন্য জ্ঞাতিগণ তাঁহাদিগকে প্রায়শ্চিত্ত করিতে অনুরোধ করিলেন। তাঁহারা রাজা বীরসিংহকে সেই বিষয় জানাইলে, বীরসিংহ জ্ঞাতিবর্গকে নানাপ্রকারে বুঝাইলেও তাঁহারা সেই পঞ্চব্রাহ্মণকে বিনা প্রায়শ্চিত্তে কিছুতেই তাঁহাদিগকে পুনর্গ্রহণে সম্মত হইলেন না। তখন তাঁহারা পুত্রকলত্র ও ভৃত্যগণের সহিত বঙ্গদেশে ফিরিয়া আসিলেন। তাঁহারা আদিশূরের নিকট সমস্ত বিবরণ বলিলে আদিশূর তাঁহাদিগকে গঙ্গার তীরবর্ত্তী পঞ্চগ্রাম দান করেন (২২)।

---

(১৭) পূর্ব্বভূপ আদিশূর আনে পঞ্চজন।
দেন তিনি পঞ্চগ্রাম যার যাতে মন॥ ৫
হরিকোটি পঞ্চকোটি কামকোটি তিন।
কঙ্কগ্রাম, বটগ্রাম, সবে পায় চিন॥ ৬
হরিকোটি চান্দড়ে পঞ্চকোটি যে তটে।
কামকোটি দক্ষে কঙ্কগ্রাম হর্ষে অটে॥ ৭
বেদগর্ভে বটগ্রাম রাজা দিল বাসে॥ ৮
গোষ্ঠীকথা—স০ নি০ ৫৫৯পৃঃ।

(১৮) ক্ষি০ ব০ ৫পৃঃ।

(১৯) ব্রা০ কা০ ১১১পৃঃ।

(২০) গোষ্ঠীকথা—স০ নি০ ৫৫৯পৃঃ।

(২১) ব্রা০ কা০ ১১১—১১২পৃঃ।

(২২) এবং সমাপ্য যজ্ঞন্তমাদিশূরস্য ভূপতেঃ।
জগ্মুঃ স্বদেশং তূর্ণন্তে বিপ্রা বেদবিশারদাঃ॥ ৭০
গতেষু নিজদেশেষু স্বদেশস্থা দ্বিজাতয়ঃ।
উচুস্তান্ ব্যবহার্য্যা বৈ নাস্মাভির্দ্বিজসত্তমাঃ॥ ৭১
বঙ্গদেশে চ গমনাদজ্ঞাতজনযাজনাৎ।
যূয়ং পাতিত্যমাপন্না ন সংগ্রাহ্যা দ্বিজাতিভিঃ॥ ৭২
অস্মাকং গ্রহণীয়াশ্চেৎ যূয়ং ভবিতুমিচ্ছথ।
প্রায়শ্চিত্তঞ্চ কুরুত পুনঃ সংস্কাররূপকং॥ ৭৩
ইতি শ্রুত্বা গিরো বিপ্রা বীরসিংহান্তিকং তদা।
গত্বা সমস্তবৃত্তান্তং কথয়ামাসুরাশু তে॥ ৭৪
ততো রাজা সমাহূয় ব্রাহ্মণান্ প্রাহ বিস্তরং।
প্রায়শ্চিত্তং বিনা কোঽপি স্বীকারং ন চকার হ॥ ৭৫
ততস্তে ব্রাহ্মণাঃ পঞ্চ ভার্য্যাপুত্রাদিভিঃ সহ।
সরক্ষকাঃ কান্যকুব্জাৎ বঙ্গদেশং পুনর্যযুঃ॥ ৭৬
সর্ব্বং বিজ্ঞাপয়াঞ্চক্রুরাদিশূরনৃপান্তিকে।
তেষাং বচনমাকর্ণ্য রাজা হর্ষমুপাগতঃ॥ ৭৭

কিন্তু কুলতত্ত্বার্ণবের মতে ক্ষিতীশ প্রভৃতি স্বদেশ হইতে ফিরিয়া আসিবার পরই ঐ পঞ্চকোটি (বা ব্রহ্মপুরী) প্রভৃতি পঞ্চগ্রাম পাইয়াছিলেন। সম্ভবত পঞ্চকোটির অপর নাম ছিল ব্রহ্মপুরী, অথবা ভট্টনারায়ণ পঞ্চকোটি গ্রাম প্রাপ্ত হইয়া তাহার নাম পরিবর্ত্তিত করিয়া ব্রহ্মপুরী রাখিয়াছিলেন। প্রেমবিলাস গ্রন্থে কুলতত্ত্বার্ণবের মতই সমর্থিত হইয়াছে দেখি (২৩)। প্রেমবিলাস গ্রন্থে কিন্তু এই সঙ্গে উক্ত হইয়াছে যে, ক্ষিতীশ প্রভৃতির সঙ্গে প্রথমে ভট্টনারায়ণ, সুসেন, ধরাধর, গৌতম এবং পরাশর আসিয়াছিলেন। কিছুদিন পরে দামোদর, দক্ষ, ছান্দড়, শ্রীহর্ষ ও বেদগর্ভ আসিলেন (২৪)। আমাদের মতে কুলতত্ত্বার্ণব বা প্রেমবিলাসে উক্ত পঞ্চব্রাহ্মণের জাতিচ্যুতির আখ্যায়িকা যুক্তিসহ নহে।

১০৭। জাতিচ্যুতির আখ্যায়িকা যুক্তিসহ নহে।

আদিশূরকে নীচ ক্ষত্রিয় বা অজ্ঞাতজন বলিয়া বলা হইয়াছে; ইহাতেই অনুমান হয়, কোনও অজ্ঞাত কারণে, সম্ভবত বৈদ্যজাতিকে সম্মানে একটু লঘু করিবার জন্যই, আদিশূরকাহিনীতে পঞ্চব্রাহ্মণের আগমনসূত্রে এই আখ্যায়িকার সমাবেশ করা হইয়াছে। কুলগ্রন্থমতেই তো দেখা যায় যে, পুত্রেষ্টিযজ্ঞের জন্য দ্বিতীয়বার আদিশূর পঞ্চব্রাহ্মণ আনেন। আর, আদিশূর তো বীরসিংহের জামাতা ছিলেন এবং বঙ্গের অধিপতি ছিলেন। যদি কোনও গোলযোগ হইয়াই ছিল, তাহা প্রথমবারে হইবার কথা। আর প্রথমবারে যদি-বা তাহা হইয়াই থাকে, তবে বীরসিংহ এত বড় মূর্খ ছিলেন না যে, নিজে অপমানিত হইবার জন্য পুনরায় পঞ্চব্রাহ্মণ বঙ্গে পাঠাইতে স্বীকার করিবেন। হইলেও হইতে পারে যে, সম্ভত দশম শতাব্দীর মাঝামাঝি ক্ষিতীশ প্রভৃতি যজ্ঞসম্পাদন করিয়া যখন দেশে ফিরিয়া যান, তখন জ্ঞাতিবিরোধের কারণে এবং আদিশূরের নিকট তাঁহাদের "প্রাপ্তি" দেখিয়া জ্ঞাতিরা তাঁহাদিগকে স্বদেশে "কোণঠেসা" করিয়াছিলেন, কিন্তু বীরসিংহ নিশ্চয়ই তাহা মিটাইয়া দিয়াছিলেন, অথবা কোন উপায়ে তাহা চাপা পড়িয়াছিল। সম্ভবত সেই ঘটনাটী কোন কারণে পুত্রেষ্টি যজ্ঞের সঙ্গে লাগাইয়া দেওয়া হইয়াছে। প্রেমবিলাসের উক্তি আমরা স্বীকার করিতে পারি না, আরও এই কারণে যে, সমস্ত কুলগ্রন্থে প্রেমবিলাসের বিপরীতে একবাক্যে ভট্টনারায়ণ, দক্ষ প্রভৃতি পঞ্চ ব্রাহ্মণের একত্র গৌড়ে আগমন বলা আছে। আমরা অনুমান করি যে, জাতিচ্যুতির কারণে নহে, কিন্তু বঙ্গদেশ রমণীয় অর্থাৎ আহারাদি বিষয়ে সুখস্বাচ্ছন্দ্যপ্রদ বলিয়াই পঞ্চব্রাহ্মণের অন্যান্য পুত্রেরা ক্রমশ বঙ্গে আসিয়াছিলেন। জাতিচ্যুত না হইলেও ক্ষিতীশ প্রভৃতিকে বোধ হয় দেশে বেশ একটু অসুবিধা ভোগ করিতে হইত, তাই বীরসিংহ আদিশূরের প্রার্থনা ঘোষণা করিতেই ক্ষিতীশ প্রভৃতির বংশধরেরাই বঙ্গে যাইবার জন্য অগ্রসর হইয়াছিলেন।

১০৮। দক্ষিণা ব্যতীত পঞ্চ অনুগঙ্গ গ্রাম প্রদত্ত।

কুলগ্রন্থ আলোচনা করিলে অনুমান হয় যে, দক্ষিণাস্বরূপে পঞ্চব্রাহ্মণ যে পাঁচখানি গ্রাম পাইয়াছিলেন, তদ্ব্যতীত তাঁহাদের বসবাসের জন্য গঙ্গার তীরবর্ত্তী আরও পাঁচখানি গ্রাম দেওয়া হইয়াছিল। ক্ষিতীশবংশাবলীচরিতং গ্রন্থে আছে যে, "যজ্ঞান্তে পঞ্চব্রাহ্মণকে বহু সৌধশোভিত পুরপঞ্চকে বাস করাইলেন; সেই পুরপঞ্চকে এক বৎসর বাস করিবার পর ভট্টনারায়ণের নানা লোকাতীত কর্ম্মে সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে (এবং সম্ভবত অন্য চারিজনকেও) রাজা গ্রাম দিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন" (২৫)। ক্ষিতীশবংশাবলীতে কেবলমাত্র ভট্টনারায়ণের কথা উল্লিখিত থাকিলেও আমাদের অনুমান যে রাজা তাঁহাদের সকলকেই আরও এক একখানি গ্রাম দিয়াছিলেন। গোষ্ঠীকথায় আমাদের এই অনুমানের সমর্থন পাই। মুলোপঞ্চানন বলেন—ছান্দড় হরিকোটি ব্যতীত গঙ্গাবাসের জন্য ত্রিবেণী পাইয়াছিলেন; ভট্টনারায়ণ পঞ্চকোটি ব্যতীত কালীঘাট পান; দক্ষ কামকোটি ব্যতীত জাহ্নবীনগর ভর্ত্তীপুর (ছাপ-

বাসার্থং পঞ্চবিপ্রাণাং গঙ্গাতীরসমীপতঃ।
পঞ্চ গ্রামান্ দদৌ তূর্ণং রত্নানি বিবিধানি চ ॥ ৭৮

(২৩) প্রে॰ বি॰ ২৬৩পৃঃ।
(২৪) প্রে॰ বি॰ ২৬০পৃঃ।

(২৫) ক্ষি॰ ব॰ ৪পৃঃ—ক্ষিতীশবংশাবলীতে কেবল ভট্টনারায়ণ সম্বন্ধে একথা বলা আছে, আমাদের তাহা সঙ্গত মনে হয় না।

ঘাটিয়া মহাল) পান ; শ্রীহর্ষ কঙ্কগ্রাম ব্যতীত গঙ্গাবাসের জন্য অগ্রদ্বীপ পান ; এবং বেদগর্ভ বটগ্রাম ব্যতীত শান্তিপুরের অপর পারে গুপ্তপল্লী (গুপ্তপাড়া ?) প্রাপ্ত হন (২৬)।

দ্বারকানাথ ঠাকুরের বিষয়-সম্পত্তি।

(আচার্য্য শ্রীসতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী, এম-এ)

দ্বারকানাথের উইল।

১৮৪৫ সালের ১৬ই আগষ্ট তারিখে দ্বারকানাথ উইল করেন। পূর্ব্বে যে Deed of Settlment-এর কথা বলা হইয়াছে, যাহার দ্বারা দ্বারকানাথ অধিকাংশ বিষয়সম্পত্তির উপরে পুত্রগণকে কেবল জীবনস্বত্ব এবং পৌত্রগণকে নিব্যূঢ় স্বত্ব দান করিয়া যান, তাহা এই উইলে স্বীকৃত ও দৃঢ়ীকৃত হয় ; এবং ঐ Deed-এর অতিরিক্ত যে সম্পত্তি দ্বারকানাথের মৃত্যুকালে থাকিবে, তাহার সম্বন্ধেও ব্যবস্থা করা হয়। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ আত্মজীবনীর ৭১পৃষ্ঠায় এই উইলের ব্যবস্থার বিবরণ দিয়াছেন।

দ্বারকানাথের মৃত্যুর পর তাঁহার উত্তরাধিকারীগণ এবং নানারূপ অর্থী প্রত্যর্থীগণ, উইলে কি আছে, তাহা দেখিবার জন্য স্বভাবতই অতিশয় উদ্গ্রীব হইয়াছিলেন। ১৮৪৬ খৃষ্টাব্দের ১লা ডিসেম্বর তারিখের *Englishman* পত্রিকায় "Local Items" শীর্ষে আমরা এই সংবাদ দেখিতে পাই :—

"Dwarkanauth's Will is now the rage. From the poor sircar to the Member of the Council, evrybody would have a sight of this document ; some from curiosity, but most from interested motives."

ইহার পর ১৮৪৭ খৃষ্টাব্দের ১লা এপ্রিল তারিখের *Englishman* পত্রিকায় দেখিতে পাই যে, এই সময়ে কলিকাতার সুপ্রীম কোর্টে ঐ উইলের একটি অস্পষ্ট উক্তির অর্থ পরিষ্কার করিয়া লইবার জন্য একটি মোকদ্দমা (suit) উপস্থিত করা হইয়াছিল ; তাহাতে দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর বাদী ও দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রতিবাদী বলিয়া লিখিত আছে। এস্থলে আইনে অনভিজ্ঞ পাঠককে বলিয়া দেওয়া আবশ্যক যে, এই সকল মোকদ্দমা কোনও কলহ-বিবাদের মোকদ্দমা নহে ; এসকল কেবল ভবিষ্যৎ জটিলতা নিবারণের উদ্দেশ্যে দলীলাদির অর্থ স্পষ্ট করিয়া লইবার মোকদ্দমা। কিন্তু এ সকলেও একজনকে বাদী ও একজনকে প্রতিবাদী হইতে হয়। এই মোকদ্দমার বিবরণে দেখিতে পাই যে, দ্বারকানাথ নিজ উইলে কার ঠাকুর কোম্পানীকে "one million rupees" অর্থাৎ দশ লক্ষ টাকা ধার দেওয়ার কথা উল্লেখ করিয়াছিলেন।

উইলের যে অস্পষ্ট উক্তি লইয়া এই মোকদ্দমা হয়, তাহা *Englishman* পত্রিকায় এইরূপ উদ্ধৃত আছে,— "And as to all the residue and remainder of my real and personal estate and effects whatsoever or whosoever, I give devise and bequeath the same unto all and every my sons and son, and their and each and every of their respective sons per stripes who shall survive me, if more than one in equal shares, to and for his and their own absolute use and benefit."

ইহার পর *Englishman* বলিতেছেন, "The question being as to the meaning of the above residuary clauses, the sons claiming the whole residue thereunder in equal third parts or shares to the exclusion of the grandsons,......Peel, C. J., held the demurrer be allowed." অর্থাৎ residuary property তিন পুত্রই সমান অংশে পাইলেন। ১৮৪৭ খৃষ্টাব্দের ৩০শে মার্চ্চ তারিখে এই মোকদ্দমার রায় দেওয়া হয়।

ইউনিয়ন ব্যাঙ্কের পতন।

ইউনিয়ন ব্যাঙ্কের য়ুরোপীয় পৃষ্ঠপোষকগণের সংখ্যা ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হইতে লাগিল, এবং কার ঠাকুর কোম্পানীর বিস্তৃত বাণিজ্যের সহিত ইহার যোগ থাকাতে ক্রমে ইহাই কলিকাতার প্রধান ব্যাঙ্ক হইয়া দাঁড়াইল। এই রূপে ক্রমশঃ অধিকসংখ্যক অংশীদারের আগমন হেতু ইউনিয়ন ব্যাঙ্কে দ্বারকানাথের আর্থিক দায়িত্ব কিঞ্চিৎ লঘুতর হইতে লাগিল বটে ; কিন্তু কার ঠাকুর কোম্পানী প্রায় একা দ্বারকানাথের টাকার বলে, এবং তাঁহার আর্থিক সচ্ছলতা সম্বন্ধে লোকের অগাধ বিশ্বাসের বলেই, চলিতে লাগিল। এই কোম্পানীর বাণিজ্য যতই বহুমুখীন হইয়া প্রসারিত হইতে লাগিল, ততই ইহার ও ইউনিয়ন ব্যাঙ্কের, উভয়ের, আর্থিক দায়িত্বের পরিমাণ অত্যধিক মাত্রায় বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। ক্রমে এমন অবস্থা উপস্থিত হইল যে, ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক, কার ঠাকুর কোম্পানী এবং দ্বারকানাথের বিষয়সম্পত্তি, এই তিনটির জীবন-মরণ প্রায় পরস্পর-সাপেক্ষ হইয়া পড়িল ; দাঁড়াইলে তিনটিই দাঁড়াইবে, পড়িলে তিনটিই একসঙ্গে পড়িবে। এই অবস্থার

(২৬) সুলোপকারদের গোষ্ঠীকথা—স° নি° ২২৩পৃঃ।

কথা ভাবিলে দ্বারকানাথের পক্ষে ভূসম্পত্তি রক্ষার জন্য Deed Settlement সম্পাদনের প্রয়োজনীয়তা বেশ বুঝিতে পারা যায়।

১৮৪০ সালের কাছাকাছি সময় হইতে আরম্ভ করিয়া কয়েক বৎসরের মধ্যে ইংলণ্ডে ও ভারতবর্ষে অনেকগুলি ব্যাঙ্ক ও ব্যবসায় ফেল হয়। যতদিন দ্বারকানাথ জীবিত ছিলেন, ততদিন তিনি বাণিজ্য জগতের এই সকল ঝঞ্ঝাবর্ত্ত-প্রসূত বিপদ, এবং নিজ মুক্তহস্ততা-প্রসূত বিপদ, এই উভয় বিধ বিপদ অতিক্রম করিয়া, অপূর্ব্ব বুদ্ধিবলে ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক ও কার ঠাকুর কোম্পানীকে দণ্ডায়মান রাখিয়াছিলেন। তাঁহার মৃত্যুর পর আর ইহারা অধিক দিন দাঁড়াইয়া থাকিতে পারিল না।

১৮৪৬ সালের ১লা আগষ্ট তারিখে ইংলণ্ডে দ্বারকানাথ ঠাকুরের মৃত্যু হইল। তাঁহার মৃত্যুতে উক্ত উভয় ব্যবসায়ের প্রধান স্তম্ভটি যেন খসিয়া পড়িল। ১৮৪৭ সালের ২৭ শে ডিসেম্বর, সোমবার ইউনিয়ন ব্যাঙ্কের পতন ঘটিল।

১৮৪৭ সালের ২৮শে ডিসেম্বর তারিখের *Englishman* পত্রিকা লিখিতেছেন, "On Friday last a demand on the Union Bank for so small a sum as three thousand five hundred rupees was dishonoured, and could not be met when presented yesterday, though it was ultimately adjusted before business closed, ...but probably something will transpire in the course of the day." তার পরের দিনের *Englishman* লিখিতেছেন,—"We are informed that a bill granted by the Union Bank for Co's Rs 60,000 due on Monday remained unpaid, and was in the hands of the Notary yesterday. We have again and again pointed out to the Shareholders the necessity of closing the concern without delay. We have now some facts before us which make this more than ever important to their interests."

ইউনিয়ন ব্যাঙ্কের পতন সম্বন্ধে কিশোরীচাঁদ মিত্র লিখিতেছেন,—"ব্যাঙ্কের পক্ষে যে যে প্রণালীতে কারবার করা বিধিসঙ্গত, তাহার সীমা লঙ্ঘন করিতে গিয়া ইউনিয়ন ব্যাঙ্কের সর্ব্বনাশ হইল। কয়েকটি বিশেষ হৌসকে নীলের জন্য ধার দিয়া দিয়া ইহার টাকা নিঃশেষিত হইয়া গিয়াছিল। নীলের জন্য ঋণ দান, ও হুণ্ডীর কারবার, এই দুইটিই এই ব্যাঙ্ক ফেল হইবার প্রধান কারণ।"—(Mem. 15; সংক্ষিপ্ত ভাবানুবাদ)।

দ্বারকানাথের আর্থিক সচ্ছলতার উপরে লোকের অগাধ বিশ্বাস ছিল বলিয়া তিনি ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক ও কার ঠাকুর কোম্পানী উভয়ের জন্য সহজে টাকা ধার পাইতেন, একথা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক সম্পর্কে নিমতলার দেওয়ান রাধামোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের (শিবকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের পিতা) নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ইনি সর্ব্বদা প্রয়োজনমত এই ব্যাঙ্কে টাকা যোগাইতেন।

ব্যাঙ্ক ফেল হইলে রমানাথ ঠাকুর ইহার লিকুইডেটর নিযুক্ত হন। এই ব্যাঙ্কের জন্য দ্বারকানাথ ঠাকুরের এষ্টেট্ অধিক ক্ষতিগ্রস্ত হয় নাই। তাহা হইতে, দ্বারকানাথের ক্রীত শেয়ারের সংখ্যা অনুযায়ী, ঋণের হারাহারি অংশ মাত্র শোধ দিতে হইয়াছিল। কিন্তু ব্যাঙ্কের সমগ্র ঋণ শোধ না হওয়াতে কলিকাতার অনেক বর্দ্ধিষ্ণু ঘর ও মধ্যবিত্ত গৃহস্থ সর্ব্বস্বান্ত হন। তৎকালীন সংবাদপত্র সকলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, এই ব্যাঙ্ক ফেল হওয়াতে দেশীয় ও য়ুরোপীয় উভয় সম্প্রদায় অতিশয় সংক্ষুব্ধ হইয়া উঠিয়াছিলেন। ১৮৪৮ খৃষ্টাব্দের ৪ঠা জানুয়ারী তারিখের *Bengal Hurkaru* পত্রিকার সম্পাদকীয় উক্তিতে এই ব্যাঙ্কের পতনের দীর্ঘ সমালোচনা আছে।

দ্বারকানাথের মৃত্যুর পর কার ঠাকুর কোম্পানীর ইতিহাস।

১৮৪৬ খৃষ্টাব্দের ১লা আগষ্ট দ্বারকানাথ ঠাকুরের মৃত্যু হয়। তিনি নিজ উইলে কার ঠাকুর কোম্পানীর বিষয়ে যে ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছিলেন, দেবেন্দ্রনাথ আত্মজীবনীর ৭১পৃষ্ঠায় সে সম্বন্ধে লিখিতেছেন,—"আমাদের কার ঠাকুর কোম্পানি নামে যে বাণিজ্যব্যবসায় ছিল, তাহার অর্দ্ধেক অংশ আমার পিতার, আর অর্দ্ধেক অংশের অংশী অন্য অন্য ইংরাজ সাহেবেরা ছিলেন। ইহার মধ্যে এক আনা অংশ আমার ছিল। আমার পিতা, এই ব্যবসায়ে তাঁহার যে অর্দ্ধাংশ ছিল, তাহা কেবল একা আমাকেই দিয়া গিয়াছিলেন। কিন্তু সে অর্দ্ধাংশ আমি কেবল আপনার জন্য রাখিলাম না; আমরা তিন ভাইয়ে তাহা সমান ভাগ করিয়া লইলাম।" ১৮৪৬ সালের শেষভাগেই নিশ্চয় দেবেন্দ্রনাথ গিরীন্দ্রনাথের সহিত এই কোম্পানী সম্বন্ধে পরামর্শ করিয়া থাকিবেন। কারণ *Englishman* পত্রিকার ১৮৪৭ সালের ৯ই, ১৫ই, ২২শে ও ২৬শে জানুয়ারীর সংখ্যাগুলিতে কার ঠাকুর কোম্পানীর একটি বিজ্ঞাপন বার বার প্রকাশিত হয়; তাহার মর্ম্ম এই যে, ১লা জানুয়ারী হইতে গিরীন্দ্রনাথকে অংশীদার করিয়া লওয়া হইল, ও ঐ তারিখ হইতে তাঁহাকে লইয়া এই

৫ জন অংশীদার হইলেন,—Debendernath Tagore, Henry Barkley Henderson, Donald Macleod Gordon, Greendernath Tagore, James Stuart.

কিন্তু নগেন্দ্রনাথকে অংশীদাররূপে গ্রহণ করিবার কোনও বিজ্ঞাপন সংবাদপত্রে খুঁজিয়া পাওয়া গেল না। যখন কার ঠাকুর কোম্পানি উঠিয়া যাইতেছে, লিকুইডেশনের ব্যবস্থা হইতেছে, কোম্পানীর নাম পরিবর্ত্তিত হইতেছে, তখনও সংবাদপত্রের বিজ্ঞাপনে কেবল দেবেন্দ্রনাথ ও গিরীন্দ্রনাথেরই নাম দেখা যায়। কার ঠাকুর কোম্পানীর বিজ্ঞাপন ও তাহার বিষয়ে প্রসঙ্গ, তৎকালীন সংবাদপত্রে ইউনিয়ন ব্যাঙ্কের বিজ্ঞাপন ও প্রসঙ্গ অপেক্ষা সংখ্যায় ও পরিমাণে অনেক অল্প।

দেবেন্দ্রনাথ আত্মজীবনীতে (৮৫পৃষ্ঠা) কার ঠাকুর কোম্পানীর পতনের যে সময় নির্দ্দেশ করিয়াছেন (১৭৬৯ শকের ফাল্গুন=১৮৪৮ খৃষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী-মার্চ্চ), এবং পতন সময়ে তাহার দেনা-পাওনার যে বিবরণ দিয়াছেন, তাহাও সমসাময়িক পত্রিকায় মুদ্রিত হিসাবের সহিত মিলিতেছে না।

কার ঠাকুর কোম্পানী অনেকগুলি ব্যবসায়ের "Secretary" (এখনকার ভাষায় "Managing Agents") ছিল। তন্মধ্যে একটি নাম ছিল "Family Endowment, Life Assurance, and Amunity Society"। এই Societyর বিজ্ঞাপনে *Bengal Hurkaru* পত্রিকার ১৮৪৮ সালের ৭ই জানুয়ারীর সংখ্যায় Secretary রূপে 'কার ঠাকুর কোম্পানীর' নাম, এবং ১৪ই জানুয়ারীর সংখ্যায় 'গর্ডন ষ্টুয়াট্ কোম্পানীর' নাম রহিয়াছে। অতএব বুঝিতে হইবে, ঐ দুই তারিখের মধ্যবর্ত্তী কোনও তারিখে 'কার ঠাকুর কোম্পানী' প্রকাশ্যভাবে উঠিয়া গেল।

আশ্চর্য্য এই যে, উঠিয়া যাওয়ার কোনও বিজ্ঞাপন বা উল্লেখ তৎকালীন দুই প্রসিদ্ধ সংবাদপত্র *Bengal Hurkaru* এবং *Englishman*এ পাওয়া গেল না। যাহা হউক, *Calcutta Gazette* পত্রিকার ১৮৪৮ সালের ১৩ই জানুয়ারী সংখ্যার ৭১ পৃষ্ঠায় এই বিজ্ঞাপন দেখিতে পাওয়া যায়:—

"Mr. H. B. Henderson's term of Partnership in our Firm having expired, and Baboo Debendernath Tagore and Baboo Greendernath Tagore being desirous to retire from Commercial business, we have closed our Accounts to the 31st December last, to which date Debendernath and Greendernath Tagore will collect all assets and discharge all liabilities of the Firm.

The name of Carr, Tagore and Co. will henceforth be used only by Debendernath and Greendernath Tagore for the liquidation of the Concerns of our Firm to 31st December 1847. The business of the Firm will be continued by D. M. Gordon and James Stuart, under the name of Gordon, Stuart and Co.

12th January 1848. Carr, Tagore & Co."

এই বিজ্ঞাপন হইতে দেখিতে পাওয়া যায় যে, (১) সে সময়ে partnerগণ নির্দ্দিষ্ট সময়ের জন্য নিযুক্ত হইতেন, কারণ Hendersonএর partnership "expire" করিল। আত্মজীবনীর ৭২পৃষ্ঠায় দেবেন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন, দ্বারকানাথের মৃত্যুর পর সাহেব-অংশীদারগণকে বেতনভোগী কর্ম্মচারী অংশীদারে পরিণত করা হয়। সম্ভবতঃ এই ব্যবস্থায় তাঁহাদিগকে অংশীদার নিয়োগ করিবার সময়ে তাহা নির্দ্দিষ্ট কালের জন্য করা হইত। ৮৫পৃষ্ঠায় গর্ডন সাহেবকেও দেবেন্দ্রনাথ "প্রধান কর্ম্মচারী ডি এম্ গর্ডন" বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। (২) ১৮৪৮ সালের ১২ই জানুয়ারী তারিখে কার ঠাকুর কোম্পানীর অস্তিত্ব আর নাই। (৩) ১৮৪৭ সালের ৩১শে ডিসেম্বর তারিখ পর্য্যন্ত ঐ লুপ্ত কোম্পানীর প্রাপ্য টাকা আদায় ও দেয় টাকা শোধ করিবার (লিকুইডেশনের) ভার দেবেন্দ্রনাথ ও গিরীন্দ্রনাথ দুই ভাই লইলেন, এবং তাঁহারা কেবল ঐ কার্য্যের জন্যই ১৮৪৮ সালের ১২ই জানুয়ারীর পর হইতে কার ঠাকুর কোম্পানীর নাম (অর্থাৎ আত্মজীবনীর ৮৭পৃষ্ঠায় উল্লিখিত 'কার ঠাকুর কোম্পানী ইন্ লিকুইডেশন' নাম) ব্যবহার করিতে লাগিলেন। (৪) ঐ তারিখের পর হইতে হৌসের নাম আর 'কার ঠাকুর কোম্পানী' রহিল না, 'Gordon Stuart & Co.' হইয়া গেল, এবং দেবেন্দ্রনাথ ও গিরীন্দ্রনাথের সহিত তাহার কোন সংস্রব রহিল না। এই কারণেই *Bengal Hurkaru* পত্রিকায় উক্ত সোসাইটীর বিজ্ঞাপনে ৭ই ও ১৪ই জানুয়ারী তারিখে Secretaryরূপে ভিন্ন ভিন্ন কোম্পানীর নাম রহিয়াছে। (৫) ইহাও বুঝিতে পারা যায় যে আত্মজীবনীর ৮৫ পৃষ্ঠায় উল্লিখিত ত্রিশ হাজার টাকার হুণ্ডী ফিরাইয়া দেওয়া ও দরোজা বন্ধ করার ব্যাপার ১৮৪৮ সালের ১২ই জানুয়ারীর পূর্ব্বেই ঘটিয়াছিল। খুব সম্ভবতঃ এই ব্যাপার ১৮৪৭ সালের ৩১ শে ডিসেম্বর তারিখেরও পূর্ব্বে, অর্থাৎ ইউনিয়ন ব্যাঙ্কের পতনের অব্যবহিত পরেই, ঘটিয়া থাকিবে।

১৮৪৮ সালের ৪ঠা এপ্রিল কার ঠাকুর কোম্পানীর পাওনাদারদের একটি সভা হয়। ৫ই এপ্রিল তারিখের *Bengal Hurkaru* পত্রিকায় তাহার যে বিবরণ পাওয়া যায়, তাহা নিম্নে উদ্ধৃত হইতেছে। ১২ই জানুয়ারী ও ৪ঠা এপ্রিলের মধ্যবর্ত্তী আর কোনও তারিখে অন্য কোনও সভা হইয়াছিল কি না, সন্দেহ। অন্ততঃ সংবাদ-পত্রে এরূপ কোনও সভার উল্লেখ নাই।

"MESSRS CARR TAGORE & CO.

The meeting of the Creditors of this defunct Firm took place last evening, Mr. Robert Castle Jenkins presiding.

The Chairman read the Circular addressed by the partners of the late Firm to their Creditors, and the statement of accounts, which we subjoin.

ASSETS,

Pledged.

Joint Stock Shares	Rs 4,19, 500
Indigo Blocks	2, 95, 000
Seebpore Works (Interest of Carr Tagore & Co. in them)	50,000
Personal Account	400,000
Patkharah less 1st mortgage	200,000
Sundry small Home properties	50,000
Mundul Ghaut	200,000
	Rs 16, 14, 500

Unpledged.

Joint stock shares	Rs 54,450
Indigo Block	1,05,000
Indigo for 1848,21000* mds at 120—240,000; less required to finish season, 80,000	1,60,000
Silk Factories	1,05,000
Personal Account	8,64,000
	Rs 12,88,450

Total amount of Assets pledged and unpledged	Rs 29,02,950

LIABILITIES

Covered.

Loans on Joint Stock Shares	Rs 3,45,000
Sundry Security	7,70,000
Balance Indigo Account Sent in the Union Bank	5,20,000
	Rs 16,35,000

Uncovered.

Union Bank including Discounts	Rs 4,25,000
Sundry Floating Accounts in India	70,000
Ditto ditto in Europe	1,76000
Ditto Fixed ditto	80,000
London Exchange Accounts	1,60,000
	Rs 9,11,000

Total of liabilities covered & uncovered	Rs 25,46,000

Mr. Morton, after referring to the Circular that had been issued by the Firm, said he was quite sure that all in the room would join him in sympathising with the sons of Dwarkanauth Tagore and their fellow-members in the late Concern for having fallen a victim, in common with so very many others, to the un-exampled pressure of the times. The estate was in difficulties; and as the most satisfactory mode of relieving it, he would propose that it may be placed under trust, since every thing seemed to favour such an arrangement; while a resort to the Insolvent Court could not but be attended with disadvantage to the claimants. The learned gentleman pointed out that hostility, especially on the part of a large Creditor, would be fatal to the execution of the plan he proposed, and exhorted unanimity and co-operation, that the affairs might be wound up to the satisfaction of all.

Mr. Colin Campbell seconded this proposition, and the meeting adopted it unanimously.

Mr. Morton now submitted a series of resolutions proposing that they should form the basis of a Deed of trust under which the Inspectors to be appointed should conduct their operations.

* এটা ২,০০০ হইবে, তাহা স্পষ্টই বোঝা যায়। সম্ভবতঃ ২ এবং ০০০'র মধ্যে যে comma ছিল, মুদ্রাকর তাহার পরিবর্ত্তে ,1' বসাইয়াছিল।

The motion was seconded by Mr. Rob Roy Campbell, and carried unanimously.

Mr. W. F. Fergusson, in reference to one of these resolutions, which sanctioned the retention by the sons of Dwarkanauth Tagore, a certain portion of the personal property left them by their father, proposed that they be also allowed to retain the family residence at Jorasanko, and their personal property in it. In bringing forward this motion, Mr. Fergusson remarked that the known liberality and munificence of Dwarkanauth Tagore in public life, had also characterised him at home, and it was by no means improbable that a very large number of dependants maintained by him during his life time, now looked on his sons for support. The public was aware that the downfall of the house of Carr Tagore & Co. was not owing to the sons of Dwarkanauth, nor to the other partners that, with them, constituted the Firm; the Creditors could not blame them for extravagance,—they could not blame them for folly; and there therefore, appeared to him no ground for disallowing the indulgence he had proposed for Debendernauth Tagore and his brother; and he was satisfied that every creditor would cordially concur with him in this opinion.

Mr. Fergusson's motion was put to the vote, and carried by acclamation.

It was now proposed by Mr. Morton and seconded by Mr. Pillaus that Mr. Robert Castle Jenkins, Mr. F. R. Hampton, and Baboo Ramanauth Tagore be appointed Inspectors and Trustees.

The motion was put and carried unanimously.

The question of remuneration now arising, Mr. Fergusson remarked that, as the Inspectors would have the advantage of the services of the Partners of the late Firm, there seemed to him to be a reason why they should not charge such a rate of Commission as the Assignee of the Insolvent Court, upon whom fall the entire burden and expense. He would, therefore, propose that the Inspectors appointed content themselves with 3 per cent upon the realization, debiting the expenses of liquidation to the estate, as a matter of course.

The trustees expressed their willingness to accept of this amount of remuneration; Ramanauth Tagore remarking that, for his part, whatever should be his portion, he would gladly make over to his unfortunate nephews.

Mr. D. M. Gordon now came forward to assure the meeting that none of the partners of the defunct firm had benefited in the remotest degree by any portion of its funds. He was overpowered with emotion in speaking, and, in the end, even affected to tears. Although two of the partners had gone home, they had not taken out a rupee from the Concern. Mr. G. G. Macpherson had lived upon his own funds all the time that he had been in connection with the house, and, when he left Calcutta, he retired upon them. Nor had Major Henderson who had quitted Calcutta so recently, derived any profit for himself from the estate:—on the contrary, to meet certain immediate demands, he had found himself under the necessity of withdrawing part of a marriage settlement from the Firm.

Thanks were now voted to the Chairman, and the meeting separated."

এই সভার বিবরণে কার ঠাকুর কোম্পানীর যে হিসাব দেওয়া হইয়াছে, তাহাতে দেখা যায় যে কোম্পানীর মোট দেনা ২৫ লক্ষ ৪৬ হাজার টাকা ছিল; এবং কোম্পানীর সমুদয় সম্পত্তি বিক্রয় হইলে ও সমুদয় অনাদায়ী টাকা আদায় হইলে, (অর্থাৎ মোট assets ২৯ লক্ষ ২ হাজার ৯৫০ টাকা হাতে আসিলে) তাহার দ্বারা দেনা শোধ করা অসম্ভব হইত না।

কিন্তু যে-কোন একজন পাওনাদারের দাবী উপস্থিত হইবামাত্র তৎক্ষণাৎ তাহা মিটাইতে না পারিলেই হৌসের অথবা ব্যাঙ্কের পতন হয়। এ ক্ষেত্রে তাহাই ঘটিয়াছিল।

দেবেন্দ্রনাথ যে মোট দেনা এক কোটি টাকা ও মোট পাওনা সোত্তর লক্ষ টাকা লিখিয়াছেন, তাহার সহিত এই হিসাব মিলিতেছে না। ইহার কারণ কি? এরূপ অনুমান করা যাইতে পারে যে দেবেন্দ্রনাথের বর্ণিত সভা *Bengal Hurkaru* পত্রিকায় বর্ণিত সভার পূর্ব্বে হইয়াছিল, এবং সেই প্রথম সভাতে ব্যক্তিগত দেনা-পাওনা ও হৌসের দেনা-পাওনা, দুইয়েরই হিসাব একত্র করা হইয়াছিল।

দেবেন্দ্রনাথের বর্ণনাতে দেখা যায়, ঐ সভাতে প্রথমতঃ গর্ডন সাহেব জানাইলেন যে, ট্রষ্ট ডীড্ দ্বারা রক্ষিত সম্পত্তিনিচয় ঋণশোধার্থে দেওয়া হইবে না; তৎপরে দেবেন্দ্রনাথ তাহাও ঋণের জন্য দিতে সাগ্রহে স্বীকৃত হইলেন; এবং সভাভঙ্গের সময়ে সকলে এই ধারণা লইয়া চলিয়া গেলেন যে ট্রষ্ট সম্পত্তিও ঋণশোধে যাইবে।

কিন্তু আমরা জানি যে কার্য্যতঃ তাহা ঘটে নাই। দেবেন্দ্রনাথ স্বীয় মহত্ত্ব গুণে ঐরূপ প্রস্তাব করিলেন বটে, কিন্তু স্বল্প বিবেচনার পরেই সকলে বুঝিতে পারিলেন যে দেবেন্দ্রনাথের (কিংবা কাহারোই) ঐ Deed of Settlement এর দ্বারা রক্ষিত সম্পত্তির উপরে হস্তক্ষেপ করিবার কোন অধিকার নাই। *Bengal Hurkaru* পত্রিকার সভার বিবরণে দেখা যায়, পাওনাদারগণ বিনা আপত্তিতে এই ব্যবস্থা মানিয়া লইতেছেন যে ঐ সকল সম্পত্তি দ্বারকানাথের পুত্রগণেরই থাকিবে; বরং তদুপরি তাঁহারা দ্বারকানাথের পুত্রগণকে জোড়াসাঁকোর পৈতৃক বসত বাটীখানিও রাখিতে অনুমতি দিতেছেন।

এই সকল দেখিয়া মনে হয়, আত্মজীবনীতে উল্লিখিত সভা ও *Bengal Hurkaru* পত্রিকায় বর্ণিত সভা এক নহে; আত্মজীবনী-বর্ণিত সভা আগে হইয়াছিল; এবং তাহা কতকটা ঘরোয়া ভাবে ও পরামর্শ-সভার ভাবেই করা হইয়াছিল, তাহাতে কোন বিষয়ের আইন সঙ্গত মীমাংসা হয় নাই।

অথচ আত্মজীবনীর ৮১ পৃষ্ঠায় দেবেন্দ্রনাথ এমন সকল কথার উল্লেখ করিয়াছেন, যাহা formal meeting এর মীমাংসার সূচনা করে, যথা,—ভরণপোষণের জন্য পঁচিশ হাজার টাকার অনুমোদন, বিষয়পরিচালনের জন্য কমিটি নিয়োগ, কোম্পানীর লিকুইডেশনের ব্যবস্থা, ইত্যাদি। ইহাতে স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায় যে দেবেন্দ্রনাথের স্মৃতিতে একাধিক সভার ঘটনা মিশ্রিত হইয়া গিয়াছিল। সম্ভবতঃ ১৮৪৮ সালের ১২ই জানুয়ারীর সন্নিহিত কোনও তারিখে আহূত একটি সভার, এবং মার্চ-এপ্রিল মাসের দুইটি সভার ঘটনা আত্মজীবনীর ঊনবিংশ পরিচ্ছেদের আরম্ভের বিবরণে মিশ্রিত হইয়া রহিয়াছে।*

দেবেন্দ্রনাথের স্কন্ধে পতিত ঋণভার।

ব্যবসায় পতনের পর দেবেন্দ্রনাথের স্কন্ধে পিতৃকৃত ব্যক্তিগত ঋণ, হৌসের ঋণ, ও পিতার উইলে প্রতিশ্রুত দানের ঋণ, এই সকলের গুরুভার আসিয়া পড়িল। 'বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস'-প্রণেতা লিখিতেছেন, "ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক ও কার ঠাকুর কোম্পানীর কার্য্য-পরিচালনার্থ দ্বারকানাথের বিস্তর ঋণ হয়। দ্বারকানাথকে ব্যক্তিগত বিশ্বাসের উপর নির্ভর করিয়া তখনকার কলিকাতার প্রভূত ধনশালী ৺রামদুলাল সরকারের বংশধরেরা, রাজা সুখময়ের বংশধরেরা, বীরনৃসিংহ মল্লিকের বংশধরেরা, ৺জয়রাম মিত্র, রাজচন্দ্র দাস (মাড়), রাণী কাত্যায়ণী (পাইকপাড়া) প্রভৃতি, এবং কাশিমবাজারের রাজা হরিনাথ, বর্দ্ধমানের মহারাজা তিলকচন্দ্র প্রভৃতি ব্যক্তি, অনেক সময় বিস্তর টাকা বিনা লেখাপড়াতেই কর্জ্জ দিতেন। বিলাতে হঠাৎ মৃত্যু হওয়ায় এই সকল ব্যক্তির অনেকের নিকট অনেক টাকা দেনা পড়িয়া যায়, এবং দেবেন্দ্রনাথ গিরীন্দ্রনাথ ও নগেন্দ্রনাথ পিতার বিপুল বিত্তপ্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে সেই বিপুল ঋণভারেরও উত্তরাধিকারী হন। দ্বারকানাথের মৃত্যুর পর তাঁহারা অধিকাংশ বিষয়-সম্পত্তি বিক্রয় করিয়া বিপুল পিতৃঋণ পরিশোধ করেন।"—(ব. জা. ই. ব্রা. ৬। ৩৫৫)

এই "অধিকাংশ বিষয়সম্পত্তি" বলিতে ট্রষ্ট ডীড দ্বারা রক্ষিত সম্পত্তির বহির্ভূত অন্যান্য সম্পত্তি বুঝিতে হইবে। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, দেবেন্দ্রনাথ ট্রষ্ট ভাঙ্গিয়া দিতে আগ্রহান্বিত ছিলেন; কিন্তু আইনতঃ তাহা করা অসম্ভব ছিল বলিয়া উহা ঘটে নাই।

---

* শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় এই সকল সম্পর্কিত প্রাচীন তথ্যে বিশেষ অভিজ্ঞ। মহর্ষির আত্মজীবনীর ও সমসাময়িক সংবাদপত্রের বিবরণের মধ্যে এরূপ অসামঞ্জস্য দর্শন করিয়া তাহার সমাধানের জন্য খগেন্দ্র বাবুর সঙ্গে আলোচনা করিয়াছিলাম। তিনিও কিছু মীমাংসা করিয়া দিতে পারিলেন না। তিনি বলেন, কার ঠাকুর কোম্পানী যে "ফেল" হয় নাই, voluntary liquidation এ গিয়াছিল, ইহার প্রমাণ আছে। আমার সংগৃহীত সংবাদপত্রের বর্ণনার সহিত খগেন্দ্র বাবুর এই উক্তির বিরোধ নাই। কিন্তু বোধ হয় এ ক্ষেত্রে "ফেল হওয়া"র ও voluntary liquidation এর পার্থক্য প্রকৃত প্রস্তাবে ছিল না; কোন পাওনাদার ফিরিয়া গিয়া না থাকিলেও, সব পাওনাদারদের দাবী মিটাইবার টাকা যে মজুত নাই, তাহা ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক ফেল হইবার অব্যবহিত পরেই জানিতে পারা গিয়াছিল।

প্রত্যাদেশ ও পরীক্ষিত সত্য।

(ডাঃ শ্রীযুক্ত বনওয়ারিলাল চৌধুরি ডি. এস-সি)

অন্য সব সম্প্রদায় অপেক্ষা জড়বাদিত্বের বদনামটা বৈজ্ঞানিকদের প্রতি অধিকতররূপে চাপান হইয়া থাকে। জড়বাদের বিশ্লেষণে আমরা বিজ্ঞানবিদকে সুবিধাবাদী ও ব্যবহারান্বেষী (utilitarian) বলিয়া ধরিয়া লই। এক সময়ে জড়বাদকে নিরীশ্বরবাদের নামান্তর বলিয়া ধরা হইত। কাজেই সিদ্ধান্ত হইয়াছিল, ব্যবহারিক জীবনের সুবিধাবিধানই বৈজ্ঞানিক গবেষণার একমাত্র উদ্দেশ্য। এই সিদ্ধান্ত বা অনুমান কি ঠিক? আমরা অনেক দিন পূর্ব্বে তত্ত্ববোধিনীতে "ধর্ম্ম ও বিজ্ঞান" প্রবন্ধে ইহার আলোচনা করিয়াছিলাম।* প্রবন্ধান্তরে উহার আলোচনা পাঠ করিয়া আরও কিছু যোগ করা প্রয়োজন বোধ হইতেছে। গ্যালিলিও পিসা সহরের স্বনামধন্য প্রসিদ্ধ বাঁকা স্তম্ভের শিরোদেশ হইতে একই সময়ে ভারী ও পাতলা দুইটী ভিন্ন স্বতন্ত্র পদার্থ নিয়ে নিক্ষেপ করিয়া তাহাদের বিমুক্ত গতির তারতম্য লক্ষ্য করার সময় তাঁহার কি কখনও মনে আসিয়াছিল যে, এই পর্য্যালোচনায় ব্যবহারিক জীবনের কোন শ্রমলাঘবকর উপায়ের আবিষ্কারের হেতু হইবে? আমরা নিঃসন্দেহে বলিতে পারি যে, কোনও ব্যবহারিক শ্রমলাঘব উপায়ের উদ্ভব করিবার বা উদ্দেশ পাইবার জন্য তিনি ঐরূপ পর্য্যবেক্ষণে মনোনিবেশ করেন নাই। সকলেই আমেরিকা দেশবাসীদিগকে জড়বাদের প্রাধান্যের চরম দৃষ্টান্তস্বরূপে নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। অথচ এই আমেরিকাবাসীরা Michelson-Morleyর গবেষণায় অন্য কর্ত্তই না অর্থব্যয় ও সময়ক্ষেপ করিলেন। কিন্তু সকলেই জানেন Michelson-Morleyর গবেষণা কোনরূপ ব্যবহারিক শিল্প বা কারখানার উন্নতিকল্পে উদ্দিষ্ট বা পরিকল্পিত হয় নাই। আর আমেরিকার সুবৃহৎ মানমন্দির আর তাহার বৃহত্তম দূরবীক্ষণগুলির কথা কে না জানে? আমেরিকাবাসীরা তাহাদের কারখানাগুলির বা তাহাদের ব্যবহারিক শিল্পের উন্নতিকল্পে এই সব মানমন্দিরের জন্য বিপুল অর্থ ব্যয় করে নাই। এই সব মানমন্দিরের দ্বারা কত নক্ষত্রের ব্যাস মাপা হইয়াছে—লুব্ধকের প্রধান নক্ষত্র Siriusএর প্রভাহীন সঙ্গীর আপেক্ষিক গুরুত্ব সুনির্ণীত হইয়াছে। এসব তত্ত্বে ত মানবের সাংসারিক বা দৈহিক শ্রমলাঘবের কোনও সহায়তা করে নাই বা সেইরূপ উদ্দেশ্য লইয়া আমেরিকার জ্যোতির্ব্বিদেরা তাঁহাদের সময় ও শক্তির বিনিময়ে ঐ সুবৃহৎ ও সুগঠিত মানমন্দিরগুলির সাহায্যে ঐ সব অত্যাশ্চর্য্য তত্ত্বের নিরাকরণ করেন নাই। আমরা স্থানান্তরে এই সব তত্ত্বালোচনাকে বিধিলিপি-পাঠ বলিয়াছিলাম।* এই তত্ত্বানুসন্ধানীরা দিনের পর দিন, রাত্রির পর রাত্রি সর্ব্বসময়ব্যাপী অনুসন্ধান, আলোচনা ও গবেষণায় নিমগ্ন থাকিয়া প্রভুর নিয়মপ্রণালীর নির্ণয়ে নিযুক্ত। সত্যের সাধনা বিজ্ঞানের মোক্ষ। জড়বাদ বিজ্ঞানের পূর্ব্বগঠিত সিদ্ধান্ত নহে। বিজ্ঞানবিৎ সত্যের পথে প্রবেশপ্রয়াসী। সিদ্ধান্ত হইল সেই প্রয়াসের পরিসমাপ্তি। বৈজ্ঞানিকেরা প্রণালীর আবিষ্কারে নিযুক্ত থাকিবেন বলিয়া সমস্ত শক্তি-সামর্থ্য উৎসর্গ করিয়া গবেষণায় প্রবৃত্ত হন। পূর্ব্বগঠিত সিদ্ধান্তের উপপত্তি তাহার উদ্দেশ্য হইতে পারে না। মনগড়া কোন মত বা অভিমতের অন্ধ সমর্থন বৈজ্ঞানিকের কার্য্যপ্রণালীর নিয়ম নহে। জড়বাদ আজকাল আর বৈজ্ঞানিক আলোচনায় তেমন পাওয়া যায় না যেরূপ রাষ্ট্রবিজ্ঞান, অর্থশাস্ত্র প্রভৃতির অনুগামীদের ভিতর পাওয়া যাইতেছে। বর্ত্তমান সময়ের রাষ্ট্রবিৎদের শিক্ষাগুরু কার্ল মার্কস্ (Karl Marx) ইতিহাসের বিভাগ হইতে ভগবানকে বিদায় দিয়া মানুষকে তাহার সমসাময়িক অবস্থার উপায়হীন দাসরূপে প্রতিপন্ন করিয়াছেন। Karl Marxএর শিষ্যেরা গুরুর অনুগমন করিয়া মানুষের মানসিক শক্তিকে অর্থোৎপাদনের মূল হেতু স্বীকার না করিয়া কেবল শ্রমকেই (labour) ধনাগমের একমাত্র জনক বলিয়া প্রচার করিতেছেন। এইরূপ হেতুবাদে জড়বাদ বিজ্ঞানবিৎদের স্কন্ধ হইতে অর্থশাস্ত্রবিৎদের ঘাড়ে আসিয়া পড়িয়াছে।

সম্প্রতি মানচেষ্টারের নিকটবর্ত্তী সাউথ পোর্ট (South port) সহরে Church Congressএর অধিবেশন হইয়াছিল। ধর্ম্ম ও বিজ্ঞানের পরস্পর সম্বন্ধনির্ণয়সূচক অনেকগুলি প্রবন্ধ এই কংগ্রেসে পঠিত হইয়াছিল। প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের তত্ত্বানুসন্ধায়ীদের নিকট এই আলোচনা বড় প্রয়োজনীয় ও উপাদেয়। প্রকৃতপক্ষে ধর্ম্মবেত্তাদের গভীর অধ্যয়নের গূঢ় উদ্দেশ্য আর বৈজ্ঞানিক গবেষণার অনুসৃত পথের চরম লক্ষ্য একই। আমরা তত্ত্ববোধিনীর পূর্ব্বোল্লিখিত 'ধর্ম্ম ও বিজ্ঞান' প্রবন্ধে তাহা বিশেষভাবে দেখাইবার চেষ্টা করিয়াছিলাম। ১৯০৬ খৃঃ অঃ ইয়র্ক নগরে বৃটিস এসোসিয়সনের সভাপতির অভিভাষণে প্রথিতযশা সার ই, রে, ল্যাঙ্কেষ্টর (Sir E. Ray Lankester) অতি বিশদভাবে বিষয়টি বিবৃত করিয়াছিলেন। বৈজ্ঞানিকশ্রেষ্ঠ সার ই, রে, ল্যাঙ্কেষ্টরের ধর্ম্মতত্ত্বের আলোচনার উপর যে বিশেষ স্পৃহা বা ভক্তি আছে তাহা কেহ বলিবেন না। তবুও তিনি তাঁহার সেই অভিভাষণে খৃষ্টীয় ধর্ম্মসম্প্রদায়ের নিকট বিজ্ঞানশিক্ষার্থীদের প্রতি বিশেষ

* তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা—১৮৩৭ শক, পৌষসংখ্যা—১৬৮ পৃঃ।

* সুপ্রভাত ১৩১৮, জ্যৈষ্ঠ।

সহানুভূতির আবেদন জানাইয়াছিলেন। তাঁহার অনুরোধ যুক্তিমূলক। উভয়েই নশ্বর ক্ষণস্থায়ী ও সাংসারিক বিষয়সংক্রান্ত চিন্তাভাবনা হইতে চিরস্থায়ী অনন্তের ভাবনা ও অনুসন্ধানে নিযুক্ত—চারিদিকের পরিবর্তনশীল বাহ্যিক ঘটনাবলীর মধ্যে এক অপরিবর্তনীয় নিত্য ও শাশ্বত কারণের অনুসন্ধানে নিরত। এই একই ভাবাপন্ন দুই বিভিন্ন পথের সাধনার্থীর মধ্যে পরস্পরের প্রতি সহানুভূতির জন্য স্যার রে লেঙ্কেষ্টার বিশেষ আশা ও অনুরোধ জানাইয়াছিলেন।

আমরা অস্বীকার করিতেছি না যে, বৈজ্ঞানিকদের ভিতর বিশেষত জীববিদ্যাচর্চ্চনশীলদের মধ্যে একদল লোক রহিয়াছেন যাঁহারা ধর্ম্মসম্প্রদায়ীদের মতবাদকে নানারূপ ভ্রান্ত সংস্কার ও কুসংস্কারের সমষ্টি ভাবিয়া অবজ্ঞা করিয়া থাকেন এবং এবম্বিধ ভ্রান্ত সংস্কারসমষ্টির সমূলোৎপাটন মানবের উৎকর্ষতা লাভের অনুকূল বলিয়া মনে করেন। অন্যপক্ষে এই জীববিদ্যাবিৎদের মধ্যেই আর এক সম্প্রদায় আছেন, যাঁহারা সূক্ষ্মদর্শী ও তত্ত্বানুসন্ধায়ী। তাঁহারা জানেন এবং বুঝিতে পারিতেছেন যে, মানবের উন্নতি মানবসমাজের উন্নতির সঙ্গে জড়িত। আর অন্যপক্ষে যত রকমের মানবসমাজ গঠিত হইয়াছে, আদিতে তাহার সবগুলিই ধর্ম্মভাব ও ধর্ম্মমত মূলরূপে গ্রহণ করিয়া গঠিত হইয়াছে। কাজেই মানবসমাজগঠনে ও মানবসমাজের ক্রমোন্নতিতে মৌলিক ধর্ম্মমতের প্রাধান্য স্বীকার করা অবশ্যম্ভাবী। এইরূপ ভাবে গঠিত যে মানবসমাজ, তাহার অস্তিত্ব ও উন্নতি মৌলিক ধর্ম্মমতগুলির উপর নির্ভর করে। সরল ও সত্যভাবে এই ধর্ম্মমতের প্রভাব বিশ্বাস না করিলে সমাজ উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে পারিবে না। তবেই দাঁড়াইতেছে এই যে, সৃষ্টিপ্রবাহের প্রণালীর বৈজ্ঞানিক মতবাদের সঙ্গে ধর্ম্মের মূল সূত্রগুলির সামঞ্জস্য সমাজবন্ধন-রক্ষার মূল হেতুভূত। একদিকে বিজ্ঞান সৃষ্টিপ্রবাহের নূতন নূতন তত্ত্ব আবিষ্কার করিয়া প্রকৃতির প্রহেলিকার পথ সহজবোধ্য করিতেছে—অন্যদিকে ধর্ম্মবিশ্বাস যুগে যুগে যে সব মূল সত্য মহাপুরুষদের মধ্য দিয়া দৈবঘটনার ন্যায় প্রকাশিত হইয়াছে তাহা সযত্নে রক্ষা করিতেছে। দৈববাণীর ন্যায় এই সব প্রত্যাদিষ্ট সত্য সমাজরক্ষার মূলীভূত হেতুরূপে রক্ষিত হইতেছে। এই প্রত্যাদিষ্ট সত্য পাশ্চাত্য দেশে Revelation রূপে গৃহীত হইয়াছে। সমসাময়িক জনমত এই প্রত্যাদিষ্ট সত্যের বহিরাবরণ। যুগে যুগে জনমতের পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে প্রত্যাদিষ্ট সত্যও দুর্বোধ্য হইয়া পড়ে। জনমতের পরিবর্ত্তন উপলব্ধি করিয়া বর্ত্তমান বোধগম্য ভাষায় ঐ সব প্রত্যাদিষ্ট সত্যের ভাষান্তর করার চেষ্টা ধর্ম্মপ্রচারক ও ধর্ম্মভাবরক্ষকদের প্রয়াস।

নৈতৎ ত্বয্যুপপদ্যতে।

(শ্রীনারায়ণ ভারতী)

কাতারে কাতারে কৌরবপক্ষের অশ্ব, গজ, রথ, রথী, সেনাপতি এবং পদাতিক সৈন্যদলে কুরুক্ষেত্র ছেয়ে গেছে, কৌরবপক্ষের সকলেই রণোন্মত্ত, —পাণ্ডবদের রক্তের পিপাসায় সবাই তারা উদ্ভ্রান্ত, —ক্ষিপ্তপ্রায়! সবারই মুখে একই কথা,—রক্ত চাই, রক্ত চাই, পাণ্ডবদের রক্ত চাই!—কৌরব পক্ষের বীরেন্দ্র মহারথীবৃন্দ অস্ত্রে বর্ম্মে সজ্জিত হ'য়ে উৎকর্ণ ও উৎকণ্ঠিত ভাবে অপেক্ষা কর্‌ছে, কখন্ রণ-দামামা বেজে উঠ্‌বে,—কখন্ যুদ্ধারম্ভ হবে, ক্ষিপ্ত ব্যাঘ্রের ন্যায় মুষ্টিমেয় পাণ্ডবকে ছিন্ন ভিন্ন করবার সুযোগ কখন্ তারা পাবে! কৌরবগণ একদৃষ্টে সকলেই চেয়ে রয়েছে পাণ্ডবদের দিকে! কিন্তু এই ভীষণ চাঞ্চল্যের মধ্যে স্থিরভাবে দণ্ডায়মান—কে ঐ বিষাদজীর্ণ শ্যামলমূর্ত্তি? সারথির পার্শ্বে ম্লানমুখে অবস্থিত কে ঐ যোদ্ধ্‌বর? আজিকার যুদ্ধের পাণ্ডবপক্ষীয় সুপ্রধান সমরাচার্য্য উনিই কি কীর্ত্তিকুশল সেই অর্জ্জুন? হাঁ, তাই বটে। অর্জ্জুন এবং তাঁর সারথি কৃষ্ণ,—এতদুভয়ের পরস্পরে বর্ত্তমান যুদ্ধপ্রসঙ্গে বহু কথার আলোচনা হচ্ছিল। সহসা পার্থসারথি কৃষ্ণ, গাণ্ডীবধন্বা অর্জ্জুনকে দৃঢ়স্বরে ব'লে উঠলেন, "নৈতৎ ত্বয্যুপপদ্যতে" অর্থাৎ তোমাতে এই দৌর্ব্বল্য সাজে না। কৃষ্ণের এই কথাটীতে অকস্মাৎ নিরুদ্যম অর্জ্জুনের চিত্তস্থিত নৈরাশ্যের মেঘরাশি ভেদ ক'রে অমিতবিক্রমে অতর্কিতভাবে, একটা সুপ্রবল আত্মশক্তির প্রদীপ্ত তড়িৎরেখা বিস্ফুরিত হ'য়ে উঠ্‌ল। অর্জ্জুন ভাবলেন, আপাতপ্রতীয়মান আমার এই শক্তিহীনতা—এটা কি মায়া? মোহতন্দ্রাতুর আমি,—সত্যই কি আমার দ্বারা কুরুপাণ্ডবের দ্বৈরথ যুদ্ধে কীর্ত্তিকেতন উড্ডীন হবার আশা আছে?—শ্রীকৃষ্ণ, ভ্রষ্টলক্ষ্য পার্থকে মেঘগম্ভীরস্বরে পুনরায় বল্‌লেন, "মামনুস্মর যুধ্য চ"। কুরুপাণ্ডবের ভীষণ যুদ্ধে পরস্পরের ভবিষ্যৎ পরিণতি

ভাল হোক বা মন্দ হোক, এ যুদ্ধে তোমাকে প্রবৃত্ত হ'তেই হবে ; অর্জ্জুন ! এই যুদ্ধে বহু আত্মীয় ধ্বংস হবে এবং তজ্জন্য লোকে তোমাকে নিন্দা করতে পারে, সমাজেও তুমি অপাংক্তেয় হ'তে পার, তবু তোমাকে বলছি,—"ক্লৈব্যং মাস্ম গমঃ পার্থ !"—দৌর্ব্বল্য ত্যাগ কর, যুদ্ধে অগ্রসর হও। মেঘমধ্যে তাড়িতবাতের ন্যায় কৃষ্ণের এই কথাগুলিতে অর্জ্জুনের মোহমেঘ ক্ষণমধ্যে ছিন্ন ভিন্ন হ'য়ে গেল। অর্জ্জুনের চক্ষুতে আগুনের ফিন্‌কি ছুটতে লাগ্‌ল, সহসা বাহুদ্বয় তপ্তরক্তধারায় চঞ্চল হ'য়ে উঠ্‌ল ; ত্যক্ত গাণ্ডীব সহসা যেন তাঁর মনে ক্ষাত্রবীর্য্যের স্মৃতি জাগিয়ে দিল ! শরীরের প্রত্যেক রক্তবিন্দু কক্ষভ্রষ্ট নক্ষত্রবৎ তাঁর দেহমনের অসাড়তার মধ্য দিয়ে ছুটাছুটি আরম্ভ করল। * * * তার পরে যা ঘটেছিল, মহাভারতের পাঠকগণের কাছে তা' অবিদিত নাই।

মহাভারতে বর্ণিত এই যে অর্জ্জুনের চরিত্র, ইহা শুধু প্রাচীন কাব্যকথা মাত্র নয়—কুরুক্ষেত্রবিজয়ী অর্জ্জুনের চরিত্র, নিখিল মানবের চরিত্রপুঞ্জের মূর্ত্ত পরিব্যক্তি।—অবসাদ, নিরুৎসাহ, জড়তাপ্রমুখ প্রবল কৌরবপক্ষ নরনারায়ণের চিরশত্রু। একা অর্জ্জুন নয়, আমরা প্রত্যেকেই অবসাদরূপ কুচক্রী দুর্য্যোধনের দ্বারা উৎপীড়িত হই। সংসার-কুরুক্ষেত্রে অবসাদের ন্যায় শক্তিশালী শত্রু আর কে আছে ? কর্ত্তব্যের গাণ্ডীব আমাদেরও হস্তচ্যুত হয়, কর্ম্মনাশা অবসাদে আমরাও মুহ্যমান হ'য়ে পড়ি, কিন্তু তথাপি নিরবচ্ছিন্ন ভাবে সর্ব্বদা স্মরণ রাখতে হবে যে, উচ্চাকাঙ্ক্ষার উত্তুঙ্গ শৈলশৃঙ্গ হ'তে আমরা যেন নৈরাশ্যের পল্বলকর্দ্দমে নিক্ষিপ্ত না হই, আত্মার চরম অবমান না করি। অনন্ত দুঃখ ও অবিরত নিষ্ফলতার সঙ্গে সারাজীবন যুদ্ধ করবার জন্য প্রস্তুত থাকা চাই। কারণ জীবন-কুরুক্ষেত্রে কৌরবপক্ষ চিরকালই প্রভাবান্বিত। অবসাদে জর্জ্জরিত ও অবসন্ন হ'লেই বিরুদ্ধ পক্ষের শরাঘাতে আমাদের সর্ব্বনাশ হবে। সিদ্ধিলাভের জন্য অবিরত চেষ্টা করা চাই, প্রাণপণ প্রয়াসে জীবনসংগ্রামে জয়শ্রীলাভের জন্য উগ্র তপঃশক্তিপ্রয়োগে নিরন্তর "মন্ত্রের সাধন কিম্বা শরীরপতন" এই প্রতিজ্ঞা সহকারে জীবনব্যাপী কঠোর পরিশ্রম করা চাই, খাটুনি খাটা চাই।

সিদ্ধিলাভের জন্য মানুষের চেষ্টার পরিণাম অনেক ক্ষেত্রেই নিরর্থক পণ্ডশ্রমে পর্য্যবসিত হয়, কিন্তু তাই ব'লে চুপ ক'রে বসে থাকলে কি ক'রে চল্‌বে ? অগ্রসর হ'তে গিয়ে পিছিয়ে পড়া বিচিত্র নয়, হয়তো বহুদিনের সাধনাতেও সিদ্ধির পথে না-ও এগোতে পারি,—তাই ব'লে কি অন্তর্নিহিত আত্মশক্তির পরীক্ষা লব না ? সাধনার দুঃসহ আনন্দ থেকে দূরে নির্ব্বাসিত রইব ? পরিশ্রমের ফলে সিদ্ধি আসে উত্তম, নচেৎ পুনরায় অক্লান্ত শ্রম—উগ্র তপঃপ্রয়োগ। একাগ্র চেষ্টার সাহায্যে বিজয়ী হবার জন্য নূতন ক'রে সেই কঠোর যন্ত্রণাপ্রদ সাধনার পথেই আবার ফিরে আসা !! একেই ত মনুষ্যত্ব বলে। আত্মশক্তি যাতে দেশবাসীর মধ্যে জাগে তেমন শিক্ষা, দীক্ষা, অনুষ্ঠান, প্রতিষ্ঠান চাই। যে প্রতিষ্ঠানে মানুষের প্রাণে উৎসাহের দীপ্ত বহ্নিজ্বালা জাগ্রত হ'য়ে ওঠে, তেমন শিক্ষাশালা না হ'লে আমাদের কর্ম্মকুণ্ঠ স্থবির জাতির ছেলে মেয়েরা ক্রমান্বয়ে পঙ্গু হ'তে থাকবে।

পাশ্চাত্য দেশে দিনের বেলায় যে কর্ম্মের প্রবল তুফান ছুটে, রাত্রিকালেও সে কর্ম্মস্রোতের বিরাম হয় না। সুপ্রসিদ্ধ এডিসন সাহেব প্রায় সারা রাত্রি জেগে বৈজ্ঞানিক গবেষণা ক'রতেন। তাঁর কর্ম্মপ্রাণতার ফলে তাঁর সহযোগীদেরও কর্ম্মশক্তি যথেষ্ট বেড়ে গিয়েছিল এবং এই এডিসন আপন দৃষ্টান্তে এমন কতকগুলি কর্ম্মী তৈয়ার ক'রে তুলেছেন যে, কুঁড়েমীর প্রশ্রয় তাঁরা কিছুতেই দেবেন না। আমাদের দেশে অধিকাংশ লোক রাত্রিতে কাজ কর্ম্ম করা দূরে থাক, দিবাভাগেও হাত-পা চুল্‌কিয়ে, নিশ্চেষ্ট অবসন্নতায়, গ্লানিপূর্ণ জীবনের জীর্ণতায় সময়রত্নকে বৃথা ব্যয় করে। সময়ের মূল্য এদেশে নাই। বলতে গেলে তিক্ত শোনায়, কিন্তু সত্য কথা এই যে, আমরা চালাকি চিনি, বুজরুগী চিনি, পরহিংসা, প্রতারণা চিনি, কিন্তু সময়কে চিনি না। জাড্য, অবসাদ, আত্মগ্লানি, নিশ্চেষ্টতা চিনি,—চিনিতে ইচ্ছা করি না কর্ম্ম—কর্ত্তব্যনিষ্ঠা ; চিনিতে চাই না—সত্য-শিব-সুন্দরকে। কি সাহিত্যক্ষেত্রে, কি

রাষ্ট্রনীতিক্ষেত্রে স্বল্পশ্রমে, স্বল্পত্যাগে, স্বল্পবিদ্যায় দিগ্‌গজ হওয়ার প্রলোভনে আমাদের জাতিটা উচ্ছন্নের পথে চলেছে। আরাধনা না করলে দেবতাকে পাওয়া যায় না, ইহাও কি নূতন ক'রে বলতে হবে? পৃথ্বীক্ষেত্র হ'তে সার্থকতার সারশস্য সংগ্রহের জন্য প্রখর দুঃখসূর্য্যতাপে দগ্ধ হ'য়ে হল-কর্ষণ করতে হয়, ব্যথাবর্ষার খরকরকাপ্রপাতে সহাস্যমুখে নিত্য জর্জ্জরিত হ'তে হয়।

ওগো সুখসাগরের কাণ্ডারীর দল! সহজপথের সহজিয়াগণ! এত কষ্টের পরিণামেও কত জায়গায় নিষ্ফলতার দুর্ভিক্ষ ঘটে। জগৎটা যে কঠিন, বন্ধুর, নিষ্ঠুর;—পৃথিবীটাও যে অগ্নিময় একটা ঘূর্ণ্যমান গ্রহ! এই গ্রহের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে হ'লে আমাদেরও অগ্নির ন্যায় দুর্ব্বারণীয় তেজবীর্য্য অর্জ্জন করতে হবে। শান্তি কোথায়? নিদ্রার অবসর কই? বিরাট বিশ্বগোলক উদ্দাম, অনিবার্য্য গতিস্রোতে বায়ুতাড়িত মেঘপুঞ্জের ন্যায় বিমান-বর্ত্মে আঘূর্ণিত হচ্ছে। আমাদেরও জীবনের ছন্দ ঐ গতির সুরে গেঁথে তোলা একান্ত প্রয়োজন। শান্তিরাজ্যের স্বর্ণতোরণ কর্ম্মবলেই আয়ত্ত হয়—নিশ্চেষ্টতার দ্বারা নয়। শান্তি, শান্তি ব'লে উচ্চৈঃস্বরে কোটীজন্ম চীৎকার করলেও, কর্ম্মকুণ্ঠ ব্যক্তি শান্তি পাবে না। আপৎকণ্টকাকীর্ণ দুঃখ-দুর্য্যোগের মধ্য দিয়েই শান্তিসুখের সন্ধান পাওয়া যায়। মানবসভ্যতার অভিব্যক্তির ইতিহাস অবর্ণনীয় দুঃখের নিরবচ্ছিন্নতায় পরিপূর্ণ। তবু ত মহাপুরুষগণ একথা কোন দিন বলেন নাই যে, দুঃখকে এড়িয়ে সুখ চাই। উচ্চাদর্শের নিকট সমস্ত স্বার্থসুখ বলি দেওয়াই পুরুষার্থ। সিদ্ধার্থ, ক্রাইষ্ট, চৈতন্য প্রভৃতি বিশ্বহিতব্রতী সাধুগণ কথায় ও কার্য্যে জগৎকে দেখিয়েছেন যে, ত্যাগের কষ্টই কল্যাণপথের পাথেয়। সুখ তুচ্ছ—দুঃখই বরণীয়। সুখমত্ত দুর্ব্বৃত্তেরা ক্রাইষ্টকে খুন করেছিল, সক্রেটিসকে যন্ত্রণা দিয়েছিল,—আজ কোথায় সেই দস্যুদল? কাহারা আজ জয়গৌরবে উচ্চশির? প্রহারকগণ নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে, কিন্তু প্রহৃতগণ শতাব্দীর অন্ধকার মেঘমালা ভেদ ক'রে প্রোজ্জ্বল জ্যোতিষ্কবৎ বিশ্বজনচক্ষে অমিয় কিরণ বর্ষণ করছেন। সুখস্পৃহা? উহা পঙ্ককুণ্ড। শান্তি? উহা ক্লৈব্য মাত্র। জড়তা? উহা নরকের পুষ্পিত পন্থা। ঐ সকল আমাদের ত্যাগ করা আশু আবশ্যক।

"ক্লৈব্যং মাস্ম গমঃ পার্থ নৈতৎ ত্বয্যুপপদ্যতে।
ক্ষুদ্রং হৃদয়দৌর্ব্বল্যং ত্যক্ত্বোত্তিষ্ঠ পরন্তপ॥"

অর্জ্জুনের প্রতি প্রযুক্ত শ্লোকটি মানবমাত্রেরই প্রতি প্রযুজ্য। সমগ্র হিন্দুশাস্ত্র খুঁজিয়াছি কিন্তু এ জাতীয় শ্লোক অধিক চক্ষে পড়ে নাই। "নৈতৎ ত্বয্যুপপদ্যতে"! অর্থাৎ তোমাতে ইহা সাজে না। এটী বড় মূল্যবান কথা। তোমাতে দৌর্ব্বল্য সাজে না, তপঃকুণ্ঠা সাজে না, ত্যাগভীরুতা সাজে না, অসত্য কিছুই তোমার আরাধ্য নহে। শ্রেয় লাভের জন্য দুঃখের কণ্টকমুকুট গৌরবের সহিত মাথায় ধারণ ক'রে সত্য, শিব ও সুন্দরের পূজায় ব্রতী হ'তে হবে।

প্রাণহীন পৃথিবীকে জীবনের বন্যায় ভাসিয়ে দাও। ত্যাগের গঙ্গোত্রীপ্রবাহে কঙ্কালেও জীবনের সাড়া আনয়ন কর—হৃদয়যমুনায় জীবনের অমিয় সুতান জাগিয়ে তোল। আরাম ও সোয়াস্তি, এবং আত্মপরিচর্য্যার বিরুদ্ধে বিদ্রোহের রুদ্র ধ্বজা উড়াও। মৃত্যুসঞ্জীবন প্রবল প্রাণ অধিকাংশ লোকেরই নাই, ধরণী প্রাণশূণ্য কঙ্কালের জীর্ণতম শ্মশানশয্যায় পরিণত হ'তে চলেছে,—এই শ্মশানকে প্রাণের অজস্র ধারায়, গানের অফুরন্ত মাধুরীতে ভরিয়ে দিতে হবে। প্রভূত উৎপাদিকা শক্তিসম্পন্ন, সুপ্রচুর উর্ব্বর ভূমিসম্পৎযুক্ত এই অন্নপূর্ণার দেশে দারিদ্র্যযন্ত্রণা কেন? "ভগবান", "ভগবান" ক'রে এত চেঁচামেচি, গেরুয়ার প্রাদুর্ভাব, জগদ্‌গুরুর আবির্ভাব, শতবিধ উপধর্ম্মের ছড়াছড়ি হচ্ছে তবু দেশব্যাপী অশান্তির দাবাগ্নি কেন? ভেদ কেন, বৈষম্য কেন, পরগ্লানি কেন, ভণ্ডামি কেন, প্রতারণা কেন? আমাদের দেশে কাজ করবার লোকের এত অভাব কেন? উচ্চ চিন্তাগুলিকে সাফল্যমণ্ডিত করবার জন্য তড়িৎশক্তিপূর্ণ তেজস্বী কর্ম্মীর আধিক্য নাই কেন? সকল কার্য্যেরই গোড়ায় গলদ কেন? ফাঁকি দিয়ে এ দুঃখ মোচন হবে না। দেশে এখন চাই ক্লান্তিক্লেশহীন নিরলস ও সরলপ্রাণ বহুসংখ্যক ধীর কর্ম্মব্রতী দল,—যারা "বয়সের

ভ্রূকুটী, জরার ভ্রূকুটি” উপেক্ষা ক’রে সত্য-শিব-সুন্দরের জন্য সর্ব্বস্ব সমর্পণ ক’রে সাধনায় যত্নবান হবে। বিশ্বহিতব্রতে অগ্রসর হ’লে অর্জ্জুনের মত সকলেরই অবসাদ, তন্দ্রা ও ভয় আসতে পারে; বৃহৎ কর্ম্মে ব্রতী হ’লে আমরাও ক্লান্ত হ’য়ে পড়তে পারি, কিন্তু সাধনার শক্তি অসীম। সাধনাসাগরে স্নাত হ’লে কর্ম্মক্লান্তি দূর হ’তে তিলার্দ্ধ সময় লাগবে না। নৈরাশ্য-সংঘাতে কাপুরুষের মত নিজেকে নিরাশ্রয় মনে করা কিছুতেই উচিত নয়। প্রতীচ্যের কর্ম্মবীরগণের জীবনীতে মরুবিজয়ের মন্ত্র আছে, সেই মৃত্যুঞ্জয় কর্ম্মমন্ত্রে দীক্ষা নিয়ে লক্ষ লক্ষ সাধক বাংলার বহু দুঃখ-দৈন্যের সহিত প্রতিযোগিতা করুন। গ্রহ-নক্ষত্রে, ভিসুভিয়স পর্ব্বতগহ্বরে, প্রকৃতির গোপনতম কক্ষে, কোথায় না প্রতীচ্য দেশের কর্ম্মিগণের উৎসাহধারা দুর্ব্বার বেগে ছুটেছে? জীবনকে দুঃখের মুখে অক্লেশে উৎসর্গ করতে পারে তাই উহারা সুখীও হয়। আমরা দুঃখ বর্জ্জন ক’রে সুখ চাই, নির্ঝঞ্ঝাটে সিদ্ধি চাই, বিনা তপস্যায় সাফল্য চাই, তাই অনবরত দুঃখই আমাদের সাথী—অব্যাহত সুখ আমাদের অদৃষ্টে নেই। যদি প্রকৃত সার্থকতা পেতে চাই, তা হ’লে “নৈতৎ ত্বয্যুপপদ্যতে”, এই কথাটীর মর্ম্ম আমাদের জাতিকে অবিলম্বে উপলব্ধি করতে হবে।

রামমোহন-স্মৃতিসভা।

গৌহাটি ব্রাহ্মসমাজের প্রাঙ্গণে মহা সমারোহে স্বর্গীয় মহাত্মা রামমোহন রায়ের বাৎসরিক স্মৃতিসভা গত ২৭শে সেপ্টেম্বর অপরাহ্ণ ৫½ ঘটিকার সময় হইয়া গিয়াছে। আর্ল-ল কলেজের অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত জে, বড়ুয়ার প্রস্তাবে এবং ব্রাহ্মসমাজ-হিতৈষী শ্রীযুক্ত কালীপদ মুখোপাধ্যায়ের অনুমোদনে পণ্ডিত শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র গোস্বামী মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিলেন। গৌহাটী ব্রাহ্মসমাজের সম্পাদক শ্রীযুক্ত কমললোচন দাস সভাপতি মহোদয়কে পুষ্পমাল্য দিয়া বরণ করিলেন। সভার কার্য্য আরম্ভ হইলে শ্রীযুক্তা লতিকা দেবী (অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত জে. বড়ুয়ার পত্নী) স্বর্গীয় মহাত্মার বিষয়ে একটী রচনা পাঠ করেন। অতঃপর মিস্ বি. দাস, আর্ল-ল কলেজের ছাত্র শ্রীযুক্ত তারিণীকমল পণ্ডিত বি-এ, মিসেস্ বি. দাস, শ্রীমান এস্. কে. দাস, আর্ল-ল কলেজের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত তীর্থনাথ ফুকন বি-এল্ এবং গৌহাটী বালিকা হাই স্কুলের শিক্ষক শ্রীযুক্ত মাখনলাল মৈত্র প্রভৃতি আরও কয়েকজন বক্তা ও মহিলা তাঁহাদের বক্তৃতা পাঠে সমাগত ভদ্র মহোদয় ও মহিলাদের মনোরঞ্জন করিলেন।

সভাপতি মহাশয় আসামী ভাষায় স্বর্গীয় মহাত্মার বিষয়ে একটী নাতিদীর্ঘ সরস বক্তৃতা করিয়া সকলকে মোহিত করিলেন। শ্রীযুক্ত কমললোচন দাস সভাপতি এবং অন্যান্য সকলকে ধন্যবাদ দিবার পর সভা ভঙ্গ হয়।

দুইটী সঙ্গীত হইয়াছিল। শ্রীযুক্ত বিপিনবিহারী দাস বি. ই, এবং তাঁহার ভ্রাতা শ্রীমান দিলীপকুমার তাঁহাদের সুললিতকণ্ঠের সঙ্গীতে সকলকে মোহিত করিয়াছিলেন।

যদিও মহাত্মা রামমোহন আজ ৯৩ বৎসর হইল নশ্বর দেহ ত্যাগ করিয়াছেন, তথাপি তিনি এখনও জীবিত আছেন। বাঙ্গলা এবং আসাম দেশের সর্ব্বত্রই তিনি সুপরিচিত এবং ভারতের অন্যান্য স্থানেও তাঁহার বাংসরিক স্মৃতিসভা হইয়া থাকে। রামমোহন রায়ের মৃত্যু মৃত্যুই নহে, তাহা অমৃত।

আসামের সহিত সেই সুদূর সময়েও রামমোহনের সম্পর্ক ছিল। ৺গুণাভিরাম বড়ুয়ার এবং ৺আনন্দরাম ঢেকিয়াল ফুকনের জীবনচরিত্র পাঠ করিলে জানা যায় যে, ৺যজ্ঞরাম খারঘরিয়া ফুকনের সহিত রাজার পরিচয় ছিল এবং খারঘরিয়া ফুকন মহাশয় মহাত্মার সহিত উপাসনায় যোগ দিতেন। সেই সময়ে গৌহাটী হইতে কলিকাতায় ডাক বার দিনে যাইত এবং সাধারণ নৌকায় যাইতে একমাস লাগিত। তখন কোনও প্রকার বাষ্পযানের প্রচলন হয় নাই।

মহাভারতের
নীতি-বাক্য।

বনপর্ব্ব।

(৺অনাথকৃষ্ণ দেব কর্ত্তৃক সংগৃহীত)

ব্যাস।—যাহার জন্মাবধি যেরূপ স্বভাব হইয়া থাকে, সে না মরিলে তাহা কদাচ যায় না। স্বজনের সহিত বিবাদ নিতান্ত নিন্দনীয়।

(আরণ্যক পর্ব্বাধ্যায়,—৩১

কৃষ্ণ।—যে ব্যক্তি ঘৃণিত লোকের অনুগামী হয়, সেও বধ্য, এই সনাতন ধর্ম্ম। (ঐ—৪৬

কৃষ্ণ।—স্ত্রী, দ্যূত, মৃগয়া ও সুরাপান এই কামসমুত্থিত ব্যসনচতুষ্টয় দ্বারা লোক শ্রীভ্রষ্ট হয়।

(অজ্জুনাভিগমন পর্ব্বাধ্যায়—৫৭

দ্রৌপদী—ভার্য্যা রক্ষিত হইলে প্রজা রক্ষিত হয়, প্রজা রক্ষা হইলে আত্মা রক্ষিত হইয়া থাকে।

(ঐ—৫১

কৃষ্ণ।—শত্রু সর্ব্বতোভাবে বধার্হ, সে দুর্ব্বল হইলেও বলবানের অনুপেক্ষণীয়। (ঐ—৭৯

কৃষ্ণ।—সেতু ভিন্ন হইলে, জলবেগ নিবারণ করা নিতান্ত সহজ ব্যাপার নহে। (ঐ—৮১

মার্কণ্ডেয়।—সমস্ত ভূতগণ বিধিকৃত বিধানের অনুবর্ত্তী হইয়াই স্বকুলোচিত কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতেছে।

(ঐ—৮৭

বক (মুনি)।—কেহই ব্রাহ্মণকে পরিত্যাগ করিয়া এই লোক বা পরলোক জয় করিতে পারে না। (ঐ—৮৮

দ্রৌপদী।—সময়বিশেষে ক্ষমাও অবলম্বন করিতে হইবে; কেন না যে ক্ষত্রিয় ক্ষমাকালে ক্ষমাবলম্বন না করেন, তিনি সর্ব্বভূতের অপ্রিয় হইয়া ইহকালে বা পরকালে বিনাশপ্রাপ্ত হন। (ঐ—৯০

দ্রৌপদী।—নিরবচ্ছিন্ন তেজ আশ্রয় করিলে কদাচ শ্রেয়োলাভ হইতে পারে না এবং একমাত্র ক্ষমা অবলম্বনেও শুভলাভের ব্যতিক্রম ঘটিয়া থাকে।

যে ব্যক্তি প্রতিনিয়ত কেবল ক্ষমা আশ্রয় করিয়া কালযাপন করে, সে বহুবিধ দোষের আকর হইয়া উঠে।

(ঐ

প্রহ্লাদ।—যিনি ক্রোধভরে অন্যায়পূর্ব্বক মনুষ্যকে বহুবিধ দণ্ড প্রদান করেন, তিনি অচিরাৎ স্বজন, ধন ও প্রাণ হইতে পরিভ্রষ্ট হয়েন সন্দেহ নাই।

(অজ্জুনাভিগমন পর্ব্বাধ্যায়—৯৫

প্রহ্লাদ।—একেবারে তেজ প্রদর্শন করা অথবা একেবারে মৃদুস্বভাব অবলম্বন করা উভয়ই একান্ত বিরুদ্ধ। সময়ানুসারে তেজস্বিতা বা মৃদুভাব আশ্রয় করিবে।

যিনি যথাযোগ্য কালে মৃদুভাবাবলম্বী বা রোষপরবশ হয়েন, তিনিই ইহকাল ও পরকালে অশেষ সুখ সম্ভোগ করিয়া থাকেন। (ঐ—৯৫

পূর্ব্বে যে ব্যক্তি তোমার বহুবিধ উপকার করিয়া পরে কোন গুরুতর অপরাধে পতিত হয়, তাহার উপকার করিয়া সেই অপরাধ ক্ষমা করা উচিত।

যে ব্যক্তি অজ্ঞান বশতঃ অন্যের নিকটে অপরাধী হয় তাহাকে ক্ষমা করা বিধেয়, কারণ সকলে শ্রেয়স্করী বুদ্ধি লাভ করিতে পারে না (ঐ—৯৬

যাহারা বুদ্ধিপূর্ব্বক অপরাধ করিয়া তাহার অপলাপে প্রবৃত্ত হয়, অপকার অল্প হইলেও সেই সকল পাপাত্মা কুটিল লোকদিগকে সংহার করিবে।

প্রথম অপরাধে সকল প্রাণীকেই ক্ষমা করা কর্ত্তব্য।

সামরূপ উপায় দ্বারা কি উগ্রস্বভাব কি মৃদুস্বভাব সম্পন্ন সকলকেই সংহার করা যায়। জগতীতলে সামের অসাধ্য কিছুই নাই, অতএব সামই বলীয়ান উপায়।

দেশকালের প্রতীক্ষা করা সর্ব্বতোভাবে বিধেয়।

(ঐ—৯৬

যুধিষ্ঠির।—ক্রোধ মনুষ্যকে সংহার করে ও ক্রোধই মঙ্গলের কারণ হয়; সুতরাং সমস্ত শুভাশুভ ঘটনা ক্রোধ হইতেই সমুদ্ভূত হইয়া থাকে।

যে ব্যক্তি ক্রোধ সম্বরণ করিতে সমর্থ হয় তাহারই মঙ্গল।

যাহার ক্রোধাবেগ ধারণ করিবার সামর্থ্য নাই, নিদারুণ ক্রোধ তাহারই অমঙ্গলের কারণ হয়।

(ঐ—৯৭

যুধিষ্ঠির।—যে ব্যক্তি ক্রোধীর প্রতি ক্রোধ প্রকাশ না করে, সে আত্ম-পর উভয়কেই মহৎ ভয় হইতে পরিত্রাণ করে; সুতরাং সে ব্যক্তি আত্ম-পর উভয়েরই উপকারক হইয়া উঠে।

দুর্ব্বলের ক্রোধ সংবরণ করাই বিধেয়।

সাধুলোকেরা জিতক্রোধ ব্যক্তিকে সাতিশয় প্রশংসা করিয়া থাকেন।

ক্ষমাপর সজ্জন ব্যক্তির নিশ্চয়ই জয়লাভ হইয়া থাকে।

মিথ্যা অপেক্ষা সত্যই শতগুণে শ্রেষ্ঠ ও নৃশংসাচার অপেক্ষা অনৃশংসতাই নিতান্ত শ্রেয়ঃ।

যিনি বুদ্ধিবলে প্রবল ক্রোধ বশীভূত করিতে সমর্থ হন, যাঁহার হৃদয়াভ্যন্তরে কিঞ্চিন্মাত্র ক্রোধের সঞ্চার থাকে না, তত্ত্বদর্শী পণ্ডিতেরা তাঁহাকেই তেজস্বী বলিয়া নির্দ্দেশ করেন।

(অর্জ্জুনাভিগমন পর্ব্বাধ্যায়—৯৮

মূর্খেরাই ক্রোধকে তেজ বলিয়া নির্ণয় করিয়া থাকে।

যদি স্বধর্ম্ম পরিত্যাগ করিতে হয় তাহাও করিবে, তথাপি কোন ক্রমে ক্রোধাবিষ্ট হইবে না।

হীনমতি মূঢ় ব্যক্তিই ক্ষমার্জ্জবাদি গুণসকল লঙ্ঘন করিয়া থাকে।

তাপিত হইলেই তাপ প্রদান করিবে ও গুরু কর্ত্তৃক আহত হইলেই তাঁহাকে আঘাত করিবে, কেহ আক্রোশ প্রকাশ করিলে তাহার উপর আক্রোশ প্রকাশ করিবে, হিংসা করিলেই হিংসা করিবে এইরূপ রীতি-পদ্ধতির অনুসরণ করিলে সমুদায় জগৎ বিনষ্ট ও অধর্ম্ম পরিবর্দ্ধিত হইত। (ঐ—৯৯-১০০

সর্ব্বপ্রকার আপদেই ক্ষমা বিধেয়।

যে ব্যক্তি আক্রুষ্ট তাড়িত ও ক্রুদ্ধ হইয়াও বলিষ্ঠের প্রতি ক্ষমা প্রদর্শন করিয়া থাকে এবং যে ব্যক্তি প্রভাবসম্পন্ন হইয়াও ক্রোধকে জয় করত ক্ষমাশালী হয় সেই ব্যক্তিই বিদ্বান ও শ্রেষ্ঠ; তাহারই সনাতন লোক লাভ হইয়া থাকে। কিন্তু অল্পবিজ্ঞান-সম্পন্ন রোষপর ব্যক্তির ইহকাল ও পরকাল উভয়ই বিনষ্ট হয়। (ঐ—১০০

বিদুর।—স্বধনে পরিতৃপ্ত হওয়া ও পরধনে লোভ না করাই রাজাদিগের পরম ধর্ম্ম।

(আরণ্যক পর্ব্বাধ্যায়—২১

ব্রাহ্মসমাজে সঙ্কীর্ণতা।

(শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর)

অত্যন্ত দুঃখিত অন্তঃকরণে বলিতে বাধ্য হইতেছি যে, ব্রাহ্মসমাজে সঙ্কীর্ণতা যথেষ্ট প্রবেশ লাভ করিয়াছে। আমরা বহুদিন যাবৎ এই কথা শুনিয়া আসিতেছিলাম, কিন্তু এতদিন কোথাও সঙ্কীর্ণতা স্পষ্টভাবে ব্যক্ত হইতে দেখি নাই। সম্প্রতি রায় সাহেব শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের পুত্রের বিবাহ উপলক্ষে "যুবক"সম্প্রদায় যে মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন, তাহার ভিতর দিয়া তাঁহাদের অন্তরের সাম্প্রদায়িক ও সুতরাং সঙ্কীর্ণ ভাব বড়ই বেশী বাহির হইয়া পড়িয়াছে। বিবাহটী মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথপ্রবর্ত্তিত একেশ্বরবাদসম্মত আদি ব্রাহ্মসমাজের পদ্ধতি অনুসারে সুসম্পন্ন হইয়াছে, একথা আমরা ইতিপূর্ব্বেই পত্রিকার পাঠকবর্গকে জানাইয়াছি। এই উপলক্ষে ব্রহ্মোপাসকমণ্ডলীর বহির্ভূত শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রকুমার বন্দ্ব পরিবার যে উক্ত মণ্ডলীর অন্তর্ভুক্ত হইলেন, সেদিকে "যুবক"সম্প্রদায়ের দৃষ্টি পড়িল না, ইহাই আশ্চর্য্য। আমরা ঢাকায় অবস্থানকালেও ব্রাহ্মদিগের এই সঙ্কীর্ণতার কথা শুনিয়াছিলাম, কিন্তু তাহা বিশ্বাস করিতে প্রবৃত্তি হয় নাই। কিন্তু তাঁহাদের অন্যতর মুখপত্র "যুবক"-পত্রের গত ভাদ্রসংখ্যায় শ্রীমান সুললিত সরকারের পত্র পাঠ করিয়া উহা প্রত্যক্ষ করিলাম। উক্ত পত্রে লিখিত হইয়াছে—"বিবাহ আদিসমাজমতে আচার্য্য দ্বারা ও হিন্দুসমাজমতে পুরোহিত দ্বারা উভয়বিধ উপায়ে সম্পন্ন হইয়াছে"। এই কথা সুললিতবাবু নিশ্চয়ই প্রকৃত ঘটনা না জানিয়াই লিখিয়া থাকিবেন, কারণ উহা একটুও ঠিক নয়। আমাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেও সুললিতবাবু জানিতে পারিতেন যে, আদিসমাজের পদ্ধতিতে যে উপাসনা ও উপদেশ দেওয়া প্রভৃতি কর্ত্তব্য অবধারিত আছে, তাহা সাধারণত বেদী হইতে আচার্য্য করেন; এবং সম্প্রদান, পাণিগ্রহণ প্রভৃতি বিবাহসম্বন্ধীয় অবশ্যকর্ত্তব্য সাধনের জন্য যে সকল মন্ত্র পাঠ করাইতে হয়, সেগুলি সাধারণত পুরোহিতের সাহায্যে সম্পন্ন হইয়া থাকে। সম্ভব হইলে একই পদ্ধতির উক্ত দুইটী অঙ্গ অনুষ্ঠানের গাম্ভীর্য্য ও মাধুর্য্য রক্ষার জন্য দুই ব্যক্তির দ্বারা সম্পন্ন হয়; অভাব পক্ষে একই ব্যক্তির দ্বারা উক্ত দুইটী কার্য্যই সম্পন্ন হয়। ব্রাহ্মসমাজ অসাম্প্রদায়িকতা প্রচারের জন্য, সঙ্কীর্ণতা দূরীকরণের জন্য অবতীর্ণ। ব্রাহ্মসমাজে সাম্প্রদায়িকতা আনিবার অবকাশ নাই। ব্রাহ্মসমাজকে যদি আমরা বাঁচাইতে চাই, তবে ইহা আদিসমাজ, উহা সাধারণ সমাজ এ দৃষ্টিতে দেখিলে চলিবে না—ব্রহ্মোপাসক সকলেরই মিলিতভাবে ব্রাহ্মসমাজকে গৌরবান্বিত করিয়া তুলিতে হইবে।

সাম্প্রদায়িকতাজনিত সঙ্কীর্ণতার কারণে ব্রাহ্মসমাজ যে কোন্ পথে চলিতেছেন, তাহা এখনও আমরা দেখিতেছি না। ব্রহ্মোপাসকমণ্ডলী হইতে, ব্রাহ্মসমাজ হইতে একে একে কত সভ্য যে সরিয়া পড়িয়াছেন ও পড়িতেছেন, তাহা আমাদের অনেকের প্রত্যক্ষ হইলেও আমরা একচক্ষু হরিণের ন্যায় ইচ্ছাপূর্ব্বক মনে স্থান দিতে চাই না—মরণের পথ সম্মুখে বিস্তৃত দেখিয়াও দেখিতে চাই না। সঙ্কীর্ণতার বেষ্টনে ব্রাহ্মসমাজকে ঘিরিয়া রাখিয়া বিনাশের পথ প্রশস্ত করিবার সার্থকতা আমরা বুঝিতে পারিলাম না।

এই সঙ্কীর্ণতা দূরীকরণের একটী প্রধান উপায় হইতেছে বালকদিগের মনে ব্রহ্মোপাসনা এবং ব্রাহ্মসমাজের প্রতি শ্রদ্ধা আনয়ন করা। বাল্যকাল অবধি ব্রহ্মোপাসনা ও ব্রাহ্মসমাজ সম্বন্ধীয় অসাম্প্রদায়িক ভাবে লিখিত গ্রন্থাদি পাঠ করিলেই ঐ প্রকার শ্রদ্ধা ও আস্থা আসিতে পারে এবং অবিচলিত থাকিতে পারে। আমাদের মনে হয়, ব্রাহ্মসমাজের তিন শাখার কর্ত্তৃপক্ষগণ তাঁহাদের নিজ নিজ শাখার প্রকাশিত অসাম্প্রদায়িক ভাবে লিখিত বালোপযোগী পুস্তকের এক-একটী তালিকা প্রস্তুত করিয়া একটী ক্ষুদ্র আলোচনা কমিটির হস্তে প্রদান করিলে ভাল হয়। সেই কমিটি সেই তালিকা হইতে আর একটী ক্ষুদ্র তালিকা প্রতি বৎসরের জন্য প্রস্তুত করিবেন। সেই তালিকাভুক্ত গ্রন্থগুলি ব্রাহ্মসমাজ বা যে কোন ব্রাহ্মের অধীনস্থ প্রত্যেক বিদ্যালয়ে পড়ানো উচিত। আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস, এই প্রকার ব্যবস্থা করিলে সঙ্কীর্ণতা অচিরেই দূরীভূত হইবে।

কালা-আজার ও সার উইলিয়াম লীষম্যান।

(Sir William B. Leishman K.C.M.G., C. B., F. R. S.)

(ডাঃ শ্রীবনওয়ারিলাল চৌধুরী ডি. এস্‌সি)

প্রথিতযশা ডাক্তার লীষম্যান চিকিৎসকজগতের এক মুকুটমণি। অল্পদিন হইল হঠাৎ তাঁহার অভাব হইয়াছে। ভারতের কালা-আজার ব্যাধির নিদান তাঁহারই চেষ্টা ও গবেষণায় নিরাকৃত হইয়াছিল। তিনি গ্লাসগো বিশ্ববিদ্যালয়ে চিকিৎসকের উপাধি লইয়া ১৮৮৭ সনে সৈনিক-বিভাগের ডাক্তার হন। ১৯০০ সনে যখন Sir David Semple ভারতে কাজ লইয়া আসেন তখন লীষম্যান নিদানতত্ত্বের অধ্যাপক নিযুক্ত হন। আমরা সংক্ষেপে কেবল তাঁহার বৈজ্ঞানিক কৃতিত্বের উল্লেখ করিব। রোগের বীজাণু পরীক্ষায় ও আবিষ্কারে নানারূপ রঞ্জন-প্রণালীর অনুশীলন আবশ্যক হয়। লীষম্যানই প্রথম বিশিষ্ট রঞ্জনপ্রণালীর পথ দেখাইয়া অনেকগুলি অদৃষ্ট বীজাণুকে অণুবীক্ষণের গোচরীভূত করিতে সমর্থ হন। তিন বৎসরের ক্রমিক চেষ্টায় তাঁহার নিজ প্রবর্ত্তিত প্রণালী অনুসরণ করিয়া ১৯০৩ খৃঃ অব্দে দমদমের একটি পীড়িত সৈনিকের প্লীহার অংশবিশেষে এক অপূর্ব্বদৃষ্ট লক্ষণবিশিষ্ট বীজাণু দেখিতে পান। এই বীজাণু ইন্দুরের রক্তপ্রবাহে ঢুকাইয়া ইহার স্বরূপের সঙ্গে আফ্রিকার অতি সাংঘাতিক নিদ্রাতুর ব্যাধির (sleeping sickness) জনক ট্রাইপ্যানোসোম (trypanosome) বীজাণুর সাদৃশ্য সপ্রমাণ করেন। এইরূপে ১৯০৩ খৃঃ অব্দে কালা-আজারের নিদান স্থির করিয়া মে মাসে তাঁহার প্রবন্ধ প্রকাশিত করেন। ইহার পরই জুলাই মাসে ডাক্তার ডনোভান মান্দ্রাজের অনেকগুলি প্লীহাগ্রস্ত রোগীর প্লীহার রক্ত হইতে এই বীজাণু পাইবার সংবাদ প্রকাশ করিয়া লীষম্যানের নিদান সমর্থন করেন। ইহার কিছু পরেই "দিল্লীস্ফোটকে" এই বীজাণু পাওয়া যায়। এবং এই একই বীজাণু যে আসামের কালা-আজার এবং দিল্লীস্ফোটকের জনক তাহা সর্ব্বত্র স্বীকৃত হয়। আর আসামের বাহিরেও যে এই রোগপ্রসারের অনেক কেন্দ্র রহিয়াছে তাহার সন্ধান পাওয়া যায়। লীপজিগ নগরে চীন হইতে প্রত্যাগত বক্সার যুদ্ধে আহত একটি সৈনিকের প্লীহাতেও এই বীজাণুর সন্ধান পাওয়া যায় এবং প্রমাণ হয় যে, চীনদেশও এই কালা-আজার রোগের একটি বিশিষ্ট কেন্দ্র।

কলিকাতার ডাক্তার রজার্স সাহেব এই বীজাণুকে প্রাণীর শরীরের বাহিরে পোষণ করিয়া ইহাকে ট্রাইপ্যানোসোম-জাতীয় * বলিয়াই সিদ্ধান্ত করিয়াছিলেন। কিন্তু পরবর্ত্তী নবেম্বরে ম্যালেরিয়া বীজাণুর আবিষ্কর্ত্তা ডাক্তার রোণাল্ড-রস এবং ১৯০৭ খৃঃ অব্দের সেপ্টেম্বর মাসে লীষম্যান স্বয়ং প্রমাণ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন যে এই বীজাণু নিদ্রাব্যাধির জনক ট্রাইপ্যানোসোম হইতে একটি স্বতন্ত্র জাতীয় জীব এবং এক প্রকার মাছির উদরে ঐরূপ বীজাণুর অনুরূপ আর একটি বীজাণু পাওয়া যায়। আজ বিশ বৎসর পর অনেক অনুসন্ধানের ফলে অনুমান করা হইতেছে যে এক প্রকার বালু-মক্ষিকার (sand-fly) উদরে এই কালা-আজার ও দিল্লীস্ফোটকের জনক বীজাণুর বাসস্থান।

কালা-আজারের বীজাণু ব্যতীত উকুনের উদরেও তিনি আর এক প্রকার বীজাণুর সন্ধান পাইয়াছিলেন। ইহাও এক প্রকার সাংঘাতিক জ্বর (Typhus জাতীয়) সংক্রমণ করে। টাইফয়েড জ্বরের প্রতিষেধক টীকার আবিষ্কার ও প্রচলনে লীষম্যান অনেক চেষ্টা করিয়া কৃতকার্য্যতা লাভ করিয়া গিয়াছেন। মানুষের রক্তে শ্বেতকণিকার কার্য্যকরী শক্তির ও সংক্রামক রোগ নিবারণকারী শক্তির অনেক তত্ত্ব লীষম্যান সমাধান করিয়া গিয়াছেন। এরূপ যশস্বী চিকিৎসক ও নিদানতত্ত্ববিদের মৃত্যুতে চিকিৎসাশাস্ত্র বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হইল। ভারতবর্ষ রোগের আকর এবং আমাদের প্রতি গৃহ ব্যাধিমন্দির। যে সব মহাত্মা আমাদের এই সব আধিভৌতিক বিপদজালের নিরাকরণে সাহায্য করিতেছিলেন তাঁহাদের হঠাৎ অভাব আমাদের হতাশ্বাসের মাত্রা বাড়াইয়া দেয়। সুশ্রুত, বাগ্‌ভট ও মাধবের দেশে আজ রোগমূলের আবিষ্কর্ত্তার অভাব হইয়া পড়িয়াছে। তাই বিদেশী বুধগণ আমাদের প্রাণান্তক রোগের নিদান স্থির করিয়া আমাদের রক্ষার উপায় করিতেছেন। তাঁহাদের কার্য্যাবলী স্মরণ করিয়া তাঁহাদের প্রতি আমাদের কর্ত্তব্য পালন করা সঙ্গত।

গান।

(শ্রীপঞ্চানন রায়)

ভৈরবী—একতালা।

মম অন্তর হতে ঝঙ্কৃত শত ক্রন্দনযুত বন্দনা,
তোমারি অযুত শ্রবণে ধ্বনিত মোহন গীতি-মূর্চ্ছনা।

---

* আজকাল "কালাজ্বর" বলিয়া যে প্রচলিত কথা শুনিতে পাওয়া যায় উহা আসামী ভাষায় কালা-আজার। আজার শব্দে মৃত্যু বুঝায়। ঐ ব্যাধিরামে রোগীর শেষ অবস্থায় কালা-শিরা পড়ে বলিয়া উহার ঐরূপ নামকরণ হইয়াছে।

আমি নীরবে গেয়েছি যত গান
তুমি সকলি শুনেছ ভগবান
মম সঙ্গীত-রস করি পান, তুমি মোরেই করেছ বঞ্চনা।
ওগো ও-ছলে ভুলি না আমি আর
তাই বেঁধেই রেখেছি হৃদি-তার
তুমি বাজাবে স্বকরে অনিবার, তুলি সুমধুর সুর-ঝঞ্জনা।
আমি বিজনে একাকী সাথী-হীন
ভয়ে ক্ষীণ তনু, আমি অতি দীন
তুমি এস প্রিয়তম নিশিদিন মোর রবে নাক কেন যন্ত্রণা॥

গ্রন্থ-পরিচয়।

(শ্রীক্ষেমেন্দ্রনাথ ঠাকুর বি. এস্‌-সি)

সুকথা (দ্বিতীয় শ্রেণীর শিশুগণের জন্য)।—'মল্লিকা' ও 'অঞ্জলি' রচয়িত্রী শ্রীমতী চারুবালা দেবী প্রণীত। প্রকাশক :—ভট্টাচার্য্য এণ্ড সন্ ৬৫ কলেজষ্ট্রীট্ কলিকাতা এবং ঢাকা ও ময়মনসিংহ। মূল্য এগার পয়সা মাত্র।

লেখিকা 'সাধক রামপ্রসদ' ও 'কমলাকান্ত' প্রভৃতি প্রসিদ্ধ গ্রন্থরচয়িতা শ্রীঅতুলচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের পত্নী। এই সচিত্র পুস্তকটীতে শিশুদের উপযোগী নানা বিষয় সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। শিক্ষকমহাশয়গণ অনায়াসে এই পুস্তকটী স্ব স্ব বিদ্যালয়ের পাঠ্যভুক্ত করিতে পারেন। ইহার দ্বিতীয় সংস্করণ হইয়াছে, তাহা হইতেই ইহার উপযোগিতা জানা যায়। 'এডুকেশন ডিপার্টমেণ্ট'ও ইহা প্রাথমিক শিক্ষার জন্য অনুমোদন করিয়াছেন।

বর্ত্তমানে কলিকাতা কর্পোরেশনের অধীনে কতকগুলি প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে। কর্পোরেশনের শিক্ষাবিভাগ যদি এই পুস্তকটী তাঁহাদের বিদ্যালয়গুলিতে প্রচলন করেন তবে তাঁহাদের ত কোনই ক্ষতি হইবে না, কিন্তু এই দুঃস্থ সাহিত্যিক পরিবারের বিশেষ উপকার হইবে সন্দেহ নাই। আমরা আশা করি কর্পোরেশনের শিক্ষাবিভাগ এই বিষয়ে বিশেষ বিবেচনা করিবেন।

সংবাদ।

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা।—"গ্যালারি"র রুচির অনুসরণই বর্ত্তমান যুগের অধিকাংশ সাময়িক পত্রিকার একমাত্র ব্রত হইয়া দাঁড়াইতেছে। কেবল তত্ত্ববোধিনীই এ পর্য্যন্ত এই প্রলোভনের পথ অতিক্রম করিয়া এই সুদীর্ঘ ৮৪ বৎসর যাবৎ কেবল আপনার সত্য আদর্শেরই অনুসরণ করিয়া আসিতেছে। সুখের বিষয়, ইহার অসাম্প্রদায়িকতা ও সত্যপ্রিয়তা অধুনা অনেকের দৃষ্টিপথে পড়িতেছে। সম্প্রতি বৈদ্যমহোপাধ্যায় কবিরাজ শ্রীগিরিজাপ্রসন্ন সেন আয়ুর্ব্বেদরত্নাকর মহাশয় আমাদিগকে এ বিষয়ে স্বতঃপ্রণোদিত হইয়া যে পত্র লিখিয়াছেন তাহা আমরা আনন্দের সহিত নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম :—

"আপনার তত্ত্ববোধিনী আমি নিয়মিতরূপে আন্তরিকতার সহিত ভক্তিপূর্ব্বক পাঠ করি। এরূপ সাম্প্রদায়িকতাশূন্য নিরপেক্ষ ধর্ম্মসম্বন্ধীয় কাগজ বর্ত্তমানে নাই। যে কোন ধর্ম্মসম্প্রদায় এই কাগজকে নিজের সম্প্রদায়ের কাগজ বলিয়া মনে করিতে পারেন।

ভগবানের নিকট প্রার্থনা করি আপনি সুস্থশরীরে দীর্ঘজীবন লাভ করিয়া বিশ্বজনীন ধর্ম্ম ও সৎসাহিত্যের প্রচার করুন।

শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত বনওয়ারিলাল চৌধুরী মহাশয়কে অন্যতম সম্পাদক নির্ব্বাচন করিয়া প্রকৃত যোগ্য ব্যক্তির সমাদর করিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত ক্ষেমেন্দ্রনাথ ঠাকুরের নির্ভীক ও ওজস্বিনী রচনা পাঠ করিয়া আমি ক্রমশঃ তাঁহার অনুরাগী হইয়া উঠিতেছি।"

আয়-ব্যয়।

১৮৪১ শক, সন ১৩৩২ সাল।

আয়	৭৭২৮৮/৯
পূর্ব্বকার স্থিত	৪৩॥৵৯
সমষ্টি	৭৭৭২॥/৬
বাদ খরচ	৭৭৫৫॥০
স্থিত	১৭/৬

আয়।

ব্রাহ্মসমাজ।

মাসিক দান	২০০০৲
বাৎসরিক দান	৫৲
উৎসবের দান	২২৮০
আনুষ্ঠানিক দান	১১৮/০
এককালীন দান	৩৲
বেঙ্গল অগার হাউসের ডিভিডেণ্ড	১০৲
বিবিধ	৮॥৶০
ঋণগ্রহণ	৩০৫২।/৩
সমষ্টি	৪২১৪॥/৬

তত্ত্ববোধিনী।

বকেয়া	১৪৯।৶০
হাল	১৫০৲
বিজ্ঞাপন	২১৯৲
মাশুল	২৮/০
নগদ	৩৲
অগ্রিম	১৮/০
সমষ্টি	৫৫৭।৵০

যন্ত্রালয়।

পুস্তক মুদ্রণ	২১৬৲
কাগজ	২৪৸০
দপ্তরী	৪৪॥৵৩
অন্যান্য	৩৫॥৶০
	৩২১/৩

পুস্তকালয়।

সমাজের পুস্তক	৩৪৸/০
গচ্ছিত পুস্তক	৫৩৸৵০
মাশুল	৬।/০
গীতারহস্যের মূল্য	১৪৫৫৲
গীতারহস্যের মাশুল	৮৫৸৵০
সমষ্টি	১৬৩৫৸৵০
সর্ব্ব সমষ্টি	৭৭২৮৸৵৯

ব্যয়।

ব্রাহ্মসমাজ।

কর্ম্মচারীর বেতন	৮৫৯৸/০
ইলেক্‌ট্রিক লাইট	৪০/০
ইলেক্‌ট্রিক মেরামত	৩৩৮৲
ট্যাক্স	২৩৬।৵০
লাইসেন্স	১২৲
মাঘোৎসব	১০৪॥/৩
হারমোনিয়ম মেরামত	২০৲
অন্যান্য	৩০৭।৶৬
ঋণশোধ	১৪২৯৵৩
সমষ্টি	৩৩৪৭।৶০

তত্ত্ববোধিনী।

বেতন	১১৬।/০
দপ্তরী	২৫॥৵৬
মাশুল	৮৪॥৶৯
অন্যান্য	৬৬/৯
কাগজ	১৪৯।৬
কমিশন	২২॥০
মুদ্রাঙ্কন	২৮৲
প্রবন্ধ	৮৲
সমষ্টি	৫০০॥/৬

যন্ত্রালয়।

কর্ম্মচারীর বেতন	১৩৮৬৸৯
কাগজ	৯৯/৩
দপ্তরী	৭৩৲
অতিরিক্ত পারিশ্রমিক	১৯৩৸৵০
বিবিধ	১৩৯/০
সমষ্টি	১৮৯১৸/০

পুস্তকালয়।

কাগজ	৩২/০
বেতন	৬৭৵০
মাশুল	১৮।৵৩
দপ্তরী	১৯৫৵৬
গীতারহস্যের মূল্য	১১৩০।৶০
গীতারহস্য বাঁধাই	১৬২।৵০
গীতারহস্যের মাশুল	৮৪/৬
গীতার কমিশন	২৩৭।৵৩
অন্যান্য	৮৮॥৵০
সমষ্টি	২০১৫॥৵৬
সর্ব্বসমষ্টি	৭৭৫৫।০

আয়-ব্যয়।

১৮৪৮ শকের বৈশাখ হইতে কার্ত্তিক অবধি সাত মাসের হিসাব।

আয়	৬৫২৬॥/৩
পূর্ব্বকার স্থিত	১৭/৬
সমষ্টি	৬৫৪৩॥৵৯
ব্যয়	৬৫৩৫৸৶৯
স্থিত	৭॥৶০

আয়।

ব্রাহ্মসমাজ।

বাৎসরিক দান	৬৸/০
এককালীন দান	২৫৲
আনুষ্ঠানিক দান	১৫৲
বিশেষ কার্য্যের দান	২৲
বণ্ডেড্‌ অয়ার হাউসের ডিভিডেণ্ড	৫০৲
কোম্পানি কাগজের সুদ	৫ ৫ ৶০
কোম্পানি কাগজ বিক্রয়	২২৯০৸০
হাওলাত আদায়	৮১৲
সস্‌পেন্স আদায়	১৩৮৲
ঋণগ্রহণ	১৭৫২॥/৩
হাওলাত জমা	২।/০
সমষ্টি	৪৮৬৮॥৵৩

তত্ত্ববোধিনী।

বকেয়া	৮৯৸৶০
হাল	৫৬৸/০
বিজ্ঞাপন	৭৯৲
মাশুল	৮॥০
নগদ	॥৵০
সমষ্টি	২৩৪৸৵০

যন্ত্রালয়।

অপরের পুস্তক মুদ্রণ	৫৮৲
কাগজের মূল্য	১৬৪৸০
	২২২৸০

পুস্তকালয়।

সমাজের পুস্তক	৭৪৸৵০
গচ্ছিত পুস্তক	২৯৸০
মাশুল	॥০
গীতারহস্যের মূল্য	৪৭৪৲
ঐ মাশুল	২১৶০
গীতা তর্জ্জমা	৬০০৲
সমষ্টি	১২০০।/০

ব্যয়।

ব্রাহ্মসমাজ।

বেতন	২৮২৸০
সরঞ্জামী	৪‖৹৬
মাশুল	৫।/৩
ইলেক্‌ট্রিক্	২৬।৵০
কেরাসিন	৪৸০
বারবরদারী	১৭/৬
বিবিধ	১৩৮৸৵৬
পাখাকুলী	১‖৵০
হাওলাত প্রদান	৭১৲
সস্‌পেন্স	১৭৫‖০
হারমোনিয়াম মেরামত	৮৲
পার্ব্বণী	১।/০
দান ফেরৎ	১০০৲
হাওলাত শোধ	১৸৵৬
মাঘোৎসব	৩‖৹৬
আসবাব	৫৸৵৩
লাইসেন্স	১২৲
ড্রেণ পরিষ্কার	‖/০
ঋণশোধ	৩০৫১৸৵০
সমষ্টি	৩৯১৩৶০

তত্ত্ববোধিনী।

কাগজ	১৫৬৲
দপ্তরী	৪৬৸৶০
মাশুল	৩১৻৬
বেতন	১০২৸০
বিবিধ	৩।৶০
প্রবন্ধ	২৯৸/০
মূল্য আদায়ের কমিশন	৮৲
বিজ্ঞাপন	৪‖০
বিজ্ঞাপনের কমিশন	১‖৵১০
সমষ্টি	৩৯৩৵৬

যন্ত্রালয়।

বেতন	৭৫৮।৶০
জলপানী	৩‖০
অতিরিক্ত পারিশ্রমিক	১৪/০
কাগজ ক্রয়	১৫৮‖৶৩
কালি	৮।৵০
তৈল	৪‖/৬
সাজিমাটী	২৲
রুলঢালাই	২৵০
তামাক	২৸৵৬
ময়দা লেই	৸৵৩
শিরীষ	৩।৶০
দপ্তরী	৬৯‖০
বিবিধ	২৫।৶০
মাশুল	১৶০
প্রুফ কাগজ	২।০
বাতি	/০
ব্রাস	৶০
সমষ্টি	১০৫৭‖৵৬

পুস্তকালয়।

গচ্ছিত পুস্তকের মূল্য শোধ	২।০
কমিশন	২৩/০
বেতন	৩৭‖
বিবিধ	‖৶৯
মাশুল	৫৵০
গীতারহস্যের বাঁধাই	১০৬৸৬
গীতারহস্যের মূল্য	৩২৬।০
গীতারহস্যের মাশুল	২১।৶৬
গীতার কমিশন	৩৩/০
বিবিধ	৪‖/০
বিজ্ঞাপন	৮৲
গীতার তর্জ্জমা	৬০০৲
সমষ্টি	১১৬৯৻৯
সর্ব্বসমষ্টি	৬৫৩২৸৶৯

আদিব্রাহ্মসমাজের ১৮৪৮ শকের জন্য কর্ম্মচারী নিয়োগ।

গত ৯ই আশ্বিন রবিবার আদিব্রাহ্মসমাজের দ্বিতল গৃহে অধ্যক্ষ সভার যে অধিবেশন হইয়াছিল, তাহার নির্দ্দেশক্রমে এবং ট্রষ্টী ও সম্পাদক শ্রীযুক্ত ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের সম্মতিক্রমে আদিব্রাহ্মসমাজের কার্য্যনির্ব্বাহের জন্য নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ যথালিখিত পদে নিযুক্ত হইলেন।

সম্পাদক

শ্রীযুক্ত ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর বি-এ, তত্ত্বনিধি।

সহযোগী সম্পাদক

শ্রীযুক্ত ক্ষেমেন্দ্রনাথ ঠাকুর বি, এস্-সি।

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার সম্পাদক

শ্রীযুক্ত ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর বি-এ, তত্ত্বনিধি।

এবং

ডাঃ শ্রীযুক্ত বনওয়ারিলাল চৌধুরী ডি, এস্-সি।

সহকারী সম্পাদক

শ্রীযুক্ত ক্ষেমেন্দ্রনাথ ঠাকুর বি, এস্-সি।

কর্ম্মাধ্যক্ষ

শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র সাংখ্যবেদান্ততীর্থ।

হিসাবরক্ষক

শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার ভট্টাচার্য্য।

Tattwabodhini Patrika

Reg. No. C. 432.

একবিংশ কল্প

চতুর্থ ভাগ

পৌষ, ব্রাহ্মসম্বৎ ৯৭।

১০০১ সংখ্যা

১৮৪৮ শক

তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা

"ব্রহ্ম বা একমিদমগ্র আসীন্নান্যৎ কিঞ্চনাসীত্তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রন্নিরবয়বমেকমেবাদ্বিতীয়ম্ সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয়ং সর্ব্ববিৎ সর্ব্বশক্তিমদ্ধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্যসাধনঞ্চ তদুপাসনমেব"।

সম্পাদক—

শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও ডাক্তার শ্রীবনওয়ারিলাল চৌধুরী ডি, এস্‌সি

সহঃ সম্পাদক—শ্রীক্ষেমেন্দ্রনাথ ঠাকুর বি, এস-সি।

৫৫ নং অপার চিৎপুর রোড্ কলিকাতা, আদিব্রাহ্মসমাজ যন্ত্রে শ্রীরণগোপাল চক্রবর্ত্তী দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

সাল ১৩৩৩। খৃঃ ১৯২৭। সম্বৎ ১৯৮৩। কলিগতাব্দ ৫০২৭। পৌষ।

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার বার্ষিক মূল্য ৩৲ টাকা ডাকমাশুল ৵০ আনা। এই সংখ্যার মূল্য ।০ আনা। } আদিব্রাহ্মসমাজের কর্ম্মাধ্যক্ষের নামে পাঠাইতে হইবে।

একবিংশ কল্প

চতুর্থ ভাগ

পৌষ, ব্রাহ্মসম্বৎ ৯৭।

১০০১ সংখ্যা ১৮৪৮ শক

তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা

"ব্রহ্ম বা একমিদমগ্র আসীন্নান্যৎ কিঞ্চনাসীত্তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রন্নিরবয়বমেকমেবাদ্বিতীয়ম্ সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয়ং সর্ব্ববিৎ সর্ব্বশক্তিমদ্ধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্যসাধনঞ্চ তদুপাসনমেব"।

সম্পাদক—

শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও ডাক্তার শ্রীবনওয়ারিলাল চৌধুরী ডি, এস্‌সি

সহঃ সম্পাদক—শ্রীক্ষেমেন্দ্রনাথ ঠাকুর বি, এস-সি।

কলিগতাব্দ ৫০২৭। সম্বৎ ১৯৮৩। খৃঃ ১৯২৬। শক ১৮৪৮। সাল ১৩৩৩।

মুক্তি কোথায়?

(শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর)

কে তুমি অনন্তের পথে চলিয়াছ? অনন্তের পথে তুমি কাহার সন্ধানে চলিয়াছ? কোন্ সুন্দর পুরুষ তোমার মনোহরণ করিয়াছেন? দিকে দিকে ত সৌন্দর্য্য ছড়াইয়া পড়িয়া আছে—তাহাতেও কি তুমি তৃপ্তিলাভ কর নাই? আরও সৌন্দর্য্য চাও? আমি বুঝিয়াছি—কেন তুমি এত সৌন্দর্য্যের মধ্যেও অতৃপ্তির খুঁৎ-খুঁতানি লইয়া বাস করিতেছ। তুমি এক জন পুরুষ—ইচ্ছাশীল, জ্ঞানবান্ ও সৌন্দর্য্য-বোধবিশিষ্ট পুরুষ; এই সমস্ত জড়ে তোমার অচল সৌন্দর্য্যতৃপ্তি আসিতেছে না। তুমি চাও—নিত্য সচল পুরুষের সৌন্দর্য্যে নিজের সৌন্দর্য্যবোধকে ডুবাইয়া দিয়া আপনাকে নিত্য নব রসে অভিষিক্ত করিতে। ভাল; কিন্তু সেই আসল সুন্দর পুরুষের পূর্ণ সৌন্দর্য্য যদি তোমার সম্মুখে সহসা প্রকাশিত হয়, তাহাই কি তুমি দেখিতে পাইবে? পাইলেও তুমি তাহা ধারণা করিতে পারিবে না—তোমার চক্ষু ঝলসিয়া যাইবে। অনন্ত সুন্দর পুরুষের সন্ধানে তুমি যাইতেছ—যাও। কিন্তু তোমাকে আমি একটি রহস্য বলিয়া দিই। সেই সুন্দর পুরুষের আদেশে তাঁহার প্রিয়কার্য্যসাধন করিতে যাইয়া ব্যথা পাইয়াছেন, আহত হইয়াছেন, এমন অনেক ত্যাগী পুরুষ তোমার যাত্রাপথের দুই ধারে দেখিতে পাইবে। তাঁহাদের চক্ষুর দিকে এক বার দৃষ্টিপাত করিও—দেখিবে, সেই চক্ষুর ভিতর হইতে কি বীর্য্য, কি তেজ, আর সেই সঙ্গে কি মাধুর্য্য, কি সৌন্দর্য্য প্রকাশ পাইতেছে! তাঁহাদের সেই অটল অচল ধৈর্য্যপূর্ণ মধুর দৃষ্টিতেই সেই মহান্ সুন্দর পুরুষের সকল সৌন্দর্য্যের সুন্দর প্রতিচ্ছায়া দেখিতে পাইবে।

প্রকৃতির প্রতি অণু-পরমাণুতে ত সেই মহাসুন্দরের হাতের ছাপ মুদ্রিত আছে। কিন্তু সকল সময়ে সকল অবস্থায় সেই ছাপ আমাদের মনোযোগ ভালরূপ আকর্ষণ করিতে পারে না। অনেক সময়েই আমাদের দৃষ্টি সেই ছাপের উপর নিপতিত হইলেও কেমন সহজেই পিছলাইয়া যায়; কিন্তু অবস্থাবিশেষে পিছলাইয়া না যাইয়া আটকাইয়া যায়। প্রলয়ের অনুবোধক ঘোর অন্ধকার নিশীথের গগন আচ্ছাদিত রাখে। কিন্তু রাত্রিশেষে যখন সেই অন্ধকার কনক-তপনের অরুণ-কিরণের সহিত সংগ্রাম করিতে করিতে দৃষ্টিসীমান্ত কুজ্ঝটিকার আকারে একটু একটু করিয়া সরিয়া যাইতে থাকে এবং অরুণ-তপন যখন বিজয়ীর বেশে আমাদের দৃষ্টিপথে প্রকাশিত হয়, তখন সেই আবির্ভাবের মধ্যে সুন্দর পুরুষের সুন্দর হাতের ছাপ বড়ই সুস্পষ্ট প্রকাশ পায় এবং আমাদের মনকে তাহার দিকে সবলে আকর্ষণ করিয়া ধরিয়া রাখে। তাই মনে হয়—বুঝি বা, যেখানে রুধিরাক্ত প্রলয়ের

তাণ্ডব নৃত্য চলিতেছে, সেই স্থানেই শ্যামল সৃষ্টির নবীন ভাবের মধ্যে এক আশ্চর্য্য সৌন্দর্য্য উঁকি-ঝুঁকি মারিয়া ব্যাকুলভাবে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে থাকে। তাই বুঝি কবিরা বলেন যে, সৃষ্টি ও স্থিতির ভিতরেও যাঁহার সুন্দর হাতের ছাপ দেখা যায়, প্রলয়ের ভিতরেও তাঁহারই সুন্দর হাতের ছাপ দেখা যায়।

প্রলয়ের ভিতরেও যাঁহার গম্ভীর সৌন্দর্য্য দেখা যায়, তাঁহাকে দেখিবার জন্য তুমি কোথায় ঘুরিয়া বেড়াইতেছ? প্রলয়পয়োধি ভেদ করিয়া যিনি এই সৃষ্টিকে তুলিয়া ধরিয়া তাহার মধ্যে স্বপ্রকাশ হইয়াছেন, নিজের সৌন্দর্য্যধারা ঢালিয়া দিয়াছেন, তাঁহার সন্ধান পাইবার জন্য তুমি এ দিক্ ও দিক্ বৃথা ছুটাছুটি করিতেছ কেন? যে দিকেই তুমি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিবে, সেই দিকেই ত প্রতি অণু-পরমাণুরই ভিতরে তাঁহাকে দেখিতে পাইবে। তবু আমি তোমাকে একটি গুপ্তরহস্যের সন্ধান দিতেছি। তুমি যাহাদিগকে পাপী বলিয়া ঘৃণা কর, যাহাদের মুখ দেখিলে অমঙ্গলের সম্ভাবনা আশঙ্কা কর, সেই সকল পাপীদের মধ্যে যাহারা ফিরিয়া গিয়া শুদ্ধ অপাপবিদ্ধের চরণে আত্মনিবেদন করিয়াছে, তাহাদের ভিতরে সেই মহান্ সুন্দর পুরুষের সর্ব্বাপেক্ষা সমুজ্জ্বল প্রকাশ দেখিতে পাইবে। আত্মনিবেদিত পাপীর মধ্য দিয়াই তিনি সব চেয়ে বেশী আত্মপ্রকাশ করেন। পাপীর মধ্যেও তাঁহার প্রকাশ দেখিলে তীর্থে তীর্থে ঘুরিয়া তাঁহার সন্ধান করিবার প্রয়োজন হইবে না।

পাপীর ভিতরেও এই প্রকারে ভগবানের আত্মপ্রকাশ দেখিলে কেবল যে তীর্থে তীর্থে ঘুরিবার প্রয়োজন হইবে না, তাহা নহে; কেবল যে তাঁহাকে নির্জ্জনের ভিতরে, আর গভীর ধ্যানের মাঝেই স্বপ্রকাশ দেখিতে পাইবে, তাহা নহে; তখন তুমি তাঁহাকে হাটে-ঘাটে-বাটে, অর্থাৎ সর্ব্বত্র ও সকল সময়েই স্বপ্রকাশ দেখিবে; তখন তুমি তাঁহাকে নির্জ্জনের ন্যায় সজনেরও ভিতরে প্রত্যক্ষ করিবে; তখন তুমি তাঁহাকে ধ্যানের মত কর্ম্মের প্রবল-ঝঞ্ঝনার ভিতরেও উপলব্ধি করিবে। তখন তুমি বুঝিতে পারিবে—কবীর কেন গাহিয়াছেন,—

"পানিমে মীন পিয়াসী রে—
মোক শুনত শুনত লাগে হাসি রে।"

যখন তুমি তাঁহাকে এই প্রকারে অন্তরে বাহিরে প্রত্যক্ষ করিবে, তখনই তুমি তাঁহাকে প্রিয়তম বলিয়া জানিতে পারিবে। তখনই উপনিষদের ঋষিদের মত তোমারও নিকটে তিনি "তদেতৎ প্রেয়ঃ পুত্রাৎ প্রেয়ো বিত্তাৎ প্রেয়োঽন্যস্মাৎ সর্ব্বস্মাৎ"—পুত্র হইতে প্রিয়, বিত্ত হইতে প্রিয় এবং অন্য সকল হইতে প্রিয়তমরূপে প্রকাশিত হইবেন। তখন আর তোমার এই জিজ্ঞাসার অবসরই আসিবে না যে, তোমার প্রিয়তম আছেন, কি নাই? তখন ত তিনি তোমার চতুর্দ্দিকেই মহাসত্যরূপে দেদীপ্যমান হইয়া উঠিবেন—তোমায় "নাই" বলিতে দিবে কে? তখন তুমি সুখসমুদ্রের ভিতরেও যেমন তাঁহার বরাভয়প্রদ দক্ষিণ-হস্ত দেখিতে পাইবে, তেমনই দুঃখ-বিপদের ভিতরেও সেই রুদ্রদেবেরই প্রসন্ন বদন দেখিয়া ধৈর্য্যে ও শ্রদ্ধা-ভক্তিতে অটল অচল হইয়া থাকিবে।

সেই অটল অচল শ্রদ্ধা-ভক্তি লইয়া যখন তুমি কর্ম্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইবে, তখন তোমার সে বল, বীর্য্য ও তেজের সম্মুখে দাঁড়াইবে, কাহার সাধ্য? তখন তোমার রসনা অগ্নিময় হইয়া উঠিবে; তখন তোমার প্রতি বাক্য চতুর্দ্দিকে অগ্নিকণা ছড়াইতে থাকিবে। তখন তুমি কর্ম্মক্ষেত্রের কঠোর সংগ্রামের মধ্যে পড়িয়া যদি নিহতও হও, তবে ত তোমাকে অভিনন্দন করিয়া সাদরে গ্রহণ করিবার জন্য দেবগণের মধ্যে উলুধ্বনি পড়িয়া যাইবে। জয়-পরাজয়, লাভ-লোকসান উভয়ের প্রতি সমচিত্ত হইয়া যখন তাঁহার চরণে সর্ব্বস্ব নিবেদন করিতে পারিবে, তখন তুমি সংসারে জয়ী হইলেও জয়ী, আর পরাজয় লাভ করিলেও জয়ী। তখন তোমার জীবনের প্রতি মুহূর্ত্ত—অতীত, বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ—অনন্তকাল ধরিয়া তোমার বিজয়ঘোষণা করিতে থাকিবে।

তাঁহার চরণে সর্ব্বস্ব নিবেদন করিলে ত বিজয়ী হইবেই; কিন্তু এই সর্ব্বস্ব নিবেদন করা কখন্ সহজসাধ্য হয়, তাহা কি জান? আবার একটি গুপ্ত সুড়ঙ্গের সন্ধান দিতে অগ্রসর হইতেছি—অনধিকারীর নিকটে সহজে এই সন্ধানের সংবাদ

দিও না। সুখসম্পদ যখন তোমার হাতের কাছে আসিয়া বিকশিতদন্তে হাস্য করিতে থাকিবে,—ভাল করিয়া ভাবিয়া দেখিও—তখন তুমি "তাঁহার চরণে এই সর্ব্বস্ব নিবেদন করিলাম" বলিয়া বাহিরের লোক-দেখানো ভড়ং করিলেও কিছুতেই সত্য-সত্য সর্ব্বস্ব নিবেদন করিতে পারিবেই না। সত্য বলিতে কি, তোমার প্রিয়তম সেই লোক-দেখানো পূজা গ্রহণ করিতে আসিবেনই না। কিন্তু, যখন দুঃখ-জ্বালার তীক্ষ্ণধার করাত তোমার হৃদয়ের ভিতর কুরিয়া কুরিয়া একটা গুপ্ত স্থান প্রস্তুত করিবে এবং সেই স্থানটি যখন তুমি অশ্রুবিধৌত করিয়া সুমার্জ্জিত করিবে, তখনই দেখিবে, তোমার প্রিয়তম কোথা হইতে গুপ্তভাবে আসিয়া সেই গুপ্ত স্থানটি তোমার অজানত অধিকার করিয়া বসিয়া আছেন এবং অন্য কথা দূরে থাক, তোমার দুই বিন্দু অশ্রু তাঁহার চরণে নিবেদন করিলেও তিনি তাহা সাদরে গ্রহণ করিবেন।

তিনি যখন তোমার সেই নিবেদিত অশ্রু গ্রহণ করিবেন, তখন সেই অশ্রুই যে তাঁহার আশীষরূপে ঘুরিয়া ফিরিয়া তোমার অন্তরে বজ্রের বল প্রদান করিবে। অশ্রু তাঁহারই বলের কণা লাভ করিয়া বজ্রের বল ধারণ করিবে। তুমি ত জান যে, তাঁহার বলক্রিয়া লুকানো নাই—প্রকৃতির প্রতি অণু-পরমাণুতে তাহা স্বপ্রকাশ। সেই বলক্রিয়ার প্রভাবে সূর্য্য-চন্দ্র-গ্রহ-নক্ষত্র হইতে ধূলিকণা পর্য্যন্ত ছন্দে ছন্দে নৃত্য করিতেছে। সেই বল অপ্রতিহত—কাহার সাধ্য যে, তাহার সম্মুখে দাঁড়ায়, তাহাকে প্রতিহত করে? সেই বলের অধিকারীই যখন তোমার অন্তরে আসন গ্রহণ করিবেন, তখন দুঃখ-দৈন্যই বা কোথায়, নিরাশা-নিরানন্দই বা কোথায়? তখন তুমি স্পষ্টই দেখিতে পাইবে যে, ইহা খুবই সত্য কথা যে, তিনি অসহায়ের সহায়, দুর্ব্বলের বল; তিনি অনাথের নাথ। তখন তোমার মন-প্রাণ নিশ্চয়ই আশায় ও আনন্দে ভরপুর হইয়া উঠিবে। তখন তোমাকে দুঃখ-ক্লেশ ব্যথা দিতে পারিবে না; কর্ম্মের ভীষণ গর্জ্জনও তোমার অন্তরের নীরবতা ভাঙ্গিতে পারিবে না। তখন হিমালয়ের উত্তুঙ্গ শৃঙ্গে, যেখানে প্রাণিমাত্রের চিহ্ন দৃষ্ট হয় না, যেখানে নীরবতা মূর্ত্তিপরিগ্রহ করিয়া নিত্য বিদ্যমান, সেখানেও তুমি। আবার সমতল ভূমির কর্ম্মক্ষেত্রে, যেখানে কোলাহল-কলরব, দুঃখ-দৈন্যের ক্রন্দন-হাহাকার নিত্য জাগ্রত, যেখানে সংসার-সংগ্রামের উত্তালতরঙ্গ মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে বজ্রধ্বনি করিয়া তোমায় গ্রাস করিবার বিভীষিকা প্রদর্শন করে, সেখানেও তুমি। তখন তুমি পথহারা পথিকের শ্রান্তি-ক্লান্তির মধ্যে, তাহার হতাশ প্রাণে অতুল বল-বীর্য্য ও শক্তি-সামর্থ্য ঢালিয়া দিয়া সহজেই তাহাকে নবজীবনে সঞ্জীবিত করিয়া তুলিতে পারিবে।

তখন তোমার অন্তরে একটা বিরাট বিপুল স্বাধীনতার বিমল বায়ু প্রবাহিত হইবে এবং তাহার প্রতি হিল্লোল মুক্তির অপূর্ব্ব সুগন্ধ বহন করিয়া আনিবে। তখন তোমার অন্তরের সুষুপ্তি বিদূরিত হইবে এবং জাগিয়া উঠিবে—এক বিরাট—মুক্তি—মুক্তি—মুক্তি। *

পঞ্চব্রাহ্মণের বংশপরিচয়।

(শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর)

১০। পাঁচ গোত্র।

উপরে যাহা কিছু আলোচনা করিয়া আসিয়াছি, তাহা দ্বারা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছি যে, ৯৯৯ সম্বতে ভট্টনারায়ণাদি পঞ্চব্রাহ্মণ আদিশূর কর্ত্তৃক বঙ্গে আনীত হইয়া এখানেই বসবাস করিয়াছিলেন। তন্মধ্যে ভট্টনারায়ণ ছিলেন শাণ্ডিল্যগোত্রীয়, দক্ষ কাশ্যপগোত্রীয়, শ্রীহর্ষ ভরদ্বাজগোত্রীয়, বেদগর্ভ সাবর্ণিগোত্রীয় এবং ছান্দড় বাৎস্যগোত্রীয়।

১১। গোত্র কি?

সম্বন্ধনির্ণয়কার বলেন, পূর্ব্বে ঋষিরা নানা কার্য্যের জন্য অনেকগুলি করিয়া ধেনু রক্ষা করিতেন। সেগুলির নাম হোমধেনু। তাহাদের রক্ষার ভার শিষ্য ও সন্তানদের উপর অর্পিত হইত। হিংস্র জন্তুর হস্ত হইতে রক্ষার জন্য ঋষিরা নিজ নিজ আশ্রমের অনতিদূরে এক একটী গোচারণ স্থান নির্দ্দিষ্ট করিয়া লইতেন। ঐ স্থানগুলি বৃতি দ্বারা বেষ্টিত থাকিত, সুতরাং হিংস্র বন্যজন্তু

---

* বার্ষিক বসুমতী।

সহসা সেগুলির মধ্যে প্রবেশ করিতে পারিত না। এই সকল স্থানে গোধন ত্রাণ বা রক্ষা পাইত বলিয়া এগুলির নাম হইল গোত্র। ক্রমে এক স্থলে অনেকগুলি ঋষির "গোত্র" নির্দ্দিষ্ট হওয়ায় বিভিন্ন ঋষির বিভিন্ন গোত্রের পৃথক পৃথক নামকরণ হয়। তখন সেই সেই ঋষিকে গোত্রপ্রবর্ত্তক বলিয়া ধরা হইল। তাঁহাদের সন্তান বা শিষ্যগণ তাঁহাদের গোত্রসম্ভূত বলিয়া পরিচিত হইতে লাগিলেন। এইরূপে গোত্র শব্দে বংশ ও তদ্বংশসংশ্লিষ্ট ব্যক্তিমাত্রকে বুঝাইতে লাগিল (১)।

১১১। প্রবর কি?

এদেশের ক্রিয়াকর্ম্মে ব্রাহ্মণদিগের গোত্র বলিবার সঙ্গে সঙ্গে তাঁহাদের প্রবরও উল্লেখ করিতে হয়। প্রবর কি? বিদ্যানিধি মহাশয় বলেন—ঋষিদিগের মধ্যে ক্রমে যখন নামসাদৃশ্য হইতে লাগিল, তখন সেই সদৃশনামা ঋষিদিগকে প্রবরের দ্বারা বিশেষিত করা হইতে লাগিল। ঐ সকল ঋষিদিগের সন্তান বা শিষ্যদের মধ্যে যে সকল ব্যক্তি শ্রেষ্ঠতা লাভ করিলেন, তাঁহাদিগেরই নামে 'প্রবর' প্রচলিত হইল। এইরূপে 'প্রবর' দ্বারা এক গোত্রে যতগুলি বংশের সংস্রব থাকে, তাহা সহজে উপলব্ধ হয় (২)।

১১২। বেদী কি?

সেকালের কোন ব্রাহ্মণের পরিচয় লইতে গেলে তাঁহার নাম, গোত্র ও প্রবর প্রভৃতির সঙ্গে তিনি কোন্ বেদী তাহাও জিজ্ঞাসা করা হইত। পুরাকালে কোন ব্রাহ্মণ চতুর্ব্বেদ না হৌক, অন্তত একটী বেদেরও কোন এক অংশ না পড়িলে ব্রাহ্মণ বলিয়াই গণ্য হইতেন না। এখনও কোন ব্রাহ্মণের গৃহে কোন ক্রিয়াকর্ম্ম হইলে তাহা তাঁহার পূর্ব্বপুরুষদিগের অধীত বেদবিহিত প্রণালী অনুসারেই অনুষ্ঠিত হয়। সেই অনুষ্ঠানে "কুলক্রমাগত অবলম্বিত বেদ বা শাখা পরিত্যাগপুরঃসর অন্য বেদের বা শাখার মন্ত্রাদি পাঠ হয় না, এবং পূর্ব্বপুরুষগণের অনুষ্ঠিত ক্রিয়াকলাপ অনুসারে অন্য বেদাদির নিয়মানুযায়ী কার্য্যের অনুষ্ঠান হয় না" (৩)। যে ব্রাহ্মণের ক্রিয়াকলাপ যে বেদবিহিত প্রণালী অনুসারে সাধারণত অনুষ্ঠিত হইত, তাঁহাকে তৎবেদী বলা যাইত।

১১৩। পঞ্চব্রাহ্মণের কে কোন্ বেদী?

বঙ্গদেশে ভট্টনারায়ণপ্রমুখ পঞ্চব্রাহ্মণের যে বংশধরেরা আছেন, তাঁহারা রাঢ়ী ও বারেন্দ্রভেদে বিভক্ত। তন্মধ্যে পূর্ব্ববঙ্গের অধিবাসীগণ অধিকাংশই বারেন্দ্র এবং পশ্চিমবঙ্গের অধিবাসীগণ অধিকাংশই রাঢ়ী। রাঢ়ী ও বারেন্দ্র-ভেদের কারণ এখন আলোচনা করিবার প্রয়োজন নাই। রাঢ়ীশ্রেণী ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে সামবেদেরই চর্চ্চা অধিক। ইঁহাদিগের অধিকাংশই প্রায় সামবেদী ও কুথুমশাখী, অর্থাৎ সামবেদের কুথুমশাখাবিহিত প্রণালী অনুসারেই ক্রিয়াকর্ম্ম করেন। যাঁহারা ঋগ্বেদী, তাঁহাদিগের যাবতীয় বৈদিক ও গৃহ্যকর্ম্ম আশ্বলায়ন শাখার নিয়মে সম্পন্ন হয়। যজুর্ব্বেদীদিগের যাবতীয় বৈদিক ও গৃহ্যকর্ম্ম কাণ্বশাখার মন্ত্রে সম্পাদিত হয় (৪)। মহেশ তাঁহার কুলপঞ্জিকায় পঞ্চব্রাহ্মণকে সামবেদে লব্ধগৌরব বলিয়াছেন (৫)। কুলার্ণবের বচন ধরিয়া নুলো পঞ্চানন তাঁহার সারাবলী গ্রন্থে বলেন—ভট্টনারায়ণ ও দক্ষ তিন বেদে অভিজ্ঞ ছিলেন, শ্রীহর্ষ অথর্ব্ববেদে কুশল ছিলেন, চতুর্ব্বেদী ছান্দড় এবং তাঁহার সমতুল্য বেদগর্ভ সামবেদে পারগ ছিলেন (৬)। প্রেমবিলাসের মতে ক্ষিতীশ ও বীতরাগ চতুর্ব্বেদে এবং সুধানিধি, মেধাতিথি ও সৌভরি ত্রিবেদে পারদর্শী ছিলেন (৭)। আমরা এখানে তাঁহাদের পুত্রগণ উদ্দিষ্ট হইয়াছেন বলিয়া ধরিতে পারি। গৌড়েব্রাহ্মণপ্রণেতা বলেন যে, যজ্ঞ সম্পন্ন করিতে অধ্বর্য্য, হোম ও উদ্গান, এই তিন ক্রিয়ার প্রয়োজন। তন্মধ্যে অধ্বর্য্য সম্বন্ধীয় কার্য্য যজুর্ব্বেদী দ্বারা, হোম ঋগ্বেদী দ্বারা, এবং উদ্গান সামবেদী দ্বারা নিষ্পন্ন হইবার বিধি পূর্ব্ব হইতেই আছে (৮)। শ্রীনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় কেন যে বলিলেন (৯)—"কান্যকুব্জে সামবেদী ও যজুর্ব্বেদী ব্রাহ্মণ ব্যতীত অপর কোন-বেদী ব্রাহ্মণ ছিলেন না,

(১) স০ নি০ ৬১ পৃঃ
(২) স০ নি০ ৬২পৃঃ
(৩) স০ নি০ ১পৃঃ
(৪) স০ নি০ ২১পৃঃ
(৫) স০ নি০ ৩০৬পৃঃ
(৬) স০ নি০ ৩০৭পৃঃ
(৭) প্রে০ বি০ ২৬২পৃঃ
(৮) গৌ০ ব্রা০ ৩৭পৃঃ
(৯) গৌ০ ব্রা০ ৩৭পৃঃ

বেলগাছিয়ার বাগান।

দ্বারকানাথ ঠাকুরের বেলগাছিয়ার প্রসিদ্ধ বাগান বর্ত্তমান কালে পাইকপাড়ার রাজাদের অধিকারে আছে। ইহা বেলগাছিয়া রোডে অবস্থিত।

১৮২৩ হইতে ১৮৪১ সাল পর্য্যন্ত অর্থাৎ বিলাত-যাত্রার পূর্ব্বের আঠারো উনিশ বৎসর কাল দ্বারকানাথের সম্পদ ও প্রতিপত্তি উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হইতেছিল। উচ্চপদস্থ দেশীয় ও ইংরাজ উভয়শ্রেণীর লোকই তাঁহাকে সম্মান করিতেন। নিজের ব্যবসা-বাণিজ্যের সুবিধার জন্য তিনি এই সকল লোককে 'বেলগাছিয়া ভিলায়' প্রায়ই নিমন্ত্রণ করিতেন। উচ্চপদস্থ ইংরাজ কর্ম্মচারীদের মধ্যেও দ্বারকানাথের এতদূর প্রতিপত্তি ছিল যে, এই বেলগাছিয়া ভিলায় নিমন্ত্রিত সাহেবেরা তাঁহার সাহায্যে নিজ চাকরী প্রভৃতির সুবিধা করিয়া লইতেন। "তখনকার দিনে 'বেলগাছিয়া ভিলা'য় নিমন্ত্রণ হয় না, বা দ্বারকানাথের সহিত পরিচিত নহেন, এ কথা বলিতে যেন সাহেবেরা মর্য্যাদার হানি মনে করিতেন"। (ব. জা. ই. ব্রা. ৬। ৩৩০, ৩৩১)।

দ্বারকানাথের চরিতাখ্যায়ক কিশোরীচাঁদ মিত্র লিখিতেছেন, "দ্বারকানাথ 'বেলগাছিয়া ভিলাকে' সূক্ষ্ম সুরুচির সহিত সুসজ্জিত করিয়াছিলেন। এই ভিলাই তাঁহার আতিথ্যের প্রধান ক্ষেত্র ছিল। এখানে তিনি রাজার মতন খরচ করিয়া নিমন্ত্রিতদের আপ্যায়ন করিতেন। 'মোতি ঝিল' নামক একটি খাল সমস্ত বাগানটির মধ্য দিয়া আঁকিয়া বাঁকিয়া প্রসারিত ছিল; এই ঝিল নীলপদ্ম রক্তপদ্ম এবং অন্যান্য নানা ফুলে সর্ব্বদা ঝলমল করিত। চারিদিকে বাগানের তৃণাচ্ছাদিত প্রাঙ্গণটি বিস্তৃত; ফাল্গুন চৈত্র মাসে তাহা গোলাপ ফুলে এবং অন্যান্য নানাবর্ণের ফুলে সুশোভিত থাকিত। বাগানে একটি সুপ্রশস্ত বৈঠকখানা ঘর ছিল। তাহা তখনকার পক্ষে নূতন প্রণালীতে সজ্জিত করা হইয়াছিল। নব্যতন্ত্রের য়ুরোপীয় শিল্পিদিগের ভাল ভাল ছবিতে গ্যালারির দেওয়ালগুলি অলঙ্কৃত ছিল। দ্বারকানাথ ছবির ও প্রস্তরমূর্ত্তির উৎকর্ষ অপকর্ষ বিচারে বেশ অভিজ্ঞ ছিলেন। বৈঠকখানার পশ্চাতে একটি মার্ব্বল পাথরের ফোয়ারা ছিল। মোতিঝিলের মাঝখানে একটি দ্বীপ; দ্বীপের উপরে একটি "summer house"; তাহাতে যাইবার জন্য একটি কাঠের সেতু ও একটি ঝুলানো লোহার সেতু ছিল। এইটি বিশেষভাবে আমোদ-প্রমোদের স্থান ছিল।

দ্বারকানাথ প্রায়ই তাঁহার এই বেলগাছিয়া ভিলাতে কলিকাতার সম্ভ্রান্ত লোকদের ভোজ দিতেন। ভোজ্যের পারিপাট্যে ও নিমন্ত্রিতদের পদমর্য্যাদায় এই সকল ভোজের দিনগুলি তৎকালীন কলিকাতার ইতিহাসে এক-একটি চিহ্নিত দিন হইয়া উঠিত।

এই সকল ভোজে সর্ব্বশ্রেণীর লোককেই দ্বারকানাথ নিমন্ত্রণ করিতেন। ভিন্ন ভিন্ন জাতির ও ভিন্ন ভিন্ন অবস্থার লোকদিগকে একত্র করিয়া, তাহাদিগকে স্বচ্ছন্দে ও মন খুলিয়া পরস্পরের সঙ্গে মিশিবার সুযোগ সৃষ্ট করিয়া দিতে, দ্বারকানাথ অতিশয় উৎসাহী ছিলেন। সরকারী দরবার প্রভৃতিতে দেশীয় ও য়ুরোপীয়গণ একত্র মিলিত হইতেন বটে; কিন্তু পদের অনৈক্য ভুলিয়া সমানভাবে বন্ধুর মতন মিশিবার স্থান একমাত্র বেলগাছিয়া ভিলাই ছিল। স্বয়ং দ্বারকানাথ মানুষটি এমন ছিলেন যে, তাঁহার গুণেই এই সকল মিলনের ব্যাপার এমন সফল হইয়া উঠিত। তাঁহার মধুর ব্যবহারে, সৌজন্যে ও সহৃদয়তায় সকলেই মুগ্ধ ও আকৃষ্ট হইতেন।

এই বেলগাছিয়া ভিলা-তে দ্বারকানাথ একদিন অনারেব্‌ল্‌ মিস্‌ ইডেনের সম্মানার্থ একটি নাচ এবং সান্ধ্য ভোজের অনুষ্ঠান করেন। মিস্‌ ইডেন লাট-ভগিনী, অতএব য়ুরোপীয় সমাজের অধিনেত্রী, এবং দ্বারকানাথ বাঙ্গালীসমাজের শীর্ষস্থানীয় পুরুষ; অনুষ্ঠানটি এই নিমন্ত্রিতা ও নিমন্ত্রণকারী উভয়েরই পদমর্য্যাদার অনুরূপ সমারোহের সহিত সম্পন্ন হইয়াছিল। ঘরগুলি আলোকে, আরশীতে, মির্জ্জাপুরের কার্পেটে, লাল জাজিমে, সবুজ রেশমে, পুষ্পগুচ্ছশোভিত মার্ব্বেলের টেবিলে, দর্শকদিগের চোখ ঝলসাইয়া দিতেছিল। সিঁড়িতে, বারান্দায়, হলে, অজস্র নানা জাতীয় অর্কিড, সুদৃশ্য লতা, ও পাতাবাহারের গাছ রক্ষিত হইয়াছিল। Summer houseটি এবং ঝুলানো সেতুটি, ফুল, লতা ও দেবদারুপাতার মালায় এবং নানা বর্ণের পতাকায় ভূষিত হইয়াছিল। সহস্র সহস্র রঙ্গীন আলোতে জল ও স্থল উদ্ভাসিত হইতেছিল। হলের ভিতরে অবিশ্রাম বাজনা বাজিতেছিল; রাত্রি দ্বিপ্রহরের পরও নাচ চলিতেছিল; বাহিরে ঘন ঘন বিচিত্র জমকাল আতসবাজি জ্বলিয়া উঠিতেছিল। সকলেই বলিতেছিলেন যে এমন জাঁকজমকের ভোজ কলিকাতায় কখনও দেখা যায় নাই।*

কিন্তু শ্রেষ্ঠভাবে বিচার করিতে হইলে বলিতে হয় যে ইহা কেবল একটি বড় ভোজ নয়; ইহা দেশের সামাজিক ইতিহাসেরও একটি বড় ঘটনা। দ্বারকানাথ ইংরেজসমাজ ও হিন্দুসমাজের মধ্যে ব্যবধান ভাঙ্গিয়া ফেলিবার জন্য কতরূপ চেষ্টা করিতেছিলেন, এই ঘটনা

---

* *Calcutta Courier* পত্রিকায় ১৮৩১ খৃষ্টাব্দের ২৬শে ফেব্রুয়ারী সংখ্যায় এই ভোজের উল্লেখ আছে। তৎপূর্ব্বদিন অর্থাৎ ২৫শে ফেব্রুয়ারী এই ভোজ হইয়াছিল।—(প্রবন্ধলেখক)।

তাহার একটি বিশিষ্ট নিদর্শন।"—(Mem. 70—74; সংক্ষিপ্ত ভাবানুবাদ)।

লর্ড অকলণ্ডের ভগিনীর এই সম্বর্দ্ধনার বৃত্তান্ত আত্মজীবনীর ৩১পৃষ্ঠায় দেখিতে পাওয়া যায়।

দ্বারকানাথ ঠাকুর দেশীয় ও য়ুরোপীয় ভদ্রলোকদিগকে সামাজিক ভাবে মিলিত করিবার যে চেষ্টা করিতেছিলেন, তাহার চিত্র উপরে উদ্ধৃত বিবরণ হইতে আমরা দেখিতে পাই। ইহাতে তখন দেবেন্দ্রনাথের একটুকুও উৎসাহ ছিল না। ইহা কিছুই বিচিত্র নহে। এই সকল প্রমোদসভার কার্য্যকলাপ দেবেন্দ্রনাথের রুচি ও প্রকৃতির একান্ত বিরুদ্ধ ছিল। কিন্তু দেশীয় ও য়ুরোপীয় সমাজের সামাজিক মিলন সংঘটন বিষয়ে দেবেন্দ্রনাথ বোধ হয় পরবর্ত্তী কালেও বিশেষ উৎসাহ প্রকাশ করেন নাই।

দ্বারকানাথের চেষ্টা ও প্রভাব সত্বেও তৎকালীন হিন্দু ভদ্রলোকদের পক্ষে য়ুরোপীয়দিগের সহিত আহার করা সহজ ছিল না। ১৮৪০ সালের ১৯শে ফেব্রুয়ারী তারিখে বেলগাছিয়ার বাগানে একটী জমকাল ball নাচ ও ভোজ হয়। যে সকল হিন্দু ভদ্রলোক নাচ ও বাজি পোড়ান দেখিয়াই চলিয়া গেলেন, খানার টেবিলে বসিলেন না, তাঁহাদিগকে বিদ্রূপ করিয়া *Bengal Hurkaru* পত্রিকা (২১শে ফেব্রুয়ারীর সংখ্যায়) লিখিতেছেন, "There were a great many native gentlemen present on the occasion. Many of them remained to witness the exhibition of the fireworks only, and then returned, no doubt to escape the steam of the supper table." অপর দিকে, যাহারা সেখানে গোপনে খানা খাইয়া আসিলেন, তাঁহাদিগকে বিদ্রূপ করিয়া বাংলা কাগজে ছড়া বাহির হইয়াছিল,—

'বেলগাছিয়ার বাগানে হয় ছুরি কাঁটার ঝন্‌ঝনি,
খানা খাওয়ার কত মজা, আমরা তার কি জানি?
জানেন ঠাকুর কোম্পানী।'

("প্রবাসী", ১৩১৯ বঙ্গাব্দ, ২৩২পৃষ্ঠা, সৌদামিনী দেবী লিখিত "পিতৃস্মৃতি" দ্রষ্টব্য)।

বৈঠকখানা বাড়ী।

বিলাত যাত্রার পূর্ব্বেই বেলগাছিয়ার বাগানে দ্বারকানাথ এইরূপে ইংরাজদিগের সহিত আহার করিতে প্রবৃত্ত হন, এবং তাহার ফলে তাঁহাকে নিজ ভবনের এ কাংশে "বৈঠকখানা বাড়ী" নির্ম্মাণ করিতে বাধ্য হইতে হয়। দেবেন্দ্রনাথের আত্মজীবনীর নানা স্থানে এই বৈঠকখানা বাড়ীর উল্লেখ আছে।

"দ্বারকানাথ প্রথম বয়সে একজন বিশিষ্ট বৈষ্ণব ছিলেন। তাঁহার দেবদ্বিজে বিশেষ ভক্তি ছিল। তিনি প্রত্যহ হোম, তর্পণ, জপ করিতেন। অন্যান্য গৃহস্থ ব্রাহ্মণের ন্যায় স্বহস্তে গৃহদেবতা ৺লক্ষ্মীজনার্দ্দন বিগ্রহের নিত্য পূজা করিতেন। যে পূজক নিযুক্ত ছিল সে ভোগাদি পাক করিয়া ভোগ দিত ও আরত্রিক করিত। ... ... তাহার পর যখন সাহেব মেমদিগের সহিত ঘনিষ্ঠতা বাড়িল, তাঁহার বেলগেছিয়ার বাগানে খানা চলিতে লাগিল, তখন প্রথম প্রথম দ্বারকানাথ খানার টেবিলে বসিতেন না; দূরে দূরে থাকিতেন, এবং খানার শেষে গঙ্গাজলাদি স্পর্শ ও বস্ত্র ত্যাগ করিয়া শুদ্ধ হইতেন। যতদিন এইভাবে চলিয়াছিল, ততদিন তিনি নিজে দেবপূজা করিতেন। কিন্তু যেদিন হইতে তিনি মেম [ও] সাহেবদিগের প্ররোচনায় তাঁহাদের সহিত ভ্রষ্টাচারে লিপ্ত হইলেন, সেই দিন হইতে নিজে দেবপূজা ত্যাগ করিলেন এবং নিজের অনুষ্ঠিত প্রত্যেক কাজের জন্য,—অর্থাৎ পূজা, হোম, তর্পণ, পিতৃমাতৃশ্রাদ্ধ প্রভৃতি কার্য্যের জন্য,—ভিন্ন ভিন্ন বেতনভুক্ ব্রাহ্মণ নিযুক্ত করিয়া দিলেন। শুনা যায়, তাঁহার এইরূপ পুরোহিতের সংখ্যা ১৮ জন ছিল।

এই সময় হইতে তিনি ঠাকুরঘরে প্রবেশ করিতেন না, পূজা-পার্ব্বণে ঠাকুরদালানে উঠিতেন না, সাধারণ দর্শকের ন্যায় উঠানে দাঁড়াইয়া দেবদেবী দর্শন করিয়া প্রণামাদি করিতেন। এই সময় হইতে তাঁহার পরিবারস্থ মহিলাগণ, এমন কি তাঁহার পত্নীও, তাঁহার সহিত একাসনে বসিতেন না; হঠাৎ স্পর্শ করিলে স্নান করিয়া শুদ্ধ হইতেন। এই সময়ে দ্বারকানাথের জ্ঞাতিগণ তাঁহার ভ্রষ্টাচারজন্য তাঁহাকে পরিত্যাগ করিতে উদ্যত হন। পাথুরিয়াঘাটার দর্পনারায়ণ ঠাকুরবংশীয় হরকুমার, কানাইলাল প্রভৃতি সকলেই তাঁহাকে পরিত্যাগ করা স্থির করিয়াছিলেন। দ্বারকানাথ ইহা অবগত হইয়া তাঁহার পৈতৃক ভদ্রাসনের পার্শ্বে এক বৈঠকখানা বাড়ী নির্ম্মাণ করাইয়া লইয়াছিলেন, এবং এই নূতন বাড়ীতেই থাকিতেন।...

তাহার পর যখন দ্বারকানাথ প্রথমবার বিলাত যান, তখন পাথুরিয়াঘাটার জ্ঞাতিগোষ্ঠীর নেতা কানাইলাল ঠাকুর তাঁহাকে বলিয়া দিলেন, 'আর চলিবে না, এইবার আমরা বাধ্য হইয়া তোমায় ত্যাগ করিব।'... প্রথম যাত্রায় দ্বারকানাথের সহিত তাঁহার এক ভাগিনের চন্দ্রমোহন চট্টোপাধ্যায় বিলাতে গিয়াছিলেন। এই যাত্রা হইতে ফিরিয়া আসিলে দ্বারকানাথ তাঁহার ভদ্রাসন হইতে স্বতন্ত্র বৈঠকখানায় বাস করিলেন; এবং তাঁহার ভাগিনের তাঁহার জ্যেষ্ঠের সহিত এক বাড়ীতে বাস করিতে লাগিলেন বটে, কিন্তু তাঁহার বাসের জন্য

সামবেদী ও যজুর্ব্বেদী ব্রাহ্মণ আদিশূরের যজ্ঞস্থলে আসিয়াছিলেন" (১০) তাহা আমরা বুঝিতে পারিলাম না।

১১৪। দক্ষের পূর্ব্বপুরুষ।

যে পঞ্চব্রাহ্মণ বঙ্গদেশে আসিয়াছিলেন, তন্মধ্যে দক্ষ কাশ্যপগোত্রীয়। সেই কাশ্যপগোত্রে মহাতপস্বী কৃষ্ণমিশ্র জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পুত্র ভমিশ্র; তাঁহার পুত্র ওঙ্কার; তাঁহার পুত্র স্বর্ণ; তাঁহার পুত্র জয়; তাঁহার পুত্র বীতরাগ। ক্ষিতীশ প্রভৃতির সঙ্গে ইনি গৌড়ে গিয়াছিলেন (১১)। প্রেমবিলাসের মতে বীতরাগের সুপণ্ডিত দ্বাদশ পুত্র—সুসেন, দক্ষ, ভানুমিশ্র, কৃপানিধি, ইন্দ্র, চন্দ্র, মহেশ, রুদ্র, জীব, হরিহর, বলদেব ও দানব (১২)। কিন্তু হরিমিশ্র ও কুলার্ণবের মতে বীতরাগের চারি পুত্র—সুসেন, দক্ষ, ভানুমিশ্র ও কৃপানিধি (১৩)। এড়ুমিশ্র ও কুলপঞ্জিকার মতে প্রথম চারি পুত্র সুভদ্রার গর্ভজাত (১৪); বীতরাগের দ্বিতীয় স্ত্রীর গর্ভজাত সন্তানের মধ্যে ইন্দ্র প্রভৃতি পাঁচজন বিখ্যাত ছিলেন (১৫)। আমাদের অনুমান হয় যে, বীতরাগের পুত্রগণের মধ্যে যাঁহারা বিশেষ খ্যাতিলাভ করিয়াছিলেন, তাঁহাদেরই নাম হরিমিশ্র ও কুলার্ণব কর্ত্তৃক উল্লিখিত হইয়াছে।

১১৫। শ্রীহর্ষের পূর্ব্বপুরুষ।

ভরদ্বাজগোত্রে মেধাতিথির অষ্টাদশ পুত্র—আদ্য, মধ্য, গৌতম, বিশ্রুত, শ্রীহর্ষ, শ্রীধর, কৃষ্ণ, শিব, দুর্গাদাস, রবি, শশী, ধ্রুব, নিকর, প্রতাপ, প্রভাব, গণেশ, ধ্বজ, এবং বজ্র (১৬)। কুলতত্ত্বার্ণবের মতে মেধাতিথির শ্রীহর্ষ প্রভৃতি আট পুত্র (১৭)। এড়ুমিশ্র এবং কুলরমার মতে মেধাতিথির পুত্রগণের মধ্যে কয়েকজন বিখ্যাত ছিলেন এবং কয়েকজন "জঘন্য" ছিলেন। বিখ্যাত পুত্রগণের মধ্যে শ্রীহর্ষ "শ্রেষ্ঠ, সর্ব্বমান্য, কবিসভায় সর্ব্বপূজ্য, কৃতী ও তিলকস্বরূপ" ছিলেন (১৮)। ইহা হইতে অনুমান হয় যে, কুলতত্ত্বার্ণব ও হরিমিশ্রকারিকায় কেবল বিশেষ বিখ্যাত পুত্রগণই স্থান পাইয়াছেন। মেধাতিথির পিতার নাম ধীর এবং তিনিই পিতার সর্ব্বকনিষ্ঠ পুত্র ছিলেন (১৯)।

১১৬। বেদগর্ভের পূর্ব্বপুরুষ।

সাবর্ণিগোত্রে সৌভরির রত্নগর্ভ প্রভৃতি দ্বাদশ পুত্র (২০)। কুলতত্ত্বার্ণবের মতে সৌভরির চারি পুত্র—বেদগর্ভ, রত্নগর্ভ, পরাশর ও মহেশ্বর (২১)। কুলরমা এবং মহেশ্বরধৃত কুলপঞ্জিকার মতে সৌভরির ৯টী পুত্র (২২)। হরিমিশ্রও কুলতত্ত্বার্ণবের সমর্থন করিয়া চারি পুত্রেরই উল্লেখ করিয়াছেন (২৩)। আমাদের অনুমান হয় ইঁহারা বিশেষ বিখ্যাত চারি পুত্রকেই স্বীকার করিয়াছেন।

১১৭। ছান্দড়ের পূর্ব্বপুরুষ।

বাৎস্যগোত্রে সুধানিধির সাত পুত্র—ধরাধর, হৃষীকেশ, ছান্দড়, বিভূতি, ভূতভাবন, দেব এবং কল্যাণমিত্র (২৪)। কুলতত্ত্বার্ণবের মতে দুই পুত্র—ছান্দড় এবং ধরাধর (২৫)। কুলপঞ্জিকা এবং বাচস্পতিমিশ্রধৃত কুলার্ণবের মতে সুধানিধির প্রথম স্ত্রীর গর্ভে ছান্দড় ব্যতীত অপর ছয়জন জন্মগ্রহণ করেন, এবং দ্বিতীয় স্ত্রীর গর্ভে কেবল ছান্দড় জন্মগ্রহণ করেন (২৬)।

১১৮। ভট্টনারায়ণের পূর্ব্বপুরুষ।

ভট্টনারায়ণের এবং তাঁহার পূর্ব্বপুরুষদিগের পরিচয় পরবর্ত্তী কথায় আলোচনা করিব।

১১৯। পঞ্চব্রাহ্মণের বয়স।

ভট্টনারায়ণপ্রমুখ পঞ্চব্রাহ্মণ যখন এদেশে আসেন, তখন তাঁহাদের বয়স কত ছিল, তাহা ধ্রুবানন্দের গোষ্ঠীকথা, কুলপঞ্জিকা (২৭) এবং ভাটের কাহিনীতে (২৮) স্পষ্ট উক্ত হইয়াছে। শ্রীহর্ষের বয়স ছিল ৯০ বৎসর, ভট্টনারায়ণের ৮০ বৎসর, দক্ষের ৬০ বৎসর এবং বেদগর্ভের ৫০ বৎসর। কেবল ছান্দড় যুবাপুরুষ

(১০) ঝা০ ব্রা০ ৪৭পৃঃ
(১১) ব্রা০ কা০ ১০৩ হরিমিশ্র
(১২) প্রে০ বি০ ২৭৩পৃঃ
(১৩) কু০ ত০ ৮৯ শ্লোক, ব্রা০ কা০ ১০৩পৃঃ
(১৪) স০ নি০ ৪৮৩পৃঃ
(১৫) স০ নি০ ৪৮৪পৃঃ
(১৬) প্রে০ বি০ ২৭৩পৃঃ।
(১৭) কু০ ত০ ৯০ ও ৯১ শ্লোক।
(১৮) স০ নি০ ৪৮৫পৃঃ।
(১৯) স০ নি০ ৪৮৭—পৃঃ।
(২০) প্রে০ বি০ ২৭৩পৃঃ।
(২১) কু০ ত০ ৯২ শ্লোক।
(২২) স০ নি০ ৪৮৩পৃঃ।
(২৩) ব্রা০ কা০ ১০৩পৃঃ।
(২৪) প্রে০ বি০ ২৭৩পৃঃ। (২৫) কু০ ত০ ৯০ শ্লোক।
(২৬) স০ নি০ ৪৮২—৮৩।
(২৭) স০ নি০ ৫৫৫—৫৬।
(২৮) স০ নি০ ৫৫৭।

ছিলেন (২৯)। তাঁহাদের বয়স অধিক হইলেও তাঁহারা অসাধারণ বলশালী ছিলেন। মুলো পঞ্চানন বলেন যে, শ্রীহর্ষ বয়সে বৃদ্ধ হইলেও তাঁহার যথেষ্ট শারীরিক বল ছিল, এমন কি, তাঁহাকে যুবাপুরুষ বলিয়া বোধ হইত (৩০); তিনি অত্যন্ত কর্ম্মশীল ও ভীষ্মসদৃশ ছিলেন। ভট্টনারায়ণ ৮০ বৎসর বয়স্ক হইলেও সপ্তর্ষির ন্যায় দিবা নিশি জাগ্রত থাকিতেন (৩১)। দক্ষ ৬০ বৎসর বয়স্ক হইলেও মনে ও দেহে ব্রহ্মার বল ধারণ করিতেন (৩২)। বেদগর্ভের বয়স ৫০ হইলেও বীর্য্যে বশিষ্ঠসদৃশ ছিলেন এবং ছান্দড় যুবা হইলেও জিতেন্দ্রিয় ও জ্ঞানবৃদ্ধ ছিলেন (৩৩)।

মহর্ষির আত্মজীবনীতে বর্ণিত বাড়ী ও বাগান।

(আচার্য্য শ্রীসতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী এম-এ)

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ তাঁহার আত্মজীবনীতে নানা স্থানে পুরাতন বাড়ী, ভদ্রাসন বাড়ী, বৈঠকখানা বাড়ী ও বেলগাছিয়ার বাগানের উল্লেখ করিয়াছেন। এখানে সে সকলের কিঞ্চিৎ বিবরণ প্রদত্ত হইতেছে।

পুরাতন বাড়ী ও 'গোপীনাথ' বিগ্রহ।

[এই অংশ শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় অনুগ্রহ পূর্ব্বক আমাকে লিখিয়া দিয়াছেন।]

"পুরাতন বাটী অর্থে পাথুরিয়াঘাটার ঠাকুরগোষ্ঠীর আদি বাসভবন। নীলমণি ঠাকুরের পরিবারে কোনও দিন বিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত ছিল না। বর্ত্তমান কালে শ্রীযুক্ত প্রফুল্লনাথ ঠাকুরের বাটীতে যে 'রাধাকান্ত' বিগ্রহের পূজা হয়, সেই বিগ্রহই ঠাকুর-বংশের পূর্ব্বপুরুষ জয়রাম ঠাকুরের প্রতিষ্ঠিত। পরে যখন দর্পনারায়ণের পুত্রগণ পৃথক হন, তখন (মহারাজা যতীন্দ্রমোহনের পিতামহ) গোপীমোহন ঠাকুর ১৮১৭ খৃষ্টাব্দে নিজ বাটীতে 'গোপীকান্ত' বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করেন। এ বিগ্রহ এখনও মূলাযোড়ের ঠাকুর বাটীতে বিদ্যমান। 'গোপীনাথ' বলিয়া কলিকাতার ঠাকুরগোষ্ঠীর কোনও বিগ্রহের কথা আমার জানা নাই।

নিম্ন-লিখিত শ্লোকটি প্রসন্নকুমার ঠাকুরের জমিদারী সেরেস্তার মোহরে দেখিতে পাওয়া যায়,—

'বঙ্গোত্তরে রঙ্গপুরে পরগণে পাত্তিলাদহে।
গোপীনাথঃ প্রভুর্যস্য, ভূপতিপ্রসন্ন ঠাকুরঃ ॥'

উত্তরকালে প্রসন্নকুমারের সহিত ঘনিষ্ঠতার ফলে বোধ হয় মহর্ষি পুরাতন বাটীর ঠাকুরের নাম ভুলিয়া গিয়া 'রাধাকান্ত' স্থলে 'গোপীনাথ' ব্যবহার করিয়াছেন। মহর্ষি এখানে পুরাতন বাটীর 'রাধাকান্ত' বিগ্রহের কথাই বলিতেছেন, এইরূপ অনুমান করিবার হেতু এই যে, গোপীমোহন ঠাকুরের বাটীকে 'আমাদের পুরাতন বাটী' বলা মহর্ষির পক্ষে সম্ভবপর নয়।"

ভদ্রাসন বাটী।

বর্ত্তমান ৬নং দ্বারকানাথ ঠাকুর লেনস্থ যে বাড়ীতে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের বংশধরগণ বাস করিতেছেন, তাহাই দ্বারকানাথ ঠাকুরের ভদ্রাসন বাটী। কিন্তু এ বাড়ীর অনেক অংশ পূর্ব্বে অন্যরূপ ছিল; ভিতরের দিকে অনেক খোলা জমি ছিল, পুকুর ছিল। রবীন্দ্রনাথও তাহা দেখিয়াছেন। তাঁহার জীবনস্মৃতিতে আছে,—"বাহির বাড়ীতে দোতালায় দক্ষিণ-পূর্ব্ব কোণের ঘরে চাকরদের মহলে আমাদের দিন কাটিত। ... জানালার নীচেই একটি ঘাট-বাঁধানো পুকুর ছিল। তাহার পূর্ব্বধারের প্রাচীরের গায়ে প্রকাণ্ড একটা চীনা বট, দক্ষিণধারে নারিকেল শ্রেণী। ... তাহার [বট গাছের] গুঁড়ির চারি ধারে অনেকগুলা ঝুরি নামিয়া একটা অন্ধকারময় জটিলতার সৃষ্টি করিয়াছিল। ... বাড়ীর ভিতরে আমাদের যে বাগান ছিল, তাহাকে বাগান বলিলে অনেকটা বেশী বলা হয়। একটা বাতাবি লেবু, একটা কুলগাছ, একটা বিলাতী আমড়া ও একসার নারিকেল গাছ তাহার প্রধান সম্পত্তি। মাঝখানে ছিল একটা গোলাকার বাঁধানো চাতাল। ... আমাদের বাড়ীর উত্তর অংশে আর একখণ্ড ভূমি পড়িয়া আছে, আজ পর্য্যন্ত ইহাকে আমরা গোলাবাড়ি বলিয়া থাকি। এই নামের দ্বারা প্রমাণ হয়, কোনো এক পুরাতন সময়ে ওখানে গোলা করিয়া সম্বৎসরের শস্য রাখা হইত।" ('জীবনস্মৃতি', শান্তিনিকেতন প্রেস, ৯-১৫ পৃষ্ঠা।)

বাড়ীর ভিতরে আর একটি পুকুর ছিল। একটি বালক (রামবল্লভ ঠাকুরের পুত্র) ডুবিয়া যাওয়ায় বাওয়াতে সে পুকুর বুজাইয়া ফেলা হয়। আত্মজীবনীর ২০, ২১ পৃষ্ঠায় বর্ণিত "তত্ত্বরঞ্জিনী" সভার অধিবেশন বাহির বাড়ীর পুকুরের ধারের কোনও কুঠরীতে হইয়া থাকিবে। সেই পুকুর বুজাইয়া এখন ৬নং দ্বারকানাথ ঠাকুর লেন ভবনের দক্ষিণের বাগান হইয়াছে।

---

(২৯) সং দিং ৫৫৬—৫৭।
(৩০) সং দিং ৫৫৫পৃঃ।
(৩১) সং দিং ৫৫৩পৃঃ।
(৩২) সং দি ৫৫৬। (৩৩) সং দি· ·৭৩পঃ।

বাহির মহলের বৈঠকখানার উপরে স্বতন্ত্র গৃহ নির্ম্মিত হইল, তাঁহার আহারাদির জন্য স্বতন্ত্র ব্যবস্থা হইল।" (ব. আ. ই. ব্রা. ৩। ৩৩৯—৩৫১ পৃষ্ঠা ও সংশোধন-পত্র দ্রষ্টব্য।)

৫৫৯ দ্বারকানাথ ঠাকুর লেনস্থ যে বাড়ীতে এখন দ্বারকানাথের পুত্র গিরীন্দ্রনাথের বংশধর শ্রীযুক্ত গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও শ্রীযুক্ত অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়েরা বাস করিতেছেন, সেই বাড়ীই দ্বারকানাথ ঠাকুরের বৈঠকখানা বাড়ী ছিল।

ধর্ম্মসাধনে কর্ম্মের আবশ্যকতা।

(অধ্যাপক শ্রীউপেন্দ্রনাথ বল, এম-এ)

সংসারে থাকিয়া ধর্ম্মসাধনে এত অন্তরায় যে, মানুষ মনে করে, সংসার ছাড়িয়া না গেলে কিছুই করা যাইতে পারে না; সমস্ত জ্বালা-যন্ত্রণার হাত এড়াইয়া যদি নির্জ্জনে যাইতে পারি তাহা হইলে নিশ্চিন্ত হইয়া সাধন-ভজনে মন দেওয়া যাইতে পারে, এই বলিয়া কত সাধু বৈরাগ্য গ্রহণ করিয়াছেন। ভারতে এইরূপ অনেক সন্ন্যাসী আছেন, যাঁরা সংসারের উপর বিরক্ত হইয়া লোকালয় পরিত্যাগ করিয়াছেন। কত কারণে এই বিরক্তি আসে—কেহ হয়ত এত দুঃখ-কষ্ট পাইয়াছেন যে, আর তাহা সহ্য করিতে না পারিয়া সংসার ত্যাগ করিয়াছেন; কাহাকেও মানুষের অবহেলা ও তাচ্ছিল্য সংসারবিমুখ করিয়াছে; আবার কেহ কেহ অদৃশ্য ও অজ্ঞাত বস্তুর মধুর আকর্ষণে সংসারের সুখ-দুঃখকে জলাঞ্জলি দিয়াছেন। কাহার মনের ভিতর কখন্ কি স্রোত আসিয়া আঘাত করে তাহা বলিতে পারা যায় না। ইন্দ্রিয়াতীত হয়ে প্রকৃতির সমস্ত আকর্ষণকে অগ্রাহ্য করে, বাহিরের সমস্ত রূপ রস গন্ধ তুচ্ছ করে একেবারে অনির্ব্বচনীয় ভূমার শুভ্র সাগরে ডুবিয়া গিয়াছেন এরূপ যোগীর সংখ্যা বিরল।

শাক্যসিংহ গৌতম রোগ মৃত্যু জরা বার্দ্ধক্য দেখে সংসার ছাড়লেন, নিজের জীবনে কিছুই আঘাত পাননি। তাঁর পিতা তাঁকে খুব সুখের মধ্যেই রেখেছিলেন। কিন্তু এত সুখের মধ্যে থেকেও সংসারের দুঃখের রূপ তাঁর সামনে যখন এসে পড়ল তখন তিনি সমস্ত দুঃখের অতীত হওয়ার জন্য উদ্বিগ্ন হলেন। সংসার পরিত্যাগ করে—কৃচ্ছ্র সাধনা আরম্ভ করলেন। সাত বছর ধরে কঠোর সাধনা করে তিনি তাঁর বাঞ্ছিত বস্তু লাভ করতে পারলেন না। মানবপ্রকৃতি তাঁর সমস্ত সাধনাকে যেন বিদ্রূপ করে উঠল। শরীর শুষ্ক হয়ে গেল—অস্থি-চর্ম্মসার হল, দুর্ব্বল হয়ে অজ্ঞান হতে লাগলেন, সহ-সাধকেরা পরিত্যাগ করে গেলেন, কিন্তু তাঁর শান্তি এল না; প্রাণে সে আলোক এলো না, যার বলে তিনি বলতে পারেন যে, সমস্ত দুঃখ-যন্ত্রণার হাত থেকে তিনি রক্ষা পেয়েছেন। তার পরে যখন কৃচ্ছ্র সাধন পরিত্যাগ করলেন, মানুষের হৃদয়ে প্রেমের পরিচয় পেলেন, সহসা তাঁর মধ্যে নূতন আলোক এল। এই আলোক তাঁকে নিয়ে গেল কর্ম্মের দিকে, জীবের প্রতি প্রেমে; প্রকৃতির শক্তিকে ধর্ম্মপথে পরিচালিত করে, জীবনে নূতন শক্তি লাভ করলেন। সমস্ত ইন্দ্রিয় সংযত করে, প্রকৃত জ্ঞান লাভ করে তিনি সংসারে ধর্ম্ম-চক্র প্রবর্ত্তন করলেন। মানুষকে কর্ম্মের মধ্য দিয়া ধর্ম্মের দিকে তিনি আহ্বান করলেন। সেই আহ্বান শুনে কত নর-নারী ধন্য হয়ে গেলেন। কর্ম্মের নূতন ধারার মধ্যে মানুষ কি এক আনন্দ পায়! সে আনন্দ নিজের সুখ-জনিত নয়—তাতে জীবনের সমস্ত শক্তি বিকাশপ্রাপ্ত হয়। একটি পুষ্প যখন প্রস্ফুটিত হয়, তার মধ্যে কত আনন্দ! সৌন্দর্য্যসৃষ্টিই পুষ্পজীবনের সার্থকতা। মানুষ যদি আজীবন কাজ করে যেতে পারে, সদ্ভাবে যদি সে সমাজের ও জীবের মঙ্গলের জন্য জীবন দান করতে পারে, তবে উহা অপেক্ষা মানবজীবনের সার্থকতা কোথায়?

> ন কর্ম্মণামনারম্ভান্নৈষ্কর্ম্ম্যং পুরুষোঽশ্নুতে।
> ন চ সন্ন্যসনাদেব সিদ্ধিং সমধিগচ্ছতি ॥

"কর্ম্মের অনুষ্ঠান না করিয়া কেহ জ্ঞানলাভ করিতে পারে না; এবং কেবলমাত্র সন্ন্যাসেই সিদ্ধিলাভ হয় না।"

কর্ম্মের অনুষ্ঠান না করিয়া জ্ঞান লাভ করা যায় না, ইহার কারণ কি? আমি সংসার পরিত্যাগ করিয়া সন্ন্যাস অবলম্বন করিলে সিদ্ধি পাইব না। ইহা বড় শক্ত কথা। তত্ত্বদর্শীরা এই কথার প্রমাণ দিয়াছেন; গীতায় তাই আবার বলা হইয়াছে, "ন হি কশ্চিৎ ক্ষণমপি জাতু তিষ্ঠত্যকর্ম্মকৃৎ। কার্য্যতে হ্যবশঃ কর্ম্ম সর্ব্বঃ প্রকৃতিজৈ-র্গুণৈঃ॥" "কোন অবস্থায় ক্ষণমাত্রও জ্ঞানী বা অজ্ঞানী কেহই কর্ম্ম না করিয়া থাকিতে পারে না, স্বাভাবিক গুণে সকলে অভিভূত হইয়া কর্ম্ম করিয়া থাকে।" যিনি যে অবস্থায়ই থাকুন না কেন, তাঁহাকে কর্ম্ম করিতে হইবে। অনেকে হয়ত কার্য্য করিতেছে না, কিন্তু মনে মনে ইন্দ্রিয়সম্ভোগের ইচ্ছা খুব বেশী; সেইরূপ ব্যক্তি প্রকৃতপক্ষে কপটাচারী, তিনি গৈরিক ধারণ করুন বা ভস্মে দেহ আবৃত করুন তাঁহার হৃদয় সাধারণ মানুষের মত দীন। বাহিরের কর্ম্মবিমুখতা তার একটা মিথ্যা আবরণ, সংসারে এইরূপ কপটাচারীর সংখ্যা অনেক।

বাহিরে বলিয়া বেড়াই—ধর্ম্মে আমার জীবনকে অর্পণ করিয়াছি, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে আমার চিত্তশুদ্ধি হয় নাই, ইন্দ্রিয়সংযম করিতে পারি নাই, আমার পবিত্রতা লাভ হয় নাই, আমার সমস্ত সাধন-ভজন বৃথা।

যস্ত্বিন্দ্রিয়াণি মনসা নিয়ম্যারভতেঽর্জ্জুন।
কর্ম্মেন্দ্রিয়ৈঃ কর্ম্মযোগমসক্তঃ স বিশিষ্যতে॥

"হে অর্জ্জুন, কিন্তু যিনি মন দ্বারা জ্ঞানেন্দ্রিয়গণকে সংযত করিয়া কর্ম্মেন্দ্রিয় দ্বারা কর্ম্মযোগের অনুষ্ঠান করেন, সেই ফলকামনাহীন অনাসক্ত ব্যক্তিই প্রশংসার যোগ্য।" এইরূপ কাজ ইন্দ্রিয়ভোগের জন্য বা কোনরূপ ফলাকাঙ্ক্ষা করিয়া নয়; তবে কিসের জন্য মানুষ কর্ম্ম করিবে? নদী পর্ব্বতগাত্র হইতে নির্গত হইয়া যদি আপনার জলধারা সমস্ত সমতলে ছড়াইয়া দিত, তাহা হইলে সমুদায় জল শুকাইয়া যাইতে বিলম্ব হইত না; কিন্তু সেই জল গভীর খাতের মধ্য দিয়া যায় বলিয়া সংসারের এত উপকার হয়। সেইরূপ মানুষের প্রকৃতিকে সংযত না করিলে মানুষ উচ্ছেদের দিকে যায়। নদী আপনার জল রক্ষা করিতে পারে তাহাকে কূল দিয়া বাঁধা হয় বলিয়া। মানুষের শক্তি এইরূপ বাঁধন চায়। বুদ্ধ এই পথ নির্দ্দেশ করে দিয়েছিলেন; গীতায়ও তাই বলা হচ্ছে, মন দ্বারা ইন্দ্রিয়চয় নিয়মিত করে কার্য্য করতে। কার্য্যে প্রবৃত্ত করবার জন্য গীতার শিক্ষা—

নিয়তং কুরু কর্ম্ম ত্বং কর্ম্ম জ্যায়ো হ্যকর্ম্মণঃ।
শরীরযাত্রাপিচ তে ন প্রসিধ্যেদকর্ম্মণঃ॥

"তুমি নিত্য কর্ম্ম কর, যেহেতু কর্ম্মহীন অবস্থা অপেক্ষা কর্ম্ম শ্রেষ্ঠ, সর্ব্বকর্ম্মশূন্য হইলে তোমার দেহযাত্রাও নির্ব্বাহ হইবে না।"

ভারতের ধর্ম্মশাস্ত্রে এই কর্ম্মের ভেরীধ্বনি শুনিয়া মানুষ কি করিয়া ইহাকে তুচ্ছ বলিয়া চলিয়া যায় তাই অনেক সময় ভাবি। ঘোর সংশয়সংগ্রামের মধ্যে অর্জ্জুনকে শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন—"তুমি কর্ম্ম কর। কর্ম্ম না করিলে তোমার দেহযাত্রাও নির্ব্বাহ হইবে না।" অথচ ভারতবাসীর মন সর্ব্বদা কর্ম্মত্যাগের জন্য ব্যাকুল, ইহা একটা রহস্য। কর্ম্ম কিসের জন্য করবে? শরীরটা শুকিয়ে গেলেই বা ক্ষতি কি? তাহার উত্তরে বলা হইতেছে;—

যজ্ঞার্থাৎ কর্ম্মণোঽন্যত্র লোকোঽয়ং কর্ম্মবন্ধনঃ।
তদর্থং কর্ম্ম কৌন্তেয় মুক্তসঙ্গঃ সমাচর॥

"যদি লোকে যজ্ঞ বা ভগবদারাধনার্থ ব্যতীত অন্য কর্ম্ম করে তাহা হইলে তাহার কর্ম্ম বন্ধন হয়, সুতরাং হে কৌন্তেয়, নিষ্কাম হইয়া কর্ম্ম অনুষ্ঠান কর।" আমি কাজ করিব তাহা যজ্ঞ, তাহা আমার ভগবানের আরাধনা, ইহাতে আর অন্য আকাংক্ষা নাই। আমার সব কাজ তাঁর পূজা, ইহা অপেক্ষা মানুষ আর কি শ্রেষ্ঠ যজ্ঞ করিতে পারে? আমার শরীর ও মন দিয়ে ভগবানের সেবা হতে পারে এই বিশ্বাস করলে সমস্ত কর্ম্মকুণ্ঠা লোপ পায়। আমার হাত দিয়ে দেবযজ্ঞ সম্পাদিত হবে এবং সেই যজ্ঞে নরকুল ধন্য হবে, জগতে দেবভাব প্রসারিত হবে, এইরূপ কর্ম্মের আকর্ষণে পড়লে মানুষের সমস্ত দোষ-দুর্ব্বলতা পালিয়ে যায়, কাজ তাকে মুক্তির নির্ম্মল আকাশে উড়িয়ে নিয়ে যায়।

দেবান্ ভাবয়তানেন তে দেবা ভাবয়ন্তু বঃ।
পরস্পরং ভাবয়ন্তঃ শ্রেয়ঃ পরমবাপ্স্যথ॥

"এই যজ্ঞদ্বারা তোমরা দেবগণকে সংবর্দ্ধন কর, সেই দেবগণও তোমাদিগকে সংবর্দ্ধিত করুন, এইরূপে পরস্পর সংবর্দ্ধনা করিতে করিতে পরম মঙ্গল লাভ করিবে।" মঙ্গল ও পবিত্র কার্য্যে জীবনের সমস্ত দেবভাব উদ্বুদ্ধ হয়, এবং দেবভাব উদ্বুদ্ধ হলে জীবন উন্নতির পথে যায়। ভগবানের সেবায় যদি কেহ জীবন অর্পণ না করে, তাহা হইলে সে যাহা কিছু সম্ভোগ করে তাহাতে তাহার অধিকার নাই; এইরূপ সুখান্বেষী লোককে চোরের সহিত তুলনা করা হইয়াছে।

কর্ম্মের উৎস স্বয়ং ভগবান। তিনি নিজে খাটিতেছেন, অতন্দ্রিতভাবে সমুদায় সৃষ্টি করিতেছেন; তাঁর কাছে দিন নাই, রাত্রি নাই, কত কোটি কোটি সৌরজগত নির্ম্মাণ করছেন, কত রক্ষা করছেন, কত গড়ছেন, কত ভাঙ্গাচ্ছেন, স্বয়ং আদর্শ হয়ে আমাদের সামনে দাঁড়িয়ে আছেন। সেই ক্রিয়াশীল দেবতা আমাদিগকে কর্ম্মশক্তিসম্পন্ন করেছেন, আমরা কিছুই করছি না। অহঙ্কারে অন্ধ ব্যক্তিরাই বলতে চায় যে "আমি কর্ম্মের কর্ত্তা"। একটু অভিনিবেশ সহ দেখলে বুঝতে পারি আমি কিছুই করি না, যা কিছু করি সে কেবল ভগবদ্দত্ত শক্তির গুণে। আমি নিজে কিছু করছি না, ভগবানের জন্যই সমস্ত কাজ, এই বিশ্বাস করে যাঁরা কর্ম্ম করেন, তাঁরা কর্ম্মের দ্বারাই মুক্তি লাভ করেন, তাঁরা সংসারে দুঃখ-যন্ত্রণার হাত হতে অনায়াসে ত্রাণ পেতে পারেন। এই বিশ্বাস না হলে কর্ম্ম আমাদের বন্ধন, আমাদের ক্রমে জড়িয়ে মেরে ফেলে। কেবল জ্ঞান ও পাণ্ডিত্য ফলালে আমরা ইন্দ্রিয়ের হাত থেকে পার পেতে পারি না, আমি সহজে রাগ-দ্বেষে বিচলিত হতে পারি। ঈশা যখন বন্দী হয়ে প্রাণদণ্ডাজ্ঞা পেলেন, তিনি অবিচলিত হয়ে বললেন, ইহাই আমার পিতার ইচ্ছা। হৃদয়ে কি শান্তি! কোন উদ্বেগ নাই, সমস্ত জীবন তিনি ভগবানকে আহুতি দিয়ে দিয়েছিলেন, তাঁর আবার কিসের ভয়? সমস্ত সংসার উল্টে গেলেও তাঁর সেই জীবনের কার্য্য তিনি পরিত্যাগ করেন নাই। সেই যজ্ঞে ভগবান্

তৃপ্ত হলেন, তার সঙ্গে সঙ্গে মানুষের অধিকার কত বেড়ে গেল, স্বর্গ মানুষের কাছে এসে উপস্থিত হল। নিষ্কাম আত্মযজ্ঞের ইহাই রীতি। সমস্ত ইন্দ্রিয় সংযত করে বুদ্ধ কর্ম্মে নিযুক্ত হলেন, সংসারে নূতন প্রেমের ধারা প্রবাহিত হল, ধর্ম্ম ও কর্ম্মের দ্বন্দ্ব ঘুচে গিয়ে গভীর সখ্য সংস্থাপিত হল। তাঁর পিতামাতা, আত্মীয়স্বজন সন্তুষ্ট হলেন, ভারতের নরনারী শান্তির মন্ত্র পেয়ে ধন্য হয়ে গেল।

ধর্ম্মসাধনের জন্য কর্ম্ম মানবের পক্ষে বিশেষ আবশ্যক। অদম্য ইন্দ্রিয়গণকে সংযত করতে হলে তাহাদিগকে সৎ কার্য্যে নিযুক্ত করতে হয়। সেই কার্য্যের মধ্যে তারা আপনাদের শক্তিকে খাটিয়ে শ্রান্ত হয়ে পড়ে, মন ধর্ম্মপথ হতে আর দূরে চলে যেতে পারে না। ইন্দ্রিয়দমন অতি কঠিন কার্য্য। তারা সহজে বশ মানতে চায় না, অনেক সময় বিপথে টেনে নিয়ে যায়। কিন্তু আমার মনে যদি আকাঙ্ক্ষা থাকে ভগবানের কাছে যাওয়া, যদি আমার জীবনকে তাঁর যজ্ঞের জন্য প্রস্তুত করতে কৃতসংকল্প হই, তাহলে বিপথে গেলেও আমার গম্যস্থানে এক সময় না এক সময় গিয়ে পড়বই। চুপ করে বসে থাকলে রিপু অনেক সময় আরও প্রবল হয়ে ওঠে। তাকে ভাল কাজে খাটিয়ে জব্দ করতে হবে; তাই কর্ম্ম আমাদের পক্ষে বিশেষ আবশ্যক। ভগবানের কাছে প্রার্থনা করি—তিনি আমাদের যে কর্ম্মশক্তি দিয়েছেন তার দ্বারা যেন আমারা তাঁকে পেতে পারি।

ডাক্তার এডওয়ার্ড বাইলস্ কাউয়েল।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

(শ্রীপঞ্চানন রায়)

অক্সফোর্ড বেলায়ল কলেজের ডাক্তার স্কট কবি টেনিসনের বন্ধু ছিলেন। কবি অতিথিরূপে সময়ে সময়ে তাঁহার ভবনে সমাগত হইতেন, কিন্তু ডাক্তার স্কটের কঠোর নিয়মানুবর্ত্তিতা তাঁহার কবিজন-সুলভ চিত্তের পক্ষে প্রীতিকর না হওয়ায় তিনি উদারচেতা কাউয়েলের বাসভবনকেই বিশেষ পছন্দ করিতেন। এই সূত্রে কবির সহিত কাউয়েলের প্রগাঢ় প্রেমের সঞ্চার হয়। সুবিখ্যাত লেখক থ্যাকারে সাহেবের সহিতও কাউয়েল এই সময়ে পরিচিত হন। *

* কলিকাতা মহানগরী থ্যাকারের জন্মস্থান। তাঁহার একটী আবক্ষ প্রতিমূর্ত্তি ভিক্টোরিয়া স্মৃতি-ভবনে রক্ষিত আছে।

অক্সফোর্ডে আগমনাবধি কাউয়েল বরাবরই Honours School এ যাইতে অনিচ্ছুক ছিলেন। কখনও 'পাশ' এবং কখনও 'অনার্স' স্কুলে অধ্যয়ন করিয়া তিনি আপনার প্রাথমিক দিনগুলি অতিবাহিত করিতেছিলেন। অবশেষে মতি স্থির করিয়া তিনি Honours School এই অধ্যয়ন করিতে আরম্ভ করেন এবং ১৮৫৪ খৃষ্টাব্দে উক্ত বিদ্যালয় হইতেই উপাধি পরীক্ষা প্রদান করিয়া প্রথম শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হন। অতিরিক্ত বাজে বই পড়ার জন্য বন্ধুবর্গ তাঁহার সফলতাবিষয়ে হতাশ হইয়া পড়েন, কিন্তু তাঁহার আশাতীত কৃতকার্য্যতা সকলের পক্ষেই যে প্রীতিকর হইয়াছিল সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। পরীক্ষার অব্যবহিত পূর্ব্বে তিনি Honours Course ছাড়িয়া দিতে বাধ্য হন, তথাপি তাঁহার প্রত্যুত্তর-পত্র পরীক্ষকমণ্ডলীর এতদূর প্রীতিকর হইয় ছিল যে, তাঁহারা সকলে একযোগে তাঁহাকে সম্মানীয় চতুর্থ স্থান প্রদান করিয়া বি-এ, উপাধিতে ভূষিত করেন। অঙ্কশাস্ত্রে তিনি দ্বিতীয় শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হন। ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে এম-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া * দশ পাউণ্ড মূল্যের কতকগুলি পুস্তক উপহারস্বরূপ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। অবশেষে হিব্রু ভাষায় বৃত্তিলাভের চেষ্টা করিতে গিয়া ভালরূপ প্রস্তুত না থাকায় অকৃতকার্য্য হন।

কাউয়েলের ভাগ্যে অক্সফোর্ডে দীর্ঘকাল বাস করা ঘটিয়া উঠিল না। ১৮৫৫ খৃষ্টাব্দের শেষ ভাগে তাঁহার বন্ধু জর্জ্জ কিচেন তাঁহাকে একটী পত্র লিখিয়া জানান যে, কলিকাতা প্রেসিডেন্সি কলেজে ইংরাজী ইতিহাসাধ্যাপকের পদ খালি হওয়ায় সার জেমস্ ষ্টিফেন তাঁহাকে ভারতবর্ষে যাইয়া উক্ত পদ গ্রহণ করিতে সক্ষম এমন কোন একজন সুযোগ্য ব্যক্তিকে নির্ব্বাচন করিতে অনুরোধ করিয়াছেন। ভারতবর্ষের কোন কলেজে

* কাউয়েলের জীবনচরিতের ১০৮ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে … … 'he took his M. A. degree in 1857 before his departure for India' ; কিন্তু ১২১পৃষ্ঠায় লিখিত আছে যে, 'on August 1st they both sailed for India' … এবং কলিকাতায় আসিয়া কাউয়েল যে চিঠি লিখেন তাহার তারিখ 'Dec. 7-56 Monday, Spence's Hotel, Calcutta.' সুতরাং কোন্ বৎসর তিনি ঠিক্ এম এ. পাশ করেন তাহা বোঝা গেল না।

অধ্যাপকের পদ লাভ করা কাউয়েলের পক্ষে স্বপ্নাতীত সুযোগ বলিয়া মনে হইল। যদিও ইংলণ্ডের ইতিহাস তাঁহার যথার্থ পাঠ্য বিষয় ছিল না, তবুও বিষয়টি তাঁহার প্রিয় ছিল। উক্ত পত্র প্রাপ্তির তিন মাস পরে তিনি কলিকাতা প্রেসিডেন্সি কলেজের ইংলণ্ডের ইতিহাস ও রাজনীতিমূলক অর্থনীতি (political economics) শাস্ত্রদ্বয়ের অধ্যাপকপদের নিয়োগপত্র প্রাপ্ত হইলেন।

১৮৫৬ খৃষ্টাব্দের ১লা আগষ্ট কাউয়েল ও তাঁহার স্ত্রী তাঁহাদের যাবতীয় পুস্তকাদি লইয়া ভারতগমনার্থ পোতারোহণ করিলেন। জাহাজে তাঁহারা ব্যবহারোপযোগী ভারতীয় ভাষাশিক্ষায় এবং রাজনৈতিক অর্থনীতি চর্চ্চায় কালযাপন করিতেন। উত্তমাশা অন্তরীপ প্রদক্ষিণ করিয়া ২৯শে নভেম্বর তাঁহারা কলিকাতায় উপস্থিত হইলেন। এখানকার Spence's Hotelএ বাসস্থান ঠিক করিয়া তিনি আপনার কর্ম্মগ্রহণ করিলেন। তাঁহার কার্য্যগ্রহণের প্রথম দিনকার একটী ঘটনা পণ্ডিত কৃষ্ণচন্দ্র রায়ের পত্রে উল্লিখিত হইয়াছে। ঐ দিন কার্য্য গ্রহণ করিতে যাইয়া কাউয়েল রায়মহাশয়দিগের ক্লাসের বাহিরে টুপীহস্তে দণ্ডায়মান ছিলেন। Mr. Hand তখন অধ্যাপনা করিতেছিলেন, তিনি ছাত্রগণ কর্তৃক অনুরুদ্ধ হইয়া কাউয়েলকে অবলোকন করিলেন এবং তাঁহার পরিচয় অবগত হইয়া তাঁহাকে তদানীন্তন অধ্যক্ষ Mr. Clintএর নিকট লইয়া গেলেন। এদিকে ছাত্রমহলে তাঁহার নাম প্রচারিত হইবামাত্র ছাত্রগণ তাঁহার প্রতি বিশেষ আকৃষ্ট হইয়া পড়িল। ঐ দিনই অন্য সময়ে Mr. Clint তাঁহাকে লইয়া পুনরায় ঐ ক্লাসে উপস্থিত হইলেন এবং ছাত্রদিগকে একটী অঙ্ক দিয়া প্রস্থান করিতে উদ্যত হইবামাত্র কাউয়েল তখনই সেই সুকঠিন অঙ্কটির সমাধান করিয়া তাঁহাকে দেখাইলেন; ইহাতে Mr. Clint পরে ছাত্রমণ্ডলীকে বলিয়াছিলেন যে, তিনি কেবল সাহিত্যশাস্ত্রেই সুপণ্ডিত নহেন, পরন্তু একজন যথার্থ গণিতজ্ঞ। এই সময়ে ভারতবর্ষে সিপাহীবিদ্রোহ উপস্থিত হয়। তাঁহার আত্মীয়স্বজনের নিকট লিখিত তৎকালীন পত্রগুলি উক্ত বিদ্রোহবিষয়ক বহু প্রয়োজনীয় ঐতিহাসিক তথ্যে পূর্ণ। অতঃপর তিনি হিন্দুস্থানী ভাষা শিক্ষায় মনোনিবেশ করেন।

১৮৫৮ খৃষ্টাব্দে প্রাতঃস্মরণীয় বিদ্যাসাগর মহাশয়ের পদত্যাগে সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষের পদ শূন্য হয়। কাউয়েল সাহেবকে উক্ত পদ প্রদান করিবার একমাত্র আপত্তি ছিল তাঁহার বাঙ্গলা ভাষায় অনভিজ্ঞতা। এই জন্য তিনি অভিনিবিষ্ট হইয়া বাঙ্গলা শিক্ষা আরম্ভ করেন এবং শীঘ্রই উহা আয়ত্ত করিয়া লইতে সমর্থ হন।

১৮৫৮ খৃষ্টাব্দের ৮ই আগষ্ট তিনি সংস্কৃত কলেজের তদানীন্তন অবস্থা ও অধ্যয়নাদিবিষয়ক একটী বিস্তৃত বিবরণ প্রদান করিতে আদিষ্ট হইয়া অস্থায়ী ভাবে উক্ত কলেজের অধ্যক্ষপদে প্রতিষ্ঠিত হন। এই পদ গ্রহণ করা হেতু প্রেসিডেন্সি কলেজের পারিশ্রমিক ব্যতীত অতিরিক্ত তিনশত মুদ্রা তাঁহাকে প্রদত্ত হইত। প্রেসিডেন্সি কলেজের অধ্যাপকগণ সেই সময় নিম্ন ও উচ্চ নামক দুইটী শ্রেণীতে বিভক্ত ছিলেন। নিম্ন শ্রেণীর অধ্যাপকগণ মাসিক তিনশত মুদ্রা পারিশ্রমিক এবং বাসস্থানের জন্য অতিরিক্ত অশীতি মুদ্রা প্রাপ্ত হইতেন। উচ্চ শ্রেণীর অধ্যাপকগণের মাসিক পারিশ্রমিক ছিল ছয়শত টাকা ও বাসস্থানের জন্য একশত। কাউয়েল সাহেব পারিশ্রমিক বাবদ প্রেসিডেন্সি কলেজ হইতে মাসিক আটশত টাকা পাইতেন। ইতিহাস এবং অর্থনীতি ছাড়াও সময়ে সময়ে তাঁহাকে ইংরাজী সাহিত্য এবং দর্শনবিষয়ক অধ্যাপনাও করিতে হইত। প্রতি রবিবার তিনি নিজ ভবনে কয়েকটী ছাত্রকে বাইবেল পড়াইতেন। তিনি ভারতে আসিবার পূর্ব্বে এদেশে এম এ. পড়িবার কোন ব্যবস্থা ছিল না। তিনিই প্রথমে প্রেসিডেন্সি কলেজে এম-এ. পড়াইবার ব্যবস্থা করিয়া নিজেই ইতিহাস এবং রাজনৈতিক অর্থনীতি অধ্যাপনার ভার গ্রহণ করেন। পূর্ব্বে সংস্কৃতভাষা বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্য-তালিকাভুক্ত ছিল না। প্রধানতঃ তাঁহারই যত্নে উহা প্রবেশিকা, এফ-এ এবং বি-এ, পরীক্ষার পাঠ্য রূপে নির্দ্দিষ্ট হয়। সংস্কৃত ভাষায় এম-এ, পরীক্ষার প্রবর্ত্তনও তাঁহার বিশেষ প্রচেষ্টার ফল; কলিকাতা কর্পোরেশনের ভূতপূর্ব্ব সহকারী সভাপতি (Vice Chairman)

স্বর্গীয় নীলাম্বর মুখোপাধ্যায় মহাশয় ১৮৬৫ খৃষ্টাব্দে উক্ত ভাষাতেই প্রথম এম-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষপদে আসীন হইয়াই কাউয়েল সাহেব উহার তাৎকালিক অবস্থাদি পর্য্যবেক্ষণ করিয়াই একটী সুবিস্তৃত বিবরণ সরকার বাহাদুরকে প্রেরণ করেন। তাঁহার এই সময়কার একটী পত্রে জানা যায় যে সংস্কৃত-কলেজ সম্বন্ধে উক্ত সুন্দর ও সুবিস্তৃত বিবরণী (report) প্রদান করা হেতু তদানীন্তন ছোটলাট বাহাদুর তদীয় প্রাইভেট সেক্রেটারী দ্বারা শিক্ষা-বিভাগের ডিরেক্টর মহোদয়কে লিখিত একটী পত্রে তাঁহার খুব প্রশংসা করিয়া ধন্যবাদ জানাইতে অনুরোধ করেন। কাউয়েলপ্রদত্ত উক্ত বিবরণী অনুসারেই সংস্কৃতকলেজের তাৎকালিক পরিবর্তন-সমূহ সংঘটিত হয়। শিক্ষাবিভাগের ডিরেক্টারের বিবরণীতেও আমরা উহার ইঙ্গিত দেখিতে পাই। নিম্নে পাদটীকায় সাধারণের অবগতির জন্য কাউয়েলের জীবনী হইতে উহার সারাংশ উদ্ধৃত করিয়া দিলাম। *

কাউয়েল সাহেব কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন ফেলো এবং সিণ্ডিকেটের একজন বিশিষ্ট সদস্য ছিলেন। এতদ্ব্যতীত পাঠ্য-পুস্তক-নির্ব্বাচন-সমিতির ইংলণ্ডের ইতিহাস, দর্শন, রাজনৈতিক অর্থনীতি, গ্রীক্ ও ল্যাটিন্ ভাষার পুস্তকসমূহ নির্ব্বাচনের জন্য একজন উপদেষ্টা নিযুক্ত হন। তৎকালীন The Vernacular Literature Society নামক একসমিতির তিনি সম্পাদক ছিলেন। ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দের ৯ই জানুয়ারী তিনি Asiatic Societyর সম্পাদক নির্ব্বাচিত হন। ১৮৬৩ খৃষ্টাব্দের জুলাই মাস পর্য্যন্ত তিনি উক্ত পদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। সংস্কৃত পুস্তক সমূহের সম্পাদকতা করিবার জন্য তিনি উক্ত সোসাইটির Philological Section এর সভাপতি-পদ লাভ করেন। এই সোসাইটীর জন্য তাঁহাকে প্রভূত পরিশ্রম করিতে হইত।

১৮৫৯ খৃষ্টাব্দের মে মাসে কাউয়েল-পত্নী অত্যন্ত পীড়িত হইয়া পড়েন, কিন্তু তাঁহার আন্তরিক যত্নে ও শুশ্রূষায় শীঘ্রই নিরাময় হইয়া উঠিতে সমর্থ হন। এই সময় কলিকাতার তদানীন্তন বিশপ কাউয়েলকে তদীয় প্রাসাদে আসিয়া বাস করিতে অনুরোধ করায় তিনি সেইখানেই বাস করিতে আরম্ভ করেন। তাঁহার স্ত্রীর স্বাস্থ্যের পক্ষে এই বাড়ীটী বিশেষ উপযোগী প্রতিপন্ন হইল। এই সময়ে সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষপদে তিনি স্থায়ীরূপে প্রতিষ্ঠিত হন।

শীঘ্রই বেথুন কলেজের এক সভায় তিনি "History and Historical evidence to the Educated Hindus" নামক বিখ্যাত বক্তৃতাটী প্রদান করেন। এই সময় তিনি কাজে এতদূর ব্যস্ত থাকিতেন যে, প্রায়ই প্রাতর্ভোজন করিতে বিস্মৃত হইতেন এবং তাঁহার ভক্ষ্য দ্রব্যগুলি চতুর বায়সকুল বণ্টন করিয়া খাইত। এই সময়কার সংস্কৃতকলেজের কোন বার্ষিক পুরস্কারবিতরণী সভায় তিনি একটী স্বরচিত সংস্কৃত শ্লোক পাঠ করেন ও একটী সুদীর্ঘ বাঙ্গলা বক্তৃতা দ্বারা সমাগত ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতগণের মনস্তুষ্টি বিধান করেন। ১৮৬১ খৃষ্টাব্দের পুরস্কারবিতরণী সভাতেও তিনি ঐরূপ একটী শ্লোক পাঠ ও সুদীর্ঘ বক্তৃতা প্রদান করিয়াছিলেন।

* A complete account of the present condition and recent history of the Sanskrit College is given in the valuable report of the Principal, Mr. Cowell. I have nothing to add to Mr. Cowell's statements except to record my opinion that the Institution is now in a most satisfactory state, and that this is mainly due to his tact and judgement, and to the earnest devotion he has bestowed upon a charge for which he is specially qualified by his University training and his eminent acquirements as an oriental scholar. (Life of Professor Cowell—Page 219)

শব্দ-ব্রহ্ম।

(২)

(শ্রীবসন্তকুমার ভট্টাচার্য্য)

এই শব্দ—এই বাণী অপরের নিকট হইতে প্রত্যুত্তর চাহে। ব্রহ্ম বলিলেন "আমি আছি"—জানি না কোন্ অলক্ষিত শক্তিতে জীবের মুখ হইতেও বাহির হইল "তুমি আছ"। এই "আমি-তুমিতে"

মিলিয়া কত নব নব লীলা-খেলা হইয়াছে ও হইতেছে। এই "আমি-তুমির" সংমিশ্রণে কত হাসি কত রোদন, কত আনন্দ কত বেদন, কত মিলন কত বিরহের সৃষ্টি হইল। ধ্রুব কাঁদিতে কাঁদিতে ডাকিলেন "ভগবন্! কোথায় তুমি?" মধুবন মাতাইয়া শত ফুল ফুটাইয়া উত্তর আসিল "বৎস! বৎস! এই যে আমি"। জ্ঞানহীন দুর্ব্বল ক্ষুধিত তৃষিত শিশু অতি কষ্টে ডাকিল "মা" "মা"—শত কর্ম্ম ফেলিয়া অঞ্চল লুটাইয়া ব্যাকুল হইয়া উন্মাদিনী মাতা ছুটিয়া আসিয়া শিশুকে বক্ষে তুলিয়া শত চুম্বন দিয়া বলিলেন "বাছা! বাছা! এই যে আমি"। ডাকিলেই উত্তর আসে—প্রার্থনা করিলেই ফল লাভ হয়। বসন্তের কোকিল ঝঙ্কার করিয়া যেমন বনান্তর হইতে অন্য কোকিলকে জাগাইয়া দেয়—তেমনই প্রেমিকের কণ্ঠস্বর—প্রেমভরা আহ্বান ধ্বনি—পর্ব্বতসম বাধাবিঘ্ন ঠেলিয়া প্রেমাস্পদকে যত দূরস্থই কেন হউক না—নিকটে—অতি নিকটে ডাকিয়া আনে। মানব যদি নীরব থাকিত, প্রেমভরে ব্যাকুলচিত্তে না ডাকিত—ভগবান তা হলে মনের দুঃখে বোধ হয় সমস্ত সৃষ্টিটাকে ভস্ম করিয়া ফেলিতেন। অভ্রভেদী চিরতুহিনাচ্ছন্ন অচল অটল হিমাচল ডাকিতে জানে না বলিয়াই এত বড় হইয়াও জড় পদার্থ মাত্র। অনন্ত গগনবিহারী কোটী চন্দ্র-সূর্য্য এত জ্যোতির্ম্ময় হইয়াও ডাকিতে জানে না বলিয়াই যেন চিরদিন আপনাদের তেজে আপনারা জ্বলিতেছে। মানবশিশু ধন্য যে জন্মদাতাকে ডাকিতে জানে—প্রেমাস্পদের কর্ণে প্রেমগাথা শুনাইতে জানে এবং জীবনধনের মধুমাখা নাম গাহিতে গাহিতে প্রাণ ত্যজিতে জানে। তাই সে ক্ষুদ্র হইয়াও সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ, তাই সে দুর্ব্বল হইয়াও মহাবল পরাক্রান্ত, তাই সে জীব হইয়াও ভগবানের সঙ্গী—ষষ্ঠীর বর ও স্বর্গের অধিকারী। ডাকা দুর্ব্বলতা নহে—প্রার্থনা করা তোষামোদ নহে—ব্যাকুলতা নিরাশ্রয়তা নহে। যে বিপদে চীৎকার করিয়া বিপদভঞ্জনকে ডাকিতে পারে—যে সম্পদে কলকণ্ঠ ছাড়িয়া সম্পদদাতার জয়গান করিতে পারে—যে মিলনে আত্মহারা হইয়া পরমাত্মার আরাধনা করিতে পারে এবং যে বিরহে পাগলপ্রাণে গান গাহিয়া ত্রিভুবনকে উন্মত্ত দেখিতে পারে—সেই মানবই এই বিশ্বের মধ্যে সৌন্দর্য্যের আধার—সেই মানবই এই সৃষ্টির চিরশ্রেষ্ঠ অভিব্যক্তি এবং সেই মানবই যুগে যুগে ধর্ম্মলীলার প্রধান সহায়।

কত প্রত্নতত্ত্ববিদ পণ্ডিত কত পুরাতন ভগ্ন দেবমন্দিরাদির ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত পাষাণখণ্ডে কোন্ ভাষায় কত কি লেখা আছে তাহা পড়িয়া বেড়াইতেছেন, আমিও তাঁহাদের সঙ্গে সঙ্গে ঘুরিয়া ঘুরিয়া পড়িতেছি—ভূস্তরে প্রস্তরে তাবৎ চরাচরে কি সুমিষ্ট দেবভাষায় কি মধুর অনুষ্টুপ ছন্দে কোন্ অনাদি কাল হইতে কত কি লেখা রহিয়াছে। সৃষ্টির প্রতি বিন্দুতে বিন্দুতে প্রতি ভূতে ভূতে লেখা রহিয়াছে—"ও যো দেবোঽগ্নৌ যোঽপ্সু যো বিশ্বং ভুবনমাবিবেশ। য ওষধিষু যো বনস্পতিষু তস্মৈ দেবায় নমো নমঃ।" কে লিখিয়া গেল—কোন্ যুগে লিখিল—হিন্দু না মুসলমান—খৃষ্ট-পূর্ব্বে না খৃষ্ট-পরে? কেবল মানব কেন—পশুপক্ষীরাও যে কথা কহিতেছে—বৃক্ষলতা যে বেদপাঠ করিতেছে—পর্ব্বত নাচিতেছে—সমুদ্র করতালি দিতেছে—চন্দ্র-তারা পুষ্প ছড়াইতেছে। কে বলে এ সৃষ্টি জড়পদার্থ—কে বলে এ সৃষ্টি পর্ব্বত পাথর—নীরব—না না এতক্ষণ যাহা বলিয়াছি সবই ভুল হইয়াছে। ঐ শুন জল স্থল অনল অনিল কথা কহিতেছে—শব্দব্রহ্ম ভূতসমূহের বিন্দুতে বিন্দুতে থাকিয়া বলিতেছেন—"সর্ব্বভূতস্থমাত্মানং সর্ব্বভূতানি চাত্মনি!" আহা! কি স্বর্গীয় কি অমৃতপূর্ণ শব্দব্রহ্মের সমুচ্চারণ!

শব্দ যেমনই কঠোর তেমনই কোমল—যেমনই কর্কশ তেমনই মধুর! বজ্রের প্রচণ্ড রব ও বাঁশরীর সুমধুর ধ্বনি—উভয়ের কত পার্থক্য! বজ্ররব কেহই চায় না—মুরলীধ্বনি পশু পক্ষী মানবে যাচিয়া শুনিতে চায়। সাপুড়ের বাঁশী শুনিয়া তীক্ষ্ণ বিষধর লুটাইয়া পড়ে, হিংসা ছাড়ে, ধরা দেয়। ব্যাধের বাঁশীতে সরল মৃগ স্বেচ্ছায় মস্তক পুরস্কার দিয়া বলে, "যব্ এক পত্র খড়্খড়ায়ে তব্ বৈঠি সিংহলকা দ্বীপ—তেরা বেণু-স্বর শুনকে শির দিয়া বকসিস্। সিং বেচকে কৌড়ি করনা, মাস্ পাকায়েকে খাও—চামড়া লেকে আসন কিযে বেণুকা স্বর শোনাও।" মধুর শব্দের কাছে জীবের প্রাণ তুচ্ছ—জাতিকুল কল্পনা মাত্র। আমাদের প্রাণের তারের সঙ্গে ব্রহ্মের অদৃশ্য অব্যক্ত বীণার তারের মিল আছে। যখন সেই অদৃশ্য তার ঝঙ্কারিয়া উঠে, তৎসঙ্গে আমাদের প্রাণের তারও কাঁপিয়া উঠে। কোন্ দেশে—কোন্ দূরতম বিভাগে—প্রাণপ্রিয় প্রেমভরে বীণা বাজাইলেন—মানব অমনই সব কর্ম্ম ফেলিয়া সেই দিকে ছুটিল। কে ডাকিতেছে—আর ঘরে থাকা হলো না। কার বাঁশী বাজিতেছে—আর সংসার ভাল লাগিল না। যে মানবের ভিতর দিয়া এই মিষ্ট বাঁশী বাজে তিনি ধন্য!

মিষ্ট কথার মূল্য অনেক—সহজে মিলে না। আমরা সকলেই যদি সকল সময়েই মিষ্ট কথা বলিতে পারিতাম, তাহা হইলে মানবপরিবারে কতই না শান্তি স্থাপিত হইত! ত্রিতাপ-জ্বালার কতই না উপশম হইত। পিতাপুত্রে, মাতাকন্যায়, ভ্রাতাভগ্নীতে, স্বামী-স্ত্রীতে কতই না মাধুর্য্য ফুটিয়া উঠিত! আমাদের সংসার শান্ত, হাস্য,

সখ্য, বাৎসল্য ও মাধুর্য্যরসে আনন্দ-নিকেতনে পরিণত হইত। আমাদের গৃহের বালকবালিকাগণ বাল্মীকির তপোবনে লবকুশের ন্যায় মিষ্টকণ্ঠে কি অভিনব রামায়ণই না গান করিত! আমাদের জীবনের সুর যদি শব্দব্রহ্মের সহিত মিলিত তবে আমাদের উপদেশে কত অশান্ত ব্যক্তি শান্ত হইত—কত পাপী পাপ ছাড়িয়া ভগবদ্ভক্ত হইয়া পড়িত! শিশু প্রহ্লাদের কথায় দৈত্যপুরীর সমুদায় দৈত্য দেবদ্বেষে কেমন মাতিয়াছিল—সাধনায় সিদ্ধিলাভের পর গৌতমের উপদেশে কত শত লোক মঙ্গলের পথে কেমন ফিরিয়া আসিয়াছিল। ঈশার সুমিষ্ট কথা শুনিয়া কত তাপিত প্রাণ কেমন জুড়াইয়া গিয়াছিল এবং নিত্যানন্দ শ্রীগৌরাঙ্গের হরিনামকীর্ত্তনে কত তৃষিত আত্মা প্রাণ ভরিয়া শান্তিবারি পানে কেমন চিরতৃপ্ত হইয়াছিল। তাঁহারা যাহা পারিয়াছিলেন আমরা তাহা পারি না কেন? ইহার কারণ কি? আমরা কথা কহিতে জানি না—লোককে বুঝাইতে গিয়া চটাইয়া দিই। কেন এমন হয়? কারণ, আমাদের সঙ্গে শব্দব্রহ্মের মিলন আমরা অধিক সময়ে ভুলিয়া যাই।

ব্রহ্ম কেবলই মিষ্ট, কেবলই মধুর—তাই তাঁর নাম আনন্দ, অমৃত। আনন্দের সন্তান—অমৃতের পুত্র আমরা—অনেক সময় অভ্যাসদোষে সেই আনন্দ ও অমৃতকে হারাইয়া ফেলি। সেই জন্যই আমাদের সংসারে এত গোলযোগ, এত কলহ, এত কোলাহল। মানবের কণ্ঠে কেমন কোমল স্বর আছে; কিন্তু যতক্ষণ না তাহা বাহিরের বীণার স্বরের সঙ্গে এক হয় ততক্ষণ খুব মিষ্ট গায়কেরও কণ্ঠ হইতে তত মিষ্ট স্বর নির্গত হয় না। তবে চাই কি? মিলন! কার সঙ্গে মিলন? অনাদি চিরন্তন ভুবনরঞ্জন শব্দব্রহ্মের সঙ্গে। এক কথায় ব্রহ্মের সঙ্গে জীবের মিলন চাই—পরমাত্মার সঙ্গে জীবাত্মার সংযোগ চাই। তাঁহারই শব্দে তাঁহারই বংশীরবে, আমাদের সকল শব্দকে সকল রবকে মিলাইয়া লইতে হইবে। আমি কখন্ সুমিষ্ট হইব? যখন অনন্ত মাধুর্য্যে অঙ্গ ঢালিয়া দিব। সেই অনন্তকে না লইলে না ভজিলে কেহই শান্ত স্নিগ্ধ ও মধুর হইতে পারে না। নারদের বীণা, নানকের রবাব, দাউদের তন্ত্রী, শ্রীগৌরাঙ্গের মৃদঙ্গ এত মিষ্ট কেন? কারণ, উহারা চিরদিন বিশ্বযন্ত্রীর যন্ত্রের সঙ্গে মিলিয়া মিশিয়া আছে। মৃদঙ্গ-করতালের সুর বার বার বাঁধিতে হয় না—সেই গোড়ায়, সেই মূলে বাঁধা আছে—তাই কখনও বেসুরে বাজে না। আমাদের জীবনযন্ত্রকেও ঐরূপ সেই বিশ্ব-যন্ত্রীর যন্ত্রের সঙ্গে মিলাইয়া বাঁধিয়া রাখিতে হইবে। মিলন চাই—যোগ চাই—'দ্বা সুপর্ণা সযুজা সখায়া' চাই। সূতিকাগারের জন্য রাখিলে হইবে না—বিলম্ব লাভ করিতে হইবে। যতদিন সুরে সুর না মিলাইবে, ততদিন যাহাই কেন কর না, কেবলই যাতনা। শঙ্করের কথা—"অস্মিন্ সংসারে যোজিতচিত্তঃ শোচতি শোচতি শোচত্যেব"।

মিলনই জগতের আকাঙ্ক্ষিত। মিলনে সুখ, মিলনে স্বর্গ। মিলন না থাকিলে অভিনয় জমে না—উপন্যাস ভাল লাগে না। বিন্দুতে বিন্দু মিলাইয়া সমুদ্রের সৃষ্টি হইল—অণুতে অণু মিলাইয়া ব্রহ্মাণ্ড গঠিত হইল। মহাকর্ষণ, মাধ্যাকর্ষণ, কৈশিকাকর্ষণ একের সঙ্গে অপরের মিলন জন্য। বিবাহবন্ধন, সংসার-বন্ধন, জীবের সঙ্গে জীবের মিলনের কারণ। এ সৃষ্টির একটী আর একটীকে ডাকিতেছে। কেহই যেন একাকী থাকিতে পারিতেছে না। যিনি একাকী ছিলেন তিনি বহুধা আত্মপ্রকাশ করিলেন এই সম্মিলনসুখ সম্ভোগ করিবার জন্য। মানব যদি ভগবানকে ভাল না বাসে, তাঁহার নিকটে না আসে, তাঁহার নামে জয়ধ্বনি না করে, তবে ভগবান বেদনা অনুভব করেন। সেই জন্যই তিনি জীবের নিকটে প্রেম ভিক্ষা করেন। হতভাগ্য জীব তাঁহাকে চিনিতে না পারিয়া কত অপমান করে, বিদায় করিয়া দিবার চেষ্টা করে। কিন্তু ভগবান যে জীব-প্রেমাকাঙ্ক্ষী; তিনি শত অপমান সহ্য করিয়াও জীবের হৃদয়-কুটীরে একবার প্রবেশ করিবার পথ অন্বেষণ করেন। তাই তিনি শব্দরূপে আমাদের কণ্ঠে ও রসনায় প্রকাশ পাইতেছেন। এই শব্দকে অপমান করা, তুচ্ছ করা আমাদের কিছুতেই উচিত নহে। এই শব্দ হইতেই সকল পাইব, পঞ্চেন্দ্রিয়ে অতীন্দ্রিয় ভগবানের মাধুর্য্য সম্ভোগ করিয়া জন্ম ভুলিব, মরণ ভুলিব, ইহকাল ভুলিব পরকাল ভুলিব। শিশুর সমুদায় দুঃখ-যাতনা যেমন দূরে যায় "মা" "মা" বলিয়া ডাকিলে—জীবেরও ত্রিতাপ-জ্বালা দূর হয় তেমনই ভগবানের নামোচ্চারণে। এই নাম-ব্রহ্মই আমাদের চির অবলম্বন। সৃষ্টিরও প্রথমে শব্দ, জীবের সাধনেরও প্রথমে শব্দ। জীবের শিক্ষায় দীক্ষায় শব্দ এবং সাধন-ভজনেও শব্দ। জীবের ক্ষুধা তৃষ্ণা যাতনা আনন্দ সবই শব্দে প্রকাশ পায়—শব্দ শুনিয়াই এক অপরের প্রাণের কথা বুঝিয়া লয়। এই শব্দই আমাদের সূতিকাগারে অস্ফুট ক্রন্দনরব এবং শ্মশানশয্যায় তারক ব্রহ্ম নাম।

সৎসাধকগণ! আমরা আজি কোথায় আসিয়াছি তাহা একবার বিশদরূপে হৃদয়ঙ্গম করিবার চেষ্টা করি। এমন দিন ছিল যখন আমরা কেহই ছিলাম না। কিন্তু আজ কত দলে দলে আমরা এই বিশ্বরঙ্গালয়ে আসিয়াছি। আজ আমাদের সম্মুখে অসত্য নাই

অন্ধকার নাই। অসত্য অসৃষ্টিরূপ মহান্ধকারের পরে আজ আমরা সৃষ্টির কতই-না নব নব আলোকে ও সৌন্দর্য্যে মণ্ডিত হইতেছি। পূর্ব্বে যেখানে ছিলাম, এখন আর সেখানে নাই; পরে এখান হইতেও অনন্ত বিকাশের দিকে চলিয়া যাইব। এ সৃষ্টি ক্রমেই ফুট হইতে ফুটতর হইতেছে। অনন্তের মধুর বাঁশরী গানে—শব্দব্রহ্মের তানমানলয়পরিশুদ্ধ সঙ্গীততানে এই সৃষ্টি নাচিতে নাচিতে কোন্ অজানা অচেনা দেশের পানে ক্রমাগতই ছুটিতেছে। শব্দব্রহ্মের বেণুস্বরে সূর্য্য নাচিতেছে—চন্দ্রমা নাচিতেছে—ছায়াপথ, শিশুমার নাচিতেছে—সপ্তর্ষিমণ্ডল নাচিতেছে—গঙ্গা যমুনা গোদাবরী নাচিতেছে—নরলোকে নরনারী, জলে স্থলে স্থাবর জঙ্গম সকলেই নাচিতেছে। ভূর্ভুবঃস্বর্লোকের এ নৃত্য কখনও থামিবে না। এটা দেখিতেছি সঙ্গীতের দেশ, হাসির রাজ্য, আনন্দের সাম্রাজ্য! 'আনন্দাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে—আনন্দেন জাতানি জীবন্তি—আনন্দম্ প্রয়ন্ত্যভিসংবিশন্তি।' আমাদের উৎপত্তি আনন্দে, স্থিতি আনন্দে, পরিণতি আনন্দে। কে বলে আমরা সূতিকাগারে জন্মিয়াছি? কে বলে আমরা শ্মশানে মরিব। আমাদের জন্ম এত ক্ষুদ্র নয়, আমাদের মরণ এত সহজ নয়। আমরা অমৃতের সন্তান আনন্দের পুত্রকন্যা। সেই সচ্চিদানন্দ ব্রহ্ম আমাদিগকে আশীর্ব্বাদ করুন।

সাংখ্যে ঈশ্বরবাদ।

(অধ্যাপক ৺অভয়কুমার মজুমদার এম-এ লিখিত ইংরাজী নিবন্ধের অধ্যাপক শ্রীযতীন্দ্রকুমার মজুমদার এম-এ, পি-এইচ. ডি কৃত অনুবাদ)

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

সেশ্বর সাংখ্যসম্বন্ধে শাস্ত্রীয় প্রমাণ।

উপরে যাহা বলা হইয়াছে তাহা হইতে এক্ষণে এই কথা বেশ স্পষ্টীকৃত হইতেছে যে, সাংখ্য ঈশ্বরাস্তিত্ব স্বীকার করিতেছেন। কিন্তু কয়েকটী শ্লোক আছে, যাহা এই অনুমানের বিরোধী বলিয়া মনে হয়। সেই শ্লোকগুলি এই—

"পঞ্চবিংশাৎ পরং তত্ত্বং পঠ্যতে ন নরাধিপ।
সাংখ্যানান্তু পরং তত্ত্বং যথাবদনুবর্ণিতং॥
বুদ্ধমপ্রতিবুদ্ধত্বাদ্ বুধ্যমানঞ্চ তত্ত্বতঃ।
বুধ্যমানঞ্চ বুদ্ধঞ্চ প্রাহুর্যোগনিদর্শনম্॥"

(মভা. ৩০৭ অঃ, ৪৫ ও ৪৭শ্লো.)।

অর্থাৎ—"সাংখ্যে পঞ্চবিংশ তত্ত্বের অতিরিক্ত আর কোনও তত্ত্ব স্বীকৃত হয় নাই। সাংখ্যেরা যাহাকে পরম তত্ত্ব বলিয়া মনে করেন, তাহা আমি যথার্থরূপে বর্ণনা করিয়াছি। যোগশাস্ত্রে এইরূপ বলা হইয়াছে যে, জ্ঞানের সার যে ব্রহ্ম তিনি কেবল অজ্ঞানাবদ্ধ হইয়াই জীব হয়েন। সুতরাং, যোগশাস্ত্রে ব্রহ্ম ও জীব এই দুয়ের কথাই বলা হইয়াছে।" এখানে ইহা স্পষ্টই বলা হইতেছে যে সাংখ্য জীবের অতিরিক্ত আর কোনও তত্ত্বের অস্তিত্ব স্বীকার করেন না; কেবল যোগদর্শনেই ইহা স্পষ্টতঃ স্বীকৃত হইয়াছে। কিন্তু আমরা পূর্ব্বে দেখাইয়াছি যে, অন্যান্য আরও অনেক সূত্রে ইহা স্পষ্টই স্বীকৃত হইয়াছে যে, সাংখ্য পঞ্চবিংশ তত্ত্ব হইতে অতিরিক্ত তত্ত্ব অর্থাৎ ব্রহ্ম বা ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করেন। তাহা হইলে আমরা এই দুইটী বিরুদ্ধ বাক্যের সামঞ্জস্য কিরূপে সাধন করিতে পারি? অনেক প্রকারে এই সামঞ্জস্য সাধন করিতে পারা যায়। প্রথমতঃ, উপরি-উক্ত শ্লোকটীর পাঠ ভিন্নরূপ হইতে পারে; দ্বিতীয়তঃ, ইহা প্রক্ষিপ্ত (interpolation) হইতে পারে; তৃতীয়তঃ, পূর্ব্বে যে সকল শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে তাহাদের সহিত ইহা একেবারে অসমঞ্জস নহে। উপরি-উক্ত শ্লোকটীর এই অর্থ হইতে পারে যে পঞ্চবিংশ তত্ত্ব অর্থাৎ পুরুষই পরম তত্ত্ব; ইহার উপরে যাহা, তাহা নিস্তত্ত্ব, এবং ইহার ভিন্ন নাম দেওয়া হইয়াছে, যথা ব্রহ্ম বা ঈশ্বর। সুতরাং, সাংখ্য যদি পঞ্চবিংশ তত্ত্বের অতিরিক্ত আর একটী তত্ত্ব স্বীকার না করেন, তাহা হইলে ইহার দ্বারা কোনও অসামঞ্জস্য সাধিত হয় না। অধিকন্তু, সাংখ্যের পূর্ব্বোদ্ধৃত সূত্রগুলিতে একথা স্পষ্টই বলা হইয়াছে যে, সব তত্ত্বগুলিই (এমন কি জীবও) পরম পুরুষের সর্গ (evolutes), তাহা হইলে সাংখ্য যদি পরম পুরুষকে কোনও তত্ত্ব বলিয়া না ধরেন তাহাতে কোনও দোষ হয় না। পুনশ্চ, পূর্ব্ব সূত্রগুলিতে ইহা স্পষ্টই বলা হইয়াছে যে, জীব (যাহা পঞ্চবিংশ তত্ত্ব) ত্রিগুণী বা ত্রিগুণান্বিত ঈশ্বর ব্যতীত আর কিছুই নহে, সুতরাং এই উপাধি বর্জ্জন করিয়া জীব ঈশ্বরের সহিত এক হইতে পারে। এক্ষণে এই সকল কথা বলিয়া সাংখ্য যদি ঈশ্বরকে একটী অতিরিক্ত তত্ত্ব বলিয়া উল্লেখ না করেন তাহাতে বিশেষ দোষ হয় না, কোনও অসামঞ্জস্য থাকা তো দূরের কথা। পুনশ্চ, একথা স্মরণ রাখিতে হইবে যে, পূর্ব্বোক্ত সূত্রগুলিতে ইহা পুনঃ পুনঃ ও দৃঢ়তার সহিত বলা হইয়াছে যে সাংখ্য ও যোগ এক, অর্থাৎ উভয়ের বিষয়টী এক; কিন্তু যোগদর্শনে ঈশ্বরের কথা বলা হইয়াছে এবং ইহাতে ইহা দেখাইতেছে যে, এমন কি, যদিও সাংখ্য সাক্ষাৎসম্বন্ধে ঈশ্বরের কথা বলে না (একথা যে সত্য নহে আমরা পূর্ব্বেই তাহা দেখাইয়াছি), তথাপি ইহা অন্ততঃ পরোক্ষভাবেও ঈশ্বরের কথা বলে, এবং সাংখ্য যে ঈশ্বরাস্তিত্ব অস্বীকার করে, ইহা

লো দূরের কথা। ইহাতে পূর্ব্বোক্ত বিরোধের মীমাংসা হইতেছে।

ভগবদগীতার দ্বিতীয় অধ্যায়ে (যাহা মহাভারতের ভীষ্মপর্ব্বের একটি অংশ), জীবের স্বভাব বা প্রকৃতি এবং জীব ও ঈশ্বর সম্বন্ধে সাংখ্যের যে মত তাহা পরিষ্কাররূপে বর্ণিত হইয়াছে। যে শ্লোকগুলিতে এই মতের অবতারণা হইয়াছে সেগুলি আমরা এক্ষণে বিবেচনা করিয়া দেখিব।

"অচ্ছেদ্যোঽয়মদাহ্যোঽয়মক্লেদ্যোঽশোষ্য এব চ।
নিত্যঃ সর্ব্বগতঃ স্থাণুরচলোঽয়ম্ সনাতনঃ॥
অব্যক্তোঽয়মচিন্ত্যোঽয়মবিকার্য্যোঽয়মুচ্যতে।"
(গীতা, ২৪।২৫ শ্লোঃ)।

অর্থাৎ, "আত্মাকে ছেদন করা যায় না, দহন করা যায় না, ক্লেদযুক্ত ও শোষণ করাও যায় না। ইহা নিত্য, সর্ব্বগত, স্থাণু, অচল, অনাদি, অব্যক্ত, অচিন্ত্য ও অবিকার্য্য।" এরূপ বর্ণনা কেবল পরমপুরুষেরই হইতে পারে, কারণ কেবল পরমপুরুষই বস্তুতঃ সর্ব্বগত এবং জীবাত্মা উপাধিযুক্ত; এই ব্যাখ্যাটী নিম্নলিখিত শ্লোকের দ্বারাও সমর্থিত হইতেছে। সেই শ্লোকটী এই—

"দেহী নিত্যমবধ্যোঽয়ং দেহে সর্ব্বস্য ভারত।
তস্মাৎ সর্ব্বাণি ভূতানি ন ত্বং শোচিতুমর্হসি॥"
(গীতা, ৩০শ্লোঃ)।

অর্থাৎ, "এই আত্মা, যাহা সর্ব্বজীবের দেহে বিরাজমান, তাহা সর্ব্বদাই অবধ্য; এই কারণে, হে ভারত, সর্ব্বজীবের মৃত্যুতে তোমার শোক করা উচিত নহে।" ইহার সহিত ১৭শ শ্লোকটীও পাঠ করিতে হইবে; তাহা এই—

"অবিনাশি তু তদ্বিদ্ধি যেন সর্ব্বমিদং ততম্।
বিনাশমব্যয়স্যাস্য ন কশ্চিৎ কর্ত্তুমর্হতি"।

অর্থাৎ, "যে আত্মা সমস্ত পৃথিবীকে ব্যাপ্ত করিয়া রহিয়াছে, তাঁহাকে অবিনাশী বলিয়া জান; ইনি অব্যয় বলিয়া কেহ ইঁহাকে বিনাশ করিতে পারে না।" এখানে এই কথা লক্ষ্য করিতে হইবে যে, শঙ্কর ও অন্যান্য ভাষ্যকারদিগের মতে 'তৎ' ও 'যেন' শব্দে ব্রহ্মকেই বুঝাইতেছে। ঐ অধ্যায়ের শেষ শ্লোকটীতে সব জিনিষটীকে একেবারে পরিষ্কার করিয়া বলা হইয়াছে। সেই শ্লোকটী এই—

"এষা ব্রাহ্মী স্থিতিঃ পার্থ নৈনাং প্রাপ্য বিমুহ্যতি।
স্থিত্বাস্যামন্তকালেঽপি ব্রহ্মনির্ব্বাণমৃচ্ছতি"॥
(গী. ৭২ শ্লোঃ),

অর্থাৎ, "হে পার্থ, ব্রাহ্মী স্থিতি এইরূপ; এবং যিনি সেই অবস্থা প্রাপ্ত হন তিনি আর এই সংসারে পড়িয়া মুহ্যমান হন না; এমন কি, মৃত্যুকালেও যিনি তাঁহাতে স্থিত করেন তিনিই তাঁহার সহিত একেবারে যুক্ত হন"। ১৩শ অধ্যায়েও এইরূপ শ্লোক দেখিতে পাওয়া যায়। যথা—

"উপদ্রষ্টানুমন্তা চ ভর্ত্তা ভোক্তা মহেশ্বরঃ।
পরমাত্মেতি চাপ্যুক্তো দেহেঽস্মিন্ পুরুষঃ পরঃ"॥
(গী. ২২ শ্লোঃ)।

অর্থাৎ, "যে পুরুষ (আত্মা) এই দেহে বিদ্যমান, তিনি প্রকৃতির অতীত; তিনি দ্রষ্টা, অনুমন্তা, ভর্ত্তা, ভোক্তা, মহেশ্বর ও পরমাত্মা"। এইরূপ—

"সমং সর্ব্বেষু ভূতেষু তিষ্ঠন্তং পরমেশ্বরং।
বিনশ্যৎস্ববিনশ্যন্তং যঃ পশ্যতি স পশ্যতি"॥
(গী. ২৭ শ্লোঃ),

অর্থাৎ, "যিনি পরমপুরুষকে সকল বিনাশশীল ভূতে অবিনাশিরূপে দেখেন এবং সর্ব্বভূতে সমভাবে বিদ্যমান দেখেন, তিনিই ঠিক দেখেন।" এ বিষয়ে ১৪শ অধ্যায়ের নিম্নলিখিত শ্লোকগুলি আরও জোর দিতেছে। সে শ্লোকগুলি এই—

"মম যোনির্মহদ্‌ব্রহ্ম তস্মিন্ গর্ভং দধাম্যহং।
সম্ভবঃ সর্ব্বভূতানাং ততো ভবতি ভারত॥
সর্ব্বযোনিষু কৌন্তেয় মূর্ত্তয়ঃ সম্ভবন্তি যাঃ।
তাসাং ব্রহ্ম মহদ্ যোনিরহং বীজপ্রদঃ পিতা"॥
(গী. ৩ ও ৪ শ্লোঃ),

অর্থাৎ, "প্রকৃতি আমার (ঈশ্বরের) যোনি, আমি তাহাতে গর্ভ নিক্ষেপ করি। হে ভারত, তাহা হইতেই সকল ভূত উৎপন্ন হয়। হে কুন্তীপুত্র, প্রকৃতি সকল ভূতের মাতা এবং আমি (ঈশ্বর) তাহাদের পিতা"। সুতরাং ভগবদগীতার মতেও সাংখ্য ঈশ্বরাস্তিত্ব স্বীকার করে, এবং জীব এই ঈশ্বরেরই বহুধা প্রকাশ মাত্র; অথবা অন্য কথায়, জীব ত্রিগুণী বা ত্রিগুণান্বিত ঈশ্বর।

ভাগবত-পুরাণে কপিল ও দেবাহুতির কথোপকথনে যে সাংখ্যের কথা আছে তাহাতে আমরা ঈশ্বরাস্তিত্ব সম্বন্ধে ঐ এক কথাই দেখিতে পাই। নিম্নলিখিত শ্লোকগুলি বিবেচনা করিয়া দেখা যাউক—

"অহং-মমাভিমানোত্থৈঃ কামলোভাদিভির্ম্মলৈঃ।
বীতং যদা মনঃ শুদ্ধমদুঃখমসুখং সমং॥
তদা পুরুষ আত্মানং কেবলং প্রকৃতেঃ পরং।
নিরন্তরং স্বয়ংজ্যোতিরনির্বাণমখণ্ডিতং॥
জ্ঞানবৈরাগ্যযুক্তেন ভক্তিযুক্তেন চাত্মনা।
পরিপশ্যত্যুদাসীনং প্রকৃতিঞ্চ হতৌজসম্॥"
(ভা. ৩য় স্কন্ধ, ২৫অঃ, ১৫—১৭ শ্লোঃ)।

অর্থাৎ, "চিত্ত যখন কামলোভাদিরূপ মলা—যাহা 'আমি এই', 'ইহা আমার', ইত্যাদিরূপ জ্ঞান হইতে উত্থিত হয়—হইতে মুক্ত হয় এবং তদ্ধেতু নিজে

শুদ্ধ হয় ও সুখদুঃখে উদাসীনবৎ থাকে, তখনই জীবাত্মা ঈশ্বরকে দর্শন করে; যিনি প্রকৃতির অতীত, ত্রিবিধ-দুঃখাতীত, সর্ব্বদাই আত্মপ্রকাশবান, সূক্ষ্ম, অখণ্ড, জ্ঞান বিরাগ ও ভক্তিযুক্ত-চিত্ত; এবং জীবাত্মা তখন প্রকৃতি-কেও উদাসীনবৎ দর্শন করে, কারণ প্রকৃতি তখন তাহার নিকট শক্তিহীনা"। নিম্নলিখিত শ্লোকগুলিও বিবেচনা করিতে হইবে—

"অনাদিরাত্মা পুরুষো নির্গুণঃ প্রকৃতেঃ পরঃ।
প্রত্যগাত্মা স্বয়ংজ্যোতির্বিশ্বং যেন সমন্বিতম্॥
স এষ প্রকৃতিং সূক্ষ্মাং দৈবীং গুণময়ীং বিভুঃ।
যদৃচ্ছয়ৈবোপগতামভ্যপদ্যত লীলয়া॥
গুণৈর্বিচিত্রাঃ সৃজতীং সরূপাঃ প্রকৃতিং প্রজাঃ।
বিলোক্য মুমুহে সদ্যঃ স ইহ জ্ঞানগূহয়া॥
এবং পরাভিধ্যানেন কর্ত্তৃত্বং প্রকৃতেঃ পুমান্।
কর্ম্মসু ক্রিয়মাণেষু গুণৈরাত্মনি মন্যতে॥
তদস্য সংসৃতির্বন্ধঃ পারতন্ত্র্যঞ্চ তৎকৃতং।
ভবত্যকর্ত্তুরীশস্য সাক্ষিণো নির্বৃতাত্মনঃ"॥

(ভা. ৩য় স্কন্ধ, ২৬অঃ, ৩—৭ শ্লোঃ)।

অর্থাৎ, "পুরুষ ত্রিগুণাতীত। তিনি প্রকৃতির অতীত, অপ্রত্যক্ষ (unpersensible), স্বপ্রকাশ এবং ইঁহার দ্বারাই জগত ব্যক্ত। সেই পুরুষ কেবল লীলা-চ্ছলে সূক্ষ্ম ও দৈবী প্রকৃতিকে উপভোগ করেন; এই প্রকৃতি ত্রিগুণান্বিতা। যিনি নিজের মত বহুপ্রকার জীব সৃষ্টি করেন সেই প্রকৃতিকে দর্শন করিয়া পুরুষ তৎক্ষণাৎ অজ্ঞানবশতঃ মূঢ় হইয়া পড়েন। এইরূপে প্রকৃতিকে নিজ আত্মা ভাবিয়া পুরুষ নিজেকে সকল কার্য্যের কর্ত্তা বলিয়া মনে করিতে থাকেন, কিন্তু বস্তুতঃ কার্য্য প্রকৃতির গুণের দ্বারাই সম্পাদিত হয়। সেই জন্য আনন্দরূপ ঈশ্বর—যিনি কেবল সাক্ষীস্বরূপ, কর্ত্তা নহেন, তাঁহার বন্ধন রচিত হয় এবং জন্মজন্মান্তর পরিগ্রহ করিতে হয়।" এই শ্লোকগুলিতে একটী জিনিষ লক্ষ্য করিতে হইবে। এখানে প্রকৃতিকে 'দৈবী' ও পুরুষকে 'প্রকৃতিপর' অর্থাৎ প্রকৃতির অতীত বলা হইয়াছে। ভাগবতের সুপ্রসিদ্ধ ভাষ্যকার শ্রীধরস্বামী এই দুইটী শব্দের এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন—"তত্র চাবরণবিক্ষেপশক্তিভেদেন প্রকৃতি-র্দ্বিধা, তত্রাবরণশক্ত্যা সৈব জীবোপাধিরবিদ্যা। বিক্ষেপ-শক্ত্যা সৈব মায়া পারমেশ্বরী। পুরুষশ্চ জীবেশ্বররূপেণ দ্বিবিধঃ, তত্র যঃ প্রকৃত্যাঽবিবেকো সংসরতি স জীবঃ। যস্তু প্রকৃতিং বশীকৃত্য বিশ্বসৃষ্ট্যাদি করোতি স পরমে-শ্বরঃ।" অর্থাৎ, "আবরণ ও বিক্ষেপ-শক্তিভেদে প্রকৃতি দুই প্রকার—আবরণ-শক্তিযোগে প্রকৃতি জীবোপাধি অবিদ্যা, এবং বিক্ষেপ-শক্তিযোগে প্রকৃতি পারমেশ্বরী মায়া। পুরুষে জীব ও ঈশ্বর এই দুই ভাব থাকা হেতু পুরুষও দুই প্রকার—প্রকৃতির অবিবেক নিবন্ধন যখন দেহ হইতে দেহান্তরপ্রাপ্তি ঘটে তখনই পুরুষকে জীব বলা যায়, এবং যখন তিনি প্রকৃতিকে বশ করিয়া জগৎ রচনা করেন তখন তাঁহাকে ঈশ্বর বলা হয়।" অন্যান্য ভাষ্যকারেরা শ্রীধরের এই ব্যাখ্যায় কোনরূপ আপত্তি উত্থাপন করেন নাই, সুতরাং আমরা ইহাকে ঠিক বলিয়া ধরিতে পারি। এক্ষণে উপরি-উক্ত শ্লোকগুলি হইতে ইহা বেশ স্পষ্টীকৃত হইতেছে যে ঈশ্বর আছেন এবং তিনি জগতের আদিকারণ, আর প্রকৃতি কেবল তাঁহার হস্তের যন্ত্রমাত্র এবং জীবাত্মাসকল অবিদ্যাহেতু ত্রিগুণান্বিত ঈশ্বর।

ঈশ্বরাস্তিত্ব সম্বন্ধে নিম্নলিখিত শ্লোকগুলি আরও স্পষ্ট প্রমাণ :—

"এতাবানেব সংখ্যাতো ব্রহ্মণঃ সগুণস্য চ।
সন্নিবেশো ময়া প্রোক্তো যঃ কালঃ পঞ্চবিংশকঃ॥
প্রভাবং পৌরুষং প্রাহুঃ কালমেকে যতো ভয়ং।
অহঙ্কারবিমূঢ়স্য কর্ত্তুঃ প্রকৃতিমীয়ুষঃ॥
প্রকৃতের্গুণসাম্যস্য নির্বিশেষস্য মানবি।
চেষ্টা যতঃ স ভগবান্ কালঃ ইত্যুপলক্ষিতঃ॥
অন্তঃ পুরুষরূপেণ কালরূপেণ যো বহিঃ।
সমন্বেত্যেষ সত্বানাং ভগবানাত্মমায়য়া॥"

(ভা. ৩য় স্কন্ধ, ২৬অ, ১৪—১৭ শ্লোঃ)।

অর্থাৎ, "যে (চতুর্বিংশতি) তত্ত্বের কথা জ্ঞানীরা বলিয়াছেন, তাহা ত্রিগুণী ব্রহ্মের আবাসস্থান বলিয়া মৎ-কর্ত্তৃক কথিত হইয়াছে; পঞ্চবিংশ তত্ত্বটীকে কাল বলা হইয়াছে। কেহ কেহ বলেন যে, কাল ব্রহ্মের শক্তি-বিশেষ, যাহা প্রকৃতিসংযোগহেতু আত্মজ্ঞানমূঢ় জীবের মনে ভীতি উৎপাদন করে; আবার কেহ কেহ বলেন যে যিনি সাম্যাবস্থাপ্রাপ্ত প্রকৃতিকে সৃষ্টিকার্য্যে উদ্বুদ্ধ করেন তিনিই ঈশ্বর এবং তাঁহাকে কাল বলা হয়। ঈশ্বরকে বলা যাইতে পারে যে তিনি তাঁহার ঐশীশক্তিবলে সকল জীবের নিয়ন্তারূপে তাহাদের অন্তরে পুরুষরূপে অবস্থান করিতেছেন এবং কালরূপে তিনি বাহিরেও বিদ্যমান রহিয়াছেন।"

উপনিষদও ঐ একই কথা প্রতিপাদন করিতেছেন। উপনিষদের দর্শনতত্ত্ব সাংখ্য হইতে গৃহীত হইয়াছে এবং উপনিষদ্ এই কথাই প্রতিপাদিত করিতেছেন যে, সাংখ্য নিরীশ্বরবাদ বা অজ্ঞেয়বাদের উপদেশ করেন না, পরন্তু ঈশ্বরাস্তিত্বই সাক্ষাৎভাবে প্রতিপাদন করেন।

(সম্পূর্ণ)

মহাভারতের
নীতি-বাক্য।

বনপর্ব্ব।

(৺অনাথকৃষ্ণ দেব কর্ত্তৃক সংগৃহীত)

যুধিষ্ঠির।—ক্ষমা ধর্ম্ম, ক্ষমা যজ্ঞ, ক্ষমা বেদ, ক্ষমাই শাস্ত্র।

ক্ষমা ব্রহ্ম ও সত্য, ক্ষমা ভূত ও ভবিষ্যৎ, ক্ষমা তপঃ ও শৌচ এবং ক্ষমাই এই পৃথিবীকে ধারণ করিয়া রহিয়াছে।

ক্ষমাশীল ব্যক্তি যজ্ঞবেত্তা, বেদবেত্তা ও তপস্বীদিগের লোক অপেক্ষা উপরিতন লোক প্রাপ্ত হইয়া থাকেন।

যজুর্ব্বেদ-বিহিত কর্ম্মকারী ও অন্যান্য কর্ম্মশীল ব্যক্তিদিগের লোকসমস্ত ভিন্ন ভিন্ন করিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, কিন্তু ক্ষমাপর ব্যক্তিদিগের লোক ব্রহ্মলোকেই প্রতিষ্ঠিত ও পূজিত হইয়া রহিয়াছে।

ক্ষমা তেজস্বীদিগের তেজের স্বরূপ ও তপস্বীগণের ব্রহ্মস্বরূপ।

সত্যপরায়ণ ব্যক্তিদিগের ক্ষমাই সত্য, ক্ষমাই যজ্ঞ ও ক্ষমাই শান্তি।

ক্ষমাপর ব্যক্তিদিগের উভয় লোকই হস্তগত; তাঁহারা ইহকালে সম্মান ও পরকালে শ্রেয়সী গতি প্রাপ্ত হইয়া থাকেন।

যাঁহাদিগের ক্রোধ ক্ষমাপ্রভাবে পরাহত হয় তাঁহাদিগের পরম পবিত্র লোক লাভ হইয়া থাকে, সুতরাং ক্ষমাই শ্রেষ্ঠ পদার্থ।

(অর্জ্জুনাভিগমন পর্ব্বাধ্যায়—১০১

দ্রৌপদী।—কর্ম্মই উত্তম মধ্যম প্রভৃতি পৃথক পৃথক লোকপ্রাপ্তির সাধন ও কর্ম্মের ফল অপরিহার্য্য।

কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া ধর্ম্ম দয়া ক্ষমা সরলতা ও লোকাপবাদভীরুতা অবলম্বনপূর্ব্বক কেহ কখন ইহলোকে উন্নতি লাভ করিতে পারে না।

(ঐ—১০২

সমুদায় লোক ঈশ্বরের বশীভূত হইয়া চলে; তিনি সমস্ত প্রাণীর প্রিয়াপ্রিয় ও সুখ-দুঃখের বিধাতা।

(ঐ— ১০৪

ঈশ্বর মানবগণকে পুণ্যকর্ম্মে অথবা পাপাচারে অনুরক্ত করিয়া সমুদায় চরাচরে ব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছেন; কিন্তু 'এই পরমেশ্বর' ইহা বলিয়া কেহই লক্ষ্য করিতে সমর্থ হয় না।

(ঐ—১০৫

যুধিষ্ঠির।—যে ব্যক্তি স্বর্গাদি ফললাভ লোভে ধর্ম্মাচরণ করে, সে ব্যক্তি ধর্ম্মবণিক; সুতরাং সে মুগ্ধ ফলানধিকারী ও ধার্ম্মিকসমাজে জঘন্য বলিয়া পরিগণিত। সে কদাচ প্রকৃত ধর্ম্মফল ভোগ করিতে সমর্থ হয় না।

(ঐ—১০৭

যুধিষ্ঠির।—ধর্ম্মই সনাতন সুখ। ধর্ম্ম কখন বিফল হয় না ও অধর্ম্মও ফলবান হয় না।

(অর্জ্জুনাভিগমন পর্ব্বাধ্যায়—১০৯

সাগর পার-লিপ্সু বণিকদিগের তরণীর ন্যায় সুরলোক-গমনোন্মুখ মানবগণের ধর্ম্মই একমাত্র ভেলা।

(ঐ -১০৮

সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বদর্শী ঋষিগণ কর্ত্তৃক আচরিত পুরাতন ধর্ম্মে কদাচ অবিশ্বাস করিও না।

(ঐ

ফলদর্শন না হইলেও ধর্ম্ম বা দেবতার প্রতি অশ্রদ্ধা করা উচিত নহে।

অসূয়া-বর্জ্জিত হইয়া প্রযত্ন সহকারে যজ্ঞ ও দান করা কর্ত্তব্য, যেহেতু ইহাই সনাতন ধর্ম্ম বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে এবং কর্ম্মের ফল ইহলোকেও দৃষ্ট হইতেছে।

(ঐ—১১০

ভক্ত ব্যক্তি মরণশীল হইয়াও যাঁহার প্রসাদে অমরত্ব প্রাপ্ত হয়, সেই পরম দেবতাকে কোন প্রকারে অবমাননা করিও না।

(ঐ

দ্রৌপদী।—দৈবপর হইয়া কর্ম্ম করিতে বিমুখ হওয়া কোন ক্রমেই উচিত নহে। সতত কর্ম্মানুষ্ঠানে নিযুক্ত হও, কদাচ গ্লানিযুক্ত হইও না।

(ঐ—১১১

যে ব্যক্তি আলস্যপরায়ণ হইয়া কেবল শয়ান থাকে, তাহাতে অলক্ষ্মীর আবেশ হয়। আর যে পুরুষ কার্য্যদক্ষ, সে নিশ্চয়ই আপন কর্ম্মের ফল লাভ করত অতুল ঐশ্বর্য্য ভোগ করে।

সংশয়ই অনর্থের মূল; অসংশয়চিত্তে কর্ম্ম করিলে অবশ্যই কার্য্যসিদ্ধি হয়; কিন্তু নিতান্ত সংশয়বিহীন ধীর ব্যক্তি সংসারে অতি দুর্লভ।

(ঐ—১১৪

আমি কর্ম্ম করিলে অর্থসিদ্ধি হয় না এই বলিয়া কর্ম্মে বৈরাগ্য প্রকাশ করিবে না।

(ঐ—১১৫

ভীম।—দান, যজ্ঞ, সাধুগণের পূজা, বেদধারণ ও আর্জ্জব এই কয়েকটী প্রধান ধর্ম্ম।

ধর্ম্মই এই জগতের মূল, ধর্ম্মাপেক্ষা কিছুই উৎকৃষ্ট নহে।

(ঐ—১২১

হংস।—উৎকৃষ্টের সহিত উৎকৃষ্টের সঙ্গতি সাতিশয় গুণপ্রসবিনী হয় সন্দেহ নাই।

(ঐ—১৯৫

দময়ন্তী।—সর্ব্বপ্রকার দুঃখে ভার্য্যাই মহৌষধস্বরূপ। ভার্য্যাসম ঔষধ আর কিছুই নাই।

(ঐ—২১৬

নল।—দুঃখিত ব্যক্তির ভার্য্যাই একমাত্র মিত্র।

(ঐ—২১৬

দময়ন্তী।—কাল পরিপূর্ণ না হইলে কেহই মৃত্যুগ্রাসে পতিত হয় না।

দময়ন্তী।—মানবগণের সুখদুঃখ ও শুভাশুভ সকলই দৈবায়ত্ত তাহার সন্দেহ নাই।

(ঐ—২৩৭

সুদেব।—পতিই নারীর প্রধান ভূষণ।

(ঐ—২৪৮

নল।—স্ত্রীলোকের স্বভাব অতি চঞ্চল।

(ঐ—২৫৭

ঋতুপর্ণ।—এই সংসারের কাহারও সর্ব্বজ্ঞতা নাই; এক পুরুষে জ্ঞানের সম্যক সমাবেশ থাকা নিতান্ত অসম্ভব।

(ঐ—২৬১

বৃহদশ্ব।—সুখ দুঃখ অতীব অকিঞ্চিৎকর।

ঐ।—পুরুষার্থের অস্থিরত্ব জানিয়া তাহার অভ্যুদয় বা নাশের বিষয়ে চিন্তিত হওয়া অনুচিত।

ঐ।—বিপৎপাতে বিমোহিত হওয়া কাপুরুষের লক্ষণ।

ঐ।—দৈবের প্রতিকূলতা প্রযুক্ত পুরুষকার নিষ্ফল হইয়া থাকে, কিন্তু তাহাতে জ্ঞানী ব্যক্তির অন্তঃকরণ কদাচ বিষন্ন বা অভিভূত হয় না।

(ঐ—২৮৭—৮

পুলস্ত্য।—মনুষ্যের বহুপুত্র কামনা করা কর্ত্তব্য।

(তীর্থযাত্রা পর্ব্বাধ্যায়—৩২৫

পুলস্ত্য।—যাহার হস্তদ্বয় পদদ্বয় মন বিদ্যা তপ ও কীর্ত্তি সুসংযত আছে, সেই ব্যক্তিই তীর্থফল ভোগ করে।

যে ব্যক্তি প্রতিগ্রহপরাঙ্মুখ ও সতত সন্তুষ্ট, যাহার শরীরে অহঙ্কারের লেশ মাত্র নাই, সেই ব্যক্তিই তীর্থফল ভোগ করে।

যে ব্যক্তি অহঙ্কারাদিরহিত, অল্পাহার, জিতেন্দ্রিয় ও সর্ব্বপাপবিমুক্ত, সেই ব্যক্তিই তীর্থফল ভোগ করে।

(ঐ—২৯৫

লোমশ।—অধার্ম্মিক লোক ধর্ম্মবিরুদ্ধ কর্ম্ম দ্বারা যে অভ্যুদয় লাভ করে, তদ্বিষয়ে আপনি কদাচ খেদ প্রকাশ করিবেন না। মনুষ্য অধর্ম্মাচরণ দ্বারা প্রথমতঃ অভ্যুদয় লাভ করিয়া সুখ সম্ভোগ করে, পরে আপনাকে প্রভু বোধ করত শত্রুসংহারে প্রবৃত্ত হইয়া পরিশেষে স্বয়ং সমূলে নির্ম্মূল হইয়া থাকে।

(ঐ—৩৫৮

ঐ।—অহঙ্কার হইতে অভিমান, অভিমান হইতে ক্রোধ ও ক্রোধ হইতে নির্লজ্জতা জন্মে; সেই নির্লজ্জতা-প্রভাবেই বিনাশ।

(ঐ—৩৫৯

লোপামুদ্রা।—এক বিদ্বান সাধু পুত্র বহুসংখ্যক অসাধু পুত্র অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ।

(ঐ—৩৭২

লোমশ।—তপস্যাই লোকস্থিতির কারণ।

(ঐ—৩৮১

উশীনর।—ব্রহ্মহত্যা ও গোহত্যা করিলে যেরূপ পাপ হয়, শরণাগত ব্যক্তিকে পরিত্যাগ করিলে তদ্রূপ পাপ জন্মে।

(ঐ—৪৬১

শ্যেন—যে ধর্ম্ম ধর্ম্মান্তরবিরোধী, তাহা কখন ধর্ম্ম নহে; পরস্পর-অবিরোধী ধর্ম্মই প্রকৃত ধর্ম্ম।

(ঐ—৪৬২

হনুমান।—আচার হইতে ধর্ম্মের সম্ভব হইয়াছে।

(ঐ—৫২৮

যজ্ঞ অধ্যয়ন ও দান এই তিনটি সর্ব্ববর্ণের সাধারণ ধর্ম্ম।

(ঐ—৫২৯

যুধিষ্ঠির।—যে ব্যক্তি ধর্ম্মার্থের প্রতি দৃষ্টিপাত না করিয়া পাপে আসক্ত হয়, সে অবশ্যই সেই পাপের ফল ভোগ করে।

(ঐ—৫৬৭

কুবের।—যে ব্যক্তি ক্রোধের বশবর্ত্তী হইয়া আপনার অনিষ্টপাতের প্রতি দৃষ্টি না করে, যে ব্যক্তি একান্ত পাপবুদ্ধি, পাপাত্মা ও কার্য্যবিভাগানভিজ্ঞ হইয়া পাপেরই অনুবর্ত্তী হয়; যে ব্যক্তি কার্য্যবিশেষানভিজ্ঞ, নিতান্ত মন্দবুদ্ধি, অকালজ্ঞ বৃথাচার ও বৃথাসমারম্ভ, সেই ব্যক্তিকে ইহকাল ও পরকাল অশেষ ক্লেশে কালযাপন করিতে হয়।

যে ব্যক্তি সাহসপ্রিয় সামর্থ্যাভিলাষী প্রবঞ্চনাপর ও দুরাত্মা সে নিশ্চয়ই পাপপঙ্কে নিমগ্ন হয়।

(যক্ষযুদ্ধ পর্ব্বাধ্যায়—৫৭২। ৩

সঙ্গীতে ভাব।

(EMOTION)

(শ্রীনির্ম্মলচন্দ্র বড়াল, বি-এল্)

সঙ্গীত ভাবসম্বন্ধীয় ললিত কলা। অন্তরের যে অনির্ব্বচনীয় ভাব তাহা সঙ্গীতেরই দ্বারা ব্যক্ত হয়; তাই ভাবই সঙ্গীতের প্রাণ। ললিত-কলার উদ্দেশ্য সৌন্দর্য্য-সৃষ্টি করা। সুপ্রসিদ্ধ জার্ম্মান দার্শনিক Kant র মতে সৌন্দর্য্য মানুষকে বিশুদ্ধ, স্থায়ী ও নিঃস্বার্থ আনন্দ দেয় এবং এক সময়ে বহু লোক সেই আনন্দ উপভোগ করিতে সক্ষম হয়। অতএব উত্তম সঙ্গীতের দ্বারাও মানুষের চিত্তে ঐরূপ সৌন্দর্য্যসৃষ্টিজনিত আনন্দের উদ্ভব হওয়া উচিত। যে সঙ্গীতের দ্বারা ঐরূপ সৌন্দর্য্য বা ভাবের সৃষ্টি না হয়, তাহা সঙ্গীত নামের যোগ্য নয়।

আজকাল আমাদের ওস্তাদি ধ্রুপদ বা খ্যাল গানে ঐরূপ সৌন্দর্য্যসৃষ্টির দিকে গায়কদের বড় একটা লক্ষ্য থাকে না; ফলে ওস্তাদি গানের উপর অধিকাংশ মার্জ্জিত-রুচি-সম্পন্ন লোকই চটা—বাস্তবিক চটিবারও কথা। যে সঙ্গীত মানুষকে ইহলোকের দুঃখ-ক্লেশ, ভয়-ভাবনা দূর করিয়া অনন্ত আনন্দলোকে লইয়া যাইবে, যে সঙ্গীত চির-বিচ্ছেদজর্জ্জর চিত্তে শান্তির অমৃতধারা বর্ষণ করিবে, যে সঙ্গীত পৃথিবীর সকলজ্বালাযন্ত্রণা ভুলাইয়া স্বর্গের মন্দাকিনীধারা পান করাইবে—সেই সঙ্গীতের নামে প্রতিপদে বাদানুবাদ, কলহ কে সহ্য করিবে? আজকালকার ওস্তাদি গানে প্রায়ই দেখা যায় যে, গায়ক ও বাদকের মধ্যে একটা প্রতিযোগিতার ভাব চলে—কে কাহাকে পরাস্ত করিতে পারে! ইহার দ্বারা রসসৃষ্টি হয় না—গানের নামে তাণ্ডবলীলা চলে। গায়কের পক্ষে গানই প্রধান; গানের সুর ও কথা সুন্দর ও সুস্পষ্টভাবে ব্যক্ত করাই তাঁহার কর্ত্তব্য; এবং বাদকের কর্ত্তব্য গায়ককে অনুসরণ করা—মৃদুভাবে তবলা বা মৃদঙ্গে ঘা দিয়া গানের ছন্দ বাহির করা—গায়ককে কোনরূপে অতিক্রম করিয়া নিজের বাহাদুরি দেখানো নয়। তাই রবীন্দ্রনাথ সত্যই বলিয়াছেন যে, ওস্তাদের এই সকল সঙ্গীতে 'কৌশল আছে কিন্তু দরদ নাই'। এই দরদই আমরা সঙ্গীতে চাই—এই দরদই অপরের প্রাণ গলাতে পারে। গানের নামে বাদকের সহিত কসরৎ গানের উদ্দেশ্য নয়। যিনি প্রকৃত artist বা কলাবিৎ হইবেন—তিনি গানের ভাবকে কখনও উপেক্ষা করিবেন না—ভাবহীন প্রাণহীন গানে কাহার মন আকৃষ্ট হইবে?

আমি বলিয়া আসিলাম যে, সৌন্দর্য্যসৃষ্টি বা মানুষের সুপ্ত সৌন্দর্য্যবোধ জাগ্রত করাই ললিত-কলার উদ্দেশ্য। আমাদের ওস্তাদি সঙ্গীতে যদি সৌন্দর্য্য-সৃষ্টির প্রয়াস না থাকে বা অভাব থাকে, সে দোষ কোনরকমেই মার্জ্জনীয় নয়। কারণ সৌন্দর্য্যসৃষ্টি না হইলে সঙ্গীতের উদ্দেশ্যই বিফল হইল। আমার এই কথায় কেহ কেহ বলিতে পারেন যে, সঙ্গীতের সুর-তাল যদি ঠিক হয়, তা'হলে এক অপূর্ব্ব আনন্দ পাওয়া যায়; সে আনন্দ উপলব্ধি করিতে হইলে কিঞ্চিৎ শিক্ষা বা এ বিষয়ে culture চাই—অর্থাৎ ঐ বিষয়ে কিছু জানা চাই। আমি স্বীকার করি যে সুর ও তাল ঠিক হইলে কয়েকজন বিশেষজ্ঞ বিশেষ আনন্দ পাইয়া থাকেন, কিন্তু সে আনন্দ ভোগ করিবার ক্ষমতা সকলের নাই। এ আনন্দ intellectual বা বিজ্ঞানের আনন্দ—æsthetic বা সৌন্দর্য্য সৃষ্টিজনিত আনন্দ নয়। সঙ্গীত যদি intellectual বা বিজ্ঞানের আনন্দ দেয়, তাহলে ললিতকলা হিসাবে ইহা খাট হইবে—কারণ ললিতকলা universal বা সার্ব্বজনীন আনন্দ প্রদান করে; বহুলোক একসঙ্গে সে আনন্দ উপভোগ করিতে সমর্থ হয়। আমাদের ওস্তাদগণ সুর-তাল বা সঙ্গীতের ব্যাকরণের দিকে অতিমাত্রায় লক্ষ্য দেন, ফলে রসসৃষ্টির পক্ষে ব্যাঘাত ঘটে। তবে আমি একথা বলি না যে সুর-তালের প্রতি লক্ষ্য দিবার দরকার নাই, কারণ রসসৃষ্টি করিতে হইলেও ঐ গুলির প্রতি দৃষ্টি রাখা দরকার; আমি বলি, সুর তাল ও ভাবের সামঞ্জস্য করিয়া গান গাওয়া অসম্ভব নয়। পূর্ব্বে আমাদের সঙ্গীতে যে ভাবের দিক উপেক্ষা করা হইত না তাহার প্রমাণ সঙ্গীতবিশারদ তানসেন সম্বন্ধে কিংবদন্তী। তানসেন গানের ভাবে সুরে তালে এরূপ তন্ময় বা আত্মহারা হইয়া গান গাইতেন যে, মল্লার রাগিণী গাইলে বাদল উপস্থিত হইত, দীপক রাগিণী গাইলে অগ্নি প্রজ্বলিত হইত। এইরূপ তন্ময় বা আত্মহারা ভাব সঙ্গীতে চাই। ইহার দ্বারাই রসসৃষ্টি সম্ভব হয়। আর এইরূপ গানই মানুষকে মুক্তির আস্বাদ দিতে পারে। তাই তেজস্বী স্বামী বিবেকানন্দ বলিয়া গিয়াছেন:—

"Drama and music are by themselves religion, any song, lovesong or any song, never mind; if one's whole soul is in that song, he attains salvation just by that; nothing else he has to do; if a man's soul is in that, his soul gets salvation."

তাই পাশ্চাত্য সাহিত্যশিল্পী Carlyle সঙ্গীতের সম্বন্ধে বলেন:—"A kind of inarticulate, unfathomable speech, which leads to the edge of the Infinite and lets us for moments gaze into that!"

সঙ্গীত যে শ্রেষ্ঠ যোগ এ কথা মিথ্যা নয়—যদি সেই ভাবে প্রাণ-মন ডুবাইয়া গীত হয়। পাশ্চাত্য সুরশিল্পী রোমাঁ রোল্যাণ্ডের কথা আমরা কিছু কিছু জানিয়াছি; তিনি বলেন, দুঃখ কষ্ট যখন তাঁকে পীড়িত করে, তখন তিনি সঙ্গীতসরোবরে স্নান করিয়া নবজীবন প্রাপ্ত হ'ন। আমাদের দেশে সঙ্গীতের উন্নতি হোক্ কায়মনোবাক্যে এই প্রার্থনা করি। সঙ্গীতের নামে বাদানুবাদ, বিরোধ দেশ হইতে তিরোহিত হোক।

ব্রহ্মসঙ্গীত-স্বরলিপি।

ভৈরবী—দাদ্‌রা।

এই যে প্রভাত আলো
এই যে কল পাখী
এই যে সবুজ শাখী
চিত্ত কোথায় ?
এই যে শ্যামল তৃণ
এই যে ফুলের রাশি
হাওয়ায় কল বাঁশী
চিত্ত কোথায় ?

এই যে রবির কিরণ
মেঘের সজল কালো
রাতের জ্যোৎস্না-আলো
চিত্ত কোথায় ?
আনন্দেরি ধারা
বইচে পাগল পারা
ধরণী তার হারা
চিত্ত কোথায় ?

এই যে তাঁহার পরশ
সকল দুঃখে সুখে
বীণা বাজায় বুকে
চিত্ত কোথায় ?
ডাক আসে যে তাঁর
ভেঙে সকল দ্বার
খোঁজ করে আমার
চিত্ত কোথায় ?

কথা, সুর ও স্বরলিপি—শ্রীনির্ম্মলচন্দ্র বড়াল, বি-এল্।

II সা দা দা। দা দা -পা I পা পা -া। -া -া -া I পা -র্সা র্সা।
এ ই যে প্র ভা ত্ আ লো • • • • এ ই যে

। ণা দা -পা I মা মা -া। -া -া -া I মা পা পমা। জ্ঞা জ্ঞা -া I
ক ল • পা খী • • • • এ ই যে স বু জ

I মা রজ্ঞা -মজ্ঞা। -রজ্ঞা -া -ঋসা I সা -ঋা জ্ঞা। ঋা সা -া I -া -া -া।
শা খী • • • • • • • চি • ত্ত কো থা য় • • •

। -া -া -া I সা -া দা। দা ণা -া I ণা সা -া। -া -া -া I সজ্ঞা -া জ্ঞা।
• • • এ ই যে শ্যা ম ল্ তৃ ণ • • • • এ ই যে

। জ্ঞা জ্ঞা -া I জ্ঞা জ্ঞা -া। -া -া -া I মা মা মা। মা মা -া I
ফু লে র রা শি • • • • হাও য়া য় ক ল •

I জ্ঞমা মা -া। -জ্ঞা -ঋা -সা I সা -ঋা জ্ঞা। ঋা সা -া I -া -া -া।
বাঁ শী • • • • চি • ত্ত কো থা য় • • •

। -া -া -া II
• • •

১´ • ১´ • ১´
II দা -া দা | ণা র্সা -া I ণা র্সা -া | -া -া -াজ্ঞ I র্জ্ঞা র্জ্ঞা -া |
এ ই যে র বি র কি র ণ • • • • মে ঘে র

• ১´ • ১´ •
| ঋা র্সা -া I ণা র্সা -া | -া -া -া I র্মা র্মা -া | র্মা -া র্মর্জ্ঞা I
স জ ল্ কা লো • • • • রা তে র জ্যো ৎ স্না•

১´ • ১´ • • ১´
I র্রা র্রর্জ্ঞা -র্মর্জ্ঞা | -র্রর্জ্ঞা -া -ঋর্সা I র্সা -ঋা র্জ্ঞা | ঋা সা -া I -া -া -া |
আ লো• • • • • • • • চি • ত্ত কো থা য় • • •

• ১´ • ১´ • ১´
| -া -া -া I র্সা র্সা -া | ঋা র্সা -া I ণা ণা -া | -া -া -া I র্সা -া ণা |
• • • আ ন ন্ দে রি • ধা রা • • • • ব ইচে

• ১´ • ১´ •
| দা পদা -ণা I দা পা -া | -া -া -া I পা পা -জ্ঞা | জ্ঞা পা -া I
পা গ• ল্ পা রা • • • • ধ র • নী ভা র

১´ • ১´ • ১´ •
I পা পদা -া | -া -া -া I সা -ঋা জ্ঞা | ঋা সা -া I -া -া -া | -া -া -া II
হা রা• • • • • চি • ত্ত কো থা য় • • • • • •

১´ • ১´ • ১´ •
II দা -া দা | ণা র্সা -া I ণা র্সা -া | -া -া -াজ্ঞ I র্জ্ঞ র্জ্ঞা -া | ঋা -া র্সা I
এ ই যে তাঁ হা র প র শ্ • • • স ক ল্ দুঃ • খে

১´ • ১´ • ১´
I ণা র্সা -া | -া -া -া I র্মা র্মা -া | র্মা র্মা -র্জ্ঞা I র্রা র্রর্জ্ঞা -র্মর্জ্ঞা |
সু খে • • • • বী ণা • বা জা য় বু কে• • •

• ১´ • ১´ •
| -র্রর্জ্ঞা -া -ঋর্সা I র্সা -ঋা র্জ্ঞা | ঋা র্সা -া I -া -া -া | -া -া -া I
• • • • • চি • ত্ত কো থা য় • • • • • •

১´ • ১´ • ১´
I র্সা -া র্সা | ঋা র্সা -া I ণা -া -া | -া -া -া I র্সা র্সণা -দা |
ডা ক্ আ সে যে • তাঁর • • • • • তে জে• •

• ১´ • ১´ •
| ণা দা -া I পা -া -া | -া -া -া I পা -া জ্ঞা | পা -মা পা I
স ক ল্ যার • • • • • যৌ ব ক রে • আ

১´ • ১´ • ১´ •
I পদা -া -া | -া -া -া I সা -ঋা জ্ঞা | ঋা সা -া I -া -া -া | -া -া -া II II
মার • • • • • চি • ত্ত কো থা য় • • • • • •

সংবাদ।

শ্রীরামপুর ব্রাহ্মসমাজ।—গত ১১ই ও ১২ই পৌষ শ্রীরামপুর ব্রাহ্মসমাজের পঞ্চষষ্টিতম সাম্বৎসরিক উৎসব যথারীতি সুসম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। মহর্ষিদেবের সমসাময়িক ৺নন্দলাল মৈত্র মহাশয় ৬৫ বৎসর পূর্ব্বে এই শ্রীরামপুরে ব্রহ্মোপাসনার পবিত্র অগ্নি প্রথম স্থাপন করেন; পরে তাঁহার সহকর্ম্মী হইয়াছিলেন ৺দুর্গাদাস লাহিড়ী মহাশয়। অনন্তর মৈত্রমহাশয়ের অবর্ত্তমানে তদীয় আত্মজতুল্য ৺মন্মথনাথ লাহিড়ী ও তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা ৺প্রমথনাথ লাহিড়ী—উভয়েই আজীবন আপন আপন শক্তি ও প্রীতির আহুতি দিয়া ব্রহ্মোপাসনার সেই পবিত্র অগ্নিকে দিন দিন বর্দ্ধিত ছাড়া কখনও নির্ব্বাপিত হইতে দেন নাই। তাঁহাদের মৃত্যুর পর দীর্ঘকাল ধরিয়া উপযুক্ত সাধক ও সেবকের একান্ত অভাবে মনে হইয়াছিল, বুঝি, এই সুসমৃদ্ধ উপনগরীর বুকের উপর হইতে সেই পবিত্র অগ্নিকণা চিরদিনের জন্যই নিভিয়া গিয়াছে। কিন্তু বড়ই আনন্দের সংবাদ এই যে, ৺প্রমথনাথ লাহিড়ী মহাশয়ের পুত্রদ্বয় শ্রীমান্ পরেশনাথ ও শ্রীমান্ সারনাথ বর্ত্তমানে উপযুক্ত হইয়া ৺তারিণীচরণ গুপ্ত মহাশয়ের পরিবারবর্গ এবং তাঁহাদের শ্রীরামপুরস্থ বন্ধুগণের উদ্যমে ও সহযোগিতায় প্রোৎসাহিত হইয়া তাঁহাদের পিতামহ ও পিতৃদেবের সাধনাকেই আপনাদের জীবনে বরণ করিয়া লইতেছেন—নির্ব্বাপিতপ্রায় ব্রহ্মাগ্নিকে আবার তাঁহারা ধীরে ধীরে প্রজ্বলিত করিতেছেন।

এতদুপলক্ষে গত ১১ই পৌষ রবিবার প্রাতঃকালে কলিকাতা হইতে আদি ব্রাহ্মসমাজের পণ্ডিত শ্রীসুরেশচন্দ্র সাংখ্যবেদান্ততীর্থ, উদীয়মান গীতিকবি সুকণ্ঠ শ্রীমান্ নির্ম্মলচন্দ্র বড়াল, সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের বিশিষ্ট সভ্য শ্রীশিশিরকুমার দত্ত এবং আরও কয়েকজন ভদ্রলোক আমন্ত্রিত হইয়া শ্রীরামপুর গমন করিয়াছিলেন। ব্রহ্মোৎসবের পবিত্র পীঠস্থান ৺দুর্গাদাস লাহিড়ী মহাশয়ের গৃহেই প্রাতরুপাসনার আয়োজন হইয়াছিল। উপাসনাগৃহটী পত্র-পুষ্প ও পতাকা দ্বারা সুন্দররূপে সজ্জিত হইয়াছিল। প্রভাতে উষাকীর্ত্তন বাহির হইয়াছিল। অতঃপর কলিকাতা হইতে সকলে আসিলে বেলা ৯ ঘটিকায় উপাসনা আরম্ভ হয়।

সান্ধ্য উপাসনার আয়োজন হইয়াছিল ৺মহেন্দ্রনাথ সান্যাল মহাশয়ের গৃহে। এই উভয় কালের উপদেশ ও উপাসনার ভার লইয়াছিলেন শ্রীসুরেশচন্দ্র সাংখ্য-বেদান্ততীর্থ মহাশয় এবং সঙ্গীতের ভার লইয়াছিলেন শ্রীমান্ নির্ম্মলচন্দ্র বড়াল ও শ্রীমতী মনোরমা দেবী।

১২ই পৌষ প্রাতঃকালে যথারীতি উপাসনাদি হইয়াছিল। ইহা ব্যতীত এই দুইদিন ব্যাপী উৎসবের অঙ্গরূপে প্রথম দিন দ্বিপ্রহরে সান্যালভবনে 'যুবকসমিতি' এবং দ্বিতীয় দিন দ্বিপ্রহরে ১নং বেনেপাড়া লেনে ভাদুড়ীভবনে 'আর্য্যকন্যাসম্মিলন' ও বালক শিশিরকুমারের স্মৃতি উপলক্ষে 'বালকবালিকাসম্মিলন' অনুষ্ঠিত হইয়াছিল।

স্থানীয় অধিবাসীগণ সকলেই এই ব্রাহ্মসমাজকে সানন্দে আপনাদের মধ্যে বরণ করিয়া লইয়াছেন। তাই নিষ্ঠাবান্ ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত ও অন্তঃপুরচারিণীরাও নিঃসঙ্কোচে এই উৎসবে যোগদান করিয়াছিলেন। আদিব্রাহ্মসমাজের ইহাই চিরন্তন সাধনা—হিন্দুসমাজকে পরিত্যাগ করিয়া নয়, তাহাকে সঙ্গে লইয়াই অগ্রসর হইতে হইবে।

সমাগত ভদ্রজনগণের আদর-আপ্যায়ন ও তাঁহাদের আহারাদির আয়োজন অতি সুন্দর হইয়াছিল।

উল্টাডাঙ্গা ব্রাহ্মসমাজ।—গত ৯ই পৌষ শুক্রবার হইতে উল্টাডাঙ্গা ব্রাহ্মসমাজের দ্বিতীয় বার্ষিক উৎসব আরম্ভ হয়। এতদুপলক্ষে আদিব্রাহ্মসমাজের পণ্ডিত শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র সাংখ্য-বেদান্ততীর্থ মহাশয়ের উপর প্রথম দিনের সান্ধ্য উপাসনার ভার অর্পিত হইয়াছিল। তিনি উক্ত দিবস যথাসময়ে বেদীগ্রহণপূর্ব্বক উপাসনা ও উপদেশাদি প্রদান করিয়াছিলেন; উপদেশের বিষয় ছিল 'মামেকং শরণং ব্রজ'। আদিব্রাহ্মসমাজের আজীবন অনুরাগী, উদীয়মান গীতিকবি সুকণ্ঠ শ্রীমান্ নির্ম্মলচন্দ্র বড়াল সানন্দে সঙ্গীতের ভার গ্রহণ করিয়া সকলের কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছিলেন ও আনন্দবর্দ্ধন করিয়াছিলেন।

পুস্তক বিতরণ।—এলগিন রোড পোঃ অঃ, ২নং চক্রবেড়ে লেন নিবাসী শ্রীযুক্ত শিতিকণ্ঠ মল্লিক তাঁহার প্রণীত বহু প্রশংসিত "সৎপ্রসঙ্গ" ও "দুই ভাই" পুস্তক দুইখানি বিনামূল্যে সকল ব্রাহ্মসমাজ ও সাধারণ পুস্তকালয়ে বিতরণ করিবেন। সম্পাদকগণ কেবলমাত্র তিন আনা মূল্যের ডাকটিকিট তাঁহার নিকট পাঠাইলেই হইবে। "সৎপ্রসঙ্গ"-খানি প্রায় দুই শত পৃষ্ঠায় সমাপ্ত। মূল্য ॥০। "দুই ভাই" উপন্যাস—মূল্য ১৲। ভাল বাঁধান ও চিত্রযুক্ত।

শোক-সংবাদ।

স্বামী শ্রদ্ধানন্দ।—গত ৮ই পৌষ বৃহস্পতিবার অপরাহ্ণ বেলা ৪ ঘটিকার সময় ভারতের রাজধানী দিল্লীনগরীতে স্বামী শ্রদ্ধানন্দ তাঁহার স্বীয় বাসভবনে আব্দুল রসীদ নামক একজন মুসলমান আততায়ীর

হস্তে প্রাণবিসর্জ্জন করিয়াছেন। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়ঃক্রম হইয়াছিল ৭১ বৎসর। তিনি সম্প্রতি নিউমোনিয়া রোগে ভুগিতেছিলেন। উক্ত দিবস অপরাহ্ণে আব্দুল রসীদ স্বামীজীর গৃহে প্রবেশ করিয়া তাঁহার সহিত ইস্লামধর্ম্ম সম্বন্ধে আলোচনা করিতে চাহে, কিন্তু স্বামীজীর শারীরিক অসুস্থতানিবন্ধন ঐ আলোচনা ভবিষ্যতের জন্য স্থগিত রাখা হয়। অতঃপর আব্দুল রসীদ জলপানের ইচ্ছা প্রকাশ করিলে স্বামীজীর আদেশে তাঁহার ভৃত্য ধরম সিং তাহাকে পাশের ঘরে লইয়া যায়। জলপান শেষ করিয়াই সে দৌড়াইয়া স্বামীজীর গৃহে পুনরায় প্রবেশ করে এবং তাঁহার বক্ষঃস্থল লক্ষ্য করিয়া উপর্য্যুপরি চারি-পাঁচটী গুলি ছোড়ে। এই সাংঘাতিক আঘাতে স্বামীজী তৎক্ষণাৎ মৃত্যুমুখে পতিত হন। প্রভুকে রক্ষা করিতে যাইয়া ভৃত্য ধরম সিংও আততায়ীর হস্তে ভীষণরূপে আহত হয়; সুখের বিষয়, হাঁসপাতালে প্রেরিত হইয়া সুচিকিৎসায় সে ধীরে ধীরে সুস্থ হইয়া উঠিতেছে।

জলন্ধরের আইনব্যবসায়ী লালা মুন্সীরাম ভগবৎ-প্রেরণায় কিরূপে স্বামী শ্রদ্ধানন্দ হইয়া আর্য্যসমাজের কর্ণধার হইলেন, কিরূপে তিনি গুরুকুলের প্রতিষ্ঠা করিলেন, কিরূপে তিনি রাউলাট আইনের প্রতিবাদ-কল্পে রাজনীতিক আন্দোলনে সংসৃষ্ট হইলেন, কিরূপে তিনি মহাত্মা গান্ধীর সহযোগী হইয়া হিন্দুমুসলমান-মিলন ও অসহযোগপ্রচারে ব্রতী হইলেন, অতঃপর কি কারণেই বা রাজনীতিক সংস্রব বর্জ্জন করিয়া হিন্দু-সংগঠন ও শুদ্ধি আন্দোলনে মনোনিবেশ করিলেন সে সব পুরাণ ইতিকথার আলোচনা বহু সংবাদপত্রেই হইয়াছে, সুতরাং আমরা এখানে তাহা হইতে নিরস্ত হইলাম। স্বামী শ্রদ্ধানন্দের মৃত্যুতে ভারতের অন্ধকারপ্রায় জাতীয় জীবনের কত বড় মঙ্গল দীপটী যে আজ নিবিয়া গেল, তাহার যুগ-যুগ সঞ্চিত অন্ধকার যে আরও কত নিবিড় হইয়া উঠিল,—যে ক্ষতি যে আঘাত আমরা পাইলাম, তাহার দুঃসহ বেদনা অনবরত বুকে বাজিতে থাকিলেও—আজ সে কথা ভাবিবার অবসর আমাদের নাই। আজ শুধু মনে পড়িতেছে ভারতের যুগ-যুগ-ব্যাপী দুর্ভাগ্য-গাথা—তাহার দীর্ঘকালের একজাতিত্ব লাভের প্রয়াস বোধ হয় অনেক দূর পিছাইয়া গেল।

এই গুপ্তহত্যার জন্য যে কোন কারণই থাক না কেন, ইহা অস্বীকার করিতে পারা যায় না যে, সাম্প্রদায়িক ধর্ম্মবিদ্বেষ এবং ধর্ম্মান্ধতাই ইহার অন্যতর প্রধান কারণ। ভগবৎপ্রীতিমূলক সত্যধর্ম্মকে অন্তরে গ্রহণ করিলে কি হিন্দুসমাজে, কি মুসলমানসমাজে ধর্ম্মান্ধতা ও সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষের অবসর থাকিতে পারে না। প্রার্থনা করি, স্বামী শ্রদ্ধানন্দের মৃত্যুর ফলে দেশ হইতে, সকল সমাজ হইতে ঐ সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ তিরোহিত হোক, দেশে পুনরায় মিলনের সুমঙ্গল বায়ু প্রবাহিত হোক, শান্তির অমৃত ফল উৎপন্ন হোক।

গ্রন্থ-পরিচয়।

দুভাই।—সচিত্র সামাজিক ও নৈতিক উপন্যাস। "স্বাস্থ্য" ও "সৎপ্রসঙ্গ" প্রণেতা শ্রীশিতিকণ্ঠ মল্লিক প্রণীত। ৬৬নং মাণিকতলা ষ্ট্রীট বেঙ্গল প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ এবং ২নং চক্রবেড়ে লেন, গ্রন্থকারের নিকট প্রাপ্তব্য। মূল্য ১৲ টাকা। ১৬ পেজী ডবল ক্রাউন আকারের ১২২পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ।

সকল দেশেই গল্পসাহিত্যের আদর অধিক—যাঁহারা গল্পের অনুরাগী।—কষ্ট করিয়া নীতিতত্ত্ব বা ধর্ম্মতত্ত্ব পাঠ করিতে অভিলাষী নহেন, তাঁহারা যাহাতে কথার ছলে সুশিক্ষা পান, পুণ্যের দিকে আকৃষ্ট হইতে পারেন, সামাজিক দোষ দূর করিয়া সুনাম অর্জ্জন করিতে পারেন, প্রবীণ গ্রন্থকার এই গ্রন্থে তাহার প্রয়াস পাইয়াছেন। একই পিতার দুই পুত্র, সৎসঙ্গগুণে একজন কত উন্নত হইতে পারে, এবং আর একজন সংসর্গদোষে কিরূপে অবনতির চরম সীমায় উপনীত হয় তাহা বিশদভাবে এই গ্রন্থে চিত্রিত হইয়াছে। শ্রেয়ঃ ও প্রেয়ের যে তত্ত্বকথা উপনিষদে আছে, শ্রদ্ধেয় সুপ্রবীণ গ্রন্থকার এই উপন্যাসখানিতে তাহাকেই মানুষের সমাজে নামাইয়া আনিয়া মূর্ত্ত করিয়া দেখাইয়াছেন।

প্রসঙ্গতঃ ইহাতে কন্যাদায়গ্রস্ত ব্যক্তি, বিধবা, কুমারী, অনাথ, দরিদ্র, প্রায় সকল শ্রেণীরই সুখ-দুঃখের কথা আলোচিত হইয়াছে। গ্রন্থখানি একাধারে গল্প ও সদুপদেশে পূর্ণ। আশা করি গ্রন্থখানি সকলের নিকট সমাদৃত হইবে।

দানপ্রাপ্তি।

কলিকাতা, ভবানীপুর ব্রাহ্মসমাজের সম্পাদক শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত শিতিকণ্ঠ মল্লিক মহাশয় ১৮৪৬ শকের ২৯ শে ভাদ্র তারিখে আদিব্রাহ্মসমাজে ১০০৲ এক শত টাকা দান করিয়াছিলেন। তিনি পুনরায় ১০০৲ এক শত টাকা দিয়া গত ১৯২৬ খৃষ্টাব্দের ২রা অক্টোবর (১৮৪৮ শকের ১৫ই আশ্বিন) তারিখে উক্ত ২০০৲ দুই শত টাকা ভবানীপুর ব্যাঙ্কিং কর্পোরেশনে শত করা বাৎসরিক ৬৷৹ টাকা সুদের ৩৬ মাসের স্থিত গচ্ছিতের ১৬০০নং রসিদ আদিব্রাহ্মসমাজে দান করিয়াছেন। তাঁহার ইচ্ছা যে উক্ত টাকা এককালীন খরচ না করিয়া কেবল মাত্র ইহার সুদের টাকাই আদিব্রাহ্মসমাজের হিতার্থে ব্যয় করা হয়। শিতিকণ্ঠ বাবুর এই উদারতা সমাজহিতৈষীগণের অনুকরণীয়।

আদিব্রাহ্মসমাজ।

আয়-ব্যয়।

১৮৪৮ শকের অগ্রহায়ণ মাস।

আয়	...	৭৯৬৷৵৬
পূর্ব্বকার স্থিত	...	৭৷৶৹
সমষ্টি	...	৮০৪৷৶৬
ব্যয়	...	৫৯৭৷৴৬
স্থিত	...	২০৭৷৴৹

আয়।

ব্রাহ্মসমাজ।

এককালীন দান	২০০৲
ঋণগ্রহণ	৩৮৬ ৫৬
সস্পেন্স আদায়	২২৲
হাওলাত আদায়	৪৲
সমষ্টি	৬১২ ৫৬

তত্ত্ববোধিনী।

পত্রিকার হাল মূল্য	৬৲
বিজ্ঞাপনের মূল্য	১৪৲
সমষ্টি	২০৲

যন্ত্রালয়।

অপরের পুস্তকমুদ্রণ	৫:৶০
কাগজের মূল্য	৫০৲
সমষ্টি	১০১৶০

পুস্তকালয়।

সমাজের পুস্তক	৸০
গীতারহস্যের মূল্য	৬০৲
ঐ মাশুল	২৸০
সমষ্টি	৬৩॥০
সর্ব্ব সমষ্টি	৭৯৬॥৶৬

ব্যয়।

ব্রাহ্মসমাজ।

পাথেয়	৫৲
বেতন	৪১॥/৩
সরঞ্জামী	২ /০
মাশুল	১১/৬
ইলেকট্রিক	৪৶৬
কেরোসিন	॥৶০
ড্রেন পরিষ্কার	॥৵০
ঋণশোধ	১০৯৶০
হাওলাত	৪৲
বারবরদারী	২৷৶৬
বিবিধ	৷৶৬
সস্পেন্স	৫৲
কোম্পানীর কাগজ হস্তান্তর জন্য	১৭৫ /৬
সমষ্টি	৩৫:৸৵৯

তত্ত্ববোধিনী।

দপ্তরী	৬॥৵০
মাশুল	৪৸৶৬
বেতন — কর্ম্মাধ্যক্ষ	১১৷০
„ হিসাবরক্ষক	৯৲
„ বেহারা	৪৲
বিজ্ঞাপন	১০৲
বিবিধ	৷৶৬
সমষ্টি	৪৬৷/০

যন্ত্রালয়।

বেতন	১০৫॥০
তৈল	॥০
সাজিমাটী	॥০
রুল ঢালাই	৷৩
দপ্তরী	৯৵০
মাশুল	৵০
তামাক	৷৵০
অতিরিক্ত পারিশ্রমিক	১১॥৶৬
লেই	৵৬
বিবিধ	/৬
সমষ্টি	১২৮॥/৯

পুস্তকালয়।

বেতন—কর্ম্মাধ্যক্ষ	১০৲
দপ্তরী	৪৲
মাশুল	॥/০
গীতার মূল্য	৩৬॥০
ঐ মাশুল	৫৶০
ঐ কমিশন	৪৷০
ঐ দপ্তরী	১০৲
সমষ্টি	৭০৷০
সর্ব্ব সমষ্টি	৫৯৭/৬

সপ্তনবতিতম সাম্বৎসরিক ব্রহ্মোৎসব।

আগামী ১১ই মাঘ মঙ্গলবার প্রাতঃকাল ৮ ঘটিকার সময় আদি-ব্রাহ্মসমাজ-মন্দিরে ব্রহ্মোপাসনা হইবে। অতএব ঐ দিবস যথাসময়ে উক্ত গৃহে সকলের উপস্থিতি প্রার্থনীয়।

শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর।
সম্পাদক।

সতীশ কবিরাজের
ভুবন বিখ্যাত
১ দাগে হাঁপ কমে
১ শিশিতে আরোগ্য
শ্বাসারি
মূল্য ১ শিশি ১।০
ডজন ১৫৲ মাশুল সতন্ত্র
হাঁপ কাশের যম
সাহাপুর, বেহালা পোঃ, ২৪ পরগণা।
ব্রাঞ্চ-রাজা নবকৃষ্ণ ষ্ট্রীট, শোভাবাজার, কলিকাতা।

Tattwabodhini Patrika Reg. No. C. 452.

একবিংশ কল্প
চতুর্থ ভাগ
মাঘ, ব্রাহ্মসম্বৎ ৯৭।

৬০২ সংখ্যা | ১৮৪৮ শক

তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা

"ব্রহ্ম বা একমিদমগ্র আসীন্নান্যৎ কিঞ্চনাসীত্তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রন্নিরবয়বমেকমেবাদ্বিতীয়ম্
সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয়ং সর্ব্ববিৎ সর্ব্বশক্তিমদ্ধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া
পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্যসাধনঞ্চ তদুপাসনমেব"।

সম্পাদক—
শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও ডাক্তার শ্রীবনওয়ারিলাল চৌধুরী ডি, এস্‌সি
সহঃ সম্পাদক—শ্রীক্ষেমেন্দ্রনাথ ঠাকুর বি, এস-সি।

৫৫ নং অপার চিৎপুর রোড্ কলিকাতা, আদিব্রাহ্মসমাজ যন্ত্রে শ্রীরণগোপাল চক্রবর্ত্তী দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত।
সাল ১৩৩৩। খৃঃ ১৯২৭। সম্বৎ ১৯৮৩। কলিগতাব্দ ৫০২৭। মাঘ।

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার বার্ষিক মূল্য ৩৲ টাকা
ডাকমাশুল ৵০ আনা। এই সংখ্যার মূল্য ।০ আনা। } আদিব্রাহ্মসমাজের কর্ম্মাধ্যক্ষের নামে পাঠাইতে হইবে।

একবিংশ কল্প
চতুর্থ ভাগ
মাঘ, ব্রাহ্মসম্বৎ ৯৭।

১০০২ সংখ্যা ১৮৪৮ শক

তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা

"ব্রহ্ম বা একমিদমগ্র আসীন্নান্যৎ কিঞ্চনাসীত্তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রন্নিরবয়বমেকমেবাদ্বিতীয়ং সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয়ং সর্ব্ববিৎ সর্ব্বশক্তিমদ্ধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্যসাধনঞ্চ তদুপাসনমেব"।

সম্পাদক—
শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও ডাক্তার শ্রীবনওয়ারিলাল চৌধুরী ডি, এস্‌সি
সহঃ সম্পাদক—শ্রীক্ষেমেন্দ্রনাথ ঠাকুর বি, এস-সি।

কলিগতাব্দ ৫০২৭। সম্বৎ ১৯৮৩। খৃঃ ১৯২৭। শক ১৮৪৮। সাল ১৩৩৩।

কথায় নয়—কাজে।

(শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর)

ওঁ পিতা নোঽসি পিতা নো বোধি নমস্তেঽস্তু।
তুমি আমাদের পিতা, পিতার ন্যায় আমাদিগকে জ্ঞানশিক্ষা দাও। তোমাকে নমস্কার।

ভগবানের পথে এই পৃথিবীতে কত শত সাধু মহাত্মা পরস্পরের সহিত আড়াআড়ি করিয়া দ্রুতগতিতে ছুটিয়া চলিয়াছেন। এখানে ব্রাহ্মসমাজের ন্যায় উদারতম ভিত্তির উপর গ্রথিত সমাজের কার্য্যভার আমার ন্যায় এক ক্ষুদ্রশক্তি দীনহীন ব্যক্তির উপর সন্ন্যস্ত হওয়ায় আমি নিজের অক্ষমতায় ভয়ে লজ্জায় ও ক্ষোভে সত্যসত্যই ব্যথিতচিত্ত ও ম্রিয়মাণ হইয়া পড়িয়াছি। সকল বিষয়ে সীমাবদ্ধ মানবের পক্ষে বর্ত্তমান দুঃখদৈন্যের ভিতর, বর্ত্তমান নিরাশা-নিরানন্দের ভিতর ব্রাহ্মধর্ম্মের উদারতম বীজ সত্যসত্য প্রাণের ভিতর ধারণ করিয়া সংসারপথে অগ্রসর হইতে হইলে যে কিপ্রকার পর্ব্বতসমান বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করিতে হয়, যিনি এই ভাবে সংসারপথে অগ্রসর হইয়াছেন, তিনিই তাহা জানেন। কিন্তু সম্মুখে রাজা রামমোহন রায়, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ, ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র, ভক্তিভাজন রাজনারায়ণ বসু, শ্রদ্ধাস্পদ প্রতাপচন্দ্র, আচার্য্য শিবনাথ শাস্ত্রী প্রভৃতি অক্লান্তকর্ম্মা মহাপুরুষদিগের দৃষ্টান্ত পাইয়া পদে পদে স্খলিতপদ হইবার আশঙ্কা সত্ত্বেও কে অগ্রসর হইবার আনন্দ হইতে আপনাকে বঞ্চিত রাখিবে? তাঁহাদেরই দৃষ্টান্তে, তাঁহাদেরই চরণতলে দাঁড়াইয়া এই মহান ভার আমি আমার এই ক্ষুদ্র মস্তকে বহন করিতে উদ্যত হইয়াছি। পরলোকগত ঈশানচন্দ্র বসু প্রভৃতির ন্যায় যে সকল অজ্ঞাতনামা কিন্তু নীরবকর্ম্মী মহাপুরুষ ব্রাহ্মসমাজের অক্লান্ত সেবায় নীরবে দেহপাত করিয়া গিয়াছেন, তাঁহাদেরও উদ্দেশে নমস্কার করিয়া, প্রাণে নববল সঞ্চয় করিয়া, ব্রাহ্মধর্ম্মের সঙ্কটমোচন বীজমন্ত্র সরবে ও নীরবে, সজনে ও নির্জ্জনে সর্ব্বতোভাবে কায়মনোবাক্যে প্রচার করিবার ভার গ্রহণ করিতে সাহস করিয়াছি। যে ভগবানের কৃপা হইলে পঙ্গু যে, সেও গিরিলঙ্ঘন করিতে পারে; মূক যে, সেও বক্তা হইয়া উঠিতে পারে, আমার দৃঢ় বিশ্বাস, বন্ধুগণের সহায়তা ও সহানুভূতি প্রাপ্ত হইলে সেই ভগবানের আশীর্ব্বাদে আমিও এই মহাভার অক্লেশে বহন করিতে পারিব।

বর্ত্তমানে ব্রাহ্মসমাজের কর্ম্মক্ষেত্রে নামিলে সর্ব্বপ্রথমেই চারিদিক হইতে এই এক প্রশ্ন কানে আসিয়া উপস্থিত হয় যে, যখন চতুর্দ্দিকে শত শত ধর্ম্মসমাজ জাগিয়া উঠিয়া নিজেদের প্রভাব বিস্তার করিতেছে, এবং সেই সকল ধর্ম্মসমাজ যখন বিভিন্ন কর্ম্মক্ষেত্র খুলিয়া প্রকারান্তরে ব্রাহ্মসমাজেরই মঙ্গল

উদ্দেশ্য সংসিদ্ধ করিতে উদ্যত হইয়াছে, তখন ব্রাহ্মসমাজের দাঁড়াইয়া থাকিবার কোন প্রয়োজন দেখা যায় কি না? ইহা সত্য বটে যে, বিভিন্ন ধর্ম্মসমাজ ও বিভিন্ন কর্ম্মসঙ্ঘ ব্রাহ্মসমাজের অনেকগুলি কার্য্য গ্রহণ করিবার ফলে, ব্রাহ্মসমাজের পূর্ব্ববর্ত্তী নেতাগণ, তাঁহাদের সমসাময়িক অন্ধকারের মধ্যে উহার প্রয়োজন স্বভাবত যেরূপ তীব্রভাবে প্রাণের ভিতর অনুভব করিয়াছিলেন, এবং অনুভব করিয়া যে বলের সহিত তাহা প্রচার করিয়া গিয়াছেন, আমাদের অনেকেই ব্রাহ্মসমাজের প্রয়োজন তত তীব্ররূপে অনুভব করিবার অবকাশ পাই না; এবং কাজেকাজেই ব্রাহ্মসমাজের মূল পত্তনভূমি উদারতম অসাম্প্রদায়িক সত্যধর্ম্ম ব্রাহ্মধর্ম্মের কথা সেই পূর্ব্ববর্ত্তী আচার্য্যদিগের ন্যায় উপযুক্ত বলের সহিত প্রচার করিতেও উদ্যুক্ত হই না। কিন্তু ব্রাহ্মসমাজের উদ্দেশ্য কি সত্যই সর্ব্বতোভাবে সংসিদ্ধ হইয়াছে? যতদিন মানুষ সীমাবদ্ধ থাকিবে এবং যতদিন মানুষ সাম্প্রদায়িকতার হাত সম্পূর্ণ এড়াইতে পারিবে না, ততদিন ব্রাহ্মসমাজের উদ্দেশ্য সম্পূর্ণ সংসিদ্ধ হইতে পারিবে না এবং ততদিন ব্রাহ্মসমাজের প্রয়োজন অস্বীকৃত হইতে পারিবে না, ব্রাহ্মধর্ম্মপ্রচারও ব্যর্থ বলা যাইতে পারিবে না। বর্ত্তমান বৎসরের প্রথম অবধি যে গৃহবিবাদ ও অন্তর্বিরোধের বহ্নি প্রজ্বলিত হইয়া সমগ্র ভারতভূমিকে স্বীয় করালগ্রাসে কবলিত করিবার উদ্যোগ করিয়াছে, ধর্ম্মের নামে অধর্ম্মের যে বিষবীজ চতুর্দ্দিকে বিক্ষিপ্ত হইতেছে, সেই গৃহবিবাদ সেই অন্তর্বিরোধ, সেই অধর্ম্মের বিস্তারই আজ আমাদিগকে প্রত্যক্ষ করাইয়া দিতেছে যে, ব্রাহ্মসমাজের ন্যায় উদারতম অসাম্প্রদায়িক বীজমন্ত্রের উপর সুপ্রতিষ্ঠিত সমাজের প্রয়োজন নিশ্চয়ই আছে।

প্রথম দৃষ্টিতে দেখিলেই মনে হয় বটে যে, এই গৃহবিবাদ ও অন্তর্বিরোধ না জানি কি এক নিরবচ্ছিন্ন ভীষণ অমঙ্গলের সূচনা করিয়া দিয়াছে—চারিদিকে বন্ধুবিচ্ছেদ, গুপ্তহত্যা—দেখিতে দেখিতে, শুনিতে শুনিতে মন কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়ে, প্রাণ অবসন্ন হইয়া আসে। কিন্তু ধ্যানস্তিমিতলোচন ঋষিদের ন্যায় অন্তরে দৃষ্টি গভীররূপে সন্নিবিষ্ট করিলে স্পষ্টই উপলব্ধ হইবে যে, এই আপাতভীষণ অমঙ্গল ভেদ করিয়াও শান্তি ও মিলনের এক মহান মঙ্গল্য মন্ত্র জাগিয়া উঠিয়াছে। এই গৃহবিবাদ ও অন্তর্বিরোধের দাবানল প্রজ্বলিত হইয়া ভারতবাসীর ঘরদুয়ার সমস্ত ভস্মীভূত করিবার উপক্রম করিয়াছে বলিয়াই সেদিন রাষ্ট্রীয় মহাসভায় সভাপতির মুখ হইতে ভগবানেরই এই সত্যবাণী বিনিঃসৃত হইয়াছে যে, "শুধু কথায় আর কাজ নাই, এখন অবধি কাজের কথা চাই।" এই অন্তর্বিরোধের ফলেই, জনসাধারণ যে দুর্নীতি ও অধর্ম্মের পঙ্কিল স্রোতে গা ভাসাইয়া দিবার উপক্রম করিয়াছিল, মনে হয়, যেন তাহারা একটু থমকিয়া দাঁড়াইয়া গিয়াছে এবং মনে হয় যেন তাহাদের অন্তরে সত্যধর্ম্মের আশ্রয়গ্রহণের আবশ্যকতা অল্পে অল্পে ফুটিয়া উঠিতে চাহিতেছে।

মিলনমন্ত্র সাধনের জন্য, শান্তি সংস্থাপনের জন্য, দেশের মঙ্গলের জন্য, জাতীয় কল্যাণের জন্য উদারতম অসাম্প্রদায়িক সত্যধর্ম্ম ব্রাহ্মধর্ম্মের দীপ্ত দীপ সমুজ্জ্বল রাখা আবশ্যক। শাক্তবৈষ্ণবের দ্বন্দ্ব, গুরুবাদের সহিত, সম্প্রদায়ের চরণে সম্পূর্ণ পরাধীনতার সহিত ব্যক্তিগত স্বাধীনতার দ্বন্দ্ব, শতবিধ দুর্নীতি অনাচার ও কদাচারের সহিত অন্তরের সদ্ভাবের দ্বন্দ্ব যখন দেশকে ছিন্নভিন্ন করিয়া তুলিতেছিল, সেই সময়ে ভগবৎপ্রেরিত সত্যধর্ম্ম ব্রাহ্মসমাজেরই ভিতর দিয়া অবতীর্ণ হইয়াছিল। আবার এই যে হিন্দুমুসলমানের ভীষণ দ্বন্দ্ব আমাদের শান্তিময় দেশে চতুর্দ্দিকে অশান্তির উৎস খুলিয়া দিয়াছে, আমার বিশ্বাস, সাম্প্রদায়িকতার হাত হইতে মুক্তিলাভ না করিলে; যে নামেই অভিহিত কর না কেন, ব্রাহ্মধর্ম্মের অসাম্প্রদায়িক সত্য অন্তরে গ্রহণ না করিলে এবং তাহা বলের সহিত কথায় ও কার্য্যে প্রচার করিতে না পারিলে এই দ্বন্দ্বের বীজ মরিবে না, চিরন্তন শান্তি সংস্থাপিত হইবে না, দেশে কল্যাণ সুপ্রতিষ্ঠিত হইতে পারিবে না। দেশে ও সমাজে যতদিন রাশি রাশি সম্প্রদায়ের উৎপত্তি হইতে থাকিবে, শতবিধ উপধর্ম্মের সৃষ্টি হইতে থাকিবে, ততদিন সাম্প্রদায়িক দ্বন্দ্ববিবাদের অভাব হইবে বলিয়া মনে হয় না, সুতরাং ততদিন অসাম্প্রদায়িকতার আদর্শ ধরিয়া থাকিবার জন্য, এবং জগতের সকল কার্য্যে মঙ্গলবিধাতা ভগবানের

মঙ্গলহস্ত দেখাইবার জন্য, ব্রাহ্মসমাজের মত সত্য-ধর্ম্মপ্রচারক ধর্ম্মসমাজের প্রয়োজন অনিবার্য্য।

এই অসাম্প্রদায়িক আদর্শ দেখাইতে গেলে, জগতের সকল কার্য্যে বিধাতার মঙ্গলহস্ত দেখাইতে গেলে, ব্রহ্মোপাসকদিগের শুধু কথায় অসাম্প্রদায়িকতা বা ভগবানের মঙ্গলভাব প্রচার করিলে চলিবে না। ব্রহ্মোপাসকমাত্রেরই, নিজ নিজ কার্য্যের ভিতর দিয়াও, উহা সমস্ত বলের সহিত প্রচার করিতে হইবে। বর্ত্তমানে ব্রাহ্মসমাজের অপেক্ষাকৃত হীনপ্রভ ও বিফলপ্রয়াস হইবার অন্যতর কারণই হইল, কথায় ও কার্য্যে অনেক ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ মিল না থাকা, এবং সেই কারণে, হৃদয়ের সমস্ত বলের সহিত সত্যধর্ম্ম ও তদবলম্বিত সত্যসকল প্রচার করিতে না পারা। যাহা অন্তরে সত্য বলিয়া বুঝিব, তাহা যেমন কথায় প্রচার করিতে পরাংমুখ হইব না, সেইরূপ তাহা কার্য্যেও পরিণত করিতে পশ্চাৎপদ হইব না। প্রতিষ্ঠিত হইবার সূত্রপাত অবধি ব্রাহ্মসমাজ তো এই কথাই প্রচার করিয়া আসিতেছেন। ব্রাহ্মসমাজের পূর্ব্ববর্ত্তী আচার্য্য ও নেতাগণও নিজ নিজ জীবনের দ্বারা এই সত্যেরই সমর্থন করিয়া আসিয়াছেন বলিয়াই উহার তেজ সমগ্র জগতে এত শীঘ্র বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছিল।

শুধু ব্রাহ্মসমাজ কেন, কোন সমাজই—ধর্ম্ম-সমাজই বল, গার্হস্থ্য সমাজই বল, আর রাজনৈতিক সমাজই বল—কেবল মুখের কথায় উন্নতির পথে জীবনের পথে স্থির থাকিতে পারে না। যে সমাজ মুখের কথা কার্য্যে পরিণত করিতে না পারিবে, সে সমাজকে মৃত্যুমুখে অগ্রসর হইতেই হইবে। শুধু কথায় কিছু হইবে না, কাজ চাই—এই সত্যবাণী আজ কিছুকাল যাবৎ ভারতবাসী জনসাধারণের অন্তরে বড়ই বেশীরকম আলোড়িত হইতেছিল এবং বাহিরে তাহা প্রকাশ লাভ করিতে চাহিতেছিল। তাই না সেদিন রাষ্ট্রীয় মহাসভায় সভাপতির মুখে ভগবৎপ্রেরণায় এই বাণী ফুটিয়া বাহির হইয়াছিল যে, এখন আর আমাদের "কথায় কাজ নাই, কাজের কথা চাই"। এই মন্ত্রের প্রকৃত অর্থ এই যে, আমাদের কথা ও কাজের মধ্যে মিল চাই—কথায় যে সত্য প্রচার করিব, কার্য্যেও তাহাই পরিণত করিব। এই মন্ত্র সভাপতি মহাশয় রাজনৈতিক আন্দোলন উপলক্ষে প্রয়োগ করিলেও আমরা নিঃসঙ্কোচে বলিতে পারি ও বলিতে চাই যে, দেশের বর্ত্তমান অবস্থায় এই মন্ত্র ভারতবাসী সকল ব্যক্তির ও সকল সমাজেরই হৃদয়ের কথা হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ইহা সকল সমাজেরই অন্তরের কথা হইয়াছে বলিয়াই আজ কঠোর রক্ষণশীল ব্রাহ্মণসমাজও নির্য্যাতিত রমণীকে সমাজে পুনর্গ্রহণের ব্যবস্থা দিয়া সমগ্র হিন্দুসমাজের আশীর্ব্বাদ সঞ্চয়ে অগ্রসর হইতে সাহস করিয়াছেন। ব্রাহ্মসমাজ যদি যথার্থই আমাদের প্রিয়বস্তু হয়, ব্রাহ্মসমাজকে যদি বাঁচাইয়া রাখা আমরা আবশ্যক মনে করি, তবে আমরা প্রত্যেক ব্রহ্মোপাসককেও সনির্ব্বন্ধ অনুযোগ করিব যে 'কথায় আর কাজ নাই; রাশি রাশি সুদীর্ঘ বক্তৃতা করিয়া এখন আর বিশেষ কোন লাভ হইবে বলিয়া মনে হয় না; এখন কাজের কথা চাই; এখন সত্যধর্ম্মকে রক্ষা করিবার উপায় অবলম্বন করা চাই; ব্রাহ্মধর্ম্মের বীজমন্ত্রকে কৌস্তুভমণির ন্যায় অন্তরে ধারণ করিয়া সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে, দুর্নীতির বিরুদ্ধে, দুঃখ-দুর্দ্দিনের বিরুদ্ধে, দেশের সর্ব্ববিধ অমঙ্গলের বিরুদ্ধে, জাতির অকল্যাণের বিরুদ্ধে সংগ্রামে অবতীর্ণ হওয়া চাই'। আমাদের মুখের কথার সহিত কাজের মিল হওয়া চাই। মুখে এক সত্য প্রচার করিব, তাহাকে কার্য্যে পরিণত করিবার সময় ভীরু কাপুরুষের ন্যায় রণে পৃষ্ঠপ্রদর্শন করিলে চলিবে না।

অমঙ্গল, অসত্য, অধর্ম্মের সহিত সংগ্রামে যদি বিজয় লাভ করিয়া বিজয়ীর বেশে দাঁড়াইতে চাও—তাহা যদি তোমাদের প্রকৃত উদ্দেশ্য হয়, প্রাণের লক্ষ্য হয়, তবে ব্রাহ্মধর্ম্মের সেই অমোঘ বীজমন্ত্রের ন্যায় অন্য কোন কিছুকেই সহায়রূপে পাইবে না। সেই অমোঘ সংকটমোচন বীজমন্ত্র হইতেছে—"তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্যসাধনঞ্চ তদুপাসনমেব" সেই ভগবানকে সমস্ত হৃদয়ের সহিত প্রীতি করা এবং তাঁহার প্রিয়কার্য্য সাধন করাই তাঁহার একমাত্র উপাসনা। এই বীজমন্ত্র যে কিপ্রকার অসাম্প্রদায়িক, তাহা কাহাকেও বুঝা-

ইহা দিতে অধিক প্রয়াস পাইতে হইবে বলিয়া মনে করি না। এই বীজমন্ত্রের, প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেই ইহার স্বতঃসিদ্ধ অসাম্প্রদায়িকতা অন্তরে সহজেই প্রতিভাত হইবে। ইহার ন্যায় অসাম্প্রদায়িক ও উদারতম বীজমন্ত্র অন্য কোন ধর্ম্মে অন্তর্নিবিষ্ট আছে বলিয়া জানি না। এই বীজমন্ত্র উদারতা ও অসাম্প্রদায়িকতার কারণেই ব্রহ্মোপাসকের হস্তে এক অব্যর্থ অস্ত্র—ইহা সকল সাম্প্রদায়িক ধর্ম্মের সঙ্কীর্ণতা ছিন্নভিন্ন করিয়া দিবার অধিকার রাখে।

যে ব্যক্তি, যে সমাজ, যে দেশ এই উদার ও অসাম্প্রদায়িক বীজমন্ত্র অন্তরে ধারণ করিবে—শুধু কথায় নয়, কিন্তু কাজেও—সে ব্যক্তি, সে সমাজ, সে দেশ হইতে সঙ্কীর্ণতা এবং তাহার অনুষঙ্গী দুঃখদৈন্য, অশান্তি নিরাশা প্রভৃতি সর্ব্ববিধ অমঙ্গলের নিদানসকল যে নিশ্চয়ই দূরে সরিয়া যাইবে, তাহা বলা বাহুল্য। ভারতের হিন্দুসমাজ এক সময়ে এই অসাম্প্রদায়িক বীজমন্ত্রের উপর প্রতিষ্ঠিত প্রকৃত সত্যধর্ম্মকে অন্তরে গ্রহণ করিয়াছিলেন বলিয়াই এই আশ্চর্য্য সত্যবাণী এদেশেই প্রকাশ পাইয়াছিল—"নৃণামেকো গমাস্ত্বমসি পয়সামর্ণব ইব" সমুদ্র যেমন নদনদীসমূহের একমাত্র গন্তব্যস্থল, ভগবানও সেইরূপ সকল মানবেরই একমাত্র গম্যস্থল। এই ভাব হইতে বিচ্যুত হইবার ফলে যখন হিন্দুসমাজ কি ধর্ম্মবিষয়ে, কি সামাজিক বিষয়ে, কি রাজনীতিক্ষেত্রে, সকল বিষয়েই শতধাবিভক্ত হইয়া শতবিধ সঙ্কীর্ণতার শত শত ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র গণ্ডীর পাশজালে আপনাকে আবদ্ধ করিল, যখন হিন্দুসমাজ মুখে উদারতার বড় বড় মন্ত্র উচ্চারণ করিতে থাকিলেও কার্য্যে ঠিক তাহার বিপরীত আচরণ করিতে লাগিল, তখনই সেই উন্নত ও সুবিস্তৃত হিন্দুসমাজ অবনতির পিচ্ছিল পথে দ্রুতপদে নামিতে লাগিল। হিন্দু ও মুসলমান উভয়ের, রাজনীতিকে সত্যধর্ম্মের ভিত্তি হইতে বিচ্যুত করিয়া রাজনীতিক্ষেত্রে নামিবার ফলেই আজ হিন্দুমুসলমানের এই ভীষণ বিরোধ। সত্যধর্ম্মের ভিত্তি হইতে বিচ্যুত করিয়া সমাজগঠনের চেষ্টার ফলেই আজ হিন্দু জাতি ধ্বংসের পথে দণ্ডায়মান। ইহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই যে, এই প্রকার মুখে উদারতার উৎস ব্রাহ্মধর্ম্মের কথা ব্রহ্মোপাসকগণ ন্যূনাধিক বলের সহিত প্রচার করিলেও, কার্য্যে অনেক সময়ে তাহার বিপরীত আচরণ করিবার ফলেই, ব্রাহ্মসমাজ আর প্রকৃত উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে পারিতেছেন না—ভারতের ধর্ম্মক্ষেত্রে, মনে হয় যেন, একটু পিছাইয়া পড়িতেছেন।

ব্রাহ্মসমাজকে যদি আবার জাগাইয়া তুলিতে চাই, হিন্দুসমাজকে যদি আবার ধ্বংসের মুখ হইতে বাঁচাইতে চাই, সমগ্র ভারতবাসীকে যদি আবার সর্ব্বাঙ্গীন স্বাধীনতা ও উন্নতির সমুচ্চ শিখরে দাঁড় করাইতে চাই, তবে প্রত্যেক ভারতবাসীকে, প্রত্যেক হিন্দুকে, প্রত্যেক ব্রহ্মোপাসককে নির্ভয়ে সর্ব্ববিধ সাম্প্রদায়িকতা, সর্ব্ববিধ অন্যায় সঙ্কীর্ণতার বিরুদ্ধে দাঁড়াইতে হইবে; সংসারের সকল ক্ষেত্রে, জীবনযাত্রার সকল বিভাগে সেই অপরাজিত দেবতার প্রবর্ত্তিত সত্যধর্ম্মের অজেয় পতাকার বিজয়-ঘোষণা করিতে হইবে।

নির্ভয়ে অগ্রসর হও। ভগবানের মাভৈঃ বাণী আকাশের প্রত্যেক অংশ হইতে প্রতি মুহূর্ত্তে ধ্বনিত হইতেছে। সেই বিশ্ববিধাতা মঙ্গলময় পরমেশ্বরের মঙ্গল ভাবে, তাঁহার অমিত শক্তিতে যদি আমাদের বিশ্বাস থাকে; সেই আনন্দস্বরূপের আনন্দবিধানে যদি আমাদের প্রকৃত আস্থা থাকে, তবে সংসারের ভয়প্রদর্শনে, সমাজের নিষ্পীড়নে আমাদের সত্যধর্ম্মপ্রচারে পরাংমুখ হইবার কোন অবকাশই নাই। ঋষিদের অন্তরে এই বিশ্বাস অটল অচল ছিল বলিয়াই তাঁহারা বড়ই বলের সহিত ঘোষণা করিতে পারিয়াছেন—"আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান্ ন বিভেতি কুতশ্চন"—ব্রহ্মের আনন্দ যিনি জানিয়াছেন, তিনি কাহা হইতেও ভয় প্রাপ্ত হন না; "আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান্ ন বিভেতি কদাচন"—ব্রহ্মের আনন্দ যিনি জানিয়াছেন, তিনি কদাপি ভয় প্রাপ্ত হন না। দুর্ব্বলতাই ভয়ের কারণ। দুর্ব্বল যে, সেই সংশয় করিতে পারে যে, সত্যধর্ম্ম প্রচারের ফলে প্রাচীন চিরপরিচিত সমাজ যদি ভূমিসাৎ হয়, তবে কি হইবে? যথার্থ প্রাণের সহিত সত্যধর্ম্ম প্রচার করা, কথায় ও কার্য্যে একমিল হইয়া সত্যধর্ম্ম প্রচার করা

দুর্ব্বল ভীরু সংশয়াত্মার কর্ম্ম নয়। যথার্থ-প্রাণের সহিত সত্যধর্ম্ম প্রচার করা—স্বাধীনতার নামে উচ্ছৃঙ্খলতাদৃপ্ত, ধর্ম্মের নামে অনাচারনিরত উদ্‌ভ্রান্তচিত্ত মানবের কার্য্য নয়। তাহার বিকৃত দৃষ্টি দেখিতে পায় না যে, সকল ঘটনার ভিতর দিয়া মঙ্গলবিধাতা ভগবানের মঙ্গলহস্ত এক আশ্চর্য্য মঙ্গলসৌধ গড়িয়া তুলিতেছে। প্রকৃত সত্যধর্ম্ম প্রাণের সহিত প্রচার করিতে গেলে, সৎসাহস চাই, ধৈর্য্য চাই, সহিষ্ণুতা চাই, একনিষ্ঠা চাই।

আজ এই উৎসবের পবিত্র দিবসে সমাগত ভক্তমণ্ডলীর সম্মুখে নূতন কথা কি-ই বা বলিব? পুরাতন কথাই বারম্বার পুনরুক্ত করিতে চাই। সত্যধর্ম্মের নামে নিত্য নূতন মতবাদ প্রচার করিয়া নব নব সম্প্রদায়সৃষ্টির অবকাশ দিও না; কিন্তু সংঘবদ্ধ হইয়া পরস্পরের নিকট বল ও উৎসাহ সঞ্চয় করিয়া যথার্থ সত্যধর্ম্ম প্রচারে বদ্ধপরিকর হও। নিত্য নূতন আচার অনুষ্ঠান প্রবর্ত্তিত করিয়া নব নব জাতিসৃষ্টির অবকাশ দিও না; কিন্তু নিজ নিজ সমাজের আচার ব্যবহার হইতে ভাল অংশ গ্রহণ করিয়া এবং মন্দ অংশ পরিত্যাগ করিয়া সত্য-ধর্ম্মের ভিত্তিতে সমাজগঠনের ব্যবস্থা কর। এই প্রকার কথা ও কার্য্যের মধ্যে মিল রাখিয়া চলিলেই, জীবনের সকল কার্য্য সকল বিভাগ সত্যধর্ম্ম হইতে অবিচ্যুত রাখিলেই ধরাধাম স্বর্গধামে পরিণত হইবে। এইপ্রকার সঙ্ঘবন্ধন বা সমাজগঠনের প্রারম্ভে অল্পসংখ্যক লোক তোমার সহায় হইতে পারে, কিন্তু তাহাতে নিরাশায় মুহ্যমান হইও না। মনে রাখিও যে, প্রতি মুহূর্ত্তে প্রেয় আমাদিগকে আপাতমধুর নানা বিষয়ের লোভ দেখাইয়া আক-র্ষণ করিতেছে। ইহা সত্ত্বেও তুমি যে ঐ অল্পসংখ্যক লোককে তোমার সহায়রূপে পাইয়াছ, তাহারই জন্য ভগবানের চরণে মস্তক অবনত করিও। তুমি স্থির জানিও যে, সকল স্বাধীনতার উৎস সেই স্বাধীন অমৃতপুরুষের সন্তান তুমি—তুমিও বীর, তুমিও সবল। সেই অমৃতপুরুষের অনিমেষ মঙ্গল-দৃষ্টিতে স্বীয় দৃষ্টি সন্নিবদ্ধ রাখিয়া মানুষের ভালমন্দ বলার উপর, মানুষের নিন্দাপ্রশংসার উপর কিছু-মাত্র নির্ভর করিও না, ভ্রূক্ষেপ করিও না। প্রতি নিমেষে অন্তরে কাণ পাতিয়া শোন যে, অন্তরের গুরু তোমাকে কোন্ পথে যাইতে আদেশ করেন। সেই আদেশ শুনিয়া সত্যধর্ম্মের পথে অগ্রসর হও—মানুষের ভয়ে, সংসারের ভয়ে সেই পথ হইতে বিচ্যুত হইও না। সংসারের নিকট যতই আঘাত পাইতে থাকিবে, ততই সেই ভক্তবৎসল ভগবানের চরণ আরও বলের সহিত আঁকড়াইয়া ধরিও—দেখিবে, সকল বিপদ আপদ নিরস্ত হইয়া শান্তি ও সুখ সুপ্রতিষ্ঠিত হইবে। তখন তোমার হৃদয় হইতে ভগবানের নামে নিত্য এই জয়ধ্বনি উঠিতে থাকিবে—জয় ভগবানের জয়।

ব্রহ্মসঙ্গীত-স্বরলিপি।

মিশ্রভৈরব—চৌতাল।

করুণার সাগর, কৃপাজল দেও হে কাতরে।
কোথা তুমি ত্রিভুবনরাজা পাবনের পাবন,
কোথায় দীন হীন অকিঞ্চন আমি।
যার গুণে পাষাণ-হৃদয়ে
দেখা দেয় প্রেমের অঙ্কুর,
ডাকি তারি তরে।
তব প্রসাদ-বারি বরিষে যথা,
জীবন-ধন শান্তি-রস উথলে তথা সহস্র ধারে।

কথা—৺সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর। স্বরলিপি—৺প্রতিভা দেবী।

১´ • ২ • ৩ ৪
সঃ II জঋা -া । সণ্সা ণ্দা । -া ন্সা । -ন্সজ্ঞা -া । জ্ঞপমপা মজ্ঞা । -া জ্ঞরা I
ক • রু • ণা • • র • • সা • • • • • গ • • • র • রু •

১´ • ২ • ৩ ৪
I মজ্ঞা -ঋসা । সণ্সা ণ্দা । ন্া -সা । সন্সা -া । সঋা -া । সন্সাঃ সঃ II
পা • • জ • • ল • দা ও হে • • • কাঁচ • রে • • "ক"

১´ • ২ • ৩ ৪
মঃ II পদা -া । না -র্সা । র্সা র্সর্সা । -নর্সা র্সর্সা । র্সা -নর্সা । র্সা -া I
কো থা • ভু • মি, ত্রিভু • • বন রা • • জা •

১´ • ২ • ৩ ৪
I র্সাঃ র্সঃ । র্সা -নর্সর্সা । র্সা -নর্সর্জ্ঞা । র্জ্ঞা -র্ঋা । -র্সণর্সা ণদা । -া পমপা I
পা ব নে • • র পা • • • ব • • • • ন • • কো • •

১´ • ২ • ৩ ৪
I মজ্ঞা -ঋা । -সা সসা । সজ্ঞা জ্ঞজ্ঞা । জ্ঞমা পমপা । মজ্ঞমা জ্ঞা । -ঋা সসা II
থা • • দীন হী ন অ কি • ঞ্চ • • • ন আ • মি "ক"

১´ • ২ • ৩ ৪
II পাঃ -পঃ । পা পা । -া পা । পদমা -পা । পপা পর্সণর্সা । ণদা -া I
বা র শু নে • পা বা • • প হু দ • • য়ে • •

১´ • ২ • ৩ ৪
I দপা -ণদা । পমপা মজ্ঞা । -া জ্ঞজ্ঞা । জ্ঞপা পমপা । মজ্ঞা মজ্ঞা । -ঋা সা I
দে • • • থা • • দে • • র,প্রে মে • র • • অ • স্কু • • র

১´ • ২ • ৩ ৪
I সণ্া -সা । -সা সজ্ঞা । -া জ্ঞজ্ঞা । জ্ঞরা -মা । -জ্ঞা -মজ্ঞা । -ঋা -সা I
জা • • কি তা • রি,ত রে • • • • • •

১´ • ২ • ৩ ৪
I মা মমা । পদাঃ দঃ । না -র্সা । র্সনর্সা র্সর্সা । র্সাঃ র্সঃ । র্সা নর্সর্সা I
ত ব,প্র সা দ বা • রি,• • বরি ষে ষ থা • • য

১´ • ২ • ৩ ৪
I নর্সর্জ্ঞা -র্ঋা । র্সা ণদা । দা দণা । দা দপা । পা পা । পা পপা I
থা,• • • জী ব • ন, ধ ন, শা • ন্তি র স, উথ

১´ • ২ • ৩ ৪
I মপা -মজ্ঞজ্ঞা । মজ্ঞা -ঋা । -সা সসা । সজ্ঞা -রজ্ঞা । জ্ঞপা -মদপা । মজ্ঞা -ঋসা II II
লে, • • ত থা • • সহ ব • ধা • • • • রে "• ক"

ব্রাহ্মগণের প্রতি সবিনয় নিবেদন।

(শ্রীকালীপ্রসন্ন বিশ্বাস)

রেলের গাড়ির ইঞ্জিনে যখন নূতন কয়লা দেওয়া হয়, তখন তাহার চিমনি হইতে একটা অতি গাঢ় কাল বর্ণের ধূম নির্গত হইয়া প্রথমে একটি স্তম্ভাকারে উঠিতে থাকে। তৎপরে উহা যতই উপরে উঠিতে থাকে ততই ঐ ধূম ক্রমশঃ চতুর্দ্দিকে বিস্তৃত ও পরিব্যাপ্ত হইতে থাকে, অবশেষে অনন্ত আকাশের সহিত মিশিয়া গিয়া অদৃশ্য হইয়া যায়, ইহা বোধ হয় সকলেই দেখিয়াছেন।

প্রথমে যে গাঢ় কৃষ্ণবর্ণ ধূম স্তম্ভাকারে উঠে, তাহাতে কয়লার ময়লা থাকে এবং ক্রমে যতই ঐ ময়লা ঝরিয়া পড়িতে থাকে ততই ঐ ধূমের বর্ণ ও গাঢ়তা পাতলা হয় এবং উহা আকাশ ভেদ করিয়া চতুর্দ্দিকে বিক্ষিপ্ত হইয়া থাকে। ময়লা বা আবর্জ্জনাপূর্ণ প্রথম ধূম আপনাকে পৃথক রাখিতে চেষ্টা করে। পরে ময়লা যতই পরিষ্কার হইয়া যায় অর্থাৎ উহা যতই নির্ম্মল হইতে থাকে ততই উহার সংকীর্ণতা দুর হইয়া যায় এবং চতুষ্পার্শ্বের আকাশের সহিত মিলিত হইবার স্পৃহা বাড়িতে থাকে এবং যখন ঐ ধূম আবর্জ্জনাশূন্য অর্থাৎ স্বচ্ছ হয়, তখন উহা সমস্ত আকাশের সহিত এমন মিলিয়া যায় যে উহার অস্তিত্ব আর দৃষ্টিগোচর হয় না।

মানুষেরও এই অবস্থা। যখন সে নবজীবন লাভ করে, চারিদিক হইতে সংসারের নানা আবর্জ্জনা বা মলিনতা আসিয়া তাহার মধ্যে প্রবেশ করে, তখন সে সেই সংকীর্ণতাপূর্ণ মলিনতার বশীভূত হইয়া আপনাকে পৃথক রাখিতে ইচ্ছা করে। পরে এই মলিনতা যতই দুর হইতে থাকে ততই তাহার হৃদয়ে উদারতা জাগ্রত হয়—সে চারিদিকের লোককে—চারিদিকের বস্তুকে প্রেমের দ্বারা আপনার করিতে চেষ্টা করে এবং অবশেষে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে আপনার প্রেমের সীমার অন্তর্ভূত করিয়া লয়। ইহাকেই বিশ্বপ্রেমের বিকাশ বলে। যখন এই বিশ্বপ্রেম হৃদয়ে পরিস্ফুট হয়, তখন মানুষ সাম্প্রদায়িকতার গণ্ডীর বাহিরে গিয়া পড়ে, তাহার সমস্ত অহঙ্কার চূর্ণ হইয়া যায়—সে সেই অনন্ত অসীমের কাছে লুটাইয়া পড়িয়া বলিতে থাকে

বড় হতে চাই না আমি
ছোট করে দাও হে আমায়।
আমি ধূলাতে মিশায়ে রব
তৃণ হতে কোমল হব
ভক্তজনপদধূলি মাখিব হে গায়।
আমার অহঙ্কার চূর্ণ কর
ভেঙ্গে দাও হে খেলার ঘর
আমার বাসনা নিভায়ে দাও ওহে দয়াময়।
সংসার বিষ আকাংক্ষা
মনে বড় দেয় শঙ্কা
কৃপা করে কৃপাময় দাও হে অভয়।

তখন সে অমল বিমল হৃদয়ে সেই অনন্ত অসীমের দিকে, সেই শুদ্ধমপাপবিদ্ধমের দিকে ধাবিত হইতে থাকে। ক্রমে আপনার বিশুদ্ধ প্রেমের দ্বারা বিশ্বসংসারের সঙ্গে সঙ্গে সেই বিশ্বপাতাকেও সম্পূর্ণভাবে ঘিরিয়া ফেলে। তাহার প্রেমরূপী গঙ্গা তখন অনন্ত প্রেমের সাগরের সহিত এমন ভাবে মিশিয়া যায় যে তাহার আর স্বাতন্ত্র্য দেখা যায় না। ইহাকেই মুক্তি কহে। যাঁহারা এই অবস্থা প্রাপ্তির জন্য সাধনা করেন তাঁহারাই প্রকৃত ব্রাহ্ম। যে সমাজ এই অবস্থা প্রাপ্তির পথ দেখাইয়া দেয়—যে সমাজ মনুষ্যকে ঐ পথের পথিক হইবার সাহায্য করে, সেই সমাজের নাম ব্রাহ্মসমাজ। এই উচ্চ আদর্শ লইয়াই আমাদের এই ব্রাহ্মসমাজ অবতীর্ণ হইয়াছে।

মনুষ্যমাত্রেই মুক্তির প্রয়াসী। তাহারা নিজ নিজ জ্ঞানশক্তির দ্বারা মুক্তির পথে পরিচালিত হইতে চায়। ইহাই মানুষের স্বাভাবিক ইচ্ছা, ইহাই তাহার স্বাভাবিক ধর্ম্ম। সকল ইচ্ছারই পরিসমাপ্তি ব্রহ্মে, সকল ধর্ম্মেরই পরিসমাপ্তি সেই একমেবাদ্বিতীয়মে। সংসারের মলিনতা এই পথের কন্টক। এই মলিনতাই মানুষকে তাহার স্বাভাবিক ইচ্ছা ফলবতী হইতে দেয় না। এই মলিনতাই তাহাকে মুক্তির পথ হইতে দূরে লইয়া যায়। সুতরাং মনুষ্যমাত্রেরই এই মলিনতাকে বর্জ্জন করা নিতান্ত কর্ত্তব্য।

"হিরণ্ময়ে পরে কোষে বিরজং ব্রহ্ম নিষ্কলং"

আমাদের হৃদয়ের নিভৃত স্থানে সেই বিশুদ্ধাত্মা পরব্রহ্ম বিরাজ করিতেছেন। যাহার হৃদয়দর্পণ স্বচ্ছ এবং নির্ম্মল, সে-ই তাঁহাকে দেখিতে পায়। যাহার হৃদয়রূপ দর্পণ যত মলিনতাপূর্ণ হয়, তাহার পক্ষে তাঁহাকে দেখা ততই কষ্টসাধ্য বা অসম্ভব হয়।

একখানি স্বচ্ছ বিমল দর্পণের সম্মুখে দাঁড়াও, তোমার প্রতিবিম্বটি অতি স্পষ্ট দেখিতে পাইবে। ঐ আয়নার উপর কিছু ধূলিকণা নিক্ষেপ কর—প্রতিবিম্বটি তত পরিষ্কার দেখিতে পাইবে না। উহার উপর কিছু কর্দ্দম লেপন কর—প্রতিবিম্বটি আরও অস্পষ্ট দেখিবে। একলেপ আলকাতরা লাগাইয়া দাও আরও অধিক অস্পষ্ট দেখিবে। পুনঃ পুনঃ আলকাতরার লেপ লাগাইয়া দাও আর কিছুই দেখিতে পাইবে না। সেইরূপ মানবহৃদয়ে প্রথমে ধূলিকণার ন্যায় সামান্য আবর্জ্জনা আসিয়া পড়ে, পরে ক্রমে ঐ ধূলিকণা কর্দ্দমে পরিণত হয়, ক্রমে আলকাতরার দাগ লাগে। তার পর পোঁচের উপর পোঁচের দ্বারা এমন একটা কঠিন আবরণ পড়িয়া যায় যে, তাহার মধ্য দিয়া ভগবানের প্রতিবিম্ব দর্শন করা একেবারে অসম্ভব হইয়া পড়ে।

কিন্তু ভগবানের এমন দয়া, তিনি আমাদের হৃদয়কে এমন করিয়া গড়িয়াছেন যে তাহার মলিনতা যতই কঠিন হউক না কেন, একেবারে দুরপনেয় নহে। চেষ্টার দ্বারা, সাধনার দ্বারা, সাধুসঙ্গের দ্বারা, এই মলিনতা দূরীভূত করিতে পারা যায়। তবে হৃদয়ের মলিনতা যতই কঠিন হয় তাহা অপনোদন করাও ততই কষ্ট এবং সাধনা-সাধ্য হয়। যেমন কাচময় দর্পণের ধূলি-কণা সামান্য ঝাড়িলেই পরিষ্কার হয়, কর্দ্দম জল দ্বারা ধৌত করিলেই চলিয়া যায়, কিন্তু আল-কাতরার লেপ যতই ঘন হয় ততই তেল ও নারিকেল ছোবড়া দ্বারা ঘসিতে হয়, সেইরূপ মনুষ্যহৃদয়ের মলিনতাও দূর করিতে পারা যায়। কিন্তু করে কে?

ব্রাহ্মসমাজ মানুষের হৃদয় হইতে মলিনতা দূরীভূত করিবার জন্যই অধিষ্ঠিত হইয়াছে। এই মলিনতা দূর করিয়া দিয়া মানুষকে মুক্তির পথে লইয়া যাওয়াই ব্রাহ্মসমাজের প্রধান উদ্দেশ্য। ইহাই ব্রাহ্মসমাজের প্রধান সাধনা। আজ এই শুভ মাঘোৎসবের দিনে, বৎসরের শেষে হিসাব নিকাসের দিনে, শ্রদ্ধেয় ব্রাহ্ম বন্ধুগণ একবার দেখুন, ব্রাহ্মসমাজকে আপনারা এই উদ্দেশ্যে কতদূর সফল করিতে পারিয়াছেন। আপনারা কত মলিন পঙ্কিল হৃদয় পরিষ্কার করিতে সক্ষম হইয়াছেন; আপনাদের হৃদয় কতদূর মলিনতাশূন্য হইয়াছে, আপনাদের প্রেম কতদূর পরিস্ফুরিত হইয়াছে।

যাহার নিজের হৃদয় মলিনতাপূর্ণ, সে কখনও অপরের হৃদয় হইতে মলিনতা দূর করিতে সক্ষম হয় না। ধূলামাখা কাপড়ের দ্বারা আর্সির ধুলা ঝাড়া যায় না, কাদামাখা ন্যাতার দ্বারা কাদা দূর করা যায় না, আলকাতরামাখা ব্রুষের দ্বারা আলকাতরার দাগ নষ্ট হয় না। কিন্তু একটি নির্ম্মলহৃদয় ব্যক্তি তাঁহার বিশুদ্ধ প্রেমের দ্বারা সহস্র সহস্র লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি লোকের হৃদয় মলিনতাশূন্য করিতে পারেন।

এক সময়ে ব্রাহ্মসমাজের নেতাগণ এই মহৎ উদ্দেশ্যের জন্য প্রস্তুত হইয়াছিলেন। তখন তাঁহাদের পবিত্র জীবন, পবিত্র প্রেম, সকলের আদর্শস্থানীয় হইয়াছিল। এমন কি, যাঁহারা সে সময় ব্রাহ্মসমাজের ঘোর প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন তাঁহারাও ব্রাহ্মসমাজের উচ্চ আদর্শ গ্রহণ করিয়া কৃতার্থ হইয়াছিলেন। তাই আজও রাজা রাম মোহন রায়, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেন, পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রীপ্রমুখ মনীষী ব্যক্তিগণ সর্ব্বসম্প্রদায়ের নিকট আদরণীয় হইতেছেন। সেই এক দিন আর এই এক দিন!

আজ আমি যখন ব্রাহ্মসমাজের দিকে দৃষ্টি-পাত করি তখন যেন আমার হৃদয়ে শেল বিদ্ধ হয়। যদিও ইহা একটি অপ্রিয় সত্য, তথাপি কর্ত্তব্যের অনুরোধে ব্রাহ্মসমাজের ভবিষ্যৎ মঙ্গ-লের জন্য, আজ আমাকে এই সকল কথা বলিতে হইতেছে। আশা করি সকলে আমাকে ক্ষমা করিবেন। আজ আমি দেখিতেছি যে, ব্রাহ্ম-সমাজে সেই উচ্চ আদর্শ, ব্যক্তিগত ব্রাহ্ম জীব-নের সেই মহৎ আদর্শ যেন অনেক নীচে নামিয়া পড়িতেছে। অনেক ব্রাহ্ম পরিবার অনেক ব্রাহ্ম-

সন্তান যেন লজ্জায় মুখ ঢাকিয়া পলাইতে চেষ্টা করিতেছে। পূর্ব্বে যে ব্রাহ্মসমাজের ব্যক্তিগত জীবনের আদর্শ লইয়া অনেকে, অনেকে কেন; সকল সম্প্রদায়ের লোক উন্নতির পথে উত্থিত হইয়াছিল, আজ সেই ব্রাহ্মসমাজ, সেই ব্রাহ্মসমাজের আদর্শচরিত্র ব্যক্তিগণের সন্তানগণ যেন স্বর্গভ্রষ্ট রাজা নহুষের ন্যায় দ্রুতবেগে নীচের দিকে নিপতিত হইতেছে। অনেকে স্বীকার করুন বা না করুন, ইহা একটি ধ্রুব সত্য। ব্রাহ্মগণ একবার চক্ষু মেলিয়া যদি দেখেন, তাহা হইলে স্পষ্টই দেখিতে পাইবেন, কেমন করিয়া আমরা ধ্বংসের পথে অগ্রসর হইতেছি। কিন্তু দুঃখের বিষয়, এই অধঃপতনের দিকে কাহারও লক্ষ্য নাই। যাঁহাদের নিকট ব্রাহ্মসমাজ অনেক আশা করিয়াছিল, যাঁহাদের মুখের দিকে ব্রাহ্মসমাজ এখনও সতৃষ্ণ নয়নে চাহিয়া আছে, তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই এখন বার্দ্ধক্য অবস্থায় অবস্থান করিতেছেন। যাঁহাদের শক্তি আছে, তাঁহারা আজ সাম্প্রদায়িকতা, সংকীর্ণতা এবং স্বার্থের কঠিন শৃঙ্খলে আবদ্ধ। এখনও যাঁহারা ব্রাহ্মসমাজে নব জীবন আনিবার ইচ্ছা করেন, তাঁহারা সহানুভূতির অভাবে কৃতকার্য্য হইতে পারেন না।

হে ব্রাহ্মগণ! আজ একবার তোমরা বুকে হাত দিয়া বল দেখি, ব্রাহ্মসমাজের প্রতি তোমাদের পূর্ব্বের ন্যায় শ্রদ্ধা ও ভক্তি বর্ত্তমান আছে কি? ব্রাহ্মসমাজের জন্য তোমাদের প্রাণ পূর্ব্বের ন্যায় কাঁদে কি না? রাজা রামমোহন রায়ের অতুল কীর্ত্তি, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের সাধনক্ষেত্র এই আদিব্রাহ্মসমাজের জীর্ণ মন্দিরটির প্রতি একবার চক্ষু খুলিয়া দেখুন দেখি। বিনা সংস্কারে ইহা আর কত দিন থাকিতে পারে? এত দিন যে ইহা ধূলিসাৎ হয় নাই, তাহা কেবল ভগবানের দয়া মাত্র। আর কিছু দিন এই ভাবে থাকিলে ইহার দ্বার রুদ্ধ করিতে হইবে, এবং ক্রমশঃ ইহা পুরাবৃত্তের অতীত স্মৃতির নিদর্শন হইয়া দাঁড়াইয়া থাকিবে। বল দেখি ভাই কয়জন ব্রাহ্মের হৃদয়ে ইহার জন্য এক বিন্দুও অশ্রুকণা সঞ্চারিত হইয়াছে?

কথাটা আদিব্রাহ্মসমাজ লইয়া বলা হইল মাত্র, কিন্তু ইহা অল্পবিস্তর সকল সমাজের প্রতি প্রয়োজ্য হইতে পারে। মফঃস্বলের সমাজের ত কথাই নাই। মফঃস্বলের অনেক মন্দির এখন জীবজন্তুর আশ্রয়স্থান রূপে পরিণত হইয়াছে। ফল কথা আমার বলিবার উদ্দেশ্য এই যে, বর্ত্তমান সময়ে ব্রাহ্মগণের মধ্যে ব্রাহ্মসমাজের প্রতি তত শ্রদ্ধা ভক্তি ও আগ্রহ দেখা যায় না; ব্রাহ্মসমাজের জন্য ব্রাহ্মদের প্রাণ আর পূর্ব্বের ন্যায় কাঁদে না, পূর্ব্বের ন্যায় ব্যাকুল হয় না। ইহার কারণ কি? আমরা এখন ব্রহ্মের পবিত্র আসনে স্বার্থকে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছি! বিশুদ্ধ প্রেমের পরিবর্ত্তে সাম্প্রদায়িকতাকে আমাদের পূজার পুরোহিত করিয়াছি!

অনেকে এখন বলিতে আরম্ভ করিয়াছেন যে, ব্রাহ্মসমাজের কার্য্য হইয়া গিয়াছে। ব্রাহ্মসমাজের এখন আর আবশ্যকতা নাই! ইহা কি সত্য? আমার বিশ্বাস, দেশের—পৃথিবীর অবস্থা বর্ত্তমান সময়ে এমন হইয়া দাঁড়াইয়াছে যে, এখন ব্রাহ্মসমাজের আবশ্যকতা পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর বর্দ্ধিত হইয়াছে। যাহারা অন্ধ, তাহারাই ব্রাহ্মসমাজের আবশ্যকতা দেখিতে পায় না। ব্রাহ্মসমাজ সার্ব্বজনীন ধর্ম্মসমাজ। ইহা এক জাতি, এক সম্প্রদায় বা এক দেশের সমাজ নহে। ব্রাহ্মসমাজ সমস্ত মানবসমাজের মঙ্গলের জন্য প্রতিষ্ঠিত। গৃহপ্রেম যে বিশ্বপ্রেমের মূল অনেকে তাহা ভুলিয়া যান। এই গৃহপ্রেমের বিস্তারই বিশ্বপ্রেম। নিজের গৃহকে উচ্ছেদ করিলে, আপন ব্যক্তিকে অনাহারে মারিলে, প্রকৃত প্রেম প্রকাশ পাইতে পারে না। বিশ্বপ্রেম নিকট হইতে উত্থিত হইয়া, নিকটকে সঙ্গে লইয়া দূর পর্য্যন্ত বিস্তারিত হইয়া, সমগ্র বিশ্বসংসারের অণুপরমাণুর উপর সমভাবে ব্যাপ্ত হয়। বিশ্বপ্রেম ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র ব্যক্তি বা বস্তুকে উপেক্ষা করিতে পারে না। আপনার দেশ, আপনার জাতি, আপনার আত্মীয়স্বজন, আপনার সমাজকে অন্ধকারের নিভৃত কক্ষে আবদ্ধ রাখিয়া দূরের অন্ধকার দূর করিতে যাওয়া দূরদর্শীর কার্য্য নয়। ব্রাহ্মসমাজ বিশ্বপ্রেমের তরণী। আমার বিশ্বাস, যেদিন জগত হইতে এই সার্ব্বজনীন ব্রাহ্মধর্ম্ম চলিয়া

যাইবে সেদিন জগত শ্মশানে পরিণত হইবে, মহাপ্রলয়ের ধ্বংসকারিণী ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি চতুর্দ্দিকে তাণ্ডব নৃত্য করিতে থাকিবে।

আজ তাই এই বিশ্বাসের অনুবর্ত্তী হইয়া বৎসরান্তে আবার এই কাতর প্রার্থনা লইয়া আপনাদিগের নিকট উপস্থিত হইয়াছি। ব্রাহ্মগণ আবার জাগ্রত হও, আবার স্বার্থ, সংকীর্ণতা এবং সাম্প্রদায়িকতার গণ্ডীর বাহির হইয়া ভায়ে ভায়ে ভগ্নীতে ভগ্নীতে পবিত্র বিমল প্রেমের বন্ধনে বদ্ধ হইয়া, জীবন সার্থক কর। একবার আত্মপর ভুলিয়া সমস্ত জগতকে আপন বক্ষে স্থান দিবার জন্য ক্রোড় প্রসারণ কর। চারিদিকে আবার এই সার্ব্বজনীন ব্রাহ্মধর্ম্মের ভেরীধ্বনি আকাশভেদ করিয়া উত্থিত হউক। সকল সমাজ মিলিয়া, সকল প্রাণ মিলিয়া আবার একতানে গাইয়া উঠ—

গাও রে আনন্দে সবে
জয় ব্রহ্ম জয়।

ভট্টনারায়ণপরিচয়।

(শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর)

১২০। ভট্টনারায়ণের সাধারণ পরিচয়।

বিভিন্ন গ্রন্থে আমরা কুলগ্রন্থসমূহের যে সকল কারিকা উদ্ধৃত দেখি, তন্মধ্যে অধিকাংশ কারিকাতে ভট্টনারায়ণ ও তাঁহার বংশের মহিমা সুকীর্ত্তিত দেখি। ইহা হইতে অনুমান হয় যে, পুত্রেষ্টি যজ্ঞে সমানীত পঞ্চব্রাহ্মণের মধ্যে ভট্টনারায়ণ কিছু বিশেষ খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন। হরিমিশ্রও আমাদের এই অনুমান সমর্থন করিয়া বলেন যে, পাঁচ গোত্রের যে পাঁচ ব্রাহ্মণ আসিয়াছিলেন, তন্মধ্যে শাণ্ডিল্যগোত্রীয় মুনিশ্রেষ্ঠই মান্যতম হইয়াছিলেন (১)। বাচস্পতি মিশ্র ভট্টনারায়ণকে "কবি" (২) ও "লোকবিখ্যাত" (৩) বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। প্রেমবিলাসে ক্ষিতীশের সাত পুত্র উক্ত হইয়াছেন (৪); কিন্তু কুলতত্ত্বার্ণবে ক্ষিতীশের ভট্টনারায়ণপ্রমুখ "বেদবিশারদ" পঞ্চপুত্রের উল্লেখ আছে (৫)। ক্ষিতীশবংশাবলীচরিতং গ্রন্থে ভট্টনারায়ণকে "কান্যকুব্জে বিদিতপ্রভাব ক্ষিতীশনামক নরেন্দ্রপুত্র" বলা হইয়াছে (৬)। ভট্টনারায়ণ রাজপুত্র ছিলেন বলিয়া মনে হয় না; তবে মনে হয় যে তিনি বেশ একটু ধনবান ছিলেন, এবং সেই সূত্রে "ক্ষিতীশ" শব্দের অর্থ ধরিয়া তাঁহাকে "নরেন্দ্র"-পুত্র বলা হইয়াছে। এডুমিশ্র এবং মহেশ তাঁহাকে "মুনি" বলিয়াছেন (৭)। মহেশ বলেন—ভট্টনারায়ণ বেদবিদ্যাতে কাহা অপেক্ষাও হীন ছিলেন না, এবং সামবেদে বিশ্রুতগৌরব ছিলেন (৮)। তিনি যজ্ঞনিপুণ এবং তিন বেদে পারদর্শী ছিলেন (৯)। সমাগত পঞ্চব্রাহ্মণের মধ্যে ভট্টনারায়ণ একটু তেজস্বী ছিলেন বলিয়া মনে হয়। ক্ষিতীশবংশাবলীচরিতং গ্রন্থে আছে—যজ্ঞ সমাপনান্তে রাজা পঞ্চব্রাহ্মণকে দীক্ষণাদি দ্বারা সন্তুষ্ট করিয়া যখন স্বরাজ্যে বাস করিবার জন্য অনুরোধ করিলেন, তখন উত্তরের জন্য সকলে ভট্টনারায়ণেরই মুখের দিকে তাকাইয়া রহিলেন। অনন্তর তাঁহার ইঙ্গিতে সকলে সম্মতি জ্ঞাপন করিলে রাজা বহু সৌধাদির দ্বারা পুরপঞ্চক গড়িয়া তুলিলে তাঁহারা সেখানে এক বৎসরকাল বাস করিলেন। পরে ভট্টনারায়ণের নানা কার্য্যে লোকাতীত ক্ষমতা দেখিয়া রাজা তাঁহাকে কয়েকটী গ্রাম দিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। কিন্তু তেজস্বী ভট্টনারায়ণ যজ্ঞান্তে যথারীতি দক্ষিণাস্বরূপে গ্রাম বা ধনরত্ন গ্রহণ করিলেও রাজার অনুগ্রহদানস্বরূপে কোন গ্রাম লইবার অক্ষমতা জানাইয়া কিছু-না-কিছু মূল্য দিয়া সেই গ্রাম ক্রয় করিতে সম্মত হইলেন (১০)। এরূপ কথা পঞ্চব্রাহ্মণের অন্য কোনও ব্রাহ্মণ সম্বন্ধে উঠে নাই, এবং বোধ হয়, ভট্টনারায়ণের মানসিক তেজস্বিতা সম্বন্ধে কোন-না কোন প্রকার কিম্বদন্তী না চলিয়া আসিলে তাঁহার সম্বন্ধে এ প্রকার কথার প্রতিধ্বনিও উঠিতে পারিত না।

১২১। ভট্টনারায়ণের পূর্ব্বপুরুষ।

শাণ্ডিল্যগোত্রে দ্বিতীয় বেদব্যাসতুল্য কলিব্যাস নামক এক ব্যক্তি জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার পুত্র বামদেব; তাঁহার পুত্র মহাদেব;

(১) ব্রা০ কা০ ১০০ পৃঃ
(২) ব্রা০ কাং ১০২ পৃঃ। (৩) স০ নি০ ৫০০ পৃঃ।
(৪) প্রে০ বি০ ২৬৩ পৃঃ। (৫) কু০ তং ৮৭ শ্লোক।
(৬) ক্ষিঃ ব০৪ পৃঃ।
(৭) স০ নি০ ৫০০ পৃঃ।
(৮) স০ নি০ ৫০৬। (৯) স০ নি০ ৫০৭।
(১০) ক্ষি০ ব০ ৪ পৃঃ।

তাঁহার পুত্র ক্ষিতীশ। মুদ্রিত কুলতত্ত্বার্ণবে, বামদেবের পুত্র ক্ষিতীশ এবং ভট্টনারায়ণকে ক্ষিতীশের জ্যেষ্ঠপুত্র বলিয়া উল্লেখ আছে। এই ক্ষিতীশ (সম্ভবত দশম শতাব্দীর মাঝামাঝি) গৌড়ে আসিয়াছিলেন (১১)। কলিব্যাস সম্ভবত তাঁহার সময়ে একজন প্রসিদ্ধ লেখক ও গ্রন্থকার ছিলেন। কিন্তু দুঃখের বিষয়, তাঁহার কোন গ্রন্থই এখন পাওয়া যায় না। প্রেমবিলাস বলেন, ক্ষিতীশের সাত পুত্র—দামোদর, ভট্টনারায়ণ, শৌরি, শঙ্কর, বিশ্বম্ভর, লোকারণ্য ও হিরণ্য (১২)। হরিমিশ্র বলেন—ক্ষিতীশের সর্ব্বগুণান্বিত অনেক পুত্র জন্মিয়াছিলেন—দামোদর, শৌরি, মহামতি বিশ্বেশ্বর, লোকবিখ্যাত শঙ্কর এবং ভট্টনারায়ণ (১৩)। কুলতত্ত্বার্ণবের মতে ক্ষিতীশের সর্ব্বগুণান্বিত পাঁচ পুত্র জন্মগ্রহণ করেন—সর্ব্বজ্যেষ্ঠ ও সুপণ্ডিত ভট্টনারায়ণ, দামোদর, বিশ্বেশ্বর, মহামতি শৌরি এবং লোকবিখ্যাত শঙ্কর ১৪)। বাচস্পতি মিশ্রও ক্ষিতীশের ৫ পুত্র নির্দ্দেশ করিয়াছেন (১৫)। তন্মধ্যে মহেশ্বর তাঁহার কুলপঞ্জিকায় (১৬) বলেন যে, দামোদর বারেন্দ্র, শৌরি দাক্ষিণাত্য, বিশ্বম্ভর বৈদিক, শঙ্কর পাশ্চাত্য এবং ভট্টনারায়ণ রাঢ়ী হইয়াছিলেন। এড়ু মিশ্র কুলপঞ্জিকা সমর্থন করিয়াছেন এবং বলেন যে ভট্টনারায়ণ আনুগঙ্গ প্রদেশ দেখিয়া সহযোগী চারজনের সঙ্গে রাঢ়দেশে প্রবেশ করিলেন।

১২২। পঞ্চব্রাহ্মণ সাতশতী কন্যা বিবাহ করেন কি না?

কাহারো কাহারো মতে পঞ্চব্রাহ্মণ অতিরিক্ত আনুগঙ্গ পঞ্চগ্রাম পাইবার পর বঙ্গদেশে বসতি করিবার সঙ্গে সঙ্গে বঙ্গদেশের পূর্ব্ববাসিন্দা সপ্তশতী ব্রাহ্মণদিগের কন্যা বিবাহ করিয়াছিলেন। বারেন্দ্রকুলপঞ্জিকায় আছে যে, রাজা ভাবিলেন যে, পঞ্চব্রাহ্মণের স্কন্ধে সাতশতী কন্যা চাপাইয়া দিতে পারিলে তাঁহারা আর এদেশ ছাড়িয়া স্বদেশে ফিরিয়া যাইতে চাহিবেন না। ইহা ভাবিয়া তিনি সাতশতী ব্রাহ্মণগণকে পঞ্চব্রাহ্মণের করে কন্যা সমর্পণ করিতে অনুরোধ করিলে তাঁহারা সানন্দে পঞ্চব্রাহ্মণকে কন্যাদান করিলেন, এবং পঞ্চব্রাহ্মণ সাতশতীকন্যাগণের গর্ভে পুত্র উৎপাদন করিলেন। ইহা অবশ্য সম্ভবপর এবং নুলো পঞ্চানন আমাদের এই অনুমান সমর্থন করেন যে, উত্তরকালে পঞ্চব্রাহ্মণের সন্তানেরা সাতশতী ব্রাহ্মণদের সঙ্গে বিবাহাদির দ্বারা অনেকটা মিশিয়া গিয়াছিলেন (১৭)। কিন্তু সাতশতী কন্যা দিয়া পঞ্চব্রাহ্মণকে বাঁধিয়া রাখিবার আখ্যায়িকা নিতান্তই অসম্ভব বলিয়া মনে হয় (১৮)। আমরা ইতিপূর্ব্বেই দেখিয়া আসিয়াছি যে পঞ্চব্রাহ্মণ যখন বঙ্গে আসেন, তখন শ্রীহর্ষের বয়স ৯০ বৎসর, ভট্টনারায়ণের বয়স ৮০ বৎসর এবং বেদগর্ভের বয়স ৬০ বৎসর। যাঁহারা জীবনের শেষ ভাগে আসিয়া পরলোকের সম্মুখে দণ্ডায়মান এবং যাঁহাদের নাম সমস্ত কুলগ্রন্থে একবাক্যে সম্ভ্রমের সহিত ঋষিকল্প, মুনি প্রভৃতি বিশেষণসহ উল্লিখিত হইয়াছে, সেই সকল মহাপুরুষদিগের সম্বন্ধে স্ত্রীলোকের প্রলোভনে বিমূঢ়চিত্ত হইয়া আবদ্ধ থাকিবার আখ্যায়িকা কেবল অসম্ভব নহে, কিন্তু নিতান্ত হাস্যকর এবং রচয়িতার সহজজ্ঞানের অভাবের সম্যক পরিচয় (১৯)। তবে উত্তরকালে পঞ্চব্রাহ্মণের সন্তানগণ যে সাতসতী কন্যা গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহা নুলো পঞ্চাননের কারিকা হইতে অনুমিত হয় (২০)।

১২৩। এবিষয়ে যুক্তি ও খণ্ডন।

এ বিষয়ে কুলপঞ্জিকাকার যে স্বপক্ষে কাহাকেও পান না তাহা নহে। যাঁহারা তাঁহাকে সমর্থন করেন, তাঁহাদের দুইটী প্রধান যুক্তি শোনা যায়। তাঁহাদের প্রথম যুক্তি এই যে, বঙ্গদেশে

(১১) ব্রা০ কা০ ১ ৩ পৃঃ; কুলরমা—স০ নি০ ২৯১-২ পৃঃ।
(১২) প্রে০ বি০ ২৬৩ পৃঃ।
(১৩) ব্রা০ কা০ ১০৩ পৃঃ। (১৪) কু০ ত০ ২৫০-৫১ শ্লোক
(১৫) স০ নি০ ৫০০। (১৬) স০ নি০ ৫০০।

(১৭) স০ নি০
(১৮) সং নি০। বিদ্যানিধি মহাশয়ও এই যুক্তি বিভিন্ন প্রণালীতে খণ্ডন করিয়াছেন।
(১৯) পঞ্চব্রাহ্মণ সম্বন্ধে মহেশ্বর বল্লালসেনকে বলিয়াছিলেন—
তাঁরা সাগ্নিক দ্বিজ, চন্দন বিষ্ঠা সম।
আর ষড়ৈশ্বর্য্যে ধনী, ইন্দ্রিয় সংযম ॥ ৩০
তাঁদের সাধ্য ছিল দোষের পরিপাকে।
জগৎ কুটুম্বী, আত্মবৎ ভাবে যাকে তাকে ॥ ৩১
গোষ্ঠীকথা স০ নি০ ৫৮৭ পৃঃ
(২০) কানাকুব্জ তেজীয়ান লয় সাতশতী।
মূর্খ নিন্দুক দেখুক, তার কি যে ক্ষতি।
সাতশতীর প্রভা, কানাকুব্জের আভা।
মণি কাঞ্চনবিভা স্ফটিকে জবাশোভা॥
নুলো পঞ্চাননের ২য় কারিকা স০ নি০ ৩৬৭

(ক) বঙ্গদেশে সামবেদীর প্রসার।

সপ্তশতীরাই একমাত্র সামবেদী ছিলেন (২১); পঞ্চব্রাহ্মণ বিভিন্ন বেদী হইলেও তাঁহাদের সন্তানেরা উত্তরকালে কেবলমাত্র সামবেদী হইলেন কিপ্রকারে? নিশ্চয়ই মাতুল সপ্তশতী ব্রাহ্মণদিগের প্রভাবে (২২)। এই যুক্তি নিরপেক্ষ বিচারে দাঁড়াইতে পারে বলিয়া মনে হয় না। আমরা পঞ্চব্রাহ্মণ কোন্ বেদী আলোচনা করিবার কালে দেখিয়া আসিয়াছি যে, কুলগ্রন্থকারগণ স্পষ্ট বলিয়াছেন যে, তাঁহারা বিভিন্ন বেদে অভ্যস্ত থাকিলেও সামবেদে লব্ধগৌরব ছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে নামেমাত্র কেহ চতুর্ব্বেদী হইলেও সম্ভবত সামবেদেরই সমধিক অনুরাগী ছিলেন। পরে তাঁহাদের সন্তানেরা নানাপ্রকারে সাতশতী ব্রাহ্মণদিগের সংশ্রবে আসিয়া, বিশেষত তাঁহাদের পৌরোহিত্যের কবলে আসিয়া দায়ে পড়িয়া ক্রমশ সম্পূর্ণরূপে সামবেদী হইয়া পড়িলেন, আমাদের ইহাই অনুমান হয়।

(খ) বংশবিস্তার

তাঁহাদের দ্বিতীয় যুক্তি এই যে, পঞ্চব্রাহ্মণ যখন স্বদেশে জ্ঞাতিপরিত্যক্ত হইয়া এদেশে আসিলেন, তখন তাঁহাদের যে ৫৬ পুত্র এক একটী গ্রাম পাইয়া গ্রামীণ বা "গাঁই" সংজ্ঞা লাভ করিয়াছিলেন বলিয়া কুলগ্রন্থে উক্ত হইয়াছে, সেই ৫৬ পুত্র আসিলেন কোথা হইতে? সপ্তশতী কন্যা বিবাহ করিয়া ঐ ৫৬ পুত্র উৎপাদন করিলে তবেই দু'দশ বৎসরে ঐ পঞ্চ ব্রাহ্মণের না হয় ৫৬ পুত্র হইয়াছিল ধরা যাইতে পারে (২৩)। ইহার প্রতিবাদে আমরা প্রথমেই বলিতে চাই যে, পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, আদিশূরের সভায় ভট্টনারায়ণ প্রভৃতি ৯৯৯ সম্বতে যখন আসেন, তখনই তাঁহাদের মধ্যে অন্তত তিন জন খুবই বয়োবৃদ্ধ ছিলেন—শ্রীহর্ষের ৯০ বৎসর, ভট্টনারায়ণের ৮০ বৎসর এবং দক্ষের ৬০ বৎসর হইয়াছিল। আদিশূরের জীবিতাবস্থায় পঞ্চব্রাহ্মণের পুত্রেরা "গাঁই" সংজ্ঞা পাইয়াছিলেন বলিয়া দেখা যায় না। আদিশূর যদি ১০০৯ সম্বতে অর্থাৎ পঞ্চব্রাহ্মণের আগমনের প্রায় ১০ বৎসর পরে পরলোক গমন করিয়া থাকেন, তবে তো আদিশূরের মৃত্যুকালে বা ভূশূরের সিংহাসন আরোহণকালে শ্রীহর্ষের বয়স ১০০ এবং ভট্টনারায়ণের বয়স ৯০ এবং দক্ষের বয়স ৭০ হইয়াছিল। যতদূর দেখা যায়, তাহাতে মনে হয়, আদিশূরের দেহান্তের পরে ধর্ম্মপাল কর্ত্তৃক ভূশূর পৌণ্ড্রবর্দ্ধন হইতে বিতাড়িত হইয়া রাঢ়ে ফিরিয়া আসিলে পর "গাঁই"য়ের সৃষ্টি হইয়াছিল। এই কারণেই বোধ হয় রাঢ়ীদের ন্যায় বারেন্দ্রদিগের ভিতর "গাঁই"য়ের এপ্রকার প্রবল প্রভাব দৃষ্ট হয় না। সুতরাং পঞ্চব্রাহ্মণের ঐ বয়সে দশ পনেরো বৎসরের ভিতর ৫৬টি পুত্র হওয়া অসম্ভব ছিল। প্রেমবিলাস গ্রন্থে এই সমস্যার আরও সুস্পষ্ট মীমাংসা করিয়া দেওয়া হইয়াছে। পঞ্চব্রাহ্মণের প্রত্যেকের সম্বন্ধে উক্ত গ্রন্থ কি মীমাংসা করা হইয়াছে দেখাইতে গেলে গ্রন্থ বড়ই বিস্তৃত হইয়া পড়িবে। আমরা তাই কেবল দৃষ্টান্তস্বরূপে ভট্টনারায়ণ সম্বন্ধেই প্রেমবিলাসগ্রন্থের মীমাংসা আলোচনা করিয়া দেখিব। প্রেমবিলাস স্পষ্টরূপে ভট্টনারায়ণের ২১ পুত্র উল্লেখ ও তাঁহাদের নাম নির্দ্দেশ করিলেও অন্যান্য গ্রন্থে তাঁহার ১৬ পুত্র বলিয়াই উল্লেখ আছে। ধ্রুবানন্দের মিশ্রী গ্রন্থে আছে—ভট্টনারায়ণের ১৬ পুত্র (২৪)। কুলদীপিকা ও আনন্দভট্টকৃত বল্লালচরিত ধরিয়া সম্বন্ধনির্ণয় ভট্টনারায়ণের ১৬ পুত্র বলেন। ইহা ঠিক নহে। উপরোক্ত দুই গ্রন্থে কেবলমাত্র যে ১৬ পুত্র গাঁই হইয়াছিলেন, তাঁহাদিগেরই নাম উল্লেখ করা হইয়াছে।

১২৪। ভট্টনারায়ণের কয় পত্নী ও কয় পুত্র।

সত্য কথা বলিতে কি, প্রেমবিলাস গ্রন্থে, কি কারণে জানি না, ভট্টনারায়ণ ব্যতীত অপর চারি জন ব্রাহ্মণের পুত্রগণসম্বন্ধে সাধারণত "পুত্রগণ" বলিয়া বলা হইয়াছে, কিন্তু একমাত্র ভট্টনারায়ণের স্ত্রীপুত্র সম্বন্ধেই গ্রন্থকার বিশেষভাবে উল্লেখ করিয়া উপরোক্ত সমস্যার সুন্দর সমাধান করিয়াছেন। প্রেমবিলাস বলেন—ভট্টনারায়ণের তিন পত্নী ছিলেন, এবং সেই তিন পত্নীর গর্ভে ২১ পুত্র জন্ম-

(২১) সং নিং।
(২২) ব্রাং কাং ৮৫ পৃঃ। বিদ্যানিধি মহাশয়ও এই যুক্তি বিভিন্ন প্রণালীতে খণ্ডন করিয়াছেন।
(২৩) সং নিং।
(২৪) ভট্টতঃ ষোড়শোদ্ভূতা—ধ্রুবানন্দের মিশ্রী গ্রন্থ সং নিং ২০পৃঃ।

গ্রহণ করেন (২৫)। প্রথম স্ত্রীর গর্ভে ৫ জন, দ্বিতীয়ার গর্ভে ১০ জন এবং তৃতীয়ার গর্ভে ৬ জন জন্মেন।

১২৫। প্রথম পত্নীর গর্ভজাত কে ?

প্রথম পত্নীর গর্ভে ৫জন জন্মগ্রহণ করেন— আদি গাঁই ওঝা, আদিবিভাকর, আদিনাথ, আদিদেব এবং আদিভাস্কর। কেহ কেহ বলেন— "আদিগাঁই ওঝা সর্ব্বপ্রথম গ্রাম পাইয়া গ্রামীণ হইয়াছিলেন বলিয়া "আদিগাঁই" নামে খ্যাত হইয়াছিলেন। আমরা কিন্তু তাহা মনে করি না। আমরা দেখি যে, ভট্টনারায়ণের প্রথম স্ত্রীর গর্ভজাত পাঁচ পুত্রেরই নামের সহিত "আদি"শব্দ সংযুক্ত আছে। কেবল তাহাই নহে, তাঁহার দ্বিতীয় পত্নীরও গর্ভজাত পুত্রগণের মধ্যে সর্ব্বজ্যেষ্ঠের নাম হইতেছে আদিবরাহ। ইহা হইতে বোধ হইতেছে, বঙ্গদেশে আসিবার পূর্ব্বেই তাঁহার ঐ সকল পুত্রের ঐরূপ নামকরণই হইয়া গিয়াছিল।

১২৬। দ্বিতীয় পত্নীর গর্ভজাত কে ?

দ্বিতীয় পত্নীর গর্ভে দশ পুত্র জন্মগ্রহণ করেন— আদিবরাহ, নানো, গুপ্ত, মহামতি, গুণ, সহ, বটুক, শুভকান, নিল্লো এবং গুই।

১২৭। তৃতীয় পত্নীর গর্ভজাত কে ?

তৃতীয় পত্নীর গর্ভে ছয় পুত্র জন্মগ্রহণ করেন— রাম, বিভু, গণ, নীপ, বিক এবং মধুসূদন।

এইরূপে আমরা দেখি যে, ভট্টনারায়ণের পশ্চিমদেশীয় তিন পত্নীরই গর্ভে ২১টী পুত্র জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। এই অবস্থায় ভট্টনারায়ণের ৮০ বৎসর বয়সে পুনরায় এদেশের সপ্তশতী কন্যার সহিত চতুর্থ পক্ষ করিবার কথা নিতান্তই হাস্যকর নহে কি ? ঋষিতুল্য পূর্ব্বপুরুষের প্রতি নিতান্ত অপমানজনক নয় কি ?

১২৮। তৃতীয় পত্নী সপ্তশতীকন্যা হওয়া সম্ভব কি না ?

ভট্টনারায়ণের প্রথম দুই পত্নী তো সপ্তশতীকন্যা নয়ই ; তাঁহার তৃতীয় পত্নী সপ্তশতী কন্যা হওয়া সম্ভব কি না ? আমাদের মতে তাহাও সম্ভব নহে। প্রেমবিলাস গ্রন্থে আমরা দেখি, ভট্টনারায়ণের একুশ পুত্রের মধ্যে প্রথম পত্নীজাত পাঁচ পুত্র বরেন্দ্রে ছিলেন এবং বাকী ষোল পুত্র রাঢ়ে গিয়া বাস করেন (২৬)। আমরা উপরে দেখিয়া আসিয়াছি—প্রেমবিলাসের মতে ক্ষিতীশ প্রভৃতি পঞ্চব্রাহ্মণের ভট্টনারায়ণ প্রভৃতি ৫৬টী পুত্র— ক্ষিতীশের ৭, বীতরাগের ১২, সুধানিধির ৭, মেধাতিথির ১৮, এবং সৌভরির ১২ (২৭)। কুলতত্ত্বার্ণবের মতে ক্ষিতীশ প্রভৃতির ২৩টী পুত্র—ক্ষিতীশের ৫, বীতরাগের ৪, সুধানিধির ২, মেধাতিথির ৮, এবং সৌভরির ৪ (২৮)। আমরা ইতিপূর্ব্বে যথাস্থানে আলোচনা করিয়া দেখিয়াছি যে, ক্ষিতীশ প্রভৃতির পুত্রগণের মধ্যে যাঁহারা বিশেষ খ্যাতিলাভ করিয়াছিলেন, তাঁহাদেরই নাম কুলতত্ত্বার্ণবে স্থান প্রাপ্ত হইয়াছে। আদিশূরের পুত্র ভূশূর যখন ধর্ম্মপাল কর্ত্তৃক পৌণ্ড্রবর্দ্ধন বা বরেন্দ্রভূমি হইতে বিতাড়িত হন, কুলতত্ত্বার্ণবের মতে তখন ক্ষিতীশ প্রভৃতি পঞ্চব্রাহ্মণের ৫৬ পুত্রই হউক বা ২৩ পুত্রই হউক সেই পুত্রগণের মধ্যে ভট্টনারায়ণপ্রমুখ মাত্র পাঁচ ব্রাহ্মণই ভূশূরের সঙ্গে রাঢ়ে চলিয়া আসেন (২৯)। পুত্রেষ্টি যজ্ঞের পর ভট্টনারায়ণ ২৩ বৎসর জীবিত থাকিয়া (৩০) ১০৩ বৎসর বয়সে উপরত হন। যাঁহারা বলেন যে, আদিশূর ক্ষিতীশ প্রভৃতি বা ভট্টনারায়ণ প্রভৃতি যে পঞ্চব্রাহ্মণকে সাতশতকন্যা দেওয়াইয়াছিলেন, তাঁহারা বলেন যে, সেই পঞ্চ ব্রাহ্মণের ৫৬ পুত্রকে ৫৬টী গ্রাম দিয়া গ্রামীণ বা "গাঁই" করিয়া দিয়াছিলেন। আদিশূর যদি ৯৯৯ সম্বতে পুত্রেষ্টি যজ্ঞের পরবৎসরের মধ্যেই পরলোক গমন করিয়াছিলেন ধরা যায়, তাহা হইলে তো এ সকল কথাই উঠিতে পারে না, কারণ কথিত আছে যে, সেই পঞ্চব্রাহ্মণ স্বদেশে গিয়া সেখান হইতে ফিরিয়া আসিলে তবে সাতশতীকন্যা দান করা হইয়াছিল—এদেশে ফিরিয়া আসিতে কোন্ না তিন চার বৎসর লাগিয়াছিল ? আর যদি ধরা যায় যে, যজ্ঞের ১০ বৎসর বাদে ১০০৯ সম্বতে আদিশূর উপরত হন, তাহা হইলেও তিন চার বৎসর বাদে সেই পঞ্চব্রাহ্মণ ফিরিয়া আসিলে বাকী পাঁচ ছয় বৎসরের ভিতর পঞ্চব্রাহ্মণের সহিত সাতশতীকন্যা বিবাহ দেওয়াইয়া তাঁহাদের ৫৬টী পুত্র দেখিয়া,

(২৫) প্রে০ বি০ ২৬৪পৃঃ।

(২৬) প্রে০ বি০ ২৬৭পৃঃ।

(২৭) প্রে০ বি০ ২৬৩পৃঃ।

(২৮) কু০ ত০ ৮৭—৯২শ্লোক।

(২৯) কু০ ত০ ১৮শ্লোক।

(৩০) ক্ষি০ব ৫পৃঃ।

অন্তত ভট্টনারায়ণের ছয় পুত্র দেখিয়া, তাঁহাদিগকে গ্রামীণ করিয়াছিলেন, অথবা ভট্টনারায়ণের ঐ ছয় বৎসরে প্রতি বৎসর একটী করিয়া সন্তান জন্মিয়াছিল ধরিতে হয়। ইহার স্বাভাবিক অসম্ভবত্ব স্পষ্ট উপলব্ধ হইবে। তদ্ব্যতীত, একদিকে কুলতত্ত্বার্ণবে দেখি যে, ভূশূর কর্ত্তৃক রাঢ়দেশে আনীত ভট্টনারায়ণপ্রমুখ ঐ পঞ্চব্রাহ্মণের (পুত্রগণের মধ্যে) যে ৫৬ পুত্র রাঢ়ে বাস করিয়াছিলেন, ভূশূরের পুত্র ক্ষিতিশূর সেই ৫৬ পুত্রকে ৫৬টী গ্রাম দিয়াছিলেন (৩১)। অপর দিকে, প্রেমবিলাস বলেন, বল্লাল সেনের সময়ে পঞ্চগোত্রীয় ব্রাহ্মণদের সঙ্গে সপ্তশতী ব্রাহ্মণদের আদানপ্রদান হইয়াছিল (৩২)। এই সকল কথার ভিতর যতটুকু সত্য থাক, ইহা হইতে আমরা অন্তত এটুকু সুস্পষ্ট উপলব্ধি করিতেছি যে, ভট্টনারায়ণের তৃতীয় পত্নীকেও কথনই সপ্তশতীকন্যা বলিয়া ধরা যাইতে পারে না।

১২৯। ভট্টনারায়ণের পুত্র।

ভট্টনারায়ণ গ্রাম প্রভৃতি পাইবার পর ২৪ বৎসর উহা নির্ব্বিঘ্নে ভোগ করিয়াছিলেন। তাঁহার ষোল পুত্রের নাম ক্ষিতীশবংশাবলীচরিতং গ্রন্থে দেখি—আদিবরাহ, বাটু, বাম, নান, নীপু, গুই, গুণ্টু, অশাস্ত্র, গুণ, বিক, অনিল, মধু, কাম, দেব, সোম, অদীন। এই গ্রন্থের সংস্করণকর্ত্তা জর্ম্মাণ পণ্ডিত হইলেও আমার মনে হয় যে, অন্তত ভট্টনারায়ণের ষোল পুত্রের নামে কিছু ভুল করিয়াছেন। যাই হউক, ভট্টনারায়ণের মাত্র ষোল পুত্র যে গাঁই হইয়াছিলেন, তাহা বুঝিতে পারিতেছি—নাম ও উপাধি লইয়া বিভিন্ন গ্রন্থে কিছু কিছু পার্থক্য দেখি। ক্ষিতীশবংশাবলীচরিতং-রচয়িতা বিনয়ী বলেন যে, উক্ত ষোল পুত্রের সকলেই সদাচারী, বিদ্বান ও সর্ব্বমান্য ছিলেন। তন্মধ্যে প্রথম চারি পুত্র বিষয়ে অত্যন্ত অনাসক্ত ছিলেন। তাঁহারা স্নেহাধিক্যবশত দয়াশীল পঞ্চম পুত্র নীপুকে রাজনীতিকুশল ও বিষয়রক্ষণে সক্ষম দেখিয়া তাঁহাকেই নিজেদের রাজ্যে অভিষিক্ত করিলেন। নীপু কেশর গ্রামে সুন্দর নগর নির্ম্মাণ করিয়া নানাবিধ ক্রিয়াকর্ম্মতৎপর হইয়া যথাধর্ম্ম ২৮ বৎসর প্রজাপালন করিয়াছিলেন। সেই অবধি নীপুর বংশ কেশরগ্রামী বলিয়া প্রসিদ্ধ হইলেন (৩৩)।

(৩১) কু০ ত০ ১০০শ্লোক।
(৩২) প্রে০ বি০ ২৬৫পৃঃ।

১৩০। ভট্টনারায়ণ গ্রন্থকার।

কুলগ্রন্থে ভট্টনারায়ণকে মুনিসত্তম, সর্ব্বশ্রেষ্ঠ প্রভৃতি মহত্ত্বব্যঞ্জক নানা বিশেষণে বিশেষিত করিলেও কোথাও তাঁহাকে গ্রন্থকার বলিয়া অভিহিত দেখি না। কিন্তু "ঠাকুরগোষ্ঠীর সংক্ষিপ্ত বিবরণ" পুস্তিকায় এবং অন্যান্য পুস্তকে তাঁহাকে অনেকগুলি গ্রন্থের রচয়িতা বলা হইয়াছে। উক্ত পুস্তিকায় তাঁহার রচিত বলিয়া চারিখানি গ্রন্থের উল্লেখ আছে—কাশীমরণ-মুক্তিবিচার, প্রয়োগরত্ন (ক্রিয়াকলাপসংক্রান্ত), বেণীসংহার নাটক এবং গোভিলসূত্রভাষ্য। ভট্টনারায়ণের রচিত বলিয়া যে সকল গ্রন্থ শ্রুত আছে, তন্মধ্যে বেণীসংহার নাটকই সর্ব্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ। আমরা জানি না, এই বেণীসংহার নাটককে শাণ্ডিল্যগোত্রীয় ক্ষিতীশপুত্র ভট্টনারায়ণ রচিত বলিয়া নিশ্চিতরূপে ধরিতে পারি কি না। সুপ্রসিদ্ধ পণ্ডিতপ্রবর জগন্মোহন তর্কালঙ্কার মহাশয় তাঁহার সংস্করণের মুখবন্ধে যতদূর বুঝা যায়, বেণীসংহারপ্রণেতা ভট্টনারায়ণকে ভট্ট রামেশ্বরসুত বলিয়া ইঙ্গিত করিয়াছেন। কিন্তু গ্রন্থের মধ্যে গ্রন্থকার নিজ গ্রন্থকে "মৃগরাজলক্ষ্মণ কবি ভট্টনারায়ণের রচিত" বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন (৩৪)। এ পর্য্যন্ত অপর কোন ব্যক্তিকে ঠিক "ভট্টনারায়ণ" রূপে পরিচিত হইতে দেখি নাই। এই কারণে অধিক সম্ভব মনে হয় এই যে, বেণীসংহার নাটক ক্ষিতীশপুত্র ভট্টনারায়ণেরই রচিত এবং সম্ভবত ক্ষিতীশেরই প্রকৃত নাম ছিল রামেশ্বর, উপাধি বা ডাকনাম ছিল ক্ষিতীশ। এমনও কি হইতে পারে না যে, রামেশ্বর বিশেষরূপে পণ্ডিত পণ্ডিত হইয়াছিলেন বলিয়া একসঙ্গে পিতা ও পুত্রের পরিচয় দিবার জন্য 'ভট্টরামেশ্বর পুত্র যাঁহার' এইরূপে বহুব্রীহি সমাস করা হইয়াছে? বারেন্দ্রবংশাবলী বিচার করিলে মনে হয় আদিবরাহ ও রামের মধ্যে শ্রেষ্ঠত্ব লইয়া বিচার চলিয়াছিল।

(৩৩) ক্ষিতীশবংশাবলীচরিতং ৪পৃঃ।
(৩৪) তদিদং কবে—মৃগরাজলক্ষ্মণো ভট্টনারায়ণস্য কৃতিং—বে০ স০ ৪পৃঃ।

দেবেন্দ্রনাথের বিদ্যাশিক্ষা ও হিন্দুকলেজ।

(আচার্য্য শ্রীসতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী এম-এ)

রামমোহন রায়ের স্কুল।

বাল্যকালে দেবেন্দ্রনাথ বাড়ীতে গৃহশিক্ষকদিগের নিকটে ইংরাজী, বাংলা, সংস্কৃত ও ফরাসী ভাষা এবং সঙ্গীতবিদ্যা ও ব্যায়াম শিক্ষা করিতেন। দ্বারকানাথ ও রামমোহন রায় উভয়েই হিন্দুকলেজ-স্থাপনে উদ্যোগী ছিলেন; কিন্তু রামমোহন রায়ের অনুরোধে দ্বারকানাথ দেবেন্দ্রনাথকে হিন্দুকলেজে না দিয়া রামমোহন রায়ের স্কুলে পড়িতে পাঠান। স্বয়ং রামমোহন নিজের গাড়ী করিয়া দেবেন্দ্রনাথকে ভর্ত্তি করিতে লইয়া যান। রামমোহন রায়ের স্কুলের প্রথম ছাত্রদলের মধ্যে, নৃপেন্দ্রনাথ ঠাকুর, রমাপ্রসাদ রায়, ক্ষেমমোহন চট্টোপাধ্যায়, মহেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় শ্যামাচরণ দে প্রভৃতি ছিলেন। রামমোহন রায় স্বদেশ পরিত্যাগ করিলে ১৮৩০ সালের ডিসেম্বর মাসে নৃপেন্দ্রনাথ ঠাকুর, রমাপ্রসাদ রায়, তারাচাঁদ চক্রবর্ত্তী প্রভৃতি সতীর্থের সঙ্গে দেবেন্দ্রনাথ হিন্দুকলেজে প্রবেশ করেন।

হিন্দুকলেজ, দ্বারকানাথ ও দেবেন্দ্রনাথ।

হিন্দুকলেজের ভিতর দিয়া তখন এক ঘোর সামাজিক বিপ্লবের সূত্রপাত হইয়াছে। হেনরি ভিভিয়ান্ ডিরোজিও নামে এক প্রতিভাবান ফিরিঙ্গি যুবক ১৮২৮ খৃষ্টাব্দে হিন্দুকলেজের চতুর্থ শ্রেণীর সাহিত্য ও ইতিহাসের শিক্ষক নিযুক্ত হন। তিনি তাঁহার অপূর্ব্ব পাণ্ডিত্য মনীষা ও হৃদ্যতার দ্বারা ছাত্রদের মন একেবারে দখল করিয়া লইলেন। ... ধর্ম্ম কিছু নয়, সমাজ কিছু নয়, ধর্ম্ম ও সমাজ বহুকাল ধরিয়া মানুষকে যে সকল সুদৃঢ় সংস্কারের জালে বাঁধিয়াছে তাহার বাঁধন না ছিঁড়িলে মানুষের মুক্তি নাই,—এই ভাবের একটা বিদ্রোহ তখন সমস্ত ইউরোপকে তোলপাড় করিয়াছিল। সেই ফরাসী বিপ্লবের ঢেউ এদেশকেও নাড়া দিল; ডিরোজিও সেই বিপ্লবের মন্ত্রে তাঁহার ছাত্রদিগকে দীক্ষিত করিলেন। তিনি তাঁহাদিগকে লইয়া একাডেমিক্ এসোসিয়েসন্ (Academic Association) নামে এক সভা খাড়া করিলেন। তাহাতে রসিককৃষ্ণ মল্লিক, কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, রামগোপাল ঘোষ, রাধানাথ শিকদার, দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়, রামতনু লাহিড়ী, শিবচন্দ্র দেব, হরচন্দ্র ঘোষ প্রভৃতি উৎসাহী সভ্য ছিলেন। সেই সভায় স্বাধীনভাবে সামাজিক বিষয়ে বিচার চলিত এবং তাহার ফলে ছাত্ররা নিজের দেশকে, দেশের ইতিহাসকে সমাজকে ধর্ম্মকে সকল রীতিনীতিকে নির্ব্বিচারে ঘৃণা করিতে সুরু করিয়া দিল। ...

রামমোহন রায় হিন্দুকলেজের শিক্ষাপ্রণালীর সম্বন্ধে খুসি ছিলেন না। ... যে কোন ধর্ম্মশাস্ত্র হউক না, ছাত্ররা ধর্ম্মালোচনা করিতে শিখুক এবং অন্যান্য শিক্ষাকে সেই বড় শিক্ষার অঙ্গীভূত বলিয়া জানুক, ইহাই ছিল রামমোহন রায়ের শিক্ষার আদর্শ।

হিন্দুকলেজের ধর্ম্মহীন নাস্তিকতার শিক্ষা সেই জন্য তাঁহাকে অত্যন্ত পীড়া দিত। ...

ডিরোজিও তখন যে ক্লাসে পড়াইতেন, দেবেন্দ্রনাথ তাহার নীচের ক্লাসে ভর্ত্তি হইয়াছিলেন। দেবেন্দ্রনাথের হিন্দুকলেজে প্রবেশের চার মাস পরেই ডিরোজিও হিন্দুকলেজ ছাড়িয়া চলিয়া যান। ... দেবেন্দ্রনাথ বোধ হয় চৌদ্দ বছর হইতে ষোল কি সতের বছর পর্য্যন্ত হিন্দুকলেজে পড়িয়াছিলেন। কলেজের সতীর্থগণের সঙ্গে যে তাঁহার বিশেষ অন্তরঙ্গ সম্বন্ধ হইয়াছিল এমন কোন পরিচয় পাওয়া যায় না। ডিরোজিওর শিষ্যদলের সঙ্গে তাঁহার কোন ঘনিষ্ঠতাই হয় নাই। ...

সৌভাগ্যক্রমে দেবেন্দ্রনাথ দ্বারকানাথ ঠাকুরের পুত্র হইয়া জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন; সুতরাং তাঁহার পক্ষে দেশীয় রীতিনীতি পোষাক-পরিচ্ছেদ, আহার-বিহার বিসর্জ্জন দিয়া বিদেশীয় অনুকরণ করিতে যাওয়া একেবারেই অসম্ভব ছিল। (অজিত ২৮-৩০)। রামমোহন রায় ও তাঁহার প্রিয় শিষ্য দ্বারকানাথ ঠাকুর উভয়েই ইংরাজী শিক্ষার যেটুকু ভাল তাহা গ্রহণ করিয়াছিলেন, কিন্তু দেশীয় রীতি-নীতি পরিত্যাগ করেন নাই; উভয়েই স্বদেশের মর্য্যাদা রক্ষা বিষয়ে অতিশয় তেজস্বিতা প্রকাশ করিতেন। এইজন্য হিন্দুকলেজের প্রথম ছাত্রদল কিছুকাল দ্বারকানাথ ঠাকুরের প্রতি বিদ্বেষপরায়ণ হইয়াছিলেন। কিরূপে সদ্ব্যবহারের দ্বারা দ্বারকানাথ তাঁহাদিগকে বশীভূত করেন, তাহা পড়িলে বিস্মিত হইতে হয়।

"তৎকালে ভারতবর্ষীয়দের দ্বারা পরিচালিত ইংরাজী সংবাদ-পত্রের মধ্যে 'জ্ঞানান্বেষণ' নামে এক পত্রিকা ছিল। এটী দিভাষী ছিল (অর্থাৎ ইংরাজী ও বাংলা উভয় ভাষায় লিখিত হইত)। হেয়ারস্কুলের প্রধান শিক্ষক বাবু রসিককৃষ্ণ মল্লিক ইহার সম্পাদক ছিলেন। ... এই পত্রিকায় একবার দ্বারকানাথের প্রতি বিদ্বেষে বিষাক্ত একটি আক্রমণ প্রকাশিত হয়। দ্বারকানাথের কোন আত্মীয় (ইনি স্বয়ং একজন পত্রিকাসম্পাদক ছিলেন), দ্বারকানাথকে পরামর্শ দিলেন যে তিনি গিয়া স্বহস্তে রসিককৃষ্ণ মল্লিককে চাবুক মারিয়া আসুন। দ্বারকানাথ এই পরামর্শ গ্রহণের পরিবর্ত্তে রসিককৃষ্ণকে

রাত্রির আহারের নিমন্ত্রণ করিলেন, এবং তাঁহাকে বুঝাইয়া দিলেন যে তাঁহার কাজটি অন্যায় হইয়াছে। রসিককৃষ্ণ দ্বারকানাথের সৌজন্যে মুগ্ধ হইয়া গেলেন, এবং দ্বারকানাথের প্রতি তাঁহার মনের ভাব পরিবর্ত্তিত হইয়া গেল। কি করিয়া শত্রুতা দূর করিতে হয়, দ্বারকানাথ সংসারের অধিকাংশ লোকের অপেক্ষা ভাল জানিতেন'।—(Mem 41, সংক্ষিপ্ত ভাবানুবাদ)। (১)

"কেবল রসিককৃষ্ণ নহেন, এই সময়ে হিন্দুকলেজের খ্যাতনামা শিক্ষিত যুবকবৃন্দের মধ্যে অনেকেই তাঁহার বিরুদ্ধে কাগজে লিখিতে আরম্ভ করেন। তন্মধ্যে কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, রামগোপাল ঘোষ, দিগম্বর মিত্র প্রভৃতি প্রধান। দ্বারকানাথ তাঁহাদের চেষ্টা ব্যর্থ করিবার জন্য অতি সুন্দর কৌশল অবলম্বন করিয়াছিলেন। দর্পনারায়ণ ঠাকুর বংশের দৌহিত্র দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়ও এই সকল নব্য যুবকদলের একজন অগ্রণী ছিলেন। তাঁহা দ্বারা দ্বারকানাথ প্রত্যেককে ভোজে নিমন্ত্রণ করিতেন এবং প্রত্যেকের সহিত কথাবার্ত্তা কহিয়া কাহার কি আশা ও উদ্দেশ্য তাহা বুঝিয়া লইতেন। এই সূত্রে দ্বারকানাথের সাহায্যেই কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় পাদরী সমাজে বিশেষ আদরে গৃহীত হন, রামগোপাল ঘোষ বণিকসম্প্রদায়ের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন, এবং দিগম্বর মিত্র কাশিমবাজারের রাজা হরিনাথের পুত্র কুমার কৃষ্ণনাথের শিক্ষক নিযুক্ত হন।" (ব. জা. ই. ব্রা. ৬,৩৩৪, ৩৩৫।)

ছেলে বয়সে রামমোহন রায়ের চরিত্রের ছাপ বালক দেবেন্দ্রনাথের মনে মুদ্রিত হইয়াছিল বলিয়াই দেশের শিক্ষিত সাধারণ যখন পশ্চিমের ধর্ম্ম সমাজ রীতি নীতি সমস্তকেই আদরে বরণ করিয়া লইলেন এবং দেশকে আঘাত করিতে লাগিলেন, তখন তিনি একাকী দেশের প্রাচীন সভ্যতার দিকে মুখ ফিরাইলেন; প্রতিকূল স্রোতের বিরুদ্ধে শক্ত করিয়া হাল ধরিয়া দাঁড়াইলেন; পাশ্চাত্য শাস্ত্র-সাহিত্য ছাড়িয়া প্রাচ্য শাস্ত্র-সাহিত্যের আলোচনা দেশময় ব্যাপ্ত করিতে চেষ্টা করিলেন। রামমোহন রায়ের পরে তিনি যদি এই কাজে না লাগিতেন, তবে দেশের শিক্ষিত লোক যে খৃষ্টান হইয়া সমাজে এক প্রকাণ্ড বিশৃঙ্খলা ঘটাইত, সে বিষয় অনুমাত্র সন্দেহ নাই। সবই ভাঙিত, কিছুই গড়িত না" (অজিত ৩৯, ৪০)

(১) ব. জা. ই. ব্রা পুস্তকের লেখক এই বৃত্তান্ত বর্ণনা করিতে গিয়া (৬।৩৩৪ পৃঃ) কিশোরীচাঁদ মিত্র লিখিত 'Anglo-Indian Press' কথাটির অর্থ ভুল বুঝিয়া 'জ্ঞানান্বেষণ'কে 'অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ানদিগের একখানি বাঙ্গালা সংবাদপত্র' বলিয়াছেন। বস্তুতঃ তাহা নহে। (রামতনু ১২৪, ১৩০, ১৪০, ১৪২, ১৪৪ পৃঃ দ্রষ্টব্য)।

সাধারণ জ্ঞানোপার্জ্জিকা সভা।

এখানে প্রসঙ্গতঃ হিন্দুকলেজের ছাত্রদিগের এই অতিরিক্ত পাশ্চাত্যানুরাগ ও প্রাচ্যবিরোধিতার উল্লেখ করিতে হইল বটে; কিন্তু সে সময়ে তাঁহারাই যে এ দেশের সর্ব্ববিধ কল্যাণ কর্ম্মের অগ্রণী এবং সামাজিক ও রাজনৈতিক স্বাধীনতামন্ত্রের উপাসক ছিলেন, ইহা বিস্মৃত হইলে চলিবে না। তাঁহাদিগের অনেকের জীবনচরিত স্বর্গীয় শিবনাথ শাস্ত্রী রচিত "রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ" নামক পুস্তকে বিবৃত আছে।

রামগোপাল ঘোষ, রামতনু লাহিড়ী, প্যারীচাঁদ মিত্র, তারাচাঁদ চক্রবর্ত্তী, কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি হিন্দুকলেজ হইতে উত্তীর্ণ প্রধান প্রধান যুবকগণ মিলিত হইয়া ১৮৩৮ খৃষ্টাব্দের প্রথম ভাগে Society for the Acquisition of general Knowledge অথবা সাধারণ জ্ঞানোপার্জ্জিকা সভা স্থাপন করেন। তাহার উদ্দেশ্য ছিল, সর্ব্ববিধ জ্ঞান উপার্জ্জনে পরস্পরের সহায়তা করা ও পরস্পরের মধ্যে প্রীতি বর্দ্ধন করা। প্রায় দুই শত যুবক ইহার সভ্য হইয়াছিলেন; তন্মধ্যে দেবেন্দ্রনাথও ছিলেন।

এই সভা যুবকগণের জ্ঞানবৃদ্ধির যথেষ্ট সাহায্য করিলেও ইহাতে ধর্ম্মবিষয়ক কোনও আলোচনাই হইত না। কিন্তু দেবেন্দ্রনাথের মন সে সময় ঈশ্বর ও ধর্ম্মতত্ত্ব-বিষয়ক প্রশ্নসকল লইয়া আন্দোলিত ছিল; এবং তিনি বহু কষ্টে একাকী নিজের একাগ্র চিন্তা দ্বারা যে সকল সিদ্ধান্তে উপস্থিত হইতেছিলেন তাহাতে অপরের "সায়" পাইবার জন্য তাঁহার মনও হৃদয় অতিশয় ব্যাকুল হইতেছিল। এই ব্যাকুলতা আত্মজীবনীর চতুর্থ ও পঞ্চম পরিচ্ছেদ ব্যক্ত হইয়াছে। কিন্তু এই বিষয়ে তিনি এই সভা হইতে সাহায্য পান নাই।

হিন্দুকলেজের তৃতীয় ছাত্রদল।

হিন্দুকলেজের ছাত্রদিগের মধ্যে পূর্ব্বোক্ত রসিককৃষ্ণ মল্লিক প্রভৃতিকে প্রথম দল, দেবেন্দ্রনাথ ও তাঁহার সহপাঠীদিগকে দ্বিতীয় দল এবং রাজনারায়ণ বসু ও তাঁহার সহাধ্যায়ীগণকে তৃতীয় দল বলা যাইতে পারে। এই তৃতীয় দলের অনেকের সহিত দেবেন্দ্রনাথের বিশেষ যোগ ছিল বলিয়া 'রাজনারায়ণ বসুর আত্মচরিত' হইতে তাঁহাদের কিঞ্চিৎ বিবরণ উদ্ধৃত হইতেছে। রাজনারায়ণ বাবু বলিতেছেন, আমার সহাধ্যায়ীর মধ্যে মাইকেল মধুসূদন দত্ত, প্যারীচরণ সরকার, জ্ঞানেন্দ্রমোহন ঠাকুর, ভূদেব মুখোপাধ্যায়, যোগেশচন্দ্র ঘোষ, আনন্দকৃষ্ণ বসু, জগদীশনাথ রায়, গোবিন্দচন্দ্র দত্ত প্রধান ছিলেন। পরলোকগত কবিবর মাইকেল মধুসূদন, সেকেণ্ড ক্লাশ

হইতে খৃষ্টীয়ান হইয়া ছাড়িয়া যান। তৎপরে বিশপস্ কলেজে ভর্ত্তি হন। প্যারীচরণ সরকার প্রেসিডেন্সী কলেজের অধ্যাপক ও সুরাপাননিবারিণী সভার প্রথম সংস্থাপক ছিলেন। জ্ঞানেন্দ্রমোহন ঠাকুর ব্যারিষ্টার। তিনি খৃষ্টীয়ান হইয়া বিলাত যান। তিনি লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের হিন্দু আইনের অধ্যাপক পদে দিন কতক নিযুক্ত ছিলেন।... ভূদেব মুখোপাধ্যায় প্রভুত যশের সহিত Inspector of School পদের কার্য্য সম্পাদন করিয়া এক্ষণে পেন্সন্ লইয়াছেন। ইনি বঙ্গভাষায় ঐতিহাসিক উপন্যাসের সৃষ্টিকর্ত্তা এবং "গার্হস্থ্যবিধি" প্রভৃতি কতকগুলি অতি উত্তম গ্রন্থ বাঙ্গালা ভাষাতে রচনা করিয়াছেন।... গোবিন্দচন্দ্র দত্ত সেকালের ছোট আদালতের জজ বিখ্যাত রসময় দত্তের পুত্র। আমি কলেজে থাকিতে ইংরাজী কবিতা 'পড়িতাম' না বলিয়া, তাহা গিলিতাম বলিলে হয়, তাহা এমনি আগ্রহের সহিত পাঠ করিতাম। ইনি এ বিষয়ে আমার সঙ্গে একহৃদয় ছিলেন বলিলে হয়। প্রাচীন ও আধুনিক ক্ষুদ্রতম ইংরাজী কবির গ্রন্থ পর্য্যন্ত আমরা পড়িতাম। ইনি কলেজ ছাড়িয়া ট্রেজারীতে এক উচ্চ কর্ম্ম প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।... ইনি ইংরাজী কবিতা উত্তম রচনা করিতে পারিতেন। ইনি বিখ্যাত কুমারী তরুদত্তের পিতা। ইনি যেমন স্বভাবতঃ ভদ্রলোক ছিলেন এমন অতি অল্প পাওয়া যায়। ইনি খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন।"

(রা, জ, ২৭—২৯)।

হিন্দুকলেজের পাঠ্যতালিকা।

হিন্দুকলেজে দেবেন্দ্রনাথ দ্বিতীয় শ্রেণী পর্য্যন্ত পড়িয়াছিলেন। রাজনারায়ণ বসু মহাশয় তাঁহার আত্মচরিতে প্রথম শ্রেণীর পাঠ্যপুস্তকের যে তালিকা দিয়াছেন, তাহা দেখিলে বুঝিতে পারা যাইবে যে দেবেন্দ্রনাথকে বর্ত্তমান বি-এ পরীক্ষার্থীদিগের অপেক্ষাও অধিক পড়িতে হইয়াছিল। সতের বৎসর বয়সের বালকের পক্ষে তাহা নিশ্চয়ই কঠিন হইয়া থাকিবে। যাহা হউক, এই শিক্ষা দ্বারাই তিনি (আত্মজীবনীর তৃতীয় পরিচ্ছেদে উল্লিখিত) য়ুরোপীয় দার্শনিকদিগের গ্রন্থ বুঝিবার সামর্থ্যলাভ করিয়াছিলেন।

রাজনারায়ণ বসুমহাশয়ের প্রদত্ত (আত্মচরিত, ২০, ২১পৃষ্ঠা) প্রথম শ্রেণীর পাঠ্যতালিকা এই :—

"English Literature :—Becon's Essays, Shakespeare,—Macbeth, Lear, Othello and Hamlet. Milton—Paradise Lost, Lycidas Comus, L' Allegro, Penseraso Sonnets etc. Pope—Essay on criticism, Rape of the Lock, Eloisa to Abelard, Elegy on the death of a young Lady, Prologue to the Satires, etc. Young,—Night thoughts; Gray's Poems.

History : পুরাবৃত্তে কোন্ পুস্তক হইতে প্রশ্ন দেওয়া হইত, তাহা নির্দ্ধারিত না থাকাতে নিম্নলিখিত পুস্তকগুলি বৎসরের ভিতরে পড়িতে হইত,—Hume's History of England (Unabridged), Gibbon's Roman Empire (Unabridged.) Mitford's History of Greece, Fergusson's Roman Republic, Elphinstone's India, Russell's Modern Europe.

সর্ব্বশুদ্ধ প্রায় ছত্রিশ ভল্যুম হইবে।

Mathematics : Euclid.—First six books and Eleventh book. Algebra Plane and spherical Trigonometry. Analytical Conic Sections. Differential and Integral calculus

Mixed Mathematics : Whewell's Mechanics. Berkley's Astromony. Webster's Hydrostatics. Phelp's optics. Calculation of Eclipses."

ডাক্তার এডওয়ার্ড বাইল্‌স কাউয়েল।

পূর্ব্বানুবৃত্তি

(শ্রীপঞ্চানন রায়)

সিপাহী বিদ্রোহ উপলক্ষে সংস্কৃতকলেজ গৃহটী সৈনিকগণের সাময়িক আবাসে পরিণত হয়; এই জন্য কয়েকটী বিভিন্ন বাটীতে কলেজের কার্য্যাদি নির্ব্বাহ হইত। আচার্য্য শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয়ের একটী পত্রে জানা যায় যে, কলেজ ঐ সময়ে সহরের কোন অংশস্থিত তিনটী ভিন্ন ভিন্ন বাটীতে স্থানান্তরিত হইয়াছিল। পূজ্যপাদ আচার্য্য শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের নিকট অবগত হইলাম যে, উক্ত তিনটী বাড়ীর দুইটী বর্ত্তমান বৈঠকখানা রোডে অবস্থিত ছিল এবং আলবার্টকলেজ ভবনের একটী অংশ অপর বাটীর স্থানাধিকার করিয়াছিল। ১৮৬০ খৃষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসে কলেজ পুনরায় স্বগৃহে প্রত্যাবৃত্ত হয়। এই উপলক্ষে কাউয়েল সাহেব একটী সুন্দর সংস্কৃত শ্লোক রচনা করেন। রচনাটী এতদুর সুষ্ঠু যে, আমরা

উহা উদ্ধৃত করিবার লোভ সংবরণ করিতে পারিলাম না। নিম্নে শ্লোকটী প্রদত্ত হইল :—

"বিদ্যালয়ঃ স্বালয়মেত্য সাম্প্রতম্
সমৃদ্ধকীর্ত্তির্ভুবনে ভবিষ্যতি।
তথাহি সানৌ মলয়স্য নান্যতঃ
ধ্রুবং সমারোহতি চন্দনদ্রুমঃ॥" *

(মলয়পর্ব্বতের সন্নিকটবর্ত্তী ভূভাগে চন্দনবৃক্ষ যেরূপ সুনিশ্চিত বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়, সেইরূপ বিদ্যালয় সম্প্রতি স্বগৃহে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া, পৃথিবীতে অতুল কীর্ত্তি অর্জ্জন করিবে।)

কাউয়েল মহোদয়ের অসীম প্রযত্নে সংস্কৃত কলেজ এই বৎসর বি-এ অধ্যাপনার অধিকার লাভ করিয়া কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্ভুক্ত হয়। পরে তাঁহারই প্রচেষ্টায় সংস্কৃতকলেজ সংস্কৃত ভাষায় এম-এ পড়াইবার অধিকারও লাভ করে। কাউয়েল সাহেবের এই সময়কার একটী পত্রে জানা যায় যে, ঐ বৎসর সংস্কৃতকলেজের একটী ছাত্র † বি-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ায়, তিনি তাঁহাকে লইয়া "Convocation meeting"এ যোগ দেন। উক্ত সভা তখন "টাউন হলে" হইত; কাউয়েল সাহেব উহাকে "curious parody of our oxford" বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। তখন অধ্যক্ষগণের আপনাপন বিদ্যালয়ের পরিচায়ক কোন চিহ্ন ছিল না বলিয়া কাউয়েল তাহার উপর কটাক্ষ করিয়াছেন এবং উক্ত উৎসবে জাঁকজমকাদির বিশেষ অভাব লক্ষ্য করিয়াছেন।

এই সময়কার একটী পত্রে কাউয়েল সাহেব বাঙালী জাতি সম্বন্ধে যে মতটী প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহা সর্ব্বতোভাবে উল্লেখযোগ্য না হইলেও সাধারণের অবগতি ও সমালোচনার জন্য নিম্নে পাদটীকায় মতটী সন্নিবেশিত করিলাম। * কোন একটী ইংরাজী কবিতা তাঁহার মনে বাঙালী জাতি সম্বন্ধে উক্ত ভাবটি আনিয়া দিয়াছিল।

সংস্কৃতকলেজের অধ্যক্ষপদে আরূঢ় হইবার পর তিনি প্রায় প্রত্যেক ছুটীতেই গঙ্গাবক্ষে ভ্রমণ করিতে ভালবাসিতেন; সময় সময় রেঙ্গুন, বারাণসী প্রভৃতি স্থানেও তিনি ভ্রমণার্থ গমন করিতেন। এই সময় তাঁহারই যত্নে সংস্কৃত চণ্ডকৌশিক নামক নাটকের দুইটী পাণ্ডুলিপি দাক্ষিণাত্য হইতে আনীত হইয়া সংস্কৃতকলেজ পুস্তকাগারের অন্তর্ভুক্ত হয়। ইহাতে ঐ পুস্তকটী বঙ্গদেশে প্রচারিত হইবার বিশেষ সুবিধা লাভ করিয়াছিল। পরে অধ্যক্ষ প্রসন্নকুমার সর্ব্বাধিকারী মহাশয়ের সময়ে উক্ত পুস্তকটী তদানীন্তন গ্রন্থাগারাধ্যক্ষ জগন্মোহন তর্কালঙ্কার মহাশয় কর্ত্তৃক মুদ্রিত হইয়া প্রকাশিত হয়। † এইরূপে তাঁহারই বিশেষ যত্নে বঙ্গদেশে অজ্ঞাতপ্রায় মহাকবি দণ্ডী বিরচিত "কাব্যাদর্শ" নামক বিখ্যাত অলঙ্কারপুস্তকটীর কয়েকখানি আদর্শপুঁথি পশ্চিমদেশ হইতে আনীত হয়; অনন্তর উহা সুবিখ্যাত পণ্ডিতপ্রবর প্রেমচাঁদ তর্কবাগীশ মহোদয় বিরচিত সুগভীর পাণ্ডিত্যপূর্ণ টীকায় বিভূষিত হইয়া ১৮৬৪ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। ‡ পূর্ব্বে বঙ্গদেশে

---

* আচার্য্য শিবনাথ শাস্ত্রীর আত্মচরিত হইতে।

† আমাদের মনে হয়, এই ছাত্রটী আচার্য্য শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্য মহোদয়। ইনিই সংস্কৃতকলেজের প্রথম উপাধিধারী। ইনি প্রেসিডেন্সি কলেজের ভূতপূর্ব্ব অধ্যাপক, হাইকোর্টের উকিল ও রিপন কলেজের ভূতপূর্ব্ব অধ্যক্ষ ছিলেন। সংস্কৃতকলেজের শতাব্দী উৎসবের সময় আমরা ইঁহাকে সশরীরে দেখিবার সুযোগ লাভ করিয়াছিলাম। সুপ্রসিদ্ধ রমেশচন্দ্র দত্ত প্রমুখ বহু বিখ্যাত বঙ্গবাসী ইঁহার ছাত্র ছিলেন। ১৮৪০ খৃষ্টাব্দে ইনি জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার বর্ত্তমান বয়স ৮৬ বৎসর। এখন ১৮৫নং মাণিকতলা ষ্ট্রীটে (বিডন স্কোয়ারের পূর্ব্বদক্ষিণ কোণে) বাস করিতেছেন। অধ্যাপক বিপিনবিহারী গুপ্ত প্রণীত "পুরাতন প্রসঙ্গ" নামক গ্রন্থটীতে ইঁহার বিষয় সম্যক্ জানিতে পারা যাইবে।

* "I was reading a very striking piece of poetry yesterday, on Bengal as a land without echoes physical or moral, as there are no mountains to break the dull monotony of its endless plain level, and no high ideas among its peeple and no greatnames in their past history to rouse them to emulation. The idea struck me very much. It is indeed sadly remarkable that Bengal with its 45 millions has hardly produced one known greatman,—there is not one great living Bengali now. Ram mohan Ray was their nearest approach to a great man, and he certainly was in many ways a remarkable man. But greatness and baboo-hood are incompatible; and baboo-hood is the beau ideal of existence to a Bengali"

(Life of professor Cowell, Page 169-70)

† পণ্ডিত জগন্মোহন তর্কালঙ্কার সম্পাদিত চণ্ডকৌশিক নাটকের ভূমিকার দ্বিতীয় পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

‡ রামাক্ষয় চট্টোপাধ্যায় প্রণীত "প্রেমচন্দ্র তর্কবাগীশের জীবনচরিত" ৪২—৪৩ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

সুবিখ্যাত "অভিজ্ঞানশকুন্তল" নাটকের কোন উৎকৃষ্ট মুদ্রিত সংস্করণ ছিল না। কাউয়েল সাহেবেরই বিশেষ যত্নে দেশদেশান্তরে মুদ্রিত কয়েকটী পুস্তক আনীত ও ১৮৬০ খৃষ্টাব্দে তর্কবাগীশ মহোদয় রচিত সংক্ষিপ্ত টীকায় বিভূষিত হইয়া প্রকাশিত হয়। অবশ্য তর্কবাগীশ মহাশয় বহু পূর্ব্বে ১৮৩৯ খৃষ্টাব্দে উক্ত নাটকের টীকাবিহীন একটী সংস্করণ মুদ্রিত করিয়া প্রকাশ করিয়াছিলেন, কিন্তু এই দ্বিতীয় সংস্করণটী পূর্ব্ববর্ত্তী সংস্করণটীর অপেক্ষা উৎকৃষ্ট হইয়াছিল ইহা বলাই বাহুল্য। *

কলিকাতায় আসিয়া অবধি এদেশীয় পণ্ডিতগণের সাহায্যে কাউয়েল সংস্কৃতভাষা উত্তমরূপে অধ্যয়ন করিতে আরম্ভ করেন। তর্কবাগীশ মহাশয় প্রভৃতি পণ্ডিতগণ তাঁহাকে এবিষয়ে যথেষ্ট সাহায্য করিতেন। মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্ন মহাশয়ের নিকট কাউয়েল ভারতীয় দর্শনশাস্ত্র অধ্যয়ন করিতেন, এই সূত্রে কাউয়েলের সহিত উক্ত পণ্ডিত মহাশয়ের যে সৌহৃদ্য জন্মিয়া যায়, আমরণ তাহা কখনও বিচ্ছিন্ন হয় নাই। কাউয়েল সাহেবের যত্নেই ন্যায়রত্ন মহাশয় অলঙ্কারাধ্যাপকের পদ লাভ করিয়া সংস্কৃত কলেজে প্রবেশ করেন। বহু বৎসর পরে কেম্ব্রিজে অবস্থান কালে কাউয়েল সাহেব ন্যায়রত্ন মহাশয়কে যে পত্রাদি লিখিতেন তাহাতে ন্যায়রত্ন মহাশয়কে তিনি যে কতদূর ভালবাসিতেন তাহার পরিচয় পাওয়া যায়। এইরূপ একটী পত্রে আমরা দেখিতে পাই যে, রামাক্ষয় চট্টোপাধ্যায় প্রণীত প্রেমচাঁদ তর্কবাগীশ মহাশয়ের জীবনী তাঁহার অত্যন্ত তৃপ্তিকর হইয়াছে।

উক্ত তর্কবাগীশ মহাশয়ের প্রতি কাউয়েল বরাবরই শ্রদ্ধাবান্ ছিলেন। কাউয়েল সাহেবের অধ্যক্ষতা কালেই তর্কবাগীশ মহোদয় সংস্কৃতকলেজের কার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করেন। উহাতে সাহেব মহোদয় এরূপ ব্যথিত হইয়াছিলেন যে, একটী সংস্কৃত শ্লোক রচনা করিয়া তিনি তর্কবাগীশ মহাশয়ের বিদায়সভায় উহা পাঠ করেন, শ্লোকটী আমরা নিম্নে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।

"আশাঃ সর্ব্বাস্তিমিরবলিতা অস্তলীনোঽংশুমালী-
ত্যুৎকণ্ঠাধোমুকুলিতদৃশোঽপ্যাকুলায়া নলিন্যাঃ।
অন্তঃপুষ্পং প্রতিনিধিরভূৎ স্বর্ণবর্ণা ভরেণু
শ্চিন্তারূঢ়া বিরহিহৃদয়ে প্রোষিতস্যেব মূর্ত্তিঃ॥" *

(সূর্য্য অস্ত গমন করিতেছে, দিক্‌সমূহ তিমিরাচ্ছাদিত হইয়া পড়িতেছে—উৎকণ্ঠায় আকুল পদ্ম অধোভাগে ঈষৎ দৃষ্টিপাত করিতেছে। চিন্তামগ্না বিরহিণীর হৃদয়ে বিদেশগত পতির মূর্ত্তিধ্যানই যেমন একমাত্র অবলম্বনের বিষয় হয়, তেমনি তপনবিরহিণী পদ্মিনীর অন্তরস্থ স্বর্ণোজ্জ্বলবর্ণাভা কণিকাই সূর্য্যের প্রতিনিধি হইয়া তাহাকে সান্ত্বনা দিতেছে।)

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ। †

(শ্রীদীননাথ সান্ন্যাল)

আজ আমরা যাঁহার স্মরণ সঙ্কল্প করিয়া এখানে সমবেত হইয়াছি, তিনি এবং তাঁহার সংস্রবে তাঁহার পরিবারমণ্ডলী বঙ্গদেশে নব যুগপ্রবর্ত্তনে বিবিধ প্রকারে সহায়তা করিয়াছেন। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের পিতা দ্বারকানাথ ঠাকুর বঙ্গদেশের মধ্যে একজন বিশিষ্ট জমিদার ছিলেন এবং ব্যবসায়বুদ্ধিও তাঁহার বড় কম ছিল না। বাঙ্গালীর মধ্যে ইনিই প্রথম ইয়োরোপ যাত্রা করেন। ইনি রোমে গিয়া ক্যাথলিক খৃষ্টান সম্প্রদায়ের সম্রাট্ পোপের সহিত সাক্ষাৎ করেন এবং তৎপরে লণ্ডনে অবস্থিতিকালে মহারাণী ভিক্টোরিয়া কর্ত্তৃক যথেষ্ট সম্মানিত হইয়াছিলেন। দ্বিতীয় বারে ইংলণ্ডে গিয়া ইনি আর স্বদেশে প্রত্যাগমন করিতে পারেন নাই, ইংলণ্ডেই দেহরক্ষা করেন। ইঁহারই জ্যেষ্ঠপুত্র মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

দেবেন্দ্রনাথ যখন বালক, সেই সময়ে মহাত্মা রামমোহন রায় চাকুরী পরিত্যাগ করিয়া কলিকাতায় অবস্থিতি ও নানাবিধ যুগপ্রবর্ত্তক অনুষ্ঠান করিতেছিলেন। রামমোহন রায়ের প্রতিষ্ঠিত ইংরেজী স্কুলই দেবেন্দ্রনাথের প্রথম শিক্ষাস্থল। এই অল্প বয়সেও বালক দেবেন্দ্রনাথ রামমোহন রায়ের

---

* রামাক্ষয় চট্টোপাধ্যায় বিরচিত "প্রেমচন্দ্র তর্কবাগীশের জীবনচরিত" ৪২পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

* প্রেমচন্দ্র তর্কবাগীশের জীবন চরিত ৫২ পৃষ্ঠা হইতে উদ্ধৃত।

† গত ৬ই মাঘ কৃষ্ণনগরে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের স্মৃতিসভায় লেখক কর্ত্তৃক পঠিত।

সহিত পরিচিত হইয়াছিলেন এবং রামমোহনও দেবেন্দ্রনাথের সৎস্বভাব দেখিয়া তাঁহাকে অত্যন্ত স্নেহ করিতেন। পরে দেবেন্দ্রনাথ হিন্দুকলেজে তাঁহার শিক্ষা সমাপ্ত করেন। বাল্য হইতেই দেবেন্দ্রনাথের মনে ধর্ম্মপ্রবণতার বীজ নিহিত ছিল। যখন তাঁহার বয়স আঠার বৎসর, তখন একদিন পিতামহীর অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া দেখিতে গিয়া, তাঁহার মনে ঐ বীজের প্রথম অঙ্কুর—বৈরাগ্যভাব দেখা দেয়। ইহার পরে অকস্মাৎ একদিন ঈশোপনিষদের একখানি ছিন্ন পত্র তাঁহার চক্ষে পড়ে। পণ্ডিতের সাহায্যে উহার মর্ম্ম গ্রহণ করিয়া তিনি উপনিষদ্ধর্ম্মের প্রতি বিশিষ্ট ভাবে আকৃষ্ট হইলেন। উহাই ঐ অঙ্কুরের প্রথম পল্লব। ইহার পর হইতে রামমোহনের ঘনিষ্ঠ সংশ্রবে আসিয়া দেবেন্দ্রনাথের মন ক্রমশঃই ঔপনিষদ ধর্ম্মের দিকে আকৃষ্ট হইতে লাগিল।

ঠিক একশত বর্ষ পূর্ব্বে ১৮২৭ খৃষ্টাব্দে রামমোহন কলিকাতায় "ব্রহ্মসভা" স্থাপন করেন। ঐ সভায় তিনি ও তাঁহার সমধর্ম্মী বন্ধুবান্ধব একত্র হইয়া পণ্ডিতের মুখে উপনিষদ পাঠ ও ব্যাখ্যা শ্রবণ করিতেন। তখন সভায় বসিয়া উপাসনাপ্রণালী প্রবর্ত্তিত হয় নাই।

কিছুকাল পরে রামমোহন বিলাতে চলিয়া গেলে প্রকারান্তরে দেবেন্দ্রনাথই রামমোহনের ব্রহ্মসভার উত্তরাধিকার গ্রহণ করিলেন।

১৮৩৯ খৃষ্টাব্দে তিনি "তত্ত্ববোধিনী" নামে এক সভা প্রতিষ্ঠিত করিয়া প্রতি সপ্তাহে সেই সভায় বন্ধুজনের সহিত গভীরভাবে ব্রহ্মতত্ত্বের আলোচনা করিতে লাগিলেন। অনতিবিলম্বে ঐ সভার সংস্রবে "তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা" নামে মাসিক পত্রিকার উদ্ভব হইল। ঐ মাসিক পত্রিকার প্রথম সম্পাদক চুপীনিবাসী অক্ষয়কুমার দত্ত, যিনি সুমার্জ্জিত বাঙ্গালা গদ্যের অন্যতম প্রবর্ত্তক বলিয়া বঙ্গসাহিত্যে প্রসিদ্ধ হইয়াছেন। চারুপাঠের সুচারু রচনাগুলি প্রথমে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকাতেই প্রকাশিত হইয়াছিল। সুতরাং বলিতে হইবে, ঐ তত্ত্ববোধিনীর দ্বারা শুধু ধর্ম্মালোচনার প্রচার নহে, সৎসাহিত্যেরও সৃষ্টি ও প্রচার হইতেছিল।

তত্ত্ববোধিনী সভাতেও প্রথম প্রথম ব্রহ্মসভার ন্যায় উপনিষদ পাঠ ও ব্যাখ্যা হইত। কিন্তু উহাতে দেবেন্দ্রনাথের তৃপ্তি হইতেছিল না। ক্রমে তিনি একটা প্রণালীবদ্ধ উপাসনার বিধান করিলেন। বোধ হয়, এই সময় হইতেই ঐ সভার নাম হইল "ব্রাহ্মসমাজ"—যাহা পরে "আদি ব্রাহ্মসমাজ" নামে খ্যাত হইয়াছে। আজ পর্য্যন্ত দেবেন্দ্রনাথের প্রতিষ্ঠিত ঐ সমাজ ও পত্রিকার কার্য্য চলিতেছে। পত্রিকারক্ষাকল্পে তিনি স্থায়ীভাবে দান বিধান করিতে ত্রুটী করেন নাই।

প্রথম প্রথম কেশবচন্দ্র সেন মহাশয় ব্রাহ্মধর্ম্ম বিষয়ে দেবেন্দ্রনাথের ঘনিষ্ঠ সহযোগী ছিলেন। ধর্ম্মবিষয়ে কেশবচন্দ্রের আগ্রহ ও আনন্দ দেখিয়া দেবেন্দ্রনাথ তাঁহাকে "ব্রহ্মানন্দ" আখ্যায় ভূষিত করেন। কিন্তু ব্রাহ্মধর্ম্ম বিষয়ে দেবেন্দ্রনাথের মত সর্ব্বাংশে উপনিষদাশ্রয়ী হইতে চলিল দেখিয়া, কেশবচন্দ্র তাঁহার সহিত সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন করিয়া স্বতন্ত্র অনুষ্ঠানে ব্রতী হইলেন। তাহা হইলেও কেশবচন্দ্রের প্রতি দেবেন্দ্রনাথের প্রীতি কখনই তিরোহিত হয় নাই। কেশবচন্দ্রের শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত তাহা অক্ষুণ্ণ ছিল।

দেবেন্দ্রনাথ ক্রমে ক্রমে উপনিষৎমূলক ব্রাহ্মধর্ম্ম সম্বন্ধে যে পুস্তকগুলি লিখিয়াছেন, তাহাতে তাঁহার উপনিষৎজ্ঞান বিশেষ প্রকারে স্ফুরিত হইয়াছে। ধর্ম্মসম্বন্ধে যে মত তিনি প্রচার করিতেন, নিজ জীবনে তাহার সাধনা করিতে তিনি সততই সচেষ্ট থাকিতেন। এই সাধনার ফলে তিনি ধ্যানপরায়ণ হইয়াছিলেন—জীবনের অনেক সময় তিনি ধ্যানে অতিবাহিত করিতেন। বোলপুরের "শান্তিনিকেতন" নিভৃত ধ্যানপরায়ণ দেবেন্দ্রনাথের সৃষ্টি। সৌন্দর্য্যবোধ (Æsthetic Sense) ও সর্ব্ববিষয়ে শোভনতাজ্ঞান তাঁহার সকল কার্য্যেই প্রকাশ পাইত। তাঁহার এই সৌন্দর্য্যবোধ উচ্চস্তরের, অর্থাৎ যাহার মধ্য দিয়া পরম সুন্দরের অনুভূতি হয়, দেবেন্দ্রনাথের সৌন্দর্য্যবোধ সেই স্তরের। শৈলাবাসে থাকিবার কালে তাঁহার মনে যে প্রগাঢ় ভগবৎস্ফুরণ হইত, তাহা ঐ সৌন্দর্য্যবোধসম্ভূত; প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য দেখিয়া তাঁহার মন ভগবানের ঐশ্বর্য্য-শ্রীতে মুগ্ধ হইয়া পড়িত।

বৈষয়িক কার্য্যপরিচালনে দেবেন্দ্রনাথ সবিশেষ

দক্ষ হইলেও তিনি ধর্ম্মের অবিরোধেই তাহা সম্পন্ন করিতেন। পিতৃবিয়োগের পরে যখন তিনি দেখিলেন যে, তাঁহার জমিদারী-সম্পত্তি বিপুল ঋণভারে পীড়িত, তখন তিনি প্রাকৃত বুদ্ধিবশে উত্তমর্ণদিগকে বঞ্চনা করিবার কৌশলাদি না করিয়া, ধর্ম্মবুদ্ধি সহকারে বিষয়ের বিপুল অংশ ত্যাগ করিয়া ঋণমুক্ত হওয়াই শ্রেয়ঃ জ্ঞান করিয়াছিলেন;—শুনা যায়, তিনি বলিয়াছিলেন যে, সমস্ত বিষয় বিসর্জ্জন করিয়া যদি তাঁহাকে ভিখারী হইতে হয়, তাহাও স্বীকার, তবু তিনি উত্তমর্ণদিগকে তাহাদের প্রাপ্য ধনে বঞ্চিত করিতে পারিবেন না। সচরাচর বিষয়-সম্পন্ন লোকে যে বয়সে বিষয়চর্চ্চা হইতে নিবৃত্ত হইয়া থাকে, দেবেন্দ্রনাথ তাহার বহু পূর্ব্ব হইতেই উপযুক্ত পুত্রগণের প্রতি বিষয় রক্ষণাবেক্ষণের ভার দিয়া ধর্ম্মসাধনায় একনিষ্ঠ হইয়াছিলেন। দেবেন্দ্রনাথের গৃহে সর্ব্বদা উপনিষদের আলোচনা হইতে থাকায়, তাঁহার পুত্র-পৌত্রগণ সকলেই বাল্য হইতেই উপনিষদের প্রভাবে ন্যূনাধিক প্রভাবিত। পিতার পক্ষে ইহা বড় কম সৌভাগ্যের কথা নহে। ইহা ছাড়া, দেবেন্দ্রনাথের গৃহই কলিকাতায় নানাবিধ কলাবিদ্যার কেন্দ্রস্থল ছিল এবং এখনও আছে। দেবেন্দ্রনাথের প্রতিষ্ঠিত আদি ব্রাহ্মসমাজ ও তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা এখন পর্য্যন্ত বিদ্যমান।

দেবেন্দ্রনাথ এইরূপ নানাবিধ সুখে এবং সর্ব্বোপরি ধর্ম্মানন্দে তাঁহার সুদীর্ঘ জীবন সফল করিয়া গিয়াছেন। ভগবান তাঁহার আত্মাকে শান্তি প্রদান করুন।

সপ্তনবতিতম মাঘোৎসব।

সমগ্র বৎসর ধরিয়া দৈনন্দিন জীবনের বৈচিত্র্যহীন সঙ্কীর্ণ পথে চলিতে চলিতে মানুষ বড়ই ক্লান্ত ও অবসন্ন হইয়া পড়ে; জীবনে নবীনতার আস্বাদনের জন্য—সাধনার পথে নূতন আলোক লাভের জন্য মানুষ মাঝে মাঝে উৎসব চায়, উৎসব তাই ধর্ম্মজীবনের একটী অপরিহার্য্য অঙ্গ। এই জন্য প্রতিবৎসর উৎসবের আভাস লইয়া যখন শীতের আলোকোজ্জ্বল প্রভাত ধরণীর বুকে নামিয়া আসে, সেই সঙ্গে সঙ্গেই যেন হৃদয়-মনের সঞ্চিত অন্ধকারও অনেকখানি অপসৃত হইয়া যায়। এবার ব্রহ্মোৎসবের প্রথমেই একটী মিলনের ভাব ফুটিয়া উঠিতে আরম্ভ করিয়াছিল, এবং শেষে উহা 'সার্ব্বজনীন ব্রহ্মোৎসবে' পরিপূর্ণ বিকাশ লাভ করিয়াছিল।

গত ৭ই পৌষ বুধবার প্রাতে মহর্ষিদেবের দীক্ষাদিবস উপলক্ষে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের পক্ষ হইতে অনেকে নগরকীর্ত্তন করিতে করিতে প্রথমে আচার্য্য শ্রীযুক্ত ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুরের গৃহদ্বারে, সেখান হইতে আদি ব্রাহ্মসমাজের সম্মুখে এবং শেষে মহর্ষিভবনের উপাসনামণ্ডপে আসিয়া যথারীতি উপাসনা ও প্রার্থনাদি করেন। অতঃপর ক্ষিতীন্দ্রনাথের গৃহে সকলে পুনর্ব্বার সমবেত হইয়া পরস্পর আলাপ-পরিচয় ও প্রীতিবিনিময়পূর্ব্বক বিদায় গ্রহণ করিলেন। ক্ষিতীন্দ্র বাবু সকলকে কমলালেবু ও সন্দেশ প্রভৃতির দ্বারা মিষ্টমুখ করাইয়া মহর্ষিদেবের ধারা বজায় রাখিয়াছিলেন।

প্রতি বৎসরের ন্যায় এবারও শ্রদ্ধাস্পদ আচার্য্য শ্রীযুক্ত ক্ষিতীন্দ্রনাথের নিকট ভবানীপুর সম্মিলন ব্রাহ্মসমাজের আহ্বান আসিয়াছিল। এতদুপলক্ষে গত ৯ই মাঘ রবিবার সন্ধ্যা ৬ ঘটিকায় তথায় ব্রহ্মোপাসনা ও সঙ্গীতাদি হইয়াছিল। তদুপলক্ষে তিনি 'কর্ত্তব্যসাধন' বিষয়ে যে সময়োপযোগী উপদেশ দান করিয়াছিলেন, তাহা আমরা আগামী সংখ্যায় প্রকাশ করিব। সঙ্গীতের ভার গ্রহণ করিয়াছিলেন ক্ষিতীন্দ্রবাবুর কন্যা কল্যাণীয়া শ্রীমতী বাণী দেবী, আদিব্রাহ্মসমাজের সঙ্গীতাচার্য্য প্রখ্যাত গায়ক শ্রীসুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং উদীয়মান গীতিকবি সুকণ্ঠ শ্রীমান নির্ম্মলচন্দ্র বড়াল।

১০ই মাঘ সোমবার সন্ধ্যা ৬৷৷০ ঘটিকায় আদিব্রাহ্মসমাজ মন্দিরে উৎসবের উদ্বোধন হয়। বেদী গ্রহণ করিয়াছিলেন ডাঃ শ্রীযুক্ত পূর্ণানন্দ চট্টোপাধ্যায় পি-এইচ. ডি. ও শ্রীযুক্ত ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর। সঙ্গীতের ভার লইয়াছিলেন শ্রীমান নির্ম্মলচন্দ্র বড়াল। আদিব্রাহ্মসমাজের পরমহিতৈষী শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন বিশ্বাস বেদীর নিম্নে দাঁড়াইয়া গম্ভীর কণ্ঠে ব্রাহ্মদিগের প্রতি একটী নিবেদন পাঠ করিলেন। নিবেদনটী বড়ই সময়োপযোগী হইয়াছিল। উহার অক্ষরে অক্ষরে ব্রাহ্মসমাজের বর্ত্তমান অবস্থার জন্য তাঁহার মর্ম্মব্যথা ফুটিয়া উঠিয়াছিল। নিবেদনটী এই সংখ্যাতেই প্রকাশিত হইল। ব্রাহ্মসমাজের প্রত্যেক হিতৈষীকে আমরা উহা পাঠ করিতে অনুরোধ করি। অতঃপর আচার্য্য ক্ষিতীন্দ্রনাথ গম্ভীরোদাত্ত কণ্ঠে স্বাধ্যায় পাঠ করিলেন। সর্ব্বশেষে ডাঃ শ্রীপূর্ণানন্দ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় তাঁহার সবল কণ্ঠে এই আশ্বাসবাণী শুনাইলেন যে, উদারদর্শী রাজা রামমোহন-প্রবর্ত্তিত একমাত্র এই অসাম্প্রদায়িক সত্যধর্ম্ম ব্রাহ্মধর্ম্মই ভারতবর্ষের নবোত্থিত সাম্প্রদায়িক সমস্যার সমাধান করিবে।

গতবারের ন্যায় এবারও ১১ই মাঘের প্রাতঃকালীন উৎসব-আয়োজন আদিব্রাহ্মসমাজ মন্দিরেই হইয়াছিল। সমগ্র বৎসরের উপচিত আবর্জ্জনা হইতে মুক্ত হইয়া মন্দিরটি ফুলসজ্জায় শুভ্রোজ্জ্বল উৎসবমূর্ত্তি গ্রহণ করিয়াছিল। ১১ই মাঘের পুণ্যতম প্রভাত শানাইয়ের সুরে সুরে সুরময় হইয়া দেখা দিল। ধূপ-ধূনার পবিত্র গন্ধে, শঙ্খ-ঘণ্টার মঙ্গল শব্দে ও পুষ্পসজ্জার সুষমাময় সৌন্দর্য্যে হৃদয়ের মধ্যে এক অপূর্ব ভাবের আলোড়ন হইতে লাগিল; মনে হইতে লাগিল, যেন দীর্ঘজীবনের সঞ্চিত পাপ-তাপ আজ ঐ পথের ধুলায় লুটাইয়া দিয়া শুচিশুদ্ধ অন্তঃকরণে ব্রিভুবনের এই উপাসনামণ্ডপে আসিয়া বসিয়াছি। বেলা ৮ ঘটিকার সময় সমবেত কণ্ঠে বেদগান উত্থিত হইল—'যোদেবোহগ্নৌ যোহপ্সু'। সঙ্গীতান্তে শ্রদ্ধাস্পদ আচার্য্য শ্রীযুক্ত ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় বেদী গ্রহণ করিলেন। আমরা অত্যন্ত দুঃখের সহিত জানাইতেছি যে, শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত চিন্তামণি চট্টোপাধ্যায় মহাশয় অসুস্থতার কারণে এবার উৎসবে যোগদান করিতে পারেন নাই। আদিব্রাহ্মসমাজের সঙ্গীতাচার্য্য প্রখ্যাত গায়ক শ্রীসুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় দুইটী সঙ্গীত করিলে ক্ষিতীন্দ্রনাথ তাঁহার মিলনভাবময়ী উদ্বোধনী বাণী শুনাইলেন। এবার নির্ম্মলচন্দ্র গাহিলেন—"এই আলোয় ভরা অসীম আকাশ সূর্য্যকিরণ ঢালা।" পরবর্ত্তী সঙ্গীতখানি বাণী দেবী কর্ত্তৃক বিবিধ তান-লয় সহকারে গীত হইলে ক্ষিতীন্দ্রবাবু গম্ভীরোদাত্ত কণ্ঠে স্বাধ্যায় পাঠ করিলেন। স্বাধ্যায়ান্তে সুরেন্দ্র বাবু দুইটী গান করিলে ক্ষিতীন্দ্রনাথ তাঁহার স্বাভাবিক ওজস্বিনী ভাষায় ও সবলকণ্ঠে "কথায় নয়—কাজে" বিষয়ে যে উপদেশ দান করিলেন তাহা যেমন তেজোগর্ভ তেমনই উৎসাহোদ্দীপক হইল। আমরা ক্ষিতীন্দ্রনাথের এই উপদেশ স্থানান্তরে প্রকাশ করিলাম। আমরা সকলকে এই উপদেশটী মনোযোগ সহকারে পাঠ করিতে অনুরোধ করি। অবশেষে যথারীতি সঙ্গীত হইবার পর উপাসনাকার্য্য সমাপ্ত হইল। শেষের দুইটী সঙ্গীত বিশেষতঃ সর্ব্বশেষের ক্ষিতীন্দ্রনাথরচিত রামপ্রসাদী সুরের—'(মন) প্রাণ খুলে গাও, মায়েরি নাম' গানটী সমবেত কণ্ঠে গীত হইয়া সকলের মন-প্রাণ হরণ করিয়াছিল।

সায়ংকালের উৎসব এবার যথারীতি মহর্ষিদেবের সুপ্রশস্ত প্রাঙ্গণেই অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। বহুকাল পরে পূজ্যপাদ শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এবার অধ্যাপক শ্রীযুক্ত ক্ষিতিমোহন সেন মহাশয়কে সঙ্গে লইয়া বেদী গ্রহণ করিয়াছিলেন। শারীরিক অসুস্থতানিবন্ধন রবীন্দ্রনাথ কেবলমাত্র তাঁহার উদ্বোধনী বাণী শুনাইয়াছিলেন; উপদেশের ভার লইয়াছিলেন অধ্যাপক শ্রীযুক্ত ক্ষিতিমোহন সেন। রবীন্দ্রনাথ তাঁহার স্বভাবসুমিষ্ট কণ্ঠে সমবেত উপাসকবর্গকে এই বলিয়া উদ্বোধিত করিলেন যে,—"আজিকার এই উৎসবকে কোন সাম্প্রদায়িক উৎসব বলিয়া মনে করিলে আমরা ভুল করিব। সকল ধর্ম্মই অসাম্প্রদায়িক ভাবে প্রথমে উদ্ভূত হয় সাধকের অন্তরে। বিষয়বুদ্ধিসম্পন্ন সাংসারিক মানুষ তাহার উপর আপনাদের উত্তরাধিকার স্বত্ব আরোপ করিতে গিয়া সাধকের সাধনাকে হারাইয়া ভেদবুদ্ধির প্রাচীর গড়িয়া তুলে। যুগে যুগে দেশে দেশে ধর্ম্ম এমনই করিয়া চিরদিন নিগৃহীত হইয়া আসিতেছে। এই সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধির কারাগারকে আজ ভাঙ্গিয়া ফেলিতে হইবে; অন্তরের মাঝে জাগ্রত করিয়া তুলিতে হইবে সেই সাধকের সাধনাকে, যিনি ৯৭ বৎসর পূর্ব্বে এমনই দিনে প্রচলিত সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধির গণ্ডীকে অতিক্রম করিয়া আপন সাধনার আলোকে একাকী সত্যপথের সন্ধানে জয়যাত্রা করিয়াছিলেন।" অধ্যাপক ক্ষিতিমোহন সেন মহাশয়ের উপদেশ প্রধানতঃ সাধক কবি কবীরের 'দোঁহা' অবলম্বনে বিরচিত হইয়াছিল। এই 'ভক্তবাণী' অবলম্বনে রবীন্দ্রনাথের উদ্বোধনের প্রতিধ্বনি করিয়া ক্ষিতিমোহনবাবু ধর্ম্মের অসাম্প্রদায়িক রূপের যে নাতিদীর্ঘ ব্যাখ্যান দিয়াছিলেন, তাহা বড়ই মনোজ্ঞ হইয়াছিল।

সায়ংকালের সঙ্গীতগুলি এবার শ্রীযুক্ত দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের পরিচালনায় শান্তিনিকেতনের ছাত্রী—বালিকাগণ কর্ত্তৃক গীত হইয়াছিল।

১২ই মাঘ বুধবার উৎসবের 'শান্তিবাচন' হয়। এই দিন সন্ধ্যা ৬॥ ঘটিকায় আদিব্রাহ্মসমাজ মন্দিরে শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকুমার মিত্র ও শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুরের একত্র বেদীগ্রহণের কথা ছিল; কিন্তু শারীরিক অসুস্থতা-নিবন্ধন কৃষ্ণকুমারবাবু বেদীর নিম্নেই আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। ক্ষিতীন্দ্রবাবু একাকী যথারীতি উদ্বোধন ও স্বাধ্যায় পাঠ করিলে কৃষ্ণকুমারবাবু রাজা রামমোহন ও মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের কর্ম্মক্ষেত্র, ব্রাহ্মসমাজের আদি প্রতিষ্ঠান এই আদিব্রাহ্মসমাজের প্রাচীন কাহিনী ও গৌরবের ব্যাখ্যা করিয়া ইহার প্রতিষ্ঠাদিবসে বাঙ্গালার সমাজজীবনের কিরূপ ভীষণ অধোগতি ঘটিয়াছিল তাহা জলন্ত ভাষায় বর্ণনাপূর্ব্বক একটী নাতিদীর্ঘ উপদেশ দান করিলেন। অতঃপর যথারীতি সঙ্গীতাদি হইয়া শান্তিবাচনপূর্ব্বক উপাসনা ভঙ্গ হইল।

এবারকার ব্রহ্মোৎসবের সর্ব্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য ঘটনা—'সার্ব্বজনীন ব্রহ্মোৎসব'। সিটিকলেজের সুপ্রশস্ত প্রাঙ্গণে সুবৃহৎ মণ্ডপ রচনা করিয়া গত ১৩ই, ১৪ই ও ১৫ই মাঘ দিবসত্রয়ব্যাপী এই ব্রহ্মোৎসবের আয়োজন

ও অনুষ্ঠান হইয়াছিল। ১৩ই মাঘ বৃহস্পতিবার অপরাহ্ণ ৬ ঘটিকায় পূজ্যপাদ রবীন্দ্রনাথ কর্ত্তৃক উহার উদ্বোধনের কথা হয়। কিন্তু তিনি উপস্থিত হইতে না পারায় শ্রীযুক্ত বিপিনচন্দ্র পাল 'যৌবনের জাগরণ' বিষয়ে একটি সুন্দর বক্তৃতা করিয়াছিলেন। অপরাহ্ণে আলোচনাসভায় আচার্য্য শ্রীযুক্ত প্রফুল্লচন্দ্র রায় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। ১৪ই মাঘ শুক্রবারের মহিলাসম্মিলনের নেতৃত্বভার গ্রহণ করিয়াছিলেন শ্রীমতী অবলা বসু। ১৫ই মাঘ শনিবার অপরাহ্ণ ৩॥০ ঘটিকায় যে সর্ব্বশাখাসম্মিলনের অনুষ্ঠান হয়, তাহার সভাপতি-পদে বৃত হইয়াছিলেন শ্রদ্ধাস্পদ আচার্য্য শ্রীযুক্ত ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর। এই উপলক্ষে তিনি যে অভিভাষণ পাঠ করিয়াছিলেন উহা যেমন সত্যপূত তেমনই সুসঙ্গত ও উদ্দীপক হইয়াছিল। বিচ্ছিন্ন শাখাত্রয়ের মধ্যে কবে কোন্ পুণ্যলগ্নে প্রথম মিলনের বাতাস বহিয়াছিল, তারপর কত অনুকূল-প্রতিকূল অবস্থার মধ্য দিয়া ধীরে ধীরে ভগবদিচ্ছিতে তাহার এই বর্ত্তমান পরিণতি, এসকলই ক্ষিতীন্দ্রনাথ তাঁহার অভিভাষণের মধ্যে সুস্পষ্টরূপে উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি ইহাও বলিয়াছেন যে, ব্রাহ্মসমাজের এই যে অধোগতি, তাহার পূর্ব্বলব্ধ স্থান হইতে এই যে পতন—এ সকলই একমাত্র সংহতিশক্তির অভাবেই ঘটিয়াছে; আজ যদি আমরা অতীতের সকল ত্রুটী-বিচ্যুতি বিস্মৃত হইয়া পরস্পর সম্মিলিত হইতে পারি, তবে আবার আমরা ভারতের জয়যাত্রায় অগ্রগামী সেবকরূপে বরিত হইব। আমরা পরবর্ত্তী সংখ্যায় তাঁহার এই জ্ঞানগর্ভ অভিভাষণ প্রকাশ করিব। এইদিন স্যর রাজেন্দ্রনাথ মুখার্জ্জি, শ্রীযুত বিজয়চন্দ্র মজুমদার, শ্রীযুক্ত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ সরকার, ডাঃ ভি রায়, শ্রীযুক্ত বিপিনচন্দ্র পাল প্রভৃতি বহু খ্যাতনামা ব্যক্তিগণ সমাজসমস্যা বিষয়ে বক্তৃতা করিয়াছিলেন, এবং স্বনামধন্য লর্ড সিংহ এই সার্ব্বজনীন ব্রহ্মোৎসবের পরিপূর্ণ সার্থকতা প্রার্থনা করিয়া যে প্রেমপূত বাণী প্রেরণ করিয়াছিলেন তাহা সভায় পঠিত হইয়াছিল। সর্ব্বশেষে ভাই শ্রীযুক্ত প্রমথলাল সেন সংকীর্ত্তনে উপাসনা পূর্ব্বক 'শান্তিবাচন' করিলে সভা ভঙ্গ হয়।

উপরি-উক্ত সভাধিবেশন ছাড়া প্রতিদিন সায়ং প্রাতে উপাসনা ও কথকতাদিরও আয়োজন হইয়াছিল। শ্রীযুত সতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী, ডাঃ শ্রীযুত প্রাণকৃষ্ণ আচার্য্য কুচবিহারের মহারাণী শ্রীমতী সুনীতি দেবী প্রভৃতি সে সকলের ভার গ্রহণ করিয়াছিলেন।

এই সম্মিলিত ব্রহ্মোৎসবের 'সার্ব্বজনীন' নামকরণ বড়ই সুসঙ্গত হইয়াছিল; কারণ এই উৎসব কেবল ব্রাহ্মসমাজের গণ্ডীর মধ্যেই বাঁধা পড়ে নাই—হিন্দু সমাজেরও বহু নর-নারী ইহা সানন্দে উপভোগ করিয়াছিলেন।

এই উৎসব-অনুষ্ঠান উপলক্ষে ডাঃ নবজীবন বন্দ্যোপাধ্যায়, ডাঃ কালিদাস নাগ প্রভৃতি ব্রাহ্মসমাজের অগ্রগামী যুবকগণের উৎসাহ ও উদ্যম প্রশংসনীয়।

গ্রন্থপরিচয়।

অতি আধুনিক বাংলাকথা সাহিত্য।—শ্রীযুক্ত প্রমথ চৌধুরী মহাশয়ের সভাপতিত্বে প্রবাসী বঙ্গ-সাহিত্যসম্মিলনের দিল্লীনগরীস্থ পঞ্চমাধিবেশনে শ্রীঅমল কুমার হোম কর্ত্তৃক পঠিত। পৃষ্ঠা ১৯।

লেখক সংক্রামক ব্যাধির ন্যায় পরিবর্দ্ধমান আধুনিক বাংলা গল্পসাহিত্যের দোষগুলি অতি বিচক্ষণতার সহিত বিশ্লেষণ করিয়া আমাদের জাতীয় চরিত্রে উহাদের বিষময় প্রভাব নিখুঁতভাবে প্রদর্শন করিয়াছেন। সমগ্র পুস্তকটীর কোন অংশেই আমরা কোন অবান্তর আলোচনার আভাস পাইলাম না—উহার প্রতি পংক্তিটীই সারবান্ বলিয়া মনে হইল; লেখক 'সত্যং শিবং সুন্দরং'কে সমূহ সংসাহিত্যের লক্ষ্যস্বরূপ নির্দ্দেশ করিয়া সুক্ষ্মানুভূতি ও সুগভীর অন্তর্দৃষ্টির সাহায্যে বাস্তব সাহিত্য গড়িয়া তুলিবার যে পরামর্শ দিয়াছেন তাহা সত্যই প্রশংসনীয়। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে রায়বাহাদুর শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন সিংহ তাঁহার 'সাহিত্যে স্বাস্থ্যরক্ষা' নামক পুস্তক এবং শ্রীযুক্ত ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় তাঁহার 'আর্ট ও সাহিত্যে' যে নির্ভীক সত্য উক্তির অবতারণা করিয়াছিলেন, লেখক কল্যাণকর-পথানুবর্ত্তী হইয়া সেই সত্য উক্তিরই আন্তরিক সমর্থন করিয়া আমাদিগকে আশান্বিত করিয়াছেন। লেখকের রচনাভঙ্গীর প্রশংসা আমরা শতবার করিব, জাতীয় চরিত্রে ইহা সুমিষ্ট ঔষধের ন্যায় কার্য্য করিবে। আমরা এবংবিধ জাতীয় কল্যাণকামী আরও লেখকের প্রত্যাশা করি; সুকঠিন ব্যাধিগ্রস্ত জাতীয় সাহিত্যকে নিরাময় করিবার ইহাই সফলতা ঔষধ।। শ্রীপঃ রাঃ।

রামায়ণ (বাল্মীকি অনুসরণে)।—লব্ধপ্রতিষ্ঠ সাহিত্যিক রায়বাহাদুর শ্রীযুক্ত দীননাথ সান্যাল বি-এ, এম-বি মহাশয় প্রণীত। মূল্য ১॥০। পৃষ্ঠা ২৩১+৫।

পাঠকগণের নিকট দীননাথ বাবুর নূতন করিয়া পরিচয় দিবার কোন প্রয়োজন আছে মনে করি না। সুপ্রসিদ্ধ প্রবীণ সাহিত্যিক সান্যালমহাশয় রামায়ণের একটী সুন্দর সচিত্র সংস্করণ প্রকাশ করিয়াছেন। বাল্মীকি রামায়ণ অবলম্বনে প্রাঞ্জল ভাষায় এই গ্রন্থটী রচনা করিয়া লেখক বঙ্গসাহিত্যের একটী বিশেষ অভাব

মোচন করিয়াছেন। আদি কবি বিরচিত রামচরিত স্বতঃই মধুর, তদুপরি লেখকের রচনাভঙ্গী ইহাকে মধুরতর করিয়া তুলিয়াছে। বঙ্গদেশে আরও কয়েকখানি রামায়ণ প্রচলিত থাকিলেও, এই রামায়ণ-রচনার প্রয়োজন কেন হইল?—গ্রন্থকার ভূমিকায় তাহা বিশদভাবে বুঝাইয়া দিয়াছেন। পরিশেষে আমাদের বক্তব্য এই যে, গ্রন্থখানিকে বর্ত্তমান যুগোপযোগী সারগর্ভ ও সংক্ষিপ্ত আকারে সুরচিত করিয়া সাধারণের সুখপাঠ্য করার জন্য তিনি সকলেরই ধন্যবাদার্হ। ইহার প্রতিপত্রে গ্রন্থকারের পাকা হাতের চিহ্ন সুস্পষ্ট দেদীপ্যমান। গ্রন্থের ভাষা এত সরল যে বালকেও উহা পাঠ করিয়া অনায়াসেই রসবোধ করিতে পারিবে; অথচ উহা গ্রাম্যতাদোষদুষ্ট নহে। গ্রন্থকারের সর্ব্বাপেক্ষা বাহাদুরী এই যে, অল্প কয়েকটি পৃষ্ঠার মধ্যেই তিনি নিপুণভাবে রামায়ণের সকল ঘটনাই সন্নিবিষ্ট করিয়াছেন, অথচ ইহার রসভাগও অব্যাহত রাখিয়া গিয়াছেন। এইখানেই পাকা হাতের পরিচয়। ইহা বালক-বালিকাগণকে উপহার দিবার পক্ষেও বিশেষ উপযোগী হইয়াছে। আমরা এই পুস্তকের বহুল প্রচার ইচ্ছা করি। আমাদের মনে হয়, এরূপ গ্রন্থ বিদ্যালয়ের উচ্চশ্রেণীরও পাঠ্যতালিকাভুক্ত হওয়া উচিত। তিনি ঠিকই বলিয়াছেন—"ভারতে আর্য্যসভ্যতা যখন উন্নতির উচ্চতম শিখরে উঠিয়াছিল, রামায়ণ সেই সময়ের কাব্যাভিব্যক্তি। সুতরাং সেই যুগের বাণী, আদর্শ ও ধারা··· জানিতে ও বুঝিতে হইলে ঐ রামায়ণের সহিত পরিচিত হওয়া আবশ্যক।" কবি কৃত্তিবাস বিরচিত রামায়ণ একখানি খুব ভাল গ্রন্থ হইলেও মূল রামায়ণের সমসাময়িক চিত্র তাহাতে পাওয়া যাইবে না। কিন্তু এই কার্য্যবাহুল্যের দিনে কিঞ্চিদধিক ২৪০০০ শ্লোকের কাব্যগ্রন্থ পড়িবার অবসর খুব অল্প লোকেরই আছে। তাই মূল রামায়ণে বিকশিত আর্য্যসভ্যতার সমুজ্জ্বল নিদর্শন ও চিত্রের সহিত শিক্ষিত বাঙ্গালীর ঘনিষ্ঠ পরিচয় করাইবার জন্যই লেখক সরল গদ্যে বাল্মীকি-রামায়ণের এই সার সঙ্কলন করিয়াছেন।

শোকসংবাদ।

৺নীলিমা দেবী।—তত্ত্ববোধিনী ও অন্যান্য বাঙ্গালা মাসিকের লেখক, কবিগুণাকর শ্রীযুক্ত আশুতোষ মুখোপাধ্যায় বি-এ মহাশয়ের ৯ম বৎসরের কন্যা কুমারী নীলিমা দেবী বসন্তরোগে আক্রান্ত হইয়া গত ১৪ই অগ্রহায়ণ মঙ্গলবার অকালে মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে। কন্যা-বিয়োগ-বিধুর পিতাকে আমরা আমাদের হৃদয়ের সুগভীর সমবেদনা জানাইতেছি। ভগবান বালিকার লোকান্তরিত আত্মাকে তাঁহার স্নেহময় ক্রোড়ে আশ্রয় দান করুন।

দান-প্রাপ্তিস্বীকার।

১৮৪৭ শক।

(১৮৪৫ ও ৪৬ শকের দানপ্রাপ্তি ১৮৪৭ শকের শ্রাবণ-সংখ্যায় দ্রষ্টব্য।)

এককালীন দান।

রায় সাহেব শ্রীপ্রাণকৃষ্ণ সেন	৩৲

বাৎসরিক দান।

শ্রীযুক্ত সিদ্ধেশ্বর মুকুল	৫৲

মাঘোৎসবের দান।

শ্রীযুক্ত চিন্তামণি চট্টোপাধ্যায়	১৲
„ অমূল্যকৃষ্ণ সেন	১৲
„ সুধীরচন্দ্র বিশ্বাস	১৲
„ বঙ্কিমচন্দ্র দত্ত	৷৷৹
„ বিজয়কৃষ্ণ দত্ত	।৹
„ হরিশ্চন্দ্র মিত্র	৯৲
„ সুশীলকুমার গুপ্ত	১৲
„ উমাচরণ মিত্র	৯৲
„ বিষ্ণুচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়	৫৲
„ তুলসীদাস দত্ত	২৲
„ বিজয়চন্দ্র সিংহ	৫৲
„ অবিনাশচন্দ্র বসু	১৲
„ কালীপ্রসন্ন বিশ্বাস	১০৲
	২৯৸৹

আনুষ্ঠানিক দান।

শ্রীমতী প্রফুল্লময়ী দেবী	৫৲
„ হিরণ্ময়ী দেবী	৩৸৹
	৮৸৹
মোট	৪৬৷৷/৹

১৮৪৮ শকের বৈশাখ হইতে পৌষ মাস পর্য্যন্ত।

এককালীন দান।

শ্রীযুক্ত নরেন্দ্র চন্দ্র ঘোষ	২৫৲
„ শিতিকণ্ঠ মল্লিক	১০০৲

বাৎসরিক দান।

পি. মুখার্জ্জি এস্কোয়ার	৬৸৹

আনুষ্ঠানিক দান।

শ্রীসতীশ চন্দ্র ঘোষ	১০৲
শ্রীযতীন্দ্রকুমার বসু	৫৲

বিশেষ কার্য্যের দান।

শ্রীশিতিকণ্ঠ মল্লিক	১৲
শ্রীপাঁচুগোপাল মল্লিক	১৲
শ্রীনির্ম্মলচন্দ্র বড়াল	১৲
	১৪৯৸৹

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার মূল্য-প্রাপ্তিস্বীকার। *

১৮৪৭ শক।

(১৮৪৫ ও ৪৬ শকের মূল্যপ্রাপ্তি ১৮৪৭ শকের শ্রাবণ-সংখ্যায় দ্রষ্টব্য।)

বকেয়া।

শ্রীযুক্ত হরিপদ ত্রিবেদী	(১৮৪২-৪৫ শক)	৮৲
ডাক্তার শ্রীউপেন্দ্রকৃষ্ণ চৌধুরী	(১৮৪১-৪৩ শক)	৯৲
শ্রীযুক্ত কনকচন্দ্র বড়াল	(১৮৪৬ শক)	২৲
„ অবিনাশচন্দ্র দাস গুপ্ত	(১৮৪৬ শক)	২৲
„ সুশীলকুমার গুপ্ত	(১৮৪৫ শক)	২৲
„ „	(১৮৪৬ শক)	।/০
মিস্ এস্ ঘোষ	(১৮৪৫-৪৬ শক)	৬৲
শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রনাথ ঘোষ	(১৮৪২-৪৩ শক)	৩৲
„ „	(১৮৪৪-৪৫ শক)	৩৲
„ বেহারীলাল মল্লিক	(১৮৪৬ শক)	৩৲
„ পান্নালাল দে	(১৮৪৬ শক)	৩৲
„ নিত্যানন্দ চন্দ্র	(১৮৪৬ শক)	৩৲
„ মধুসূদন জানা	(১৮৪০-৪১ শক)	৪৲
„ রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী	(১৮৪২-৪৪ শক)	৯৲
„ ভগবানচন্দ্র দাস	(১৮৪০-৪৩ শক)	৮৲
রায় সাহেব রাধাগোবিন্দ রায়	(১৮৪২-৪৬ শক)	১৫৲
শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন দাস	(১৮৪৩-৪৪ শক)	৪৲
„ „	(১৮৪৫ শক)	॥৵০
„ বিমলচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়	(১৮৪৬ শক)	২৲
„ বরদাপ্রসন্ন রায়	(১৮৪৬ শক)	২৲
„ চারুচন্দ্র বসু	(১৮৪৬ শক)	৩৲
„ অবিনাশচন্দ্র পাল	(১৮৪৬ শক)	২৲
„ অক্ষয়কুমার সিংহ	(১৮৪৫-৪৬ শক)	২৲
পি. এম্ দত্ত স্কোয়ার	(১৮৪৬ শক)	৩৲
শ্রীযুক্ত শ্রীশচন্দ্র মল্লিক	(১৮৪৬ শক)	২৲
শ্রীমতী প্রেমলতা দেবী	(১৮৪৬ শক)	২৲
শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন বিশ্বাস	(১৮৪৫-৪৬ শক)	৬৲
„ উমাচরণ মিত্র	(১৮৪৬ শক)	১॥০
„ অক্ষয়কুমার দত্ত	(১৮৪৬ শক)	৩৲
„ শরৎচন্দ্র ঘোষ	(১৮৪২-৪৫ শক)	১২৲
„ রমেশচন্দ্র দত্ত	(১৮৪৩-৪৫ শক)	৯৲
এস্ কে, লাহিড়ী এস্কোয়ার	(১৮৪৫ শক)	৩৲
শ্রীযুক্ত ভুজেন্দ্রনাথ মিত্র	(১৮৪৪ ৪৫ শক)	৩৲
„ গয়ারাম পাল	(১৮৩৭-৪৫ শক)	১৮৲
শ্রীযুক্ত প্রফুল্লকৃষ্ণ বাগচী	(১৮৪৫ শক)	২৲
পি, এন, ভট্টাচার্য্য	(১৮৪৬ শক)	২৲
		১৫৮॥৴০

হাল।

রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত বসন্তকৃষ্ণ বসু	(১৮৪৭ শক)	৲
„ শিশিরকুমার দত্ত	„	১॥০
„ কৃষ্ণদাস দে	„	২৲
„ ভূপেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়	„	৩৲
„ রজনীমোহন চট্টোপাধ্যায়	„	২৲
„ মদনমোহন সেন	„	৩৲
„ হরিমোহন চট্টোপাধ্যায়	„	৩৲
মিসেস্ এস হালদার	„	২৲
শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়	„	৩৲
শ্রীমতী রমলা বসু	„	২৲
„ স্বর্ণলতা রায়	„	২৲
Rev. G. Schanzlin	„	৩৲
শ্রীমতী লাবণ্যলতা গুহ	„	২৲
শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র সরকার	(১৮৪৭ শক)	৩৲
„ অমৃতনাথ মুখোপাধ্যায়	„	৩৲
শ্রীমতী ইন্দিরা দেবী	„	২৲
শ্রীযুক্ত হরেন্দ্রনারায়ণ রায়	„	৫৲
„ উপেন্দ্রনাথ বল	„	৩৲
„ জানকীলাল বসু	„	৩৲
„ জিতেন্দ্রনাথ দাস	„	২৲
শ্রীমতী বরদাসুন্দরী দেবী	„	২৲
„ দময়ন্তী দাস	„	২৲
শ্রীযুক্ত নলীনচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়	„	৩৲
মিসেস, প্রতিভা ঘোষ	„	২৲
শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র দত্ত	„	১॥০
পি, মুখার্জ্জি এস্কোয়ার	„	৩৲
শ্রীযুক্ত পরমানন্দ দত্ত	„	৩৲
মিসেস্ এস্, ঘোষ	„	২৲
শ্রীমতী শ্যামভাবিনী বসু	„	২৲
শ্রীযুক্ত সত্যপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায়	„	৩৲
D. T. Tondwalkar Esqr.	„	৩৲
শ্রীযুক্ত বিপিনবেহারী মুখোপাধ্যায়	„	২৲
„ বেহারীলাল মল্লিক	„	৩৲
„ পান্নালাল দে	„	৩৲
„ নিত্যানন্দ চন্দ্র	„	৩৲
„ নবকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য	„	২৲
„ এ, সি চট্টোপাধ্যায়	„	৩৲

* মাশুলের প্রাপ্তিস্বীকার করা হইল না।

রায় সাহেব শ্রীরাধাগোবিন্দ রায় ,, ৩৲
শ্রীযুক্ত বরদাপ্রসন্ন রায় ,, ২৲
,, বিমলচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় ,, ২৲
,, চারুচন্দ্র বসু ,, ৬৲
H. Hydar Esqr. ,, ৬৲
শ্রীযুক্ত পি, এন, দত্ত ,, ৩৲
,, তারকনাথ রায় চৌধুরী ,, ২৲
B. P. D. Mittra Esqr. ,, ৩৲
শ্রীযুক্ত কমললোচন দাস ,, ৬৲
,, যতীন্দ্রনাথ পাল ,, ৩৲
,, পরমানন্দ দত্ত ,, ৬৲
শ্রীমতী প্রেমলতা দেবী ,, ২৲
মিসেস্ কিরণ বসু ,, ২৲
শ্রীযুক্ত জিতরাজ দাস ,, ৩৲
,, কালীপ্রসন্ন বিশ্বাস ,, ৩৲
,, বিষ্ণুচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ,, ৩৲
,, তুলসীদাস দত্ত ,, ৩৲
,, পান্নালাল মিত্র ,, ৩৲

১০৯॥০

অগ্রিম।

মিসেস্ এস, হালদার (১৮৪৮ শক) ২৲
শ্রীযুক্ত অমৃতনাথ মুখোপাধ্যায় ,, ৶০
শ্রীমতী শ্যামতারিনী বসু ,, ॥০
শ্রীযুক্ত পান্নালাল মিত্র ,, ৩৲
,, মদনমোহন সেন ,, ৩৲
,, বেহারীলাল মল্লিক ,, ৩৲

১১৸০

১৮৪৮ শক—পৌষ মাস পর্য্যন্ত।

বকেয়া।

সম্পাদক রেঙ্গুণব্রাহ্মসমাজ (১৮৪২—৪৭ শক) ১৮৲
শ্রীযুক্ত সুশীলকুমার গুপ্ত (১৮৪৬ শক) ১॥৶০
,, ,, (১৮৪৭ শক) ২৲
মিসেস্ জে, মুখার্জ্জি (১৮৪৭ শক) ২৲
শ্রীযুক্ত তারকনাথ প্রামাণিক (১৮৪৬—৪৭ শক) ৬৲
শ্রীমতী হেমাঙ্গিনী বসু (১৮৪৩—৪৬ শক) ৮৲
,, ,, (১৮৪৭ শক) ২৲
,, প্রভাবতী দেবী (১৮৪৭ শক) ২৲
মিসেস্ রেণুকা গাঙ্গুলী (১৮৪৬ শক) ২৲
শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ (১৮৪৬—৪৭ শক) ৬৲
শ্রীমতী সুনন্দিনী দেবী (১৮৪৭ শক) ৫৲
শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ বসাক (১৮৪৬—৪৭ শক) ৬৲
,, কাঙ্গালীচরণ দে (১৮৪৭ শক) ৩৲
শ্রীমতী হেমমালা বসু (১৮৪৭ শক) ২৲
শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র মল্লিক (১৮৪৬—৪৭ শক) ১২৲
,, হরিপদ ত্রিবেদী (১৮৪৬ শক) ১৲
রায় বাহাদুর চুণীলাল বসু (১৮৪৭ শক) ৩৲
মিসেস্ এস, এন, বানার্জ্জি (১৮৪৫ শক) ৬৲
শ্রীযুক্ত অবিনাশচন্দ্র পাল (১৮৪৭ শক) ২৲
শ্রীযুক্ত মদনচন্দ্র আচার্য্য (১৮৪৬—৪৭ শক) ৬৲
,, সুরেন্দ্র মোহন গুহ (১৮৪৫—৪৭ শক) ৬৲
শ্রীমতী লাবণ্যলতা চন্দ (১৮৪৬—৪৭ শক) ৩৸০
শ্রীযুক্ত বিশ্বেশ্বর সেন (১৮৪৭ শক) ৩৲
মহামান্য ডিরেক্টর অব পাবলিক ইনষ্ট্রাকসন (১৮৪৭ শক) ২৪৲

১২২৸০

দান।

শ্রীযুক্ত বরদাপ্রসন্ন রায় (১৮৪৮ শক) ২৲
রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত বসন্তকৃষ্ণ বসু ,, ৩৲
শ্রীমতী প্রভাবতী দেবী ,, ১৸০
মিসেস কিরণ বসু ,, ২৲
রায় সাহেব শ্রীরাধাগোবিন্দ রায় ,, ৬৲
শ্রীযুক্ত কৃষ্ণদাস দে ,, ২৲
B. P. D. Mittra Esqr. ,, ৬৲
শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রপতি মুস্তফী ,, ৩৲
P. Mukerjee Esqr. ,, ৬৲
মিসেস্ এস, এন্, ব্যানার্জি ,, ৬৲
শ্রীসতীশচন্দ্র ঘোষ ,, ২৲
শ্রীযতীন্দ্রকুমার বসু ,, ৩৲
শ্রীসুরেন্দ্রমোহন গুহ ,, ২৲
শ্রীসতীশচন্দ্র মল্লিক ,, ৬৲
শ্রীবিশ্বেশ্বর সেন ,, ৩৲

৪১৸০

Tattwabodhini Patrika

Reg. No. C. 462

একবিংশ কল্প

চতুর্থ ভাগ

ফাল্গুন, ব্রাহ্মসম্বৎ ৯৭।

১০০৩ সংখ্যা ১৮৪৮ শক

তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা

"ব্রহ্ম বা একমিদমগ্র আসীন্নান্যৎ কিঞ্চনাসীত্তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রন্নিরবয়বমেকমেবাদ্বিতীয়ম্ সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয়ং সর্ব্ববিৎ সর্ব্বশক্তিমদ্ধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্যসাধনঞ্চ তদুপাসনমেব"।

সম্পাদক—

শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও ডাক্তার শ্রীবনওয়ারিলাল চৌধুরী ডি, এস্‌সি

সহঃ সম্পাদক—শ্রীক্ষেমেন্দ্রনাথ ঠাকুর বি, এস-সি।

৫৫ নং অপার চিৎপুর রোড্ কলিকাতা, আদিব্রাহ্মসমাজ যন্ত্রে শ্রীরণগোপাল চক্রবর্ত্তী দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

সাল ১৩৩৩। খৃঃ ১৯২৭। সম্বৎ ১৯৮৩। কলিগতাব্দ ৫০২৭। ফাল্গুন।

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার বার্ষিক মূল্য ৩৲ টাকা ডাকমাশুল ৶০ আনা। এই সংখ্যার মূল্য ।০ আনা। } আদিব্রাহ্মসমাজের কর্ম্মাধ্যক্ষের নামে পাঠাইতে হইবে।

"ব্রহ্ম বা একমিদমগ্র আসীন্নান্যৎ কিঞ্চনাসীত্তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রন্নিরবয়বমেকমেবাদ্বিতীয়ম্
সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয়ং সর্ব্ববিৎ সর্ব্বশক্তিমদ্ধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া
পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্যসাধনঞ্চ তদুপাসনমেব"।

সম্পাদক—
শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও ডাক্তার শ্রীবনওয়ারিলাল চৌধুরী ডি, এস্‌সি
সহঃ সম্পাদক—শ্রীক্ষেমেন্দ্রনাথ ঠাকুর বি, এস-সি।

কলিগতাব্দ ৫০২৭। সম্বৎ ১৯৮৩। খৃঃ ১৯২৭। শক ১৮৪৮। সাল ১৩৩৩।

কর্ত্তব্য সাধন।

(৯৭ তম ব্রহ্মোৎসব উপলক্ষে)

(শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর)

ভগবানের নামে আমাদের সকলেরই হৃদয়তন্ত্রী আজ এই উৎসবের দিনে সমভাবে ঝঙ্কার দিয়া উঠুক। আজ এই উৎসবের দিনে আমরা দেশবাসী সকলকে—ধনী-দরিদ্র উচ্চ নীচ ও সম্প্রদায়নির্ব্বিশেষে সকলকেই সাদরে আহ্বান করিয়া বলিতেছি যে, সত্যধর্ম্মের উপর দাঁড়াইয়া সকলে একপ্রাণে মিলিত হও এবং মৈত্রীকে ব্যবহারের নিয়ামক কর। আজ এই নবজাগরণের দিনে সেই এক মাত্র অদ্বিতীয় পরব্রহ্মকে একমাত্র প্রত্যক্ষ পিতামাতা জানিয়া জীবনকে ধন্য কর এবং মিলনের এই মহামন্ত্রে দীক্ষিত হও—সংগচ্ছধ্বং সংবদধ্বং সং বো মনাংসি জানতাং—একসঙ্গে চল, একসঙ্গে কথা বল এবং পরস্পরের মন অবগত হও। দেশের বর্ত্তমান অবস্থায় মৈত্রীসাধনের যুগ আসিয়াছে। এখন মতামত লইয়া বিবাদবিসম্বাদের পরিবর্ত্তে মৈত্রীভাবের উপর দাঁড়াইয়া ভগবানের প্রিয়কার্য্য সাধনে অগ্রসর হইতে হইবে।

বর্ত্তমান শুভ অবসরে সমস্ত ভেদাভেদ ভুলিয়া সমস্ত বিবাদবিসম্বাদ ভুলিয়া ভগবানের প্রিয়কার্য্যসাধনে নির্ভয়ে অগ্রসর হও। তাঁহার অভয়বাণী আমাদিগকে প্রতি মুহূর্ত্তেই গর্জ্জিয়া উঠিয়া বলিতেছে—নিদ্রালস্য দূর করিয়া জাগ্রত হও, বিরোধবিবাদ দূর করিয়া শুভকর্ম্মে, কর্ত্তব্য-কর্ম্মসম্পাদনে আপনাকে নিযুক্ত কর। ইংরাজজাতি যেমন কথায় কথায় শতবিধ আকারে প্রকারে নেলসনের এই জাগরণবাণী পরস্পরকে শুনাইতে উদ্যত হয় যে, "ইংলণ্ড তাহার প্রত্যেক সন্তানকে কর্ত্তব্যসাধনের পথে দেখিতে আশা করে", আমরাও সেইরূপ ব্রহ্মের উপাসকমাত্রকেই মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের এই জাগরণবাণী শুনাইয়া উৎসাহিত করিতে চাই যে, 'ব্রহ্মোপাসকেরা কি জ্ঞানে, কি বিদ্যায়, কি ধর্ম্মে, কি অর্থে সকল বিষয়ে সর্ব্বাপেক্ষা উন্নত না হইলে ব্রাহ্মসমাজের পতন অবশ্যম্ভাবী'। শুভকর্ম্ম করিয়া যাও, কর্ত্তব্যকর্ম্ম করিয়া যাও—ফলাফল ফলদাতা ভগবানের হস্তে সমর্পণ কর, দেখিবে, ব্রাহ্মসমাজ অচিরেই সর্ব্বত্র কিরূপ বিজয় লাভ করে।

ভগবদ্গীতায় একটী অমূল্য মহাবাণী সন্নিবিষ্ট দেখি, "কর্ম্মণ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন"—কর্ম্মেতেই তোমার অধিকার, ফলেতে কদাপি নহে। ব্রহ্মসাধনের পথে যিনিই অগ্রসর হইয়াছেন, তিনিই ইহার সার্থকতা উপলব্ধি করিবেন। ইহারই অনুরূপ বাণী বাইবেলের একটী সঙ্গীতেও দেখি। সেই সঙ্গীতের অর্থ হইতেছে এই যে, "ভগবানের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করিয়া সাধু-কার্য্যে অগ্রসর হও। তুমি যখন পৃথিবীতে আসিয়াছ, তখন নিশ্চয়ই আহার পাইবে। ভগবানেই তুমি আনন্দিত থাক, তিনিই তোমার হৃদয়ের বাসনা পূর্ণ করিবেন। ভগবানকে তোমার সকল কর্ম্ম নিবেদন কর এবং তাঁহার উপরেই একান্ত নির্ভর কর, তিনিই তাহা সফল করিবেন।" ইহা হইতে কেমন সুস্পষ্ট বুঝা যাইতেছে যে, সকল দেশের সকল সাধকেরই ঐ একই উপদেশ।

ভগবদ্গীতায় ঐ যে কর্ম্মমাত্রে অধিকারবিষয়ক মহাবাণী সন্নিবিষ্ট দেখি, ইহা সর্ব্বজনবিদিত যে, উহা কুরুক্ষেত্রের মহাসমরের মহাগর্জ্জন ভেদ করিয়াও সমুত্থিত

হইয়াছিল। এই বাণী সেই প্রলয়কালে প্রকটিত হইয়াছিল বলিয়াই ভারতবাসী সেই মহাপ্রলয়ের পরেও আজ পর্য্যন্ত জগত হইতে অন্তর্হিত হয় নাই; এবং নিজের উন্নত মস্তক উত্তোলিত করিয়া জগতের মহাসভায় নিজের উপযুক্ত স্থান অধিকার করিতে পারিয়াছিল। মুখে এই বাণী এতগুলি অক্ষরে প্রকাশ না করিলেও, অন্তত কার্য্যে যে দেশ যে জাতি এই বাণী অন্তরে ধারণ করিয়া কর্ম্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইবে, সেই দেশ সেই জাতি যে মরিতে মরিতেও বাঁচিয়া উঠিবে, ইউরোপের জর্ম্মনি প্রভৃতি দেশ তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ।

অপর দিকে, আমাদের বর্ত্তমান অবনতিও এই বাণীর সত্যতা পদে পদে সপ্রমাণ করিতেছে। আমরা কর্ত্তব্য কর্ম্ম সাধনের পথে যতটা অগ্রসর হই বা না হই, প্রথমেই কর্ম্মের ফলে কি লাভ হইবে, তাহাই গণনা করিতে বসি। আমাদের দৃষ্টি এখন কর্ম্মে অধিকারের প্রতি তত নয়, যত কর্ম্মফলের প্রতি; কর্ম্ম করিবার পরিবর্ত্তে কর্ম্মফলের জন্যই আমরা উন্মুখ। ইহার ফলে ভারতে মিথ্যার স্রোত বহিয়া চলিয়াছে এবং তাহার অবশ্যম্ভাবী ফল শতবিধ দুর্নীতি ভারতের সর্ব্বাঙ্গ ছাইয়া ফেলিতেছে— ভারতভূমি অবনতির পথে নামিয়া চলিতেছে। কর্ম্ম না করিয়া কর্ম্মফলের জন্য উন্মুখতা আত্মবঞ্চনা বা আত্মঘাতী হওয়ার অতিরিক্ত কিছুই নয়। ইতিহাস সপ্রমাণ করে যে, আত্মবঞ্চনা করিয়া কোন ব্যক্তি বা জাতি উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে পারে নাই। ধীরভাবে আলোচনা করিলেই বুঝা যাইবে যে, আত্মবঞ্চনার ফলেই আজ আমাদের পরস্পরের প্রতি সংশয় অবিশ্বাস জাগিয়া উঠিয়াছে; আমাদের ভিতরে স্নেহপ্রেম দয়াভক্তি অন্তর্হিত হইতে চলিয়াছে।

কর্ত্তব্য কর্ম্ম যদি না কর, তবে তোমাকে অকর্ত্তব্য কর্ম্ম করিতেই হইবে; শুভকর্ম্ম যদি না কর, তবে মন্দ কর্ম্ম করিতেই হইবে, কারণ মানুষ কর্ম্ম না করিয়া কখনই স্থির থাকিতে পারে না। এক টুকরো চীরখণ্ডের জন্যও তোমাকে কর্ম্ম করিতেই হইবে, একমুঠো ভাতের জন্যও তোমাকে কর্ম্ম করিতেই হইবে, চিন্তা করিতেই হইবে। কর্ম্ম যখন আমাদের করিতেই হইবে, চিন্তার হাত যখন আমরা কিছুতেই অতিক্রম করিতে পারিব না, তখন, যিনি সকল মঙ্গলের নিদান, সেই ভগবান আমাদের অন্তরে যে শুভবুদ্ধি প্রেরণ করিতেছেন, আমাদের সকল কর্ম্ম সকল চিন্তা সেই শুভবুদ্ধিরই অনুগত করা উচিত।

কর্ত্তব্য কর্ম্ম সম্পাদন করিয়া চল—নির্ভয়ে শুভকর্ম্ম করিয়া চল। ফলাফলের ভার সেই অন্তরের গুরু মঙ্গলবিধাতার হস্তে সমর্পণ কর। কেবল এইটুকু বিশ্বাস হৃদয়ে অটল রাখিও যে, কল্যাণকর্ম্মের অনুষ্ঠাতা কখনই দুর্গতি লাভ করেন না। সরল শুভবুদ্ধিতে ফলকামনারহিত হইয়া কর্ত্তব্যকর্ম্ম করিতে থাকিলে তুমি স্বভাবতই মানুষের নিন্দাপ্রশংসার অতীত হইতে পারিবে এবং বীরপদক্ষেপে সংসারে বিচরণ করিতে পারিবে। আর, সত্য কথা বলিতে কি, তোমার কার্য্যের তুমি কি-ই বা ফল চাহিতে পার? তোমার দৃষ্টি কতটুকু? যে দেবাধিদেব সমগ্র বিশ্বজগতকে মঙ্গলের পথে পরিচালিত করিতেছেন, যিনি সমগ্র বিশ্বজগতের ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র অণুপরমাণুরও পরস্পরেরমধ্যে এক আশ্চর্য্য যোগবন্ধন স্থাপিত করিয়াছেন, মঙ্গলই যাঁহার সৃষ্টির একমাত্র উদ্দেশ্য, তোমার কার্য্যের ফলে তিনি যে মঙ্গল বিধান করিবেন, তাহা অপেক্ষা তুমি আর কি শুভফল আনিতে পারিবে?

সময়ে সময়ে আমরা সেই মঙ্গলবিধাতা বিশ্বপিতার মঙ্গলভাবের পরিচয় পাই, প্রেমহস্ত উপলব্ধি করি; আবার সময়ে সময়ে করি না। ৯১ বৎসর অতীত হইতে চলিল, রাজা রামমোহন রায় যখন কয়েকজন বন্ধুকে লইয়া ব্রাহ্মসমাজ সংস্থাপিত করিয়াছিলেন, তখন, সেই ব্রাহ্মসমাজ সুদূর ভবিষ্যতে জগতের চিন্তাস্রোতে, ভারতের কর্ম্মক্ষেত্রে কি সুমঙ্গল বিপ্লব সাধন করিবে, তাঁহাদের মধ্যে কয়জন তাহা উপলব্ধি করিয়াছিলেন? মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ যখন মাত্র কয়েকজন বন্ধুকে লইয়া দীক্ষা গ্রহণ করিলেন, সুদূর ভবিষ্যতে সেই দীক্ষাগ্রহণের ফলে কত লোকের জীবন যে পরিবর্ত্তিত হইবে, তাহা কি তিনি উপলব্ধি করিয়াছিলেন? ব্রাহ্মসমাজের সেই আদিম কালের মুষ্টিমেয় প্রচারকদিগের চতুর্দ্দিকে অগ্নিকণা ছড়াইবার ফলে স্ত্রীশিক্ষা প্রভৃতি সাধু ভাবসকল আজ ভারতের অধিবাসীদিগের মর্ম্মে মর্ম্মে স্পর্শ করিবে, তাঁহাদের মধ্যে কেহই তাহা স্বপ্নেও ভাবিয়াছিলেন কিনা সন্দেহ।

আবার যখন সংঘবদ্ধ সেই মুষ্টিমেয় ব্রাহ্মোপাসকদিগেরই ভিতর সহসা মতভেদজনিত বিরোধবিচ্ছেদের ভীষণ বহ্নি প্রজ্বলিত হইল, কে ভাবিয়াছিল যে, তাহারও ভিতরে এক সুমহান মঙ্গলসূত্র অনুস্যূত ছিল? শিশুর জন্মের পূর্ব্বে যেমন মাতার অনেক দুঃখ ক্লেশ সহ্য করিতে হয়, আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে, অনেক অমূল্য সত্য প্রকাশিত হইবে বলিয়াই ব্রাহ্মসমাজকে বিবাদ বিসম্বাদের দুঃখযন্ত্রণা ভোগ করিতে হইয়াছিল। এই বিরোধবিবাদের কারণেই ব্রাহ্মসাধারণের মধ্যে সুমিষ্ট মিলনের প্রবল আকাংক্ষা আজ বহুকাল যাবৎ জাগিয়া উঠিয়াছে। সেই মিলনের বীজ আজ সুবৃহৎ মহীরুহে পরিণত হইয়া সমগ্র ব্রাহ্মসমাজকে আশ্রয়দানে উদ্যত হইয়াছে।

ইহা স্থির জানিও যে, বিবাদবিসম্বাদই কর আর

যাহা কিছু কর, তোমার অন্তরে যদি মঙ্গল ইচ্ছা থাকে, সাধুভাব থাকে, সত্যের উপর ধর্ম্মের উপর যথার্থ নিষ্ঠা ও নির্ভর থাকে, তবে ঈশ্বর তোমার সহায় হইবেন। ব্রাহ্মসমাজের লোকসংখ্যা মুষ্টিমেয় হইলেও পূর্ব্বতন আচার্য্য ও নেতাগণের অবিচলিত মঙ্গল ইচ্ছার কারণে, অন্তরের সম্ভাবের কারণে, সত্যের উপর, ধর্ম্মের উপর, ভগবানের উপর একনিষ্ঠার কারণে তাঁহাদের প্রচারিত সত্যসকল আজ সমগ্র ভারতের অধিবাসীদের আদরের বস্তু হইয়াছে। ইহা ধ্রুব সত্য যে, কল্যাণ কর্ম্মের অনুষ্ঠাতা কদাপি দুর্গতি প্রাপ্ত হন না, অর্থাৎ কল্যাণজনক কর্ম্ম আজ হৌক, কাল হৌক, দুদিন পরে হৌক, দশদিন পরে হোক, সুফলপ্রসূ হইবেই।

ব্রাহ্মধর্ম্মের সত্যসকল প্রচারের বর্ত্তমানে প্রশস্ত অবসর আসিয়াছে। দেশবাসীগণ সত্যধর্ম্মকে ঠিক ধরিতে না পারায় উদ্‌ভ্রান্ত চিত্তে নানা দিকে ছুটিয়া বেড়াইতেছে। চক্ষুষ্মান ব্যক্তি বুঝিতে পারিবেন যে, বাহিরের উচ্ছৃঙ্খলতার ভিতরে, দুর্নীতিপ্রবণতার ভিতরে, লঘুচিত্ততার ভিতরে দেশবাসীর অন্তরে এক সরল ও সবল ধর্ম্ম লাভ করিবার জন্য প্রবল আকাংক্ষা জাগ্রত হইয়া উঠিতেছে। সত্যধর্ম্ম প্রচারের এমন শুভ অবসর হেলায় হারাইলে ব্রাহ্মসমাজ অমার্জনীয় অপরাধে অপরাধী হইবে। এই মহাজাগরণের সময়ে সকল ব্রহ্মোপাসকের আত্মপর ভুলিয়া গিয়া মিলিত হইয়া ব্রহ্মনামের মহিমা, সত্যধর্ম্মের বীজ চারিদিকে বিক্ষিপ্ত করাই কর্ত্তব্য।

সত্যই এখন আমরা আশ্চর্য্য হইয়া ভাবি যে, এতদিন আমরা বিচ্ছিন্ন হইয়াছিলাম—কেন? আমাদের পরস্পরের মধ্যে—প্রভেদ—কোথায়? আমাদের মধ্যে মূলগত কোনই প্রভেদ তো দেখিতে পাই না। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ আমাদিগকে এই যে বীজমন্ত্র দিয়াছেন—তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্যসাধনঞ্চ তদুপাসনমেব—ভগবানকে সমস্ত হৃদয়ের সহিত প্রীতি করা এবং তাঁহার প্রিয়কার্য্যসাধন করাই তাঁহার একমাত্র উপাসনা—এই উদারতম ও সম্পূর্ণ অসাম্প্রদায়িক বীজমন্ত্র যখন প্রত্যেক ব্রহ্মোপাসকেরই অবলম্বনীয়, তখন ব্রহ্মোপাসকদিগের মধ্যে অন্যান্য অবান্তর বিষয়ে শত মতভেদ থাকিলেও বিবাদ বা মনোমালিন্য আসিবার কোনই অবকাশ নাই। আমাদের বুঝিতে হইবে যে, আমরা সত্যই একই ধর্ম্মের পতাকার নিম্নে একই পিতামাতার চরণ পূজার জন্য, তাঁহারই প্রবর্ত্তিত সত্যধর্ম্ম প্রচারের জন্য ব্রাহ্মসমাজে প্রবেশ করিয়াছি। ভগবান অনন্তস্বরূপ। তাঁহার অনন্তভাবের এক একটী কণা এক একটী নরনারীর অন্তরে বৈশিষ্ট্য লাভের চেষ্টা করিতেছে। এই কারণেই সংসারে এত বৈচিত্র্য। ইহা বুঝিয়া প্রত্যেক ব্রহ্মোপাসকের কর্ত্তব্য—মতপার্থক্যের প্রতি যথোচিত শ্রদ্ধাপ্রদর্শন পূর্ব্বক সত্যধর্ম্মের মূল বীজে একমত হইয়া প্রাণের অন্তরে সদ্ভাবে মিলিত হওয়া, পরস্পরের উন্নতিতে সুখী হওয়া, পরস্পরের অবনতিতে দুঃখিত হওয়া। এই ভাবে ব্রহ্মোপাসকগণ একহৃদয় হইয়া ভগবানের নামপ্রচারে বহির্গত হইলে দিগ্বিজয়ীর বেশে ফিরিতে পারিবেন নিঃসন্দেহ; এই ভাবে পরস্পর যথার্থ মিলিত হইয়া ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারে উদ্যত হইলে ব্রাহ্মসমাজের সহিত প্রতিযোগিতা করিতে পারে কাহার সাধ্য?

মৈত্রীই নবযুগের যুগধর্ম্ম। আমরা প্রত্যক্ষ করিতেছি যে, বর্ত্তমান যুগের জগদ্ব্যাপী কর্ম্মক্ষেত্রে পরস্পরের আন্তরিক মিলন ও অন্যোন্যসাহচর্য্য অপরিহার্য্য। এই প্রত্যক্ষ সত্য উপলব্ধি করিলেও আমরা দেখি না যে, আমাদের চারিদিকে বিবাদবিসম্বাদের বীজ কি প্রকার বিক্ষিপ্ত হইয়া আমাদের সমাজ ও দেশকে ধ্বংসের পথে টানিয়া লইয়া চলিতেছে। এখানে মুসলমান হিন্দুর সঙ্গে, হিন্দু মুসলমানের সঙ্গে, ব্রাহ্মণ পঞ্চমের সঙ্গে, পঞ্চম ব্রাহ্মণের সঙ্গে মিলিতে চায় না। এই বিরোধ বিবাদ, মনের অমিল পরিত্যাগ না করিলে আমাদের শ্রেয় নাই। ইহা সর্ব্ববাদসম্মত যে, ভারতের পরাধীনতার অন্যতর কারণ হইতেছে আমাদের পরস্পরের মধ্যে মিলনের অভাব। এই মিলনের অভাববশতঃ আমাদের শুভকর্ম্ম সাধনের প্রচেষ্টাসকল ইচ্ছানুরূপ সাফল্য লাভ করিতে পারিতেছে না এবং আমরা এত মলিন, এত দুর্ব্বল হইয়া পড়িতেছি।

এই বিরোধবিবাদ এবং তজ্জনিত অবনতিস্রোতের প্রতিরোধক একমাত্র উদারতম ও অসাম্প্রদায়িক বীজমন্ত্রের উপর প্রতিষ্ঠিত সত্য ব্রাহ্মধর্ম্ম। ব্রাহ্মধর্ম্মের দেবতা সেই সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম; ব্রাহ্মধর্ম্মের দেবতা সেই বিগতবিবাদঃ পরমেশ্বর। আজ শতাব্দীপ্রায় পূর্ব্বে যখন ভারতে গৃহবিবাদ অন্তর্বিচ্ছেদ উপস্থিত হইয়া ধর্ম্মের গ্লানি উপস্থিত করিয়াছিল, সেই সময়ে রাজা রামমোহন রায়, ঐ বিগতবিবাদঃ পরমেশ্বর যাহার প্রাণ, সেই সত্যধর্ম্মকেই সর্ব্বপ্রকার গৃহবিবাদ দূর করিবার অব্যর্থ অস্ত্র এবং প্রাণের মিলনসাধনের এক অমোঘ উপায় জানিয়া তাহারই বীজ রোপিত করিয়াছিলেন, এবং তাহারই সাহায্যে দেশবাসীকে উদ্বুদ্ধ করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। রাজা রামমোহন রায়ের একনিষ্ঠভাবে সেই কর্ত্তব্যকর্ম্মসাধনের ফলেই আজ প্রায় শতাব্দী পরে সেই সত্যধর্ম্মের শক্তিতে শক্তিমান হইয়া ভারতবাসী জাগিয়া উঠিয়াছে; আজ সে মুক্তিলাভের পথে ছুটিয়া চলিয়াছে; আজ তাহার সকল রুদ্ধ শক্তি স্বাধীনভাবে স্ফূর্ত্তি পাইতে চলিয়াছে। তাঁহার একনিষ্ঠ তপস্যার ফলেই আজ ভারতবাসী মিলনের সুফল উপলব্ধি করিয়া মিলনের পথে অগ্রসর হইতেছে। সত্য-

ধর্ম্ম প্রচারিত হইবার পূর্ব্বে যে ভারতবাসী শত শত শ্রেণী-ভেদের কারণে পরস্পরকে অস্পৃশ্য ভাবিয়া পরস্পরের প্রতি সহায়হস্ত বিস্তারে পশ্চাৎপদ ছিল, সেই ভারতবাসী আজ সত্যধর্ম্মের অন্তঃস্ফুরণের প্রভাবে পরস্পরকে ভাই বলিয়া চিনিতে শিখিয়াছে ; সকলের ভিতর মনুষ্যত্ব—অন্তর্নিহিত ব্রহ্মাগ্নি উপলব্ধি করিতে শিখিয়াছে। আজ সেই ভারতবাসী পরস্পরকে একই পিতামাতার সন্তান জানিয়া মিলিতভাবে বিশ্বসভার মাঝে নিজেদের জন্য একটা উচ্চ আসন অধিকার করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছে।

সত্যধর্ম্ম প্রচারের যে শুভ অবসর আসিয়াছে, এই শুভ অবসরে আমাদের নিদ্রিত থাকিলে চলিবে না। আমোদপ্রমোদের মোহে, ঘুমের ঘোরে পশ্চাতে পড়িয়া থাকিলে আমাদের মৃত্যুকেই বরণ করিতে হইবে। এই জাগরণের মুখে আমাদেরও যেমন জাগিয়া উঠিতে হইবে, তেমনি স্ত্রীপুরুষনির্বিশেষে, ব্রাহ্মণপঞ্চমনির্বিশেষে প্রত্যেক ভারতবাসীকেও জাগরণমন্ত্র দিতে হইবে, এবং জ্ঞান ও ধর্ম্মের উন্নতিসাধনে সহায়তা করিতে হইবে। যতদিন এই ভারতভূমি পুরাকালের ন্যায় জগতের মহাসভায় উপযুক্ত উচ্চ আসন অধিকার না করে, ততদিন বৃথা আমোদপ্রমোদের কথা মুখেও আনিও না ; পদতলে দলিত করিয়া দাও নৃত্যগীতের কথা ; সুখের স্বপ্ন ভাঙ্গিয়া ফেল। যে সত্যধর্ম্মের উৎস হইতে এই জাগরণের বন্যা নামিয়া আসিয়াছে, সেই সত্যধর্ম্মের প্রবর্ত্তক পরব্রহ্মকে বিগতবিবাদং পরমেশ্বর জানিয়া তাঁহার সত্যধর্ম্মের বিজয়-বার্ত্তা সর্ব্বত্র ঘোষণা কর—বিবাদবিসম্বাদ ঘুচিয়া যাক, এবং মিলনের সুমঙ্গল বায়ু প্রবাহিত হোক।

যে ব্রাহ্মসমাজ হইতে এই সত্যধর্ম্মের বাণী আমাদের গৃহে গৃহে প্রচারিত হইয়াছে, যে ব্রাহ্মসমাজ হইতে আমরা সর্ব্বাঙ্গীন স্বাধীনতা ও সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতির সুমঙ্গল বার্ত্তা কর্ণে জপমন্ত্ররূপে প্রাপ্ত হইয়াছি, সেই ব্রাহ্মসমাজকে না বাঁচাইয়া রাখিলে আমাদের আশ্রয়স্থল কোথায়? আর, যদি সেই ব্রাহ্মসমাজকে বাঁচাইয়া রাখিতে চাও, তবে হিংসাদ্বন্দ্ব ভুলিয়া গিয়া ছোটখাটো মান অভিমান ভুলিয়া গিয়া, উচ্চনীচ ক্ষুদ্রবৃহতের ভেদাভেদ ভুলিয়া গিয়া পরস্পর মিলিত হও। সকল ভাইকে প্রেমের কঠিন-কোমল বন্ধনে বাঁধিবার জন্য অগ্রসর হও। সংশয়াত্মা সংসারী লোকের কথায় বিচলিত হইও না। আমাদের যিনি একই পিতামাতা, তিনি আমাদের প্রত্যেকের আত্মাতে সমাসীন থাকিয়া আমাদিগকে ক্রমাগত বলিতেছেন—বিচ্ছিন্ন থাকিও না—মিলিত হও। ঐ অনন্ত আকাশ হইতে সেই মঙ্গলবাণীরই প্রতিধ্বনি ফিরিয়া আসিয়া আমাদিগকে ক্রমাগত বলিতেছে—মিলিত হও—মিলিত হও।

ব্রাহ্মসমাজকে যদি উন্নতির শিখরদেশে দাঁড় করাইতে চাও, তবে বৃথা আলাপ বাজে কথা ছাড়িয়া মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের সেই জাগরণবাণী অন্তরে ধারণ কর। জ্ঞানে বড় হও, ধর্ম্মে বড় হও, কর্ম্মে বড় হও। অধর্ম্মের সহিত সংগ্রামে যদি জয়লাভ করিতে চাও, সন্তানসন্ততির যদি প্রকৃত উন্নতি দেখিবার আশা কর, তবে সকল ব্রহ্মোপাসক ভগবানের পদতলে সমবেত হইয়া তাঁহার চরণে আত্মসমর্পণ কর। সত্যেতে একনিষ্ঠ হইয়া তাঁহার চরণে হৃদয়ের সমুদয় প্রীতি সংন্যস্ত কর ; এবং তাঁহার প্রিয়কার্য্য জানিয়া, মিলনের সর্ব্বপ্রধান উপায় জানিয়া এবং তোমার সর্ব্বপ্রধান কর্ত্তব্য জানিয়া কায়মনোবাক্যে সত্যধর্ম্মের প্রচারে যত্নবান হও ; ব্রাহ্মধর্ম্মকে জয়যুক্ত কর। যে জন্মভূমি আমাদের পূজার পাত্র, সেই জননী জন্মভূমির মুখ উজ্জ্বল হইয়া উঠুক ; সকল দুঃখদৈন্য বিদূরিত হোক।

নূতন ব্রহ্মসঙ্গীত।

প্রাতঃকাল।

ভৈরব—চৌতাল।

তুমি হে জগপতি দেব বুদ্ধিদাতা।
আছ করি' সব পূর্ণ।
যে-ই যে-ই চাহে, সে-ই সে-ই তোমা পায় হে।
ভক্তিকুসুম লহ প্রেমচন্দ্র!
সর্ব্বেশ্বর নাম তব গাহে কত শত
সুর নর তিন লোকে।
—মম চিত্তে গীত নবছন্দ জাগি' উঠে
তব অঙ্কিত
অপরূপ হেরি' চারি দিশি শোভা,
হে সর্ব্ববন্দিত॥

কি. না ঠা.

আশা ভৈরবী—তেওরা।

এই আলোর ভরা অসীম আকাশ
সূর্য্য-কিরণ ঢালা
চিত্তে আমার বাজায় বাঁশি
বসায় মধুর মেলা।
প্রভাত-পাখীর এই কলতান
চিত্তে জাগায় সুপ্ত সে গান
ফুলের রাশি—জাগায় হাসি
ভরায় কুসুম-ডালা।
এ আনন্দ সভা মাঝে
চিত্ত আমার গানে বাজে
হৃদয়-বাহির জুড়ে কেবল
সেই অরূপই রূপে রাজে।
সেই একে আজ প্রণাম করি
গগন-ভুবন গানে ভরি—
মধুর করে কাটাই জীবন
ভুলি বেদন-জ্বালা॥

সি. চ. ব

ভৈরবী—দাদ্‌রা।

তুমি আমাদের থাক্‌তে সহায়
করব না ভয়—করব না ভয়
ঝড়ের রাতি সেও পোহায়—
করব না ভয়—করব না ভয়।
ঘনাক্‌ না ঘোর আঁধার রাতি
থাক্‌তে মোদের সাথের সাথী
কে নেভাবে প্রাণের বাতি
অমর ভাতি জ্যোতির্ময়—
ব্যথার প্রদীপ—সেও আলো দেয়
করব না ভয়—করব না ভয়॥
ভবার্ণবের ভেলা তুমি
করব না ভয়—করব না ভয়
অন্ধকারের ধ্রুবতারা
করব না ভয়—করব না ভয়।
অভয় মনে হাস্যমুখে
চল্‌ব সকল দুঃখে সুখে
তোমার নামটি লয়ে বুকে
গেয়ে যাব প্রেমেরই জয়—
পড়্‌ব শেষে—পায়ে এসে
করব না ভয়—করব না ভয়॥

নি, চ. ব.

সায়ংকাল।

* * *

পথে যেতে ডেকেছিলে মোরে।
পিছিয়ে পড়েছি আমি যাব যে কি করে?
এসেছে নিবিড় নিশি,
পথ-রেখা গেছে মিশি,
সাড়া দাও সাড়া দাও আঁধারের ঘোরে॥
ভয় হয় পাছে ঘুরে ঘুরে
যত আমি যাই তত যাই চলে দূরে।
মনে করি আছো কাছে,
তবু ভয় হয়, পাছে
আমি আছি তুমি নাই কালি নিশি ভোরে॥

র, না. ঠা.

* * *

আর রেখোনা আঁধারে
আমায় দেখতে দাও
তোমার মাঝে আমার আপনারে
আমায় দেখতে দাও।
কাঁদাও যদি কাঁদাও এবার
সুখের গ্লানি সয়না যে আর
নয়ন আমার যাক না ধুয়ে অশ্রুধারে॥

জানি না তো কোন্‌ কালো এই ছায়া।
আপন বলে ভুলায় যখন ঘনায় বিষম মায়া।
স্বপ্নভারে জমল বোঝা,
চির জীবন শূন্য খোঁজা,
মোর আলো লুকিয়ে আছে
রাতের পারে।

র. না. ঠা.

* * *

আপনি আমার কোন্‌খানে
বেড়াই তারি সন্ধানে।
নানান রূপে নানান বেশে
ফেরে যে-জন ছায়ার দেশে
তার পরিচয় কেঁদে হেসে
শেষ হবে কি কে জানে॥
আমার গানের গহন মাঝে শুনেছিলেম যার ভাষা
খুঁজে না পাই তার বাসা।
বেলা কখন যায় গো বয়ে,
আলো আসে মলিন হয়ে,
পথের বাঁশী যায় কি কয়ে
বিকেল বেলার মূলতানে॥

র. না. ঠা.

* * *

তুমি যে আমারে চাও
আমি সে জানি।
কেন যে মোরে কাঁদাও
আমি সে জানি॥
এ আলোকে এ আঁধারে কেন তুমি আপনারে
ছায়াখানি দিয়ে ছাও আমি সে জানি॥
সারাদিন নানা কাজে কেন তুমি নানা সাজে
কত সুরে ডাক দাও আমি সে জানি॥
সারা হলে দেয়া-নেয়া দিনান্তের শেষ খেয়া
কোন্‌ দিক পানে বাও আমি সে জানি॥

র. না ঠা.

শ্যাম—একতালা।

পরাণ জাগিল রে—
উৎসবপরশে আজি মোর।
চারি দিশি হরষ জাগিয়া হেরি—
সুগন্ধ বহে বায়ু মলয়া
ভরিয়া গগনে রে।
জয়গান তব উঠে শতকণ্ঠে আজি
দশদিশি বেজে রে।
তারি তানে তানে গাহে প্রাণ শত গান
নরনারী আকুলিয়া প্রীতিসরস সুতানে রে

শি. না. ঠা.

মিশ্র বেহাগ—দাদ্‌রা।

আপনি যখন হৃদয়ে ফুল ফুটবে না—তুমি এসো।
শুষ্ক যখন জীবনে গীত উঠবে না—তুমি এসো।
জীবন যখন হবে মরু, রইবে না তায় একটী তরু
(যখন) অন্ধ কারা ঠেকবে ধরা—তুমি এসো।
কান্না যখন বক্ষে আমার বন্যা ব'বে—তুমি এসো।
বিকল যখন লাগবে জীবন মাগবে মরণ—তুমি এসো।
নিমেষে ফুল ফুটিয়ো তবে, সুধার উৎস ছুটিয়ো তবে
(আমার) কান্নাজলে পান্নাদোলায়—তুমি এসো।
তুমি আমার জীবনে কি—কইতে আমি পারি সে কি?
সব গীতি যে বন্ধ সেথায়—সকল কথা কথার ফাঁকি।
তুমি আমার জীবনে কি—আমি বিনে জানবে কে কি?
(তোমার) চরণতলে সব বিকায়—তুমি এসো।

নি. চ. ব.

খাম্বাজ—ঠুংরি।

তাঁহারে আজিকে ডাক মন!
ভকত সভার মাঝে
শতধারে ঝরে
আশীষ তাঁহারি—দুখ হরে।
গরজি উঠিছে হিয়ে
অভয় তাঁর বাণী
সকল নাশি' হানি
ভয় ভকতেরি।
নাথ নাথ বলি'
শোক তাপ ভুলি'
তাঁর পদ ধরি' রও
চিরতরে।
আনন্দ উছলিছে—
ধরিয়া কেবা রাখে—
শোন গো শোন ডাকে
ওই জয়ভেরী।
জয় রব করি'
এসো ছুটে চলি;
পাছে পড়ে নাহি রও
পথপরে॥

ক্ষি. না. ঠা.

আড়ানা—চৌতাল।

প্রাণের মাঝারে ঝরিছে আজ
নয়ন-আসার হে—শান্ত করি' দাও।
মম হৃদি-সিংহাসনে এসো এসো দেব!
কৃপা করি' শান্তিবচন হে শুনাও।
তব বদনজ্যোতি প্রাণে হেরিয়া
দুখ-সাগর পাশরিব,—তব পদে প্রভু রাখ আমায়।
তুমি ত্রিভুবন-রঞ্জন—তুমি কঠিন দুখভঞ্জন।
মহেশ তুমি সবার সুখদায়ী॥

ক্ষি. না. ঠা.

বাহার—একতালা।

বিশ্বেশ্বর-মন্দিরে এই কে রহিবে নিরানন্দ?
উথলে যে হেথা চির-উৎসব বহে হেথা চিরানন্দ।
ফুল ফোটে হেথা গাহে পাখী
কুঞ্জে কুঞ্জে মুঞ্জরে শাখী
গুঞ্জরে অলি—ধায় নদী
বহে বায় ফুল-গন্ধ।
দুঃখেরে মোরা ডাকি, মোহঘোরে সদা থাকি
জীবনে মরণে পরম দেবতা, তাঁরে সদা পিছে রাখি।
তাঁরে রেখে হৃদে সাধিলে কাজ
কোথায় দুঃখ—কোথায় লাজ,
চির আনন্দ করে বিরাজ
টুটে যায় মোহবন্ধ॥

নি. চ. ব.

রাগিণী সিন্ধু বারোয়াঁ—তাল ঠুংরি।

প্রাণ-মন জুড়ানো এমন
কেহ নাই রে—কিছু নাই রে!
জুড়াতে এমন বেদন-দহন
কেহ নাই রে—কিছু নাই রে!

আঁধার হৃদয়ে দিতে আলো
নিমেষে ঘুচাতে সব কালো
সব দিকে এত ভালো
কেহ নাই রে—কিছু নাই রে।

ঢালিতে সুধা বিষজ্বালায়
ভরিতে কুসুম হৃদি-ডালায়
সাজাতে গেহ প্রীতি-মালায়
কেহ নাই রে—কিছু নাই রে!

এস সবে তাঁরে নমি
'তিনি' ধনে হই ধনী
এ হেন পরশমণি
কেহ নাই রে—কিছু নাই রে!

নি, চ, ব,

ঝিঁঝিটথাম্বাজ—যৎ।

হৃদয়ে তোমারি নাম নিরখি নিতিপ্রকাশ—
চন্দ্র কোটী ভানু কোটী কোটী তারকভাস।
শক্তি হে অতুলী তব এ সুন্দর তব সৃজন।
তোমার বিশ্ব ভকতমুখে ভক্তি-উজল ঘন।
গিরি-কন্দর ধ্বনিয়া উঠে তোমারি নামগানে।
তোমারি দেব শির' পরি শশীতপন শোভে।
নব জলধরে হে তড়িতছটা গলে তব মালা শোভে।
হেরি অপরূপ রূপ জগজন মন মোহে।

ক্ষি, না, ঠা,

থাম্বাজ—তাল ফেরতা।

শঙ্কর শিব সঙ্কটহারী
নিস্তার প্রভো—
জয় দেবদেব!
আকুল প্রাণে আমারি
ভকত-চিত্ত-বিহারী!
দেখা দাও
ভিক্ষা মাগি—
জয় দেব দেব।
পিপাসিত-চিত-বারি!
ত্রিলোক-জগতধারি!
দীননাথ
দয়াসিন্ধু
জয় দেব
ওহে সংসারকাণ্ডারী!
আশ্রিতভয়হারী!
ভবপারে
যাও লয়ে—
জয় দেবদেব!

ক্ষি, না, ঠা,

রামপ্রসাদী।

পাল্ তুলে দাও, ভাসাও তরী॥
ডাক্ এসেছে ওপার হ'তে,
মায়ের ঘরে হবে যেতে,
(সবাই) আনন্দেতে, হৃদয় ভরে,
একমনে যায় গো চলি।
ওপারেতে দেখ্‌না চেয়ে,
আলোয় আলোয় যাচ্ছে ছেয়ে,
(সেই) আলোয় নাচে, স্রোতের মাঝে
ছুট্‌ছে তরী হেলি দুলি।
ভাসা মেঘে চাঁদের মত,
ঢেউয়ের পরে হাঁসের মত,
(আমার) পাগল হয়ে হৃদয় ছোটে—
কে আর তারে রাখবে ধরি।
সারা পালে লেগেছে বায়,
জোয়ার জোরে ঠেলেছে নায়,
এমন সুযোগ দিয়ে ছেড়ে
রোস্‌নে কো তুই পাছে পড়ি
(হোথা) সাঁঝের আগে হবে যেতে
চল রে ধরে অভয় হরি॥

ক্ষি, না, ঠা,

কুশারিকথা ও রাঢ়ীবারেন্দ্রভেদ।

(শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর)

১০। ভট্টনারায়ণের বংশের "গাঁই"।

আমরা পূর্ব্বে দেখিয়া আসিয়াছি যে, ভট্টনারায়ণের একুশ পুত্রের মধ্যে ১৬জন পুত্র রাঢ়ে বসতি করিয়াছিলেন (১)। কুলতত্ত্বার্ণব বলেন, সেই ষোড়শ পুত্র ১৬টী গ্রাম পাইয়া "গাঁই" হইয়াছিলেন—বন্দ্য, কুসুমকুলি, কুলভি, গড়গড়ি, ঘোষাল, সেউ, দীর্ঘ, কড়ি, মাস, বড়াল, কেশরকোণি, পারি, বসু, কুশো, ঝিক এবং বোকট্টাল (২)। এইগুলি গ্রামের নাম, এবং গ্রামের নাম হইতেই গাঁইয়েরও উৎপত্তি হইয়াছে। গ্রামের নাম বলিয়াই বিভিন্ন গ্রন্থে অল্পস্বল্প নামপার্থক্যও দেখা যায়। কুলদীপিকায় নিম্নোক্ত কয়েকটী নামে পার্থক্য দেখা যায়—কুসুমকুলির স্থলে কুসুম, দীর্ঘর স্থলে দীর্ঘাঙ্গী, ঘোষালের স্থলে ঘোষলী, বড়ালের স্থলে বটব্যাল, কড়ির স্থলে কুলী, গড়গড়ির স্থলে গড়, সেউর স্থলে সেয়ক, কুশোর স্থলে কুশারি, কেশরকোণির স্থলে কেশরী, বসুর স্থলে বসুয়ারি, ঝিকর স্থলে আকাশ (?) এবং বোকট্টালের স্থলে করাল (?) (৩)।

আমাদের দেশে একটী প্রবাদ প্রচলিত আছে, "পঞ্চ গোত্র ছাপ্পান্ন গাঁই তা ছাড়া বামন নাই।" ইহার মধ্যে অবশ্য ভট্টনারায়ণের ১৬ গাঁই অন্তর্ভুক্ত আছে। কিন্তু বারেন্দ্রদিগের ভিতর এই

(১ ও ২) কু॰ ত॰ ১০২—১০৩ শ্লোক।
(৩) স॰ নি॰ ২০।
(৪) বারেন্দ্রবংশাবলী—রামধন তর্কপঞ্চানন—স॰ নি॰ ১৮০।

ছাপ্পান্ন গাঁইয়ের একটীও প্রচলিত নাই। ইহা হইতে স্পষ্টই বুঝা যায় যে, ভট্টনারায়ণ ও তাঁহার ঐ ১৬ গাঁই পুত্র ভূশূরের সময়ে রাঢ়ে চলিয়া আসিবার পরই গাঁইয়ের সৃষ্টি হইয়াছিল। উক্ত প্রবাদের মধ্যে কেহ কেহ রাঢ়ীবারেন্দ্রের মধ্যে বিদ্বেষের গন্ধ পান। আমরা তাহা মনে করি না। উক্ত প্রবাদ কেবল রাঢ়ীদিগের সম্বন্ধেই উক্ত হইয়াছে, বারেন্দ্রদিগের সম্বন্ধে তো উহা প্রযুক্তই হয় নাই, তখন উহা বিদ্বেষভাবপ্রণোদিত কি প্রকারে বলা যায়? সম্বন্ধনির্ণয়কার তাঁহার গ্রন্থের ৩৮৬ পৃষ্ঠায় ভট্টনারায়ণের পুত্ররূপে যে ষোলটী নাম দিয়াছিলেন, তাহার সহিত অন্যান্য গ্রন্থোক্ত কতকগুলি নামের সাদৃশ্য নাই। তিনি সেগুলি কোথায় পাইলেন, তাহা আমরা বুঝিতে পারিলাম না। বারেন্দ্রবংশাবলীতে পাওয়া যায় যে, ক্ষিতীশের দুই তনয়—নারায়ণ ও দামু (দামোদর); তন্মধ্যে নারায়ণের পুত্র ১৬—সর্ব্বজ্যেষ্ঠ হইলেন রামু।

"কেহ বলে সর্ব্বজ্যেষ্ঠ ওঝা হন আদি।
কেহ কহে বরাহই শ্রেষ্ঠ সর্ব্ববাদী॥" (৪)

অন্য কোন গ্রন্থে কিন্তু আমরা রামকে জ্যেষ্ঠ বলিয়া উল্লিখিত দেখি না।

১০১। কে কোন্ গাঁই?

বাচস্পতি মিশ্রের অনুসরণ করিয়া সম্ভবত আনন্দভট্ট তাঁহার বল্লালচরিতে স্পষ্টরূপে বলিয়া দিয়াছেন—কে কোন্ গাঁই হইয়াছিলেন। তাঁহার মতে—আদিবরাহ বন্দ্য, রাম গড়গড়ি, নীপ (বাচস্পতির মতে নৃপ) কেশরী, নান কুসুমকুলি, বটু (বাচস্পতির মতে বাটু) পারিহাল (কুলদীপিকার মতে পারি), গুই কুলভি, গণ ঘোষলি (কুলদীপিকার মতে ঘোষাল), শান্তেশ্বর (বাচস্পতির মতে সান্তেশ্বর?) সেয়ু, বুড়ো মাশ্চটক (কুলদীপিকার মতে মাস), বিকর্ত্তন বটব্যাল, নীল বসুয়ারি, মধুসূদন করাল, কোয় (বাচস্পতির মতে কোয়র) কুশারি, বাসু কুলিশ (কুলদীপিকার মতে কুলী এবং বাচস্পতির মতে কুলকুলি), মাধব আকাশ, এবং মহামতি দীর্ঘগ্রামী (কুলদীপিকার মতে দীর্ঘাঙ্গী, (৫)। ইহার মধ্যে আটটী গাঁই সম্বন্ধে বিভিন্ন কুলগ্রন্থে কিছু মতভেদ দৃষ্ট হয়। হরিমিশ্র ও রাজভাটের মতে—মহামতির (আনন্দভট্টের মতে) স্থলে গুঠ দীর্ঘাঙ্গী; রাজভাটের মতে মহামতি বটব্যাল; হরিমিশ্রের মতে গূঢ় (রাজভাটের মতে গণ) মাশ্চটক; হরিমিশ্রের মতে নিনো (রাজভাটের মতে বিকর্ত্তন) বসুয়ারি; হরিমিশ্রের মতে দেব (রাজভাটের মতে সাহ বা সাড়ু) সেউ; হরিমিশ্রের মতে দীন কুশি (রাজভাটের মতে নিহ্লো কুশারি); হরিমিশ্রের মতে কাম ঝিকরাড়ি; রাজভাটের মতে শুভ কুলকুলি; হরিমিশ্রের মতে সোম বোকট্টাল, রাজভাটের মতে বিভু আকাশ (৬)। কুলতত্ত্বার্ণবের মতে বরাহ বন্দ্যঘটী, নান কুসুমকুলি, গুয়ি কুলভি, রাম গড়গড়ি, গণ ঘোষলী, দেব সেউড়ি, মাধব দীর্ঘবাটী, মধুসূদন কড়িল, গূঢ় মাশ্চটক, বিকর্ত্তন বটব্যাল, নৃপ কেশরকোণি, বাটু পারিহাল, নীল বসুয়ারি, দীন কুশারি, কাম ঝিকরাড়ি, বাসুদেব বোকট্ট। (কু০ ত০ ১১২—১১৫ শ্লোক)।

১০২। প্রথম কুশারি কে?

আমরা ইতিপূর্ব্বেই দেখিয়া আসিলাম যে, ভট্টনারায়ণেরই এক পুত্র কুশারি গ্রাম লাভ করিয়া কুশারি গাঁইয়ের প্রবর্ত্তক হইয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার নাম সম্বন্ধেও বিভিন্ন কুলগ্রন্থে বিভিন্ন মত দেখি। হরিমিশ্রের এবং কুলতত্ত্বার্ণবের মতে দীন, বল্লালচরিতের মতে কোয়, রাজভাটের মতে নিহ্লো এবং 'ঠাকুরগোষ্ঠীর সংক্ষিপ্ত বিবরণে'র মতে নৃসিংহ বা নান্নু কুকশারি গাঁইয়ের মূল (৭)। কুলশাস্ত্রে অভিজ্ঞ ৺শ্রীনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় বাচস্পতি মিশ্রেরই অনুসরণ করিয়া কোয়কেই কুশারি বলিয়াছেন (৮)। কুলতত্ত্বার্ণবে দীন প্রথম কুশারি বলিয়া উক্ত হইয়াছেন (৯)। আমা-

(৫) স০ নি০ ২৩পৃঃ; ব্রা০ কা০ ১২৬পৃঃ।

(৬) আদিবরাহ বাঁড়ুরী গড়গড়ি রাম।
নীপ কেশরকুণী নান যে কুসুম॥
পারিহা বটুক মুনি. কুলভিতে গুঁই।
পশুপতি দীর্ঘবাড়ী. বিকে বসু কই॥
মহামতি বটব্যাল. বিভু আকাশে বলি।
সাহ (সাঢ়ু) ও সেয়ক শুভ কুলকুলী॥
নিহ্লো কুশার অরি, মধু করালে যান।
গুণমণি ঘোষলীর গাঁয়ে অবস্থান॥
ভট্টনারায়ণ মুনি ষোল পুত্র পান।
তার মাঝে গণপতি মাসচটে যান॥
রাজভাটের কাহিনী—স০ নি০ ২৯২পৃঃ।

(৭) Tagore Family ৫পৃঃ।

(৮) রা০ ব্রা০। (৯) কু০ত০ ১১৫ শ্লোক।

দেরও মনে হয় যে যাঁহার নাম দীন, তাঁহারই ডাকনাম কোয় ও নিহ্লো ছিল। কুলশাস্ত্রে অভিজ্ঞ পণ্ডিত ৺মহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি মহাশয় ষষ্ঠ বৎসর ৪র্থ ও ৫ম সংখ্যা "কল্পনা" মাসিক পত্রে যে বংশাবলি প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহাতে কোয়কেই আদিকুশারি বলিয়া তাঁহাকেই নিহ্লো বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।

১০৩। কুশারি গ্রাম কোথায়?

কুশগ্রাম হইতে কুশারি বা কুশাড়ি গ্রাম হইয়াছে। এই গ্রামকে এখন সাধারণে 'কুশো' বলে। বর্দ্ধমান জেলায় বর্দ্ধমান সহর হইতে ৩ ক্রোশ উত্তরপূর্ব্বে ও গোবিন্দপুর হইতে ½ ক্রোশ উত্তরপশ্চিমে অবস্থিত (অক্ষা° ২৩°১৬´ ১৫´´ উঃ ও দ্রাঘি° ৮৮°১´ ১৫´´ পূঃ) (১০)।

১০৪। কুশারিদিগের অবস্থান কোথায়?

বাঁকুড়ায় সোণামুখী, ঢাকাজেলায় পিঠাভোগ ও কয়কীর্ত্তন, যশোহরে দামুরহুদা, খুলনাজেলায় ঘাটভোগ প্রভৃতি স্থানে কুশারিদিগের অনেকের প্রধান বাসস্থান ছিল। কয়কীর্ত্তন ও পিঠাভোগের কুশারিরা গোষ্ঠীপতির বংশ (১১)।

১০৫। কুশারিগণ সিদ্ধ শ্রোত্রিয়।

আমরা উপরে বলিয়া আসিয়াছি যে, ভট্টনারায়ণপ্রমুখ পঞ্চব্রাহ্মণের বহু সন্তানসন্ততির মধ্যে ৫৬জন ৫৬টী গ্রাম পাইয়া ৫৬ গাঁই প্রবর্ত্তন করিয়াছিলেন। এই ৫৬ গাঁইয়ের মধ্যে কয়েক জন কৌলীন্য প্রাপ্ত হইলেন, কয়েক জন সিদ্ধ শ্রোত্রিয় শ্রেণীভুক্ত হইলেন এবং কয়েকজন গৌণ কুলীন হইলেন। তৎসঙ্গে এই একটী নিয়মও স্থাপিত হইল যে, কুলীনেরা কুলীনেরই সঙ্গে আদানপ্রদান করিবেন; শ্রোত্রিয়ের কন্যা গ্রহণ করিতে পারিবেন, কিন্তু শ্রোত্রিয়কে কন্যাদান করিতে পারিবেন না, করিলে কুলভ্রষ্ট ও বংশজভাবাপন্ন হইবেন; আর, গৌণ কুলীনের কন্যা গ্রহণ করিলে এককালে কুলক্ষয় হইবে—এই নিমিত্ত গৌণকুলীনেরা অরি অর্থাৎ কুলের শত্রু বলিয়া প্রসিদ্ধ হইলেন (১২)। দুএকটী বংশ ব্যতীত সাধারণত কুশারিগণ সিদ্ধ বা সৎ শ্রোত্রিয় মধ্যে স্থাপিত হইয়াছিলেন (১৩)। "কালক্রমে গৌণকুলীনেরা শ্রোত্রিয়শ্রেণীতে নিবেশিত হইলেন। কিন্তু সর্ব্বাংশে শ্রোত্রিয়দিগের সমান হইতে পারিলেন না। প্রকৃত শ্রোত্রিয়েরা শুদ্ধ শ্রোত্রিয় ও গৌণকুলীনেরা কষ্টশ্রোত্রিয় বলিয়া উল্লিখিত হইতে লাগিলেন (১৪)।" এই প্রবাদ সুপ্রসিদ্ধ যে, বল্লালসেনই এই সকল ব্যবস্থার মূল প্রবর্ত্তক। আমরা এই সকল বিষয়ে সুবিস্তৃত আলোচনা করিতে ইচ্ছা করি না, কারণ এগুলি আমাদের মূল বিষয়ের বাহিরে। তবে এ বিষয়ে একটী কৌতূহলজনক আখ্যায়িকা প্রচলিত আছে, তাহা এস্থলে উল্লেখ করিলে অপ্রাসঙ্গিক হইবে না বলিয়া মনে করি।

১০৬। কৌলীন্যপ্রবর্ত্তনের আখ্যায়িকা।

"রাজা বল্লালসেন কৌলীন্যব্যবস্থাপনের দিন স্থির করিয়া ব্রাহ্মণদিগকে নিত্যক্রিয়া সমাপনান্তে রাজসভায় উপস্থিত হইতে আদেশ করেন। তাহাতে কতকগুলি ব্রাহ্মণ এক প্রহরের সময়, কতকগুলি দেড় প্রহরের সময়, আর কতকগুলি আড়াই প্রহরের সময় উপস্থিত হন। যাঁহারা আড়াই প্রহরের সময় উপস্থিত হন, তাঁহারা কৌলীন্যমর্য্যাদা প্রাপ্ত হইলেন; যাঁহারা দেড় প্রহরের সময়, তাঁহারা শ্রোত্রিয়; আর যাঁহারা এক প্রহরের সময় আসিলেন, তাঁহারা গৌণকুলীন হইলেন (১৫)।" এই আখ্যায়িকা সর্ব্বাংশে সত্য বলিয়া মনে হয় না, কারণ এই প্রণালীতে মর্য্যাদার বিভাগ হইলে পরস্পরের মধ্যে একেবারে আদানপ্রদান বন্ধ হইবে, তাহা সম্ভব বলিয়া মনে হয় না। যাই হৌক, উপরোক্ত আখ্যায়িকার ভাবার্থ এই যে, যে ব্রাহ্মণ যত শীঘ্র রাজসভায় উপস্থিত হইয়াছিলেন, ধরিয়া লওয়া হইল যে, তিনি রাজসভায় উপস্থিত হইবার জন্য নিত্যকর্ত্তব্য অনুষ্ঠানের প্রতি তত বেশী অমনোযোগী হইয়াছিলেন।

১০৭। রাঢ় ও বরেন্দ্র।

বঙ্গদেশে, কি পূর্ব্ববঙ্গে, কি পশ্চিমবঙ্গে, শাণ্ডিল্যপ্রমুখ পঞ্চগোত্রের যে সকল ব্রাহ্মণ আছেন, তাঁহাদের মধ্যে রাঢ়ী ও বারেন্দ্রভেদ দেখা যায়—

(১০) ব্রা° কা° ১২০পৃঃ।
(১১) ব্রা° কা° ৩১৩পৃঃ; স° নি° ৩৭৩পৃঃ।
(১২) কুলরমা ও কুলকুণ্ডলিনী—স° নি° ৩০১পৃঃ।
(১৩) ব্রা° কা° ১৩৪পৃঃ।
(১৪) স° নি° ৩০৫পৃঃ।
(১৫) স° নি° ৩০৫পৃঃ।

পাঁচ গোত্রেরই ব্রাহ্মণদের মধ্যে দেখা যায় যে, রাঢ়ীও আছেন, বারেন্দ্রও আছেন। ইহা তো প্রসিদ্ধই আছে যে, ক্ষিতীশপ্রমুখই হৌন বা ভট্টনারায়ণপ্রমুখই হৌন, যে পঞ্চব্রাহ্মণ আদিশূরকর্ত্তৃক বঙ্গদেশে সমানীত হইয়াছিলেন, তাঁহাদেরই মধ্যে কেহ কেহ বা রাঢ়ী এবং কেহ কেহ বা বারেন্দ্র হইয়াছিলেন। এই রাঢ়ী ও বারেন্দ্রের ভেদ রাঢ় ও বরেন্দ্রদেশ হইতেই উৎপন্ন হইয়াছে। যাঁহারা রাঢ়ে গিয়াছিলেন, তাঁহারা রাঢ়ী হইলেন; যাঁহারা বরেন্দ্রভূমিতে বাস করিলেন, তাঁহারা বারেন্দ্র হইলেন। প্রেমবিলাস বলেন—জাহ্নবীর পশ্চিম পার রাঢ় এবং উহার পূর্ব্ব তীর ও পদ্মার উত্তর তীর বরেন্দ্র; তন্মধ্যে পদ্মার দক্ষিণ পার রাঢ়ের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ অংশ। গঙ্গার পূর্ব্ব ও পশ্চিম পার লইয়া গৌড়রাজ্য (১৬)।

১৩৮। রাঢ়ী কাহারা হইলেন?

আমরা ইতিপূর্ব্বে বলিয়া আসিয়াছি যে, প্রেমবিলাসের মতে ক্ষিতীশের সাত পুত্র এবং সেই সাত পুত্রের মধ্যে, প্রেমবিলাস বলেন, দামোদরের সন্তান বরেন্দ্রে থাকিলেন এবং শৌরি প্রভৃতি পাঁচ জনের সন্তান রাঢ়দেশে গমন করিলেন। এতদ্ব্যতীত, ভট্টনারায়ণের প্রথম পত্নীজাত পাঁচ সন্তানই বরেন্দ্রে থাকিলেন; অবশিষ্ট দ্বিতীয় ও তৃতীয় পত্নীর গর্ভজাত ষোল সন্তান রাঢ়ে আসিয়া বাস করিলেন (১৭)। কুলতত্ত্বার্ণবেরও মতে দেশের নাম অনুসারেই রাঢ়ী-বারেন্দ্রভেদের সৃষ্টি হইয়াছে। ভট্টনারায়ণ প্রভৃতি যাঁহারা রাঢ়ে গেলেন, তাঁহারা রাঢ়ী হইলেন; এবং দামোদরপ্রমুখ যাঁহারা পূর্ব্ববাস অর্থাৎ বরেন্দ্রদেশ ত্যাগ না করিলেন, তাঁহারা বারেন্দ্র হইলেন (১৮)।

১৩৯। ভেদের কারণ কি?

কেহ কেহ বলেন, ভ্রাতৃগণের পরস্পরের মধ্যে অপ্রণয় হইবার কারণেই কয়েকজন রাঢ়দেশে চলিয়া আসেন (১৯)। আমাদের তাহা যুক্তিসঙ্গত মনে হয় না। রাঢ়ীবারেন্দ্রভেদ এক সময়েই ঘটিয়াছিল দেখা যায় এবং সকল গোত্রীয় ব্রাহ্মণদিগেরই মধ্যে উহা সংঘটিত হইয়াছিল। এমন কি কথা আছে যে, সেই একই সময়ে পাঁচ পাঁচ গোত্রেরই মধ্যে সহসা গৃহবিবাদ প্রজ্বলিত হইয়া উঠিবে? গৃহবিবাদের কথা নিতান্তই অসম্ভব, তাহাও আমরা বলি না। তবে আমাদের নিকট অধিকতর সম্ভব মনে হয় যে, যাঁহারা আদিশূরের বংশধরদিগের অধিক অনুরক্ত ছিলেন, এবং যাঁহারা পূর্ব্ব নৃপতির নিকটে থাকিলে অধিকতর উন্নতির সম্ভাবনা বুঝিলেন, তাঁহারাই ভূশূরের সঙ্গে রাঢ়দেশে চলিয়া আসিয়াছিলেন। শাণ্ডিল্যগোত্রে ক্ষিতীশবংশে দামোদর ও তাঁহার সন্তানগণ এবং ভট্টনারায়ণের প্রথম স্ত্রীর পাঁচ পুত্র বরেন্দ্রে রহিলেন। কিন্তু আমাদের একটী জিজ্ঞাস্য এই যে, বারেন্দ্রকুলশাস্ত্রে দামোদরকে বরেন্দ্রভূমির শাণ্ডিল্যগোত্রীয় ব্রাহ্মণদিগের পূর্ব্বপুরুষ বলিয়া উল্লিখিত দেখি না কেন? আমরা দেখি যে, রাঢ়ীয় ও বারেন্দ্র উভয় শ্রেণীরই কুলশাস্ত্রমতে ভট্টনারায়ণ বা নারায়ণভট্ট উভয় শ্রেণীরই মূল পূর্ব্বপুরুষ বলিয়া উক্ত হন (২০)। প্রেমবিলাস বলেন যে, ক্ষিতীশপুত্র ভট্টনারায়ণকেই কেহ বা নারায়ণভট্ট বলিয়াও উল্লেখ করেন (২১)। ইহা হইতে আমাদের অনুমান হয় যে, ভট্টনারায়ণের পূর্ব্বে যদিও সম্ভবত তাঁহার ভ্রাতা দামোদর বরেন্দ্রে বাস করিয়া তিনি ও তাঁহার পুত্রেরা বারেন্দ্র নাম পাইয়াছিলেন, তথাপি ভট্টনারায়ণের ও তাঁহার সন্তানসন্ততির রাঢ়ে আসিবার পূর্ব্বে রাঢ়ীবারেন্দ্রভেদ প্রবল হইয়া উঠে নাই। অনুমান হয় যে, ভূশূরের সিংহাসনে আরোহণের পূর্ব্বেই পুত্রেষ্টিযজ্ঞ হইতে বৎসর দশের ভিতরে আদিশূরের জীবনকালেই দামোদরের পরলোকগমন ঘটিয়াছিল, এবং তাঁহার পুত্রগণও বোধ হয় বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রহণ বা অন্য কোন কারণে তাঁহাদের ভ্রাতা ও অন্যান্য আত্মীয়স্বজন হইতে এতই বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িয়াছিলেন যে, প্রেমবিলাস গ্রন্থেও তাঁহাদের নাম পর্য্যন্ত উল্লিখিত হয় নাই। কাজেই ভট্টনারায়ণ হইতেই শাণ্ডিল্যগোত্রীয় বারেন্দ্রব্রাহ্মণেরা নিজেদের উৎপত্তি নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। পরে,

(১৬) প্রে০ বি০
(১৭) প্রে০ বি০ ২৬৪।
(১৮) কু০ ত০ ১৬ ও ১৭ শ্লোক।
(১৯) স০ নি০ ২১পৃঃ।
(২০) স০ নি০ ২৯০পৃঃ।
(২১) শাণ্ডিল্যগোত্র ক্ষিতীশ পণ্ডিতপ্রধান।
তাঁর পুত্র ভট্টনারায়ণ, কেহ নারায়ণভট্ট কন।
প্রে০ বি০ ২৪শ বিলাস।

একদিকে যখন ভট্টনারায়ণের আদিবরাহ প্রভৃতি ষোল পুত্রেরা রাঢ়ে এবং অপর দিকে তাঁহার আদি গাঁই ওঝা প্রভৃতি পুত্রেরা বরেন্দ্রদেশে পুত্রপৌত্রাদি-ক্রমে বাস করিতে লাগিলেন, তখন ক্রমে ক্রমে উভয় শ্রেণীর পার্থক্য পরিস্ফুট হইতে লাগিল। উভয় শ্রেণীর মধ্যে বিবাহাদি বহুকাল যাবৎ প্রচলিত ছিল; কিন্তু অনুমান হয় যে, বল্লালসেনের সময়ে যখন রাঢ়ীদের ভিতরে কুলীন প্রভৃতি নানা থাকের সৃষ্টি হইল, তখন অবধি রাঢ়ীরা বারেন্দ্রদিগের সহিত ক্রিয়াকলাপে আদানপ্রদানে অগ্রসর হইতে সাহস করিলেন না।

এড়ুমিশ্র ও হরিমিশ্রের সময় পর্য্যন্ত বোধ হয়, রাঢ়ীবারেন্দ্রের ভেদ খুব পরিস্ফুট হয় নাই এবং সম্ভবত তাঁহাদের সময়ে উভয় শ্রেণীর মধ্যে বিবাহ প্রচলিত ছিল। পরে বিবাদকলহের জন্যই প্রভেদ খুব দৃঢ়রূপে দাঁড়াইয়া গেল। নুলো পঞ্চাননের সময়ে রাঢ়ীবারেন্দ্রে বিবাহে খুব প্রবল আপত্তি না থাকিলেও বিবাহ বোধ হয় দুএকটী ছাড়া বন্ধ হইয়াই গিয়াছিল (২২)। প্রেমবিলাস বলেন, রাঢ়ীবারেন্দ্রে অনেক বিবাহ হইয়া গিয়াছে ২৩)।

এই প্রকারে আদিশূর সম্বন্ধেও অনুসন্ধান করিতে করিতে যেমন ইতিহাস ও কুলগ্রন্থ অবলম্বনে নানা ঐতিহাসিক তথ্য সংগ্রহে সক্ষম হইয়াছি, সেইরূপ ভট্টনারায়ণ সম্বন্ধেও নানা ঐতিহাসিক তথ্য সংগ্রহ করিয়া সহৃদয় পাঠকগণের সম্মুখে ধারণ করিতে সক্ষম হইলাম।

•

দেবেন্দ্রনাথ ও তাঁহার গুরুজন।

(আচার্য্য শ্রীসতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী এম-এ)

দেবেন্দ্রনাথের পিতামহী।

এই পিতামহী দ্বারকানাথ ঠাকুরের গর্ভধারিণী নহেন; কিন্তু রামলোচন ঠাকুরের পত্নী অলকাসুন্দরী। নীলমণি ঠাকুরের পুত্রগণের মধ্যে জ্যেষ্ঠ রামলোচন ও মধ্যম রামমণি, দক্ষিণ ডিহি-নিবাসী রামকান্ত রায়ের দুই কন্যা অলকা ও মেনকাকে যথাক্রমে বিবাহ করেন। মেনকা দেবীর গর্ভে রামমণির রাধানাথ ও দ্বারকানাথ নামে দুই পুত্র এবং দুর্গামণি নাম্নী দ্বিতীয়া পত্নীর গর্ভে রমানাথ নামে আর এক পুত্র হয়। রামলোচন অপুত্রক ছিলেন বলিয়া দ্বারকানাথকে পোষ্যপুত্র-রূপে গ্রহণ করেন।

"রামলোচনের পত্নীর গর্ভে 'শিবসুন্দরী' নামে একমাত্র কন্যা হয়; কিন্তু অতি অল্প বয়সে তাহার মৃত্যু হয়। এই কন্যার মৃত্যু হইলে রামলোচন মধ্যম ভ্রাতার পুত্র দ্বারকানাথকে দত্তকপুত্র-রূপে গ্রহণ করেন। কথিত আছে, একদিন এক ভিক্ষার্থী সন্ন্যাসী রামলোচনের গৃহে উপস্থিত হয়। রামলোচনের পত্নী ভিক্ষা দিতে অগ্রসর হইলে নিকটে ক্রীড়াশীল দ্বারকানাথকে দেখাইয়া সন্ন্যাসী বলিলেন, 'মা এই শিশুটী অতি সুলক্ষণাক্রান্ত; ইহা দ্বারা বংশের গৌরব বৃদ্ধি হইবে, ধন বৃদ্ধি হইবে, এবং মানসম্ভ্রম বাড়িবে। এ ব্যক্তি নিজেও অদ্ভুত ক্ষমতাশালী, অদ্ভুতকর্ম্মা এবং যশস্বী পুরুষ হইবে।' সন্ন্যাসীর কথায় বিচলিত হইয়া অলকা ঠাকুরাণী স্বামীকে প্রলোভিত করিয়া দেবরের নিকট হইতে দ্বারকানাথকে ১২০৫ সালে (১৭৯৯ খৃষ্টাব্দে) পোষ্যপুত্র গ্রহণ করেন। অতঃপর এই দ্বারকানাথ ব্যতীত রামলোচনের আর কোন সন্তান হয় নাই।...

১২১৪ সালের অগ্রহায়ণ মাসে (১৮০৭ খৃষ্টাব্দে ১২ই ডিসেম্বর) রামলোচন ঠাকুরের গঙ্গালাভ হয়। রামলোচন ঠাকুর স্বীয় দত্তকপুত্র দ্বারকানাথের মঙ্গল কামনায় বিনা-বিবাদে আপন ভ্রাতৃবর্গের সহিত পৈতৃক বিষয়াদি বিভাগ করিয়া লইয়াছিলেন; কিন্তু অন্নবিভাগ বা বাসবিভাগ হয় নাই।

দ্বারকানাথ ১২০১ সালে জন্মগ্রহণ করেন। ১৩।১৪শ

---

(২২) রাঢ়ীবারেন্দ্র বিভা আর বৈদিকে বলে।
সমাজের সৃষ্টিকালে সব কাণা চলে॥
পৃথক অন্ন পৃথক ক্রিয়া ধর্ম্ম হেতু।
ক্রমে মনের বিচ্ছেদে নষ্ট হয় সেতু॥
বিদ্বেষ অনল হৃদি বিদ্যুতের গতি।
ভ্রাতৃভাব পিতৃভক্তি নাশে সতীমতি॥
এড়ুমিশ্র হরিমিশ্র লেখে বিভাকথা।
সমাজ সংস্কারে দেখি অনেক অন্যথা॥
কোটি কোটি মানবের একে যাহা করে।
তাহাকে কভু কেহ সামান্য নাহি ধরে॥
রাঢ়ী বারেন্দ্রে অনৈক্য বিভা ব্যবহারে।
ছিল সমভাব পাক, যজ্ঞ ও আহারে॥
দূরদেশে থেকে ক্রমে পরিচয়ে দূর।
পরস্পর দোষে হয় বিচ্ছেদ প্রচুর॥
এমন সময়ে নাহি দেখি ঐক্যভাণ।
এড়ুমিশ্র লেখেন দ্ব—শ্রেণী মিলগান॥
কিন্তু কবে কোথা কা'র কন্যাপুত্রে বিভা।
কোন্ কুলে কে করিল এপ্রকার সভা॥
নাহি আছে তার কিছুমাত্র লেখাযোখা।
থাকিলে প্রমাণগণ্য যথা স্বর্ণরেখা॥ সারাবালী
স০ নি০ ৫০৮পৃঃ।

(২৩) রাঢ়ী বারেন্দ্রে কিছু ভেদ নাই।
বিদ্বেষ কারণে ভেদ দেখিবারে পাই॥
রাঢ়ী বারেন্দ্রে বিয়ে হৈয়াছে অনেক।
দেশভেদ নামভেদ এই পর্য্যন্তেক॥
প্রে০ বি০ ২১শ বিলাস।

বর্ষের বালক দ্বারকানাথ পিতার মৃত্যুর পর মাতা ও জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা (সহোদর) রাধানাথ ঠাকুরের অধীনে ছিলেন। এ সময়ে তাঁহার জন্মদাতা পিতা রামমণি ঠাকুর ও পিতৃব্য রামবল্লভ ঠাকুর জীবিত থাকিলেও তাঁহার জ্যেষ্ঠ সহোদর রাধানাথই তাঁহার অভিভাবক নিযুক্ত হইয়াছিলেন"। (ব. জা. ই. ব্রা. ৬৩২০—৩২২)।

দ্বারকানাথ আজীবন মাতা অলকাসুন্দরীর প্রতি একান্ত ভক্তিমান এবং তাঁহার আজ্ঞাবহ ছিলেন।

দেবেন্দ্রনাথের পিতামাতা।

আত্মজীবনীতে দেবেন্দ্রনাথ নিজের পিতামাতার কথা অধিক লিখেন নাই। মাতার বিষয়ে একবার মাত্র উল্লেখ আছে; যখন দেবেন্দ্রনাথ পিতৃ-শ্রাদ্ধের পূর্ব্বে মানসিক সংগ্রামে পতিত, তখন তিনি একদিন স্বর্গগতা জননীকে স্বপ্নে দেখিয়াছিলেন। সেই স্থানটী পড়িয়া আপাততঃ এরূপ ধারণা হওয়া সম্ভব যে দেবেন্দ্রনাথ অতি অল্প বয়সে মাতৃহীন হইয়া থাকিবেন; কিন্তু বস্তুতঃ তাহা নহে। মাতার মৃত্যুকালে দেবেন্দ্রনাথ ধর্ম্মচর্চ্চারত যুবক; তাই তিনি বিশ্বাসবলে অনুভব করিতেছিলেন যে মৃত্যুর পরেও নিশ্চয়ই মাতা জীবিতা আছেন। মাতাকে স্বপ্ন-দর্শন ও মাতার বিষয়ে এই সামান্য উল্লেখ হইতেই বুঝিতে পারা যায় যে দেবেন্দ্রনাথের চিত্তে তাঁহার মাতার জন্য কিরূপ শ্রদ্ধামণ্ডিত স্থান ছিল। সৌদামিনী দেবী লিখিয়াছেন, (পিতৃস্মৃতি, প্রবাসী, চৈত্র ১৩১৮, ৫৬০ পৃষ্ঠা)—"পিতৃদেবের স্মরণশক্তি অত্যন্ত তীক্ষ্ন ছিল। একবার তাঁহার কাছে শুনিয়াছিলাম, শিশু অবস্থায় মার কোলে শুইয়া তিনি ঝিনুকে করিয়া দুধ খাইতেছেন, সে কথাও তাঁহার অল্প অল্প মনে পড়ে।" বৃহৎ পরিবারে শিশুরা একটু বড় হইলে প্রায়ই অপেক্ষাকৃত অবসরসম্পন্না পিতামহীর নিকটে প্রতিপালিত হয়। দেবেন্দ্রনাথের বেলাতেও তাহাই হইয়া থাকিবে। তাঁহার জননীর বিষয়ে আমাদের কৌতূহল অপরিতৃপ্তই থাকিয়া যাইবে।

দেবেন্দ্রনাথের পিতার সহিত সম্বন্ধ বিষয়েও আপাততঃ এই ধারণা হইতে পারে সে পিতা-পুত্রে বিশেষ ঘনিষ্ঠতা ছিল না। তাঁহার চরিতাখ্যায়ক লিখিতেছেন, "শুনিয়াছি যে দেবেন্দ্রনাথ কোন দিন তাঁহার পিতার সম্বন্ধে বিশেষ কোন প্রসঙ্গের উত্থাপন করিতেন না। একদিন শুধু বলিয়াছিলেন যে, পিতা ইংলণ্ডে থাকিতে তাঁহার হাত-খরচের জন্য মাসিক লাখ টাকা করিয়া তাঁহাকে পাঠাইতে হইত। সুতরাং লোকে যে তাহাকে 'প্রিন্স' বলিয়া ডাকিবে তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি?" (অজিত ১২) "ছেলেবেলায় দেবেন্দ্রনাথ যে তাঁহার পিতার সঙ্গ খুব বেশী পাইতেন, তাহা মনে হয় না। তাঁহার সাতাত্তর বৎসর বয়সে তিনি স্বর্গীয় উমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয়কে একদিন গল্প করিয়াছিলেন যে ছেলে বেলায় ইস্কুল হইতে আসিয়া বাবার বৈঠকখানার চারদিকে তিনি ঘুরিয়া বেড়াইতেন। বৈঠকখানায় ঢুকিতে ইচ্ছা হয় অথচ সাহস হয় না। একদিন তাঁহার পিতা বলিলেন—"তুই ছুটে ছুটে বেড়াস্ কেন, বৈঠকখানার ভিতরে বসতে পারিস্ না?" তবু তাঁহার ভরসা হয় না।

তার পরে এক সময়ে হঠাৎ গিয়া দেখেন যে ভিতরে বেশ ফুলের তোড়া, বৈঠকখানাটি নানা সুন্দর জিনিষ দিয়া সাজানো। তখন হইতে বৈঠকখানায় বসিবার অধিকার হইল। সেইখানে বসিয়া অভিধান দেখিয়া তিনি পড়া শিখিতে লাগিলেন। এই গল্প করিয়া তিনি উমেশ বাবুকে বলিলেন, 'এখন সে বাবা নাই, আনত বাবা ছুটাছুটি ছাড়িয়া তাঁর ঘরে বসিতে বলিয়াছেন। বেশ লাগিতেছে!" (অজিত, ২৮)।

পিতার বিষয়ে দেবেন্দ্রনাথ আত্মজীবনীতে যাহা লিখিয়াছেন, তাহা বিশেষ ঘনিষ্ঠতা-জ্ঞাপক নয় বটে। কিন্তু মনে রাখিতে হইবে যে সেকালে পিতায় পুত্রে বিশেষ ঘনিষ্ঠতা হওয়া সাধারণ রীতি ছিল না। সে কালের তুলনায় দ্বারকানাথ অতিশয় পুত্রবৎসল পিতা ছিলেন। দ্বারকানাথকে নিজ বিষয় সম্পত্তির প্রসারণে ও পরিচালনে, তৎকালীন কলিকাতার অধিকাংশ লোকহিতকর অনুষ্ঠানে এবং দেশীয় (বাঙ্গালী ও অবাঙ্গালী) এবং ইংরাজ ভদ্রলোকদিগের সহিত নানাবিধ সামাজিকতায়, অতিশয় ব্যস্ত থাকিতে হইত। তিনি যখন (১৮২০) গভর্ণমেন্টের বিশ্বাসভাজন হইয়া ভাবী অতুল সম্পদের ভিত্তিস্থাপনের নানা চেষ্টায় আকণ্ঠ নিমগ্ন, দেবেন্দ্রনাথের বয়স তখন ৬ বৎসর মাত্র; দ্বারকানাথের বিষয়-বাণিজ্যের সফলতা যখন (১৮৩৪) এত অধিক হইতে লাগিল যে তিনি গভর্ণমেন্টের অতি উচ্চ কর্ম্মটিও ত্যাগ করা লাভজনক মনে করিলেন, তখন দেবেন্দ্রনাথের বয়স ১৭ বৎসর। তখনও দেবেন্দ্রনাথ কলেজের ছাত্র, অথবা সবে মাত্র কলেজ ত্যাগ করিয়াছেন; সেই সময়ে পিতার ঐশ্বর্য্যের আস্বাদন লইয়া দেবেন্দ্রনাথ হঠাৎ "বিলাসের আমোদে" অত্যধিক পরিমাণে নিমগ্ন হইয়া পড়িয়াছিলেন এবং সে জন্য তাঁহার নীতিমান পিতার অসন্তোষভাজন হইয়াছিলেন। কিন্তু বিধাতার অপূর্ব্ব বিধানে ১৮৩৫ সালে দেবেন্দ্রনাথের চিত্তের গতি সম্পূর্ণরূপে পরিবর্ত্তিত হইয়া গেল; পিতামহীর মৃত্যুর পর বৈরাগ্য এবং ধর্ম্ম-পিপাসা তাঁহার চিত্তকে একেবারে গ্রাস করিয়া

ফেলিল। দ্বারকানাথ মান-সম্ভ্রম ভাল বাসিতেন, নিজ পদোচিত জাঁকজমক করিয়া বাস করিতে ভাল বাসিতেন, এবং তৎকালীন ধনীদিগের রীতি অনুসারে বিলাসের ও প্রমোদের আয়োজনও সর্ব্বদা করিতেন। কিন্তু নীতির প্রতি তাঁহার বিশেষ দৃষ্টি ছিল। তাঁহার প্রদত্ত ভোজে মদ্যের স্রোত বহিয়া যাইত, কিন্তু তিনি স্বদেশে কি বিলাতে কোথাও মদ্য স্পর্শ করেন নাই। তিনি নিজ পূজা-অর্চ্চনায় অতিশয় নিষ্ঠাবান ছিলেন; এমন কি, ইংলণ্ডে যখন তাঁহার ভবনে তাঁহার সাক্ষাতের জন্য কোন duchess আসিয়া অপেক্ষা করিতেন, তখনও তিনি নিজের জপ সম্পূর্ণ না করিয়া উঠিতেন না।

যখন দ্বারকানাথের সম্পদ-সূর্য্য মধ্যাহ্ন গগন উদ্ভাসিত করিয়া প্রখর কিরণে জ্বলিতেছে (১৮৪০), যখন কলিকাতার সমুদয় দেশীয় ও য়ুরোপীয় সমাজ দ্বারকানাথের ঐশ্বর্য্যে ও বদান্যতায় তাঁহার স্তুতিগানে মুখরিত ও তাঁহার অনুগ্রহ-কণা লাভের জন্য লালায়িত। যখন দ্বারকানাথ কলিকাতার সর্ব্বপ্রধান দাতা, পরামর্শদাতা, ও প্রায় একছত্র সামাজিক সম্রাট্, সেই সময়ে দেবেন্দ্রনাথের ক্ষুধিত ও তৃষিত চিত্ত একমাত্র ধর্ম্মকেই অনুসন্ধান করিতেছিল এবং পিতার ঐশ্বর্য্যে, পিতার ভবনের ও পিতার উদ্যানের বিলাসের আয়োজনে ও লোকসমারোহে অস্থির হইয়া উঠিতেছিল। এই সময়ে দ্বারকানাথ দেবেন্দ্রনাথের প্রতি অসন্তুষ্ট হইতেছিলেন; কিন্তু তাহার কারণ দেবেন্দ্রনাথের ধর্ম্মভাব বা বিলাসবিমুখতা নহে, বিষয়পরিদর্শনে অমনোযোগ। এই সময়ে পিতায় পুত্রে কিয়ৎ পরিমাণে মনের বিচ্ছেদ ঘটিয়াছিল সন্দেহ নাই।

কিন্তু ইহা মনে করিলে নিতান্ত ভুল হইবে যে দেবেন্দ্রনাথের হৃদয়ে ও চরিত্রে পিতার ছাপ নাই; বরং ইহার বিপরীত কথাই সত্য। আত্মজীবনীতে দেবেন্দ্রনাথ স্বীয় ধর্ম্মচিন্তার ও ধর্ম্মতত্ত্ব উপলব্ধির ইতিহাসকেই প্রাধান্য দিয়াছেন; তাই ইহাতে পিতার বিষয় উল্লেখ এত অল্প। কিন্তু দেবেন্দ্রনাথের চরিত্র, শোণিতসূত্রে ও বাল্যজীবনে পিতার দৃষ্টান্তের প্রভাবসূত্রে, দ্বারকানাথের চরিত্র হইতেই স্বকীয় অধিকাংশ মহত্ত্ব ও সদ্গুণ আহরণ করিয়াছিল। দ্বারকানাথের চরিত্রের কর্ত্তব্যপরায়ণতা, তাঁহার একান্ত সাধুতা ও সদাশয়তা, তাঁহার উদারতা ও দানে মুক্তহস্ততা, তাঁহার ক্ষুদ্রচিত্ততায় ও ক্ষুদ্র বিষয় লইয়া জীবনযাপনে একান্ত অনাস্থা, তাঁহার মনস্বিতা তেজস্বিতা ও স্বজাতির গৌরবে গর্ব্ব, তাঁহার ভারতীয় আদর্শ, সকলের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা, তাঁহার সূক্ষ্ম বিষয়ে দৃষ্টি, সৌন্দর্য্যবোধ ও শৃঙ্খলাপ্রিয়তা, এবং ধর্ম্ম-কর্ম্মে তাঁহার দৃঢ় নিষ্ঠা, আমরা দেবেন্দ্রনাথের চরিত্রেও দেখিতে পাই। কিন্তু দেবেন্দ্রনাথ বয়স্ক হইবার পর হইতে পিতার ও পুত্রের জীবনের লক্ষ্যের ভিন্নতা অতিশয় সুস্পষ্ট হইয়া উঠিল। দ্বারকানাথের আকাঙ্ক্ষা ছিল যে সংসারে প্রতিপত্তিশালী ও যশস্বী হইব, এবং প্রাণ খুলিয়া পরোপকার ও দেশের উপকার করিব। দেবেন্দ্রনাথ সংসারে নিঃস্পৃহ এবং যশ হইতে সঙ্কুচিত ছিলেন; তাঁহার মনের কথা ছিল, 'তোমা বিহনে আমার জীবনে কি কাজ?' তাঁহার আকাঙ্ক্ষা ছিল যে কিসে ব্রহ্মের পূজা দেশমধ্যে ব্যাপ্ত হয়। দ্বারকানাথ দশের মানুষ ছিলেন, মানবপ্রেমিক ছিলেন, সর্ব্বশ্রেণীর মানুষদের লইয়া থাকিতে ভাল বাসিতেন। দেবেন্দ্রনাথ ধর্ম্মের মানুষ ছিলেন ঈশ্বরপ্রেমিক ছিলেন, ঈশ্বরপ্রেমিকদের লইয়াই থাকিতে ভাল বাসিতেন। বিষয়পরিচালনে দ্বারকানাথের বুদ্ধি এবং অনুরাগ উভয়ই প্রকাশ পাইত; দেবেন্দ্রনাথ বিষয়পরিচালনে বুদ্ধি প্রয়োগ করিতেন বটে, কিন্তু তাঁহার অনুরাগ পড়িয়া থাকিত ঈশ্বরে। দ্বারকানাথ মানুষকে স্বদলে ও স্বমতে আনিবার এবং বিষয়সম্পদ নানা দিক দিয়া প্রসারিত করিবার কৌশলটি বিশেষরূপে শিক্ষা করিয়াছিলেন। দেবেন্দ্রনাথ সে সকল পথ দিয়া যান নাই, সে সকল কৌশল শিখিতে পারেন নাই। অপর দিকে ধর্ম্মের দ্বারা প্রভাবিত হওয়া অবধি দেবেন্দ্রনাথ আহারে, বিহারে, আমোদ-প্রমোদে ধনের ব্যবহারে এবং বন্ধু ও সহচর নির্ব্বাচনে যে কঠোর সংযমের ও শুচিতার নিয়মে আপনাকে বাঁধিয়াছিলেন, দ্বারকানাথে তাহা ছিল না। কিন্তু এই পার্থক্য সত্ত্বেও, দেবেন্দ্রনাথের প্রকৃতির গতিবিধির ও আচরণের অধিকাংশ লক্ষণ তাঁহাকে দ্বারকানাথের পুত্র বলিয়াই পরিচিত করিয়া দেয়।

স্বদেশের সেবায় ও বিবিধ অনুষ্ঠানে দ্বারকানাথের জীবন অতিশয় সমুজ্জ্বল। রামমোহন রায়ের ন্যায় তিনিও স্বীয় যুগের ইতিহাসে নিজের সুস্পষ্ট ছাপ রাখিয়া গিয়াছেন। তাঁহার একখানি সর্ব্বাঙ্গসুন্দর জীবনচরিত প্রকাশিত হওয়া একান্ত আবশ্যক।

দেবেন্দ্রনাথের পিতামহীর স্বহস্তে অনেক কাজ করা।

সে যুগে ধনী পরিবারের মহিলাগণও নিজের হাতে অনেক কাজ করিতেন। "রবীন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন যে, তাঁহাদের শিশুকালে ভোগবিলাসের আয়োজন ছিল না বলিলেই হয়, এবং মোটের উপরে তখনকার জীবনযাত্রা এখনকার চেয়ে অনেক বেশী সাদাসিধা ছিল। দেবেন্দ্রনাথ তাঁহার কালের কোন প্রাচীন লোকের কাছে গল্প করিয়াছিলেন যে, তাঁহার যখন তিন বছর বয়স তখন তিনি একটী ছোট ঘোড়ার উপরে দাঁড়াইয়া

ঘরের কপাটের আগল খুলিতেন, সে কথা তাঁহার বেশ মনে পড়ে। আর বেতের কুনকিতে করিয়া সকালে মুড়ি-মুড়কি প্রভৃতি গ্রাম্য জলখাবার খাইতেন। অতএব দ্বারকানাথের পরিবার বিখ্যাত ধনী পরিবার হইলেও সে কালের জীবনযাত্রার সরল ব্যবস্থাগুলি পুরুষানুক্রমে এই পরিবারে চলিয়া আসিয়াছে, ইহা স্পষ্টই দেখিতে পাওয়া যায়।" (অজিত ২৫)।

"দেবেন্দ্রনাথ যখন জন্মগ্রহণ করিলেন, তখনও দ্বারকানাথের পৈতৃক গোলপাতার ঘর বর্ত্তমান। এই গৃহই দেবেন্দ্রনাথের সূতিকা-গৃহ। মহর্ষি বলিয়াছেন যে ...'প্রথম যে দিন শাল আমার গায়ে উঠিল তাহাও আমার মনে পড়িয়াছে।' মহর্ষি অতুল ঐশ্বর্য্যের মধ্যে জন্মগ্রহণ করেন নাই, কিন্তু তাহার সূচনাক্ষেত্রে জন্মিয়াছিলেন। (প্রিয়, পরি ২।৮৮)

যুগবার্ত্তা।

(কথক শ্রীহেমচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, কবিরত্ন)

আর্য্যশাস্ত্রে যুগ চারটী—সত্য-ত্রেতা-দ্বাপর-কলি। তাঁহাদের মতে এখন চল্‌চে কলিযুগ। শ্রীমদ্ভাগবতে বলা হয়েছে, যেদিন শ্রীকৃষ্ণ বৈকুণ্ঠধামে গমন করলেন, সেদিন থেকেই কলিযুগের আরম্ভ। পুরাণ-গ্রন্থে কলিযুগের লক্ষণ যা-সব বর্ণিত হয়েছে, তা লিখে প্রবন্ধের কলেবর বৃদ্ধি এবং পাঠকের ধৈর্য্য নষ্ট করতে চাইনে, বিশেষতঃ লক্ষণগুলো মোটেই শ্রুতিসুখকর নয়।

এখন জিজ্ঞাস্য এই যে, কলিযুগ কি কেবল ভারতবর্ষের জন্যই—না সমস্ত জগতের পক্ষে? পাশ্চাত্যজাতি, যাঁরা এখন সুসভ্য ও উন্নত—সে কথা তাঁরাও বলচেন এবং তাঁদের কথা শুনে, অথবা দায়ে পড়ে আমরাও বলচি—তাঁরা কিন্তু কলিযুগ মানেন না। আমাদের মতে আমরা ক্রমাবনতিতে সত্যযুগ থেকে কলিযুগে এসে পড়েছি। আর তাঁদের মতে তাঁরা Stone age থেকে ক্রমে উন্নত হ'তে হ'তে সভ্যজাতি হয়ে উঠেছে। এর কোন্‌টা সত্য? যাদের বুদ্ধিবৃত্তি কুসংস্কারে আবৃত হয়ে আছে, তাঁদের কাছে এ বিচারের কোন দরকার নাই। তাঁদের কাছে শুধু ভারতবর্ষ নিয়েই পৃথিবী, হিন্দুজাতিই একমাত্র জাতি, এবং দেবনাগর অক্ষরে লিখিত পুঁথির কথাই মাত্র অখণ্ড সত্য। কিন্তু এই কলিযুগের স্বাধীন আবহাওয়ায় অনেক সত্যানুসন্ধীর উদ্ভব হয়েছে, খুঁজে দেখা, পরখ করা এবং প্রশ্ন করাই যাদের স্বভাব। এরা কোন রকমেই যুক্তিতর্ক ছাড়বে না। এগুলোর অবাঞ্ছনীয় আয়ুষ্কালই যেন এই ভয়াবহ কলিযুগের বহরটাকে ক্রমাগত দীর্ঘ করে চলেছে।

পাশ্চাত্য কোন কোন পণ্ডিতের মতে জগৎ ক্রমান্বয়ে উন্নতির দিকে চলেছে। আর প্রাচ্য পণ্ডিতেরা পর্য্যায়-বদ্ধ উত্থানপতনযুক্ত অনন্ত অভিব্যক্তির কথা প্রচার করে' গেছেন। দ্বিতীয় মতটাই যেন বেশি যুক্তিপূর্ণ মনে হয়। ক্রমোন্নতি মানতে গেলেই একটা প্রাথমিক অনুন্নত অবস্থা মনে আসে; সঙ্গে সঙ্গে অগ্রগাবয়বি-ধারার বিশ্রামস্থানও মেনে নিতে ইচ্ছা হয়। কিন্তু তা হ'লে সৃষ্টির অনাদিত্ব-যুক্তিলোপে ব্রহ্মেরও সৃষ্টির সঙ্গে নিত্যকাল বর্ত্তমানতা কষ্টকল্পিত হয়ে উঠে। সুতরাং এখানে প্রাচ্য মতটাই সত্যিকার বলে মনে হয়।

ব্যক্তি, জাতি অথবা সমাজ—সকলের উন্নতিই ভিতর হ'তে বাহিরে; বাহির হ'তে ভিতরে কিছুতেই নয়। ভিতরের উন্নতিকেই আমরা বলি আধ্যাত্মিক উন্নতি। জাতীয় উন্নতি আধ্যাত্মিক উন্নতির উপরেই নির্ভর করে। আর এই উন্নতি বুঝবার মাপকাঠি এই যে, সেই উন্নত জাতি, ব্যক্তি অথবা সমাজ দ্বারা তাঁর নিজের ও জগতের হিত হ'চ্ছে কি না।

আমাদের কথা পরে বলব, আগে প্রতীচ্যের কথা বলে নিচ্ছি। পাশ্চাত্য জাতি বিজ্ঞানপ্রভাবে যতই মৃত্যুযন্ত্র আবিষ্কার করুক, বাহ্যিক সমৃদ্ধি কাম বিলাসিতার বৃদ্ধি করুক আসলে তাঁরা উন্নত হ'চ্ছেন না। এ কথার প্রমাণ বিগত ভয়ঙ্কর যুদ্ধের কামানের আগুণে স্পষ্ট হয়ে দেখা দিয়েছে। অন্তর্গূঢ় কৃত্রিম সভ্যতার এমন করাল অভিব্যক্তি বিশ্ব আর কখনও প্রত্যক্ষ করেনি। এই সুদীর্ঘ কালের ভিতরে তাঁদের চমক-লাগানো সভ্যতা কোন মহৎভাব প্রসব করতে পারেনি। এত দিনের ভিতরে তাঁদের মধ্যে এমন কোন মহাপুরুষ জন্মাননি, যিনি জগতে বিদ্বেষাপহারিণী শান্তিবাণী শোনাতে পারেন। সুতরাং তাঁদের মাঝেও চলেছে কলিযুগ, এটা যদি বলি, তবে তা নিতান্তই অসঙ্গত হয় কি? এইটুকু বুঝে আমাদের ভিতরে যাঁরা অন্ততঃ সাংসারিক হিসাবেও একটু বুদ্ধিমান, তাঁরা তাঁদের অবস্থার সঙ্গে ঝগড়া করলেও হিংসা করেন না নিশ্চয়ই।

এখন বলব আমাদের কথা; পরের কথার চেয়ে কিন্তু নিজের কথাই বলা শক্ত! কারণ নিজের জিনিসের উপরে স্বভাবতই বেশি টান্ থাকে। এখানকার দু' একজন বৈদান্তিক সন্ন্যাসী—যাঁদের বাসস্থান হিমাচল পর্ব্বতের কোন চিরদিনের অজানা গুহার অন্ধকারে—তাঁরা ছাড়া সবাই একথা স্বীকার করবে। সুতরাং নিজের কথা একটু হুঁসিয়ার হয়েই বলতে হবে।

দেশের কথা নিয়ে যাঁরা নাড়াচাড়া অথবা ব্যবসা করেন, তাঁদের মধ্যে দুরকম লোক দেখ্‌তে পাই। এক দল কেবল আমাদের দোষগুলিই দেখিয়ে ভ্রূকুঞ্চিত

কচ্ছেন, আর একদল কেবল অতীত-গৌরবগাথা কীর্ত্তন করে অশ্রুজল মোচন কচ্ছেন। দু-দলের কথাই কিন্তু আংশিক সত্য। ও দুটোই চাই; কারণ, দুটো মিশিয়ে দেখলেই তবে সত্যিকার দেখা হয় মনে করি। নিজের কিছু বলতে গিয়ে অনেক সময়ে নিজের চেয়েও আমরা কথাটাকেই বড় করে তুলি; এতে সত্য জিনিসটা চাপা পড়ে একটা মতবাদের সৃষ্টি হয় মাত্র।

আজ আমাদের কপালদোষে, বিকৃত শিক্ষার গুণে "স্বরাট্" "স্বাধীনতা" প্রভৃতি কথাগুলো আর এক রকম হয়ে দেখা দিচ্ছে। এদের বর্ণ এখন রক্তবর্ণ। এদের পিছনে যেন অস্ত্রের ঝঞ্জনা আর কামানের গর্জ্জন শান্তি ও সুস্থতাকে ক্রমাগতই চোখ রাঙিয়ে শাসাচ্ছে। বাস্তবিক পক্ষে আমাদের দেশে এ কথাগুলো ছিল অমৃতত্বের সোপান। অর্থাৎ যা পেলে আর অন্য কিছু পেতে ইচ্ছা হয় না; যা একবার পেলে আর যায় না, যাবার ভয় থাকে না, রাখবার জন্য উদ্বিগ্ন হতে হয় না। আর যা রাখতে গেলে কারো সঙ্গে বিরোধ হয় না। এ সম্পত্তি অপরকে বঞ্চিত করে না, বরং সমৃদ্ধ করে। যে স্বাধীনতা অপরকে অধীন করে না, আমরা সেগুলোকে ভুল করে বুঝেছি বলেই এখন তাঁকে বাইরে খুঁজছি এবং তাঁর জন্যে নিজেদের তপস্যা ছেড়ে দিয়ে পরের দোরে অধম ভিখারীর মত হাত পেতে বসে আছি।

আমাদের পক্ষে এই তথাকথিত স্বাধীনতা বা স্বরাজ-নামধেয় জড়প্রকৃতির 'ছেলেভুলানো চুষিকাঠি' অথবা অমার্জ্জিত কল্পনার 'সোণার পাথরবাটীর' অভাবে আমরা একেবারে ম্রিয়মাণ হয়ে নিজেদের নেহাৎ কোণ-ঠেসা করে রেখে দিয়েছি। এতে দোষ হচ্ছে এই যে, যা পাবোনা তা কখনো পাবোনা, আর যা পেয়েছি তা প্রচুর হইলেও তাতে দারিদ্র্য এবং অভাব দূর হচ্ছে না।

এ জাতি চিরদিন বুঝে এসেছে যে, আধ্যাত্মিক লাভটাই বড় লাভ। এই জ্ঞানটাকে ভুলিয়ে দিয়ে যাঁরা বক্তৃতায়, প্রবন্ধে, আমাদের কল্পিত-কাঙাল ক'রে তুলতে চাচ্ছেন, তাঁদের বুদ্ধির প্রশংসা করতে পারিনে। আমরা পেয়েছি একটা জীবন্ত আধ্যাত্মিক সত্য—পাশ্চাত্য ভাষায় আজকাল বলা হচ্ছে Non-violence, আমরা বল্‌ব অহিংসা। এটা সেই সুদূর অতীত যুগের ঋষি-প্রচারিত সত্য। এর জন্মস্থান কোনো রাজধানীতে নয়—তপোবনে। কিন্তু তখনকার দিনে এর পুষ্টি হয়েছে সকল স্থানে। তখন এটা পাওয়া হয়েছিল, মাঝখানে বিকৃত শিক্ষায় আমরা একে ভুলেছিলাম। আবার তাকে নূতন করে পেয়েছি। কারণ নূতন মানুষ নূতন রকম করে' দিয়েছেন। যোগ্যহাতের দান পেলে গ্রহীতা কৃতার্থ হয়। এখন এটার মূল্য যদি আমরা না বুঝি, একে যদি আদরে গৌরবে ধারণ করতে না পারি তবে যে চিরদিন দরিদ্র থাক্‌ব তা নয়, স্বধর্ম্ম-ত্যাগজনিত মহাপাপের ফলে প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে।

আমাদের ভিতরে কলিযুগ চল্‌ছে, স্বীকার করি, তবে কিনা এটা কলির শেষ ভাগ। আবার প্রকৃতির নিয়মানুসারে সত্যযুগ ফিরে আসছে। আমাদের এখন উচিত তার সঙ্গে সঙ্গত হওয়া, তাকে মেনে চলা, তার পথ সুগম করে দেওয়া। এইটুকুই মাত্র সাধনা। এর উপরে নিজেকে ছেড়ে দিতে হবে, একে সর্ব্বান্তঃকরণে স্বীকার করতে হবে। এর ভিতরে একটুকু ফাঁকি থাক্‌লেও চল্‌বে না। মধ্যযুগে বিকৃত শিক্ষা ও অনুকরণমূলক পশু-ভাব-সঞ্জাত-শক্তির অপব্যয়ের পরে প্রকৃত সত্যযুগের দ্যোতনাত্মক Non-violence তত্ত্ব পেয়েছি। এই তত্ত্বজ্ঞানে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য উভয় জাতির ভিতরেই সত্যযুগের সঞ্চার হবে।

আমরা চাচ্ছি "স্বরাজ"; সকলে তা এখনো পায়নি। পায়নি' তাদের নিজেদেরি দোষে। যিনি এই Non-violence তত্ত্ব আমাদিগকে দিয়েছেন, তিনি কিন্তু পেয়েছেন। তাই কারাগারের লৌহপ্রাচীর তাঁকে আবদ্ধ করে না, বিরুদ্ধবাদী তাঁকে বিদ্বেষ করে না। তাই তাঁর কিছু গোপনতা নেই, তাই তাঁর বাণী—My movement is a world movement. এ স্বরাজ আমাদের তিনি দিয়েছেন, কিন্তু দুর্ভাগ্যবশে আমরা তা পাইনি'। আত্মবঞ্চিত নিস্ক্রতার মোহাবর্ত্তে পড়ে আমরা কেবলি পাক খাচ্ছি। একটা জিনিস দেওয়া হ'লেই পাওয়া হয় না; নিতে জানা চাই। একে আমরা সেই দিন হ'তে কেবলি ঠেকিয়ে চল্‌চি, যে দিন ইস্কুল-কলেজ ছাড়াকে হুজুক বলে' ভাবলুম, চরকা ঘোরানোকে বাজে কাজ বলে ধরলুম, এবং Non violence তত্ত্বটাকে অতিরিক্ত আধ্যাত্মিকতা বলে উপহাস করলুম। কেউ কেউ আজো এই Non-violence কথাটাকে এখনো একটা Diplomacy বলে ভেবে থাকেন। এই Non-violence আগে, এটাই মধ্যে এবং এটাই পরে। একমাত্র এই সাধনার পথে চলতে পারলেই আমাদের সব হবে।

অনেকেই হয় তো এই কঠোর বৈজ্ঞানিক যুগে কথাটাকে হেসে উড়িয়ে দেবেন। এঁরা বল্‌বেন, এটা বড়ই সূক্ষ্ম রকমের আধ্যাত্মিকতত্ব। কিন্তু কথা

এই যে সব রোগের চিকিৎসা এক রকম নয়। দেশ কাল পাত্রভেদে উন্নতি ও অবনতির বিভিন্নতা হয়ে থাকে। আমাদের যদি জাগ্‌তে হয় তো এরি মধ্য দিয়ে জাগ্‌ব। এ ছাড়া অন্য পন্থা নাই। আমরা মানুষ, পশুর মত ব্যবহার করলে বাঁচব কেন? আমাদের প্রকৃতিতে তা খাপ খাবে না। আমরা শক্তিমান, সুতরাং কঠিনেই আমাদের আনন্দ; আমরা ঋষির বংশধর, সুতরাং ত্যাগই আমাদের প্রকৃতি; আমাদের জন্ম ভারতবর্ষে সুতরাং ধর্ম্মই আমাদের প্রাণ; আমরা মুক্তসন্ধায়ী, সুতরাং আমাদের পন্থাও হবে নূতন সৃষ্টি; আমরা চিরকাল জগতের শিক্ষাগুরু সুতরাং আমরা যা' কর্‌ব তাই হবে আদর্শ।

ক্রমেই আমরা দেখ্‌তে পাচ্ছি সমস্ত জগতের পক্ষেই কলিযুগের অবসানে আধ্যাত্মিকতার উন্নতি হচ্ছে। জগতে সব যায়—যেতে পারে, থাকে কেবল সত্য। Non-violence বা অহিংসা এ যুগের মহাসত্য। আমরা যেন এই মহাসত্যকে কায়মনোবাক্যে স্বীকার করে ধন্য হ'তে পারি ভারতের ভাগ্যবিধাতা আমাদের বল বিধান করুন।

ডাক্তার এডওয়ার্ড বাইল্‌স কাউয়েল।

পূর্ব্বানুবৃত্তি

(শ্রীপঞ্চানন রায়)

১৮৬৪ খৃষ্টাব্দের প্রারম্ভে কাউয়েল সাহেব কিঞ্চিৎ পীড়িত হইয়া পড়েন এবং স্বদেশ-প্রত্যাগমনাভিলাষী হইয়া অবকাশলাভের জন্য চিকিৎসকদিগের অভিমতসম্বলিত একটী আবেদনপত্র প্রেরণ করেন। ভারতবর্ষের গ্রীষ্মাতিরিক্তা তাঁহার পক্ষে অপ্রীতিকর ছিল, বোধ হয় ইহাই তাঁহার পীড়ার একটী কারণ। তাঁহাদের স্বদেশগমনাভিলাষ বুঝিতে পারিয়া বহু অনুরক্ত ব্যক্তি দুঃখিতচিত্তে তাঁহাকে পত্রাদি লিখিতে আরম্ভ করেন। পত্রলেখকদিগের মধ্যে বহু খৃষ্টধর্ম্মে নবদীক্ষিত ব্যক্তি তাঁহাকে "পিতা" বলিয়া সম্বোধন করিতেন। ইহাতেই তদানীন্তন বঙ্গীয় ছাত্রসমাজের উপর তাঁহার কিরূপ প্রভাব ছিল তাহার কথঞ্চিৎ পরিচয় পাওয়া যায়। কলিকাতায় থাকিতে থাকিতেই কাউয়েলপত্নী তদীয় পিতার অসুস্থতাসংবাদ প্রাপ্ত হন। কিন্তু তাঁহার স্বদেশপ্রত্যাগমনের পূর্ব্বেই তিনি পরলোক গমন করেন। অনন্তর ১৮৬৫ খৃষ্টাব্দের ২৩শে এপ্রিল কলিকাতাবাসী ভারতীয় এবং ইউরোপীয় উভয়জাতীয় অনুরক্তগণকেই দুঃখসাগরে নিমগ্ন করিয়া তাঁহারা স্বদেশযাত্রার জন্য পোতারোহণ করেন।

স্বদেশযাত্রার পূর্ব্বে কাউয়েলদম্পতী তাঁহাদের সংগৃহীত পুস্তকের বৃহত্তর অংশটী সংস্কৃতকলেজ গ্রন্থাগারকে অর্পণ করেন এবং সংস্কৃতকলেজে ব্যাকরণশিক্ষার উন্নতির জন্য মাসিক পাঁচ টাকা করিয়া বৃত্তি প্রদানোদ্দেশ্যে কতকগুলি মুদ্রা সরকারবাহাদুরকে অর্পণ করিয়া যান। ভারত পরিত্যাগের অল্পদিন পূর্ব্বে কাউয়েল সরকারবাহাদুর কর্ত্তৃক নবদ্বীপের চতুষ্পাঠীসমূহ পরিদর্শন করিয়া একটী বিবরণী প্রদান করিতে অনুরুদ্ধ হন। এই পরিদর্শন উপলক্ষে কাউয়েল সাহেবের অসাধারণ ন্যায়শাস্ত্রজ্ঞানের পরিচয় পাওয়া যায়। এতদুদ্দেশ্যে সম্মিলিত একটী সভায় নবদ্বীপের তৎকালীন শ্রেষ্ঠ ন্যায়শাস্ত্রজ্ঞ মাধবচন্দ্র তর্কসিদ্ধান্ত মহাশয়ের সহিত তাঁহার বহু কুটিল প্রশ্নের আলোচনা হয় এবং পণ্ডিতমণ্ডলী এই সুকঠিন শাস্ত্রে তাঁহার প্রগাঢ় অধিকার দেখিয়া বিস্মিত হন। স্বদেশে প্রত্যাগমন করিয়া তিনি পরিদর্শনবিবরণীটী সরকারবাহাদুরকে প্রেরণ করেন এবং উহার ফলেই সরকারবাহাদুর ছাত্রদিগের বৃত্তি একশত মুদ্রা হইতে বর্দ্ধিত করিয়া সার্দ্ধশত করিয়া দেন।

স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তনাবধি অবকাশের দিনগুলি সুন্দরভাবে কাটিয়া যাইতে লাগিল। ১৮৬৫ সালের গ্রীষ্মকালে কাউয়েল ভারতীয় সিবিলসার্ব্বিস পরীক্ষার প্রাচ্য বিষয়সমূহের একজন পরীক্ষক নিযুক্ত হন। এই সময় তিনি রয়াল এসিয়াটিক সোসাইটীরও একজন সদস্য নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন। তাঁহাদের ভারতপ্রত্যাগমন ক্রমশঃ অনিশ্চিত হইয়া উঠিতে লাগিল। কাউয়েলের মাতা, ভ্রাতা ও কয়েকজন বিশিষ্ট বন্ধু তাঁহার ভারতপ্রত্যাবর্ত্তন বিষয়ের বিশেষ বিরোধী ছিলেন, কিন্তু স্বদেশে কোন কর্ম্মপ্রাপ্তির উপরই তাঁহাদের স্বদেশাবস্থিতি নির্ভর করিতেছিল। সত্বরই একটী সুযোগ উপস্থিত হইল; ১৮৬৭ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারি মাসে কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষগণ

একজন সংস্কৃতাধ্যাপকের পদসৃষ্টি করিতে মনঃস্থ করিলেন। কাউয়েলের পক্ষে ইহা সুবর্ণসুযোগ বলিয়া মনে হইল। অবিলম্বে মোক্ষমুলর, মনিয়র উইলিয়ামস্‌ প্রভৃতি বহু বিখ্যাত বিদ্বজ্জনের প্রশংসা-পত্রের সহিত তিনি একটী আবেদনপত্র প্রেরণ করিলেন। ঐ বৎসরেরই মে মাসে কেম্ব্রিজ বিশ্ব-বিদ্যালয়ের Trinity Collegeএ তিনি উক্ত পদ লাভ করেন। তাঁহার সুন্দর অধ্যাপনাগুণে অধ্যা-পিত বিষয়ের ছাত্রসংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। তিনিও প্রতিদিন লোকপ্রিয় হইয়া উঠিতে লাগিলেন। তাঁহার এই লোকপ্রিয়তার একমাত্র কারণ তাঁহার আত্মাভিমানশূন্যতা ও ছাত্রগণের জন্য প্রগাঢ় পরিশ্রম।

এই সুবিপুল কর্ম্মময় জীবনের মধ্যেও কাউ-য়েলের পাঠস্পৃহা বিদূরিত হয় নাই। এই সময় তিনি বিপুল উৎসাহে হিব্রুভাষাচর্চ্চায় নিযুক্ত ছিলেন এবং তদুপরি উদ্ভিদ্‌বিদ্যালোচনা করিয়া সুবিমল আনন্দ লাভ করিতেন। প্রত্নতত্ত্বালোচনাও এই সময় তাঁহার একটী প্রিয় জিনিষ ছিল। এই সমস্ত চর্চ্চা, বিশেষতঃ উদ্ভিদ্‌বিদ্যাচর্চ্চার সুবিধার জন্য তিনি অবকাশ পাইলেই নানাদেশে পর্য্যটন করিয়া পরিতৃপ্ত হইতেন।

১৮৭৪ খৃষ্টাব্দে কাউয়েল Corpus christi Collegeএর একজন সদস্য মনোনীত হইয়া Trinity College হইতে স্থানান্তরিত হন। এই সংবাদটী তাঁহার বাল্যশিক্ষক Mr. Ebdenকে জানাইলে তিনি বিশেষ সন্তোষ প্রকাশ করিয়া-ছিলেন। তাঁহার এই পদপ্রাপ্তি উপলক্ষ্যে তদীয় বাল্যশিক্ষার স্থান Ipswich Grammar Schoolএর ছাত্রবৃন্দ অর্দ্ধদিনের অবকাশ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। এই বৎসরেরই জানুয়ারী মাসের ১১ই তারিখে তাঁহার পরম স্নেহময়ী মাতা পরলোক গমন করেন।

১৮৭৫ খৃষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে কাউয়েল এডিনবার্গ বিশ্ববিদ্যালয় হইতে সম্মানসূচক L.L.D. উপাধি প্রাপ্ত হন। ১৮৮০ খৃষ্টাব্দে কাউয়েল তাঁহার প্রিয় ভারতীয় শিক্ষক মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্ন মহাশয়কে কোন রাজকীয় সম্মানসূচক উপাধি প্রদানের জন্য তাঁহার পরিচিত ভারতসরকারের কোন উচ্চ কর্ম্মচারীর সহযোগিতায় বিশেষ চেষ্টা করেন। তাহারই ফলে ন্যায়রত্ন মহাশয় ১৮৮১ খৃষ্টাব্দে C. I. E. উপাধি প্রাপ্ত হন।

১৮৮৩ খৃষ্টাব্দের ১৪ই জুন কাউয়েল সাহেবের আবাল্য সহচর প্রিয়তম বন্ধু Edward Fitzgerald পরলোক গমন করেন। এই বন্ধুবরের সহযোগি-তায় কাউয়েলের ব্রামফোর্ডের দিনগুলি অধিকতর সুন্দর হইয়া উঠিত, ইঁহার আকস্মিক অন্তর্ধানে কাউয়েল যে বিশেষ ব্যথিত হইয়া পড়িলেন তাহা বলাই বাহুল্য। তাঁহার এই বন্ধু সুপ্রসিদ্ধ পারসিক কবি ওমর খৈয়ামের প্রথম ইংরাজী পদ্যানুবাদ রচনা করিয়া বিখ্যাত হইয়াছিলেন; পারসী প্রভৃতি অহিন্দু প্রাচ্য ভাষা চর্চ্চায় তিনি কাউয়েলের এক-জন বিশেষ সহযোগী ছিলেন। তাঁহার বিয়োগ-বেদনা কাউয়েলের অন্তরকে অবনমিত করিয়া ফেলিল।

১৮৮৯ খৃষ্টাব্দে অপর্য্যাপ্ত কার্য্যভারপ্রপীড়িত হইয়া কাউয়েল সাহেব ভারতীয় সিবিল সার্ব্বিসের পরীক্ষক-পদ হইতে অবসর গ্রহণ করেন। ১৮৯২ খৃষ্টাব্দের শরৎকালে লণ্ডনমহানগরীতে "প্রাচ্য-মহাসভার" অধিবেশন হয়। কাউয়েল সাহেব এই মহাসভার "Arian Section"এর সভাপতি-পদ লাভ করিয়া অত্যন্ত সফলতার সহিত কার্য্য নির্ব্বাহ করেন। এতদুপলক্ষ্যে তিনি দুইটী সংস্কৃত শ্লোক রচনা করিয়াছিলেন। উহার ইংরাজী অনুবাদ শ্রবণ করিয়া শ্রোতৃবর্গ পরম পরিতৃপ্তি লাভ করেন। শ্লোক দুইটীর ভিতর দিয়া কাউ-য়েলের ভারতপ্রীতি বিচ্ছুরিত হইয়া পড়িতেছে। উহা এতদূর মর্ম্মগ্রাহী হইয়াছিল যে আমরা উহা উদ্ধৃত করিবার লোভ সংবরণ করিতে পারিলাম না।

"পুরা প্রশান্তাঃ ঋষয়ঃ সমাগমন্
বনেষু শাস্ত্রেষু—ইতি কার্ত্তয়েৎ স্মৃতিঃ।
ভবন্ত এবং ত্বধুনা সমাগতাঃ
অদৃষ্টদোষান্নগরে সমাকুলে॥
তথাপি মন্যে রমণীয়তারসোহ-
স্ত্যাদেতি চিন্তেষু বিপন্নায়াদপি।
তথাহি বিদ্যুদ্‌গগনে গতপ্রভে।
তমঃসু মুচ্ছ্র্ৎসু বিরাজতেতরাম্॥"

'পুরাকালে শান্তচিত্ত ঋষিগণ প্রশান্ত কানন-মধ্যে সমাগত হইতেন, স্মৃতি ইহাই কীর্ত্তন করিয়া থাকেন ; কিন্তু সম্প্রতি আপনারা অদৃষ্টদোষবশতই জনসমাকুল নগর মধ্যে সমবেত হইয়াছেন। তথাপি এবংবিধ বিপর্য্যয়ের মধ্যেও চিত্তমধ্যে রমণীয় ভাবেরই উদয় হইতেছে, কারণ দিবাশেষে গগন-মণ্ডল নিষ্প্রভ হইয়া গেলে, যখন তমোরাশি সুবিস্তৃত হইতে থাকে তখনই বিদ্যুৎ অধিকতর শোভনীয় হয়।'

১৮৯৫ খ্রীষ্টাব্দে তদীয় ছাত্রবর্গ তাঁহাকে তাঁহার একটী আলোকচিত্র উপহার প্রদান করেন। পরে তাঁহার সপ্ততিবার্ষিক জন্মোৎসব উপলক্ষ্যে তাঁহার একটী তৈলচিত্র কেম্ব্রিজের প্রথিতযশা চিত্রকর Mr. Brock কর্ত্তৃক অঙ্কিত হইয়া Corpus Christi Collegeএর সুবিপুল কক্ষে প্রতিষ্ঠিত হয়। এতদুপলক্ষ্যে যে সভা আহূত হইয়াছিল তাহাতে তাঁহার বহুসংখ্যক বন্ধু যোগদান করেন। তিনি এই সভায় নিম্নলিখিত সংস্কৃত শ্লোকটী পাঠ করেন—

"গুরুর্বিশিষ্যঃ সরলো যথা গিরৌ
অসেবিতঃ পান্থজনেন তিষ্ঠতি।
স্বরং স জীর্য্যেন্নবশিষ্যসংশ্রিতো
বৃতঃ স্বতন্ত্রৈর্বিটপৈর্বটো যথা॥"

'পর্ব্বতগাত্রজাত সরল বৃক্ষের ছায়া পথিকগণ উপভোগ করিতে পায় না—শিষ্যবিহীন গুরুও এই প্রকার। পৃথক্ পৃথক্ শাখা পরিবেষ্টিত হইয়া বটবৃক্ষ যেমন দিন দিন জীর্ণ হইতে থাকে, সেইরূপ নানা নূতন নূতন শিষ্য পরিবেষ্টিত হইয়া জরাগ্রস্ত হওয়াও গুরুর পক্ষে অপেক্ষাকৃত শোভনীয়।'

পরে তাঁহার বন্ধুগণ কর্ত্তৃক এই শ্লোকটী নানা ভাষায় অনুদিত হইয়া প্রকাশিত হয়।

১৮৯৬ খৃষ্টাব্দের মে মাসে কাউয়েল অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় হইতে চরম সম্মানসূচক D. C. L. উপাধি প্রাপ্ত হন। বহু প্রসিদ্ধ ব্যক্তি উক্ত উপাধি-বিতরণ সভায় সমবেত হইয়া উঁহাকে সম্মানিত করিয়াছিলেন। ১৮৯৮ খৃষ্টাব্দে কাউয়েল রয়েল এশিয়াটিক সোসাইটির প্রথম সুবর্ণপদক প্রাপ্ত হন। ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দে মহারাণী ভিক্টোরিয়ার রাজত্বকালের ষষ্টিতম বৎসর পূর্ণ হওয়ায় উক্ত পদক প্রদান করিবার প্রসঙ্গ উত্থাপিত হয়। ১৮৯৮ খৃষ্টাব্দে সোসাইটীর একটী বিশেষ অধিবেশনে Lord Reary মহোদয়ের সভাপতিত্বে কাউয়েল সাহেবকে উক্ত পদকটী উপহার দেওয়া হয়।

১৮৯৯ খৃষ্টাব্দের ১১ই জানুয়ারী তারিখের একটী পত্রে জানা যায় যে, কলিকাতা সংস্কৃত কলেজে তাঁহার একটী তৈলচিত্র রক্ষিত হইয়াছে। তৎকালীন অধ্যক্ষ মহামহোপাধ্যায় নীলমণি ন্যায়ালঙ্কার মহোদয়ের যত্নেই উক্ত তৈলচিত্রটী অঙ্কিত হইয়া তদানীন্তন প্রধান বিচারপতি মহোদয়ের সভাপতিত্বে একটী বিশিষ্ট সভায় উহার আবরণ উন্মোচন করা হয়।

কাউয়েলের লেখকজীবনের কোন কথা আমরা এ পর্য্যন্ত বলি নাই, কারণ দুইটী সমান্তরাল সরল-রেখার ন্যায়, উহা তাঁহার সমগ্র জীবনেতিহাসের সহিত এরূপ ভাবে প্রবহমান যে, তৎসম্বন্ধীয় একটী বিভিন্ন পুস্তক অনায়াসেই লিখিত হইতে পারে। বিভিন্ন ভাষাসম্বন্ধীয় জ্ঞাতব্য তথ্যপূর্ণ প্রবন্ধাবলী তাঁহার তত্তৎবিষয়ে প্রগাঢ় পাণ্ডিত্যের পরিচায়ক ; ঐ প্রবন্ধসমূহের সারবত্তা, সংখ্যাতিরিক্ততা ও দীর্ঘতা চিত্তকে স্বতঃই বিস্ময়াপন্ন করিয়া তুলে। প্রবন্ধের কলেবর বর্দ্ধনাশঙ্কায় আমরা ঐ সকলের কয়েকটী মাত্র উল্লেখ করিয়া অবশিষ্টগুলি পরিহার করিতে বাধ্য হইতেছি।

১৮৪১ খৃষ্টাব্দে কাউয়েল "Ipswich Radical Magazine and Review" নামে একটী পত্রিকা প্রকাশ করেন। তখন তাঁহার বয়স মাত্র পঞ্চদশ বৎসর ; উহার পূর্ব্বে তাঁহার কোন লেখার পরিচয় আমরা পাই না, সুতরাং উহাকেই আমরা তাঁহার লেখকজীবনের প্রথম নিদর্শন বলিয়া মনে করি। ১৮৪৬ খৃষ্টাব্দে "Gentleman's Magazineএর ডিসেম্বর-সংখ্যায় তিনি "Homeric Influence in the East" নামে একটী সুচিন্তিত প্রবন্ধ লেখেন। উহা তাঁহার পারসী ও গ্রীক্‌সাহিত্যে প্রগাঢ় জ্ঞানের পরিচয়জ্ঞাপক, উহাতে তিনি মহাভারত প্রভৃতি প্রাচীন ভারতীয় পুরাণ-শাস্ত্র সম্বন্ধে একটী মতবাদ প্রকাশ করিয়াছেন ও তাহার সমর্থনার্থ "Ælian" নামক কোন "ইউরোপীয়" লেখকের প্রবন্ধের একটী অংশ অনুবাদ করিয়া দেখাইয়াছেন। উক্ত মতবাদকে আমরা সত্য বলিয়া মানিয়া লইতে রাজী

না হইলেও—ইদানীন্তন পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ আমাদের শাস্ত্রাদি সম্বন্ধে যে ভ্রান্ত ধারণা পোষণ করিতেন তাহাই প্রদর্শন বাসনায় পাদটীকায় উক্ত মতবাদের কথঞ্চিৎ অংশ প্রকাশ করিলাম *।

"West Minister Review" নামক পত্রিকার ১৮৪৮ খৃষ্টাব্দের অক্টোবর সংখ্যায় তিনি "Indian epicpoetry" নামক একটী প্রবন্ধ প্রকাশ করেন। উহা তাঁহার তাদৃশ স্বল্প বয়সে সংস্কৃত শাস্ত্রাভিজ্ঞতার বিশিষ্ট পরিচয়। "Gentleman's Magazine"এর ১৮৫০ খৃষ্টাব্দের জুন-সংখ্যায় তিনি "সাবিত্রী" নামক সংস্কৃত কবিতার একটী অনুবাদ প্রকাশ করেন, এই সূত্রে মহাভারতরচয়িতা ব্যাসদেব সম্বন্ধে তিনি যে মতটী প্রকাশ করিয়াছেন, তাহার কিঞ্চিৎ সাধারণের সমালোচনার্থ পাদটীকায় সন্নিবিষ্ট করিলাম। †

১৮৫১ খৃষ্টাব্দের "West Minister Review" পত্রিকার জানুয়ারী সংখ্যায় কাউয়েল "Spanish literature" নামক একটী গভীর জ্ঞানপূর্ণ প্রবন্ধ বাহির করেন। উহা তাঁহার স্পেনীয় সাহিত্যে ব্যাপক ও গভীর জ্ঞানের নিদর্শন। এই প্রবন্ধটীর সম্বন্ধে একজন স্পেনীয় সাহিত্যিক বলিয়াছেন যে, "উহাতে স্পেনীয় সাহিত্যের কিছুই পরিত্যক্ত হয় নাই"। কাউয়েল কবে কিরূপে স্পেনীয় ভাষা ও সাহিত্যচর্চ্চা আরম্ভ করিয়া উহা সম্পূর্ণরূপে অধিগত করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন তাহা আজও অজ্ঞাত। অক্সফোর্ডে অবস্থান কালে "Oxford Essays"নামক স্বল্পায়ু পত্রটীতে তিনি "Persian Literatur" নামক একটী সুদীর্ঘ প্রবন্ধ বাহির করেন। ইহাতে তিনি পারস্যের ইতিহাস আলোচনা করিয়া বলিয়াছেন যে, "যে জাতির একবার পতন হয়, তাহার পক্ষে পুনরুত্থান কদাচিৎ সম্ভব কিন্তু পারস্য ইহার ব্যতিক্রম, কারণ তাহার তিন বার পতন ও উত্থান ক্রমান্বয়ে ঘটিয়াছিল।" পারস্য সাহিত্যসম্বন্ধে তিনি অসংখ্য প্রবন্ধ রচনা করেন এবং বহু কাব্যের পদ্যানুবাদও প্রকাশ করেন, বিশেষতঃ হাফেজের অনুবাদগুলি অতি সুন্দর হইয়াছিল। সে সকলের সম্পূর্ণ বিবরণ প্রকাশ করা অসম্ভব বলিয়া আমরা তাঁহার পারস্য সাহিত্য সম্বন্ধীয় আর কোন রচনার আলোচনা করিব না। ১৮৫৫ খৃষ্টাব্দের "Gentleman's Magazine"এর আগষ্ট-সংখ্যায় কাউয়েল "Wilson" সাহেবের ঋগ্বেদসংহিতার অনুবাদের একটী সমালোচনা প্রকাশ করেন।

"Calcutta Review" নামক পত্রিকাটী Dr Duff ও Sir John Kaye মহোদয়গণের প্রতিষ্ঠিত। কাউয়েল কলিকাতায় অবস্থান করিবার সময় ঐ পত্রের একজন বিশিষ্ট লেখক ছিলেন। তিনি উহাতে তিনটী মূল্যবান্ প্রবন্ধ প্রকাশ করেন। ঐ সকলের মধ্যে ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর সংখ্যায় প্রকাশিত "The Mythical and Legendary Accounts of Caste" নামক প্রবন্ধটী প্রগাঢ় গবেষণাপূর্ণ বলিয়া উল্লেখযোগ্য; উহা একটী জটিল বিষয়ের সুন্দর ও সুসম্বদ্ধ আলোচনা। বহু পুস্তকের সমালোচনাও উহার মধ্যে সন্নিবিষ্ট ছিল।

* "On opening the Mahabharata or shahnamah we seem to be reading an oriental edition of Homer. The simple majesty of the Greek wears indeed an oriental dress (like Themistocles at the court of Persia)" ...."The passage from Ælian which he accepts as a partial solution of the difficulty is translated" "The Indians have translated Homer into their native language, and not only they sing his poetry, but also the Kings of Persia, if one may believe the historians"
(Life of Professor Cowell Page 27)

† "The author of the Mahabharata is unknown but he may have flourished about five or six centuries before our era. Vyase the name of the reputed author merely signifies 'arrangement.'"
(Life of Professor Cowell Page 82)

ব্রহ্মসংস্পর্শ।

(শ্রীবসন্তকুমার ভট্টাচার্য্য)

'স তপোঽতপ্যত স তপস্তপ্ত্বা ইদং সর্ব্বং অসৃজত।'

ব্রহ্ম ছিলেন একাকী, আর একাকী থাকা ভাল লাগিল না। কিন্তু তিনি একমেবাদ্বিতীয়ম্, এক এবং অদ্বিতীয়; সুতরাং আর কাহাকেও খুঁজিয়া পাইলেন না। শেষে তপস্যা আরম্ভ করিলেন। তপস্যার ফলে প্রথমে শব্দ আসিল। শব্দ ব্রহ্মেরই ভিতরে লুক্কায়িত ছিল, এখন

বাহিরে আসিয়া দেখা দিল! কিন্তু সে দাঁড়ায় কোথায়? তাহার আসন কোথায়? অনন্ত শূন্যে কি পূর্ণে জানি না—অনন্ত আকাশ বিস্তৃত হইল। আকাশের বক্ষে শব্দ আসন পাতিল। আকাশ না থাকিলে শব্দ থাকিতে পারে না। আকাশের আদি ও অন্ত বুঝা যায় না—শব্দেরও আদি অন্ত অনুভূত হয় না। অনাহত শব্দে দিগন্ত কাঁপিয়া উঠিল। আকাশে শব্দ শুনিয়া—আকাশের গুণ শব্দ বুঝিয়া—ভারতের ঋষিমহর্ষিগণ আকাশ বা দ্যৌ দেবতার স্তবস্তুতি আরম্ভ করিলেন। দ্যৌএর বন্দনায় দ্যৌ পূর্ণ হইল। আকাশের গুণগানে আকাশ ভরিয়া গেল। আকাশ এবং শব্দ একাকার হইয়া গেল। কিন্তু কেবল আকাশে—কেবল শব্দে ব্রহ্মের মন উঠিল না—ইচ্ছা পুরিল না। শব্দ কেবলই শব্দ—তাহার ভিতরে আর কিছুই নাই। কেবল শব্দে কি ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্ট হয়? কেবল আকাশে কি কাহারও প্রাণ জুড়ায়? না—কখনই নহে। আরও চাই—আরও অনেক চাই। আজ যাহারা আসিয়াছে—আজ যাহাদের সম্মিলনে এই ব্রহ্মাণ্ড ফুটিয়াছে ও ফুটিতেছে—তাহাদের সকলেরই জন্য ব্রহ্মের প্রাণ কাঁদিল। তাহারা না আসিলে কিছুই হয় না—তাহারা না জাগিলে কেহই জাগে না—তাহাদের না পাইলে এই বিশাল বিশ্বলীলা জমে না। সুতরাং ব্রহ্ম অনন্ত আকাশতলে বাঁশরী বাজাইলেন। বাঁশরী অর্থাৎ শব্দ ডাকিল—প্রেমভরে ডাকিল—আয় আয় তোরা আয়। অভিনয়ের প্রথমেই অভিনয় জমাইবার জন্য—অভিনয় মিষ্ট করিবার জন্য যেমন একতান বাদ্য না হইলে চলে না, তেমনই এই মহাবিশ্বে বিশ্বলীলা জমাইবার জন্য প্রথমেই লীলাময়ের অমৃতবর্ষী বাঁশরী অর্থাৎ শব্দ একতান বাদ্য বাজাইয়া দিল। ঐ শব্দে আকাশ কাঁপিল—দশদিক টলিল—ব্রহ্মাণ্ড দুলাইয়া বায়ু আসিয়া ব্রহ্মচরণে প্রণাম করিল। ছিল একটী, হইল দুইটী—ছিল শব্দ আসিল স্পর্শ।

এই বিশ্বের একটী আর একটীকে ডাকিতেছে; ডাকিতে ডাকিতে অপরের অঙ্গে নিজ অঙ্গ মিশাইয়া দিতেছে। কেননা, মিলন না হইলে সৃষ্টি হয় না; সংযোগ না হইলে নূতনত্বের প্রকাশ হয় না। সৃষ্টিতে অনেক নূতনত্ব চাই—অনেক নব নব বিকাশ চাই। সুতরাং শব্দ-দেবতা বায়ুর স্পর্শ-দেবতাকে দর্শন মাত্রেই ছুটিয়া গিয়া তাহার অঙ্গে আপন অঙ্গ মিশাইয়া দিলেন। শব্দ ও স্পর্শ উভয়ে এক হইয়া গেলেন। শব্দের ভিতরে স্পর্শ ছিল না—কিন্তু স্পর্শের ভিতরে শব্দ ও স্পর্শ উভয়ের মিলন হইল। বায়ু মহানন্দে চারিদিকে বহিতে লাগিল। বায়ুর ভিতরে জীব শব্দ ও স্পর্শ উভয়কেই প্রাপ্ত হইল। যে দেবতা শব্দে ছিলেন, সেই দেবতাই আবার স্পর্শে দেখা দিলেন। এই যে আমাদের সর্ব্বাঙ্গে স্পর্শ খেলিয়া বেড়াইতেছে, এই যে তোমার-আমার মস্তক হইতে চরণ পর্য্যন্ত স্পর্শ রহিয়াছে, ইহা সেই স্পর্শের অতীত ব্রহ্মের স্পর্শ ভিন্ন আর কিছুই নহে! সর্ব্বাঙ্গে ব্রহ্মস্পর্শ অনুভব করিয়া শরীর যে শিহরিয়া উঠিতেছে! সর্ব্বাঙ্গে যে পুলকের লক্ষণ লক্ষিত হইতেছে! আমার শরীরের সর্ব্বস্থলে ব্রহ্ম! সেই জন্যই বুঝি যোগীবর খ্রীষ্ট বলিয়াছিলেন—"তোমরা কি জাননা যে তোমরা প্রত্যেকে এক-একটী দেবমন্দির!" এ কথা অসংখ্যবার সত্য যে আমরা প্রত্যেকেই এক-একটী দেবমন্দির। প্রতি জীবেই শিবের আবাসস্থল! জীবে ও শিবে একাকার; হে মানব! একবার ভাবিয়া দেখ তুমি যখন জননীজঠরে গঠিত হইতেছিলে, তখন ব্রহ্মের হস্ত তোমার এই রক্তমাংসময় শরীরকে স্পর্শ করিয়াছিল কি না? তোমার দেহে তাঁহার দেবদুর্ল্লভ অঙ্গুলির চিহ্ন আজিও সুস্পষ্ট চিহ্নিত রহিয়াছে কি না? কে গড়িল—মাতৃগর্ভের মধ্যে তোমার-আমার শরীরকে কে গড়িল?

ব্রহ্ম যেমনই তোমার-আমার অঙ্গ স্পর্শ করিলেন, অমনই তোমার আমার নাসিকারন্ধ্রে প্রাণবায়ু বহিল। প্রাণ, অপান, সমান, উদান ও ব্যান পাঁচদিকে ছুটাছুটি করিতে লাগিল। যে ছিল ঘুমাইয়া তাহাকে জাগাইল, যে ছিল জড়বৎ অচেতন তাহাকে চেতনা দিল। ব্রহ্ম নিশ্বাসে প্রশ্বাসে আমার অন্তর্ব্বাহ্য পূর্ণ করিলেন—ওতপ্রোতরূপে আমাকে ঢাকিয়া ফেলিলেন। আমি যখন কথা কহি, তখন আমি ব্রহ্মের ভিতর হইতেই কহিয়া থাকি—আমি যখন চলিয়া বেড়াই তখন আমি ব্রহ্ম-ক্রোড়েই বিচরণ করি। আমি যখন আমার নিজ অঙ্গে হাত দিই তখন সে হাত সহজেই ব্রহ্মকেই স্পর্শ করে। আমাতেই ব্রহ্ম খেলিয়া বেড়ান, আমিও ব্রহ্মের মধ্যে খেলিয়া বেড়াই।

প্রভাতের নব সূর্য্যের প্রাণপ্রদ কিরণস্পর্শে যেমন জীব জাগ্রত হইয়া উঠে, তেমনই ব্রহ্মের অমৃতময় সঞ্জীবনী স্পর্শে এই বিশ্বভুবনের সঙ্গে সঙ্গে তুমি আমিও জাগিয়া উঠি। আমাদের সর্ব্বাঙ্গেই প্রাণন-ক্রিয়া চলিতেছে। পদাঙ্গুলিতে একটী ক্ষুদ্র কণ্টক বিদ্ধ হইলে অমনি সে সংবাদ আমাদের সর্ব্বাঙ্গেই ছড়াইয়া পড়ে। দেহের অন্তরে ও বাহিরে সর্ব্বত্রই প্রাণরূপে ভগবানের স্পর্শ চির বিরাজমান। প্রাণের আদর কে না করে? প্রাণরক্ষার জন্যই জগতের যাবতীয় কর্ম্মচেষ্টা চলিতেছে। সূতিকাগারে সদ্যঃপ্রসূত শিশুর প্রাণরক্ষার জন্য পিতামাতা ও আত্মীয়স্বজনের বর্ণনাতীত ব্যস্ততা ও চিন্তার কথা

কে না জানে? শিশুর প্রাণরক্ষার জন্য পিতামাতা নিজ প্রাণকে কেমন অগ্রাহ্য করেন! শত বাধা তাঁহাদিগকে বাধা দিতে পারে না—সহস্র বিঘ্ন তাঁহাদের কোনই বিঘ্ন উৎপাদন করিতে পারে না। সূতিকাগারে শিশুর প্রাণ প্রতি মুহূর্ত্তে বিপন্ন হইয়া থাকে—কত প্রকার আতঙ্কে আত্মীয়স্বজন দিনপাত করেন। পুরাণে দেখা যায়, মথুরার অন্ধকারময় কংস-কারাগারে বসুদেব ও দেবকীর নবজাত সন্তানের প্রাণরক্ষায় জন্য কি অমানুষিক যত্ন ও সাহস প্রকাশ করা হইয়াছিল। বিঘোরা তমিস্রা রজনীর ভয়াবহ দৃশ্য, ঘন অন্ধকার-পূর্ণ আকাশের অবিরাম বজ্ররব ও বারিবর্ষণ, উন্মাদিনী কল্লোলিনী যমুনার উদ্দাম তরঙ্গভঙ্গী পিতা বসুদেবের প্রাণান্তক আগ্রহ ও উদ্যমের নিকট পরাভূত হইয়াছিল। বাস্তবিকই, মানব যদি প্রাণরক্ষার জন্য প্রাণপণে ছুটে তবে সমুদ্র পথ ছাড়িয়া দেয়, পর্ব্বত সরিয়া দাঁড়ায়, ব্যাঘ্র-ভল্লুক ভয়ে পলায়ন করে। পিতামাতার এই প্রাণান্তক যত্নেই সূতিকাগারের শিশু ভয় হইতে অভয় ধামে, নিরানন্দ হইতে আনন্দালয়ে, মৃত্যু হইতে অমৃতত্বে পৌঁছিয়া থাকে। প্রিয় পুত্রের পীড়া হইলে চিকিৎসক ও ঔষধ আনিতে আমরা কি ঝড়বৃষ্টি ও বজ্রাঘাতকে ভয় করি, না নদ-নদীকে গ্রাহ্য করি? প্রাণের তুল্য এ জগতে প্রিয়তম পদার্থ আর কিছুই নাই। এই প্রাণে সেই "প্রাণস্য প্রাণম্" মিশিয়া আছেন, তাই ইহা এত প্রিয়—তাই প্রাণরক্ষার জন্য প্রাণপণ করি, প্রাণ উৎসর্গ করি, প্রাণের জন্য প্রাণ দিতে পারি। এই প্রাণের রক্ষাতেই সেই প্রাণবল্লভের রক্ষা, এই প্রাণের আদরেই সেই প্রাণপ্রিয় প্রাণাধারের আদর এবং এই প্রাণের পূজাতেই সেই জগৎপ্রাণের মহাপূজা হইয়া থাকে। সাবধান মানব! এই প্রাণকে তুচ্ছ করিও না—এই প্রাণকে কষ্ট দিও না—এই প্রাণকে বিনাশ করিও না।

ব্রহ্মসঙ্গীতে আছে "মধুর প্রভাতে তোমার পরশে বিশ্বভুবন জাগে।" সত্য সত্যই সৃষ্টির মধুময় প্রভাতে ব্রহ্মের স্পর্শে এই বিশ্বভুবন জাগিয়া উঠিল। এই দিগন্ত প্রসারিত অনন্ত ব্যোমে ব্রহ্মের স্পর্শে অতি ধীরে ধীরে কত শত মূরতি নড়িয়া উঠিল—এপাশ ওপাশ ফিরিয়া স্বপ্ন হইতে জাগ্রত রাজ্যে জাগিয়া উঠিল—জড়পিণ্ডের ভিতর হইতে জীবনের পথে উঠিয়া দাঁড়াইল—মহাপ্রাণের স্পর্শে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অযুত প্রাণ ফুটিয়া উঠিল। রামায়ণে বর্ণিত রামচন্দ্রের পদস্পর্শে পাষাণখণ্ডে অহল্যার প্রকাশ কল্পিত কথা হইতে পারে, কিন্তু 'প্রাণস্য প্রাণম্' পরব্রহ্মের এক বিন্দু স্পর্শে এই জড়রাজ্য জীবন্ত প্রাণিজগতে জাগিয়া উঠিল, ইহা কল্পনা নহে—ইহা অভ্রান্ত সত্য। সত্য সত্যই ব্রহ্মস্পর্শে তরুলতা দুলিল, কুসুম হাসিল, সরিৎ ছুটিল, সিন্ধু উথলিল। এই স্পর্শে তুমি আমি জাগিলাম এবং কত জনকে জাগাইলাম। প্রভাত সমাগমে স্নেহময়ী জননী আপনি জাগিয়া ঘুমন্ত সন্তানকে জাগাইবার জন্য নাম ধরিয়া ডাকিলেন। প্রথমে শব্দ, তাই মাতা প্রথমে শব্দ উচ্চারণ করিলেন। মাতা স্নেহমাখা কণ্ঠে ডাকিলেন—"উঠ বৎস! রাত্রি প্রভাত হইয়াছে।" সন্তান ঘুমে এতই অচেতন যে, সে ডাকে সে শব্দে জাগিল না—ঘুম ভাঙ্গিল না। তখন মাতা স্পর্শের শরণ লইলেন। সুকোমল করে ধীরে ধীরে ঘুমন্ত সন্তানের অঙ্গ স্পর্শ করিলেন। সন্তানের ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল—চমকিয়া উঠিয়া বসিল। স্পর্শ নিদ্রিত জনের ঘুম ভাঙ্গিয়া দেয়—সুষুপ্তকে জাগাইয়া তুলে। স্পর্শে নিদ্রা ভাঙ্গে, প্রেম জাগে, প্রাণ অমৃতপিয়াসে অমৃতধামের দিকে যাত্রা করে। চন্দনতরুর সংস্পর্শে বনের অপর তরুও চন্দনগন্ধী হইয়া যায়। জ্বলন্ত অগ্নির সংস্পর্শে কৃষ্ণবর্ণ অঙ্গার যেমন রক্তবর্ণ ধারণ করে, তেমনই সাধু ভক্তের জ্বলন্ত তেজোময় দিব্য কান্তির স্পর্শে অঙ্গারের ন্যায় মলিন মানবের কৃষ্ণবর্ণ রূপও উজ্জ্বলভাব ধারণ করে। মানবের স্পর্শে মানব বাঁচিয়া যায়। তাই নিত্যানন্দের স্পর্শে মোহনিদ্রাভিভূত জগাই মাধাই-এর ঘুম ভাঙ্গিয়াছিল, গৌরাঙ্গের প্রেমময় সংস্পর্শে কত বিষয়াসক্ত সংসারী জনের প্রাণে বৈরাগ্য-প্রেমের সঞ্চার হইয়াছিল, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের স্পর্শে ঘুমন্ত ভারত বহু যুগযুগান্তের অজ্ঞান রাশি ঠেলিয়া ব্রহ্মজ্ঞানের নবীন আলোকে জাগিয়া উঠিয়াছিল এবং ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্রের স্পর্শে দেশে এক নবযুগের আবির্ভাব হইয়াছিল। ইঁহারা না জাগাইলে দেশ আজিও জাগিত না, ইঁহারা না ডাকিলে আজিও কেহই ব্রহ্মজ্ঞানের পতাকাতলে আসিয়া দাঁড়াইত না এবং ইঁহাদের স্পর্শ না পাইলে দেশের অজ্ঞানান্ধকার আজিও ঘুচিত না। ইঁহারা দেখাইলেন তাই আমরা ব্রহ্মকে দেখিলাম, ইঁহারা গাহিলেন তাই আমরা আজ গৃহে গৃহে ব্রহ্মসঙ্গীত গাহিলাম। পুরাণে কথিত ধ্রুব, তাঁহার মাতা সুনীতি দেবীকে স্পর্শ করিয়া ভগবানকে দেখাইয়াছিলেন কি না তাহা জানি না, কিন্তু উপরোক্ত মহাপুরুষগণের স্পর্শে আমরা অনেকেই অদৃশ্য ঈশ্বরকে স্পষ্ট দর্শন করিয়া কৃতার্থ হইয়াছি।

জন্মান্ধ আমরা ভগবানকে দেখিতে পাই না—এত নিকটে আছেন—দেহ মন প্রাণে আছেন—তবু বলি কৈ ভগবান কোথায়? ঋষি বলিলেন—এই যে ব্রহ্ম করতল-ন্যস্ত আমলকবৎ। আমরা কিছুই দেখিতে

পাইলাম না—বলিলাম কই, সবই ত শূন্য—সবই ত অন্ধকার। যখন কোন সিদ্ধ মহাপুরুষ আসিয়া আমাদিগকে স্পর্শ করিলেন, তখনই দেখিলাম—ঊর্দ্ধপূর্ণমধঃপূর্ণং মধ্যপূর্ণং যদাত্মকম্। জ্ঞানীর সংস্পর্শ না আসিলে অজ্ঞানীর জ্ঞানোদয় হয় না—প্রেমিকের সংস্পর্শ না হইলে আমাদের পাষাণপ্রাণে প্রেমপদ্ম প্রস্ফুটিত হয় না। তোমার আমার মনের অজ্ঞানান্ধকার ঘুচাইবার জন্য, পাষাণহৃদয়ে প্রেমপদ্ম ফুটাইবার জন্য, মর্ত্ত্যলোকে স্বর্গ দেখাইবার জন্য সাধু-ভক্তগণ ধরাতলে অবতীর্ণ হয়েন। প্রেমময় ভগবান ভক্তজনের ভিতর দিয়া আমাদের অজ্ঞাতসারে তোমাকে আমাকে স্পর্শ করিয়া যান। বসন্তের মলয়মারুত স্পর্শে যেমন শুষ্ক বৃক্ষলতা চমকিয়া উঠে—নব পত্র নব পুষ্পসম্ভারে নবীন সাজে সজ্জিত হয়—তেমনই প্রাণসখার পরশে শুষ্কহৃদয় নরনারী হঠাৎ শিহরিয়া উঠে—শরীর রোমাঞ্চিত হয়—পাষাণহৃদয় দ্রবীভূত হইয়া প্রেম-জলধারা চক্ষু দিয়া গড়াইয়া পড়ে। সেই অনুপম পরশমণির পরশ পাই বলিয়াই এত রোগশোকের মধ্যেও বাঁচিয়া আছি—এত দুঃখদারিদ্র্যের মধ্যেও হরিনাম গাহিয়া নাচিয়া বেড়াই। তোমরা কেহ কি তাঁহার স্পর্শ পাও না? তোমাদের গাত্রে মলয় মারুত কি বিফলেই বহিয়া যায়? আমি সত্য সত্যই দেখিয়া থাকি প্রাণসখার পরশে বিশ্বভুবন জাগে।

শব্দের ন্যায় স্পর্শের শক্তিও অজেয় ও অমর। পিতামাতার পবিত্র পদধূলি স্পর্শে সন্তান সকল স্থানেই আপনাকে নিরাপদ মনে করে। পতির পদরজ যে সতীর ললাটে সিন্দুরবিন্দুরূপে শোভা পায়, সে সতীকে দেখিয়া পাষণ্ড মানব ভয় পায়, যম দূরে সরিয়া দাঁড়ায়। ব্রহ্মজ্ঞানী সাধুসজ্জনের পদধূলি স্পর্শে কত মানব আপনাকে কৃতার্থ মনে করে। এই জন্যই পদধূলির এত মূল্য! এই জন্যই সংসারী লোকে সাধুভক্তদিগকে নিবেদন করে, "মহাশয়! আমার বাটীতে পদধূলি দিয়া কৃতার্থ করিবেন।" নিজের স্পর্শ দিয়া স্পর্শমণি যেমন কৃষ্ণবর্ণ লৌহকে সুবর্ণে পরিণত করে, তেমনই জগতের জ্ঞান ও ধর্ম্মের প্রচারক এবং সভ্যতার আদি গুরু আর্য্যগণ কৃষ্ণবর্ণ অসভ্য অনার্য্য পশুবৎ মানবদিগকে আপনাদের পবিত্র সংস্পর্শ দিয়া সভ্যজাতিতে উন্নীত করিয়াছেন। ভারতের আর্য্য ঋষিগণ যদি তপস্যাবলে অদৃশ্য অব্যক্ত ও অক্ষর পরব্রহ্মকে না জানিতেন এবং যদি তাঁহাদের তপঃস্বাধ্যায়ের কথা, ব্রহ্মজ্ঞানের কথা, সাধনভজনের কথা, জ্ঞানবিজ্ঞানের কথা প্রাণান্তক পরিশ্রমে জগতের চতুর্দ্দিকে প্রচার করিয়া না বেড়াইতেন, তবে মনে হয় সমগ্র পৃথিবী আজিও অজ্ঞানান্ধকারে ডুবিয়া থাকিত, মানববংশ দুর্নীতি ও বর্ব্বরতার আজিও রাক্ষসের ন্যায়ই বিচরণ করিত, এবং ন্যায়ান্যায়, পাপ-পুণ্য ও ধর্ম্মাধর্ম্মের পার্থক্য না বুঝিয়া অসভ্য নগ্নবেশে আজিও বনে বনেই ঘুরিয়া বেড়াইত। ভারতের ব্রহ্মজ্ঞানী আর্য্যগণই সমগ্র ধরণীকে পদধূলি দিয়া আজি সভ্যতার ও ধর্ম্মের জ্যোতিতে সমুজ্জ্বল করিয়া তুলিয়াছেন।

দিনশেষে।

(শ্রীনির্ম্মলচন্দ্র বড়াল, বি-এল)

দিনের আলো মিলিয়ে গেল
ফুটলো তারা;
দিনের মৃত্যু—তাই কি হ'বি
দুঃখে সারা?
জীবন-রবি অস্তে গেল
হ'ল আঁধা;
নতুন আলোয় জাগ্‌বে আবার
মিথ্যে কাঁদা॥

"যুবক"এর প্রতিবাদের উত্তর।

গত অগ্রহায়ণ মাসের তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় আমরা রায় সাহেব শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের পুত্রের বিবাহ উপলক্ষে "যুবকের" উক্তির জন্য যে আক্ষেপ প্রকাশ করিয়াছিলাম, "যুবক"এর লেখক তাহা "সমালোচনা" হিসাবে ধরিয়াছেন। আমরা কিন্তু অন্তরে বড়ই আঘাত পাইয়াই আমাদের বক্তব্য প্রকাশ করিয়াছিলাম, সমালোচনার হিসাবে করি নাই। প্রতিবাদ করিলেই সংকীর্ণতা প্রকাশ পায় না, কিন্তু প্রতিবাদের ভঙ্গী বা সুরেতেই তাহা প্রকাশ পায়।

বিবাহ প্রভৃতি অনুষ্ঠান সম্বন্ধে আদিব্রাহ্মসমাজের মত খুবই উদার। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথপ্রবর্ত্তিত পদ্ধতি আদর্শমাত্র। কিন্তু আদিসমাজের প্রকৃত মন্তব্য কথা এই যে, 'যে কুলের যেরূপ কৌলিক প্রথা, যে জাতির যেরূপ জাতীয় প্রথা, তাহা সেইরূপই থাকুক; কেবল সেই সকল প্রথার মধ্যে ব্রহ্মোপাসনা প্রতিষ্ঠিত হইলেই ব্রহ্মোপাসকগণের ব্রত অব্যাহত থাকিবে।' কাজেই আমরা জোরের সঙ্গে বলিতে পারি যে, পদ্ধতির বাহিরের কোন কুলপ্রথা একেশ্বরবাদের ও সুনীতির অবিরোধী হইলে তাহা অনুমোদন করিতে কোনই বাধা নাই।

প্রতিবাদক মহাশয় লিখিয়াছেন—"আদিসমাজের কোন কোন মতের অনুদারতার জন্যই আচার্য্য কেশবচন্দ্র ... ... বিচ্ছিন্ন হইতে বাধ্য হইয়াছিলেন।" এই উক্তিতেই লেখকের অদ্ভুত পক্ষপাতদুষ্টতা যে প্রকাশ পাইতেছে, তাহাতে সন্দেহ নাই। লেখক যদি ব্রহ্মানন্দ প্রভৃতির আবেদন এবং তাহার মহর্ষিপ্রদত্ত উত্তর মনোযোগের সহিত পাঠ করেন, তবে আদিসমাজের বিরুদ্ধে ঐ "অনুদারতা" শব্দ কথনই প্রয়োগ করিতে পারিবেন না। বিবাদের সেই আদিম কালে পরস্পর পরস্পরের বিরুদ্ধে নানা অনুদার ভাষা প্রয়োগ করিয়াছেন, ইহা জানা কথা, কিন্তু বিবাদের পর ন্যূনাধিক অর্দ্ধশতাব্দী অতীত হইয়া গিয়াছে, এখন নিজেদের বৈশিষ্ট্য রাখিয়াও পরস্পরের সহিত মিলনের সময় আসিয়াছে; এখন আর পরস্পরের প্রতি অনুদার ভাব পোষণ বা অনুদার ভাষা প্রয়োগ করিবার অবসর নাই।

আমরা উপরে যাহা বলিয়া আসিলাম, তাহার পর "বেদান্ততীর্থ মহাশয় আদিসমাজভুক্ত কি না," এই প্রশ্নের উত্তর অনাবশ্যক বিবেচনা করি। আমরা যতদূর জানি, তাহাতে ইহা পুনরুক্ত করিতে কোনই দ্বিধা করিব না যে, বিবাহটী "উভয়বিধ" পদ্ধতি অনুসারে হয় নাই—একমাত্র আদিসমাজের পদ্ধতি অনুসারেই হইয়াছিল।

লেখক অনেক ভ্রান্ত ধারণার বশবর্ত্তী হইয়া আদিসমাজকে উপহাস করিতে উদ্যত হইয়াছেন। তাহার জন্য আমরা প্রত্যুপহাস করিতে ইচ্ছা করি না, কারণ বিবাদকলহ ইন্ধন পাইলে নির্ব্বাণ হইবার পরিবর্ত্তে বিস্তৃতিই লাভ করে। কিন্তু এই উপহাসের ভিত্তিস্বরূপে তিনি আদিসমাজের বেদীতে অব্রাহ্মণ আচার্য্য বসাইবার বিরুদ্ধে যে আদিসমাজের প্রচেষ্টার কথা উল্লেখ করিয়াছেন, তৎসম্বন্ধে তাঁহার ভ্রান্ত ধারণা দূর করা কর্ত্তব্য মনে করি। লেখকের বোধ হয় ইহা জানা নাই যে, ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র আদিসমাজ হইতে পৃথক হইবার পরও মহর্ষিদেব তাঁহার সময়ে অব্রাহ্মণ ভক্তিভাজন রাজনারায়ণ বসু মহাশয়কে বেদীতে লইয়া বসিতেন। সেইরূপ বর্ত্তমানে আচার্য্য ক্ষিতীন্দ্রনাথও উপবীতত্যাগী ডাক্তার শ্রীপূর্ণানন্দ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় এবং অব্রাহ্মণ শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকুমার মিত্র মহাশয়কে লইয়া বেদীতে বসিতে দ্বিধা করেন নাই। ইহা প্রণিধান যোগ্য যে, আদিসমাজের অন্যান্য আচার্য্যগণ সানন্দে ইহাতে সম্মতি প্রদান করিয়াছেন।

আমরা সদ্ভাবপ্রণোদিত হইয়া বলিতেছি যে, ব্রাহ্মসমাজের ভিতরে সাম্প্রদায়িক ভাবের অস্তিত্বের কারণে একটা "জাত-ব্রাহ্মের" উৎপত্তি হইয়াছে—তাহার ফল আমরা শুভ মনে করি না। এ বিষয়ে অনেক কথা আলোচনা করিবার আছে—বর্ত্তমানে তাহার অবসর নাই। আমরা যাহা কিছু বলিয়া আসিলাম, লেখক জানিবেন যে, তাহা বাদপ্রতিবাদের ইচ্ছার বশবর্ত্তী হইয়া নহে, কিন্তু সত্যই ব্রাহ্মসমাজের মধ্যে সাম্প্রদায়িকতা ও তজ্জনিত সংকীর্ণতা দেখিয়া এবং তাহার ফলে ব্রাহ্মসমাজের অনিষ্ট আশঙ্কা করিয়া। ব্রাহ্মসমাজের মধ্যে এইরূপ সংকীর্ণতা লক্ষ্য করিয়াই পূজ্যপাদ রবীন্দ্রনাথও বলিয়াছেন—"উপবীতচিহ্নের দ্বারা সমাজে অধিকারভেদ নির্দ্দিষ্ট হয় বলিয়া যাঁহারা উপবীত ধারণকে নিন্দা করেন তাঁহারা কি এ চিন্তা করিবেন না যে অদৃশ্য উপবীত দৃশ্য উপবীতের চেয়ে অনেকগুণে দৃঢ়? "উন্নতিশীল ব্রাহ্ম" নামের পৈতাটা উচ্চ করিয়া তুলিয়া ধরিয়া * * মহাশয় যে জাত্যভিমান, যে কৌলীন্যগর্ব্ব প্রকাশ করিয়াছেন, জিজ্ঞাসা করি, তাহা কি সর্ব্বপ্রকার কুসংস্কারবর্জ্জিত?" (তত্ত্ব প. ১৮৩৪শক জ্যৈষ্ঠ) আমরা ইচ্ছা করি যে, আদি, সাধারণ বা নববিধান, প্রত্যেক শাখা যত ইচ্ছা নিজ নিজ বৈশিষ্ট্য রক্ষা করুন, কিন্তু কেহ যেন অপরের প্রতি মনোমালিন্য পোষণ না করেন। আমাদের সকল কর্ম্মে যেন মৈত্রীই নিয়ামক হয়। আমরা এই বিষয় লইয়া বাদপ্রতিবাদ করিয়া আর পরস্পরের মধ্যে এতটুকুও বিরোধের ভাব বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইবার অবসর দিতে চাহি না।

গ্রন্থপরিচয়।

পুত্রের প্রতি উপদেশ।—মূল্য ॥০ আট আনা। আমরা এই পুস্তকের দ্বিতীয় সংস্করণ পাইলাম। এত অল্প সময়ে ইহার দ্বিতীয় সংস্করণ হওয়াতেই ইহার উপযোগিতা বুঝা যাইতেছে। ইহা মিত্র ইনষ্টিটিউশন, বঙ্গবাসী কলেজিয়েট্ স্কুল, ওরিয়েণ্টাল সেমিনারী প্রভৃতি বিদ্যালয়ে পাঠ্যরূপে নির্ব্বাচিত হওয়ায় আমরা আনন্দিত হইলাম।

Our Spiritual Wants & their supply—এই বক্তৃতাটি পণ্ডিত সীতানাথ তত্ত্বভূষণ মহাশয় কর্তৃক সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের বার্ষিক সভায় সভাপতির অভিভাষণরূপে প্রদত্ত হইয়াছিল। মূল্য মাত্র চারি আনা। ২১১নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট সাধারণব্রাহ্মসমাজ হইতে প্রকাশিত।

তত্ত্বভূষণ মহাশয় ব্রাহ্মসমাজের বিশেষতঃ সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের অভাব ও তাহা পূরণের উপায়ের বিষয়ে নিপুণভাবে আলোচনা করিয়াছেন। তত্ত্বভূষণ মহাশয় যে এ বিষয়ে ভাবিয়াছেন, তাহা এই বক্তৃতা হইতেই বুঝা যায়। কিন্তু আমরা তাঁহার ন্যায় চিন্তাশীল

প্রবীণ ব্রাহ্মের নিকট হইতে ব্রাহ্মসমাজের ভবিষ্যৎ কর্ম্মপন্থা কিরূপ হওয়া উচিত সে সম্বন্ধে আরও বিস্তৃতরূপে শুনিতে ইচ্ছা করি।

Spirit of Brahmoism—শ্রীসুনীন্দ্রনাথ রায় এম্-এ বি-এল, প্রণীত। গ্রন্থটী ইংরাজীতে লেখা। গ্রন্থটী অতি সরল ভাষায় আগ্রহোদ্দীপক ভঙ্গীতে লিখিত। ইহা পাঠে ব্রাহ্মসমাজের অভিব্যক্তির ধারা বেশ বুঝা যায়। গ্রন্থটীতে কয়েকটি চিত্র আছে। কিন্তু ইহার নাম Spirit of Brahmoism না হইয়া "Evolution of Brahmoism" হইলেই বোধ হয় সঙ্গত হইত।

শোক-সংবাদ।

৺লালবিহারী বড়াল।—আদিব্রাহ্মসমাজের পরমহিতৈষী আমাদের বহুদিনের পরিচিত শ্রদ্ধাভাজন বন্ধু লালবিহারী বড়াল আর নাই। তিনি বিগত ২৮এ মাঘ শুক্রবার তাঁহার হুগলী বালী রোডস্থ ভবনে ব্রহ্মমন্ত্র উচ্চারণ করিতে করিতে পরলোকে প্রয়াণ করিয়াছেন। মৃত্যুর সময় তাঁহার বয়ঃক্রম প্রায় ৭২ বৎসর হইয়াছিল। এই সুদীর্ঘ কালের মধ্যে প্রায় ৫০ বৎসর ধরিয়া ব্রাহ্মসমাজের সঙ্গে তাঁহার ঘনিষ্ঠতম যোগ। আমাদের যতদূর মনে হয়, হুগলীর ৺ গোকুলকৃষ্ণ সিংহের সংসর্গে আসিয়া আদিব্রাহ্মসমাজের সহিত তাঁহার এবং তদীয় কনিষ্ঠ ভ্রাতা শ্রীপান্নালাল বড়ালের যোগের প্রথম সূচনা হয়। স্বর্গীয় আচার্য্য বেচারাম চট্টোপাধ্যায় যখনই কাল্না, হুগলী, শ্রীরামপুর, ধর্ম্মপুর প্রভৃতি ব্রাহ্মসমাজে প্রচারার্থ যাইতেন, ঐ দুই ভ্রাতা যৌবনোচিত সুকণ্ঠ লইয়া তাঁহার সহিত মিলিত হইতেন এবং ঐ সকল ব্রাহ্মসমাজের উৎসবকে তাঁহাদের মধুর সঙ্গীত দ্বারা উৎসবময় করিয়া তুলিতেন।

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের চুঁচুড়ায় অবস্থান কালে ঐ দুই ভ্রাতার সহিত তাঁহার যোগ নিবিড় হইয়া উঠে। ভ্রাতৃদ্বয় তাঁহাদের সঙ্গীত দ্বারা মহর্ষিদেবকে প্রায়ই তৃপ্তিদান করিয়া নিজেরা ধন্য হইতেন। মহর্ষিদেব যখন বোটে করিয়া গঙ্গাবক্ষে পরিভ্রমণ করিতেন, লালবিহারী বাবু প্রায়ই তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা পান্নালাল বাবুকে লইয়া তথায় উপস্থিত হইতেন ও উৎসাহ সহকারে আদিব্রাহ্মসমাজের সঙ্গীতগুলি গাহিয়া মহর্ষিদেবকে আনন্দে আপ্লুত করিতেন। কখনও কখনও লালবিহারীবাবু আদিসমাজের অবসরপ্রাপ্ত সঙ্গীতাচার্য্য বিষ্ণুবাবুকে হালিসহর হইতে তুলিয়া লইয়া মহর্ষির নিকট উপস্থিত করিতেন ও তথায় হারমোনিয়ম ও মৃদঙ্গ সহযোগে মহর্ষিদেবের পছন্দমত একটির পর একটি ব্রহ্মসঙ্গীত গীত হইত। মহর্ষি এতই পুলকিত হইতেন যে প্রায়ই প্রিয়নাথ শাস্ত্রী মহাশয়কে ডাকিয়া বিষ্ণুবাবুকে পুরস্কৃত করিতেন। এই সকল সঙ্গীতসভায় ৺রাজনারায়ণ বসু, ৺দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর, ৺ললিতমোহন সিংহ প্রভৃতি মহাশয়গণ প্রায়ই উপস্থিত থাকিতেন। একবার মহর্ষিদেবের ইচ্ছানুসারে ১১ই মাঘের উৎসব বোটে অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। ঐ উৎসবে লালবিহারী বাবুর উপর সঙ্গীতের ভার প্রদত্ত হয়। মহর্ষি কৌতুকচ্ছলে বলিয়াছিলেন—'ইহা আমাদের অনাদি ব্রাহ্মসমাজের উৎসব।'

আদিসমাজের অন্যতম উপাচার্য্য ৺ শম্ভুনাথ গড়গড়ি মহাশয়ের সহিত লালবিহারী বাবু ও তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতার বিশেষ যোগ ছিল। তাঁহাদের উভয় ভ্রাতার একান্ত আগ্রহে ও উদ্যোগে তাঁহাদের হুগলী বালীস্থ আবাস-নিকেতনে কয়েকবার ব্রহ্মোৎসব হয়। পূজ্যপাদ শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ এবং তদীয় অগ্রজ পূজ্যপাদ ৺জ্যোতিরিন্দ্রনাথ দুই একবার ঐ উৎসবে যোগ দেন। আজ কয়েক বৎসর ধরিয়া লালবিহারী বাবুর স্বাস্থ্য ভঙ্গ হয়; তৎসত্বেও তিনি তাঁহার হুগলীস্থ বাসভবনে 'অবৈতনিক পারমার্থিক সঙ্গীত বিদ্যালয়' প্রতিষ্ঠা করিয়া পুরাতন ব্রহ্মসঙ্গীত-চর্চ্চার বিশেষ আয়োজন করিয়াছিলেন। মাননীয় বিচারপতি স্যর আশুতোষ চৌধুরী তাঁহারই বিশেষ আহ্বানে তৎপ্রতিষ্ঠিত ঐ সঙ্গীতের কেন্দ্রস্থান হুগলীতে গিয়া জনসাধারণের উৎসাহ বর্দ্ধন করিয়া আসেন। পূজ্যপাদ জ্যোতিরিন্দ্রনাথের সহিত লালবিহারী বাবুর ঘনিষ্ঠতা উত্তরকালে বিশেষভাবে বর্দ্ধিত হইয়াছিল। লালবিহারীবাবু নিজ হইতে ব্যয়ভার বহন করিয়া জ্যোতিরিন্দ্রনাথের কয়েকখানি অমূল্য গ্রন্থের নূতন সংস্করণ বাহির করেন। পান্নালালবাবুর দ্বিতীয় পুত্র শ্রীমান নির্ম্মলচন্দ্র বড়াল বাল্য হইতে জ্যেষ্ঠতাত ও পিতার নিকট হইতে ধর্ম্মভাব উত্তরাধিকার-সূত্রে লাভ করিয়া সঙ্গীতরচনায় ও সঙ্গীতের আলাপে অনেক দিন হইতে আদিব্রাহ্মসমাজের বিশেষভাবে সেবা করিয়া আসিতেছেন। লালবিহারীবাবুর মৃত্যুতে আমরা নিরতিশয় কাতর। পরমমাতা তাঁহার সুশীতল ক্রোড়ে তাঁহার চিরদাসকে স্থান দান করুন, ইহাই আমাদের কামনা।

চিন্তামণি বাবুর ৩য় পুত্রবধূ।—বিগত ৮ই ফাল্গুন রবিবার আদিব্রাহ্মসমাজের উপাচার্য্য শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত চিন্তামণি চট্টোপাধ্যায় মহাশয় তাঁহার ৩য় পুত্রবধূটীকে অকালে হারাইয়াছেন। চিন্তামণিবাবুর উপর শোকের আঘাত উপর্য্যুপরি চলিতেছে। পরমপিতা তাঁহার ঐ পুত্র দ্বিজেন্দ্রনাথের অন্তরে সান্ত্বনা বর্ষণ করুন এবং পরলোকগত আত্মাকে তাঁহার প্রসারিত ক্রোড়ে স্থানদান করুন, ইহাই আমাদের প্রার্থনা।

আদিব্রাহ্মসমাজ।

আয়-ব্যয়।

পৌষ ও মাঘ মাস, ১৮৪৮ শক, ১৩৩৩ সাল।

আয়	১৯৭৩/৬
পূর্ব্বকার স্থিত	২০৭/০
সমষ্টি	২১৮০৵৬
ব্যয়	১৯০৯৶৯
স্থিত	২৭০৸৶৯

আয়।

ব্রাহ্মসমাজ।

বিশেষ কার্য্যের দান	১৲
মাঘোৎসবের দান	১২৲
ঋণগ্রহণ	২৯৬৷৶০
বণ্ডেড ওয়্যারহাউস্	৬০৲
হাওলাত আদায়	৩৪৲
বিবিধ	১৷৬
সমষ্টি	৪০৫৶৬

তত্ত্ববোধিনী।

পত্রিকার বকেয়া মূল্য	২১৸০
পত্রিকার হাল মূল্য	১১৲
পত্রিকার নগদ বিক্রয়	।০
পত্রিকার মাশুল	২/০
বিজ্ঞাপনের মূল্য আদায়	২৩৲
সমষ্টি	৫৮/০

যন্ত্রালয়।

অপরের পুস্তকমুদ্রণ	৫৮৯৲
কাগজের মূল্য আদায় (অপরের)	৩০৪৷৶০
দপ্তরী, (অপরের)	৩৩৪৸/০
	১২২৮৷০

পুস্তকালয়।

সমাজের পুস্তক বিক্রয়	২৮৷/০
অপরের পুস্তক বিক্রয়	৪৲
মাশুল আদায়	১৵০
গীতারহস্যের মূল্য আদায়	২৪০৲
" মাশুল	৭৷৵০
সমষ্টি	২৮১।/০
সর্ব্ব সমষ্টি	১৯৭৩/৬

ব্যয়।

ব্রাহ্মসমাজ।

পাথেয়	৩৲
কর্ম্মচারীগণের বেতন	১৪৩৷/০
আসবাব	৵০
ডাকমাশুল	৭৵০
ইলেক্‌ট্রিক আলোক	১০৵৬
কেরোসিন তৈল	১৷৯
ড্রেণ পরিষ্কার করার ব্যয়	৷/০
ঋণশোধ	১১২৪৸০
হাওলাত প্রদান	৬৩৲
বারবরদারী	৯৶৬
মাঘোৎসবের ব্যয় মায় সমাজগৃহের আংশিক মেরামত	৫৮৸৵৬
কোম্পানীর কাগজ হস্তান্তর করণ জন্য	৩৫৲
বিবিধ	।৵৯
সমষ্টি	১৪৫৮৷/

তত্ত্ববোধিনী।

কাগজের মূল্য প্রদান	৫৮৸৵০
পত্রিকা ডাকে পাঠাইবার মাশুল	৯৸৩
কর্ম্মচারীগণের বেতন	২২৸০
বিবিধ	২।০
সমষ্টি	৯৩৷৵৩

যন্ত্রালয়।

কর্ম্মচারীগণের বেতন	১৫৬/৬
" জলপানী	৸/০
" অতিরিক্ত পারিশ্রমিক	১০৶৩
মাঘোৎসবের জন্য কার্ড ও খাম খরিদ (অপরের)	১৭৸৩
প্রুফের জন্য কাগজ খরিদ	২।০
ছাপার কাগজ	৬০৷৶০
ছাপার কালি	২।০
প্রেসের জন্য তৈল	১।৩
গেলি বাঁধা দড়ি	।৶০
ডাক মাশুল	৵৬
তামাক	৸০
ক্রুস খরিদ	।৶০
লেই প্রস্তুত জন্য খরচ	।৩
বিবিধ	৯৲৩
সমষ্টি	২৬২৷৵৩

পুস্তকালয়।

বেতন	৮৸০
সমাজের পুস্তক বিক্রয়ের কমিশন	৩৸০
ডাক মাশুল	১/৬
অন্যান্য	৸/৩
গীতার মূল্য শোধ	৫৭।০
" মাশুল	৪৵০
" কমিশন	১৭৷০
" অন্যান্য	১৲৬
সমষ্টি	৯৪৷/৩
সর্ব্ব সমষ্টি	১৯০৯৶৯

Tattwabodhini Patrika

Reg. No. C. 462.

১০০৪ সংখ্যা

১৮৪৮ শক

তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা

"ব্রহ্ম বা একমিদমগ্র আসীন্নান্যৎ কিঞ্চনাসীত্তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রন্নিরবয়বমেকমেবাদ্বিতীয়ম্ সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয়ং সর্ব্ববিৎ সর্ব্বশক্তিমদ্ধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্যসাধনঞ্চ তদুপাসনমেব"।

সম্পাদক—

শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও ডাক্তার শ্রীবনওয়ারিলাল চৌধুরী ডি, এস্‌সি

সহঃ সম্পাদক—শ্রীক্ষেমেন্দ্রনাথ ঠাকুর বি, এস-সি।

৫৫ নং অপার চিৎপুর রোড্ কলিকাতা, আদিব্রাহ্মসমাজ যন্ত্রে শ্রীরূপগোপাল চক্রবর্ত্তী দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

সাল ১৩৩৩। খৃঃ ১৯২৭। সম্বৎ ১৯৮৩। কলিগতাব্দ ৫০২৭। চৈত্র।

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার বার্ষিক মূল্য ৩৲ টাকা ডাকমাশুল ৵০ আনা। এই সংখ্যার মূল্য ।০ আনা। } আদিব্রাহ্মসমাজের কর্ম্মাধ্যক্ষের নামে পাঠাইতে হইবে।

তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা

"ব্রহ্ম বা একমিদমগ্র আসীন্নান্যৎ কিঞ্চনাসীত্তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রন্নিরবয়বমেকমেবাদ্বি
সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয়ং সর্ব্ববিৎ সর্ব্বশক্তিমদ্ধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া
পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্যসাধনঞ্চ তদুপাসনমেব"।

সম্পাদক—

শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও ডাক্তার শ্রীবনওয়ারিলাল চৌধুরী ডি, এস্‌সি

সহঃ সম্পাদক—শ্রীক্ষেমেন্দ্রনাথ ঠাকুর বি, এস-সি।

একবিংশ কল্প

চতুর্থ ভাগ

১৮৪৮ শক

কলিকাতা

৫৫নং আপার চিৎপুর রোড্

আদিব্রাহ্মসমাজ যন্ত্রে

শ্রীরণগোপাল চক্রবর্ত্তী দ্বারা

মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

সাল ১৩৩৩। খৃঃ ১৯২৭। সম্বৎ ১৯৮৩। কলিগতাব্দ ৫০২৭।

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা।

একবিংশকল্প, চতুর্থ ভাগ।

১৮৪৮ শক, ব্রাহ্মসম্বৎ ৯৭।

বর্ণানুক্রমিক বিষয়-সূচী।

বিষয়।	লেখক		পৃষ্ঠা।

চিত্র-সূচী।

সম্পাদক—

শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও ডাক্তার শ্রীবনওয়ারিলাল চৌধুরী ডি, এস্‌সি

সহঃ সম্পাদক—শ্রীক্ষেমেন্দ্রনাথ ঠাকুর বি, এস-সি।

কলিগতাব্দ ৫০২৭। সম্বৎ ১৯৮৩। খৃঃ ১৯২৭। শক ১৮৪৮। সাল ১৩৩৩।

সার্ব্বজনীন ব্রহ্মোৎসবে সভাপতির অভিভাষণ।

(শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর)

যে ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে কত শত সহস্র সূর্য্য পরিভ্রমণ করিতেছে; যে ব্রহ্মাণ্ডে "যতনে জাগায়ে জ্যোতি ফিরে কোটি সূর্য্যলোক"; যেখানে ঐ অসীম আকাশস্থিত এক একটী নক্ষত্র এক একটী সূর্য্যসমান সেখানে আমাদের এই পৃথিবী কত ক্ষুদ্র! আবার যে পৃথিবীতে কত শত সাধু মহাত্মা ঈশ্বরের চরণে আত্মসমর্পণ করিয়া মোক্ষপথে দ্রুতগতিতে ছুটিয়া চলিয়াছেন, সেখানে আমার ন্যায় দীন হীন মলিন বঙ্গবাসী কি ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্রতর! আমার ন্যায় এক ক্ষুদ্রশক্তি দীনহীন ব্যক্তির উপর আজিকার কার্য্যপরিচালনের গুরুভার সন্ন্যস্ত হওয়ায় আমি নিজের অক্ষমতায়, ভয়ে, লজ্জায় সত্যসত্যই ব্যথিতচিত্ত ও ম্রিয়মাণ হইয়া পড়িতেছি।

কিন্তু সম্মুখে রাজা রামমোহন রায়, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ, ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র, ভক্তিভাজন রাজনারায়ণ বসু, শ্রদ্ধাস্পদ প্রতাপচন্দ্র, আচার্য্য শিবনাথ শাস্ত্রী প্রভৃতি অক্লান্তকর্ম্মা মহাপুরুষদিগের দৃষ্টান্ত পাইয়া পদে পদে স্খলিতপদ হইবার আশঙ্কা সত্ত্বেও ভগবানের নামপ্রচারে অগ্রসর হইবার আনন্দ হইতে কে আপনাকে বঞ্চিত রাখিবে? তাঁহাদেরই দৃষ্টান্তে, তাঁহাদেরই চরণতলে দাঁড়াইয়া এই মহান ভার আমি আমার এই ক্ষুদ্র মস্তকে বহন করিতে স্বীকার করিয়াছি। যে ঈশানচন্দ্র বসুর অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলে মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়ের গ্রন্থাবলী আমাদের সহজলভ্য হইয়াছে, যে নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় অসীম অধ্যবসায়ের ফলে রাজা রামমোহন রায়ের জীবনী প্রদান করিয়া বৎসরের পর বৎসর শত শত যুবকের সম্মুখে এক মহান আদর্শ ধারণ করিতেছেন, সেই পরলোকগত ঈশানচন্দ্র, নগেন্দ্রনাথ প্রভৃতির ন্যায় যে সকল অজ্ঞাতনামা কিন্তু নীরবকর্ম্মী মহাপুরুষ ব্রাহ্মসমাজের অক্লান্ত সেবায় নীরবে দেহপাত করিয়া গিয়াছেন, তাঁহাদেরও উদ্দেশে নমস্কার করিয়া, প্রাণে নববল সঞ্চয় করিয়া, এই সভার ভিতর দিয়া সার্ব্বজনীন ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রচারভার গ্রহণ করিতে সাহস করিয়াছি। যে ভগবানের কৃপা হইলে পঙ্গু যে, সেও গিরি লঙ্ঘন করিতে পারে; মূক যে, সেও বক্তা হইয়া উঠিতে পারে, আমার দৃঢ় বিশ্বাস, সমাগত বন্ধুগণের সহায়তা ও সহানুভূতি প্রাপ্ত হইলে সেই ভগবানের আশীর্ব্বাদে আমিও এই মহাভার অক্লেশে বহন করিতে পারিব।

আজই বা এত সাধুমহাত্মাদিগের সমাগম হইল কেন? অনন্ত আকাশে প্রতিদিন যে প্রভাততপন পূর্ব্বসমুদ্রকে রঞ্জিত করিয়া উদিত হয়, আজও প্রভাতে সেই সূর্য্যই উদিত হইয়াছিল। প্রতিদিন

যে বায়ু প্রবাহিত হইয়া আমাদিগের জীবন দান করে, আজও সেই বায়ুই আমাদিগের জীবনদান করিতেছে। প্রতিদিন যে জাহ্নবী বসুন্ধরাকে শস্যশ্যামল করিয়া প্রবাহিত হয়, আজও সেই জাহ্নবীই প্রবাহিত হইতেছে। তবে আজ এই সাধুসজ্জনদিগকে এখানে নব উৎসাহে নব আনন্দে জাগ্রতভাবে আসিতে দেখি কেন? অদ্যকার দিনে কি নূতনত্ব, কি বিশেষত্ব আছে যে, তাহার বলে আকৃষ্ট হইয়া আজ আমরা এই স্থানে সমাগত হইয়াছি?

এবারকার ব্রহ্মোৎসব আমাদের মিলনোৎসবে পরিণত হইয়াছে। আমাদের পিতামাতা পরমেশ্বর আমাদের সকলকে মিলিত করিয়াছেন, এবারকার ব্রহ্মোৎসবের ইহাই বিশেষত্ব। শাখানির্বিশেষে সকল ব্রহ্মোপাসক ভগবানের চরণপূজার জন্য বিনা বাধায় বিনা দ্বিধায় একত্র মিলিত হইবেন, আমাদের এই আশা, আমাদের অনেক বৎসরের এই প্রাণের আকাঙ্ক্ষা আজ সাফল্য লাভের দিকে অগ্রসর হইতেছে, এবারকার উৎসবে তাহার বিশেষ পরিচয় পাইয়া আমাদের হৃদয় আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া উঠিতেছে। বহুকাল যাবৎ মিলন সাধনের জন্য আমরা অনেক কথা বলিয়াছি, অনেক বক্তৃতা করিয়াছি এবং আমরা ব্যক্তিগত ভাবে অনেক চেষ্টাও করিয়াছি। কিন্তু মনে হইতেছে, এবার মিলন শুধু কথায় পর্য্যবসিত হইবে না, কার্য্যে পরিণত হইবে। মনে হইতেছে, সকল ব্রহ্মোপাসকেরই অন্তর হইতে মিলনের জন্য একটা কাতর প্রার্থনা উঠিয়াছে, এবং ভগবান যেন সেই প্রার্থনায় সাড়া দিয়াছেন। মনে হইতেছে, ভগবানের মঙ্গল বিধানে ব্রাহ্মসমাজের পুনরভ্যুদয় সমুপস্থিত।

আজ এই মিলনক্ষেত্রে ভগবানের নামে আমাদের সকলেরই হৃদয়তন্ত্রী সমভাবে ঝঙ্কার দিয়া উঠুক। উদারতম ও সম্পূর্ণ অসাম্প্রদায়িক বীজমন্ত্রের উপর সুপ্রতিষ্ঠিত সত্যধর্ম্মের উপর দাঁড়াইয়া সকলে একপ্রাণে মিলিত হও। আজ এই নবজাগরণের দিনে সেই পরমপুরুষ ভগবানকে একমাত্র পিতামাতা জানিয়া জীবনকে ধন্য কর; এবং শুধু কথায় নয়, কাজেও মিলনের এই মহামন্ত্রে দীক্ষিত হও—সংগচ্ছধ্বং সংবদধ্বং সং বো মনাংসি জানতাং—এক সঙ্গে চল, এক সঙ্গে কথা বল এবং পরস্পরের মন অবগত হও। বর্ত্তমান শুভ অবসরে সমস্ত ভেদাভেদ ভুলিয়া সমস্ত বিবাদবিসম্বাদ ভুলিয়া ভগবানের প্রিয়কার্য্যসাধনে নির্ভয়ে অগ্রসর হও। বর্ত্তমান জাগরণকে আরও জাগ্রত করিয়া তোল।

আজ মনে পড়ে, আমাদের যোড়াসাঁকোস্থ ভবনে যে দিন প্রথম ব্রাহ্মসম্মিলন হয়। সেই প্রথম সম্মিলনে ব্রাহ্মসমাজের বিভিন্ন শাখার কর্ত্তৃপক্ষগণ মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের আহ্বানে সমবেত হইলেও বেদীতে একসঙ্গে বসিয়া উপাসনা করিতে সম্মত হন নাই। কিন্তু মহর্ষির প্রযত্নে ও উৎসাহে তাঁহাদের মন হইতে সে ভাব ক্রমশ বিদূরিত হইয়া গেল—তখন, পুরাকালে যেমন বিভিন্ন ঋষি একই যজ্ঞের অধ্বর্য্য, সামগান প্রভৃতি বিভিন্ন অঙ্গের ভার গ্রহণ করিতেন, ব্রাহ্মসমাজের বিভিন্ন শাখার আচার্য্যগণও সেইরূপ পুরাকালের মতান্তর ও মনান্তর ভুলিয়া বৎসর বৎসর ব্রাহ্মসম্মিলনের উপাসনাকার্য্যের বিভিন্ন অংশের ভার গ্রহণ করিতে লাগিলেন।

আজ মনে পড়ে, যখন মহর্ষিদেব তাঁহার পার্কস্ট্রীটস্থ ভবনে ব্রাহ্মসাধারণকে সম্মিলিত উপাসনায় আহ্বান করিয়া, তিনি স্বয়ং উপাসনার মুখপত্তন করিবার জন্য উপর হইতে আমার স্কন্ধে ভর দিয়া উপাসনামণ্ডপে অবতরণ করিতেন। আজ মনে পড়ে, সেই উপাসনামণ্ডপের মধ্যস্থলে বসিয়া তিনি যখন সুগম্ভীর বেদমন্ত্রে উপাসনার সূত্রপাত করিয়া সমগ্র মণ্ডপটীকে কম্পিত করিয়া তুলিতেন; এবং সেই উপাসনায় যখন সম্মিলিত ভক্তমণ্ডলী সমস্বরে যোগদান করিতেন, তখন আমার সর্ব্বাঙ্গ কিরূপ রোমাঞ্চিত হইত।

মহর্ষিদেবের জীবিতকাল পর্য্যন্ত ব্রাহ্মসমাজের প্রাচীন নেতাগণ এই ভাবে আনন্দহৃদয়ে প্রতি বৎসরই ব্রাহ্মসম্মিলনের অনুষ্ঠান করিতেন। মনে হয় যে, সে সময়ে বাহিরের অনুষ্ঠান সুচারুরূপে সম্পন্ন হইলেও ব্রহ্মোপাসকদিগের অন্তরে প্রকৃত মিলন সংঘটিত হয় নাই, তাঁহাদের মন হইতে দলাদলির ভাব তখনও বিদূরিত হয় নাই। সম্ভবত সেই কারণেই মহর্ষিদেবের তিরোভাবের

পর এই সম্মিলিত উপাসনার জন্য ব্রাহ্মদিগের মধ্যে আর কোনই আগ্রহ বা উদ্যোগ দেখি নাই।

অবশেষে আজ কয়েক বৎসর হইল, আমার কয়েকটী বন্ধুর আগ্রহে ও উদ্যোগে আমি মাঘোৎসব ও ভাদ্রোৎসব উপলক্ষে সম্মিলিত উপাসনার ব্যবস্থা করিয়া বড়ই আনন্দ উপভোগ করিয়াছিলাম। নানা কারণে তাহাও পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইলাম—অবিচ্ছিন্নভাবে ধারাবাহিকরূপে তাহা রক্ষা করিতে পারিলাম না। কিন্তু আমরা প্রাচীন ঋষিদিগের নিকটে এই সত্য আশ্বাসবাণী লাভ করিয়াছি যে, কল্যাণকর্ম্মের অনুষ্ঠাতা কদাপি দুর্গতি প্রাপ্ত হন না, অর্থাৎ শুভ কর্ম্ম সুফলপ্রসূ হইবেই। এবারকার এই মিলনোৎসবে সেই আশ্বাসবাণীর সত্যতার প্রত্যক্ষ পরিচয় পাইতেছি। সম্মিলনের সেই যে বীজ রোপিত হইয়াছিল, আজ তাহা যে সুবৃহৎ মহীরুহে পরিণত হইয়া ব্রাহ্মসমাজের সকল শাখাকেই, ব্রহ্মোপাসকমাত্রকেই ছায়াপ্রদানে উদ্যত হইয়াছে, ইহাতেই আমরা অত্যন্ত আশান্বিত ও আনন্দিত হইতেছি।

ব্রাহ্মসমাজের সমস্যা নির্দ্ধারণ করিয়া সকল ব্রহ্মোপাসকের মিলিতভাবে তাহার নিরাকরণ করাই আজিকার আলোচ্য বিষয়। ব্রাহ্মসমাজের সর্ব্বপ্রধান সমস্যা হইতেছে—ব্রাহ্মসমাজের আর প্রয়োজন আছে কি না। বর্ত্তমানে ব্রাহ্মসমাজের কর্ম্মক্ষেত্রে নামিলে সর্ব্বপ্রথমেই চারিদিক হইতে এই এক প্রশ্ন কানে আসিয়া উপস্থিত হয় যে, যখন চতুর্দ্দিকে শত শত ধর্ম্মসমাজ জাগিয়া উঠিয়া নিজেদের প্রভাব বিস্তার করিতেছে, এবং সেই সকল ধর্ম্মসমাজ যখন বিভিন্ন কর্ম্মক্ষেত্রের ভিতর দিয়া প্রকারান্তরে ব্রাহ্মসমাজেরই মঙ্গল উদ্দেশ্য সংসিদ্ধ করিতে উদ্যত হইয়াছে, তখন ব্রাহ্মসমাজের দাঁড়াইয়া থাকিবার কোন প্রয়োজন দেখা যায় কি না? যদি দেখা না যায়, তবে ব্রাহ্মসমাজের সমাজসমস্যা বলিয়া কোন কথাই উঠিতে পারে না। কিন্তু প্রকৃতই বর্ত্তমান যুগে ব্রাহ্মসমাজের কি প্রয়োজন নাই? ইহা সত্য বটে যে, বিভিন্ন ধর্ম্মসমাজ ও বিভিন্ন কর্ম্মসংঘ ব্রাহ্মসমাজের অনেকগুলি কার্য্য গ্রহণ করিবার ফলে, ব্রাহ্মসমাজের পূর্ব্ববর্ত্তী নেতাগণ, তাঁহাদের সমসাময়িক অন্ধকারের মধ্যে উহার প্রয়োজন স্বভাবত যেরূপ তীব্রভাবে প্রাণের ভিতর অনুভব করিয়াছিলেন, এবং অনুভব করিয়া যে বলের সহিত তাহা প্রচার করিয়া গিয়াছেন, আমাদের অনেকেই ব্রাহ্মসমাজের প্রয়োজন তত তীব্ররূপে অনুভব করিবার অবকাশই পাই না; কাজেকাজেই ব্রাহ্মসমাজের মূল পত্তনভূমি উদারতম অসাম্প্রদায়িক সত্যধর্ম্মের কথা সেই পূর্ব্ববর্ত্তী আচার্য্যদিগের ন্যায় উপযুক্ত বলের সহিত প্রচার করিতেও উদ্যুক্ত হই না। কিন্তু ব্রাহ্মসমাজের উদ্দেশ্য কি সত্যই সর্ব্বতোভাবে সংসিদ্ধ হইয়াছে? যতদিন মানুষ সীমাবদ্ধ থাকিবে, এবং যতদিন মানুষ সাম্প্রদায়িকতার হাত সম্পূর্ণ এড়াইতে পারিবে না, যতদিন মানুষ ক্ষুদ্রতা লইয়া খেলা করিবে, ততদিন ব্রাহ্মসমাজের উদ্দেশ্য সম্পূর্ণ সংসিদ্ধ হইতে পারিবে না, এবং ততদিন ব্রাহ্মসমাজের প্রয়োজন অস্বীকৃত হইতে পারিবে না, ব্রাহ্মধর্ম্মপ্রচারও ব্যর্থ বলা যাইতে পারিবে না। বর্ত্তমান বৎসরের প্রথম অবধি যে গৃহবিবাদ ও অন্তর্বিরোধের বহ্নি প্রজ্বলিত হইয়া সমগ্র ভারতভূমিকে স্বীয় করালগ্রাসে কবলিত করিবার উদ্যোগ করিয়াছে, ধর্ম্মের নামে অধর্ম্মের যে বিষবীজ চতুর্দ্দিকে বিক্ষিপ্ত হইতেছে, সেই গৃহবিবাদ, সেই অন্তর্বিরোধ, সেই অধর্ম্মের বিস্তারই আজ আমাদিগকে সুস্পষ্ট দেখাইয়া দিতেছে যে, ব্রাহ্মসমাজের ন্যায় উদারতম বীজমন্ত্রের উপর সুপ্রতিষ্ঠিত সমাজের প্রয়োজন নিশ্চয়ই আছে। এখনও পল্লীগ্রামে স্ত্রীশিক্ষার বিরুদ্ধে যে বিষময় ভাব শিক্ষিতদের হৃদয় অধিকার করিয়া আছে, তাহাই ব্রাহ্মসমাজের প্রয়োজন সবলে সপ্রমাণ করে।

মিলনমন্ত্র সাধনের জন্য, শান্তি সংস্থাপনের জন্য, দেশের মঙ্গলের জন্য, জাতীয় কল্যাণের জন্য ব্রাহ্মসমাজের ন্যায় উদারতম একটী সমাজের দীপ্ত দীপ সমুজ্জ্বল রাখা আবশ্যক। শাক্তবৈষ্ণবের দ্বন্দ্ব, গুরুবাদের সহিত, সম্প্রদায়ের চরণে সম্পূর্ণ পরাধীনতার সহিত ব্যক্তিগত স্বাধীনতার দ্বন্দ্ব, শতবিধ দুর্নীতি অনাচার ও কদাচারের সহিত অন্তরের সদ্ভাবের দ্বন্দ্ব যখন দেশকে ছিন্নভিন্ন করিয়া তুলিতেছিল, সেই সময়ে ভগবৎপ্রেরিত সত্যধর্ম্ম ব্রাহ্ম

সমাজেরই ভিতর দিয়া অবতীর্ণ হইয়াছিল। আবার এই যে হিন্দুমুসলমানের ভীষণ দ্বন্দ্ব আমাদের শান্তিময় দেশে চতুর্দ্দিকে অশান্তির উৎস খুলিয়া দিয়াছে, আমার বিশ্বাস, সাম্প্রদায়িকতার হাত হইতে মুক্তিলাভ না করিলে, যে নামেই অভিহিত কর না কেন, ব্রাহ্মধর্ম্মের অসাম্প্রদায়িক সত্য অন্তরে গ্রহণ না করিলে, এবং তাহা বলের সহিত কথায় ও কার্য্যে প্রচারি করিতে না পারিলে এই দ্বন্দ্বের বীজ মরিবে না, চিরন্তন শান্তি সংস্থাপিত হইবে না, দেশে কল্যাণ সুপ্রতিষ্ঠিত হইতে পারিবে না।

চক্ষুষ্মান ব্যক্তিমাত্রকেই স্বীকার করিতে হইবে যে,. সমগ্র ভারতে আজ এক মহা নবজাগরণের যুগ নামিয়া আসিয়াছে। ধীরভাবে আলোচনা করিলে দেখিবে যে, এই নবজাগরণের সূত্রপাত হয় ব্রাহ্মসমাজের সংস্থাপন হইতে। রাজা রামমোহন রায় ব্রাহ্মসমাজের আকারে যে জাগরণের বীজ এই ভারতভূমিতে রোপণ করিয়াছিলেন, কে অস্বীকার করিবে যে, আজ সেই বীজ প্রকাণ্ড মহীরুহে পরিণত হইয়া কেবল ভারতকে নহে, সমগ্র জগতকে আশ্রয় দিতে চলিয়াছে। রামমোহন রায় সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতির পথে অগ্রসর হইবার যে এক আশ্চর্য্য ভাবতরঙ্গ চালাইয়া দিয়াছিলেন, আজ সেই তরঙ্গের জগদ্ব্যাপী প্রসার দেখিয়া কাহার হৃদয় না আনন্দিত হয়! ব্রাহ্মসমাজের আবির্ভাবের কারণেই ভারতবাসী নিজের হারানিধি মনুষ্যত্বকে খুঁজিয়া পাইয়াছে, এবং সেই মনুষ্যত্বের উপর দাঁড়াইয়াই ভারতবাসী আজ জগতের মহাসভায় নিজের আসন সুদৃঢ় করিবার জন্য ন্যায্য দাবী করিতে সক্ষম হইতেছে। এই মনুষ্যত্বকে খুঁজিয়া পাইবার ফলেই আজ বিজ্ঞানাচার্য্য জগদীশচন্দ্র বসু বিজ্ঞানবিষয়ক নবতর সত্য আবিষ্কারে অগ্রসর হইতে পারিয়াছেন। এই মনুষ্যত্বকে খুঁজিয়া পাইবার ফলেই ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র হইতে স্বামী বিবেকানন্দ ও তাঁহার শিষ্যগণ পর্য্যন্ত পাশ্চাত্য ভূখণ্ডে মুক্তির নবতর বার্ত্তা ঘোষণা করিতে সাহস করিয়াছেন। ব্রাহ্মসমাজের আবিষ্কৃত মনুষ্যত্বের স্বাধীনতাবায়ুতে পরিপুষ্ট বলিয়াই পূজ্যপাদ রবীন্দ্রনাথ তাঁহার গীতাঞ্জলির চরণে সমগ্র ভূখণ্ডের মস্তক অবনমিত করিতে পারিয়াছেন। রাজা রামমোহন রায় সেই যে জাগরণের নবযুগ প্রবর্ত্তিত করিয়া গিয়াছেন, আজ শতাব্দী পরে সেই নবযুগের সন্ধিক্ষণ কাটিয়া গিয়াছে; এখন সন্ধিক্ষণের অরুণ আভার পরিবর্ত্তে নবজাগরণের নবোজ্জ্বল সূর্য্য আমাদের সম্মুখে প্রতিভাত হইতেছে। ক্ষণজন্মা রামমোহন রায় সর্ব্বাঙ্গীন স্বাধীনতার, সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতির যে ক্ষীণধারা প্রবাহিত করিয়া দিয়াছিলেন, আজ তাহাতে জোয়ার আসিয়াছে। কাহারও সাধ্য নাই যে, সেই জোয়ার প্রতিরুদ্ধ করে।

সত্যধর্ম্মই হইল ব্রাহ্মসমাজের ভিত্তি, সর্ব্বাঙ্গীন স্বাধীনতাই হইল ব্রাহ্মসমাজের প্রাণ এবং সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতিই হইল ব্রাহ্মসমাজের লক্ষ্য। যে ব্রাহ্মসমাজ হইতে এই সত্যধর্ম্মের বাণী আজ আমাদের গৃহে গৃহে প্রচারিত হইতেছে; যে ব্রাহ্মসমাজ হইতে আমরা সর্ব্বাঙ্গীন স্বাধীনতা ও সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতির সুমঙ্গল বার্ত্তা কর্ণে জপমন্ত্ররূপে প্রাপ্ত হইয়াছি, সেই ব্রাহ্মসমাজকে না বাঁচাইয়া রাখিলে আমাদের আশ্রয়স্থল কোথায়? আর, যদি সেই ব্রাহ্মসমাজকে বাঁচাইয়া রাখিতে চাও, তবে হিংসা দ্বন্দ্ব ভুলিয়া গিয়া, ছোটখাটো মান অভিমান ভুলিয়া গিয়া, উচ্চনীচ ক্ষুদ্রবৃহতের ভেদাভেদ ভুলিয়া গিয়া পরস্পর মিলিত হও। সকল ভাইকে প্রেমের কঠিনকোমল বন্ধনে বাঁধিবার জন্য অগ্রসর হও। সংশয়াত্মা সংসারী লোকের কথায় বিচলিত হইও না। আমাদের যিনি একই পিতামাতা, তিনি আমাদের প্রত্যেকের আত্মাতে সমাসীন থাকিয়া আমাদিগকে ক্রমাগত বলিতেছেন—পরস্পর বিচ্ছিন্ন থাকিও না—মিলিত হও। ঐ অনন্ত আকাশ হইতে সেই মঙ্গলবাণীরই প্রতিধ্বনি ফিরিয়া আসিয়া আমাদিগকে ক্রমাগত বলিতেছে—মিলিত হও—মিলিত হও।

সত্যই এখন আমরা আশ্চর্য্য হইয়া ভাবি যে, এতদিন আমরা বিচ্ছিন্ন হইয়াছিলাম—কেন? আমাদের পরস্পরের মধ্যে—প্রভেদ—কোথায়? ব্রাহ্মসমাজের বিভিন্ন শাখার মধ্যে—প্রকৃতই কোন ধর্ম্মসমাজের সঙ্গে মূলগত কোনই প্রভেদ আমি তো দেখিতে পাই না। ব্রাহ্মধর্ম্মের এই যে বীজ—তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্যসাধনঞ্চ তদুপাসনমেব

—ভগবানকে প্রীতি করা এবং তাঁহার প্রিয়কার্য্য সাধন করাই তাঁহার একমাত্র উপাসনা—এই বীজমন্ত্র কোন্ ব্রহ্মোপাসক অস্বীকার করিবেন? যে বীজমন্ত্র এতই অসাম্প্রদায়িক ও উদার যে, জগতের কোন ধর্ম্মসম্প্রদায়ই তাহাকে অস্বীকার করিলে দাঁড়াইতেই পারে না, সেই বীজমন্ত্রকে ব্রাহ্মসমাজের কোন শাখাই যে অস্বীকার করিতে পারেন না এবং করেন না, তাহা বলাই বাহুল্য। এই উদারতম ও সম্পূর্ণ অসাম্প্রদায়িক বীজমন্ত্র যখন প্রত্যেক ব্রহ্মোপাসকেরই অবলম্বনীয়, তখন তাঁহাদের মধ্যে অবান্তর বিষয়ে শত মতভেদ থাকিলেও বিবাদ বা মনোমালিন্য আসিবার কোনই অবকাশ নাই। আমাদের বুঝিতে হইবে যে, আমরা সত্যই একই পিতামাতার চরণপূজার জন্য ব্রাহ্মসমাজে প্রবেশ করিয়াছি। আমাদের উপাস্য দেবতা সত্যং—জ্ঞানং—অনন্তং ব্রহ্ম; আমাদের উপাস্য দেবতা বিগতবিবাদং পরমেশ্বর। ভগবান অনন্তস্বরূপ। তাঁহার অনন্তভাবের এক একটী কণা এক একটী নরনারীর অন্তরে বৈশিষ্ট্য লাভের চেষ্টা করিতেছে। এই কারণেই সংসারে এত বৈচিত্র্য। ইহা বুঝিয়া প্রত্যেক ব্রহ্মোপাসকের কর্ত্তব্য—পরস্পরের মতপার্থক্যের প্রতি যথোচিত শ্রদ্ধা প্রদর্শনপূর্ব্বক সত্যধর্ম্মের মূলবীজে একমত হইয়া প্রাণের অন্তরে সদ্ভাবে মিলিত হওয়া, পরস্পরের উন্নতিতে সুখী হওয়া, পরস্পরের অবনতিতে দুঃখিত হওয়া। এইভাবে ব্রহ্মোপাসকগণ একহৃদয় হইয়া ভগবানের নামপ্রচারে বহির্গত হইলে দিগ্বিজয়ীর বেশে ফিরিতে পারিবেন নিঃসন্দেহ, এই ভাবে পরস্পর যথার্থ মিলিত হইয়া সত্যধর্ম্ম প্রচারে উদ্যত হইলে ব্রাহ্মসমাজের সহিত প্রতিযোগিতা করিতে পারে কাহার সাধ্য?

মিলনের যে কি ফল, তাহা আমরা এবারকার ব্রহ্মোৎসবে প্রত্যক্ষ করিলাম। পণ্ডিতেরা ঠিকই বলিয়াছেন যে, যে খড়বিচালি এক একটী ধরিলে বিশেষ কোনই কার্য্যে আসিবে না, তাহারই সমষ্টি দ্বারা বলবান হস্তীকেও বাঁধা যায়, কারণ—সংহতিঃ কার্য্যসাধিকা—মিলনেই কার্য্যের সাফল্য। ইংরাজের নিকট তাহাদেরও সাফল্যের গুপ্তমন্ত্র লাভ করিয়াছি—Union is strength। এই মিলন শুধু কথায় পর্য্যবসিত হইলে চলিবে না—আন্তরিক হওয়া চাই—কথায় ও কার্য্যে এক হওয়া চাই। যে সমাজ মুখের কথা কার্য্যে পরিণত করিতে না পারিবে, সে সমাজকে মৃত্যুমুখে অগ্রসর হইতেই হইবে। শুধু ব্রাহ্মসমাজ কেন, কোন সমাজই—ধর্ম্মসমাজই বল, গার্হস্থ্যসমাজই বল, আর রাজনৈতিক সমাজই বল—কেবল মুখের কথায় উন্নতির পথে জীবনের পথে স্থির থাকিতে পারে না। "শুধু কথায় কিছু হইবে না, কাজ চাই"—এই সত্যবাণী আজ কিছুকাল যাবৎ ভারতবাসী জনসাধারণের অন্তরে বড়ই বেশীরকম আলোড়িত হইতেছিল এবং বাহিরে তাহা ব্যক্ত হইতে চাহিতেছিল। তাই না সেদিন রাষ্ট্রীয় মহাসভায় সভাপতির মুখে ভগবৎপ্রেরণায় এই বাণী ফুটিয়া বাহির হইয়াছিল যে, এখন আর আমাদের "কথায় কাজ নাই, কাজের কথা চাই" অর্থাৎ আমাদের কথা ও কাজের মধ্যে মিল চাই—কথায় যে সত্য প্রচার করিব, কার্য্যেও তাহাই পরিণত করিব। কেবল রাজনীতিক্ষেত্রে নহে, দেশের বর্ত্তমান অবস্থায় এই মন্ত্র ভারতবাসী সকল ব্যক্তির, সকল সমাজের সকল অবস্থারই হৃদয়ের কথা হইয়া দাঁড়াইয়াছে। রাজনীতিক্ষেত্রে যদি এই মন্ত্র, কেবল হৃদয়ে ধারণ নহে, কার্য্যেও পরিণত করিতাম, তবে দেশের অনেক রাজনৈতিক সমস্যার খুব সহজেই সমাধান হইত। এই মন্ত্র দেশবাসীর হৃদয়ের অনেকটা স্থান সুদৃঢ়রূপে অধিকার করিয়াছে বলিয়াই আজ কঠোর রক্ষণশীল ব্রাহ্মণসমাজও নির্য্যাতিত রমণীকে সমাজে পুর্ণগ্রহণের ব্যবস্থা দিয়া সমগ্র হিন্দুসমাজের আশীর্ব্বাদ সঞ্চয়ে অগ্রসর হইতে সাহস করিয়াছেন। মুখে এক সত্য প্রচার করিব, তাহাকে কার্য্যে পরিণত করিবার সময় ভীরু কাপুরুষের ন্যায় রণে পৃষ্ঠপ্রদর্শন করিলে চলিবে না।

এক সময়ে ভারতের হিন্দুসমাজ উদারতম বীজমন্ত্রের উপর প্রতিষ্ঠিত প্রকৃত সত্যধর্ম্মকে অন্তরে গ্রহণ করিয়া কার্য্যেও পরিণত করিয়াছিলেন বলিয়াই এই আশ্চর্য্য সত্যবাণী এদেশেই প্রকাশ পাইয়াছিল—"নৃণামেকো গম্যস্ত্বমসি পয়সামর্ণবইব"—সমুদ্র যেমন নদনদীসমূহের একমাত্র

গন্তব্যস্থলে, ভগবানও সেইরূপ সকল মানবেরই একমাত্র গম্যস্থল। এই ভাব হইতে বিচ্যুত হইবার ফলে যখন হিন্দুসমাজ কি ধর্ম্মবিষয়ে, কি সামাজিক বিষয়ে, কি রাজনীতিক্ষেত্রে, সকল বিষয়েই শতধাবিভক্ত হইয়া শতবিধ সঙ্কীর্ণতার শত শত ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র গণ্ডীর পাশজালে আপনাকে আবদ্ধ করিল; যখন হিন্দুসমাজ মুখে উদারতার বড় বড় মন্ত্র উচ্চারণ করিতে থাকিলেও কার্য্যে ঠিক তাহার বিপরীত আচরণ করিতে লাগিল, তখনই সেই উন্নত ও সুবিস্তৃত হিন্দুসমাজ অবনতির পিচ্ছিলপথে দ্রুতপদে নামিতে লাগিল। হিন্দু ও মুসলমান উভয়ের, রাজনীতিকে সত্যধর্ম্মের ভিত্তি হইতে বিচ্যুত করিয়া, কথা ও কাজে মিল না রাখিয়া, রাজনীতিক্ষেত্রে নামিবার ফলেই আজ হিন্দুমুসলমানের এই ভীষণ বিরোধ। সত্যধর্ম্মের ভিত্তি হইতে বিচ্যুত করিয়া, কথা ও কাজের মিল না রাখিয়া সমাজগঠনের চেষ্টার ফলেই আজ হিন্দুজাতি ধ্বংসের পথে দণ্ডায়মান। ইহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই যে, এই প্রকার মুখে উদারতার উৎস ব্রাহ্মধর্ম্মের কথা ব্রহ্মোপাসকগণ ন্যূনাধিক বলের সহিত প্রচার করিলেও, কার্য্যে অনেক সময়ে তাহার বিপরীত আচরণ করিবার ফলেই, ব্রাহ্মসমাজ আর প্রকৃত উন্নতির পথে পূর্ব্বের ন্যায় দ্রুতগতিতে অগ্রসর হইতে পারিতেছেন না—ভারতের ধর্ম্মক্ষেত্রে, মনে হয় যেন, একটু পিছাইয়া পড়িতেছেন।

মৈত্রীই নবযুগের যুগধর্ম্ম। আমরা প্রত্যক্ষ করিতেছি যে, বর্ত্তমান যুগের জগৎব্যাপী কর্ম্মক্ষেত্রে পরস্পরের আন্তরিক মিলন ও অন্যোন্যসাহচর্য্য অপরিহার্য্য। সেই এক সময় গিয়াছে, যখন ব্রহ্মোপাসকগণ এই প্রত্যক্ষ সত্য মুখে প্রচার করিলেও অভিমানে অহঙ্কারে বিচ্ছিন্ন হইয়া কোথায় কোন্ দূর-দূরান্তরে ছটকাইয়া পড়িলেন; ছোটখাটো কথায় আহত হইয়া কেহই কাহারও উপর মমতা করিলেন না; সুদীর্ঘকালব্যাপী সম্প্রীতি মুহূর্ত্তের মধ্যে কোথায় অন্তর্হিত হইয়া গেল। ইহার ফলে আমাদের প্রিয় ব্রাহ্মসমাজের অঙ্গে যে কি কঠোর আঘাত পড়িয়াছে, কয়জন তাহা ধীরভাবে চিন্তা করিয়াছেন? এই বিরোধ বিবাদ, মনের অমিল পরিত্যাগ না করিলে আমাদের শ্রেয় নাই। এই মিলনের অভাবে আমাদের শুভকর্ম্মসাধনের প্রচেষ্টাসকল ইচ্ছানুরূপ সাফল্য লাভ করিতে পারিতেছে না। আমাদের ইচ্ছা, উদ্যোগ ও উৎসাহ সত্ত্বেও সংহতির অভাবে সেই সকল অনুষ্ঠান কত সময়ে নিষ্ফল হইয়াছে, এবং তাহার ফলে আমরা এত মলিন, এত দুর্ব্বল হইয়া পড়িতেছি। কিন্তু ব্রাহ্মসমাজের সেই আদিমকালে ব্রহ্মোপাসকগণের পরস্পরের মধ্যে সদ্ভাব থাকিবার কারণে, মিলনমন্ত্র কথায় ও কার্য্যে সাধন করিবার ফলে, সত্যধর্ম্মকে মানদণ্ড করিয়া সকল কার্য্য করিবার ফলে, ব্রাহ্মসমাজ দেশের মধ্যে কি প্রবল শক্তিরূপে দাঁড়াইয়াছিল, পুরাতন তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার প্রতি পৃষ্ঠায় তাহার পরিচয় পাওয়া যায়। স্বামী শ্রদ্ধানন্দজীকে হত্যার কারণে আজ যে শুদ্ধিসংগঠন দেশবাসীর সম্মুখে বড় হইয়া দাঁড়াইয়াছে, কে তাহার অগ্রণী?—ঐ ব্রাহ্মসমাজ। কয়জন লোক ইহা জানেন যে, ব্রাহ্মসমাজ জনৈক খৃষ্টধর্ম্মে দীক্ষিত যুবককে অকুতোভয়ে দীক্ষিত করিয়া ব্রহ্মোপাসক হিন্দুসমাজে ফিরাইয়া আনিয়াছিলেন? যে স্ত্রীশিক্ষা বিস্তারের ফলে আজ গৃহলক্ষ্মীগণ সংসার উজ্জ্বল করিতেছেন, কে তাহার পথপ্রদর্শক? ঐ ব্রাহ্মসমাজ। সে সময়ে ব্রহ্মোপাসকগণ অন্তরে মিলিত ছিলেন বলিয়াই এবং তাঁহারা একমাত্র ভগবানের উপর নির্ভর করিয়া কথায় ও কাজে মিল রাখিয়া চলিতেন বলিয়াই তাঁহারা নানা শুভকর্ম্মের অনুষ্ঠানে কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন।

স্বাধীনতাই ব্রাহ্মসমাজের প্রাণ। এই স্বাধীনতার অর্থ উচ্ছৃঙ্খলতা নয়। ব্যক্তিগত স্বাধীনতার সঙ্গে সামাজিক অধীনতার সামঞ্জস্য করিয়া লইতে হইবে। প্রাচীন হিন্দুসমাজ আপনাকে কঠোর সমাজবন্ধনের নিগড়ে আবদ্ধ করিবার ফলে আজ দেখি, হিন্দুর সংখ্যা ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর হইতে চলিয়াছে। এদিকে ব্রহ্মোপাসকগণ ব্যক্তিগত স্বাধীনতার অতিমাত্র পক্ষপাতী হওয়াতে, আমাদের মধ্যে যে উচ্ছৃঙ্খলতা অল্পাধিক প্রবেশ লাভ করিয়াছে, তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। ইহার কারণ এই যে, ব্রাহ্ম-

সমাজের লক্ষ্য সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি হইতে আমাদের দৃষ্টি সরিয়া গিয়াছে। সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতির প্রতি যদি আমাদের দৃষ্টি নিবদ্ধ থাকিত, তবে, উপস্থিত অনেকের অপ্রিয়ভাজন হইবার আশঙ্কা সত্ত্বেও, আমার এই হৃদয়ের কথা বলিতেছি যে, দেশের এই দুঃখদুর্দিনের দিনে, ইতিহাস প্রতি পৃষ্ঠায় যে নৃত্য-গীতকে অবনতির পিচ্ছিল পথ বলিয়া সপ্রমাণ করিতেছে; জাপান, ইটালি প্রভৃতি দেশ যাহার অপকারিতা উপলব্ধি করিয়া যাহাকে নির্ব্বাসিত করিবার চেষ্টায় আছে, সেই নৃত্যগীতকে উৎসাহদান করিয়া মাতৃজাতিকে অবমাননা করিতে অগ্রসর হইতাম না। আমি কেন, কেহই নির্দ্দোষ আমোদপ্রমোদের বিরোধী হইতে পারে না। কিন্তু যে সকল আমোদ প্রমোদ মানবের নীচভাবসকল, স্বীকার করি বা নাই করি, উত্তেজিত করিতে বাধ্য, প্রত্যেক চিন্তাশীল ব্যক্তিই সেই সকল আমোদপ্রমোদের সম্পূর্ণ বিরোধী হইবেন নিঃসন্দেহ। এই যে অভিনয়শালায় অভিনয়ের ব্যবস্থা হয়, অভিনয়শালার কোন্ কর্ত্তৃপক্ষ অস্বীকার করিতে পারেন যে, জনসাধারণকে আকৃষ্ট করিবার জন্য অনেক স্থলেই তাঁহাদিগকে নানা অসঙ্গত উপায় অবলম্বন করিতে হয়? কে জানে যে, বর্ত্তমানে ছাত্রদিগের মধ্যে শত করা ৭০ জন যে ভীষণ রোগের স্পর্শাক্রান্ত, অভিনয়শালার অভিনয়দর্শন প্রভৃতি অন্যায় কার্য্য তাহার কারণ নয়?

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ আমাদের এক পারিবারিক উপাসনায় এই একটী জাগরণমন্ত্র দিয়াছিলেন—ব্রহ্মোপাসকগণ সমস্ত জাতি অপেক্ষা সকল বিষয়ে, কি জ্ঞানে কি বিদ্যায় কি ধর্ম্মে কি অর্থে উন্নত না হইলে ব্রাহ্মসমাজের পতন অবশ্যম্ভাবী। বিগত মহাসমরের পর ইউরোপের ইতিহাস হইতে আমরা এই জ্ঞান লাভ করিয়াছি যে, ব্রাহ্মসমাজের পতন হইলে তাহার আবর্ত্তে ভারতের সকল সমাজই ডুবিতে থাকিবে। বর্ত্তমান যুগে দেশের যেরূপ অবস্থা আসিয়াছে, তাহাতে দেশবাসীর কর্ণে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের ঐ জাগরণমন্ত্র ভিন্ন অন্য কোন মন্ত্র দিতে পারি না।

ব্রাহ্মসমাজকে যদি আবার জাগাইয়া তুলিতে চাই, হিন্দুসমাজকে যদি আবার ধ্বংসের মুখ হইতে বাঁচাইতে চাই, সমগ্র ভারতবাসীকে যদি আবার সর্ব্বাঙ্গীন স্বাধীনতা ও উন্নতির সমুচ্চ শিখরে দাঁড় করাইতে চাই, তবে প্রত্যেক ভারতবাসীকে, প্রত্যেক হিন্দুকে, প্রত্যেক ব্রহ্মোপাসককে নির্ভয়ে সর্ব্ববিধ অন্যায় সঙ্কীর্ণতার বিরুদ্ধে দাঁড়াইতে হইবে; সংসারের সকল ক্ষেত্রে, জীবনযাত্রার সকল বিভাগে সেই অপরাজিত দেবতার বিজয় ঘোষণা করিতে হইবে। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ সত্যধর্ম্মের যে বীজমন্ত্র আমাদিগকে দিয়াছেন, তাহাই কৌস্তুভমণির ন্যায় আমাদিগের অন্তরে ধারণ করিতে হইবে। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের যে জাগরণমন্ত্র আজ উপস্থিত করিলাম, তাহাই জপমন্ত্ররূপে সঙ্গে সঙ্গে রাখিতে হইবে এবং মৈত্রীকে ব্যবহারের নিয়ামক করিতে হইবে। কেবল ব্রাহ্মসমাজ কেন, যে সমাজ এই ভাবে চলিতে থাকিবে, সেই সমাজেরই সমস্যাসকল সহজেই নিরাকৃত হইতে পারিবে।

ব্রহ্মোপাসক বন্ধুগণ! এই পথে নির্ভয়ে অগ্রসর হও। কথায় ও কার্য্যে সত্যধর্ম্ম প্রচারের যে শুভ অবসর আসিয়াছে, এই শুভ অবসরে তোমাদের নিদ্রিত থাকিলে চলিবে না। ভগবানের মাভৈ-বাণী আকাশের প্রত্যেক অংশ হইতে প্রতিমুহূর্ত্তে ধ্বনিত হইতেছে। এই জাগরণের মুখে, আমোদপ্রমোদের মোহে, ঘুমের ঘোরে পশ্চাতে পড়িয়া থাকিলে আমাদের মৃত্যুকেই বরণ করিতে হইবে। যতদিন এই ভারতভূমি পুরাকালের ন্যায় জগতের মহাসভায় উপযুক্ত উচ্চ আসন অধিকার না করে, যতদিন না সর্ব্বাঙ্গীন স্বাধীনতা ও সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি দেশবাসীর হস্তগত হয়, ততদিন আমার এই কাতর মিনতি, বৃথা হাসি খেলা, অশ্লীল আমোদপ্রমোদের কথা মুখেও আনিও না; ভায়ে-ভায়ে বৃথা দ্বন্দ্ববিবাদ করিয়া নিজের শক্তির, দেশের শক্তির অপচয় হইতে দিও না। পদতলে দলিত করিয়া দাও নৃত্যগীতের কথা; দূর করিয়া দাও ভেদাভেদের কথা।

বিশ্ববিধাতা মঙ্গলময় পরমেশ্বরের মঙ্গলভাবে, তাঁহার অমিতশক্তিতে যদি আমাদের বিশ্বাস থাকে; সেই আনন্দস্বরূপের আনন্দবিধানে যদি আমাদের প্রকৃত আস্থা থাকে, তবে আমরা স্পষ্ট বুঝিব যে, এখানে দুর্ব্বলতার স্থান নাই। দুর্ব্বলতাই ভয়ের

কারণ। দুর্ব্বল যে, সেই সংশয় করিতে পারে যে, সম্মুখে প্রতি পদনিক্ষেপের ফলে প্রাচীন জীর্ণ, কিন্তু চিরপরিচিত, সমাজ যদি ভূমিসাৎ হয়, তবে কি হইবে? যথার্থ প্রাণের সহিত ভগবানের মঙ্গল-বিধান উপলব্ধি করিয়া তাঁহার সত্যধর্ম্ম প্রচার করা, কথায় ও কার্য্যে একমিল হইয়া সকল শুভকর্ম্মে অগ্রসর হওয়া দুর্ব্বল ভীরু সংশয়াত্মার কর্ম্ম নয়। যথার্থ প্রাণের সহিত শুভকার্য্যসাধনে অগ্রণী হওয়া স্বাধীনতার নামে উচ্ছৃঙ্খলতাদৃপ্ত, ধর্ম্মের নামে অনাচারনিরত উদ্‌ভ্রান্তচিত্ত মানবের কার্য্য নয়। তাহার বিকৃতদৃষ্টি দেখিতে পায় না যে, সকল ঘটনার ভিতর দিয়া মঙ্গলবিধাতা ভগবানের মঙ্গলহস্ত কি এক আশ্চর্য্য মঙ্গলসৌধ গড়িয়া তুলিতেছে। ভগবানের পথে অগ্রসর হইতে গেলে সৎসাহস চাই, ধৈর্য্য চাই, সহিষ্ণুতা চাই, একনিষ্ঠা চাই।

নিশ্চয় জানিও, সকল স্বাধীনতার উৎস, সকল মঙ্গলের একমাত্র নিদান সেই স্বাধীন অমৃতপুরুষের সন্তান তুমি—তুমিও বীর, তুমিও সবল। সেই অমৃত পুরুষের অনিমেষ মঙ্গল দৃষ্টিতে স্বীয় দৃষ্টি সন্নিবদ্ধ করিয়া, মানুষের ভালমন্দ বলার উপর, মানুষের নিন্দাপ্রশংসার উপর কিছুমাত্র নির্ভর করিও না, ভ্রূক্ষেপ করিও না। প্রতি নিমেষে অন্তরে কাণ পাতিয়া শোন যে, অন্তরের গুরু তোমাকে কোন্ পথে যাইতে আদেশ করেন। সেই আদেশ শুনিয়া সত্যধর্ম্মের পথে অগ্রসর হও—মানুষের ভয়ে, সংসারের প্রলোভনে সেই পথ হইতে বিচ্যুত হইও না। তোমাদের সকল সমস্যা সহজেই মীমাংসিত হইবে।

অধর্ম্মের সহিত সংগ্রামে যদি জয়লাভ করিতে চাও, সন্তানসন্ততির যদি প্রকৃত উন্নতি দেখিবার আশা কর, তবে অসত্য, অধর্ম্ম হইতে নিজেরাও সর্ব্বদা দূরে থাকিবে এবং সন্তানগণকেও সর্ব্বদা দূরে রাখিবে। জ্ঞানে বড় হও, ধর্ম্মে বড় হও, কর্ম্মে বড় হও। ভগবানের হস্তে ফলাফলের ভার সমর্পণ করিয়া নিজের মঙ্গলসাধনে, সমাজের ও দেশের কল্যাণসাধনে একমনে একপ্রাণে আপনাকে নিয়োগ কর। দ্বেষহিংসা বিদূরিত করিয়া পরস্পরকে তুলিয়া ধরিবার চেষ্টা কর। স্ত্রীপুরুষ-নির্ব্বিশেষে, ব্রাহ্মণপঞ্চম-নির্ব্বিশেষে সকলের সম্মুখে জ্ঞানলাভের দুয়ার উন্মুক্ত করিয়া দাও। তখন দেখিবে, স্বরাজ হস্তগত হইয়াছে, স্বাধীনতা হস্তগত হইয়াছে, উন্নতির সুবিস্তৃত রাজপথ উন্মুক্ত হইয়া গিয়াছে। তখন ভগবানের অমোঘ আশীর্ব্বাদ দেশের মস্তকে ঝরিতে থাকিবে; দেশ সজীব হইয়া উঠিবে, এবং শ্রদ্ধা-ভক্তি-জ্ঞান কর্ম্মের সাহায্যে সকল সদ্‌গুণের আধার হইয়া উঠিবে; সমগ্র দেশে দুঃখ-দৈন্যের হাহাকার ও ক্রন্দনের পরিবর্ত্তে আনন্দের বিমল হাসি ও শুভ অনুষ্ঠানসমূহের মঙ্গলশঙ্খ আবার বাজিয়া উঠিবে। তখন তোমার হৃদয় হইতে ভগবানের নামে নিত্য এই জয়ধ্বনি উঠিতে থাকিবে—জয় ভগবানের জয়।

এমিয়েলের জার্নাল।

(শ্রীহিমাংশুপ্রকাশ রায়)

জিনেভা,

২৫শে আগষ্ট, ১৮৭১।

দিবসটি কি প্রসন্ন, আকাশটি কি অপূর্ব্ব, বাতাসটি কি স্নিগ্ধ! প্রভাতকালটি যেন অগাধ শান্তিসাগরজলে সুস্নাত ও পরিতৃপ্ত! পর্ব্বতে সৈকতে নন্দন-সৌরভ বিরাজিত! এ সমুদয়ই যেন আমাদের প্রতি অজস্র আশীর্ব্বাদ। এই ধ্যানরত স্থলের পুণ্য গাম্ভীর্য্যকে ভঙ্গ করিতে কোন প্রকার তুচ্ছ অবান্তর কোলাহল নাই। মনে হয় যেন কোন এক বিশাল মন্দিরাভ্যন্তরে প্রবেশলাভ করিয়াছি। ইহার মধ্যে প্রত্যেক প্রাকৃতিক জীব ও সৌন্দর্য্যের প্রবেশাধিকার ও নির্দ্দিষ্ট স্থান বর্ত্তমান। এই বিরাট দেবদূতগণের সঙ্গমস্নিগ্ধ শান্তিস্বপ্ন ভঙ্গের আশঙ্কায় আমি এমন কি নিশ্বাসপাতেও ক্ষান্ত আছি। এই সকল স্বর্গীয় শুভ মুহূর্ত্তেই আমাদের ওষ্ঠপ্রান্তে উচ্চারিত হয়—আমি উপলব্ধি করি, আমি বিশ্বাস করি, আমি দর্শন করি; এবং তখনই সমস্ত দুঃখ-ব্যথা ও দুর্দ্দশা, জীবনের অসহনীয় জ্বালা-যন্ত্রণা বিস্মৃতিসলিলে বিসর্জ্জনান্তে স্বর্গীয় ভূমানন্দে নিমগ্ন হই। আমরা দেবগণের শ্রেণীভুক্ত হই, এবং ঈশ্বরপ্রসাদের মধ্যে প্রবেশলাভ করিয়া ধন্য হই। কর্ম্মক্লেশ, অশ্রুপাত, দুঃখ, পাপ, মৃত্যু সকলই অন্তর্হিত হয়। পার্থিব জীবন ধন্য হইয়া অবিমিশ্র আনন্দে পরিণত হয়। পদার্থসমূহের এই সুগভীর নীরব নিশ্চলতার মধ্যে সর্ব্বপ্রকার স্বরবৈষম্য বিলীন হয়। প্রতীত হয় যেন সৃষ্টি-বৈচিত্র্য এক সুবৃহৎ ঐক্যতান—প্রেমস্বরূপ পরমেশ্বরের গুণকীর্ত্তনে সর্ব্বক্ষণ রত। সৃষ্টির কার্য্য ইহা ব্যতীত অন্য কিছু কিনা সে প্রশ্ন আমাদের চিন্তায় তখন আর

উদয় হয় না। আমরা নিজেরা তখন প্রত্যেকে এই বিরাট ঐক্যতানের এক-একটি সুর-তরঙ্গে পরিণত হই। এবং অন্তরাত্মা অকস্মানন্দের সহযোগে স্পন্দিত হইবার নিমিত্ত মহোল্লাসের নিস্তব্ধতাকে ভঙ্গ করে।

জিনেভা,
১৭ই এপ্রিল, ১৮৫৫।

দিবসটি মেঘমুক্ত, সমুজ্জ্বল, সুখোষ্ণ। চতুর্দ্দিকে পক্ষীকুলের কূজনধ্বনি। নিশার আকাশ নক্ষত্রখচিত। প্রকৃতি সৌন্দর্য্যবসনে আবৃতা—স্নেহশীলা।

প্রায় দুই ঘণ্টাকাল এই বচনাতীত রমণীয় দৃশ্যের মধ্যে আমি আত্মহারা রহিয়াছি। আমি উপলব্ধি করিতেছি, আমি অনন্তস্বরূপের মন্দিরে বর্ত্তমান, অসীম বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সম্মুখে অনন্ত নিখিল জগতে নিখিলপতির অতিথি। নীল ব্যোমস্থিত নক্ষত্ররাজি মর্ত্ত্যলোক হইতে আমার চিত্তকে কোন সুদূরের ঊর্দ্ধলোকপানে আকর্ষণ করে। ঈশ্বরারাধনায় তন্ময় অন্তরের উপর তাহারা কি বচনাতীত শান্তিসুধা ও অমর জীবনরস সঞ্চার করে। মনে হয় আমাদের পৃথিবী একখানি ক্ষুদ্র তরীতুল্য এই নীলসমুদ্রে ভাসমান। এবম্বিধ প্রগাঢ় এবং প্রশান্ত আনন্দ আমার সমগ্র মানব-অন্তরটিকে পরিপুষ্ট করে, পবিত্র করে ও মহীয়ান করে। আমি ঈশ্বরে সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণ করিলাম—আমার আমিত্ব এক্ষণে কেবলমাত্র কৃতজ্ঞতা ও দাসত্বের সমষ্টি।

বুদ্ধবাণী।

(শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর)

Busy not yourself anxiously and
unprofitably
About other worlds, Gods, souls, spirits
or demons ;
Of thy coming hither and from whence ;
Of the soul's existence ;
And if it be, of its going hence, when
and unto where.
Nought is proven ; all this is unknown
and unknowable,
whilst the duties of life are substantial
and urgent.

আকুল কোরো না চিত্ত সন্ধানেতে বৃথা
কোথা কত লোক দেব আত্মা ভূত প্রেত ;
হেথা তুমি এলে কেন, কোথা হতে এলে ;
আত্মাই বা আছে কিনা ; থাকে যদি তবে,
কোথা হতে কবে কোথা যেতে হবে তব।
প্রমাণ কিছুরি নাই ; অজ্ঞাত অজ্ঞেয়
বলে জানি গো এসব ; জীবনে কর্ত্তব্য-
সাধন প্রথম কাজ—দৃঢ় ভিত্তি যার॥ বুদ্ধদেব।

বুদ্ধদেবের এই উক্তির কথা বলিয়া অনেকে ঈশ্বর, আত্মা, পরলোক প্রভৃতি সম্বন্ধে কোন বিচার আলোচনা করিতে চাহেন না। কিন্তু আমাদের বোঝা উচিত যে, এসকল বিষয়ে বিচার আলোচনা না করিয়া যে উপায় নাই। আমরা প্রকৃতির অন্তর্ভুক্ত—প্রকৃতির বহির্ভূত নই। ইহা যদি ঠিক হয়, তবে কেমন করিয়া অস্বীকার করিব যে, এ সকল বিষয়ে আলোচনার প্রয়োজন নাই? প্রয়োজনই যদি না থাকিত, তবে আমাদের প্রাণের ভিতর এ সকল কথা উঠে কেন? ঐ যে, বুদ্ধদেব বলিলেন—কোথা কত লোক, কত দেবতা, আত্মা প্রভৃতি আছে, তুমি কোথা হইতে এবং কেনই বা এ জগতে জন্মগ্রহণ করিলে, এসকল বিষয়ের বৃথা সন্ধান করিতে অগ্রসর হইও না—এ কথা হয়তো তাঁহার পক্ষে বলা সহজ হইয়াছিল, কিন্তু এভাবে চলা সাধারণ মানবের পক্ষে মোটেই সহজ নয়। প্রকৃতির প্রেরণাতেই যে আমাদের ঐসকল বিষয়ে দৃষ্টি পড়ে—ইহার অর্থ এই যে, যখন ঘটনাচক্রে ঐ সকল বিষয়ের প্রতি আমাদের মনপ্রাণ আকৃষ্ট হয়, তখন যে ঐ সকলের প্রতি দৃষ্টি না দিয়া থাকিতে পারি না।

এই সকল বিষয়ের সন্ধানকে বৃথা বা নিরর্থক বলাও যায় না। আমরা জগতের ইতিহাস আলোচনা করিয়া দেখিতে পাই যে, এই সকল বিষয়ের আলোচনা কিছুতেই নিষ্ফল হইতে পারে না। এই সকল বিষয়ের আলোচনা হইতেই তো জগতে প্রজ্ঞান বা দর্শনবিভাগের এত উন্নতি হইয়াছে। বুদ্ধদেবের সিদ্ধান্ত যুক্তিপূর্ণ বা ভ্রান্ত, তাহা এস্থলে বিচার যদি বা নাও করি, তাহা হইলেও ইহা তো সহজেই বুঝা যাইতেছে যে, বুদ্ধদেব নিজেও ঐ সকল বিষয়ের আলোচনা করিয়া তাহারই ফলেই তো তাঁহার নিজের সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন।

বুদ্ধদেব তো বলিলেন, আত্মা আছে কি না বিচার করিবার প্রয়োজন নাই। কিন্তু তিনি তো এ প্রশ্নের নিরাকরণ করিলেন না যে,—আত্মা আছে

কি না যদি তাহারই কোন ঠিক-ঠিকানা না রহিল, তবে জীবনের পথে কর্ত্তব্যের ভিত্তি রহিল কোথায়? একথা বুঝি যে, আত্মা আছে এবং তাহার অনন্ত উন্নতির অভিমুখে গতি আছে এবং মন্দ কাজ করিয়া সেই গতির পথে বাধা আনয়ন করা উচিত নহে; এবং সেই আত্মার অন্তরেই ভালমন্দ বিচারের, কর্ত্তব্য ও অকর্ত্তব্য জানিবার ভিত্তি সুদৃঢ়রূপে নিহিত আছে—ইহা স্বীকার করিলে তবে আমাদের ভালর পথে অগ্রসর হওয়া এবং সমাজকে, দেশকে ও জগতকে সেই পথে চলিতে বলা সহজ হয়। আত্মা, ঈশ্বর, পরলোক প্রভৃতি বিষয়ের আলোচনা ছাড়িয়া কর্ত্তব্যের কথা কি প্রকারে আসিতে পারে, তাহা আমাদের ধারণাতেই আসে না। হইতে পারে, আমি প্রকাশ্যে ঈশ্বর আত্মা প্রভৃতির বিষয় আলোচনা না করিয়া আমার জীবনের কর্ত্তব্য করিয়া চলিতেছি। কিন্তু তাহাতে এইমাত্র বুঝায় যে, মুখে বা প্রকাশ্যে ঐ আলোচনা না করিলেও অন্তরে নিশ্চয়ই স্থির করিয়া লইয়াছি যে, আত্মা আছে এবং সেই আত্মার ভিতরেই কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্যের নির্দ্দেশ পাইতেছি—তবেই না সেই কর্ত্তব্যকে কর্ত্তব্য জানিয়া সেই কর্ত্তব্যের পথে চলিতেছি। ইহাই যদি ঠিক হয়, তবে ঐ আত্মার অস্তিত্ব আলোচনা করিতে গিয়াই ঈশ্বর এবং তাহারই সঙ্গে পরলোকেরও অস্তিত্ববিষয়ক আলোচনা স্বতই উপস্থিত হয়, এবং তাহাদের অস্তিত্ব স্বীকার করা অনিবার্য্য হইয়া উঠে।

বুদ্ধদেব বলিতেছেন—আত্মা, ঈশ্বর প্রভৃতির অস্তিত্ববিষয়ে কোন কিছু প্রমাণ নাই। বলিলেই তো সকলে শুনিবে না। কত শত যোগীন্দ্র, ঋষিমুনিগণ,—তাঁহারা যে আবার ঐ সকলের অস্তিত্ব বিষয়ে জ্বলন্ত সাক্ষ্য দিয়াছেন। এ বিষয়ে যখন এই রকম বিরোধ দেখা যাইতেছে, তখন সাধারণ মানবের পক্ষে কঃ পন্থা—আমরা কোন্ পথ ধরিয়া চলিব? ইহার সহজ উপায় হইতেছে—হৃদয় দিয়া বিচার করিয়া সত্যকে গ্রহণ করা। আমার হৃদয়, তোমার হৃদয় এ বিষয়ে কি বলিতেছে? এ কথা কি কখনও হৃদয়ে সায় পায় যে, আমার ভিতরে তোমার ভিতরে তাহার ভিতরে আমাদের কাজকর্ম্মের একজন পরিচালক নাই? আমরা তো জানি যে, আমাদের জিহ্বা কথা কহিতেছে, হস্ত স্পর্শ করিতেছে ইত্যাদি। কিন্তু ইহা তো স্পষ্ট অনুভূত হয় যে আমিই ঐ কথা কওয়াইতেছি, ঐ স্পর্শ করাইতেছি; আমারই ইচ্ছা অনুসারেই ঐ কথা বাহির হইতেছে, হস্ত স্পর্শ করিতে অগ্রসর হইতেছে। এই যে আমি, এই আমিকে তুমি আত্মাই বল আর যাহাই বল—সত্যটা দাঁড়াইতেছে এই যে, আমি বা আত্মা বলিয়া একটা কিছু আছে। সেই আমি বা আত্মাকে আমরা চর্ম্মচক্ষুতে দেখিতে না পাইলেও উহা আছে এবং উহার ভিতরেই কর্ত্তব্য-অকর্ত্তব্যের জ্ঞান নিহিত আছে। প্রবাদ আছে—চুল টানিলেই মাথা আসে। সেই প্রকার আত্মা স্বীকার করিলেই ঈশ্বর, পরলোক প্রভৃতি তত্ত্বগুলি স্বীকার করা অনিবার্য্য। এগুলিকে অজ্ঞাত ও অজ্ঞেয় বলিলে নিজের উপর অবিচার করা হয়, সমগ্র মানবসমাজের প্রতি অবিচার করা হয়। আর একটা কথা ভাবিয়া দেখা উচিত যে, অজ্ঞাত ও অজ্ঞেয় বলিলেও কতকটা জ্ঞাত ও জ্ঞেয়ের ভাব আপনিই আসিয়া পড়ে। সোণার পাথরবাটি অজ্ঞাত ও অজ্ঞেয়, কিন্তু তাহার সঙ্গে সঙ্গে সোণারও জ্ঞাত-জ্ঞেয়ত্ব এবং পাথরেরও জ্ঞাত-জ্ঞেয়ত্ব আপনিই আসিয়া পড়ে না কি? আমরা আত্মা, ঈশ্বর প্রভৃতিকে সম্পূর্ণভাবে জানিতে না পারিলেও সে সম্বন্ধে যে কিছু না কিছু জানিতে পারি, তাহাতে আর সন্দেহ নাই—প্রতি মানবের হৃদয় এবং সমগ্র মানবসমাজের ইতিহাস সে বিষয়ে গভীর সাক্ষ্য প্রদান করে। এ বিষয়ে উপনিষদের ঋষির নিকট কি গভীর শান্তিপূর্ণ আশ্বাসবাণী শুনিতে পাই—"ঈশ্বরকে যে জানা যায় না তাহাও নহে, জানা যে যায় তাহাও নহে; তাঁহাকে জানা যায় না এবং জানা যায়, এই কথার মর্ম্ম যিনি জানিয়াছেন তিনিই তাঁহাকে যথার্থরূপে জানিয়াছেন।" আর ঐ যে ঋষি উদাত্তস্বরে হিমাচলের শিখরদেশ হইতে নিজের অন্তরের প্রত্যক্ষ অনুভূতি ঘোষণা করিয়া ব্যক্ত করিলেন—"আমি সেই তিমিরাতীত মহান পুরুষকে জানিয়াছি", এই সরল প্রত্যক্ষ অনুভূতি কি আমরা অবজ্ঞাভরে উপেক্ষা করিতে পারি, দূরে ঠেলিয়া রাখিতে পারি? কখনই নয়।

আমরা আত্মা ঈশ্বর প্রভৃতি সুদৃঢ় সত্যের সন্ধানে সকলকে অগ্রসর হইতে বলি বলিয়া যে কাহাকেও কর্ত্তব্যসাধনে পশ্চাৎপদ হইতে বলি, তাহা নয়। প্রত্যুত আমাদের মত এই যে, ভগবান বা অন্তর্যামী আত্মার আত্মা পরমাত্মাকে সমুদয় হৃদয়ের সহিত প্রীতি করিলে আমাদের কর্ত্তব্যের সুদৃঢ় ভিত্তি পাই এবং তখন কর্ত্তব্যসাধন অনিবার্য্য কর্ত্তব্য হইয়া পড়ে। এই কারণে আমরা প্রকৃত ধর্ম্মের দুইটী অঙ্গ নির্দ্দিষ্ট করি—ভগবানকে প্রীতি ও তাঁহার প্রিয়কার্য্য সাধন। প্রীতি একাত্মক হইতে পারে না; একাধিক সচেতন পুরুষের মধ্যেই এই প্রীতির সম্বন্ধ সম্ভব হয়। প্রীতির সম্বন্ধ স্থাপিত হইলেই পরস্পরকে জানিতেই হইবে যে কোন্ কার্য্যটী কাহার প্রিয়। কেবল তাহাই নহে, যাঁহাদের মধ্যে অকৃত্রিম প্রীতি থাকে, স্বভাবতই তাঁহাদের পরস্পরের প্রিয়কার্য্যসাধনে অনুরাগ জন্মে। প্রীতি ও প্রিয়কার্য্যসাধনের মধ্যে এক অবিচ্ছিন্ন ও অপরিহার্য্য সম্বন্ধ আছে। তাই ঈশ্বরকেও সত্যসত্য প্রীতি করিলে তাঁহার প্রিয়কার্য্য সাধনে নিশ্চয়ই আমাদের মতি হইবে। আর তিনি আমাদিগকে ভাল বাসেন বলিয়া সর্ব্বদাই আমাদের প্রিয়কার্য্য সাধনে নিরত আছেন। কিন্তু তিনি যে প্রিয়কার্য্য সাধন করিবেন, তাহার সঙ্গে মঙ্গলভাব অবিচ্ছিন্ন। তিনি আমাদের সর্ব্বদাই মঙ্গলসাধন করিতেছেন তিনি মঙ্গলবিধাতা।

আমরা এই কথা বলি, বুদ্ধদেব বলুন অথবা যিনিই বলুন যে, ঈশ্বর আত্মা প্রভৃতি অজ্ঞাত ও অজ্ঞেয়, তাহার প্রতি অবিচলিত বিশ্বাস ও আস্থা স্থাপন না করিয়া নিজের হৃদয়ের প্রতি অন্তর্দৃষ্টি স্থাপন করিয়া দেখ, নিজের হৃদয়ে তুমি কি বাণী পাও। অবহিত হইয়া শ্রবণ কর, সেই বাণী আমাদিগকে বজ্রনির্ঘোষে অনুক্ষণ বলিতেছে যে, আত্মা, ঈশ্বর প্রভৃতি সম্পূর্ণ অজ্ঞাত বা অজ্ঞেয় নহে, কিন্তু জ্ঞাত ও জ্ঞেয়। জ্ঞাত ও জ্ঞেয় বলিয়াই ভারতের ঋষিরা সরল ভাষায় ঈশ্বরকে প্রাণের প্রাণ ও আত্মার আত্মা রূপে ঘোষণা করিতে পারিয়াছেন; আত্মাকে বিজ্ঞানাত্মা পুরুষ বলিতে পারিয়াছেন; এবং পরলোকের অস্তিত্ব স্বীকার করিয়াছেন। বুদ্ধদেব তাঁহার সমসাময়িক লোকদিগকে অনাচার কদাচার হইতে ফিরাইয়া আনিবার জন্যই শুভকর্ম্ম অনুষ্ঠানের প্রতি জনসাধারণের সমস্ত মনোযোগ আকর্ষণ করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। আমরা শুভ কর্ম্ম অনুষ্ঠানেও বিরত হইব না এবং সেই সঙ্গে সমস্ত কল্যাণের মূল উৎস ভগবানের চরণ ধরিয়া থাকিতেও বিরত হইব না। সংশয়বাদ আমাদের অন্তর হইতে অপগত হউক। শ্রদ্ধা আমাদের সমস্ত মনপ্রাণকে পরিপূর্ণ করিয়া রাখুক।

দেবেন্দ্রনাথের বাল্যকথা।

(আচার্য্য শ্রীসতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী এম-এ)

মা গোসাঁই ও বৈষ্ণবী শিক্ষয়িত্রী। *

"নীলমণি ঠাকুরের পরিবারবর্গ নিষ্ঠাবান্ বৈষ্ণব ছিলেন, এবং খড়দহের গোস্বামীদের শিষ্য ছিলেন। সেই গোস্বামীদের নিকটে তাঁহারা দীক্ষা গ্রহণ করিতেন। দীক্ষাগুরুর পত্নীকে 'মা-গোসাঁই' বলা হইত। অনেক সময়ে গুরুর অভাবে অথবা গুরুর পুত্র প্রাপ্তবয়স্ক না হইলে, গুরুপত্নীরাও দীক্ষা দিতেন। মা-গোসাঁইরা শিষ্যবাড়ীতে আসিবার সময় প্রায়ই নিজের কন্যা পুত্রবধূ প্রভৃতিকে সঙ্গে লইয়া আসিতেন। তাঁহারা আসিলে তাঁহাদের অভ্যর্থনা করিতে এবং নানারূপ ন্যায় ও অন্যায় দাবী মিটাইতে শিষ্যদের বিব্রত হইতে হইত। আমার মনে হয় যে ইহাই লক্ষ্য করিয়া মহর্ষি তাঁহার পিতামহীর সম্বন্ধে লিখিয়াছেন, 'কিন্তু তিনি মা-গোসাঁইয়ের সতত যাতায়াত বড় সহিতে পারিতেন না।'

রামলোচন ঠাকুরের দীক্ষাগুরুর নাম ছিল হরিমোহন গোস্বামী; ইহার পত্নী কাত্যায়নী দেবীই অলকাসুন্দরীর দীক্ষাগুরু ছিলেন। তিনিই আত্মজীবনীতে বর্ণিত 'মা-গোসাঁই'।

'মা-গোসাঁই' ছাড়া আর এক শ্রেণীর বৈষ্ণবী শিক্ষয়িত্রী সে যুগে পরিবারে পরিবারে গমন করিয়া মেয়েদের লেখাপড়া শিখাইতেন। দ্বারকানাথের পরিবারেও তাহা করা হইত। এই বৈষ্ণবীগণও খড়দহের গোস্বামীদের বিশেষ জানিত না হইলে পরিবারে অবাধ প্রবেশ লাভ করিতে পারিতেন না। তাঁহারা প্রতিদিন পড়াইতে আসিতেন; অনেক সময়ে ছাত্রীদের বাটীতেও থাকিতেন। এই সকল বৈষ্ণবীর শিক্ষাদান কেবল বাংলায় শেষ হইত না; তাঁহারা সংস্কৃত বৈষ্ণব স্তবগুলিও অর্থের

---

* 'মা-গোসাঁই' ও বৈষ্ণবী শিক্ষয়িত্রীদের সম্বন্ধে এই নিবন্ধটি শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় অনুগ্রহপূর্ব্বক লিখিয়া দিয়াছেন।

সহিত শিক্ষা দিতেন। (এই শিক্ষাদানের নিদর্শন, চমৎকার হস্তলিপিতে বৈষ্ণবীকর্তৃক লিখিত বাংলা অনুবাদ সহ সংস্কৃত পুঁথি, আমার নিকটে আছে)। এই সকল বৈষ্ণবীদের কিন্তু 'মা-গোসাঁই' বলা হইত না। এই সকল বৈষ্ণবীরা পরিবারের কর্ত্রীর সহিত 'মা' প্রভৃতি পারিবারিক সম্পর্ক স্থাপন করিতেন, এবং তদনুসারে পরিবারের অন্যান্য সকলের সহিত তাঁহাদের যথোপযুক্ত সম্বোধনের সম্বন্ধ হইত।"

দেবেন্দ্রনাথ "বিলাসের আমোদে মগ্ন" কবে হইয়াছিলেন?

"চৌদ্দ বছর বয়সে দেবেন্দ্রনাথ হিন্দু কলেজে প্রবেশ করেন এবং ষোল হয় ষোল কি সতের বছর বয়সে হিন্দু কলেজ ছাড়িয়া থাকিবেন। সুতরাং এই ষোল হইতে আঠারো বছর পর্যন্ত, তাঁহার ভাষায় বলিতে গেলে, তিনি "বিলাসের আমোদে ডুবিয়াছিলেন" (অজিত ৪৭)।

দ্বারকানাথ স্বয়ং শুদ্ধাচারী মানুষ হওয়া সত্ত্বেও তাঁহাকে কলিকাতার ধনীদিগের অনুকরণে ও তাঁহাদের অনুরূপ চালে বিলাসের ও আমোদের আয়োজন করিতে হইত; এবং পুত্রগণ বয়স্ক হইলে, সামাজিকতার খাতিরে তাহাদিগকেও এই সকল আমোদের সভায় লইয়া যাইতে হইত। কিন্তু অপরিণত বয়সে তাহারা কেহ স্বয়ং বিলাসিতায় ও আমোদে মগ্ন হয় ইহা তিনি পছন্দ করিতেন না; এবং এই জন্য তিনি এসময়ে দেবেন্দ্রনাথের বিলাসপরায়ণতা ও অত্যধিক ব্যয়শীলতায় বিরক্ত হইয়াছিলেন।

এই সময়ে কলিকাতার ধনীদিগের "বিলাসের আমোদ" যে সুনীতি ও সুরুচি উভয় হইতে ভ্রষ্ট হইত তাহা বলাই বাহুল্য। কিশোর দেবেন্দ্রনাথ এ সময়ে যে পথে চলিয়াছিলেন, তাহাও তদ্রূপই ছিল। ইহাতে তাঁহাকে দোষী করা যায় না; বরং আশ্চর্য্য হইতে হয় যে, এমন অবস্থা হইতেও ঈশ্বর তাঁহাকে নিজের দিকে টানিয়া লইলেন।

দেবেন্দ্রনাথ বলিয়াছেন, "আমার চারিদিকে কেবল বিলাসের ও আমোদের অনুকূল বায়ু অহর্নিশি প্রবাহিত হইতেছিল। এত প্রতিকূল অবস্থাতেও ঈশ্বর আপনি দয়া করিয়া আমার মনে বৈরাগ্য দিলেন ও আমার সংসারাসক্তি কাড়িয়া লইলেন; এবং তাহার পরে সেই আনন্দময় স্বীয় আনন্দের ধারা আমার মনে বর্ষণ করিয়া নূতন জীবন প্রদান করিলেন।" ব্রাহ্মসমাজের ইতিহাসে মানুষের জীবনপরিবর্ত্তনই ভগবানের করুণার অনন্ত প্রকাশ; সেই অনন্ত প্রকাশ দেবেন্দ্রনাথের জীবনে অতি সমুজ্জ্বল।

দেবেন্দ্রনাথের এই "বিলাসের আমোদে মগ্ন" হওয়ার বিশেষ বর্ণনা নিষ্প্রয়োজন। কেবল তাঁহার এই সময়ের সাজসজ্জা ও ব্যয়বাহুল্যের বিষয়ে কিঞ্চিৎ উল্লেখ অপরের লেখা হইতে উদ্ধৃত করা যাইতেছে। যাঁহাকে আমরা সুদীর্ঘকাল শুভ্র বস্ত্র পরিহিত শান্ত সমাহিত তপস্বীর মূর্ত্তিতে দেখিয়া আসিয়াছি, তাঁহার কৈশোরের বাবুমূর্ত্তির বর্ণনা আমাদের চিত্তে কুতূহলের উদ্রেক করে এবং ঈশ্বরের নবজীবনপ্রদ করুণার সাক্ষ্য প্রদান করে।

শ্রীযুক্তা হেমলতা সরকার লিখিয়াছেন, "আমার পিতামহ গল্প করিতেন, তাঁরা দেখিয়াছেন, আট ঘোড়ার গাড়ী হাঁকাইয়া পরম রূপবান এক যুবা বুক ফুলাইয়া কলিকাতার রাস্তা কাঁপাইয়া যাইত। জিজ্ঞাসা করিলেন 'ইনি কে?' 'আরে কে তা জান না? দ্বারকানাথ ঠাকুরের বড় ছেলে হাওয়া খেতে বাহির হয়েছেন।' আমাকে মহর্ষির এক কন্যা গল্প করিয়াছেন যে, 'ঠাকুরদাদা মশাই যখন বেঁচে ছিলেন, বাবা মহাশয়ের table expenses ছিল daily ৩০০৲—বড়ছেলে বন্ধুবান্ধবদের লইয়া আহারে প্রতিদিন ব্যয় করিবে ৩০০৲ টাকা।" (তত্ত্বকৌমুদী ১৮৪৬ শকের ১৬ই ভাদ্রের সংখ্যা, ১১৭পৃষ্ঠা)।

তাঁহার কালের কোন প্রাচীন লোকের কাছে শুনিয়াছি যে, কলিকাতা সহরে তখন তাঁহার 'বাবু' খ্যাতি রটিয়া গিয়াছিল। জগদ্ধাত্রী ভাসানের সময় তিনি যেমন বেশভূষা পরিয়া বাহির হইতেন, অনেক বড়লোক তাঁহার অনুকরণ করিতেন।......

এই সময়ে তিনি একবার প্রায় লাখ টাকা খরচ করিয়া খুব ধুমধামের সহিত বাড়ীতে সরস্বতী পূজা করিয়াছিলেন। সেই পার্ব্বণে সহরে গাঁদা ফুল ও সন্দেশ দুর্লভ হইয়া উঠিয়াছিল। গাঁদা ফুল দিয়া তিনি প্রকাণ্ড এক সামিয়ানার মত তৈরী করিয়াছিলেন। প্রতিমা এত মস্ত হইয়াছিল যে, বিসর্জ্জনের সময়ে নানা কৌশলে তাহাকে বাড়ী হইতে বাহির করিতে হয়।"—(অজিত, (৪৬, ৪৭)।

স্বপানে আনন্দ হারাইয়া দেবেন্দ্রনাথের অশান্তি।

এই অশান্তির অবস্থাকে দেবেন্দ্রনাথ ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের অভিনন্দনের উত্তরে এইরূপে বর্ণনা করিয়াছেন, "সেই উদাস ভাবের আনন্দে হৃদয় এমনি বিকশিত হইল যে, সে রাত্রি চক্ষুতে নিদ্রা আইল না। তাহার পরদিনে সে আনন্দ চলিয়া গেল। তখন আমি ঘোর বিষাদে, অকূল চিন্তাতে নিমগ্ন হইলাম। পিপাসাতুর পথিকের ন্যায় সেই আনন্দের আকর প্রেমের সাগর সত্যস্বরূপের অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইলাম। মনে হইতে লাগিল যে চিত্তপটের জ্ঞানভূমিতে অনন্তের যে সুন্দর ছবি মুদ্রিত রহিয়াছে, তাহা কি কেবল ছবি মাত্র? তাহা কি মনের ভাবমাত্র? সেই বাস্তবিক সত্য কি নাই, যাহার এই প্রতিবিম্ব, যাহার এই প্রতিরূপ? এই প্রকারে

বুদ্ধির মধ্য আন্দোলন চলিল। এই আন্দোলন ও আলোচনাতে আমার মন ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হইতেছিল, তখন হঠাৎ উপনিষদের এক ছিন্নপত্র আমার হস্তে নিপতিত হইল।" —(তব ৩১০)।

দেবেন্দ্রনাথ কর্তৃক ১৮৩৮ সালের পূর্বে পঠিত
য়ুরোপীয় দর্শনশাস্ত্র।

এই সময়ে অষ্টাদশ শতাব্দীর ফরাসী দার্শনিক ও বিপ্লববাদী লেখকগণের এবং হিউম প্রভৃতি নিরীশ্বরবাদী গ্রন্থকারদিগের মত ও শিক্ষা হিন্দুকলেজের ছাত্রদিগের মধ্যে অতিশয় প্রসার লাভ করিয়াছিল। দেবেন্দ্রনাথ সেই দার্শনিকদিগের মধ্যে কাহারও কাহারও গ্রন্থ পাঠ করিয়াছিলেন এবং অপর কয়েকজনের মূলগ্রন্থ পাঠ না করিয়া থাকিলেও পাঠকসূত্রে তাঁহাদের মত ও শিক্ষার সহিত তিনি যে পরিচিত হইয়াছিলেন, ইহাতে সন্দেহ নাই।

(১) "প্রকৃতির অধীনতাই মনুষ্যের সর্বস্ব" এই ভাবটি হয়তো তিনি Julien offroy dela Mettrie (1709—1751) হইতে লাভ করিয়া থাকিবেন। এই লেখকের মতে মনের সকল ক্রিয়া শরীরের গঠনের উপর নির্ভর করে, শরীরের সঙ্গে সঙ্গেই আত্মার হ্রাস-বৃদ্ধি হয়, এবং শরীরের মৃত্যুতে আত্মারও ধ্বংস হয়। এই জড়বাদী দার্শনিকদিগের রচনাবলীর মধ্যে সর্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ গ্রন্থ ছিল Baron Paul Heinrich Dietrich von Holbach (1723—1749) প্রণীত Systune dela nature etc.। তাহাতে স্পষ্টতঃ জড়বাদ ও নিরীশ্বরবাদের সমর্থন এবং মানবাত্মার স্বাধীনতার মতের প্রতিবাদ করা হইয়াছে। (২) দেবেন্দ্রনাথ যে ইংরাজ দার্শনিক John Locke (1632—1704) প্রণীত Essay Concerning Human understanding পাঠ করিয়াছিলেন, তাহা স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায়। ফটোগ্রাফের কাচপাত্রে পতিত প্রতিবিম্বের তুলনার দ্বারা মানবের ইন্দ্রিয়জ্ঞানের উৎপত্তির ব্যাখ্যা Lockeই করিয়াছিলেন। আমরা বিষয়জ্ঞানের সহিত আপনাদিগকেও জানি এই তত্ত্বের আভাসও Lockeএর পুস্তকে আছে। (৩) সম্ভবতঃ David Hume (1711—1776) প্রণীত Enquiry Concerning Human understanding নামক গ্রন্থও তিনি এই সময়ে পড়িয়া থাকিবেন; কারণ হিন্দুকলেজের ছাত্রদিগের মধ্যে এই গ্রন্থের বিশেষ সমাদর ছিল। (৪) আত্মজীবনীর চতুর্থ পরিচ্ছেদে 'প্রয়োজনবিজ্ঞানবান্' ঈশ্বরের কথা পড়িয়া মনে হয় যে তিনি Systemetic materialissmএর অন্যতম প্রবর্তক Gassaudir (1592—1655) সহিত এবং ইংরাজ বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক Sir Robert Boyle (1627—1691) রচিত Disquigition about the Final Causes Natural Things নামক পুস্তকের সহিত পরিচিত ছিলেন। (৫) কিন্তু এখনও তিনি Thomas Reid প্রমুখ Scottish দার্শনিকগণের সহিত পরিচিত হন নাই। আত্মজীবনীর চতুর্থ পরিচ্ছেদে বর্ণিত আলোক লাভের পরে, প্রথমে উপনিষৎ হইতে এবং ক্রমশঃ এই Scottish দার্শনিকগণের রচনা হইতে, তিনি নিজ সিদ্ধান্তসকলের সার প্রাপ্ত হন। কিন্তু এই তৃতীয় পরিচ্ছেদে বর্ণিত সময়ে তিনি কেবল হিন্দুকলেজের ছাত্রদিগের মধ্যে বহুলভাবে পঠিত ও সমাদৃত য়ুরোপীয় দর্শনের পুস্তকগুলিরই সাক্ষাৎ পাইয়াছিলেন; তাহাতেই তাঁহার মনের সংগ্রাম এত বাড়িয়া গিয়াছিল এবং তিনি 'প্রকৃতি'কে পিশাচী বলিয়া অনুভব করিতেছিলেন।

প্রথমবয়সে দেবেন্দ্রনাথের ধর্মবিশ্বাস।

"প্রথম বয়সে আমার নিকটে এই নক্ষত্রখচিত অনন্ত আকাশ অনন্তদেবের পরিচয় দেয়। একদিন শুভক্ষণে এই অগণ্য নক্ষত্রপূর্ণ অনন্ত আকাশ আমার নয়নপথে প্রসারিত হইয়া প্রদীপ্ত হইল। তাহার আশ্চর্য্য ভাবে আমার সমুদয় মন সমুদয় আত্মা আকৃষ্ট হইল। অমনি বুদ্ধি প্রকাশিত হইয়া সিদ্ধান্ত করিল যে এ কখন পরিমিত হস্তের রচনা নহে। সেই মুহূর্তে অনন্তের ভাব হৃদয়ে প্রতিভাত হইল। তখন আমার পাঠ্যাবস্থা। একথা অদ্যাপি আমি কাহারো নিকটে প্রকাশ করি নাই। আপনাদের অদ্যকার সৌহার্দ্দ্যে বাধ্য হইয়া হৃদয়দ্বার উদ্ঘাটন করিয়া তাহা এখন ব্যক্ত করিতেছি।

"প্রথমে এই অনন্ত আকাশ হইতে অনন্তের পরিচয় পাইলাম, যেন আবরণ ভেদ করিয়া অনন্ত ঈশ্বর আমাকে দেখা দিলেন, যেন যবনিকার একপার্শ্ব হইতে মাতার বদন দেখিতে পাইলাম। সেই প্রসন্ন বদন আমার চিত্তপটে চিরদিনের জন্য মুদ্রিত হইয়া রহিয়াছে।

"প্রথম বয়সে উপনয়নের পর প্রতি নিয়ত যখন গৃহেতে শালগ্রামশিলার অর্চনা দেখিতাম, প্রতি বৎসর যখন দুর্গাপূজার উৎসবে উৎসাহিত হইতাম, প্রতিদিন যখন বিদ্যালয়ে যাইবার পথে ঠনঠনিয়ার সিদ্ধেশ্বরীকে প্রণাম করিয়া পাঠের পরীক্ষা হইতে উত্তীর্ণ হইবার জন্য বর প্রার্থনা করিতাম, তখন মনের এই বিশ্বাস ছিল যে, ঈশ্বরই শালগ্রামশিলা, ঈশ্বরই দশভুজা দুর্গা, ঈশ্বরই চতুর্ভুজা সিদ্ধেশ্বরী।

"কিন্তু সেই শুভক্ষণে যেমন এই অনন্ত আকাশের উপরে আমার নয়ন-যুগল উন্মীলিত হইল, অমনি আমার জ্ঞান উন্মীলিত হইয়া মনের পৌত্তলিক ভাবকে ক্ষণকালের মধ্যে তিরোহিত করিয়া দিল। অমনি জানিলাম,

অনন্ত আকাশের অগণ্য নক্ষত্র পরিমিত হাতের কার্য্য নহে, অনন্ত পুরুষেরই এই অনন্ত রচনা।

"প্রথম উপদেশ অনন্ত আকাশ হইতে পাইলাম। পরে শ্মশানে বৈরাগ্যের উপদেশ হইল। সহসা উদাসীনের আনন্দ হৃদয়ে উত্থিত হইল।"—(ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের অভিনন্দনের উত্তর; ভব, ৩২৮—৩৩০)।

অনন্ত আকাশ দর্শনে দেবেন্দ্রনাথের মনে এই ভাবের উদয় আনুমানিক ১৮৩১ খৃষ্টাব্দে চতুর্দ্দশ বর্ষ বয়সে, হিন্দু-কলেজে পাঠকালে হইয়া থাকিবে।

ডাক্তার এডওয়ার্ড বাইল্‌স কাউয়েল।

পূর্ব্বানুবৃত্তি

(শ্রীপঞ্চানন রায়)

"The London quaterly" নামক পত্রিকার ১৮৬৫ খ্রীষ্টাব্দের জুলাই সংখ্যায় কাউয়েল "La Fontaini and his fables" নামে একটী রচনা প্রকাশ করেন। এই প্রবন্ধে উক্ত লেখকের একটী গল্পের সহিত সংস্কৃত "হিতোপদেশের" "হংসকচ্ছপকথা" নামক গল্পটীর সাদৃশ্য প্রদর্শিত হইয়াছিল। ১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দে "Macmillan's Magazine"এর এপ্রিল সংখ্যায় বাঙলা উপন্যাস "দুর্গেশনন্দিনীর" কাউয়েল-লিখিত একটী সমালোচনা প্রকাশিত হইয়াছিল। ইহার মুখবন্ধে কাউয়েল স্পষ্টাক্ষরে উল্লেখ করেন যে,—"ভারতবর্ষই উপন্যাসের জন্মভূমি এবং ইউরোপীয় মধ্যযুগের অধিকাংশ লোকপ্রিয় গল্পেরই মূল উৎসের সন্ধান পাওয়া যায় প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্যের মধ্যে; প্রাচ্যদেশজাত গল্পমালার সুবিন্যস্ত সংস্করণ, সেই পুরাতন উপকথাগুলি নবযুগের অভ্যুত্থানের সঙ্গে সঙ্গে আধুনিক গল্পসাহিত্যের ছায়ায় অস্পষ্ট হইয়া গিয়াছে, কিন্তু ভারতবর্ষে এখনও তাহারা পূর্ব্বাকারেই জনপ্রিয় কল্পনাসমূহের মধ্যে অবস্থান করিতেছে।

"প্রত্যেক গল্পের প্রারম্ভে একটী সন্তানহীন রাজার উল্লেখ থাকিবেই থাকিবে; ঐ রাজা অবশেষে কোন ব্রতাদি পালন করিয়া একটী অতুলনীয় পুত্র লাভ করেন। প্রত্যেক রাজকন্যা কোন স্বয়ম্বরসভায় সমাগত পাণিপ্রার্থীদিগের মধ্য হইতে তাঁহার পতি নির্ব্বাচন করিয়া লইবেন, এবং প্রত্যেক গল্পই দেহান্তরপ্রাপ্তিবিষয়ক সার্ব্বজনীন বিশ্বাস হইতে অত্যন্ত স্বাভাবিক ভাবে উদ্ভূত অমানুষিক রূপান্তরপ্রাপ্তি প্রভৃতিতে পূর্ণ থাকিবেই থাকিবে।

"যাহা হউক, একটী আধুনিক পদ্ধতি অবশেষে প্রচলিত হইয়াছে। ইহা বুজরুকির ক্ষেত্র হইতে বাস্তবজীবনের গভীরতর অনুরাগসমূহের দিকে গল্পসাহিত্যের মোড় ফিরাইতে সুরু করিয়াছে। ইহা ভারতে ইংরাজীশিক্ষার পরিণাম বলিয়া অনুরাগব্যঞ্জক।" অতঃপর কাউয়েল গল্পাংশটীর সমালোচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন এবং উহা হইতে কতকগুলি নির্ব্বাচিত অংশ উদ্ধৃত করিয়া দেখাইয়াছেন, বাহুল্যভয়ে তাহা আর এখানে সংযোজিত করিলাম না।

১৮৫১ খৃষ্টাব্দে কাউয়েল সংস্কৃত নাটক "বিক্রমোর্ব্বশী"র ইংরাজী অনুবাদ সম্পূর্ণ করেন। এই বৎসরই তিনি "বররুচি"র "প্রাকৃত" ব্যাকরণ প্রকাশ করিয়া উইল্‌সন্ মহোদয়কে উপহার দেন। উহার আর একটী সংস্করণ পরে ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত হইয়াছিল।

১৮৬৫ খৃষ্টাব্দে কাউয়েল উইলসনের ঋগ্বেদানুবাদ ও Elphinstoneএর ভারতবর্ষের ইতিহাসের সম্পাদকতা করেন; উভয় পুস্তকই ১৮৬৬ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হইয়াছিল।

কাউয়েল সাহেব কেম্ব্রিজে অধ্যাপক-পদপ্রাপ্তির জন্য যে আবেদনপত্র প্রেরণ করিয়াছিলেন তাহার মধ্যে তাঁহার "কৃষ্ণযজুর্ব্বেদের" এবং উদয়নের "কুসুমাঞ্জলি"র ইংরাজী অনুবাদের কথা পাওয়া যায়, কিন্তু কবে তিনি ঐ সকল অনুবাদ সম্পূর্ণ করেন, তাহা আমরা জানিতে পারি নাই। ১৮৭৮ খ্রীষ্টাব্দে কাউয়েল "স্বপ্নেশ্বরে"র টীকার সহিত "শাণ্ডিল্যে"র ভক্তিসূত্রের ইংরাজী অনুবাদ প্রকাশ করেন। অবশেষে ১৯০২ খ্রীষ্টাব্দের "Extra Asiatic society Journal"এর ডিসেম্বর সংখ্যায় তাঁহার বাঙালী কবি মুকুন্দরাম চক্রবর্ত্তী কবিকঙ্কনের চণ্ডীকাব্যের ইংরাজী অনুবাদ প্রকাশিত হয়। শোনা যায়, রামবাগান দত্ত-পরিবারের বাবু গোবিন্দচন্দ্র দত্ত তাঁহাকে উক্ত বিষয়ে প্রথম প্ররোচিত করেন। এই গোবিন্দচন্দ্র দত্ত মহাশয়ই সুপ্রসিদ্ধ কুমারী তরু ও অরু দত্তের পিতা। কলিকাতায় থাকিতে থাকিতেই এই দত্ত মহাশয়দিগের সহিত কাউয়েলের ঘনিষ্ঠতা জন্মিয়া গিয়াছিল; কাউয়েলের তৎকালীন পত্রগুলিতে এই দত্তদের বিষয় উল্লেখ দেখা যায়।

কোন একজন বন্ধুর অনুরোধে কাউয়েল পাশ্চাত্য সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতগণের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস রচনা করেন; ইউরোপীয় সংস্কৃতজ্ঞগণের প্রাথমিক ইতিহাস বলিয়া ইহার যথেষ্ট উপযোগিতা আছে। George Cowell লিখিত কাউয়েল সাহেবের জীবনীর শেষভাগে এই সমগ্র ইতিহাসটী প্রদত্ত হইয়াছে। ১৮৭২ খৃষ্টাব্দের ১৩ই এপ্রিল তারিখের "The Times" নামক সংবাদপত্রে কাউয়েল "A letter on the Calcutta Presidency and Sanskrit Colleges" নামক একটী রচনা প্রকাশ

করেন। দুঃখের বিষয় উক্ত রচনাটী সংগ্রহ করিতে না পারায় এই প্রবন্ধে উহার সারসন্নিবেশ করিতে পারিলাম না।

কাউয়েল-রচিত সংস্কৃত শ্লোকসমূহ মৌলিক ও সুললিত; ঐগুলি এরূপ নির্ভুল যে, কখনই পাশ্চাত্য পণ্ডিতের রচনা বলিয়া মনে হয় না *। তদীয় অধ্যক্ষতাকালীন সংস্কৃতকলেজের প্রত্যেক পুরস্কারবিতরণী সভায় স্বকীয় বঙ্গভাষায় প্রদত্ত বক্তৃতার উপসংহারে তিনি প্রত্যেক বৎসরই নিয়মিত ভাবে এক-একটী স্বরচিত সংস্কৃত শ্লোক পাঠ করিয়া উপস্থিত শ্রোতৃবর্গকে বিস্ময়বিমূঢ় করিয়া তুলিতেন। দুঃখের বিষয়, ঐ সকলের একটী মাত্র আমরা সংগ্রহ করিতে পারিয়াছি—উহা পূর্ব্বেই প্রদত্ত হইয়াছে—এক্ষণে ঐরূপ আর একটী কবিতার তদ্রচিত ইংরাজী অনুবাদ পাদটীকায় প্রদত্ত হইল †।

১৮৯৯ খৃষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে কাউয়েলের প্রিয়তমা সহধর্ম্মিণী পরলোক গমন করেন। জীবনের এই মহীয়সী সঙ্গিনীর মরণে কাউয়েল যে বিশেষ ব্যথিত হইয়া পড়েন তাহা বলাই বাহুল্য। তাঁহার প্রিয় পিত্রালয় ব্র্যামফোর্ড গ্রামের গীর্জ্জাঙ্গনে তাঁহার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া নীরবে সুসম্পন্ন হয়।

১৯০০ খ্রীষ্টাব্দে ভট্ট মোক্ষমূলর পরলোক গমন করেন; অক্সফোর্ডে তাঁহার স্মৃতিরক্ষার্থ বিশেষ চেষ্টা হয়। কাউয়েল সাহেব উক্ত কার্য্য সম্পাদনের জন্য প্রভূত পরিশ্রম স্বীকার করেন। স্মৃতিরক্ষা তহবিলে ২৫০০ পাউণ্ড সংগৃহীত হইয়াছিল। কাউয়েল উহাতে চাঁদা স্বরূপ পাঁচ পাউণ্ড প্রদান করেন; ঐ সংগৃহীত মুদ্রালব্ধ আয় হইতে ভারতীয় ভাষা, প্রত্নতত্ত্ব, ধর্ম্ম এবং ইতিহাস প্রভৃতির উন্নতির জন্য সাহায্য করা হইবে স্থির হয় এবং Prof Hubert Herkomer R. A. প্রদত্ত মোক্ষমূলরের একটী তৈলচিত্র "All Soul's College"এর সুবৃহৎ কক্ষে প্রতিষ্ঠিত হয়।

নীরবকর্ম্মী কাউয়েলের দানশীলতা সর্ব্বজন বিদিত না হইলেও একটী বিশেষ উল্লেখযোগ্য বিষয়। অন্তঃসলিলা ফল্গুর ন্যায় করুণা তাঁহার অন্তরের গোপন নির্ঝরিণী। আমরা বিশ্বস্তসূত্রে অবগত হইয়াছি যে, কলিকাতায় অবস্থান কালে তিনি বহুসংখ্যক ছাত্রকে ভরণপোষণাদি দ্বারা সাহায্য করিতেন। ঐ ছাত্রসমূহের মধ্যে মহামহোপাধ্যায় নীলমণি মুখোপাধ্যায় মহাশয় একজন ছিলেন *। কাউয়েল-দম্পতী কলিকাতা পরিত্যাগ কালে তাঁহাদের পুস্তকের অধিকাংশই সংস্কৃত কলেজে অর্পণ করেন এবং সংস্কৃতকলেজে ব্যাকরণ শিক্ষার উন্নতির জন্য বৃত্তি প্রদানোদ্দেশ্যে কতকগুলি মুদ্রা প্রদান করেন, ইহা পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে। এইগুলি কাউয়েল মহোদয়ের দানশীলতার বিশিষ্ট নিদর্শন। যে ক্ষুদ্র পাঠশালাটী তাঁহার ভবিষ্যৎ জীবনবিটপীর অঙ্কুরোদ্গমের বিশেষ সহায়তা করিয়াছিল সেই "Ipswich Grammar School"টীও তাঁহার নীরব দান হইতে বঞ্চিত হয় নাই। কাউয়েল তাঁহার ভ্রাতা মরিসকে উক্ত বিদ্যালয়ে "কাউয়েল পুরস্কার" নামক একটী বার্ষিক পুরস্কার বিতরণের জন্য দুই শত পাউণ্ড প্রদান করেন। কাউয়েলের মৃত্যুকালীন ইচ্ছানুসারে তাঁহার সুবৃহৎ গ্রন্থাগারটী চারি ভাগে বিভক্ত হয়। এক ভাগ কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারকে প্রদত্ত হয়। দ্বিতীয় অংশটী "Corpus Christi College"এর গ্রন্থাগারে অর্পিত হয়। ভূতত্ত্ববিদ্যা সম্বন্ধীয় পুস্তকাবলী এবং প্রাচীন মুদ্রা সম্বলিত তৃতীয় অংশটী "Fetzwilliam Museum" কে প্রদত্ত হয়। অবশিষ্ট চতুর্থ ভাগটী "Girton College Library"তে অর্পিত হয়। এই পুস্তকসমূহ ব্যতীত কাউয়েল ১৫০০ শত পাউণ্ড "Corpus Christi College"এর অধ্যক্ষগণের হস্তে, তাঁহার নিজ নামে "গণিত কিংবা Classic" শিক্ষার্থ ছাত্রদিগের বৃত্তি প্রদান মানসে সমর্পণ করিয়া যান।

কাউয়েলের চিত্ত চিরকালই শিশুর ন্যায় সরল ছিল, তিনি কখনও আপনাকে প্রচারিত করিতে ভাল বাসিতেন না; এই কারণ বশতই তিনি ১৮৮৯ খৃষ্টাব্দে "Congress of Orientals" এবং "Stockholom"এর অধিবেশনের প্রতিনিধি-পদ প্রত্যাখ্যান করেন। তাঁহার সাধুজনোচিত অমায়িক ব্যবহার সকলকেই আকৃষ্ট করিত। তাঁহার নিকট অধ্যয়ন করিয়া ছাত্রগণ কখনও শিক্ষকের গাম্ভীর্য্য উপলব্ধি করিতে পারিতেন না। অসীম বিদ্যাবত্তা সম্পন্ন একজন মনীষীর পক্ষে উহা একটি অসাধারণ গুণ বলিতে হইবে। যথার্থ পণ্ডিত (Savant) বলিতে যাহা বুঝায় কাউয়েল প্রকৃতই তাহা ছিলেন।

---

* উহাদের কয়েকটী পূর্ব্বেই প্রদত্ত হইয়াছে।

† "The sweet taste in poetry like white candied sugar, attracts the entire soul of the feeble minded, but he who is strong in mind and thinks himself a man, is not lured by the bait of a sweet taste."

(A portion of the Cowell's letter, Dated 1861, Sept 9)

* "I was indebted to you for my education" (a portion of Nilmoney Mookerjee's letter to Cowell, Cowell's Life—Page 446)

তাঁহার বহুভাষাভিজ্ঞতার কথা পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে। ইউরোপীয় প্রধান প্রধান ভাষা এবং প্রাচ্য পারসী প্রভৃতি ভাষা ছাড়া তিনি ভারতীয় সংস্কৃত, পালি, বাঙলা ও হিন্দি ভাষায় বিশেষ পারদর্শী ছিলেন। কেম্ব্রিজে অধ্যাপনা কালে তাঁহাকে "পারসীক"দিগের প্রাচীনতম গ্রন্থ "জেন্দআভেস্তা"র অধ্যাপনা করিতে হইত। ইহা প্রাচীন পারসীক ভাষায় অগাঢ় জ্ঞান ব্যতীত কখনও সম্ভব হইত না। উদ্ভিদবিদ্যা, অঙ্কশাস্ত্র এবং প্রত্নতত্ত্ববিদ্যাতেও তিনি বিশেষ অভিজ্ঞ ছিলেন। ভারতীয় সংস্কৃত-শাস্ত্র মহোদধির প্রায় প্রত্যেক বিভাগেই তাঁহার বিশেষ কৃতিত্ব দেখিতে পাওয়া যায়। এতাদৃশ অসংখ্য গুণান্বিত হইয়াও তিনি অতিশয় বিনয়ী ছিলেন। প্রথম দৃষ্টিতে তাঁহাকে একজন ধর্ম্মাচার্য্য বলিয়াই মনে হইত। বস্তুতই ভারতের বহু ব্যক্তি তাঁহাকে একজন ধর্ম্মপ্রচারক বলিয়াই জানিতেন। খৃষ্টধর্ম্মে নবদীক্ষিত বহু ভারতীয় যুবক তাঁহাকে পিতা বলিয়া সম্বোধন করিতেন। খ্রীষ্টধর্ম্মে নবদীক্ষিত ভগবান চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় উহাঁদের অন্যতম ছিলেন; ইনিও কাউয়েলকে পিতৃসম্বোধন করিয়া পত্রাদি লিখিতেন। একজন সম্ভ্রান্ত মুসলমান ভদ্রলোক একবার কাউয়েলের সম্বন্ধে বলিয়াছিলেন যে "কাউয়েল সাহেব যখন খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বী তখন খৃষ্টধর্ম্ম সত্য হইলেও হইতে পারে"। এই সমস্ত ব্যাপার পর্য্যালোচনা করিলে তিনি যে বিশেষ লোকপ্রিয় ছিলেন তাহা স্বতই উপলব্ধি হয়। ভারতীয় ঋষিজনোচিত উদার আকৃতি অবলোকন করিয়া বহু কৃতবিদ্য পুরুষই তাঁহাকে ঋষি বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন*। বাস্তবিক তাঁহার উন্নত চরিত্র এবং সত্যপ্রিয়তা ঋষিজনোচিত ছিল বলিলে কিছুই অত্যুক্তি হয় না। আচার্য্য শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় তাঁহার সত্য-প্রিয়তা সম্বন্ধে একটী গল্পের উল্লেখ করিয়াছেন, তাহা সংক্ষেপে বর্ণনা করিবার লোভ সংবরণ করিতে পারিলাম না। উহা এই:—কাউয়েল যখন সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ ছিলেন তখন সিপাহী বিদ্রোহ উপলক্ষ্যে কলেজ সহরের অন্য কোন অংশস্থিত তিনটী বাটীতে স্থানান্তরিত হইয়াছিল। একদা উহারই একটী বাটীতে অগ্রে সোপান আরোহণ ব্যাপার লইয়া ছাত্রদের মধ্যে একটী খণ্ড যুদ্ধ হয়। আচার্য্য শাস্ত্রী মহোদয়ও যোদ্ধৃবর্গের একজন ছিলেন। অচিরাৎ যুদ্ধবার্ত্তা কাউয়েলের কর্ণগোচর হইল, তিনি শাস্ত্রী মহাশয়দের শ্রেণীতে উপস্থিত হইয়া গম্ভীর কণ্ঠে যোদ্ধৃদের নাম জিজ্ঞাসা করিলেন; কেহই উত্তর দিলনা, এইরূপে দুই তিন বার জিজ্ঞাসার পরও যখন কেহই উত্তর দিলনা তখন শাস্ত্রী মহাশয় আর নিশ্চিন্ত থাকিতে পারিলেন না, তিনি নিজ নাম প্রকাশ করিয়া ফেলিলেন। কাউয়েল তাঁহার সত্যপ্রিয়তায় মুগ্ধ হইয়া অবশেষে বলিয়াছিলেন যে "যুদ্ধ সাহসের কার্য্য সন্দেহ নাই, কিন্তু সত্যকথন অধিকতর সাহসের পরিচায়ক"।

ভারতবাসীর সমাজসংস্কার বিষয়ে কাউয়েল উদার মতাবলম্বী ছিলেন। তাঁহার একটী পত্রে জানা যায় যে তিনি তাঁহার কোন আত্মীয়ার পত্রে, বিলাতে পাঠার্থ দুইজন ভারতীয় রাজার আগমনসংবাদ প্রাপ্ত হইয়া অত্যন্ত খুসী হইয়াছেন এবং প্রত্যুত্তরে লিখিতেছেন যে, "আমি যখন ভারতে ছিলাম তখন হিন্দুর পক্ষে কালাপানি উত্তীর্ণ হওয়া বিশেষ পাপ বলিয়া উক্ত হইত, এক্ষণে দুই জন হিন্দু রাজার সমুদ্রপারে আগমনসংবাদ শুনিয়া অত্যন্ত আনন্দিত হইলাম"। তদীয় ছাত্রগণের প্রতি তাঁহার ভালবাসা এতদূর প্রবল ছিল যে শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় যখন কেম্ব্রিজে অবস্থান করিতেছিলেন তখন তাঁহাকে দেখিবার জন্য কাউয়েল জলবায়ুর বৈপরীত্য সত্বেও আগ্রহান্বিত চিত্তে আগমন করেন এবং দুইজনে কথোপকথনে অর্দ্ধ ঘণ্টা অতিবাহিত করেন।

৺চন্দ্রনাথ বসু মহাশয় বলিতেন যে কাউয়েল যখন প্রেসিডেন্সি কলেজের ছুটীর পর ছাত্রগণের মধ্য দিয়া তাঁহাদের অনেকের প্রশ্নের সমাধান করিতে করিতে চলিয়া যাইতেন তখন সে একটী দর্শনীয় ব্যাপার ছিল; সেরূপ দৃশ্য এখন কদাচিৎ দেখিতে পাওয়া যায়।

ছাত্রগণের প্রতি তাঁহার প্রীতি এতাদৃশ প্রবল ছিল যে একবার পণ্ডিত কৃষ্ণচন্দ্র রায় মহাশয় বঙ্গভাষায় একটী ভারতীয় ইতিহাস পুস্তক প্রণয়ন করিয়া উহা কাউয়েলকে দেখিতে বলেন। কাউয়েল তখনও বাঙলা ভাষা শিখেন নাই; তথাপি একজন দোভাষীর সাহায্যে উহা উত্তমরূপে বুঝিয়া লন এবং কেবল ঐখানেই ক্ষান্ত হন নাই, পরন্তু যখন ইহা মুদ্রিত হইয়া প্রকাশিত হয় তখন যাহাতে উহা স্কুলের পাঠ্যপুস্তকরূপে গণ্য হয় সেজন্যও বিশেষ চেষ্টা করিয়া অবশেষে কৃতকার্য্য হন। উক্ত পণ্ডিত মহাশয়ই এক স্থানে বলিয়াছেন যে প্রেসিডেন্সি কলেজে সুসম্বদ্ধ ইতিহাস-পাঠপ্রণালী কাউয়েলের দ্বারাই প্রথম প্রচলিত হয়।

কাউয়েল কদাচ আত্মপ্রশংসা শ্রবণ করিতে পারিতেন না, কেহ কখনও তাঁহার ন্যায্য প্রশংসা করিলেও তিনি বিরক্ত হইয়া উঠিতেন। কাউয়েল বলিতেন তাঁহার জীবনের ব্রত দুইটী, একটী অধ্যয়ন ও অপরটী অধ্যাপনা।

* He had the look of a veritable Indian "Rishi"—(a part of K. C. Roy's letter. Cowell's life Page 441)

* 'A Rishi has come to us'. (Pandit Shibnath Sastri's letter, Cowell's life Page 444)

তিনি যথার্থই আপনার জীবনের ব্রতোদ্‌যাপন করিয়া গিয়াছেন, বলিতে পারা যায়।

১৯০৩ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসের শেষ হইতে কাউয়েল পীড়িত হইয়া পড়েন; ফেব্রুয়ারী মাসের প্রথমে উক্ত পীড়া কঠিন আকার ধারণ করে। অবশেষে উক্ত মাসের ৯ই তারিখে তিনি আত্মীয়-পর সকলকেই প্রগাঢ় দুঃখসাগরে নিমগ্ন করিয়া পরলোক গমন করেন। তাঁহার চিরপ্রিয় নীরব ব্র্যামফোর্ড পল্লীতে তাঁহার প্রিয়তমা সঙ্গিনীর পার্শ্বে তাঁহার নশ্বর দেহ সমাহিত হয়। কাউয়েলের মৃত্যুতে ইংলণ্ড যে অমূল্য রত্নকে হারাইয়া ফেলিয়াছে তাহার স্থান কখনও পূর্ণ হইবে কি না জানি না। কাউয়েলের নশ্বর দেহ বিনষ্ট হইয়াছে কিন্তু তাঁহার কল্পস্থায়ী গুণগরিমা এখনও সমভাবে বর্ত্তমান রহিয়াছে। যতদিন ইংরাজী সাহিত্য পৃথিবীতে বর্ত্তমান থাকিবে ততদিন তাঁহার ভারতীয় ও পারস্য জ্ঞানোদ্যানের আহৃত প্রসূনাবলী অম্লানভাবে অবস্থান করিবে এবং গন্ধবাহী সমীরণ যেমন দিকে দিকে উল্লাস সৃষ্টি করিয়া প্রবাহিত হয় তদ্রূপ প্রাচ্য-কুসুম-সুবাস-বাহী কাউয়েল ধরণীর প্রতি দিকে অভিনন্দিত হইবেন।

ব্রহ্ম-সংস্পর্শ।

(২)

(শ্রীবসন্তকুমার ভট্টাচার্য্য)

স্পর্শের এক দিকে যেমন মঙ্গল, অপর দিকে তেমনই অমঙ্গলও আছে। স্পর্শে জীব বাঁচেও বটে, আবার মরেও বটে। আরোগ্যকর ঔষধের স্পর্শে কত শত কঠিন পীড়ার উপশম হয়, আবার বিষাক্ত ঔষধের স্পর্শে, বিষাক্ত বৃক্ষ-লতাদির স্পর্শে, সর্পের ন্যায় বিষাক্ত জন্তুর স্পর্শে সুস্থকায় বলিষ্ঠ জীব জীর্ণ হইয়া পড়ে—মরিয়া যায়। কতিপয় রোগ আছে, যাহা স্পর্শের জন্য অপরে সংক্রামিত হয়। লোকে পিতামাতা ও সাধু-গুরুজনের উচ্ছিষ্ট খাইয়া নিজেকে পবিত্র ও তৃপ্ত মনে করে, কিন্তু রুগ্ন ও অসাধুভাবাপন্ন মানবের উচ্ছিষ্টে রুগ্ন ও অসাধু হইয়া যায়। এই জন্য আর্য্যসন্তান যাহার তাহার উচ্ছিষ্ট অন্নাদি ভোজন করেন না এবং আহারীয় বস্তু যাহাতে যে সে স্পর্শ না করে, তাহার জন্য সর্ব্বদা সাবধান থাকেন। মাতা, ভগ্নী বা স্ত্রী ও কন্যাদির রন্ধনে কত যত্ন, আদর ও পবিত্রতা বিরাজ করে; এবং বেতনভোগী দাস-দাসী বা দোকানদারদিগের রন্ধনে কত অযত্ন, অনাদর ও মলিনতা মিশাইয়া থাকে। যদি তুমি সুস্থ ও সবল থাকিতে চাও, তবে যাহা তাহা স্পর্শ করিও না, যাহার তাহার হস্তে অন্ন-জল গ্রহণ করিও না এবং যাহার তাহার সহিত এক শয্যায় উপবেশন ও শয়ন করিও না। পবিত্র অন্ন জল আহার-পানে মনও পবিত্র হয়। আমি জানি, ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র এই সব কারণেই স্বপাকে আহার করিতেন। কিন্তু আমরা যদি তপস্যাবলে সর্ব্বদাই পরব্রহ্মকে স্পর্শ করিয়া থাকিতে পারি, তাহা হইলে আর অন্য জীবের স্পর্শ হইতে আমাদের কোনই ভয় থাকে না। মাতৃক্রোড় স্পর্শ করিয়া থাকিলে শিশু যেমন অন্ধকারকে ভয় করে না, ভূত প্রেত ডাকিনী যোগিনী কাহাকেও গ্রাহ্য করে না, তেমনই সেই পরম মাতা জগজ্জননীর অঙ্গ স্পর্শ করিয়া থাকিলে আমরাও ত্রিজগতে অপর কাহাকেও ভয় করি না। এই জন্যই অগ্নিমুখে, সমুদ্রগর্ভে, বিষপানে এবং ঐ প্রকার অন্য ভয়ঙ্কর শাস্তিতে সাধুভক্তগণ প্রহ্লাদের ন্যায় অমর, অজেয় ও নির্ভয় থাকেন এবং সজোরে অত্যাচারকারীদিগকে বলেন, "সেই ভয়াপহারী অনন্ত ভগবান কাছে থাকিতে অপর ভয়ের সম্ভাবনা কোথায়?"

শব্দ আসিয়া যতটুকু করিল, স্পর্শ আসিয়া তাহার উপরে আরও একটু অধিক করিল। এই সৃষ্টি একটী দেবতাতে গঠিত নহে, কিন্তু শব্দ স্পর্শ ও রূপ প্রভৃতি পর পর পাঁচটী দেবতা কর্তৃক বর্ত্তমান আকারে আকারিত হইয়াছে। খং-বায়ুর্জ্যোতিরাপঃ-পৃথিবীময় এই সৃষ্টি শব্দ স্পর্শ রূপ রস ও গন্ধের সমাবেশে ও স্থূল বিকাশে অভ্যুদিত হইয়াছে। এই পঞ্চ তন্মাত্রই পঞ্চ দেবতা। ইহাদের মধ্যেই "তং দেবতানাম্ পরমঞ্চ দৈবতম্" বিরাজ করিতেছেন। আজ যখন স্পর্শদেবতারই পূজা করিতেছি, তখন আর অপর দেবতাদিগের কথা বলিব না। যখন একটীর সঙ্গে আর একটী মিশিয়া যায়, তখন দুই জনেরই স্বাতন্ত্র্য লোপ পাইয়া অন্য একটী অভিনব পদার্থ উৎপাদন করে। এখন দেখ মিলন কেমন মিঠে, কেমন অভিনব! পুংকেশর ও গর্ভকেশরের সংস্পর্শে বা সম্মিলনে কেমন অমৃতপূর্ণ ফলের সৃষ্টি হয়। সাধক! যদি এ জগতে কোন মধুর ফল আকাঙ্ক্ষা কর তবে আপনাকে আর স্বতন্ত্র রাখিও না, কিন্তু সদ্গুণবিশিষ্ট আর একটীর সহিত মিশিয়া যাও। এই মিশামিশি ছোঁয়া-ছুঁয়িতেই ফলফুলের বিকাশ, ও সমগ্র জীবের জন্ম। এই মিশামিশিতেই সাধুভক্তগণ ব্রহ্মকে নিত্যই নূতন দেখেন। বোধ হয় এই জন্যই ছোঁয়াছুঁয়ি করিবার আশায় এই সৃষ্টি যেন একেবারে উন্মত্ত হইয়া উঠিয়াছে। আকাশের গ্রহ-তারা পরস্পরকে ছুঁইবার জন্য কতই না ব্যস্ত হইয়া ব্যোমে ব্যোমে ছুটাছুটি করিতেছে। এমন উদ্দাম ছুটাছুটি আর কোথাও নাই। সমুদ্রকে স্পর্শ করিবার জন্য নদ-নদী কতই না বেগে তর তর করিয়া বহিতেছে। পাখী আকাশকে ছুঁইবার
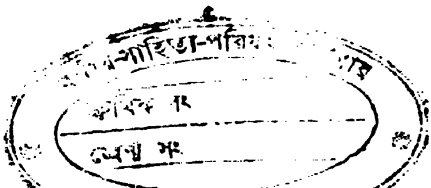
জন্তু যেন উধাও হইয়া প্রাণপণে ঊর্দ্ধে উঠিতেছে; এবং পৃথিবী হইতে স্বর্গকে ছুঁইবার জন্য, ইহলোক হইতে পরলোককে স্পর্শ করিবার জন্য, মানব হইয়া দেবতাকে ধরিবার জন্য, যোগী ভক্ত কর্ম্মী জ্ঞানী ঋষি মহর্ষি দেবর্ষি ব্রহ্মর্ষি প্রভৃতি সকলেই যেন উর্দ্ধবাহু হইয়া অনন্তের পথে অবিশ্রান্ত দৌড়াইতেছেন।

শব্দে মানুষ মোহিত হয়, কিন্তু স্পর্শে একেবারে উন্মত্ত হইয়া উঠে। প্রেমিক বন্ধু বন্ধুকে ছুঁইবার জন্য কতই না আগ্রহান্বিত—সদ্যপ্রসূত পুত্রটীকে কোলে তুলিবার জন্য প্রসূতি কতই না ত্বরান্বিতা—আকাশের চাঁদকে একবার ছুঁইবার জন্য ক্ষুদ্র শিশুর কতই না সরল হস্তপ্রসারণ—ভবকাণ্ডারীর চরণতরীকে স্পর্শ করিবার জন্য মুমুক্ষু মানবের কতই না ব্যাকুল প্রার্থনা! কি জানি, স্পর্শের ভিতরে কি দৈবশক্তি লুকায়িত আছে যে একের স্পর্শে অপরে একেবারে আত্মহারা ও উন্মাদ হইয়া যায়! তুমি যতই কেন আমাকে ভালবাস না, যতই কেন প্রেমনয়নে আমার পানে তাকাও না, একবার প্রেমভরে স্পর্শ না করিলে আমার প্রাণ জুড়ায় না—একবার তোমার পদ্মহস্ত বুলাইয়া না দিলে আমার গাত্রজ্বালা কমে না—একবার মস্তকে হাত না দিলে প্রাণ কিছুতেই শান্তি লাভ করে না। ঔষধে যাহা না হয়, প্রেম-ভরা প্রাণভরা শুশ্রূষায় তাহা হইয়া থাকে। পদসেবায় পায়ের বেদনা কমে, বুকে চাপিয়া ধরিলে হৃৎকম্প কমে, চক্ষে হাত বুলাইয়া দিলে দিব্যদৃষ্টি ফুটে। ইহা কে পারেন? মা পারেন, বন্ধু পারেন, আর সেই জগন্মাতা জগজ্জননী পারেন। মায়ের স্পর্শ মলয়মারুতের স্পর্শ অপেক্ষাও সুমিষ্ট—প্রিয় সখা-সখীর স্পর্শ বসন্তের কোকিল-কাকলীর ন্যায় স্বপ্নময়—সাধু ভক্তের সংস্পর্শ শরতের প্রতিপদের চন্দ্রকলার ন্যায় আশাপ্রদ, এবং জগজ্জননীর স্পর্শ ভূতলে জন্মমৃত্যুবিবর্জ্জিত স্বর্গের ন্যায় আনন্দময়। স্পর্শ না করিলে কাহাকেও আদর করা সম্পূর্ণ হয় না। পোষিত গোবৎস বা মৃগশিশুকে নাম ধরিয়া ডাক, তত বুঝিতে পারিবে না—কিন্তু গায়ে হাত বুলাইয়া দেও, সে তোমার আদর সাদরে অনুভব করিবে। ভগবান তাঁহার অনুগত ভক্তজনের গায়ে হাত বুলাইয়া দেন বলিয়াই ভক্ত ক্রুশে বিদ্ধ হইলেও বিদ্ধকারীদিগকে আশীর্ব্বাদ করেন, অগ্নিতে নিক্ষিপ্ত হইলেও নিক্ষেপকারীদিগকে আলিঙ্গন করেন, এবং বাইশ বাজারে নিষ্ঠুরভাবে প্রহৃত হইলেও প্রহারকারিগণকে হাস্যমুখে অভিবাদন করেন। কার সাধ্য ভক্তকে কষ্ট দেয়? এ জগতে এমন দুরাত্মা দানব কে আছে যে হরিভক্তের প্রাণে যাতনা দিতে পারে? ভগবান যাহার সর্ব্ব দেহে বর্ম্মস্বরূপ হইয়া আছেন, সে ভক্ত দুরন্ত সংসার-রণভূমিতে অজেয়, অবধ্য ও অমর। শুনিয়াছি গণ্ডারের চর্ম্ম কোনও অস্ত্রেই বিদ্ধ হয় না, তেমনই হরিভক্তের চর্ম্মও পার্থিব কোন শাণিত শরেই বিদ্ধ হয় না। কেননা ভক্তের 'শরবৎ' আত্মাই লক্ষ্যরূপী ব্রহ্মের ভিতরে প্রবিষ্ট হইয়া 'তন্ময়:' হইয়া যায়। তাই ব্রহ্মের গায়ে হাত না দিলে ভক্তের গায়ে সে হাত ঠেকে না; ব্রহ্মকে না মারিলে ভক্তকে মারা যায় না।

শত্রুর গায়ে শত্রুতা ভুলিয়া আদর করিয়া হাত দাও—তাহার রোগশয্যায় বসিয়া তাহার সর্ব্বাঙ্গের সেবা কর, দেখিবে সে আর তোমার শত্রু থাকিবে না—দেখিতে দেখিতে পরম মিত্ররূপে পরিবর্ত্তিত হইয়া যাইবে। মানুষকে যদি কিরাইতে চাও—অসুরকে যদি দেবতা করিতে চাও—অসাধুকে যদি সাধু গড়িতে চাও, তবে স্নেহভরে প্রেমভরে তাহার গায়ে হাত বুলাও—বেদনা ঝাড়িয়া দেও, অশ্রু মুছাইয়া দেও। সস্নেহে সপ্রেমে পায়ে হাত বুলাইবার লোক এ জগতে কয় জন পাওয়া যায়? বেদনা দূর করিবার, অশ্রু মুছাইবার বন্ধু কাহার কয় জন আছে? স্নেহ মাখা হাত গায়ে পড়ে না বলিয়াই মাতৃহারা শিশু অত মলিন—প্রেমপূর্ণ কণ্ঠালিঙ্গন পায় না বলিয়াই পত্নীহারা দুর্ভাগা মানব অত রুক্ষ শুষ্ক ও কঠোর। এই জন্যই কৃষ্ণের কাল রূপ যশোদার কোলে বড়ই খুলিয়াছিল, এবং শিবের বামে সতী ও রামের পাশে সীতা বড়ই সাজিয়াছিল। যশোদা না থাকিলে কেহই বনের রাখালবালক কৃষ্ণকে অত শ্রীমান্ করিয়া তুলিতে পারিত না, সতী না থাকিলে শিবকে কেহই শ্মশান হইতে কৈলাসধামে লইয়া যাইতে পারিত না, সীতা না থাকিলে চতুর্দ্দশ বৎসর বনবাসের কঠোর যাতনা রামচন্দ্র কখনই এত হাস্যমুখে সহ্য করিতে পারিতেন না। স্নেহময়ী জননী এবং পতিব্রতা সতী স্ত্রী এই উভয়েই মানবজাতির কান্তি, পুষ্টি, তুষ্টি ও শান্তি।

এই স্পর্শদেবতা বায়ুরূপে জগতের প্রাণ রক্ষা করিতেছেন, তাই ইঁহার নাম জগৎপ্রাণ। প্রকৃতির প্রাণের স্পন্দন এই বায়ুতেই অনুভূত হইয়া থাকে। মানবের হৃদয়যন্ত্রের স্পন্দনও এই স্পর্শেই অনুভূত হইয়া থাকে। রোগীর গাত্রে হাত দিয়া তাহার নাড়ী ধরিয়া শ্বাসপ্রশ্বাস পরীক্ষা করিয়া বিজ্ঞানবিদ্ চিকিৎসক তাহার জ্বরের উত্তাপের পরিমাণ, প্রাণনক্রিয়ার গতি প্রভৃতি নিরূপণ করেন। স্পর্শের দ্বারা দর্শনও করা যায়; গায়ে হাত দিয়া উত্তাপ দেখি, নাড়ী ধরিয়া জ্বরের বেগ দেখি। প্রাণের জ্বালাও এই স্পর্শের সাহায্যে জানা যায়। বিরহীর তপ্ত নিঃশ্বাস কতই না

উত্তপ্ত ও অবশ করে। বাণী বা শব্দ কেবলমাত্র কানের ভিতর দিয়া প্রাণে পশিয়া থাকে, কিন্তু স্পর্শ সর্ব্বাঙ্গের অসংখ্য লোমকূপ ছিদ্রপথে প্রবিষ্ট হইয়া জীবের অন্তস্তলে আঘাত করে। স্পর্শ করে জীবনকাঠি ও মরণকাঠি। আমি তোমাকে বিষ মাখাইয়া মারিতেও পারি, আবার ঔষধের প্রলেপ দিয়া মরণ হইতে ফিরাইতেও পারি। এমন জীবন ও মরণের বন্ধুকে আমরা কখনই উপেক্ষা করিতে পারি না—এ দেবতার যথাযোগ্য সম্বর্দ্ধনা ও পূজা করিতেই হইবে।

এই স্পর্শ লাগিলে মানীর মান যায়, ব্রাহ্মণ অশুচি হয়, ছোঁয়াছুঁয়িতে জাতি যায়। ভগবান যাদের স্পর্শ করেন, তাদের জাতি যায়, কুল যায়, মান যায়; শব্দ বা বাণী শ্রবণে কাহারও জাতি যায় না, কিন্তু স্পর্শ বা ছোঁয়াছুঁয়িতে লোকের জাতি যায়। ব্রহ্মের কোনও জাতি নাই; তাই তিনি বুদ্ধ, যীশু, মহম্মদ, নানক ও গৌরাঙ্গের মুখ দিয়া ঘোষণা করিয়া দিলেন যে মানব-জাতির কোন জাতি নাই—তাহারা সকলেই এক জগৎপিতার সন্তান! নদীয়ার গৌরাঙ্গদেব ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, কিন্তু ভগবান যখন তাঁহাকে স্পর্শ করিলেন, আলিঙ্গন করিলেন, তখন তাঁহার চৈতন্য হইল, তখন তিনি ঘোষণা করিলেন যে মানবের জাতি নাই। তাঁহার সংস্পর্শে যাঁহারা আসিলেন তাঁহাদের সকলেরই জাতি গেল। শত শত ব্রাহ্মণ ও শূদ্র তাঁহার দলভুক্ত হইয়া আপনাদের পূর্ব্ব পরিচয় ভুলিয়া "দাস" বলিয়া পরিচিত হইলেন। মহামহোপাধ্যায় সার্ব্বভৌম পণ্ডিতও দাসপতে নাম লিখাইলেন। গৌরাঙ্গ পরশে লোকের জাতি গেল, মান-সম্ভ্রম গেল, অভিমান পলায়ন করিল। কেবল শ্রীক্ষেত্র নহে, কিন্তু সমগ্র বিশাল ভারতক্ষেত্রে, কেবল শ্রীপুরীতে নহে কিন্তু ভারতের সকল প্রধান পুরীতে আজ গৌরাঙ্গের এই 'স্পর্শ' বিস্মৃত হইয়া পড়িতেছে। তাই ছোঁয়াছুঁয়িতে বর্ত্তমান যুগে জাতি রক্ষা করা দায় ও সমস্যা হইয়া পড়িয়াছে।

ভগবান যখন দূরে থাকেন তখন তিনি আহ্বান করেন, শব্দ উচ্চারণ করিয়া ডাকেন; কিন্তু তিনি যখন নিকটে অতি নিকটে আসেন, তখনই আমাকে স্পর্শ করেন, ছুঁইয়া ফেলেন, আলিঙ্গন করেন। শব্দে যিনি কেবল-মাত্র কর্ণে, স্পর্শে তিনি সর্ব্বাঙ্গে। ভগবানের সংস্পর্শ আমার সর্ব্বাঙ্গে! ভগবান যখন জীবকে ধরেন, স্পর্শ করেন, তখন দেখিতে দেখিতে জীব পরিবর্ত্তিত হইয়া যায়, তাহার সর্ব্বাঙ্গে দিব্যশ্রীর বিকাশ দেখা যায়। প্রাচীন ভক্তের মুখে একটী গান শুনিয়াছিলাম,—"ওটা শিব নয় মায়ের পদতলে। এটা মিথ্যা কথা লোকে বলে। দৈত্য বেটা রণে পড়ে, মা গিয়ে তার ঘাড়ে চড়ে, মায়ের পদস্পর্শে দানব-দেহ শিবরূপ হয় রণস্থলে।" জীব যতই কেন মলিন থাকুক না, ব্রহ্ম যখন তাহাকে স্পর্শ করিয়া আছেন, তখন তাহাকে পরিবর্ত্তিত হইতেই হইবে। একদিন না একদিন তাহার শ্রী ফিরিয়া যাইবেই যাইবে। তুমি যতই কেন আপনার জাতি-কুল বজায় রাখিবার চেষ্টা কর না, একদিন না একদিন হরি তোমাকে স্পর্শ করিয়া তোমার জাতি-কুল নষ্ট করিয়া দিবেনই দিবেন। তুমি যখন ক্ষুদ্র দেহপিঞ্জর ভাঙ্গিয়া অনন্ত গগনপথে উড়িবে, তখন তোমার জাতি থাকিবে না—কুল থাকিবে না, নাম-রূপ উপাধি কিছুই থাকিবে না। ইহা মাটির দেশ, পৃথিবী মাটিতে নির্ম্মিত, এখানে মাটিরই বেশী আদর। যার যত মাটি আছে, সে তত বড়লোক। সে মূর্খ চরিত্রহীন পাষণ্ড হইলেও সংসারের কাছে দেবতার ন্যায় পূজা প্রাপ্ত হয়। এদেশে আসিয়া সকলেই মাটি হইয়া যায়। আমরা কিন্তু মুখে খাঁটি জিনিসের আদর করিলেও মাটিকেই ভাল চিনি। খাঁটিকে চিনিবার ইচ্ছা ও শক্তি আমাদের বড়ই কম। কিন্তু ব্রহ্মস্পর্শে একদিন আমাদের মাটির রূপ বদলাইয়া যাইবে—সব কাল্পনিক রূপ চলিয়া যাইবে। আমরা দানব হইয়াও ব্রহ্মস্পর্শে দিব্যভাব ধারণ করিব—শিবরূপ ধারণ করিব। আজ যিনি ধনমদে মত্ত, ঐশ্বর্য্যের চাকচিক্যে আত্মবিস্মৃত, অন্তঃসারশূন্য তোষা-মোদকারিগণে পরিবৃত, তিনিও একদিন ব্রহ্মস্পর্শগুণে রাজপুত্র গৌতমের ন্যায় দীনহীন বেশে আচণ্ডাল ব্রাহ্মণকে আপনার ভাই বলিয়া আলিঙ্গন করিতে কুণ্ঠিত হইবেন না।

ক্ষুদ্র বীজ ফল-পুষ্প-শোভিত বিশাল বৃক্ষকে বীজ-রূপেই বুকে করিয়া জন্ম গ্রহণ করে বলিয়াই তাহার সুন্দর অভিব্যক্তি যেমন অপরিহার্য্য, তেমনই আমরা সূক্ষ্ম শব্দ-স্পর্শাদিরূপে ভূমা পরব্রহ্মকে বুকে করিয়া জন্মিয়াছি বলিয়াই আমাদের ক্রমোন্নতি—ক্রমবিকাশ—ইহলোক পরলোক ছাড়াইয়া ব্রহ্মলোক পর্য্যন্ত ব্যাপ্ত হইবেই হইবে। সূর্য্যোদয়কে চাপিয়া রাখা সম্ভব হইতে পারে, কিন্তু তোমার আমার উন্নতিকে—মাঙ্গলিক অভিব্যক্তিকে—দেবত্বের বিকাশকে চাপিয়া রাখিতে পারে এমন দুর্জ্জয় শক্তি এ বিশ্বে আজিও সৃষ্ট হয় নাই। আমরা ব্রহ্মসন্তান, তুমি আমাদের সংস্রবার ক্ষুদ্র মনে করিয়া ঘৃণা করিলেও আমরা একদিন মাটি ঠেলিয়া গাছ-পাথর সরাইয়া আকাশ ভেদিয়া ব্রহ্মধামে গিয়া উপনীত হইবই হইব। রাজসিংহাসনবিহারিণী রাজ-আদরে গরবিনী হাবভাবময়ী সুরুচির সন্তান 'উত্তমকে' পশ্চাতে ফেলিয়া কাননবাসিনী উটজসঞ্চারিণী জন্ম-দুঃখিনী সুনীতিদেবীর দীন হীন পুত্র 'ধ্রুব' নিশ্চয়ই

একদিন দেব-মানববন্দনীয় হইয়া ধ্রুবলোকে স্থান পাইবেই পাইবে। আজ আমরা বৃক্ষলতা, নদ-নদী চন্দ্র-সূর্য্যাদির অধীন হইয়া উহাদিগকে প্রভু বলিয়া মানি; কিন্তু আমাদের এমন শুভদিন আসিবেই আসিবে যে দিন এ বিশ্বের সমুদয় বৃক্ষলতা আমাদের পায়ে পুষ্পাঞ্জলি ঢালিয়া দিবে—সমস্ত নদ-নদী আমাদের পাদপদ্ম ধৌত করিয়া দিবে—সমস্ত গ্রহ-তারকা আমাদের জয়-গান করিবে এবং সমগ্র ভূমণ্ডল আমাদিগকে সাদরে আলিঙ্গন দিবে। এ কথা সত্য যে আজ আমরা বড়ই দুর্ব্বল, কিন্তু দেখ দেখ আমাদের মধ্যে সেই দুর্ব্বলের বল প্রতিষ্ঠিত আছেন। একথা সত্য যে আমরা বড়ই মলিন, কিন্তু দেখ দেখ আমাদের মধ্যে সেই আদিত্যবর্ণ চির জ্যোতির্ম্ময় মহাপুরুষ চির উদিত হইয়া আছেন। একথা সত্য যে আজ আমরা বড়ই ক্ষুদ্র, কিন্তু দেখ দেখ আমাদের মধ্যে সেই মহতো মহীয়ান চিরবিরাজ করিতেছেন। সুতরাং আমাদের আর ভয় নাই—আমাদের আর বিপদ নাই। আমাদের ক্রমোন্নতি একান্তই অপরিহার্য্য! আমরা যখন বিশ্ববীজকে বীজ-রূপে বক্ষে লইয়া জন্মিয়াছি—তখন মাতৃক্রোড়ে শিশুর ন্যায় ক্রমোন্নতির সুদর্শনচক্রে ঘুরিতে ঘুরিতে যে অমৃতের পথে—অনন্তের পথে, অভয়ের পথে দিনে দিনে সচ্চিদানন্দের আনন্দ ধামে গিয়া পৌছিব তাহাতে আর সন্দেহ মাত্র নাই। আজ আমরা এই মাটির দেশে মাটির পথে ধূলায় লুটাইতে লুটাইতে সাংসারিক সুখের আশায় ব্যাকুলভাবে "স্বর্ণমৃগের" পশ্চাতে পশ্চাতে ছুটিতে ছুটিতে শত লাঞ্ছনা ভোগ করিতেছি, কিন্তু নিশ্চয়ই জানিও চিরদিন আমাদের এ দুর্দ্দশা থাকিবে না, ব্রহ্মসংস্পর্শে ব্রহ্মোপাসনাবলে ব্রহ্মগুণগানে আমরা এই মাটির দেশকে মধুময় দর্শন করিব এবং "ওঁ মধু বাতা ঋতায়তে" গাইতে গাইতে ব্রহ্মনামের নিশান উড়াইয়া সাধুভক্তগণের সঙ্গে মিশিয়া চিদানন্দপুরে গমন করিয়া কৃতকৃতার্থ হইব।

বঙ্গভাষার সহিত দ্রাবিড় ভাষার সৌসাদৃশ্য।

(শ্রীঅমিয়ময় দাস, বি-এ)

বৈদিক যুগের পূর্ব্বে (১৫০০ খৃঃ পূঃ) আর্য্যগণ যখন প্রথম ভারতবর্ষে আসিয়াছিলেন, তখন তাঁহাদের আচার-ব্যবহার হেলেন্, ইটালী, কেল্ট, জারমান এবং শ্লাভ-দেশীয় পূর্ব্বপুরুষগণের আচার-ব্যবহারের ন্যায় ছিল। তাঁহাদের প্রভাব তখনও এদেশে তেমন ভাবে সঞ্চারিত হয় নাই। তখন তামিল দ্রাবিড়দিগের শাসন, ধর্ম্ম, শিল্প প্রভৃতি উন্নত হইয়াছিল। পরে আর্য্যগণ আসিয়া তাঁহাদের ভাব প্রচার করিতে লাগিলেন; এবং এই সময় হইতে দ্রাবিড়-দিগের অনেক কথা আর্য্যভাষার মধ্যে আসিয়াছিল। দ্রাবিড়-দিগের বহু দেব-দেবীর নাম, কাহিনী প্রভৃতি আর্য্যেরা গ্রহণ করেন; এমন কি অনেক সময়ে তাহাদের মতবাদকেও মানিয়া লইতেন। ইহার প্রমাণস্বরূপ বলা যায় যে,—আত্মার যোনিভ্রমণ (Transmigration of soul) সম্বন্ধে ঋগ্বেদে বিশেষ উল্লেখ না থাকিলেও, আর্য্যেরা দ্রাবিড়দিগের নিকট ইহা গ্রহণ করেন। দ্রাবিড়দিগের দেব-দেবীর নামও যে আর্য্যেরা ব্যবহার করিতেন তাহার কতক প্রমাণ পাওয়া যায়; দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা যায় যে, দ্রাবিড়দের পর্ব্বতের দেবতাকে আর্য্যরা "রুদ্র" (Red God) বলিতেন। এই 'রুদ্রের' নাম তামিল ভাষায় শিবন (লোহিত) এবং শেম্বু (তাম্র); ঐ শব্দদ্বয় হইতেই "শিব" এবং "শম্ভু" শব্দের উৎপত্তি। অতঃপর পৌরা-ণিক যুগে আর্য্যেরা 'রুদ্র' 'শিব' অথবা 'মহাদেব' বলিয়া এক দেবতা আছেন, এই কথা ঘোষণা করিতে লাগিলেন।

ঋগ্বেদের ভাষা, পদলালিত্য, বাক্যবিন্যাস আর্য্য-দিগের নিজস্ব; কিন্তু কতকগুলি শব্দের উপর যে অজ্ঞাত-সারে দ্রাবিড়শব্দের প্রভাব আসিয়াছে তাহা বেশ প্রতীয়মান হয়। ঋগ্‌বেদের নিম্নলিখিত শব্দগুলি দ্রাবিড়-শব্দ হইতে উৎপন্ন বলিয়া অনেকে স্বীকার করেন। যথা:—অনু, কপি, পুষ্প, পুষ্কর, নানা (অনেক), কুট (কুটীর), কলা (কলাবিদ্যা), কাল (সময়), নীল, ফল, বিল (গর্ত্ত), ময়ূর, নীহার, বীজ, রূপ, সায়ং, কুণ্ড, পুজন ইত্যাদি বহু শব্দ দ্রাবিড় হইতে গৃহীত।

যতই আর্য্যগণ ইহাদের সহিত মিশিতে লাগিলেন ততই পরস্পরের মধ্যে শব্দের আদানপ্রদান হইতে লাগিল। বৈদিক যুগের পরেও আর্য্যভাষায় আরও অনেক দ্রাবিড় শব্দ পাওয়া যায়। যথা:—অটবী, অলর্ক (এক প্রকার ফুল) সোনা, তণ্ডুল, তিল, আড়ম্বর, মর্কট, বলক্ষ (শ্বেত বর্ণ), শব, কুলাল (কুম্ভকার) ইত্যাদি।

স্বর, বাক্যযোজনা, পদবিন্যাস, শব্দার্থ প্রভৃতি লইয়া আলোচনা করিলে বুঝা যায় যে দ্রাবিড়ভাষার সহিত বঙ্গভাষার অনেক মিল আছে।

বঙ্গভাষায় যেমন প্রাণ, স্নেহ, রত্ন ইত্যাদি না বলিয়া অনেক সময়ে দীর্ঘ উচ্চারণে পরাণ, সিনেহ, রতন বলি, সেই প্রকার যুক্ত ব্যঞ্জন বর্ণকে ভাঙ্গিয়া স্বরবর্ণের সহিত মিলিত করিয়া দ্রাবিড় ভাষাতেও দীর্ঘ শব্দের উচ্চারণ করিতে দেখিতে পাওয়া যায়। যথা, তামিল:—পিরাম্মন (ব্রাহ্মণ); কন্নড়:—বরামন (ব্রাহ্মণ); তামিল:—